তপন রায়চৌধুরী

বাঙালনামা

'বাঙালনামা' অতীব সুখপাঠ্য। তপনবাবুর বলবার ভঙ্গি সচ্ছল, বাক্যগুলি তরতর করে বয়ে চলে, ভাষাতে কোনও কালোয়াতি-বা দেখানোপনা নেই। তিনি গল্পের পর গল্প বলে যাচ্ছেন, আমরা আঁটো হয়ে বসে শুনছি।

অ শো ক মি ত্র , দে শ

গ্রন্থটি অতিশয় সারবান। রচনার গুণে একটানা পড়ে যাবার আগ্রহ যেমন জাগিয়ে রাখে তেমনই মাঝে মাঝেই আবার আগের অংশ আবার পড়ে নিতে ইচ্ছে হয়।

সু নী ল গ ঙ্গো পা ধ্যা য় , ব ই য়ে র দে শ



আত্মকথা বা আত্মচরিত নয়, পাথুরে ইতিহাসও নয়। 'বাঙালনামা' আবিস্তৃত সমাজজীবনের কাহিনি। 'রোমন্থন'-খ্যাত লেখকের কলমে ভিন্ন স্বাদের স্মৃতিকথা। হারিয়ে যাওয়া ধূসর জগতের কিংবা হারাতে থাকা সময়ের নিবিড় বিবরণ। এই স্মৃতিকথার শুরু ১৯২৬ সাল, অর্থাৎ লেখকের জন্মের বছর থেকে। তারপর বর্তমান কাল অবধি এর সময়সীমা। ফেলে আসা আশি বছরে অতি দ্রুত নিজেকে বদলাতে থাকা সময়, লেখকের শৈশব-কৈশোরের পূর্ববঙ্গ, সেখানকার বিস্মৃত মানুষজন এবং বিলুপ্ত জীবনযাত্রা, পঞ্চাশের দশকের অক্সফোর্ড আর এখনকার সেই পশ্চিমি নালন্দা, গতশতাব্দী জুড়ে মহাদেশ থেকে মহাদেশে লেখকের সফর ও সুদীর্ঘ প্রবাসজীবন ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই রচনায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞা আর রসমাধুর্যে ভরপুর এক পথিকজীবনের ইতিবৃত্ত 'বাঙালনামা'।

ISBN 81-7756-669-5



অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯২৬ সালে, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে। পৈতৃক ভিটে বরিশালের কীর্তিপাশা। শিক্ষা বরিশাল জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সেন্ট অ্যান্টনিজ় কলেজের প্রাক্তন ফেলো। প্রথম জীবনে পড়িয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে জাতীয় অভিলেখাগারের সহকারী অধ্যক্ষ, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের অধ্যক্ষ ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন। এ ছাড়া হার্ভার্ড, পেনসিলভেনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড' ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। 'রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা' তাঁর লেখা প্রথম বাংলা বই। কলকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট ও ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত ড. রায়চৌধুরী ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ।

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

বাঙালনামা

বাঙালনামা

তপন রায়চৌধুরী



আনন্দ

প্রথম সংস্করণ মে ২০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০৯
চতুর্থ মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৩

ISBN 81-7756-669-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

BANGALNAMA
[Memoirs]
by
Tapan Roychowdhury

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

জীবনসায়াহ্নে যিনি আমার
সর্বকর্মের অধিষ্ঠাত্রী সেই মহামান্যা
লীলালক্ষ্মী বিম্বরাজাকে,
তস্যা মাতা সুকন্যাকে
এবং তাঁহার মা হাসিকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

ইয়োরোপ পুনর্দর্শন
রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা
প্রবন্ধ সংগ্রহ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

'বাঙালনামা' পাঠকগোষ্ঠীর কাছে আশাতীত অভ্যর্থনা পেয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে পা দিতে ভরসা পেল। লেখক এই সৌভাগ্য অনুপার্জিত জেনে অধিগুণ পাঠক-পাঠিকাদের বিনীত ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

প্রথম সংস্করণটি তার যোগ্যতার অতিরিক্ত সমাদর পেলেও কিছু কঠিন সমালোচনারও লক্ষ্য হয়েছিল। সেই সমালোচনার উত্তরে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। প্রথমেই এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সমালোচনার কথা বলি। আমার বহুদিনের বন্ধু ডক্টর অশোক মিত্র লিখেছেন যে তাঁর 'বাঙালনামা' এই শিরোনামটি পছন্দ হয়নি। কারণ আমি পনেরো বছর বয়েস থেকে দেশত্যাগী, সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি, আমার স্ত্রী কখনও পূর্ববঙ্গে যাননি (কথাটা সত্যি না), বইটার নাম বোধহয় 'দুনিয়ানামা' হওয়া উচিত ছিল। আমার বক্তব্য, আমি একুশ বছর বয়সে বাস্তুহারা হয়েছি, ৫২ বছর পরে নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে, বহু মানুষের অশ্রুজলে গঙ্গাস্নান করে মাতৃভূমিকে ফিরে পেয়েছি, যে মাতৃভূমি কখনও আমার চেতনা থেকে দূরে সরে যায়নি। বাঙালের শ্রমের অন্নে আমার দেহ পুষ্ট, বাঙালের ভাষা আমার ভাষা, বাঙালের পবিত্র ক্রোধ আমার দুর্দিনের সহায়— আমি বাঙাল না হলে কে বাঙাল? বাঙালের দেহ বাঙালের চরিত্র নিয়ে দুনিয়ার ঘাটে ঘাটে নৌকা বেঁধেছি, অন্নের সংস্থান করেছি। আমার বাঙালের চাপরাস কেড়ে নেয় এমন ক্ষমতা কার আছে? সুতরাং এ কেতাবের নাম 'বাঙালনামা'-ই রইল। এ নিয়ে আপত্তি করলে শুনব না।

দ্বিতীয় একটি আপত্তি বহু চিঠিপত্রে, মানুষের মৌখিক মন্তব্যে বারবারই চেতনাগোচর হয়েছে। সেই আপত্তি আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনি নিয়ে। কলকাতা শহরে ১৯৪৬ সনে অমানুষিক দাঙ্গা তথা গণহত্যার আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী— আর কয়েক লক্ষ মানুষের মতো। তার বিবরণ দিতে গিয়ে আমি নাকি মুসলমানদের পক্ষ টেনে কথা বলেছি, সরোয়ার্দি সাহেব যে ওই দাঙ্গার মূল নায়ক এমন কথা আমি নির্দ্বিধায় বলিনি। আমি দাঙ্গার যে ঘটনাগুলি স্বচক্ষে দেখেছি, তারই বর্ণনা দিয়েছি। হিন্দু পাড়ায় থাকতাম সুতরাং তাদের সুকীর্তিই চোখে পড়েছে বেশি। আর ভাগ্যদোষে আমি ঐতিহাসিক। সরোয়ার্দি সাহেবের অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পথ বন্ধ, কারণ সে বিষয়ে দলিলপত্র যদি কিছু থাকে তা কেউ দেখেনি, দেখবার উপায়ও নেই। আর বিনা প্রমাণে ফাঁসির আদেশ দিতে আমার পেশাগত

অসুবিধে আছে। জুরির বিচারেও লোকটি বেনিফিট অফ ডাউট পেতেন। আমিও তাঁকে তার বেশি কিছু দেইনি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের এক ভয়াবহ সম্ভাবনা আমাকে বিচলিত করেছে। পথেঘাটে ক্লাবে রেস্তেরাঁয় শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের কথাবার্তায় এক মারাত্মক প্রবণতা দেখি যার তুলনীয় কিছু আমি ৪৬-৪৭-এর প্রাণঘাতী বর্বরতার সময়েও দেখিনি। আমাদের জীবনের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের কারণ নাকি মুসলমান তোষণ। এর থেকে সম্ভাব্য মুক্তিদাতা একমাত্র গুজরাট গণহত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদী। এই জাতীয় চিন্তা এবং রাজনৈতিক প্রবণতার পথেই জার্মানিতে নাৎসিরা ক্ষমতায় এসেছিল। আমরাও কি সেই পথেই চলেছি?

আমার নীরদবাবু সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি কারও কারও অসদিচ্ছাপ্রণোদিত মনে হয়েছে। বলা প্রয়োজন— এঁরা সবাই আমার প্রতি ব্যক্তি হিসাবে বিরূপ নন। ওঁর এক আত্মীয় শুনলাম মন্তব্য করেছেন, "আমাদের গাল দিয়েছে।" কথাটা এতই অশ্রদ্ধেয় যে এ নিয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যেসব সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষ ওই পরিচ্ছেদটির মধ্যে অসূয়ার গন্ধ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। নীরদবাবু আমার নিতান্ত প্রিয়জন, এক অর্থে আমার পিতৃস্থানীয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে উনি প্রবাদপুরুষ। ওঁকে আমি যা বুঝেছি তা লিখে রেখে যাওয়া আমার কর্তব্য মনে হয়েছে। আমি ঐতিহাসিক। স্তুতি রচনা আমার পেশা না। ওঁর লেখা যাঁরা পড়েছেন বা ওঁকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ওঁর চিন্তা ও ব্যক্তিত্বে আপত্তিকর কিছু প্রবণতার সম্বন্ধে সচেতন। ওঁর সেই প্রবণতাগুলি জাতিবর্ণ এবং বংশগত সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে কারও নিন্দা করা যদি আমার উদ্দেশ্য হয় তবে তা আমাদের হতভাগ্য সমাজের, কোনও ব্যক্তিবিশেষের না, নীরদবাবুর তো নয়ই। উনি সম্ভবত কায়স্থেতর কোনও জাতির মানুষ, একবিংশ শতাব্দীতে এরকম কথা কেউ গালিগালাজ মনে করতে পারেন এমন চিন্তা স্বপ্নেও আমার গোচরিভূত হয়নি। উনিশ শতকে জাতিবর্ণ নিয়ে উদ্‌বেগ ব্রাহ্মণেতর সব বাঙালির মধ্যে দেখা যায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এ জাতীয় প্রবণতা লক্ষণীয়। কোনও কোনও কায়স্থ নিজেকে বৈদ্য বলে ঘোষণা করলেন, বৈদ্যরা উপবীত ধারণ করতে শুরু করলেন, আগুরিরা উগ্রক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করলেন এবং কার কোন বর্ণ তা নিয়ে রীতিমতো লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। এর সঙ্গে নতুন উপসর্গ জুটল কার কী পেশা বা চাকরি তা নিয়ে স্নবারি। নীরদবাবুর স্পর্শকাতর পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ উপরোক্ত দু'রকম সামাজিক বিকৃতিরই শিকার হয়েছিলেন, এমন প্রমাণ আছে। ওঁর জীবন ও কর্মের অবাঞ্ছিত দিকগুলির মূলে এই দুর্ভাগ্য বলে আমার ধারণা। এ কথা বলায় আমি ওঁকে "এক্সপোস" করেছি এমন যদি কারও মনে হয় তবে বুঝতে হবে যে উনিশ শতকে যে সব বিকৃত মূল্যবোধ আমাদের সমাজশরীরে প্রবেশ করেছিল তারা আজও শুধু সজীব না, প্রবল শক্তিতে লাথি ছুড়ছে।

আরও একটি সমালোচনার কথা বলি। আমার প্রিয়তম বন্ধু অমল দত্তের জীবনের একটি ঘটনা— ওঁর প্রেম ও বিবাহ এবং সেই প্রসঙ্গে এক মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি যা আমাদের সকলের জীবনেই ছায়া ফেলেছিল— সম্পর্কে সত্যিতে কী ঘটেছিল তা আমি লিখেছি। এ নিয়ে

অত্যন্ত রুচিবান কিছু মানুষও আমার কাছে আপত্তি জানিয়েছেন। আমার বক্তব্য— ঘটনাটি নিয়ে নানা মিথ্যা গুজব ষাট বছর পরে এখনও চালু আছে। তাই এ নিয়ে সত্যি কথাটি লেখা প্রয়োজন মনে করেছি। এ ব্যাপারে কারও কোনও দোষ ছিল না। সেই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছি। আমার এই সিদ্ধান্ত কারও নিন্দনীয় মনে হলে আমার কিছু করার নেই।

এই সংস্করণটি সম্পর্কে আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য আপাতত শেষ করব। শরীরে বড় একটি অস্ত্রোপচারের ঠিক আগের দিন 'দেশ' পত্রিকায় আমার লেখাটির শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়। আমার ধারণা হয়েছিল সেই ১৮ এপ্রিল আমার জীবনের শেষ দিন হবে। মনে মনে সবার কাছে বিদায় নিয়ে অস্ত্রোপচার কক্ষে প্রবেশ করেছিলাম। যখন জ্ঞান হল, নিছক বেঁচে থাকা যে কত সুখের হেতু সে কথা উপলব্ধি হয়েছিল। তরঙ্গিত দুঃখ সুখ না, রাত্রিদিন প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান অবান্তর মনে হয়েছিল। সেই কৈবল্যবোধ স্থায়ী হয়নি। নানা ব্যর্থতা নিয়ে মনোবিকলন, বার্ধক্যের সঙ্গী শোকতাপ, মানুষের প্রতি কারণ-অকারণে বিরক্তি সবই ফিরে এসেছে। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মন, সুখে বিগতস্পৃহ— ওসব হয় না স্যার, ওসব কথা ভগবদ্গীতা জাতীয় ভাল ভাল বইয়ে লেখা থাকে। অবশ্য পড়বেন, কিন্তু ভুলেও বিশ্বাস করবেন না। এই কেতাবে ব্যক্তিগত কথা কমই আছে।

কিন্তু এমন একটি পরিচ্ছেদ যোগ করলাম তাতে শুধুই ব্যক্তিগত কথা, আসন্ন মৃত্যুর আলোয় পৃথিবীটা কেমন দেখায় তার ব্যক্তিগত বিবরণী। এটা সত্যিই হাইকোর্ট দেখানোর প্রচেষ্টা, জীবজীবনের অন্তিম হাইকোর্ট। আশা করে আছি, শুধু বাঙাল না, সব পাঠকই এই সংক্ষিপ্ত মৃত্যুচিন্তা থেকে কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন।

গ্রন্থকার

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

২০০৬ সালের গোড়ার দিকে 'বাঙালনামা' লেখা শেষ করি। ২০০৭-এর ১৭ এপ্রিল 'দেশ' পত্রিকায় লেখাটির শেষ কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার কথা। 'বাঙালনামা'র শেষ পরিচ্ছেদে লিখেছি,— আমি হৃৎপিণ্ডের একটি 'ভাল্ব' বদল করার জন্য অস্ত্রোপচারে সম্মতি দিয়েছি। সেই অস্ত্রোপচার হবে ২০০৭ সালের ১৮ এপ্রিল— 'দেশ' পত্রিকায় 'বাঙালনামা'র শেষ কিস্তি ছাপা হওয়ার পরের দিন। এই যোগাযোগের পিছনে ভাগ্যদেবতার কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে কি না জানি না।

'দেশ' পত্রিকার গ্রাহক শুনি লক্ষাধিক। তা হলে পাঠকসংখ্যা তার অন্তত দু'-তিন গুণ। এই বিরাট সংখ্যার পাঠকমণ্ডলীর কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত এবং আমার কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য। কারণ আমার জীবন সাদামাটা শিক্ষাজীবীর। দীর্ঘদিন প্রবাসী,— তবে সে অভিজ্ঞতাও কয়েক হাজার বাঙালি শিক্ষাজীবীর। তাই রোমাঞ্চহীন এই জীবনকথা পাঠক-পাঠিকার কেন ভাল লাগল তার কোনও সদ্ব্যাখ্যা আমি পাইনি।

পাঠকদের চিঠিতে আমার অনেক ভুল দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ স্মৃতিভিত্তিক রচনা,— এবং অস্ত্রোপচারটি এক বছর আগে হওয়ার কথা ছিল, সেই কারণে একটু তাড়াতাড়িতে লেখা। ফলে বেশ কিছু ভুল আছে। সেগুলি শোধরাতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তবে বলি,— অনেক ক্ষেত্রে ভুল পত্রলেখকরাই করেছেন, আমি না। আর কিছু পত্রলেখকের চিঠিতে এক বিচিত্র বিদ্বেষ-প্রণোদিত মনোভঙ্গির প্রকাশ দেখেছি। অনেকেরই আপত্তি— মুসলমানদের আমি যথোচিত গালিগালাজ করিনি। এবং এক পত্রলেখকের গালিগালাজের লক্ষ্য সুশোভন সরকার এবং সুখময় চক্রবর্তী। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিঠিটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় শুনেছি লেখক অন্যত্র ওটি ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। ওঁর উদ্যোগ যথোচিত প্রশংসা করার ভাষা আমার নেই। আক্ষেপের কথা,— শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এ জাতীয় ব্যক্তি অপ্রতুল না, ঔপনিবেশিক যুগের বহুব্যাপী ব্যর্থতাবোধ আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গ হয়ে গেছে। আমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষের ব্যাখ্যা সেইখানে খুঁজতে হয়।

বহু মানুষের সাহায্য এবং উৎসাহ এই রচনা সম্ভব করেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে 'দেশ' পত্রিকা এবং 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর কর্মী। এই দুই সংস্থা তাঁদের কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না-জায়েজ ঘোষণা করেছেন। অতএব হৃদয়ের কথা হৃদয়েই রইল। যাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারলাম না,— আশা করি তাঁরা টেলিপ্যাথির সাহায্যে বুঝে নেবেন।

কয়েকটি মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে আর একটু সোচ্চার হচ্ছি। তাঁদের শীর্ষে প্রয়াত বন্ধু কুমার মুখার্জি এবং অমর সান্যাল। কুমার 'রোমন্থন' প্রকাশ হওয়া অবধি বর্তমান লেখাটি লিখতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। দুই কিস্তি প্রকাশ হওয়ার পর তিনি চলে গেলেন। আমার নানা অনুল্লেখ্য কাজের সাক্ষী অমর সান্যাল মহা উৎসাহে লেখাটি পড়ছিলেন। যে কিস্তিতে ওঁর কথা লিখেছি, সেটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন আগে তিনিও লোকান্তরিত হলেন। আমার সমস্ত লেখাটি ধাপে ধাপে যাঁদের মাথায় লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেছি তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক-অধ্যাপক কুণাল বসু এবং তাঁর পত্নী সুস্মিতা। অক্সফোর্ডে ওঁদের বহু শ্রান্ত সন্ধ্যা স্মিত মুখে এই অত্যাচার সহ্য করে কেটেছে। আমার স্ত্রীও এই উৎপীড়নের সহ-শিকার ছিলেন। চতুর্থ এবং পঞ্চম যে দুই ব্যক্তি এইভাবে উৎপীড়িত হয়েছেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরাও 'আনন্দবাজার' সংস্থার কর্মী, ফলে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তাঁদেরও টেলিপ্যাথি মারফত বুঝে নিতে হবে।

এই বইটি উৎসর্গিত লীলালক্ষ্মী বিঘ্নরাজা, তাঁর জন্মদাত্রী আমার কন্যা সুকন্যা এবং তস্যা মাতা হাসিকে। আমার জীবনরস যখন শুকিয়ে আসছিল তখন লীলালক্ষ্মীর আবির্ভাব। এখন আরও একশো বছর বাঁচতে ইচ্ছে করছে। শুনে লীলা সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বললেন "Dadu, you will be very old by that time.' তারপর একটু চিন্তা করে,— 'So shall I'।

কলকাতা
২২ মার্চ, ২০০৭

তপন রায়চৌধুরী

বা ঙা ল না মা

প্রারম্ভিক

বেশ কয়েক বছর আগে 'রোমন্থন' নাম দিয়ে বাল্য ও প্রথম যৌবনের স্মৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি নকশা জাতীয় রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। লেখাটি জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্যি বলতে শিক্ষিত বাঙালির কাছে আমার নাম যেটুকু পরিচিত তা ওই রোমন্থনের দৌলতে। যৌবনে দেখেছি, শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই স্যার যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং নীহাররঞ্জন রায়ের নাম জানতেন। অনেকে তাঁদের লেখাও কিছু কিছু পড়তেন। অনুরূপ পাণ্ডিত্য বা খ্যাতি যে আমার ভাগ্যে জোটেনি, তা আমার বহুমুখী অসাফল্যরই অন্যতর দ্যোতক। পাঠক-পাঠিকা এই আত্মবিলাপ মার্জনা করবেন।

রোমন্থনের সময়সীমা ছিল ১৯৪৭-৪৮ : দেশবিভাগের নিদারুণ অভিজ্ঞতা। বন্ধুবান্ধব এবং গুণগ্রাহী পাঠকরা দেশবিভাগের পরবর্তী কাল, তথা সুদীর্ঘ প্রবাসজীবনের স্মৃতিকথা লিখতে বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু কী লিখব, কী ভাবে লিখব তা ঠিক করতে করতে অনেক বছর কেটে গেল।

একটা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত প্রথমেই নিতে হল। 'আত্মকথা' লেখা আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ তার জন্য যে-সাহস দরকার তা আমার নেই। অনেক খ্যাতনামা মানুষের আত্মচরিত পড়েছি। তার অধিকাংশই যে অসত্য বা অর্ধসত্যে ভরা এ কথা আজ বহুবিদিত। অন্তহীন সাহস না থাকলে সত্যিকার আত্মকথা লেখা যায় না। রুসোরও অনেক আগে সন্ত অগাস্টিনের যুগ থেকে অনেক আত্মচরিতকারই নিজের যৌনতা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় লিখেছেন। এ যুগে তো ও ধরনের স্বীকারোক্তি আর ফ্যাশন নেই, নিতান্তই জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যে-মানুষ আধুনিক সংবেদনশীল চেতনা সত্ত্বেও বাড়ির ঝি-র গায়ে হাত তুলেছেন অথবা দুঃখিনী মাকে ঘেন্না এবং অবহেলা করেছেন, এসব কথা লিখতে ইতস্তত করেননি, তাঁর সমতুল্য লোক বেশি নেই। আমি বা আমার মতো অনেক লোকই নিজকৃত বহু কাজ নিজের কাছে স্বীকার করতেও লজ্জিত। সেসব কথা লেখার সাহস কোথায় পাব? আর নিজের গভীরতর চেতনা, অবদমিত মনের নানা বিকৃতির কথা লিখলে তা মনস্তাত্ত্বিকের কাছে হয়তো মূল্যবান বিশ্লেষণযোগ্য উপাদান হত, পূতিগন্ধপ্রিয় পাঠকরা লুফে নিতেন। কিন্তু ও পথে অর্থোপার্জন করতেও বুকের পাটা লাগে। আমার মতো ভিতু ছাপোষা লোকের তা নাগালের বাইরে। সব অপ্রিয় সত্য, যাবতীয় লজ্জাকর তথ্য বাদ দিয়ে নিজের কীর্তিকাহিনির সত্যমিথ্যা মেশানো বিবরণ যেসব আত্মচরিতের মূল উপাদান, তাদের সাহিত্য হিসাবে মূল্য থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক আত্মপ্রকাশ যা

আত্মচরিতের গোড়ার কথা, অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি তা কোনও অর্থেই নয়। সুতরাং আত্মচরিত লেখার প্রচেষ্টা সাহসের অভাবেই ছাড়তে হল।

কিন্তু বয়স আশির দিকে এগুচ্ছে। মানুষের স্বল্পস্থায়ী জীবনের হিসাবে সময়টা লম্বা। এই দীর্ঘ সময় ধরে নানা ঘাটের জল খেতে হয়েছে। পিছনের দিনগুলি সত্যিই নানা রঙের, যদিও রঙগুলি প্রায়শই ঘনকৃষ্ণ অথবা অভাব আর নৈরাশ্যে ধূসর। তবু সেসব দিনের স্বাদ আজকের প্রজন্মের কাছে অচেনা। অপরিচয়ের দান যে-মাদকতা, তার সম্ভাবনায় ভরা। আর যে-পৃথিবী ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকেও চিনতাম, তার অনেকাংশই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালে বরিশাল গিয়ে এই সত্য প্রবলভাবে অনুভব করি। যে-শহরে এখন থাকি, সেই অক্সফোর্ডও আর পঞ্চাশের দশকের অক্সফোর্ড নেই, এই পশ্চিমি নালন্দার চিরন্তনী বলে আত্মশ্লাঘা সত্ত্বেও। বার্ধক্যের এই রচনা সেই বিস্মৃত বা বিলুপ্ত জগতের বিবরণ। লেখক সেখানে দর্শক, বড়জোর পার্শ্বচরিত্রে অভিনেতা। অর্থাৎ বর্তমান রচনাটি আত্মজীবনী নয়, স্মৃতিকথা। আর শুরু করছি ১৯২৬ সাল, অর্থাৎ জন্মের বছর থেকে, যদিও অবশ্যম্ভাবী কারণেই সে সময়ের কোনও স্মৃতি আমার নেই। বন্ধু ও শুভার্থীদের উপদেশ, দেশবিভাগের সময় থেকে শুরু করা, অনেক ভেবে গ্রহণ করলাম না। কারণ, রোমন্থনও স্মৃতিকথা না, স্কেচবুক মাত্র।

জন্মস্থান : মাতুলালয় : কুমিল্লা শহর

আমার জন্ম মাতুলালয়ে—কুমিল্লা শহরে। ঈসাই সন ১৯২৬, যে বছর সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসবেন ঘোষিত হল। ওই ঘটনাটা আমার বাল্যজীবনে প্রাসঙ্গিক, কারণ যেসব রাজনৈতিক কর্মী বাড়িতে সব সময় যাওয়া-আসা করতেন, বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ ওই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলে নেমে তাঁদের অনেকেই প্রচণ্ড মার খেয়েছিলেন। তাঁদের মাথায় বা ঊর্ধ্বাঙ্গের নানা জায়গায় সেই প্রহারের চিহ্ন আমার শৈশব ও বাল্যস্মৃতির অঙ্গীভূত। আমরা যে ইংরেজের গোলাম এবং বেয়াদবি করলে মার খাওয়াই গোলামের ভাগ্যলিপি—এ কথাটা অতি শৈশবেই পরিচিত কংগ্রেস ভলান্টিয়ররা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যথাস্থানে সে বিষয়ে বলব।

আপাতত মামাবাড়ির কথা বলি। আমার দাদামশায় ঊনচল্লিশ বছর বয়সে ছাব্বিশ বছর বয়স্কা পত্নী এবং সাতটি সন্তান রেখে পরলোকগমন করেন। সপ্তম সন্তানটি তখনও মাতৃগর্ভে। দাদামশায়ের মৃত্যুকাহিনি বৈচিত্র্যচিহ্নিত। ওঁর প্রথম যৌবনে কোনও গণৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে উনি ঊনচল্লিশ বছর বয়সে মারা যাবেন। এই কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে মেনে নিয়ে দাদামশায় তাঁর সমস্ত জীবনের বিলিব্যবস্থা তদনুসারেই করেছিলেন। আটত্রিশ পেরিয়ে ঊনচল্লিশে যে দিন পা দিলেন, সে দিনই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। গণকের জয়জয়কার। আমার ধারণা ঘটনাটা ইচ্ছামৃত্যুরই শামিল। বিশ-পঁচিশ বছর ধরে 'অমুক দিনে আমি মারা যাব' এ রকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে, ওই দিনটিতেই মারা

যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা না। জন্মদুঃখী আমার দিদিমা অসাধারণ বুদ্ধি আর অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে আরও ষাট বছর বেঁচে ছিলেন।

তাঁর সাত সন্তান লালনপালনের ভার নেন দাদামশায়ের ছোট ভাই, ও অঞ্চলে বিখ্যাত আইনজীবী রায়বাহাদুর ভূধর দাস। রায়বাহাদুর তাঁর পরবর্তী জীবনের পরিচয়। প্রথম জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিখ্যাত অভয়াশ্রমের আওতায় তিনি বিপ্লববাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শুনেছি একবার তিনি শাড়ি পরে আত্মগোপন করে পুলিশের পাতা জাল থেকে নিস্তার পান। সেসব পুলিশ নিতান্তই হাবা ছিল সন্দেহ নেই। কারণ ভদ্রলোক প্রায় সাত ফুট লম্বা ছিলেন এবং বঙ্গরমণীরা কখনও এতটা উচ্চতা অর্জন করেছেন, ইতিহাসে এমন নজির নেই। সম্ভবত পসার এবং সম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর চিত্তে রাজভক্তির উদয় হয়। ভূধরবাবু পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। উপরি পাওনা রায়বাহাদুর খেতাব। ওঁর মক্কেলরা ওঁকে অন্য এক উপাধি দিয়েছিল—ভোন্দর দাস, ওরফে ভোন্দর মোক্তার (যদ্যপি উনি পাস করা উকিলই ছিলেন)। কারণ ভূধর শব্দটা কুমিল্লা অঞ্চলের গ্রামবাসী মুসলমানদের অভিধানে সুলভ ছিল না। মক্কেল প্রদত্ত ভোন্দর অর্থাৎ ভোঁদড় উপাধি পরিবারস্থ সবাই সম্মান জ্ঞানেই গ্রহণ করেছিলেন। মামারা সগর্বে আত্মপরিচয় দিতেন, 'আমরাই তো ভোন্দরের ছাও।' এই ভোঁদড়শাবক পরিচয় শ্লাঘারই বিষয় ছিল।

ভোন্দর মোক্তারের নানা কীর্তি কুমিল্লা অঞ্চলে জনপ্রবাদের অঙ্গ ছিল। শুনতাম ওঁর কাছে মামলায় হেরে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বী এক উকিলকে তাঁর গ্রাম্য মক্কেল তিরস্কার করে বলেন, 'ভোন্দর মোক্তার যখন ষাঁড়ডার মতো গর্জনটা দিল, তহন্ যদি আফনে ম্যাড়াডার মথন মটকাডাও মারথেন, হেইলে হয়থ মামলাডা বাছথ।' অর্থাৎ ভূধর দাসের বৃষগর্জনের প্রত্যুত্তরে উকিলবাবু যদি মেষসুলভ ম্যা ম্যা ধ্বনিও করতেন, তাহলেও হয়তো কিছু আশা ছিল।

এই সিংহতেজা মানুষটিকে নিজের দাদামশায় বলে জানতাম। মামলার কাজে বরিশাল এলে বসবার ঘরে সোফায় শুয়ে উনি ঘুমাতেন। আর ওঁর বিশাল ভুঁড়িটি ঢাকজ্ঞানে বাজিয়ে আমি নির্মল আনন্দ পেতাম। কিন্তু এই কলাচর্চায় মা-বাবার অনুমোদন ছিল না। ফলে আমার সঙ্গীত শিক্ষার ওইখানেই শুরু এবং শেষ।

দেশবিভাগের কিছু পরে দাদামশায় এবং ভোঁদড়শাবকরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। শুধু এক মামা পিতার বিশাল সম্পত্তি আঁকড়ে পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনারা তাঁকে খুন করে—শরীরের সমস্ত রক্ত নিষ্কাশন করে নিয়ে।

কুমিল্লা শহরে ভূধর দাসের প্রাসাদোপম বাংলো বাড়ি ছিল—বিশাল কম্পাউন্ডের মাঝখানে সাহেবি কায়দায় তৈরি, সামনে চওড়া গাড়িবারান্দা। মানে ত্রিশের দশকে বাংলা ছবিতে নায়িকার অভিজাত পিতারা যে-ধরনের বাড়িতে থাকতেন, কতকটা সেই স্টাইলে। আমার মা এবং মামামাসিরা কাকার আশ্রয়ে ওই বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন। অন্য সহায়হীন ভ্রাতৃবধূ আর ভাইপো-ভাইঝিদের হৃদয়বান মানুষ ভূধর দাস অবহেলা করেননি। কিন্তু দরিদ্র আশ্রিতজনের ভাগ্যে যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছোটবড় অপমান বরাদ্দ থাকে, কর্মব্যস্ত মানুষটি তা থেকে ওদের বাঁচাতে পারেননি। উনি ভাইপোদের সযত্নে লেখাপড়া শিখিয়ে

জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভাইঝিদের বহু ব্যয়ে বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর বাড়ির পাশেই বেশ কিছুটা জমিবাগান নিয়ে আমার দিদিমা এবং মামাদের বড় একতলা বাড়ি ছিল, সম্ভবত ওঁরই অর্থসাহায্যে।

কিন্তু ভূধরবাবু সম্পর্কে ওঁদের নালিশের অন্ত ছিল না। শুনতাম দিদিমা নাকি স্বামীর মৃত্যুর পর প্রায় সাতদিন অজ্ঞান ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে সদ্যবিধবা বউদির টিপসই আদায় করে ভূধরদাদু বড় ভাইয়ের রেখে যাওয়া সত্তর হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আত্মসাৎ করেন। গিরিশ ঘোষের নাটকোপযোগী এই কাহিনি যদি-বা সত্যি হয়, তবু সাত ভাইপো-ভাইঝির ভরণপোষণ, শিক্ষাদীক্ষা, বিয়েসাদিতে সে টাকা উনি কতগুণে শোধ দেন, তার হিসাব মিলানো আজ আর সম্ভব না।

প্রায় একশো বছর আগের এই সব তুচ্ছ পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়ে কেন আজ শব্দব্যয় করছি ঠিক জানি না। একটা কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। নানা দোষগুণ নিয়ে ভূধরবাবু বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন। ওই ধরনের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী, হয়তো কিছুটা দাম্ভিক, কর্মকুশল মানুষ আমাদের সমাজে আর দেখা যায় না। সাফল্যের চূড়ায় যে-নিঃসঙ্গতা, তা তাঁকে ঘিরে ছিল। লোকে কানাঘুষা করত—উনি নাকি ওঁর বিখ্যাত এক সহকর্মীর পত্নীর প্রেমাসক্ত ছিলেন। আদালত-ফেরতা রোজই তাঁর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতেন। যতদূর জানি, নিঃসঙ্গ মানুষটির 'অবৈধ' প্রেম এর বেশি এগোয়নি। বাইরে থেকে মনে হত মানুষটি কঠিন প্রকৃতির, আবেগহীন, দুরধিগম্য। কিন্তু বহু নিরাড়ম্বর দানধ্যানে ওঁর হৃদয়ের অন্যতর পরিচয় ছিল। কিন্তু আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা অথবা ইচ্ছা ওঁর ছিল না। তাই ছেলেপেলেরা ওঁকে ভয় পেত। আমি পেতাম না, কারণ বুঝতে পেরেছিলাম যে, ভুঁড়িতে ঢাক বাজানো ব্যাপারটা ওঁর অপছন্দ ছিল না। বোধ হয় অর্বাচীন শিশুর নির্বোধ দুঃসাহস ওঁকে যন্ত্রণাময় নিঃসঙ্গতা থেকে ক্ষণিক মুক্তি দিত। আমার ঠাকুর্দা আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই মারা যান, আর নিজের দাদামশায় তো মা'র শৈশবেই গতাসু। ভূধরদাদু আদর না দিলেও প্রশ্রয় দিতেন। শাসনহীন স্নেহের সঙ্গে ওই আমার প্রথম পরিচয়। তার প্রতিদানে যে-তীব্র অহেতুকী ভালবাসা বোধ করতাম, তা শুধু শিশুহৃদয়েই লালিত হতে পারে। আর পারে কৈশোর প্রেমে। বড় হয়ে যখন গলসওয়ার্দির 'ওল্ড ইংলিশ' নাটকটি পড়ি, তখন তার দোষেগুণে ভরা কেন্দ্রীয় চরিত্রটিতে দাদামশায় ভূধর দাসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। চরিত্রটিতে আরও একটি প্রিয় মানুষের ছায়া দেখতে পেতাম। তিনি শের-ই-বাংলা ফজলুল হক।

আমাদের মামাবাড়িতে বেশি যাওয়াআসা ছিল না। মা আমাদের নিয়ে দু-তিন বছরে একবার যেতেন। বাবাকে কখনও যেতে দেখিনি। আমাদেরও ওখানে গিয়ে খুব একটা ভাল লাগত না। তার একটা কারণ আমার আবাল্য বিদ্রোহী দাদা, অরুণ ওরফে অতু, খেতে বসলেই মা ওকে নিয়ে তাঁর নানা অভিযোগ আর দুঃখের কথা বলতে শুরু করতেন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে খাওয়া ছেড়ে দাদা উঠে যেত। মাতুল পরিবারে ওর সপক্ষে এবং বিপক্ষে নানা মন্তব্য হত। শুধু দিদিমা (আমরা বলতাম আজিমা), যাঁর স্নেহে কখনও কোনও সীমা বা বাছবিচার ছিল না, মাকে বকতে থাকতেন। ভাল ছেলের উজ্জ্বল নিদর্শন আমার

সঙ্গে তুলনা করে দাদার নিকৃষ্টতা প্রমাণে মা সচেষ্ট হতেন। এই আবেগময় নাটকে নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিতাম। ভোজনপ্রিয় দাদার অসমাপ্ত খাওয়া এবং অহেতুক অপমান বড় কষ্ট দিত। নিজের প্রশংসাটা এই পরিস্থিতিতে আরও যন্ত্রণাদায়ক ছিল।

আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে সন্তানপালন সম্পর্কে কিছু নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় ধারণা এখনও চালু আছে। তার একটি হচ্ছে সন্তানের পক্ষে কী মঙ্গলজনক তা মা-বাপের চেয়ে কেউ ভাল বোঝে না। কিন্ডারগার্টেনে পড়াতে হলেও তার জন্য শিক্ষা নিতে হয়, অথচ সন্তানপালনের গুরুদায়িত্ব নেওয়া হয় শুধুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি বা তার অভাবের ভরসায়। মা-বাপের নিরঙ্কুশ সদিচ্ছা আর স্নেহ—শিশুপালনের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়—তার সমস্ত ঘাটতি নাকি পূরণ করে। তাঁদের নিজেদের জীবনের অতৃপ্তি ব্যর্থতাবোধ সহনশক্তির অভাব পরিমিত সুবুদ্ধি যে সন্তানপালনে বিপর্যয় ঘটাতে পারে, ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতে আমাদের দ্বিধা হয়। আর, সব সন্তানকে মা-বাপ সমান চোখে দেখে এ কথারও কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। শৈশবে আমরা মা-বাবার স্নেহের অভাব কখনও বোধ করিনি। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, দাদার প্রতি ওঁদের একটা পুঞ্জীভূত বিরক্তিবোধ আর আশাভঙ্গের মনোভাব ছিল, যদিও সে কোনও অর্থেই খারাপ ছাত্র বা বখে যাওয়া ছেলে ছিল না। বড় হবার পর মনে হত মানুষটার সারা জীবন কেটেছে মা-বাপের অনুমোদন লাভের ব্যর্থ চেষ্টায়। ওর জীবনের বহুমুখী সম্ভাবনা বোধহয় প্রধানত এই কারণেই ফলপ্রসূ হয়নি।

মামাবাড়িতে সমবয়স্ক মামাতো ভাইদের কাছে দাদা খুব প্রিয় ছিল না। তার এক কারণ, জমিদার বাড়ির ছেলে বলে আমাদের কিছুটা দেমাক ছিল এবং দাদা অনেক সময় তা বেশ স্থূলভাবেই প্রকাশ করত। শৈশবের স্নবারি যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে তা ধারণা করা কঠিন। আমাদের দেমাকের দ্বিতীয় উপজীব্যটা সম্ভবত মামাতো ভাইদের কাছে আরও বেদনাদায়ক ছিল। আমাদের পরিবারে সাহেবি ভাবাপন্ন ঠাকুর্দার সময় থেকে, পরবর্তী কালে বাবার স্বদেশি ধরনধারণ সত্ত্বেও, জীবনশৈলী কিছুটা পশ্চিমায়িত ছিল। আমরা পিঁড়িতে বসে কাঁসার থালাবাটিতে অন্নগ্রহণের অভ্যেস ছেড়ে টেবিলে চিনামাটির বাসন এবং কাচের গ্লাস সহযোগে খানা খেতাম। খাদ্যটা প্রধানত ভাত-ডাল-মাছ হলেও, জমিদার ইসমাইল চৌধুরির বিবির কাছে শেখা মোগলাই কোর্মা, রেজালা বিরিয়ানি এবং স্টিমার কোম্পানির বাবুর্চিদের প্রশিক্ষণে বামনাবতার বসা—এবং পরে আন্দামান-ফেরত আফছারিয়া-রন্ধিত সুপ-রোস্ট-পুডিং জাতীয় বিলাতি ভোজ্য আমাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণে অকারণে সেইসব তথ্য মামাতো ভাইদের কাছে ঘোষণা করে দাদা তাদের হীনম্মন্যতা উস্কে দিত। ফলে মাঝেমাঝেই তাদের সঙ্গে অপ্রিয় বাক্য আদানপ্রদান হত।

তারপর দাদা তর্জনী আস্ফালন করে এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করত যা আমার কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য ঠেকত : 'যদি রোহিণী সেনের রক্ত গায়ে থাকে তো ওদের সঙ্গে কথা বলবে না।' কখনও কখনও রোহিণী সেনের জায়গায় অশ্বিনী দত্তের নাম উল্লিখিত হত। রক্ত

গায়ে থাকতে কী বোঝায় তা আমার জানা ছিল না। ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে জিনস্ বা ডি-এন-এ তত্ত্ব বোধ হয় আবিষ্কৃত হয়নি। হলেও পাঁচ বছর বয়সে বিষয়টা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল না। কিন্তু রোহিণী সেন বা অশ্বিনী দত্ত কারও রক্তই বৈধ পথে আমাদের ধমনীতে প্রবহমান হওয়া সম্ভব ছিল না—এ তত্ত্ব বড় হয়ে বুঝেছি। বরিশালের প্রবাদপুরুষ অশ্বিনী দত্তর সঙ্গে আমাদের কোনও আত্মীয়তা ছিল না, যদিও ওঁরা আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নেহাতই আত্মগরিমা বাড়াবার জন্য দাদা ওঁর নামও টেনে আনত। আর বিদ্যাবত্তা এবং ইতিহাসচর্চার জন্য খ্যাতিমান আমাদের পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ রোহিণীকুমার সেন ছিলেন আমার ঠাকুর্দার বড় ভাই। সুতরাং তাঁর রক্ত আমাদের শরীরে আসা দ্বাপর বা ত্রেতা যুগে শাস্ত্রসম্মত হলেও কলির গোড়ার দিকেই তদ্ঘটিত প্রথাটা উঠে গেছে। উনিশ বা বিশ শতকে ব্যাপারটা ঘটলে নেহাতই কেলেঙ্কারি বলে গণ্য হত। আসলে ওই দুই বিখ্যাত ব্যক্তির নাম টেনে এনে দাদা বোঝাতে চাইত—আমরা কংস রাজার বংশধর, এ কথা কখনও ভুললে মহান কীর্তিপাশা পরিবারের অবমাননা হবে। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় আমার স্মৃতিশাস্ত্র এবং পারিবারিক ইতিহাস, দুই বিষয়েই ধারণা কিছুটা অস্পষ্ট ছিল। তাছাড়া তখন দাদার মতামত স্মৃতিশ্রুতিরই তুল্য ছিল। ফলে বিব্রত মুখে মামাতো ভাইদের এড়িয়ে চলতাম। মাতুলালয়বাস অসহনীয় হয়ে উঠত।

কিন্তু জীবনযাত্রার মান যদি শ্লাঘার বিষয় হয়, তাহলে মামাবাড়ির তুলনায় আমাদের চালিয়াতি করার খুব কোনও কারণ ছিল না। সে যুগের হিসাবে ওঁরা সম্পন্ন গৃহস্থ, আমরা সংকটাপন্ন জমিদার, 'জলসাঘর'-এর বিপন্ন নায়ক বিশ্বম্ভর রায়ের হাল হতে খুব আর দেরি নেই। ছোটমামা ছিলেন কন্ট্রাক্টর—দুটো ট্রাক আর একটি বাসের মালিক, মাসিক আয় আট-দশ হাজার টাকা, যা আজকালকার হিসাবে কয়েক লাখের সঙ্গে তুলনীয়। আজিমার রাজত্বে ভোজনের ব্যবস্থা স্মরণ করলে মনে হয় সেই বিপুল রোজগারের সিংহভাগ পেটপুজোয় খরচ হত, কারণ মামার কোনও সঞ্চয় বা কু-অভ্যাস দুটোর একটাও ছিল না।

একটি ট্রাক খাটত মাছের ব্যবসায়। কাঁচা টাকা ছাড়া মেছো কোম্পানি থেকে রোজ দুটি পাঁচ থেকে দশসেরি মাছ পাওনা ছিল। যাঁরা সের কাকে বলে ভুলে গেছেন, তাঁরা শব্দটাকে কে. জি. বা কিলোগ্রামে অনুবাদ করে নিন, তার সঙ্গে মনে মনে হিসাব করুন দশ কেজি ওজনের মাছ বাড়িতে শেষ কবে দেখেছেন। ওই মহামৎস্য ছাড়াও উপরি পাওনা ছিল দিনান্তে ট্রাক পরিষ্কার করার সময় পড়ে থাকা 'কুচো' মাছ, তাতে দুটি মাঝারি সাইজের বালতি ভরে যেত। নেট ওজন পাঁচ-ছ সেরের কম নয়। 'কুচো' মাছ মানে হেলাছেদ্দা করার মতো কিছু নয়—মাঝারি সাইজের চিংড়ি, পাবদা, বাচা, পার্শে ইত্যাদি। এই বিপুল পরিমাণ মাছ রোজ রাঁধা এবং খাওয়া হত, মুক্ত হস্তে ঘানিতে ভাঙা সরষের তেল খরচা করে। বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ, যাবতীয় কাজের লোক, বাস-ট্রাকের কর্মীরা—কেউই বাদ পড়ত না। এই মৎস্যপুরাণের এখানেই ইতি নয়। মাছের ট্রাক ফিরত মধ্যাহ্নভোজনের পরে। অতএব দুপুরের খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করা আজিমার মতে আবশ্যিক। ত্রিশের দশকে কুমিল্লায় মাছ নিতান্তই সস্তা। তাই রোজই বাজার থেকে আয়তনে তিমিঙ্গিলতুল্য রুই কাতলা চিতল মহাশোল জাতীয় কোনও না কোনও মাছ আসত, এক বা একাধিক। মা-মাসিরা এই অপচয়ে

মৃদু আপত্তি জানালে আজিমা তা নস্যাৎ করে দিতেন : 'ক'স কী? ধনেরা না খাইয়া থাকব?' ধনেরা অর্থাৎ আমরা নাতি-নাতনিরা না খেয়ে থাকব এমন আশঙ্কার কোনও হেতু ছিল না। কারণ দিন পনেরো মাতুলালয়বাসের পর যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন খোদার খাসি জাতীয় পুরুষ্টু প্রাণীরা আমাদের দেখে ঈর্ষিত হত সন্দেহ নেই। আর শরীরে তখন মাংসের তুলনায় মাছের অংশ অনেক বেশি।

আমাদের আয়তনবৃদ্ধির মাছ ছাড়া অন্য কারণও ছিল। মামাবাড়িতে মধু এবং দুধের স্রোতস্বিনী না থাকলেও, দুধের সরবরাহটা একটা নাতিবৃহৎ জলাশয় ভরার জন্য পর্যাপ্ত ছিল মনে হয়। আজিমার দুটি অত্যন্ত নাদুসনুদুস গাভী ছিল। তাদের দেখলে গোমাতার সুযোগ্যা কন্যা উমা ভারতী আনন্দাশ্রুতে আপ্লুতা হতেন, আদর্শ গোরুর সন্ধানে হল্যান্ড দৌড়তে হত না। এই কামধেনুরা মাথা পিছু রোজ গড়ে ত্রিশ সের দুধ দিতেন। সেই দুধে ঘি, মাখন, মিষ্টান্নাদি তৈরি করার পরেও প্রায় সের দশ-বারো উদ্বৃত্ত থাকত। মধ্যাহ্নভোজনের পর সে বস্তু এক জগদ্দল কড়াইয়ে কাঠকয়লার উনোনে টিমে আঁচে চাপানো থাকত। ঘণ্টা তিনেক পর সেই দুধ যে-জিনিসে পরিণত হত তাকে অমৃতবৎ বললে কিছুমাত্র অতিভাষণ হবে না। খাদ্যের লাইনে ইন্দ্রলোকে ওর চেয়ে বেশি সুস্বাদু কিছু পাওয়া যায়, একথা বিশ্বাস করতে আমি নারাজ। যে-দুধ রূপান্তরিত হয়নি, তা আমার চক্ষের বিষ ছিল। আর ছোটবেলায় অভ্যেস ছিল, খাওয়ার সময় নিজের থালা ছাড়া অন্য কোনও দিকে দৃকপাত না করা—কতকটা অর্জুনের ধনুর্বিদ্যা শেখার আদর্শে। ফলে খাওয়ার শেষে আজিমা যখন দুধ বিতরণ করতেন, তখন প্রবল শিরঃকম্পনে নিজের অনীহা ঘোষণা করতাম। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল মাতামহী-বর্ণিত 'দুধ' আসলে সেই পাটকিলে রঙের রাবড়ি। দিনের পর দিন কী ভুল করেছি ভেবে প্রাণটা হাহাকার করে উঠেছিল।

আজিমার শরীরমনে আলসেমির কোনও স্থান ছিল না। দুপুরের খাওয়া শেষ হলেই উনি সারা বছরের জন্য নানা মুখরোচক খাদ্য—আচার, মোরব্বা, বড়ি, আমসত্ত্ব, নাড়ু, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি তৈরি করতে বসতেন। তাছাড়া দৈনিক বরাদ্দ দুগ্ধজাত তথা ময়দা, ডাল, নারকেলের মিষ্টি তো ছিলই। তারপর আক্ষরিক অর্থেই বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রস্তুতিও একটা বড় কাজ ছিল। সংকটচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, মাঘমঙ্গল, পাঁচুঠাকুর ইত্যাদি নানা ব্রত মারফত সব দেবদেবী উপদেবতা অপদেবতাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা বছর ধরেই চলত। প্রতিটি ব্রতেরই নিয়মকানুন স্বতন্ত্র, বিচিত্র এবং অনেক সময়ই অত্যন্ত কষ্টকর। সংকটচণ্ডীর ব্রতটা মনে আছে। ওই ব্রতের অনুষ্ঠান ঘণ্টা তিনেক ধরে চলত এবং সব কাজই করতে হত ডান হাতে। আর সেই দক্ষিণ হস্তটি ব্যবহার করতে হত হাঁটুর নীচ দিয়ে। এটাই ছিল 'সংকটে বসা', উদ্দেশ্য ঘণ্টা তিনেক ওইভাবে 'সংকটে' বসে পরিবারস্থ সবাইকে সারা বছর সংকটমুক্ত রাখা। মানুষ যন্ত্রণা পেলে স্বর্গস্থ দেবতারা খুশি হন, এই ধারণা অনেক ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা। বোধ হয় ধরাতলবাসী দেবতাদের আচরণ থেকেই ধারণাটা জন্মেছে।

ব্রতপালনের অন্যতর অঙ্গ বিচিত্র শিল্পচর্চা। এঁটেল মাটি দিয়ে নানা সাইজের পুতুল বা মূর্তি তৈরি করা হত। আর প্রতি ব্রতে আলপনাও ছিল বিশিষ্ট চেহারার। কোন ব্রতে তা মনে

নেই, আজিমা নিজের হাতে মাটি দিয়ে এক বিরাট কুমির বানাতেন। কৃষ্ণনগরের কুমোররা তা দেখলে নিশ্চিত হতমান হতেন। ব্রতসংক্রান্ত যে-শিল্পে আমাদের সব চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল সেটা অবশ্যই রন্ধনশিল্প। প্রতি ব্রতে যেসব বিচিত্র আহার্য প্রস্তুত হত বছরের অন্য কোনও সময় তা পাওয়া যেত না।

আজকাল দেখি সবাই সব সময় ভীষণ ব্যস্ত, কিছু করারই কেউ সময় পান না। আজিমাকে কখনও সময়ের অভাব বলে অনুযোগ করতে শুনিনি। ওঁর হাতে সর্বদাই অন্তহীন সময়। রান্নাবাড়ি, মিঠাই বানানো, ব্রতপার্বণ এসব ছাড়া ওঁর আর একটি বড় কাজ ছিল কাঁথা সেলাই আর পশমের জামা বোনা। ওঁর তিন ছেলে আর চার মেয়ে এবং তাঁদের জনা বিশেক সন্তানসন্ততি সকলেরই গায়ে ওঁর বোনা উলের সোয়েটার শোভা পেত। প্রতি শীতেই আমাদের একটি নতুন সোয়েটার পাওনা ছিল। ওঁর আর এক শখ ছিল বাগান। সে বাগানে সারা বছরই নানারকম সুগন্ধি দেশি ফুল আর বহুবর্ণ বিদেশি মরসুমি ফুল ফুটত। যেসব ফলের গাছ পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের মাটিতে গজানো সম্ভব, তার প্রায় সবই আজিমা পুঁতেছিলেন। যা গজানো সম্ভব নয়, তাদেরও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেননি। যথা আঙুর। বাগানে সুদৃশ্য একটি আঙুরের লতা ছিল। তাতে বেশ বড় বড় কালো রঙের ফল হত, যদিও স্বাদে তা জামিরের মতো টক। অবশ্যি এই সামান্য ব্যাপারে আজিমা দমতেন না। অসহ্য রকমের টক আঙুর প্রচুর চিনি সহযোগে লোভনীয় জ্যামে পরিণত হত।

আজিমার সারা জীবনই নানা দুঃখে ভরা। বেশির ভাগ সময়টা উনি ছোটছেলের কাছেই থাকতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে ছেলের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সেই ছেলের প্রথম পক্ষের তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আজিমা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। বোধ হয় ভরসা ছিল মা-মরা ছেলেমেয়েগুলি জ্যাঠা বা পিসিদের কাছে আশ্রয় পাবে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটে দেশবিভাগের পরে। যাঁদের ভরসায় উনি ছোটছেলের আশ্রয় ছেড়েছিলেন, কারও অবস্থাই তখন খুব সচ্ছল না। তিনটি অপোগণ্ড শিশুর ভার নিতে কেউ কোনও উৎসাহ দেখাল না। সবারই উপদেশ— ওদের বাপের কাছে ফিরিয়ে দাও, তুমি একা এসো, মাথায় করে রাখব। জেদি মানুষটি সৎমার হাত থেকে বাচ্চাগুলিকে বাঁচাবেন বলেই ঝগড়া করে বের হয়ে এসেছিলেন। ওই সদুপদেশ ওঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তখন ওঁর বয়স আশির উপরে। সোজা মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের দরবারে হাজির হয়ে উনি হাবড়ায় উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি বাড়িগুলির একটি দাবি করেন। সেই বাড়ির গৃহ এবং উদ্যানসজ্জার জন্য নানা জিনিস এবং গাছপালা চেয়ে এক লম্বা ফর্দ আজিমা মেয়ে-জামাইদের কাছে পাঠান। সেই ফর্দে উনি আঙুরলতার উল্লেখ করতে ভোলেননি। হাবড়ার বাড়ির একচিলতে বাগানে আঙুরলতা লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। শুনেছি ফলও ধরেছিল প্রচুর। তার স্বাদগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়নি।

আজিমার প্রাণশক্তি বোধ হয় অন্তহীন ছিল। শত আঘাতেও তা ক্ষুণ্ণ হত না। উনি বেঁচে থাকতেই ওঁর দুই ছেলে আর দুই জামাই মারা যান। খবরগুলি ওঁর কাছ থেকে গোপন করা হত। কিন্তু কোনওভাবে উনি বুঝতে পারতেন। ওঁর মেজছেলের মৃত্যুর দিনটায় উনি আমাদের কাছে ছিলেন। সবাই দুঃসংবাদটা চাপা দিতে ব্যস্ত। হঠাৎ আজিমা জিগ্যেস

করলেন, 'কালু নাই, না?' সবাই চুপ করে রইল। দরজায় পিঠ দিয়ে বসে উনি কিছুক্ষণ খুব কাঁদলেন। তারপর উঠে যে-কাজ করছিলেন, সেই কাজে আবার হাত দিলেন।

কুমিল্লা শহরে আমার শৈশব আর বাল্যের অনেকগুলি দিন কেটেছে। শহরে বা তার কাছেপিঠে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল কয়েকটি অতিবৃহৎ দিঘি, যাদের স্থানীয় নাম ছিল সাগর, আর শহরের অদূরে ময়নামতীর পাহাড় অর্থাৎ ঢিপি। সেই ঢিপির নীচে অনেক পুরাবস্তু লুকিয়ে ছিল। যতদূর মনে পড়ে, আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে ত্রিশের দশকেই ওখানে খননের কাজ শুরু করে। পাকিস্তানি আমলে সে কাজ আরও এগিয়ে যায়। আমাদের বাসস্থান বরিশাল জেলা প্রায় হল্যান্ডের মতোই উচ্চাবচতাহীন সমতল। কুমিল্লা শহরে সবচেয়ে উঁচু জায়গা ছিল চাঁদমারি—অর্থাৎ পুলিশদের বন্দুক ছোঁড়া অভ্যেস করার জন্য মাটি ফেলে তৈরি ঢিপি, উচ্চতায় বিশ-পঁচিশ ফুট, আগাছার কৃপায় রীতিমতো মনোরম। ছেলেবেলায় চাঁদমারি আরোহণ করে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পেতাম। চাঁদমারির তুলনায় ময়নামতী হিমালয়সদৃশ। আর হেমেন রায়ের 'ময়নামতীর মায়াকানন' পড়ে জায়গাটা মঙ্গলগ্রহের অন্তর্গত বলে অনেক দিন বিশ্বাস ছিল। সুতরাং পাহাড়টি ছিল আমার স্বপ্নভূমি। বিমল, কুমার, রামহরি সেখানে আমার সাগরেদ্, এভারেস্ট অভিযাত্রীরা অনুচর মাত্র। আর 'চাঁদের পাহাড়'-এর ডিয়েগো আলভারেজের সঙ্গে সেখানে রোজই দেখা হত। এহেন ময়নামতী ছাড়া কুমিল্লায় আমার দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল ধর্মসাগর। দিঘির সঙ্গে আমরা বরিশালেও অপরিচিত ছিলাম না। কিন্তু এ বিশাল রাজকীয় ব্যাপার, সাগর অভিধা সামান্যই অতিরঞ্জন।

সেই ধর্মসাগরের পারে বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা রামমূর্তি তাঁবু ফেললেন। মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে সার্কাসের জন্তুজানোয়ার দেখতে গেলাম। দেখলাম বিরাট এক হাতি গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফিরে এলে বড়রা প্রশ্ন করলেন, 'ক' কী দেখলি।' চার বছর বয়স্ক প্রতিমা জুরির ফোরম্যানের মতো সকলের হয়ে উত্তর দিল, 'আমমূর্তিরে দেইখা আইলাম। গাছের লগে বাঁইধা থুইছে। হে খালি দোলে আর দোলে।'

কুমিল্লা শহরে আমার এক অস্তিত্ববাদী বন্ধু জুটেছিল—সার্ত্রের আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল আগে। তার নাম কেউ জানত না, সম্ভবত সে নিজেও না। কিন্তু তা বলে সে পরিচয়হীন ছিল এমন নয়। শতচ্ছিদ্র আলখাল্লা পরা মানুষটি ভিক্ষে করতে এসে কোমরে হাত দিয়ে উদ্দাম নৃত্য সহযোগে যে বিচিত্র সঙ্গীত পরিবেশন করত তাতে তার গভীর আত্মজ্ঞান এবং পিতৃবংশ সম্পর্কে যথোচিত গৌরববোধের পরিচয় পাওয়া যেত। গানটি নিম্নরূপ :

আমি রহিমচাঁদা করিমচাঁদা ফটিকচাঁদার ভাই।
আমি বাজারেতে যাই।
কত কিলগুতা খাই।
আমার পিঠের চামড়া নাই।

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা যোগীচিত্ত মানুষটি সত্যিকারের ভিক্ষাজীবী ছিল না। গৃহস্থের আঙিনায় নৃত্যগীত পরিবেশনের ন্যায্য মূল্য হিসাবেই যা দেওয়া হত, তা থলিস্থ করে আভূমি

সেলাম জানিয়ে সে নাচতে নাচতে চলে যেত। কিলগুঁতাজনিত পৃষ্ঠদেশের চর্মহীনতা তার জীবনবোধ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেনি। ছ-সাত বছর বয়স অবধি আমি সেই দার্শনিক নৃত্যশিল্পীর রুদ্রতাণ্ডবে যোগ দিতাম। এমন যোগ্য শিষ্য সে আর পায়নি। আত্মপ্রশংসা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু বলি উক্ত শিল্পে আমার রীতিমতো পারদর্শিতা জন্মেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার নৃত্যগুরু অন্তর্ধান হলেন। ফলে আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রইল। না হলে উদয়শঙ্করের খ্যাতি যে নিষ্প্রভ হত এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

নাবালকবাবুর বাসা : প্রথম বোধোদয়

আমার জন্ম মামাবাড়ি কুমিল্লা শহরে, কিন্তু আমার প্রথম স্মৃতি যে জায়গাটিকে কেন্দ্র করে সে হল বরিশাল, বিশেষ করে নদীর পাড়ের একটি সাহেবি কেতার বাংলো বাড়ি। বরিশালবাসী বাড়িটিকে নাবালক লজ বা কীর্তিপাশার বাবুগো বাসা বলে জানত। লেখকের প্রপিতামহ প্রসন্নকুমার সেন। তাঁর পরিচয়ে বাড়িটির পরিচয়। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা রাজকুমার সেনকে কুলগুরু এবং জমিদারির দেওয়ান ষড়যন্ত্র করে সরবতে বিষ মিশিয়ে খুন করে। রাজকুমারবাবুর স্ত্রী সহগমন করেন—স্বেচ্ছায় বলেই শোনা যায়। দেওয়ানবাবু শিশু প্রসন্নকুমারকেও স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন। তরুণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বেইলি সাহেব কীর্তিপাশা গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। প্রথম কয়েক বছর প্রসন্নবাবু সাহেবের পরিবারেই মানুষ হন, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই, অর্থাৎ ওঁর নাবালক অবস্থায়ই উপরিউক্ত বাংলো বাড়িটিতে বেইলি সাহেব ওঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সুবাদে বাড়ির নাম নাবালকবাবুর বাসা ওরফে নাবালক লজ। বাড়িটি বিশেষ করে ওঁর জন্য তৈরি, না কোনও সাহেবের কাছ থেকে কেনা—সঠিক জানা নেই। কিছু কিছু আসবাবপত্রে আঠারো-উনিশ শতকের বিশেষ করে রিজেন্সির সময়ের ছাপ ছিল। সেগুলি প্রপিতামহ কলকাতায় নিলামে কিনেছিলেন না বাড়ির সঙ্গে পেয়েছিলেন, তাও জানি না।

আমার প্রথম স্মৃতি ওই আসবাবপত্রের একটিকে কেন্দ্র করে। এখনও চোখ বুজলে সেই কালো রেক্সিনে মোড়া খাটের সাইজের কাউচটিকে দেখতে পাই এবং তার স্পর্শ অনুভব করি। হাসপাতালের খাটের ধরনে এর মাথা এবং পায়ের দিক দুইই ভাঁজ করে তোলা যেত—ওভাবে দুদিকই তুললে জিনিসটা ইংরেজি বর্ণমালার ভি অক্ষরটির আকার নিত। ওই ভি-আকৃতি কাউচে শুয়ে বড় গর্ব বোধ করতাম। কারণ অভিজ্ঞতাটা অনন্যসম্ভব। আমার সাইজের মানুষ ছাড়া আর কেউ ওভাবে শুতে পারত না এবং বাড়িতে ওই সাইজের মানুষ আর কেউ ছিল না। আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ।

শীতের সময় রেক্সিনের আবরণ ঠান্ডা হয়ে থাকত। অনেক বয়স বলে রেক্সিন জায়গায় জায়গায় ফেটে গিয়েছিল। সেই ঠান্ডা আর খসখসে স্পর্শ মনে পড়লে এখনও একটা ব্যাখ্যাহীন সুখ বোধ করি। ক্রমে রেক্সিন অব্যবহার্য হয়ে উঠলে তার জায়গায় বাদামি রঙের চামড়া আমদানি হল। আমার সাশ্রুজল বৃষনিনাদ বড়দের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারল না।

সান্ত্বনাস্বরূপ আমাকে রেক্সিনের টুকরো দিয়ে এক গদা বানিয়ে দেওয়া হয়। তখন উপেন্দ্রকিশোর রচিত ছোটদের মহাভারত শুনে ভীমের আদর্শে নিজের চরিত্র গঠনে আমি ব্যস্ত। তবে আমার এবং ভীমের গদা আকারে অনুরূপ ছিল না। এ নিয়ে মনে একটা সান্ত্বনাহীন ব্যর্থতাবোধ জমে ওঠে। ফলে ভীম হওয়ার স্বপ্ন সফল হল না। তবে এখনও বজ্জাত মানুষ দেখলে গদাঘাতে এবং পদাঘাতে তার মস্তকচূর্ণ করার ইচ্ছে প্রবল হয়। বাবরি মসজিদ এবং গুজরাতের ঘটনার পর ইচ্ছেটা অদম্য হয়ে ওঠে।

শৈশবের সব ইচ্ছে এবং অনুভূতি অবশ্যি আগ্রাসনধর্মী ছিল না। বাড়ির পাশেই নদী, তার সিক্ততা মেঝে ছাপিয়ে ওঠার আশঙ্কায় বাড়ির নীচে আর্চের আকারে কালেপ, সামনে গোলাপের বাগান (যা সাপের উৎপাতে উচ্ছেদ করে পরে লন তৈরি হয়) চারপাশে হাসনুহানা আর রঙ্গন ফুলের ঝাড়, স্থলপদ্ম, শেফালি আর কাঠচাঁপার গাছ, বাড়ির গেটের বাইরে মস্ত উঁচু এক সপ্তপর্ণী আর এক আঁশফলের গাছ, বাড়ি ঢোকার পথের এক পাশে আলোকলতায় ছাওয়া ল্যানটানার বেড়া, তার ধারেই ক্রমশ সংস্কারহীন পুকুর, পেছনের বাগানে লিচু, জাম, কাঁঠাল, আমলকী, কুর্চিফুলের গাছ, তরকারির বাগানে লাউ-কুমড়োর মাচা, বেড়ায় লতানো মটরশুঁটি—সব মিলিয়ে এক অন্তহীন রহস্যের জগৎ। কালেপের নীচে রাক্ষস-খোক্কসের বাসস্থান। নিশ্চিন্ত দূরত্ব থেকে উঁকি দিয়ে দেখতাম। মাঝে মাঝে খসখস শব্দে দেহধারী প্রাণীর অস্তিত্বের আভাস পেতাম। সোন-গুইল অর্থাৎ স্বর্ণগোধিকারা স্বচ্ছন্দে আসা-যাওয়া করত। ওদের প্রতি ভয়মিশ্রিত একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। শুনতাম যে, সাপের শত্রু বলে ওরা আমাদের মিত্র। কিন্তু ওদের সর্পিল আঁকাবাঁকা গমনভঙ্গি দেখে ভয় আর জুগুপ্সাই বোধ হত। আর ছিল বেজি। এরাও সাপের শত্রু, অতএব সযত্নে পালনীয়, সম্ভব হলে শিক্ষণীয়ও বটে। তা ছাড়া লোমে ঢাকা এদের শরীর দেখে আকর্ষণই বোধ করতাম। জুগুপ্সা না। বরিশালে অনেক বাড়িতে পোষা বেজি ছিল। সাপের প্রতিষেধক বলেই তাদের কদর। আমার খুব ইচ্ছে হত বেজি পোষার। কিন্তু প্রাণীটির কুখ্যাতি ছিল, যে-হাত তাদের খাদ্য জোগায়, সে-হাতই তারা দংশন করে বলে। ফলে আরও অনেক ইচ্ছার মতো ওটিও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

বেজিপ্রীতি প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন তুলি। মানুষ যেসব প্রাণী আদর করে পোষে, তার অধিকাংশই রোমশ, যদিও সাপ-কুমির এমনকী বাদুড় আর ট্যারান্টুলা-প্রেমিক মানুষও আছে। আমরা প্রায় নির্লোম হয়েও আমাদের এই রোমশ প্রীতির কারণ কী? এ কি রক্তকণিকায় লোমাকীর্ণ পূর্বপুরুষের স্মৃতি—যখন প্রাক-নিয়ানডার্থাল অতিবৃদ্ধ পিতামহরা রোমশ প্রেয়সীদের সানন্দে আলিঙ্গন করতেন? শরিয়তে নির্দেশ আছে মেয়েরা মাথার চুল সযত্নে ঢেকে রাখবেন—তার কারণ বীর্যবান পুরুষরা নারীর কেশাগ্র দেখলেও বিচলিত হতে পারেন, এই আশঙ্কা। মধ্যযুগে পুরুষশ্রেষ্ঠ আরবরা একটু সহজে উত্তেজিত হতেন।

পাঠিকা-পাঠক, এইসব সমাজতত্ত্বঘটিত চিন্তা আমার শৈশবে মাথায় আসেনি। ওগুলি পরবর্তীকালে মনোবিকলনেরই ফসল। সে কথা থাক, শৈশব-চেতনার অনেকটাই জুড়ে ছিল নানা জাতের পশুপক্ষী। বিশেষত যাদের নাম শুনতাম, কিন্তু কদাচিৎ ক্ষণিকের দেখা মিলত, তাদের সম্বন্ধে অন্তহীন কৌতূহল বা বিস্ময়বোধ ছিল, যথা বনবিড়াল বা ভাম। বনবিড়াল

মোটেই গৃহমার্জারের বন্যসংস্করণ নয়। দীর্ঘদেহী নখদন্তবান স্বাধীন প্রাণী। হঠাৎ কখনও কালেভদ্রে কালেপের ভিতর থেকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি, রাত্রে এরা আমাদের পোষা হাঁস, মুরগি, গিনি ফাউল শিকার করতে আসত। খাঁচার ভিতর থেকে প্রচণ্ড আর্তনাদ শোনা যেত। খাঁচার তার ছিড়তে ভামরা ছিল রীতিমতো সিদ্ধথাবা। আর তাদের নিকটাত্মীয় খাটাশ, বরিশালের ভাষায় খাডাশ, তাদের দেহনির্গত তীব্র কুবাসকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। ভীষ্ম-দ্রোণও তার সামনে দাঁড়াতে পারতেন মনে হয় না। তবে খাটাশরা মহৎ প্রকৃতির প্রাণী। নিতান্ত চরম অবস্থা ছাড়া এই মহাস্ত্র ওঁরা ব্যবহার করতেন না।

আর ছিল সাপ—নানা বর্ণের, নানা জাতের। ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তো ছিলই। তার চেয়ে বেশি ছিল গল্পকথা মারফত নানা ধারণা। বরিশালবাসী স্বভাবত কাঠখোট্টা হতে পারে, কিন্তু তাদের সর্পপুরাণে বিচিত্র এবং বহুব্যাপী কল্পনার প্রকাশ। কবে কোন সাপের ছানা কে মেরেছিল, মা সাপ তাকে সাত দিন অনুসরণ করে এক অমাবস্যার রাতে দিনক্ষণ দেখে মরণকামড় দেয়। কে নাকি বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার পর শাশুড়ি ঘোমটা তুলে মুখ দেখতে যেতেই ঘোমটার ভিতর থেকে বিশাল এক কেউটে সাপ বেরিয়ে ফণা তুলে তাকে দংশন করল। সর্পিণী আসলে ছেলের নির্যাতিতা প্রথম পক্ষের স্ত্রীর অবতার। পুনর্জন্ম নিয়ে শাশুড়ির অত্যাচারের শোধ তুলল। আরও শুনতাম—বরিশালবাসী শত্রুনিপাতের কাজেও সাপকে ব্যবহার করে—তার ল্যাজ চুলকে জানলা দিয়ে শত্রুর ঘরে ছেড়ে দিয়ে। রাত্রে শুতে গিয়ে চোখ বুজলেই এইসব ভয়াবহ কাহিনি মনে পড়ত। মনে মনে বলতাম, "বাবা সাপ, তুমি আমাকে কামড়িয়ো না। আমি তো দুষ্টু ছেলেদের মতো তোমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করি না।" তবুও আচমকা ঘুম ভাঙলেই চারিদিকে যেন মৃদু হিস-হিস শব্দ শুনতে পেতাম। সন্তর্পণে দেখতাম—মশারি ভাল করে গোঁজা আছে কি না।

কিন্তু ভোরের আলো ফুটলেই রাত্রির সব বিভীষিকা কেটে যেত। প্রতিটি দিনই নানা বিস্ময়কর আবিষ্কারের সম্ভাবনায় ভরা। আমাদের বাড়িতে দৈনিক পূজা-আর্চার চল ছিল না। বাপ-ঠাকুর্দা নাস্তিক ছিলেন, ফলে মা-ও কখনও নিত্যপূজার চেষ্টা করেননি। এক আমার যিনি দেখাশোনা করতেন, সেই যতিদিদি আমাদের দালানের সংলগ্ন টিনের ঘরের এক কোনায় ঠাকুর দেবতার মূর্তি সাজিয়ে পূজা-আর্চা করতেন। মানুষটি নিত্যানন্দপন্থী বৈষ্ণব ছিলেন। উনি হাততালি দিয়ে সাশ্রুনয়নে ভজন গাইতেন—

বল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ।

তালে তালে সাধ্যমতো নর্তনকুর্দন করতাম।

সকালে উঠে প্রথম কাজ ছিল যতিদিদির ঠাকুরের জন্য পুষ্পসংগ্রহ। পূজাটা উপলক্ষ মাত্র, আসল উৎসাহ পুষ্পসংগ্রহে। যতদূর মনে পড়ে—তখন সব কিছুরই রঙ যেন বেশি উজ্জ্বল ছিল। সব কিছুই অন্তহীন বিস্ময়ের আকর। বাগানের কোনায় কোনায় লাল-সাদা চন্দনের ফোঁটার মতো চিহ্নে ভরা কচুপাতার জঙ্গল। তার উপর বৃষ্টি বা শিশিরের জল টলটল করত। সত্যিই মনে হত মস্ত বড় মুক্তোর দানা। কিন্তু পাতাসুদ্ধ জলকণা সংগ্রহ করে ঘরে আনার চেষ্টা কখনও সফল হয়নি। অনেক পরে জ্ঞান হয়েছে, ওই মুক্তো সংগ্রহের জন্য

সৃষ্টি হয়নি, মূল্যাতীত আনন্দে গড়া প্রকৃতির দানটি শুধু বিষয়বুদ্ধিহীন শিশুরই সম্পত্তি হতে পারে।

চেতনার সেই প্রত্যূষলগ্নে বিস্ময়ের কি শেষ আছে? শীতের গোড়ায় ঘাসের মধ্যে হঠাৎ দেখা যেত গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি রঙের ফুল। গাছ নেই, পাতা নেই—যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। মালি বলত, 'ভুঁইচাঁপা।' আসলে ফুলটা ক্রোকাসেরই রকমফের। আর স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, শেফালি, গুলঞ্চ, টগর? রোজই তাদের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু রোজই তারা নতুন, কখনও ক্লান্তিকর নয়, কখনও মনে হয় না অনেক দেখা হয়েছে, আর থাক। গন্ধে, রঙে, স্পর্শে তারা ইন্দ্রিয়াতীত এক তীব্র অনুভূতির সংবাদ নিয়ে আসে। বাড়ির সীমানা-নির্দেশক দেয়ালটিকে আমরা বলতাম ছার-দেওয়াল। ছার-দেওয়ালের গায়ে ঘন সবুজ এক লতা, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ ফল ফলত। একটু টিপলে মট করে আওয়াজ হয়ে ফেটে যেত—আমরা বলতাম মটফল। এই মটফল আমাদের রান্নাবাড়ি খেলার প্রধান উপাদান ছিল, ওই লতা আর ফলের সত্যিকার জাতিধর্ম কী, সে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়নি। আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম শৈশবে সব বর্ণাঢ্য জিনিসেরই রং যেমন খুব উজ্জ্বল দেখায়, তেমন অনেক জিনিসই আকারে খুব বড় মনে হয়। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় এক ডাক্তারিবিদ্যায় গবেষকের গিনিপিগ হয়ে মেস্কালিন সেবন করেছিলাম। যে-ঔজ্জ্বল্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম, মেস্কালিন-প্রভাবে সেই ঔজ্জ্বল্য আবার কিছুক্ষণ চোখে দেখি। ফলে আমার ধারণা জন্মায় যে, আমাদের কিছু কিছু ইন্দ্রিয়বোধ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা হয়ে আসে। শিশুর 'অকারণ পুলক'-এর একটা কারণ বোধ হয় তার চোখে পৃথিবীর উজ্জ্বলতা।

পুলক? পুলক তো তখন সব কিছুতেই। নিত্যই নতুন আবিষ্কারের পুলক। বাড়ির বাগানে গুবরে শালিক লাফিয়ে বেড়ায়, তার সাদা আর বাদামি রঙের পালকসজ্জা সাধারণ শালিকের থেকে অন্য রকম। ওকে কি ছোঁয়া যায়? যায় না, কিন্তু ছোঁয়ার চেষ্টাতেই আনন্দ। কিন্তু বাড়িতে পোষা হাঁসদের দু' হাতে তুলে নিলে তারা অসম্ভব ছটফট করে—তখন ভয়ানক অস্বস্তি লাগে। শীতের দুপুরবেলা ঝোপের ভিতর কুক্‌খা বা কুবোর ডাক শুনি। ওদের ভয় পাই, কারণ ওদের চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল, তাছাড়া শুনেছি ওরা সাপের রানি। আর যেসব প্রাণী দৃষ্টির প্রায় বাইরেই থাকে? পুকুরে সরু সরু প্রায় স্বচ্ছ খোরকিনা মাছের দল—গামছা দিয়ে যাদের ধরার চেষ্টা অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হয়। নদীতে শু অর্থাৎ শুশুকরা ঘাই মারে। তাদের মসৃণ কালো রঙের পিঠটাই দেখতে পাই। ওদের পুরো শরীরটা কীরকম দেখতে? পঞ্জিকায় যে-মকরের ছবি দেখি তার মতো? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। আর বর্ষার সময় নদীতে জলের উপর শুধু নাকটি ভাসিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায়—তারা কি কুমির না শুকনো কাঠের টুকরো? যতিদিদির সঙ্গে নদীতে যখন নাইতে যেতাম তখন ওদের কুমিরই ধরে নিয়ে প্রাণভয়ে পালাতাম। শুকনো কাঠ হলে সেই উত্তেজনার আনন্দ কোথায় থাকত?

নদীতলের রহস্যের কি শেষ আছে? পাড় ধরে বালির নীচে কাছিম বা কাঠুয়ার ডিম। ডিমের জন্মদাতাদেরও প্রায়ই দেখতাম। ওরা আমাদের খাদ্যও বটে, বিশেষ সুখাদ্য। তবে জলের ভিতর ওদের দেখা পেলে ভয়ই হত—কামড়াতে পারে বলে। আর ছিল কাণ্ডট,

হাঙরেরই ছোট সংস্করণ। এদের কখনও চোখে দেখিনি। শুনতাম এদের তীক্ষ্ণ দাঁত এত সহজে মানুষের হাত-পা কেটে নেয় যে কিছু টের পাওয়া যায় না। যতিদিদির বিশ্বাস করার ক্ষমতা কিছু প্রবল ছিল। সে বলত—কার নাকি একটি পা কাঙটে কেটে নিয়েছিল। পাড়ে ওঠার পরে সে টের পায়, পা-টি গচ্চা গেছে। কীভাবে পাড়ে উঠল এ প্রশ্নের উত্তরে বিরক্ত সুরে যতি বলত—"কেন, মানুষ এক পায়ে হাঁটে না?" —"কিন্তু সে তো লাঠি নিয়ে!" —"ও লোকটাও লাঠি নিয়ে হেঁটেছিল।" এর পর আর কথা চলে না।

ভালবাসার জগতে মানুষ আর মনুষ্যেতর প্রাণীতে যে তফাত করতে হয়—এই চেতনা হতে আমার অনেকদিন লেগেছিল। অবশ্যি ইংল্যান্ডে দীর্ঘদিন বাস করে ধারণা হয়েছে যে, এ দেশের লোক মানুষের তুলনায় কুকুর, বেড়াল আর ঘোড়াই বেশি ভালবাসে। শহরের বাড়ির গোয়ালেই গরু-বাছুর ছিল। আর ঘোড়ার গাড়ি টানার জন্য ছিল সাদা ওয়েলার ঘোড়া জ্যাক এবং বাদামি রঙের অশ্বিনী, বেগম। এ ছাড়া দাদার অশ্বারোহণের শখ মেটাতে একটি মণিপুরী টাট্টু। এরা সকলেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু লাথি মারতে পারে এই আশঙ্কায় এদের কিছুটা সম্ভ্রমের চোখে দেখতাম। ফলে একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলতে হত। কোচম্যান উৎসাহ দিত হাতে করে জ্যাককে ঘাস খাওয়াতে, কিন্তু ওর কর্কশ জিভের স্পর্শে গা সিরসির করত। ফলে সে দূরের বন্ধুই রয়ে গেল।

শৈশবস্বপ্নের কেন্দ্রে ছিল দুটি অস্তিত্বহীন প্রাণী—একটি লোমে ঢাকা কুকুরছানা এবং একটি ভেড়ার বাচ্চা। অন্য অনেক কাম্য জিনিসের মতো এ দুটিও আমার বাস্তব জীবনের অঙ্গ হয়নি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী জুড়ানবাবু—জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে যাঁর অভিধা জুড়ান ঠাকুর এবং যাঁকে আমাদের পরিবারেরই একজন বলে জানতাম—শীতের সকালে আমাকে কাঁধে করে কুয়াশায় ঢাকা নদীর পাড়ে রেসের ঘোড়া দেখাতে নিয়ে যেতেন। আমার নানা গোপন ইচ্ছার কথা ওঁকে বলতাম। তাতে সায় দিয়ে উনি আমার প্রত্যাশা উস্কে দিতেন। ওঁর স্কন্ধারূঢ় অবস্থায় শুনতাম উনি আশ্বাস দিচ্ছেন, 'একটা ম্যাড়ার বাচ্চা আর একটা কুত্তার বাচ্চা! হ, সামনের বার কইলকাতা গিয়াই তোমার লইগ্গা কিন্নিয়া আনমু।' নদীর পাড়ে বেল্স পার্কে দেখতাম কুয়াশায় আধ-ঢাকা রেসের ঘোড়াদের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ইচ্ছে হত বলি, 'জুড়ানবাবু, ছোট দেখে একটা ঘোড়ার ছানাও আনবেন।' মানে যে ছানা ছোটই থাকবে, কখনও বড় হয়ে লাথি ছুঁড়বে না। কিন্তু সে তো আর আমার খাটের নীচে ঘুমাবে না, আস্তাবলেই থাকবে। তাই ওই ইচ্ছেটা চেপেই যেতাম।

আমার জীবনে ঘোড়া বা ম্যাড়ার বাচ্চার আবির্ভাব ঘটেনি বটে, কিন্তু বাবার আদেশমতো কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে দশ টাকা দিয়ে জুড়ানবাবু সত্যিই এক 'বিলৈতি কুত্তার বাচ্চা' কিনে আনলেন। 'বিলৈতি' তার প্রমাণ—ওর কান ভাঙা। বাবা ওর বিলৈতিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'অ জুড়ান, এ ত শিং মাছের কাঁটা দিয়ে ফোড়াইয়া কান ভাঙছে।' জুড়ানের উত্তর—তা হতে পারে না। এক সাক্ষাৎ শ্বেতাঙ্গ বিলাতি সাহেবের খানসামার কাছ থেকে কেনা এই কুত্তার বাচ্চা। তার ভাঙা কান সাহেবের শ্বেতবর্ণর মতোই সহজাত এবং অব্যয়। এসব বিতর্ক আমার ভাল লাগেনি কারণ অসম্ভব রকম ছটফটে হলদেটে রঙের ক্ষুদ্র প্রাণীটি দেখামাত্রই আমার হৃদয় জয় করেছিল। বিলৈতি না হলে কি এত রূপগুণ সম্ভব?

শীতল জ্যাঠার কাছে প্রভুভক্ত কুকুর ফিডোর গল্প শুনেছিলাম, তারই নামে আমার কুকুরছানার নাম রাখলাম—ফিডো! যতিদিদি এবং বামনাবতার বসার সাহায্যে ফিডোর যত্নের অভাব নেই। যতি তাকে দুধভাত খাওয়ায়, বসা বাজার থেকে 'মাংসের ছাড লইয়া' আসে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ফিডোর বংশগৌরব নিয়ে সন্দেহের কারণ ঘটল। দেখি তার ভাঙা কান বিলৈতিত্ব অস্বীকার করে উচ্চে তুলেছে মাথা। বাড়িতে যেসব ঠাকুর্দার পাশে দাঁড়ানো অভিজাত কুকুরদের ফটো ছিল—যথা ডালমেশিয়ান লিও বা রোমশ স্প্যানিয়েল জিমি, যারা আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই গতাসু, তাদের সঙ্গে ফিডোর কোনও সাদৃশ্য পাওয়া গেল না। জুড়ানবাবু বললেন—ওটা ফকস টেরিয়ার, যাদের কান সোজা এবং লোম ছোট হয়। রসিক মনাইকাকা দেখেশুনে মত দিলেন—এটা টেরিয়ার ঠিকই, তবে রোডেসিয়ান অর্থাৎ রাস্তার কুকুর, দেশি কুকুরের সঙ্গে জাতিতে অভিন্ন। ক্রমে তাঁর সন্দেহই সত্যি প্রমাণ হল। বিলৈতি কুকুরের আদর স্বাভাবিক, পোস্ট-মডার্নিস্ট মাত্রেই নাক সিঁটকে এ কথা বলবেন। ঔপনিবেশিক-পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য বণিকরাজ যে বিজিত জাতির মধ্যবিত্ত শ্রেণির মগজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই ধোলাই করেছিল, এ কথা আজ কে না জানে? আমি শৈশবেই এ সত্যের আভাস পেলাম। ফিডোর কান খাড়া হতেই যতিদিদি দুধভাত দেওয়া বন্ধ করল। বসা নিম্নবর্গের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও 'মাংসের ছাড' আনা ব্যাপারে উৎসাহ হারাল। বোধ হয় আমাদের মতো সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংস্পর্শে এসে তার নিম্নবর্গসুলভ বিশুদ্ধ প্রাক্-ঔপনিবেশিক চেতনা গুলিয়ে গিয়েছিল। যা হোক, ফল এই দাঁড়াল যে, কার্যত আমাদের বাড়িতে ফিডোর ভাত উঠল। ভাঁড়ারের বা ক্যাশবাক্সের চাবি আমার হাতে ছিল না। তাই আহত বিস্ময়ে ফিডোর নিরন্ন হওয়ার ব্যাপারটা অসহায় দৃষ্টিতে দেখলাম। নেড়ি কুত্তার বাচ্চাকে কে আদর করে দুধ-ভাত-মাংস খাওয়াবে? প্রথম কিছুদিন সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এঁটোকাটা ওর সামনে ফেলে দেওয়া হত। ক্রমে সেটাও বাদ পড়তে লাগল। যেখানে সেরেস্তার কর্মচারীরা অনেকে থাকতেন এবং খেতেন সেই পুকুরপাড়ের ঠিকাবাসার পাঁশগাদায় ফিডো আহার অন্বেষণ করতে লাগল। তখন সে সকলের উপহাসের বস্তু—তার পরিচয় 'তপুবাবুর বিলৈতি কুত্তা'। ঠিকাবাসার রাঁধুনি এবং ভৃত্যরা খেয়ালখুশি মতো তাকে পেটায়, লাথি মারে, কারণ সে খাওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ার চেষ্টায় থাকে। দুই বছর বয়সে সে তখন আকারে বেশ বড়সড়। বোধহয় সে সত্যিই আলসেশিয়ান জাতীয় কোনও বনেদি বিলাতি কুকুরের অনুলোম বিবাহের সন্তান ছিল, কারণ আমাদের দেশি নেড়ি কুত্তা সাধারণত অত বড় হয় না। তাকে বিজাতীয় জ্ঞানে দেশি কুকুররা দল বেঁধে আক্রমণ করত। একদিন দেখি ফিডো কোমর ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে বাড়ির উঠানে এসেছে। কে যেন ডান্ডার বাড়িতে ওর কোমর ভেঙে দিয়েছে। বাবা পশুচিকিৎসককে খবর দিলেন। তিনি এসে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল প্রাণীটির যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন। সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরবেলা আর ফুল তুলতে উৎসাহ পেলাম না। সান্ত্বনাহীন শোকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ছার-দেওয়ালের ওপারে এক দিকে কীর্তনখোলা নদী, আর এক দিকে নদীর পাড় ধরেই

মানুষের বসতি। তৃতীয় দিকে ব্রাউন সাহেবের দোতলা বাড়ি এবং বাগান। ঔপনিবেশিক জগতের অলিখিত জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী প্রতিবেশী ব্রাউন পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বা যাতায়াত ছিল না। শুনেছি ব্রাউনরা পর্তুগিজ বংশাবতংস ফিরিঙ্গি। কিছু পয়সা হওয়ায় ইংরাজি ব্রাউন নাম গ্রহণ (যা তাদের গাত্রবর্ণরও সুষ্ঠু বর্ণনা) এবং নেটিভদের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ত্যাগ। আর ছার-দেওয়ালের অন্য পাশে যেসব ব্রাত্যজন বাস করতেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সামাজিক সম্পর্ক নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যতির হাত ধরে কখনও কখনও মাটির দেওয়াল আর টিন অর্থাৎ করোগেটেড লোহা অথবা খড়ের ছাউনি দেওয়া সেইসব বাড়িতে মাঝে মাঝে যাইনি এমন না। কিন্তু এ জাতীয় সামাজিক আদানপ্রদানে গুরুজনদের বিশেষ আপত্তি ছিল। সামাজিক লক্ষ্মণগণ্ডি লঙ্ঘন করে আমাদের নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য যতি মাঝেমাঝেই বকুনি খেত। এই প্রসঙ্গে সেই ভয়াবহ শব্দ—'ছোটলোক' কথাটা মাঝেমাঝেই কানে আসত। কিন্তু যতি এসব বিশেষ গায়ে মাখত না। ওর কাছে মস্ত বড় একটা সুশিক্ষা পেয়েছিলাম। সে বলত, 'সব মানুষই মানুষ'। ভাগ্যবান মানুষদের এই সত্য উপলব্ধি করতে সম্ভবত আরও অনেক শতাব্দী লাগবে।

ছার-দেওয়ালের ওপারের মানুষরা সবাই কিন্তু এক শ্রেণির ছিল না। পল্লীগ্রামের মতো মফস্বল শহরে বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া এ রকম জাতিভেদভিত্তিক আবাসন নানা কারণেই সম্ভব হত না। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে ভুঁইমালি, মুদি, ছোট দোকানদার, নাপিত, তাঁতি, অফিসের পিয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোক আমাদের প্রতিবেশী ছিল। কিন্তু তাদেরই পাশাপাশি স্বর্ণকার, মহাজন, বেশ অর্থবান মুদিদের ঘরও ছিল। জাতিভেদের আচারগুলি তখনও প্রবল। সব বাড়িতেই আমাদের নাড়ু-বাতাসা খেতে দিত। কিন্তু জল খেতে দিত শুধু যারা জলচল তারাই। যে-নাপিত তার পেশা ছাড়েনি, তার হাতের জল খাওয়ায় কোনও বাধা ছিল না। পরে আমার এক খ্যাতনামা সহকর্মীকে বলেছিলাম তাঁর ছোঁয়া জল দ্বিজ হয়ে আমি গ্রহণ করতে পারি না—কারণ তিনি জাতব্যবসা ছেড়ে মাস্টারি ধরেছেন, এখন আর কারও চুল কাটেন না বা দাড়ি কামান না! কথাটা ভুল বলেছিলাম—তাঁর পদবিতে বিভ্রান্ত হয়ে। আসলে তিনি জাত্যংশে নরসুন্দর না, সুবর্ণবণিক।

রান্না জিনিসের মধ্যে নিম্নবর্ণের রাঁধা-ভাজা-পোড়া উচ্চবর্ণের খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না, যদি তাতে নুন না থাকে। কিন্তু ভাত বা সেদ্ধ জিনিস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এক ভুঁইমালি বাড়িতে আলুনি নিমফুল, বকফুল ভাজার লোভে প্রায়ই যেতাম। তবে সেই আনন্দসংবাদ বাড়িতে জানানোর কোনও প্রয়োজন দেখিনি। ওই দরিদ্র বসতির মাঝখানে সাহাবাবুদের বিশাল দোতলা বাড়ি, যদিও তার বেড়া দরমার এবং ছাদ টিনের। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশভাগের কিছু আগে সাহাবাবুরা আমাদের জমিদারি এবং বসতবাড়ি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞানে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। সম্মানবোধটা একটু কম হলে সম্ভবত আমরা অনেক দুর্দশা থেকে রেহাই পেতাম। বদ্যির বামুন অতএব সেকেন্ড ক্লাস ধরণীতলবাসী দেবতাজ্ঞানে সাহা-বাড়িতে মহিলারা আমাকেও প্রণাম করতেন। তখন আমার চার-পাঁচ বছর বয়স। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রণাম করলে সংকোচে কুঁকড়ে যেতাম।

সামাজিক শ্রেণিবিভাগের গন্ডি এক যতিই লঙ্ঘন করত না। গরিব বসতির শিশুপালও এ ব্যাপারে নির্বিকার ছিল। বিকেল হলেই 'বাবুগো বাড়ি খ্যালতে যাবি না?' এই জিকির দিয়ে জনা দশ-বারো বালখিল্য—যাদের বয়স চার-পাঁচ থেকে দশ-বারো অবধি—আমাদের উঠোনে হাজির হত। তাদের মধ্যে কয়েকটি প্রধান চরিত্রর স্মৃতি আজও রয়ে গেছে। যথা 'অগো বেঙ্গি', 'মগো বেঙ্গি', জগদীশ্যা, রাখাইল্যা, সন্না। দুই বেঙ্গি পাশাপাশি দুই বাড়ির কন্যা। 'অগো' অর্থাৎ ওদের, 'মগো' অর্থাৎ মোদের। এরা দু'জনেই কুমির-কুমির খেলায় অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট। মগো বেঙ্গির বয়স তখন সাত। সে সামাজিক উচ্চাশাসম্পন্ন নারী। বাবুগো বাড়ির পোলাদের সঙ্গে বর-বউ খেলায় তার উৎসাহ কিছু বেশি। ব্যাপারটা চোখে পড়লে গুরুজনরা বিশেষ অপছন্দ করতেন। মুদিকন্যা মগো বেঙ্গিকে পুত্রবধূরূপে বরণ করতে মা'র খুব উৎসাহ ছিল না। আর এক মুদিনন্দিনী যে কালে বিলাতে প্রধানমন্ত্রী হবেন এ তথ্য তখন অজ্ঞাত ছিল। তা ছাড়া গেরস্ত ঘরের মেয়ে মগোর—যার এগারোয় না পড়তেই বিয়ে হবে, বিবাহসংস্কারের আসল উদ্দেশ্যটা জানা ছিল। সেই জ্ঞান যাতে আমাদের চেতনায় অকালে সঞ্চারিত না হয়, এ নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা ছিল। আর নীতিজ্ঞানসম্পন্ন জগদীশ্যা?—যে নদীর ঘাটে স্নানরতা রমণীদের ইজ্জত রক্ষা এবং তাদের দেখে ফেলে পুরুষরা যাতে ভ্রষ্টচরিত্র না হয় তার তত্ত্বাবধান এই দুই গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিল? তার সঙ্গে মেলামেশাও বিপজ্জনক বলে মনে করা হত। আর চন্দ্রা ভুঁইমালির কন্যা সন্না, সে একটু বেশি সুন্দরী। আমার ন বছর বয়স্ক দাদা, দশ বছর বয়স্কা এই রূপসীর প্রতি বেশ আকৃষ্ট ছিল বলে আমার ধারণা। এইসব কারণে আমাদের কৌমার্য তথা মতির সুকুমারত্ব রক্ষার জন্য গুরুজনরা চিন্তিত হবেন—এ আর বিচিত্র কী? শ্রেণিঘটিত কারণে এইসব বাল্যসঙ্গী-সঙ্গিনীদের সোজাসুজি তাড়িয়ে দেওয়া যেত না, তখনকার সামাজিক মূল্যবোধে বাধত। কিন্তু সূর্যাস্তের অনেক আগেই—'অন্ধকার হইছে, এইবার ঘরে যা' বলে এই প্রতিবেশী সন্তানদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। অবাঞ্ছিত সঙ্গ থেকে ছেলেদের সম্পূর্ণ বাঁচানো না গেলেও তার সময়কাল যতটা সীমিত করা যায়—এই আর কী!

কোনও একটি বিশেষ দিনে মানুষের শৈশব শেষ হয় না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছিল বলে আমার ধারণা—একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চন্দ্রা ভুঁইমালি তার জাতিগত পেশা ছেড়ে আমাদের কাছারির 'ভাণ্ডারী' হয়েছিল। কোনও ভাণ্ডার রক্ষা তার কর্তব্যর অঙ্গ ছিল না। আমাদের জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের সেবার্থে স্থাপিত ঠিকাবাসার জন্য বাজার করা ইত্যাদি ছোটখাটো কাজে তাকে লাগানো হত। এ ছাড়া তার খ্যাতি ছিল গুণিন বলে। কারও অসুখ-বিসুখ হলে চন্দ্রার ডাক পড়ত। সে এক হাতে ধুনুচি আর এক হাতে এক গোছা ঝাঁটার কাঠি নিয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এক ধরনের আরতিনৃত্য করত। কিছুক্ষণ নাচের পর ওর ওপর দেবীর ভর হত। তখন সে ওই ঝাঁটার কাঠি বা নিমগাছের পাতাসুদ্ধ ডাল দিয়ে রোগীকে ঝাড়ফুঁক করত। এসব কারণে চন্দ্রাকে সবাই একটু সমীহ করে চলত। ওর ধরন-ধারণও ঠিক নিম্নবর্গীয় ছিল না। সুন্দরী সন্না চন্দ্রার বড় মেয়ে।

আমাদের উঠানে রোজ যারা খেলতে আসত—সন্না তাদের একজন, এ কথা আগেই

বলেছি। হঠাৎ তার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেল। সন্না কেন আসে না? সবাই পরস্পরের দিকে তাকায়, কিন্তু এ প্রশ্নের কেউ উত্তর দেয় না। হঠাৎ একদিন ঠোঁটকাটা 'মগো' বেঙ্গি কথাটা বলেই ফেলল। 'সন্নারে হ্যার বাপে বেচ্চিয়া দিছে—সাহাবাবুর কাছে।' ছ'-সাত বছর বয়সে কথাটার অর্থ বোধ হল না। মানুষ কি বেচা যায়? আর বাপ মেয়েকে বেচে? বাজারে লাউ-কুমড়োর মতো? ক'দিন পর বাবা চন্দ্রাকে তলব করলেন। আমাদের বললেন, 'তোমরা ওই ঘরে যাও।' পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম বাবা চন্দ্রাকে প্রশ্ন করছেন, 'তুই নাকি সাহার কাছে মাইয়াডারে বেচ্চিয়া দিছ?' চন্দ্রা নতমস্তকে মৃদু স্বরে উত্তর দিল, 'হ হুজুর।' প্রশ্ন : 'এমন কাজ ক্যান্ করলি? প্রাণে ধরিয়া মাইয়াডারে জানোয়ারের হাতে দিতে পারলি?' উত্তর : 'কী করমু কয়েন? মাইয়াডা দ্যাখতে হুন্দার। পাঁচ বদমাইসে নজর দেয়। ওর যুগ্যি ঘরে বরে দেওনের ত আমার ক্ষেমতা নাই। সাহাবাবু লোক খারাপ না, দয়ামায়া আছে। মাইয়াডা থাকবে খাইবে ভাল। আর আমার আরও তিনডা মাইয়া, উনি যা টাকা দেছেন তাতে তাগোও বিয়া সাদি ভালমতো দিতে পারব।' বাবা : 'অর ত এখনও দশ পার হয় নাই। ও গিয়া বুড়ার লগে থাকবে? হ্যাসে বিষ খাইবে না ত?' উত্তর : 'হুজুর, না। ওর এহন এগারো চলতে আছে। কইছি না, সাহাবাবুর শরীলে দয়ামায়া আছে, সোমত্ত হইলেই তিনি অরে ঘরে লবেন। হ্যার আগে না।' বাবা বললেন, 'তাইলে তারে ক' পুরুত ডাইক্কা বিয়া করতে।' চন্দ্রা জিভ কেটে বলল, 'হেয়া কি হয়! আমরা ছোট জাইত।'

ছ' মাস পরে—সম্ভবত সন্না সোমত্ত হওয়ার পর—সাহাবাবু তাকে ঘরে নিলেন। চন্দ্রা তো বলেইছিল—ওঁর মায়ার শরীর। মায়ার শরীরটি রীতিমতো দশাসই—ভুঁড়িষ্মান, লোমাচ্ছন্ন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। শরীরটি যাঁর সম্পত্তি তাঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে। সংসারাভিজ্ঞ জগদীশ্যা খিক খিক করে হাসতে হাসতে মেয়ে কেনার জৈবিক উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করল। সাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ সন্নাকে কল্পনা করে আমার একই সঙ্গে কান্না আর বমি পেল। যে-পৃথিবীতে ফুলের রঙে স্বর্গের উজ্জ্বলতা, গুবরে শালিক আর থোরকিনা মাছ অনন্ত বিস্ময়ের বস্তু, কচুর পাতায় জলবিন্দু আমার নির্লোভ কামনায় ভাস্বর—সেই পৃথিবীটা যেন হঠাৎ তার রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের খোলস ছেড়ে একটা বীভৎস সরীসৃপের আকার নিয়ে বের হয়ে এল। এই নতুন পৃথিবীর গোসাপের মতো লেলিহান জিভ, কুমিরের মতো ক্লেদময় কর্কশ চামড়া। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম এক বিকটাকার অজানা কোনও জন্তু সন্নাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। জন্তুটার মুখ সাহাবাবুর।

শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে আদম আর ইভ নন্দনকানন থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। শয়তানের অবতার সাহাবাবু কুজ্ঞানের অঞ্জন শলাকা দিয়ে আমার চক্ষুরুন্মীলন করলেন। জীবন ও জগতের কুৎসিত রূপ আমার চেতনাগোচর হল। শৈশবের নিষ্পাপ স্বর্গ থেকে আমার চিরদিনের মতো নির্বাসন ঘটল।

শৈশবের কথা স্মরণ করলে অনেকগুলি মুখ মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে তাদের সঙ্গে ভালবাসার বন্ধন। দীর্ঘদিন বিদেশে বাস করে বুঝেছি, আমাদের সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ মানুষে মানুষে এই স্নেহবন্ধন—যা সহস্র রকমের ক্ষুদ্রতা, দলাদলি, ঈর্ষা-দ্বেষ সত্ত্বেও এক ধরনের আনন্দ আর শান্তির স্বাদ নিয়ে আসে, যার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনও সমাজে বোধ হয় নেই।

ইংল্যান্ডে এক সন্ধ্যায় ট্রেনে বাড়ি ফিরছি। কামরায় সহযাত্রী শুধু একজন মুসলমান মৌলবি। উনি জায়ে-নমাজ বিছিয়ে সান্ধ্য নমাজ পড়লেন। কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম—ইংরাজি ভাষাটা ওঁর অজানা, আমার অখাদ্য হিন্দুস্তানিতে বাতচিত শুরু করলাম। মৌলবি সাহেব জানালেন—বিদেশে এই ওঁর প্রথম আগমন। কেমন লাগছে এই প্রশ্নের উত্তরে চারটি শব্দে বিলাতি সভ্যতার উনি যে-মূল্যায়ন করলেন, তার চেয়ে সুষ্ঠু বর্ণনা এবং আমাদের সঙ্গে এদের মূলগত তফাত কোথায় তার নির্দেশ, আমি আর কোথাও পাইনি। ওঁর বক্তব্য—এদের "ইনসানিয়াত জেয়াদা, মুহব্বত কম।" অর্থাৎ আমাদের সমাজে "মুহব্বত জেয়াদা, ইনসানিয়াত কম।" ব্যাপকতম অর্থে সেই মুহব্বত আমাদের সমাজ এবং ব্যক্তিচেতনাকে রক্ষা করছে, শত যন্ত্রণা আর ব্যর্থতাবোধ সত্ত্বেও আনন্দের সন্ধান দিচ্ছে। যদি কোনওদিন ইনসানিয়াত অর্থাৎ যে সব গুণে মানুষ এই পৃথিবীতে সুখ-সমৃদ্ধি-ধর্মময় বীরভোগ্য জীবন যাপন করতে পারে, তা আমাদের আয়ত্ত হয়, আশা করি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার মূল্য হিসাবে আমাদের মূল্যাতীত স্নেহবন্ধনগুলি বিসর্জন দেবে না।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে দাস-রাজত্বর কথা লিখেছেন। বিশাল যৌথ পরিবারের প্রাসাদোপম বাসভবনে এই সেবকশ্রেণী তুর্কি সুলতানদের দাসগোষ্ঠীর মতোই অশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যখনই ভারতীয় শাসনযন্ত্রের ছোট কর্তাদের শরণাপন্ন হতে হয় তখনই দেখা যায় যে, সম্পদ ও পদমর্যাদায় নীচের সিঁড়ির মানুষ ক্ষমতা হাতে পেলে তার ব্যবহারে কারুণ্য দেখান না। কবির শৈশব-অভিজ্ঞতাও একই জাতের নিষ্করুণতার স্মৃতিতে মলিন। ঠাকুরবাড়ির দাসগোষ্ঠী শিশু আর মা-বাপের মাঝখানে এক দুর্ভেদ্য বেড়ার ভূমিকাও পালন করত।

আমাদের চারপাশে সেবকশ্রেণির যারা ছিল, তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন মানুষ। আমার ঠাকুর্দারা চার ভাই। বড় ঠাকুর্দা রোহিণীকুমার কিছুদিন যৌথ পরিবারব্যবস্থাই চালু রেখেছিলেন। আমার ঠাকুর্দা, কনিষ্ঠ বিনোদকুমার, স্বভাব এবং আচরণে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন। আমাদের গ্রাম এবং শহরের সব সম্পত্তিই এজমালি হলেও শহরের বাড়িতে ঠাকুর্দা একাই পুত্রকন্যা নিয়ে বাস করতেন। গ্রামে যেসব জ্যাঠা-কাকা জেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনেরা থাকতেন, তাদের তুলনায় আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধরনধারণ একটু বেশি শহুরে ছিল। এই পার্থক্যর একটি লক্ষণ—গ্রামবাসী আত্মীয়দের সেবকশ্রেণির সঙ্গে আচার-ব্যবহারে ভেদবুদ্ধি কিছু কম ছিল। ঝি-চাকররা কনিষ্ঠদের কাকা-পিসি-দাদা-দিদি। রাঁধুনি ব্রাহ্মণ হলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তার পদধূলি নিত। আর ঠাকুর-চাকরের হাতে কানমলা

চড়চাপড় খাওয়া তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অঙ্গ ছিল। কর্তারা পারতপক্ষে ভৃত্যদের গায়ে হাত তুলতেন না, যদিও কাছারিঘরে দুর্বিনীত 'প্রজা' অর্থাৎ রায়তদের মারবার জন্য সওয়া হাত জুতার ব্যবস্থা ছিল। সেই জুতার স্মৃতি কীর্তিপাশার লোকগীতিতে আজও বেঁচে আছে—মিহির সেনগুপ্ত লিখিত 'সিদ্ধিগঞ্জের মোকাম'-এ সে কথার উল্লেখ পাই। মোটকথা আমাদের পরিবারের মধ্যে যাঁদের শহুরেপনা বা পশ্চিমায়ন কিছু কম, তাঁদের আধুনিক শ্রেণিসচেতনতাও অতটা জাগ্রত ছিল না। শ্রেণিসচেতনতা অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে কতকটা প্রাক্-আধুনিক সামন্ততন্ত্রের মনোভঙ্গিতে চিহ্নিত। সেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে অলঙঘ্য লক্ষ্মণগণ্ডি ছিল না। ভৃত্য সত্যিতেই পরিবারের একজন, সম্পর্কে প্রভুর ভাই বা সন্তানস্থানীয়।

আমাদের অধুনাপন্থী 'নিউক্লিয়ার' পরিবার এই প্রাক্-আধুনিক মনোভাব থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিল। আমাদের যারা সেবা করে, তারা যে কখনওই আমাদের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে না, এবং ক্রোধের মুহূর্তে তাদের গায়ে হাত তোলা গুরুজনদের বিধিদত্ত অধিকার—শৈশবে এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ ঘটেনি। অবশ্যি সংস্কার-লব্ধ বর্ণধর্ম শ্রেণিসম্পর্ক কিছুটা গুলিয়ে দিয়েছিল। ভৃত্যের গায়ে হাত তোলা যেত, কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণের গায়ে কখনওই না। মুসলমান জমিদার বাড়িতে ঝিয়েদের উপরও মারধর হতে দেখেছি। ঝিকে মারধর করা সম্ভবত বাঙালি হিন্দু পরিবারে চালু ছিল না। Thank God for small mercies.

মোট কথা, গ্রামবাসী জেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনেরা হয়তো কিছুটা রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত দাসরাজত্বে বাস করতেন। অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি। পরিণত বয়সে যে-মূল্যবোধ শ্রেয় বলে মেনেছি, তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের গ্রামবাসী আত্মীয়দের প্রাক্-আধুনিক শ্রেণিচেতনা তুলনায় অনেক বেশি মানবিকতা বোধে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে। আমাদের পরিবারে ঝি-চাকরদের উপর অত্যাচার করা হত এমন না। কিন্তু তারা যে আমাদের মতো 'ভদ্রলোক' নয়, এ কথা কখনও ভুলতে দেওয়া হত না।

এই শ্রেণিচেতনা শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ-ভালবাসার উপর ছায়া ফেলেনি। তার অন্যতর কারণ, একটি মানুষের অস্তিত্ব আমাদের পরিবারে শ্রেণিসম্পর্ক কিছুটা ওলট-পালট করে দিয়েছিল। যতিদিদি। আমার ঠাকুর্দা বজরায় বেড়াতে বের হয়ে এক স্নানরতা চতুর্দশী সুন্দরীকে দেখে তাঁকে বিয়ে করেন। বিনোদপত্নী সরোজিনীর রূপের খ্যাতি সে যুগে বাঙালি ভদ্রসমাজের সর্বত্র পৌঁছেছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'-এ লেখকের মামাতো বোন সরোজিনীর রূপবর্ণনা এবং ছবি আছে। সাহেব সিভিল সার্জন ঠাকুমাকে দেখতে এসে মন্তব্য করেছিলেন, "বিনোদবাবু, আপনার স্ত্রীকে ঈশ্বর সংসার করার জন্য সৃষ্টি করেননি। অতি মূল্যবান চিনামাটির পুতুলের মতো এঁকে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখলে ঠিক হয়।" ছাব্বিশ বছর বয়সে চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ঠাকুমা মারা যান। ঠাকুর্দার বয়স তখন ত্রিশ। শিশুকন্যাটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি মানুষের প্রয়োজন হয়। সেই কাজের জন্য যার আবির্ভাব হল সে যতি। প্রসঙ্গত বলি, পরে সেই শিশুকন্যা, আমার ছোটপিসি পদ্মার সঙ্গে কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের বিয়ে হয়।

যতি মুর্শিদাবাদের এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের মেয়ে। জাতে তাঁতি, তিন বছর বয়সে বিয়ে হয়ে পাঁচ বছর বয়সে সে বিধবা হয়। তারপর অনেক দুর্গতির ইতিহাস। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যতির কোনও আত্মীয় ওর হয়ে দরখাস্ত করে। (যতি পড়তে পারত, কিন্তু লেখার ব্যাপারে নাম সইয়ের উপরে আর উঠতে পারেনি।) সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে শিশু পদ্মাকে পালন করার চাকরিটি ও পেয়ে যায়। বিপত্নীক তরুণ জমিদার বিনোদকুমার দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে সেটা কিছু অস্বাভাবিক বা নিন্দার্হ ব্যাপার হত না। কিন্তু সন্তানবৎসল ভদ্রলোক আবার বিয়ে করে ছেলেমেয়েদের সৎমার হাতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তা ছাড়া একমাত্র ছেলে অমিয় বা চাঁদের প্রতি তাঁর স্নেহর কোনও সীমা ছিল না। আবার বিয়ে করলে পুত্রের সম্পত্তিতে অন্য ভাগীদার আসতে পারে—এ সম্ভাবনাও ওঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। সন্তানদের কথা ভেবে তিনি যে-আত্মত্যাগ করলেন তার ফল ভুগল একটি মানুষ। যতি ঠাকুর্দার শয্যাসঙ্গিনী হল। ভাবলে অবাক হই যে, আমার তীব্র নীতিবোধসম্পন্ন বাবা এই ঘটনায় নীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখেননি। বরং ঠাকুর্দার তুলনাহীন স্নেহ এবং আত্মত্যাগেরই পরিচয় পেয়েছেন। যতিকে ঠাকুর্দা এক কাঠা জমি বা একশো টাকার কোম্পানির কাগজও দিয়ে যাননি। ওঁর বোধহয় প্রত্যাশা ছিল যে, ছেলে, ছেলের বউ তার ভরণপোষণের ভার নেবে। যতি আমাদের পরিবারের একজন হিসাবেই রয়ে গিয়েছিল। খাওয়াপরার তার অভাব হয়নি। কিন্তু মা'র সঙ্গে মনোমালিন্য তীব্র হয়ে ওঠায় যতিকে প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে নিঃসম্বল অবস্থায় নিজের গ্রামে ফিরে যেতে হয়। তার এক বছরের মধ্যেই ও মারা যায়।

পতিপুত্রহীন যতির সমস্ত স্নেহভালবাসার প্রায় একমাত্র পাত্র ছিলাম আমি। মা-বাবার প্রথম সন্তান আমার বড় দাদা তরুণ প্রতিবন্ধী ছিলেন—জন্মের সময় ফর্সেপের চাপে তাঁর মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি মায়ের তৃতীয় সন্তান। প্রতিবন্ধী তরুণ প্রথম এবং আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড় দাদা অরুণকে দেখাশোনার পর তৃতীয় সন্তানটিকে লালনপালন করার মতো সময় বা শারীরিক ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সেই কর্তব্যভার যতি নিজের হাতে তুলে নেয়। জীবনের প্রথম বছরগুলি আমি কার্যত মাতৃহীন ছিলাম। যতির সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ ওর তীব্র স্নেহ বড়ই প্রকাশমুখী ছিল। সেই গ্রাম্য আতিশয্য আমার সহ্য হত না। ওর সেবা আমি অবশ্যই নিতাম। কিন্তু প্রতিদানে ও যা পেত, তাকে নিষ্করুণ বিরক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। শিশুর করুণাহীনতায় কোনও বাধাবন্ধ থাকে না। এবং তা যে কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে এখন মনে করলে আশ্চর্য হয়ে যাই। যতি আদর করতে এলে আমি মুখ ভেঙাতাম, খিমচে দিতাম। আর একটু বড় হয়ে গুণ যখন আরও বাড়ল, তখন ওর দৈহিক স্থূলত্ব নিয়ে স্থূলতর ঠাট্টা করতাম। বলতাম রুক্মাবাইয়ের সার্কাসে ওকে হাতি হিসাবে ভর্তি করে নেবে। যতি অসহায়ভাবে আবেদন করত, "ছি সোনা, অমন বলতে নেই।" ওর জীবনের ট্র্যাজেডি যতদিনে বোধগম্য হল, ততদিনে সে আক্ষরিক অর্থেই আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

আমাদের পরিবারে যতির জায়গাটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না। সে যে ভৃত্যশ্রেণির না, তার প্রমাণ সে আমাদের খাটে বিছানায় বসত, বাবাকে তাঁর ডাকনাম ধরে ডাকত 'চাঁদ'। কিন্তু সে যে প্রভুশ্রেণির নয়, তার প্রমাণ ওর প্রতি মা'র ব্যবহারে। ঠাকুর্দার জীবিতকালে

যতি সম্ভবত শাশুড়ির ভূমিকায় অবতীর্ণা হতে চেয়েছিল। সে দাবি করত যে, বিয়ের পর মাকে বরণ করে ওই ঘরে তুলেছিল। শুনেছি ও মায়ের নামে নানা নালিশ করে ঠাকুর্দার কাছে বকুনি খাওয়াত। যতির এইসব অপরাধ মা কখনও ক্ষমা করেননি। বাবার নীতিজ্ঞান ওকে অনেকদিন পর্যন্ত আশ্রয়চ্যুত করেনি। কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনে যে বিরোধের একটা অন্তঃসলিলা ধারা ছিল, সে সম্পর্কে অতি শৈশবেই আমি সচেতন হই। যতিকে সজ্ঞানে আমি কখনও ভালবাসিনি। কিন্তু মায়ের সঙ্গে এই অব্যক্ত কলহে কেন জানি না আমি মনে মনে ওরই পক্ষ নিতাম। সম্ভবত তার একটি কারণ মনের দিক থেকে আমি মাতৃহীন ছিলাম। আমাদের পরিবারে আমি ছাড়া সবাই দেখতে সুন্দর ছিল। বাবা পরম রূপবান, মা'র গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো। আমার দেহবর্ণে আফ্রিকার ছায়া, মুখশ্রী ঠিক কার্তিকের সঙ্গে তুলনীয় না। এ নিয়ে আত্মীয়-স্বজন পরিচিত অনেকেই নির্দ্বিধায় মন্তব্য করতেন। ফলে চেহারা নিয়ে অতি শৈশবেই আমার একটা হীনম্মন্যতা জন্মায়। আমার সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ফরসা সুন্দর দেখতে ছোট একটি বোন জন্মাল, তখন সত্যিই আমার ধারণা হল যে এই পরিবারে আমার কোনও জায়গা নেই। আমার স্বভাব ছিল ছোটবড় সবাইকে খেপানো। ছোট বোন যখন বড় হচ্ছিল তখন তাকে খেপিয়ে এক দিকে তার আঁচড়-কামড়, অন্য দিকে মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। তবে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে ভাল ছাত্রর বড় আদর। তাই ইস্কুলের পরীক্ষায় যখন ফার্স্ট-সেকেন্ড হতে শুরু করলাম, তখন বাড়িতে আমার কদর বাড়ল। কিন্তু তাতে কোনও সুখ ছিল না, কারণ আমার তুলনায় আমার দাদা যে পড়াশুনোয় খারাপ, এ কথা তাকে ভুলতে দেওয়া হত না। বেচারা কোনও অর্থেই খারাপ ছাত্র ছিল না। কিন্তু সে পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হত না। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার লোক সে কোনও দিনই না। জীবনের রূপরস সর্বদাই তাকে হাতছানি দিত।

আমার সঙ্গে তার আচারব্যবহারের তুলনামূলক সমালোচনা আমাকে বড় বিব্রত করত। ফলে আমার ছেলেবেলার অনেকটাই একটা অস্বস্তিবোধ নিয়ে কাটে। দাদার জন্য বড় কষ্ট হত। সে কষ্ট প্রকাশ করার উপায় আমার জানা ছিল না।

আমাদের নির্ভেজাল ফুর্তি জমত সেবকশ্রেণির তিনটি মানুষের সঙ্গে—সাড়ে তিন কি চার ফুট উঁচু বসা তাদের নেতৃস্থানীয়। তাকে কেউ নেতা হিসাবে মানত, এমন না। কিন্তু তার সকলের উপর তম্বি করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। খর্বকায় মানুষদের প্রতাপ এবং আস্ফালন কিছু বেশি হয়—উদাহরণ ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন এবং আমার পরিচিতের ভিতর প্রয়াত বাঙালি কৃষ্টিবীর নীরদ সি. চৌধুরী। বসা ছিল ঠাকুর্দার খাস চাকর। তার প্রধান কাজ ধুতি কোঁচানো আর কাটলেট বানানো। সারাদিন ধরে কুপিয়ে কুপিয়ে মাংসখণ্ডকে সে অসাধারণ রকমের মিহি এক বস্তুতে পরিণত করত। সেই দিনভর পরিশ্রমের শেষ ফল যে কাটলেট, তা স্মরণ করলে এখনও শিহরন হয়। তম্বি করার জন্য উপযুক্ত সাজ প্রয়োজন। তাই দর্জিকে দিয়ে বসা এক খাকি পুলিশের পোশাক বানিয়ে নিয়েছিল। কারণ তার দাবি ছিল যে, সে আসলে সি.ঐ.টি অর্থাৎ সি.আই.ডি. বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক। কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যে ছিল না। বাবা গাঁধীবাদী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই নাবালক

লজের উপর টিকটিকির নজর ছিল। বাড়িতে ঢোকার রাস্তার মোড়ে অনেক সময়ই দেখতাম মোড়া বা ভাঙা চেয়ার পেতে বসে একটা লোক বিরস মুখে বিড়ি ফুঁকছে। বিড়ি ফোঁকা ছাড়া তার আর কোনও কাজ আছে মনে হত না। নজর রাখার একটা কারণ—বাড়িতে যারা আসা-যাওয়া করত তারা সবাই গাঁধীবাদী নয়। কেউ কেউ সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। এদেরই একজন ত্রিশের দশকে অত্যাচারী এক দারোগাকে বরিশাল শহরে প্রকাশ্য দিনের আলোয় ছুরি মেরে খুন করে। নিরক্ষর বসা বিপ্লবীদের সম্পর্কে কী চমকপ্রদ তথ্য পুলিশকে জানাত বলা কঠিন। তবে এক গবেষকের কাছে বাঙালি গোয়েন্দাদের লেখা রিপোর্টের কপি দেখেছিলাম। তার ভাষা এই রকম : "বৈকাল চারি ঘটিকা অবধি তাহাকে শেডু (অর্থাৎ shadow) করিলাম। তখন সে আরেক ষড়যন্ত্রকারীর সহিত চা খাইতে বসিল।" বসার রিপোর্টের তথ্যমূল্য সে তুলনায় কম হওয়ার কথা না।

বসার আর একটা কাজ ছিল আমাদের তত্ত্বাবধান—অর্থাৎ স্নানাহার বা ঘুমের সময় হলে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের নাইতে, খেতে, ঘুমাতে বাধ্য করা। এ কাজটা ওর পক্ষে সহজ ছিল না। কারণ আমাদের বয়স পাঁচ-ছয় ছাড়ালেই ও আর আমাদের সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠত না। কিন্তু বলে যা সম্ভব না, তা কৌশলে সম্ভব হত। কোস্তাকুস্তিতে হেরে গিয়ে ও আমাদের কাতুকুতুতে পরাস্ত করত। ছোট ছোট আঙুলের সেই সুড়সুড়ি এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা। এই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহারের আগে অবশ্যি সে অবস্থার গুরুত্বটা বোঝাতে চেষ্টা করত। ও ছোটবেলায় যাত্রায় অভিনয় করত, ফলে ওর ভাষায় একই সঙ্গে নাটকীয়তা আর ক্লাসিক গাম্ভীর্যের সমন্বয়। বসা গুরুজনদের রুদ্ররোষের সম্ভাবনা বিষয়ে আমাদের সচেতন করার জন্য বলত, "এখনও যে যাইতে আছ না, এর পর রাগরাগিণী শোনবা হ্যানে।" ওর শব্দশাস্ত্রে ক্রোধের প্রতিশব্দ 'রাগ'-এর সঙ্গে রাগিণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আর সময় সম্বন্ধে ওর ধারণাগুলি নিতান্তই মৌলিক এবং নিজস্ব। হয়তো এগারোটা বাজে। বসা ঘোষণা করল, "একটা বাজিয়া গ্যালে। তোমাগো নাওনের নাম নাই।" আমাদের প্রত্যুত্তর, "বসা, এখন মাত্র এগারোটা।" বসা : "তয়?" —"তয় কী?" — "এগারোটার পরই ত বারোটা। হ্যার পর একটা বাজতে আর কতক্ষণ?" দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ওর মন্তব্যর কোনও জবাব ছিল না। নলিনীদলগত জলের মতো অস্থায়ী এই জীবন যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী তা কি ভোলা যায়? আমাদের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে ও খেলার নতুন নিয়ম চালু করেছিল। হয়তো চার দান পড়েছে ওর। চার ঘর যাওয়ার পথে আমাদের একটা ঘুঁটি। সেটি ও খাবেই। এ নিয়ে ধুন্দুমার। কিন্তু কার সাধ্য রোধে তার গতি!

বসার সহকর্মী এবং নানা ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ওড়িশানন্দন নগা বসার দেড়গুণ। কিন্তু বচসা হাতাহাতিতে দাঁড়ালে বসা চেয়ার, টেবিল, টুল—হাতের কাছে যা পেত তার উপর লাফিয়ে উঠে নগাকে আক্রমণ করত। দৃশ্যটা এতই অসম্ভব যে নগা হেসে গড়িয়ে পড়ত। তখনকার মতো কলহশান্তি।

নগা এবং পাচক ধর্ম দু'জনেই কটক জেলার লোক। ওদের মারফত ওড়িশা-সংস্কৃতির নানা দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বরিশাল শহরে দু'-তিন শ' ওড়িয়া বসতি করেছিল। এদের একটা বড় অংশ স্টিমার ঘাটের কুলি, তবে বেশির ভাগই ভদ্র পরিবারে ভৃত্য বা পাচক

ব্রাহ্মণ, আর কেউ কেউ রাস্তার কল বা টিউবওয়েল থেকে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের কাজ করত। মিউনিসিপ্যালিটির জল নেওয়ার জন্য বাড়িতে কল বা আরও ব্যয়সাধ্য টিউবওয়েল বসানোর মতো অবস্থা অনেকেরই ছিল না। ওড়িয়া শ্রোতা বা দর্শক সংখ্যায় যথেষ্ট থাকায় ওড়িশা থেকে মাঝে মধ্যে যাত্রার দল আসত। নটরা [বলা বাহুল্য, এসব দলে নটী থাকত না] বাস্তবিকই গণশিল্পী, আধা শহুরে বাবু শ্রেণির না। তাদের চলাবলা ধরনধারণের সঙ্গে পরে দিল্লিতে যে-রামলীলা দেখেছি তার অনেক মিল ছিল। আমি সাপ্রু হাউসে ভদ্দরলোকের রামলীলার কথা বলছি না। লালকেল্লার সামনের মাঠে নিম্নবর্গীয় লীলা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশিদের রামলীলার কথা বলছি (যাতে স্কুল অফ ইকনমিকসের কালুরাম গোঁফ কামিয়ে সীতার অভিনয় করত)। কিন্তু ওড়িয়া যাত্রার বৈশিষ্ট্য ছিল গান আর নাচ। গদ্য বা পদ্যে কথাবার্তা কমই থাকত। সংস্কৃত নাটকের মতো একজন সূত্রধার থাকত। তবে শুধু প্রথমে না, প্রতি দৃশ্যেই সে কুশীলবদের ভূমিকা নির্দেশ করত। রাম-সীতা এসে দাঁড়ালেন। সূত্রধার বলল, "রাম-অ আউচি, সীতা আউচি, এবে নাচ-অ কুরু, নাচ-অ কুরু"। নৃত্য ও গীত সহ অভিনয় শুরু হত। তবে হনুমানকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিত না, রাবণকেও না। তাদের আবির্ভাবেই তাদের পরিচয়। আর যত দূর বুঝতাম—বিভীষণের চরিত্র পরিবেশন সম্পূর্ণ নেতিবাচক ছিল না। ওড়িশার ধর্মবুদ্ধিতে যে-লোক (বা রাক্ষস) ধর্মের খাতিরে নিজ বংশের শত্রুতা করেছে সে শুধুই নিন্দনীয় বলে বর্ণিত হত না। রাম-সীতার অভিষেকের দৃশ্যে রক্ষরাজ বিভীষণের হনুমানের লেজ ধরে সানন্দ নৃত্যে নাট্যকারের নীতিগত অনুমোদনের ইঙ্গিত ছিল।

যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরে নগা এবং ধর্ম বাছা বাছা দৃশ্যের পুনরভিনয় করত। ধর্মর পটুত্ব ছিল সঙ্গীতে, নগার নৃত্যে—বিশেষত হনুমানের ভূমিকায়। বানরসেনা হিসাবে নগার নেতৃত্বে নৃত্যাভিনয়ে আমরা যোগ দিতাম। নিজের পেশাগত স্বার্থে হাবিলদার-চর্চার (Subaltern Studies) ধারক ও বাহকদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, হাবিলদারত্বে আমার বাল্যেই অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এই কথাটা তাঁদের চেতনাগোচর করার জন্য। সত্যিতে হাবিলদার-চর্চার প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎদা না, স্বয়ং বাল্মীকি। বানরসেনা নিম্নবর্গের প্রতীক। আর রাক্ষসরা যে আধিপত্যকামী শোষক মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিচ্ছবি এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? দিগ্বিজয়লোভী রাম আগাগোড়া সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক। না হলে বালিকে বলেন, "সসাগরা ধরণী ইক্ষ্বাকু বংশের সম্পত্তি। আর তোমরা সব, মৃগই হও আর শাখামৃগই হও, আমাদের বধ্য"? মানে পাকা racist-ও বটে। বিভীষণকে সিংহাসনে বসানো যে কংগ্রেসের রাষ্ট্রাধিকার লাভ এবং নেহরুর প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, এ তো নবজাত শিশুও বুঝতে পারে। আর সীতাকে রাম যা হেনস্তা করলেন তাতে তাঁকে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার চরম উদাহরণ ছাড়া আর কী বলা যায়? নবনীতা দেব সেনের সীতা বিষয়ক গল্পচক্র আর একবার পড়ে দেখুন। নগার নৃত্যগোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে এসব চেতনা আমার বাল্যকালেই হয়েছিল। এখন হাবিলদার-চর্চা গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের প্রতি নিবেদন, তাঁরা যেন বাল্মীকির দাবিটা একটু বিবেচনা করেন। ভদ্রলোক মন্দ লিখতেন না। (প্রশ্ন : মুনিঋষিদের কি ভদ্রলোক বলা যায়? অপরপক্ষে ভারতবর্ষের সাহেব ঐতিহাসিকরা

'ভদ্রলোক' কথাটা মুখ্যত গালাগালি বলে ধরে নিয়েছেন। বাঙালি ভদ্রলোক ঐতিহাসিকরাও কেউ কেউ একই কথা বলছেন। ড. অশোক মিত্র অনেকদিন আগেই ঘোষণা করেছেন—উনি ভদ্রলোক নন।)

শাস্ত্রচর্চা আপাতত বন্ধ রেখে বাল্যকথায় ফিরে যাই। যতি, ধর্ম এবং নগা তিনজনেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের গল্পগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এরা তিনজনেই পড়তে পারত। ধর্ম আর নগা ওড়িয়া ভাষায় সাক্ষর ছিল। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ওদের জ্ঞান বই পড়ে হয়নি। আমাদের গ্রামীণ সমাজে ওই সব প্রাচীন এবং অনেক সময় অত্যন্ত জটিল কাহিনিগুলি কীভাবে গণ-চেতনার অঙ্গ হয়ে গেছে তার ইতিহাস কেউ লেখেনি। বিদেশে পড়াতে গিয়ে বহুবার বলেছি—সাক্ষরতা বা নিরক্ষরতার সংখ্যাবিচার করে কোনও দেশের সমাজ বা রাষ্ট্রচেতনার মূল্যায়ন হয় না। যে-সাক্ষরতা Sun পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় নগ্নিকার ছবি দেখতে উদ্বুদ্ধ করে, তার তুলনায় ভারতীয় গ্রামবাসীর নিরক্ষরতা, যা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনির কল্পনা এবং নীতিবোধে সমৃদ্ধ, নাগরিকতার প্রস্তুতি হিসাবে তা কম মূল্যবান নয়।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি নিয়ে যতি, নগা, ধর্ম এবং বসা প্রায়ই আলোচনা করত। প্রসঙ্গত বলি—সাক্ষর হওয়ার অনেক আগেই যতির কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত আমাদের আদ্যোপান্ত শোনা হয়ে গিয়েছিল। অনেক কাহিনি নিয়েই যতির সঙ্গে ওড়িশানন্দনদের মতান্তর ঘটত। এখন মনে হয় যে, ধর্ম আর নগার মহাকাব্য দুটির সঙ্গে যে-ভাষানুবাদের মাধ্যমে পরিচয় হয়, অথবা ওড়িশার লোকসংস্কৃতিতে কাহিনিগুলি যে-রূপে পরিচিত ছিল, তার সঙ্গে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের গরমিল অনেক। ফলে যতির সঙ্গে ওদের মতান্তরের কোনও সমাধান সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বসার সঙ্গে কাব্য তথা শাস্ত্র বিচারের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওর শাস্ত্রজ্ঞান প্রধানত যাত্রাভিনয় থেকে সংগ্রহ করা, সাইজে ছোট হওয়ায় বালগোপাল, বামনাবতার, শিশু প্রহ্লাদ, বালখিল্য মুনি, যাত্রার দলে এইসব ভূমিকায় এক সময় ওর বেশ চাহিদা ছিল। কিন্তু সে অনেকদিন আগে। ফলে তার স্মৃতি কিছুটা গুলিয়ে গিয়েছিল। তার উপর ওর মৌলিক চিন্তাধারাও ঐতিহ্যলব্ধ কাহিনিগুলিকে অসামান্য নাটকীয় রূপ দিত এবং ওর নানা কূট প্রশ্নে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। যথা, "দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় দশরথ রাবণেরে কী কইছিলে?" "গঙ্গা আনয়ন করছিলে কেডা? ভীম না অর্জুন?" "দণ্ডকবনে সোনার ছাগল সাজ্জিয়া আইছিলে কেডা? বিভীষণ না কুম্ভকর্ণ?" "বামনাবতার বলিরাজের মাথায় কোন ঠ্যাং চাপাইয়া দেছেলে? তৃতীয় না চতুর্থ?" এই বিচারে সকলের পরাস্ত হওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। শুধু বসা আড়ালে গেলে ধর্ম মন্তব্য করত, "ষড়া বসা সম্পূর্ণ মূর্খ অছি।"

ভারতবর্ষের রাজনীতি বিষয়ে আমার প্রথম পাঠ নগার কাছ থেকে পাওয়া। কারণ নগা ছিল সার্টিফায়েড স্বাধীনতাসংগ্রামী। সার্টিফিকেটটি সদাশয় উদারপন্থী ইংরাজ সরকারের পুলিশ স্বহস্তে ওর শরীরে এঁটে দিয়েছিল। মাথায় চুলের নীচে লম্বা একটা দাগ তার সংগ্রামী জীবনের স্মৃতি বহন করত। সাইমন কমিশনের সভ্যরা সারা ভারতবর্ষ ঘুরে, সর্বত্রই 'Go back Simon, go back Simon' এই জিগির শুনে শুনে পর্যুদস্ত অবস্থায় কটক শহরে এসে

শান্তির মুখ দেখলেন। কারণ ট্রেন থেকে নামতেই খোলকরতাল বাজিয়ে কীর্তনের দল ওদের অভিনন্দন জানায়। অন্তত ওঁদের তাই মনে হয়েছিল। আসলে কী হয়েছিল তা সেই কীর্তনে অংশগ্রহণকারী নগা একক নৃত্যনাট্যর মারফত আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সে গলায় খোল ঝুলিয়ে পাইকদের যুদ্ধ নৃত্যের স্টাইলে উদ্দাম নাচে মেতে উঠত এবং তালে তালে তীব্রনিখাদে ঝঙ্কার দিত, "গো-ব্যাককো সাইমনো, গো-ব্যাককো সাইমনো।" এই অভিনন্দনে বিলৈতি সাহেবদের চিত্ত প্রসন্ন হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় পুলিশদের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তার প্রমাণ—নগার মাথায় লগুড়াঘাতের চিরস্থায়ী চিহ্ন। এর পর থেকে নগার বিপ্লবী চেতনা কখনও ম্লান হয়নি। ওর কাছ থেকেই জানতে পারি—মহাত্মা গাঁধীই কল্কি অবতার। সময় হলে খাটো ধুতি ছেড়ে যোদ্ধৃবেশে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে নর্মদা তীরের মহাযুদ্ধে ইংরেজনিবহ নিধন করবেন। আর যদি কেউ ভেবে থাকে যে সেই ঘোর সমরে কটক জিলার নগেন্দ্র পরিড়া অনুপস্থিত থাকবে, তো সে নেহাতই চক্ষু থাকতেও অন্ধ। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে বর্মচর্মপরিহিত যুযুধান নগাকে কল্পনানেত্রে স্পষ্ট দেখতাম। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মন ভরে যেত।

ঘেসেড়া মেনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য মেজাজের লোক—ঈশ্বর-প্রেমে আবিষ্ট মরমিয়া মানুষ। নমাজ পড়তে তাকে কখনও দেখিনি। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই সে গান ধরত, "আয় হাবিব, এ খোদা" আর তার সঙ্গে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ। কখনও সে মানিক পীরের গান গাইত—"সেই ত মানিক পীর নদী পারের লা" (অর্থাৎ না, অর্থাৎ নৌকা)। মানিকের উপদেশ মতো আল্লার নাম নিয়ে নবীকে সার জানলে কীভাবে অক্লেশে মাজা দুলিয়ে ভবনদী পার হওয়া যায়, এক হাত কোমরে এক হাত মাথায় দিয়ে সত্যিই মাজা দুলিয়ে নেচে নেচে ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে দিত। কখনও মুখে মুখে কখনও পুঁথি থেকে পড়ে সে নানা কিস্‌সা শোনাত—সোনাভানের কিস্‌সা, হাতেমতাই-র কাহিনি, সোহরাব-রুস্তমের মর্মন্তুদ ট্রাজেডি। সেই সব কাব্যকথার কিছু কিছু কথা একটু দুর্বোধ্য মনে হত। যথা "লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার।/ সুমার করিয়া দেখে পঁয়ত্রিশ হাজার।" অথবা "ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।" এখন জানি সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপিতে লাখ লাখকে পঁয়ত্রিশ হাজারে নামানো কিছু কঠিন না। মার্জিন অফ এরর একটু বাড়িয়ে নিলেই হল। কিন্তু মর্দ যদি হেঁটেই যাবে তবে ঘোড়ায় কেন চড়ল। এই সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। মেনার জাগতিক আচরণেও কিছু কিছু ব্যাখ্যাতীত ঘটনা ঘটত। যেমন এক ঘোর বৃষ্টির দিনে গরু-বাছুরগুলি নদীর পাড়ে ছেড়ে রেখে বাড়ি চলে এল। কারণ? "গোরুগুলা ভিজ্জিয়া যাইবে, হেইয়ার লইগগা ছাতা লইতে আইছি।" একটা কথা বলে মেনা প্রসঙ্গ শেষ করি। ধর্ম ব্যাপারে আমি গোঁড়া নাস্তিক, এ নিয়ে মনে কখনও সন্দেহের ছায়া পড়েনি। নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন কি না আছেন, জানি না। কিন্তু শত যন্ত্রণাময় মৃত্যুভয়পীড়িত জীব-জীবনের দেখভাল করছেন নভস্থিত করুণাময় কোনও পিতা— এই বিশ্বাস গল্পকথা ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবতে পারিনি। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার বিরহে মেনার আকুল কান্না দেখে কৈশোরে অনেক সময় মনে হয়েছে, যে-ঈশ্বরবিশ্বাস এই শুদ্ধচিত্ত সরল মানুষটিকে এমন লোকাতীত আনন্দের জগতে নিয়ে যেতে পারে, তার অংশীদার হতে পারলে হয়তো মন্দ হত না। আমরা যখন উপন্যাস পড়ি বা বর্ণনামূলক ছবি দেখি, তখন তার

রসবিচারে শিল্পকর্মটি আক্ষরিক অর্থে সত্যভিত্তিক কি না তা বিচার করি না। তেমনই নাস্তিক হয়েও বহু সহস্র বছর ধরে গড়ে ওঠা মানুষের ঈশ্বরচিন্তায় অনির্বচনীয় রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস তার স্বাদ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করবেই—এমন কোনও অলঙ্ঘ্য নিয়ম নেই। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' বা 'রামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে যে-আনন্দ পেয়েছি, আমার নাস্তিকতা তাতে কোনও বিঘ্ন ঘটায়নি।

নিম্নবর্গীয় আর একটি মানুষের কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে যাব। কীর্তনখোলা নদীর এক পাড়ে শহর বরিশাল। অন্য পাড়ে কাউয়ার চর। শহুরে মানুষরা রহস্য করে বলতেন বায়সদ্বীপ। আমাদের শোওয়ার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে কাউয়ার চরের গাছপালা, পাড়ে বাঁধা নৌকা, দু-একটি কুটির বেশ দেখা যেত। সে চর রহস্যের আকর। ওখানে কারা থাকে, তারা কী করে, গাছপালা-পুকুর-খাল কী রকম এ নিয়ে আমার অশেষ কৌতূহল ছিল। কিন্তু সে কৌতূহল কখনও মেটেনি। কারণ কাউয়ার চরে কেউ যেত না, যাওয়ার কোনও কারণ ঘটত না। জ্যেঠতুত দাদা কালুদার সাহায্যে হাটুরেদের ডিঙি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করে যখন নৌকাবিহারে যেতাম, তখনও কোনও দিন কাউয়ার চর দর্শন ঘটেনি। এক-আধবার সসঙ্কোচে কালুদাকে বলেছি, "যাবা নাকি কাউয়ার চর?" নিরাসক্ত সুরে বইঠা টানতে টানতে তার প্রত্যুত্তর, "ক্যান? ওহানে আছেডা কী?" কী আছে জানি না বলেই যাওয়া এ কথা তাকে কী করে বোঝাব? আমার এই না দেখা Yarrow অদৃষ্টই রয়ে গেল। ফলে পরিচয়-জনিত মোহভঙ্গ আমার ঘটেনি। অলস দুপুরের অন্তহীন কল্পনার জগতে যা কিছু অসম্ভব তার অকুস্থল ছিল কাউয়ার চর।

কাউয়ার চরের সঙ্গে আমাদের একমাত্র সংযোগসেতু ছিল একটি মানুষ—জয়নাল। সংক্ষিপ্ত হয়ে নামটি দাঁড়িয়েছিল জয়না। জয়না কাউয়ার চরের বাসিন্দা। একটি বহুছিদ্রময় ডিঙিতে করে সে নদী পার হয়ে আসত আমাদের বাগানে শ্রমসাধ্য মোটা কাজগুলি করতে। ডিঙিটি যে শতচ্ছিদ্র ছিল সে তথ্য আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। কাউকে না বলে ওটিকে নিয়ে কালুদা আর আমি পাড়ি জমাতাম। কালুদা বৈঠা টানত। আমি একটা এনামেলের ভাঙা বাটি দিয়ে জল সেচতাম। আমরা যে ডুবে মরিনি তা নেহাতই গুরু কৃপায়। জয়না এই দুই কাজ একসঙ্গে কীভাবে করত তার হদিশ আমরা পাইনি। ওর সত্যিকার মনিব ছিল আমাদের মালি হাসমাতালি। একটিও কথা না বলে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে সে কাজ করে যেত। আর হুঁকো হাতে হাসমাতালি তাকে অকথ্য বাপান্ত করত। জয়না শুধু একটি শব্দই ক্বচিৎ কখনও উচ্চারণ করত। "CZ"। তার ভাবার্থ "হুজুর যা বলেন"। সারাদিন ওকে কখনও কিছু খেতে দেখিনি। বোধ হয় সকালবেলা পান্তা খেয়ে বাড়ি থেকে বের হত। কিছু খেতে দিলে খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। এ ছাড়া ওর মুখভাবে ভাবান্তর কখনও দেখিনি।

সে ভাবান্তর একদিন দেখলাম বড় বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে। বাড়ি থেকে কিছু দামি বাসন চুরি গিয়েছিল। কী করে হল? গেটে দিনে রাতে দারোয়ান মোতায়েন থাকে। তাকে এড়িয়ে চোর কী করে পালাল? এ প্রশ্নের অনেক সোজা উত্তর ছিল। পেছনে ঠিকাবাসার রাস্তা, তার উলটোদিকে নদীর ঘাট। আর দারোয়ানও কিছু সদাবিনিদ্র প্রহরী নয়। সুতরাং

চুরি করে পালাবার পথের কিছু অপ্রতুলতা ছিল না। কিন্তু সে কথা কেউ চিন্তা করল না। হঠাৎ হাসমাতালি বলে বসল, "ওই জয়না হারামজাদাই নেছে।" ওই নিরীহতম মানুষটার পক্ষে এ কাজ করা কতটা অসম্ভব, তা কারও মনে হল না। সবাই বলতে শুরু করল—বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। ওই মিচকে শয়তান ভালমানুষ সেজে থাকে। অতএব মিচকে শয়তানের উপর অনেক হম্বিতম্বি এবং কিছু মারধর হল। একটি কথাও না বলে অসহায় মানুষটা তার ভাঙা নৌকাটি নিয়ে কাউয়ার চরে ফিরে গেল। যাবার সময় দেখলাম তার দু গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। জয়না আর কখনও ফিরে আসেনি। মহা তম্বি করে হাসমাতালি বলল, "দ্যাখছেন হুজুর, হারামজাদা আর আইলে না!" তার না-ফেরাটাই তার অপরাধের চরম প্রমাণ বলে ধরে নেওয়া হল। যে-দিন সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে হিন্দুস্থানে উদ্বাস্তুজীবন শুরু করার জন্য রওনা হই, সেদিন কেন জানি না জয়নালের অশ্রুসিক্ত মুখটা বারবার মনে পড়ছিল। মনে হয়েছিল, অপমানে দুর্দশায় ওর সমান হবার দিন সমাগত।

আমাদের বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে আমলকী গাছের ছায়ায় টিনের ছাদওয়ালা এক বাসায় একটি পরিবার বাস করতেন। সে পরিবারের কর্তা বিশ্বেশ্বর দাস, আমাদের ভুইঞা জ্যাঠা, কালেক্টরেটে হেড ক্লার্ক ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে সুবোধ আর সুধীর—আমাদের ছোড়দা, বড়দা। তাঁদের স্ত্রীরা ছোট বউদি, বড় বউদি, দুই মেয়ে পচিদি, বুচিদি। ওরা যে আমাদের পরিবারের অংশ নয়, শৈশবে এ কথা বুঝবার কোনও কারণ ঘটেনি। যত দূর মনে পড়ে এদের একটিই শোওয়ার ঘর এবং একটিই খাট ছিল। দুপুরবেলা যখন তখন ওদের বাড়ি চলে যেতাম, ছুটির দিনে দেখতাম সবাই সেই অতি প্রশস্ত খাটে পাশাপাশি ঘুমোচ্ছে। ভুইঞা জ্যাঠা দাদুর আশ্রিতজনদের একজন, তাঁরই অনুমতি নিয়ে আমলকীতলায় ওই বাড়ি। পরে ওই বাড়ি ওঁদের ছাড়তে হয়—জমিদারি সম্পত্তির অন্যতম শরিক এক জ্যাঠামশাই ওখানে বাগান করবেন দাবি করায়। কিন্তু তার অনেক আগেই ভুইঞা জ্যাঠার পরলোকপ্রাপ্তি হয়েছে।

শৈশবের অনেক সন্ধ্যাই কেটেছে ওঁর সঙ্গসুখে। ওঁর একটি চশমার খাপ ছিল। সেটি থেকে পেপারমিন্ট বের করে উনি আমাদের খাওয়াতেন। নিজে অল্প পরিমাণে আফিঙ খেতেন। আর আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নানা রকম নাচ দেখাতেন—ইংরাজি, ফরাসি, জাপানি। নাচগুলি বিভিন্ন শৈলীর ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের চোখে একই মনে হত। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি ভরা মুখ নিয়ে সেই অনবদ্য নৃত্য চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই। পরে নুরেইয়েভকে নাচতে দেখেছি। কোনও তুলনা হয় না।

ছোড়দা বড়দা আমাদের বাড়ির লনে ব্যাডমিন্টন খেলতে আসতেন। দাদাকে খেলায় নেওয়া হত। আপাতদৃষ্টিতে আমাকেও নেওয়া হত, কিন্তু আসলে আমি ছিলাম এলেবেলে বা দুধুভাতু অর্থাৎ সত্যিতে খেলার অংশীদার নয়। ব্যাপারটা আমি ভালই বুঝতাম। তাই কোর্টের সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খেলায় বিঘ্ন ঘটাতাম। এ সময় পিছন ফিরলেই দেখতাম ছোড়দা আমাকে মুখ ভেঙাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদাও। চোখাচোখি হলেই মুখভঙ্গি বদলে একগাল হেসে ছোড়দা বলতেন, "অ তপু, খুব ভাল খেলতে আছ। খেল, খেল।" আর নিম্নস্বরে দাদাকে বলতেন, "আইজ খেলাডারে শ্যাষ করলে। কী আর করবা?"

ওঁর স্বভাব ছিল বাচ্চাদের খেপানো। পাঁচ বছর বয়স অবধি আমার দেহ রীতিমতো স্থূল আর দুই গাল বিশেষ রকম ফোলা ছিল। যেসব বয়োজ্যেষ্ঠরা সেই ফোলা গাল তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে যথেচ্ছ টিপতেন, ছোড়দা তাঁদের একজন। আমার বিরক্তি বাড়াবার জন্য সেই সঙ্গে আমাকে আদরের নাম, তপলু—যা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যেত, সেই নামে ডাকতেন। "আবার তপলু বলে!" বলে ঘোর গর্জন করতাম। ওই গর্জন শোনার জন্যই এই নাটকাভিনয়। সবাই হেসে আকুল হত। সে কৌতুকে অংশ নেওয়ার মতো আমার মনের অবস্থা থাকত না।

ভুইঞা জ্যাঠার বাড়িতে সব সময়ই একটা হইহই আর ফুর্তির পরিবেশ ছিল। এক বীভৎস দুর্ঘটনায় সেই ফুর্তিতে ছেদ পড়ল। ভুইঞা জ্যাঠা একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন আর্তনাদ করতে করতে। দফতরে সিলমোহর করার জন্য 'লা' বা গালা গলিয়ে রাখা হত। জ্যাঠা ভুল করে জুতাসুদ্ধ পা এক ফুটন্ত গালার পাত্রে বসিয়ে দেন। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উনি হাঁটতে হাঁটতেই বাড়ি ফেরেন। সরকারি কর্মচারী, সেই সুবাদে সাহেব সিভিল সার্জন স্বয়ং অস্ত্রোপচার করে জুতা থেকে ওঁর পা মুক্ত করেন। কিন্তু ভুইঞা জ্যাঠা এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই যে শয্যা নিলেন, আর ওঠেননি। আমাদের সন্ধ্যাগুলি নিরানন্দ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ওঁর কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। উনি চুপ করে আমার হাত দুটি ধরে থাকতেন। ওঁর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ত। শুধু চশমার খাপ থেকে বের করে পেপারমিন্ট দেওয়ার পুরনো প্রথাটা শেষ অবধি বজায় ছিল।

যে-মানুষটি হঠাৎ হঠাৎ এসে উদয় হয়ে আমাদের জীবনে আনন্দধাম স্থাপন করতেন তিনি হচ্ছেন শীতল জ্যাঠা। চিত্রকর, গায়ক, অভিনেতা, গল্পকথক, ডাক্তার—অশেষ গুণসম্পন্ন শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় (মাধবী মুখোপাধ্যায়ের দাদামশায়)। এঁর কথা 'রোমন্থন'-এ লিখেছি। কিন্তু ওঁর কথা লিখে শেষ করা যায় না। ঠাকুর্দা অনেক লোককে পালন করেছিলেন। অসাধারণ সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন এই ব্রাহ্মণবটু তাঁদের একজন। ছবি আঁকা, কীর্তন গাওয়া, ছেনিতে খোদাই করে পাথরের মূর্তি গড়া—এসব উনি কারও কাছে শেখেননি। শুনেছি ঠাকুর্দার কাছে ওঁর আঁকা ছবি দেখে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব হ্যাভেলকে চিঠি লিখেছিলেন। হ্যাভেল ওঁকে ইতালি পাঠিয়ে আঁকা শেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু নিতান্তই গ্রামবাসী শীতল জ্যাঠা এই সৌভাগ্য বরণ করার সাহস পাননি। উনি যে লজ্জাবতী লতা ছিলেন এমনও নয়। গ্রামে-গঞ্জে শহরের বাড়িতে বাড়িতে নানা অনুষ্ঠানে উনি কীর্তন করতেন (এ বিদ্যাও কারও কাছে শেখা নয়)। হাজার হাজার লোক শুনতে আসত। আমাদের গ্রামের বাড়ির স্টেজে উনি অভিনয়ও করতেন অসাধারণ। এবং সব সময়ই ওঁকে নায়কের ভূমিকাটি দিতে হত। কিন্তু নিজের সমাজের গণ্ডির বাইরে যেতে উনি ভরসা পেতেন না। তাই বিদেশে চিত্রবিদ্যাশেখা শিল্পী হওয়া ওঁর হল না। ভরণপোষণের যাতে একটা ব্যবস্থা হয় সেই ভেবে ঠাকুর্দা ওঁকে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়ে দেন। সেই সুবাদে উনি এল. এম. এস. ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারির চেয়ে ছবি আঁকার দিকে ঝোঁকটাই বেশি ছিল। ওঁর আঁকা কৃষ্ণলীলা তথা রামসীতা এবং পুরাণ কাহিনির ওলিওগ্রাফ অনেক বাড়িতেই দেখা যেত। রবি বর্মার ধরনে আঁকা, তুলনায় একটু

অপটু হাতে। শৈশবে আমাদের ধারণা ছিল—চিত্রশিল্পের শেষ কথা শীতল জ্যাঠার আঁকা ছবি।

শীতল জ্যাঠার সব ব্যাপারেই একটা মৌলিকতা ছিল। রগুড়ে মানুষটি আমাদের কপট ক্রোধে গাল দিতেন, অভিধা 'মূর্খের ডিম'। উনি বোধ হয় বাবার ঘনিষ্ঠতম আশৈশব বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বাবাও মাঝে মাঝে মূর্খের ডিম বলে বর্ণিত হতেন। শুনেছি ঠাকুর্দাকেও শীতল জ্যাঠা মূর্খের ডিম বলতেন—তবে আড়ালে। মানুষটি সব ব্যাপারেই অ্যাডভেঞ্চারপ্রবণ ছিলেন, এবং অ্যাকসিডেন্টপ্রবণও বটে। শিলংয়ে ম্যাগনোলিয়ার মগডাল থেকে পুষ্প আহরণ করতে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে, কক্সবাজারে সমুদ্রে হাঙরের ল্যাজ চেপে ধরতে গিয়ে (ওঁর ধারণা হয়েছিল—ল্যাজ ধরে থাকলে কোনও মতেই হাঙর মুখ ঘুরিয়ে কামড়াতে পারবে না, শুধু শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা সাঁতারে অনেকটা সমুদ্রবিহার করে নেবেন), কাশীতে পাতার খোলায় ঢেলে দেওয়া দুধের ফেনা হুশ করে চুমুক দিয়ে খেতে গিয়ে গলায় ঠেকে—বারবারই ওঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে। কথাগুলি কল্পনাপ্রসূত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সাক্ষী আমার বাবা। ম্যাগনোলিয়া গাছ থেকে পড়ার সময় শীতল জ্যাঠাকে বাঁচাতে গিয়ে ভাঙা ডাল ওঁর হাতে বসে গিয়েছিল। তার ক্ষতচিহ্ন বাবা বাকি জীবন বহন করেছেন। জ্যাঠার গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, মধুমালা মালঞ্চমালার গল্প উনি মাঝে মাঝে গান করে বলতেন। আর ওঁর pièce de résistance ছিল রাইডার হ্যাগার্ডের 'শী'। বইটা আমি নিজে কখনও পড়িনি। কিন্তু শীতল জ্যাঠার কাছে শুনে মনে হত এই কাহিনি রহস্যরোমাঞ্চর শেষ কথা।

আমাদের কলকাতা প্রবাসের সময় শীতল জ্যাঠার শিল্পপ্রতিভা ব্যবসার কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল। উনি আর বাবা একসঙ্গে একটি পুতুল এবং ম্যানিকিন বানানোর ব্যবসা খোলেন। ওঁদের তৈরি ডামি বেঙ্গল স্টোর্স ইত্যাদি বড় বড় দোকানের শোকেসে দেখা যেত। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলাফল ব্যক্তিগত জীবনে সুখের হয়নি। ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে বাবার সঙ্গে শীতল জ্যাঠার মনোমালিন্য ঘটে। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের জীবন থেকেও আনন্দময় মানুষটি সরে গেলেন। তখন আমরা কলকাতায় ওঁর পাশের বাড়িতেই থাকতাম। হঠাৎ আমাদের গল্পের আসর বন্ধ হয়ে গেল। আহত বিস্ময়ে ঘটনাটা মেনে নিতে হল।

আমাদের সব চেয়ে যিনি আপনজন ছিলেন তাঁর কোনও স্মৃতি আমার নেই। তিনি আমার ঠাকুর্দা, অনারেবল বিনোদকুমার রায়চৌধুরী, মেম্বার, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, কীর্তিপাশার বড় হিস্যার বাড়ির জমিদারির চার আনি অংশের মালিক। আমার আড়াই বছর বয়সে ওঁর মৃত্যু হয়। শুনেছি আমাকেই উনি সব চেয়ে স্নেহ করতেন। ওঁর ভরসা ছিল, ছেলের তৃতীয় সন্তান মেয়ে হবে। আমার আবির্ভাবে অনেক অশ্রুজল ফেলে শেষে তৃতীয় নাতিকে ফ্রক পরিয়ে রেখে নাতনির শখ মেটাতেন। শখ মেটাবার অন্যতম উপায়—কলকাতা থেকে ক্রমাগত বিদেশি চকোলেট আমদানি। ও বস্তু খেয়ে খেয়ে আমার যকৃৎ বিপন্ন হয়েছিল। পরে সেইসব বিচিত্র চেহারার চকোলেটের টিন আমার খেলনা রাখার পাত্র হয়েছিল। ওঁর মৃত্যুর পর আমার মরণাপন্ন অসুখ হয়—কিছুটা ওঁকে না দেখার মনোকষ্টে, কিছুটা দীর্ঘদিন

চকোলেট অতিভোজনের ফলে। ওঁর মুখ আমার মনে পড়ে না, কিন্তু নদীর পাড়ের বাংলো বাড়িটিতে যেন ওঁর উপস্থিতি সব কিছু ছাপিয়ে বিরাজ করত। বাবা, মা, যতি, বসা, ভুইঞা জ্যাঠা, শীতল জ্যাঠা সকলের কাছে ওঁর গল্প এত শুনতাম, চারিদিকে ওঁর এত ছবি ছিল যে, উনি নেই এ কথা কখনও মনে হওয়ার সুযোগ ছিল না। আমার প্রতিবন্ধী বড়দা তরুণ আট বছর বয়সে মারা যান। চোখের সামনে দেবশিশুর মতো সুন্দর প্রথম নাতির মৃত্যু দেখে দাদুর জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। মৃত্যুকামনা করে উনি চান্দ্রায়ণ ব্রত করেন। শুনেছি মাসব্যাপী ব্রত যেদিন শেষ হয় সেদিনই উনি মারা যান। কথাটা সত্যি কি না জানি না।

বড় হিস্যার বাড়ি

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী বৈদ্যবংশের সন্তান দেওয়ান কৃষ্ণকুমার সেন সম্ভবত আঠারো শতকের কোনও সময়ে ভূষণার সত্রাজিত রায়ের বংশধর রায়কাঠির রাজার কাছ থেকে প্রভুভক্তির পুরস্কার হিসাবে কীর্তিপাশা গ্রাম তালুক পান। তাঁর দুই ছেলের নামে তালুকের নাম হয় রাজারাম সেন কাশীরাম সেন তালুক। জ্যেষ্ঠ রাজারাম সম্পত্তির দশ আনা অংশ পেয়ে বড় হিস্যার বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। ছয় আনার অংশীদার কনিষ্ঠ কাশীরামের বংশধররা ছোট হিস্যার বাড়ি বলে পরিচিত হন। চকমিলান মিনি-প্রাসাদটি কখনও বোধ হয় একটি বাড়িই ছিল। দুই হিস্যায় মামলা-মোকদ্দমা লাঠালাঠি নিয়ে ঝগড়াটা জমে উঠলে বার্লিন শহরের মতো মাঝখানে দেওয়াল তুলে এক বাড়ি দুই বাড়িতে পরিণত হয়। দুই বাড়িই প্রায় একই চেহারার দুর্গাদালান আর থিয়েটারের জন্য বাঁধা আটচালায় শোভিত ছিল। শুধু বংশের রক্ষয়িত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি বড় হিস্যার ভাগেই পড়েছিল। এ সব কথাই 'রোমন্থন'-এ লিখেছি। এখানে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করলাম।

যদিও আমরা বরিশালের বাংলো বাড়িতেই বছরের দশ-এগারো মাস থাকতাম, জ্ঞান হওয়া অবধি জানতাম যে, আমাদের সত্যিকার বাড়ি কীর্তিপাশা গ্রামে বড় হিস্যার জমিদারবাড়ি—যেখানে আমরা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। বরিশালের বাড়িটি বাসা মাত্র, নিতান্তই ক্ষণকালের আস্তানা।

প্রপিতামহ প্রসন্ন সেন ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। জানি না, ইংরেজ পরিবারে মানুষ হয়ে ওঁর ইংরাজি কেতার কর্মক্ষমতা জন্মেছিল কি না। উনি সম্পত্তি বহুগুণ বাড়িয়েছিলেন এবং ওঁরই আমলে বড় হিস্যার এক মহলা বাড়ি দুই মহলায় পরিণত হয়। অর্থাৎ একটি চক বা প্রশস্ত উঠোন ঘিরে বড় দোতলা বাড়িটিকে বাড়িয়ে আর একটি মহল অর্থাৎ একই চেহারার দ্বিতীয় চক ঘিরে এক নম্বর মহল সংলগ্ন আর একটি দোতলা দালান তৈরি হয়। বাইরের মহলের প্রশস্ত ছাদে আমার ঠাকুর্দার বসবার একটি ঘর ছিল। তার ঠিক উপরে আর একটি ঘর। সেখানে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হত, পূজার সময় চারতলার ঘরটিতে বাল্যখিল্যদের সারা রাতের আড্ডা জমত।

প্রসন্নকুমার ঢাকা গিয়ে মৌলবিদের কাছে ফার্সি শেখেন। বড় হিস্যার বাড়ির হলঘরে

অনেকগুলি বড় বড় বইয়ের আলমারি ছিল, তার একটি ফার্সি বইয়ে ভর্তি। ওই সংগ্রহটি প্রপিতামহের সময়ে শুরু হয় বলে আমার ধারণা। ওর একটি বড় অংশ লখনউয়ের মুন্সি নওলকিশোরের লিথোপ্রেসে ছাপা, বাকি বইগুলি এশিয়াটিক সোসাইটির Bibliotheca India সিরিজের। প্রসন্নবাবু রেলপথ হওয়ার অনেক আগেই জল এবং স্থলপথে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। ওঁর এই ভ্রমণের নেশা জিন মারফত আমার রক্তস্রোতে কিছুটা পৌঁছেছে মনে হয়। যখনই সুযোগ পাই বিপুলা এ পৃথিবীর নানা জায়গায় পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াই। তবে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রপিতামহ শ্বেতপাথরের আসবাবপত্র এবং বাসনকোসন সংগ্রহ করতেন—মুখ্যত আগ্রা এবং জয়পুর থেকে। জায়গা এবং অর্থের অভাবে ওটা আমার ঠিক হয়ে ওঠে না। বিরাট বিরাট ভড় সেই পাথরের তৈরি আসবাব নিয়ে কীর্তিপাশার খাল অবধি আসত—সোজা আগ্রা থেকে। খাল তখনও যথেষ্ট গভীর বলেই সম্ভব হত। এসব কথা শৈশবে গ্রামবৃদ্ধদের কাছে শুনেছি, তাঁদের শৈশবস্মৃতি হিসাবে।

প্রসন্নবাবু মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান—চারটি পুত্র সন্তান এবং বেশ ক'টি কন্যা সন্তান রেখে। কন্যাদের সদ্বংশীয় স্বজাতি-পুত্র দেখে বিয়ে দেওয়া হত এবং জামাইরা ঘরজামাই হয়ে সেরেস্তায় চাকরি করতেন (এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রর 'জামাই বারিক' দ্রষ্টব্য)। কন্যারা পিতৃগৃহেই থাকতেন। দুর্গাস্তব মারফত বাঙালি হিন্দুমাত্রেই জানেন যে, দেবী নানা রূপে সর্বভূতেষু সংস্থিতা। তবে সাক্ষাৎ মহিষমর্দিনীরূপে সংস্থিতা হওয়ার জন্য বাবার পিসিমাদেরই উনি বেছে নিয়েছিলেন। মর্দনের কাজটা মহিষাসুরের উপর না হয়ে প্রধানত স্বামীদের উপরই হত। এই হতভাগ্যদের দুই একটিকে ছোটবেলায় দেখেছি। তাদের ভীতত্রস্ত চলাফেরায় বিবাহের সুখস্মৃতি চিরকালের মতো মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। নারীবাদীরা role model-এর খোঁজে আমার এই পিতৃ-পিতৃষ্বসাদের জীবন ও চরিত্র সমীক্ষা করতে পারেন। পুরুষশাসিত সমাজ? ওঁদের শাসন করবে এমন পুরুষ দ্বাপর-ত্রেতায়ও জন্মায়নি। স্বয়ং রাবণ ওঁদের দেখলে ইঁদুরের গর্তে ঢুকতেন।

ঠাকুর্দারা চার ভাই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ক্রমে পৃথগন্ন হন। তিন ভাই কীর্তিপাশায়ই থেকে যান। কনিষ্ঠ, আমার ঠাকুর্দা, বরিশালে বাস করতে শুরু করেন। কীর্তিপাশার বাড়িতে চার ভাইয়ের জন্য আলাদা আলাদা কয়েকটি করে ঘর ছিল। দোতলায় চকের একদিকে রেলিংয়ের পাশ ধরে উঁচু বারান্দা, তার পাশে কয়েক সিঁড়ি নেমে এইসব ঘর। এই ঘরগুলিতে পরে চার ভাইয়ের ছেলেরা সপরিবারে বাস করতেন। বারদালানে বিশাল হল ঘর— বড় বড় বইয়ের আলমারি, ঝাড়লণ্ঠন ওরফে শ্যান্ডেলিয়েরে, শ্বেতপাথরের টেবিল আর বেঁটে বেঁটে কিছু সিংহাসন, কিছু তৈলচিত্র—চার ভাইয়ের এবং তাঁদের মা ষষ্ঠীপ্রিয়া দেবীর (উনিও মহিষমর্দিনীর অংশাবতার ছিলেন বলে শুনেছি) আর বড় ঠাকুর্দার শখের ফোটোগ্রাফির 'ফলশ্রুতি' —এক বিশাল ট্রাঙ্ক ভর্তি ফোটোর নেগেটিভ। হলের এক কোনায় আর একটি ট্রাঙ্কে শখের থিয়েটারের জন্য সাজপোশাক, ঝুটা গয়নাগাটি, টিনের তলোয়ার জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র। ভব্যজনদের আপ্যায়ন আর প্রজাদের নালিশ-ফরিয়াদ শোনা এই ঘরেই হয়। 'উত্তরের কোঠা' (বরিশালি উচ্চারণে 'কোডা') নামধেয় বৈঠকখানাটি ছিল

জলসাঘর। লখনউ-বারাণসীর বাইজিদের খেয়াল-ঠুংরির আওয়াজ এবং নূপুর কিঙ্কিণী—এক সময় ওই ঘর থেকেই শোনা যেত। তবে তা আমাদের জন্মের আগে। একতলার সামনের দিকে সারি সারি ঘর—জমিদারির দফতরখানা তথা সেরেস্তাঘর। সেরেস্তার কর্মচারীদের অনেকের ওইখানেই শয়ন। ওই ঘরগুলির পাশেই বেশ জমকালো 'সিংদরজা' অর্থাৎ সিংহদ্বার। প্রতিমা বিসর্জনের দিন এই দরজা দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেবীর নিষ্ক্রমণ হত। আর বিয়েসাদিতে বরকে পালকি চড়িয়ে এই দরজা দিয়েই আনা হত। সিংহদ্বার দিয়ে চকে ঢুকলে ডাইনে দুর্গাদালান—যার পশ্চিমবঙ্গীয় নাম চণ্ডীমণ্ডপ। তার মুখোমুখি আটচালা, শখের থিয়েটারের জন্য বাঁধানো স্টেজ। দেবীদের পূজার সময় ওই আটচালার জমিতে হাড়িকাঠ বসানো হত। আটচালার পেছনে এবং একপাশে মাটির উপরে এবং নীচে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর—অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। পিতল, কাঁসা, পাথর আর রূপার কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন, থিয়েটারের সাজসরঞ্জাম, ঢাল, তলোয়ার, ল্যাজা, সড়কি ইত্যাদি প্রাক-আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এইসব ঘরে রাখা থাকত। হাঁড়ি-কুড়ি যা ছিল তার এক-একটিতে একশো লোকের রান্না হতে পারত। দেবীর ভোগের থালা-বারকোসগুলিও অনুরূপ মাপের। মাটির নীচের ঘরগুলির মধ্যে একটি ছিল 'আন্ধারিয়া কোঠা'। জনশ্রুতি—ওই ঘরে অবাধ্য প্রজা তথা শত্রুপক্ষের লেঠেলদের গুম করা হত।

আমরা বছরে একবার কি দুইবার জলপথে কীর্তিপাশা যেতাম। খুব ছোটবেলায় আমাদের ছয়-দাঁড়ের গ্রিনবোট বা বজরা করে যেতাম। পরে ভাড়া করা কোশ নৌকায়। বরিশাল থেকে কীর্তিপাশা ষোল মাইল। গ্রিন বোটে ওই পথ যেতে প্রায় পুরো একদিন লাগত, আর দুই দাঁড়ের কোশ নৌকোয় আট-দশ ঘণ্টা। কিন্তু ওই নৌকাযাত্রাটাই আমাদের এক মহা উৎসব ছিল। পথে সুজার কেল্লা (যেখানে নাকি ভ্রাতৃযুদ্ধে পরাজিত শাহ সুজা আরাকান পালাবার পথে ক্ষণস্থায়ী মাটির কেল্লা গড়েছিলেন), নলছিটি, ঝালকাঠি বন্দর। নদীর পাড়ে মাঝে মাঝে ক্ষিরাই আর মর্মার ক্ষেত। দুই-ই শসাজাতীয় অতি সুস্বাদু, সবজি বলুন সবজি, ফল বলুন ফল। একটি গোলাকার, অন্যটি জাম্বো সাইজের। নৌকা থামিয়ে ক্ষেতের মালিককে সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে আমরা যথেচ্ছ খেতাম। আর জেলেরা মাঝে মাঝে ইলিশ মাছের জাল তুলত। জালের কালো সুতোর আড়ালে রৌদ্রে উজ্জ্বল রূপার ঝকমকি। ইলিশ মাছ জলের বাইরে দু-এক সেকেন্ড মাত্র বাঁচে। সেই সদ্য ধরা ইলিশ মাছ জেলেদের কাছ থেকে কিনে ভেজে খাওয়া হত। ও বস্তু পেলে দেবতারা তুচ্ছ অমৃত খেতে যেতেন না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

নদী ছেড়ে খাল বেয়ে বড় হিস্যার বাড়ির ঘাটে পৌঁছতাম। সেখানে কর্মচারী মেরধা তথা ভাই এবং কাকাদের রিসেপশন কমিটি তৈরিই থাকত। পৌঁছানো মাত্র 'আইয়া গ্যাছে, আইয়া গ্যাছে' বলে একটা ধ্বনি উঠত। খালের ধারে প্রথমেই চোখে পড়ত ডাঙায় তোলা ভাঙা গ্রিনবোটটি। বড় হয়ে মনে হত ওটি আমাদের অবক্ষয় এবং দুর্ভাগ্যের প্রতীক। পূর্বপুরুষ জমিদারি স্থাপন করেছিলেন, প্রপিতামহ তার সমৃদ্ধি বাড়িয়েছিলেন, ঠাকুর্দা এবং তাঁর দাদারা সেই সম্পদ ভোগ করেছেন, বাবা-জ্যাঠাদের আমলে আমাদের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমুখী। কিছুটা অর্থাভাবে, কিছুটা উদ্যোগহীনতার ফলে সর্বত্রই ভাঙনের চিহ্ন। বজরা

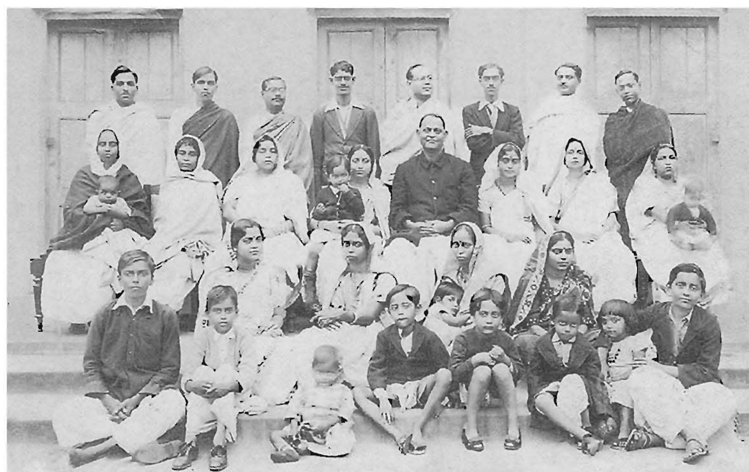
আর সারানো হয় না, শহরের বাড়ির পুকুর সংস্কারের অভাবে মজে যায়। জমিদারভবনের দেওয়াল ফুঁড়ে বট-অশ্বত্থের চারা গজায়। মালিকদের কিছুতেই যেন তাপ-উত্তাপ নেই।

এই প্রসঙ্গে জমিদারি প্রথা সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলতে চাই। এই প্রথা নিয়ে ভালমন্দ অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু Floude Commission-এর রিপোর্ট ছেড়ে দিলে প্রথাটির যে-চেহারা আমি দেখেছি, তার সঙ্গে মেলে এমন বাস্তব বিবরণ আর কোথাও পাইনি। এক-এক জন অদ্ভুত সব কাল্পনিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। একজন লিখেছেন—সারাদিন হেঁটেও তাঁদের সম্পত্তির সীমানা পার হওয়া যেত না। ভদ্রলোক বোধহয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা ভাবছিলেন। আসলে জমিদারি সম্পত্তি ওরকম এক নাগাড়ে একশো-দুশো মাইলব্যাপী হত না। বড় জমিদারিগুলি একটার পর একটা মহাল বা তালুক সংগ্রহ করে গড়ে উঠত। মহাল মানে revenue unit—সরকার বাহাদুরের নথিপত্রে যার জন্য দেয় একটা বাঁধা খাজনা ধরা থাকত। সাধারণত বিশেষ বিশেষ জমিদারির সম্পত্তি যেসব মহাল, তা ছড়ানো ছিটানো থাকত, পরস্পরসংলগ্ন প্রায় কখনওই না। আমাদের কীর্তিপাশা গ্রামের মধ্যেই অন্য তালুকদারের ছিট তালুক ছিল—যা আমাদের সম্পত্তির অংশ না।

জমিদারদের দুরবস্থার সূচনা হয় দুই কারণে। প্রথম কথা বংশানুক্রমে শরিক বা অংশীদারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রপিতামহ একাই মালিক ছিলেন, তাঁর ছেলেরা চার শরিক আর বাবা-জ্যাঠাদের সময় শরিক-সংখ্যা বারো। প্রথাটি বজায় থাকলে আমাদের আমলে সতেরো জন শরিক হত। অথচ সম্পত্তির আয় বাড়ছিল না, কমছিল। কমার কারণ অব্যবস্থা। খাজনা আদায়ের ভার ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হত। তিনি নায়েব-গোমস্তা-তহশিলদারদের উপর নির্ভরশীল। কর্তারা যখন কিছু দেখেন না, পরস্পর শরিকি ঝগড়াঝাটিতে এবং সমাধানহীন দুশ্চিন্তায় মগ্ন, তখন ম্যানেজারের কী দায় পড়েছে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করার? যাঁদের উপর খাজনা সংগ্রহের ভার, তাঁরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু প্রজাদের কাছে কেঁচো। তাঁদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নিজের ট্যাঁকে কিছু পয়সা গুঁজে সস্তায় জমি বন্দোবস্ত করেন। অসহায় দরিদ্র প্রজাদের কাছে নৃসিংহ অবতার। কিন্তু যাদের কিছুই নেই, তাদের কাছ থেকে বেশি কিছু বের করা অসম্ভব। ইংরিজি প্রবাদে বলে—পাথর নিংড়ে রক্ত বের করা যায় না। প্রজার সর্বনাশ হত ঠিকই, কিন্তু জমিদারের ভোগে লাগত না। বাবুরা সবই জানেন। কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা বা উৎসাহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সরকারের খাজনা, সেরেস্তার খরচা এবং ম্যানেজারের মাইনে দিয়ে যা বাকি থাকত তা বারো শরিককে তাঁদের ন্যায্য অংশ অনুযায়ী মাসে মাসে 'অ্যালাউয়েন্স' বা মাসোহারা দেওয়া হত। যাঁদের অংশ এক আনা, তাঁদের 'অ্যালাউয়েন্স' কখনও কখনও দুই ঘরের অঙ্কে নামত। খাজনা আদায় খারাপ হলে সেরেস্তার জমানো টাকা থেকে ধার দেওয়া হত। অথচ এজমালি সম্পত্তির বাঁধা খরচা—মানে জমিদারি ফুটানির বহিঃপ্রকাশ, যথা বিনা প্রয়োজনে ডজন ডজন ঝি-চাকর পালন, পূজা-আর্চা, পুণ্যাহ ইত্যাদিতে ব্যয়বাহুল্য এক চুলও কমানো হত না। কমালে মান থাকে না। আর মামলা-মোকদ্দমা, বিশেষত ছোট হিস্যার সঙ্গে, ক্ষীয়মাণ রোজগারের একটা বড় অংশ শুষে



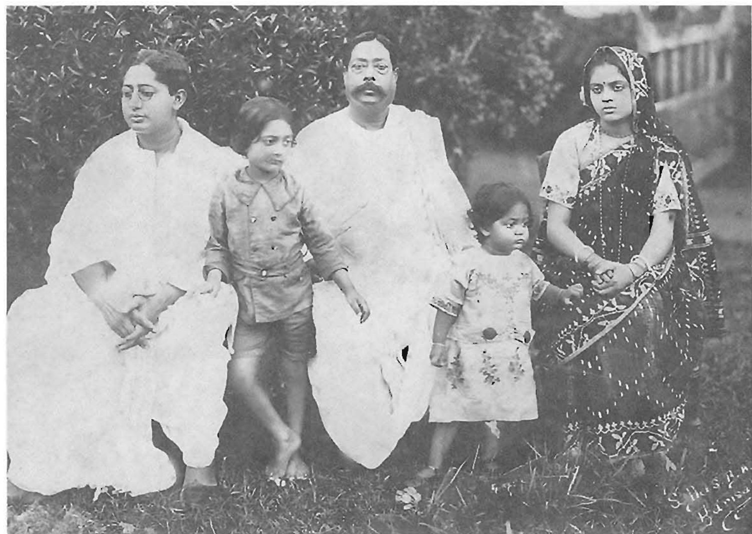
আমার বাবা অমিয়কুমার রায়চৌধুরী



সপরিবারে রায়বাহাদুর ভূধর দাস। চেয়ারে, বাঁদিক থেকে প্রথম, দিদিমা তিলোত্তমাদেবী। মাঝে দীর্ঘতম পুরুষ ভূধর দাস।



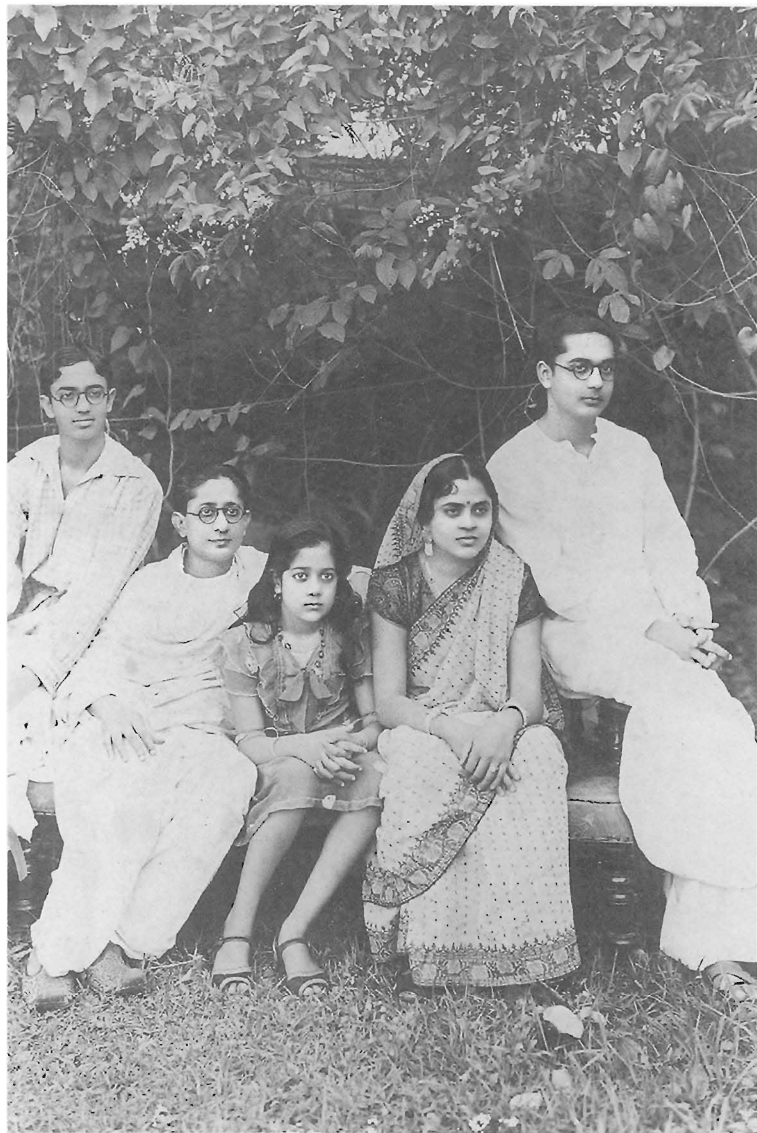
অশ্বপৃষ্ঠে দাদা অরুণ, বরিশালে



বাবা, দাদা অরুণ, পিতামহ বিনোদকুমার, আমি, মা



আমাদের কীর্তিপাশার বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ। বর্তমান অবস্থা।



আমাদের পরিবার। বরিশালের বাড়িতে। বাঁদিক থেকে আমি, বাবা, বোন সুজাতা, মা প্রতিভা দেবী এবং দাদা অরুণ।



আমার ঠাকুরদা বিনোদকুমার রায়চৌধুরী ও ঠাকুমা সরোজিনী রায়চৌধুরানি।



সপরিবারে মেজজ্যাঠা (ডানদিকে)



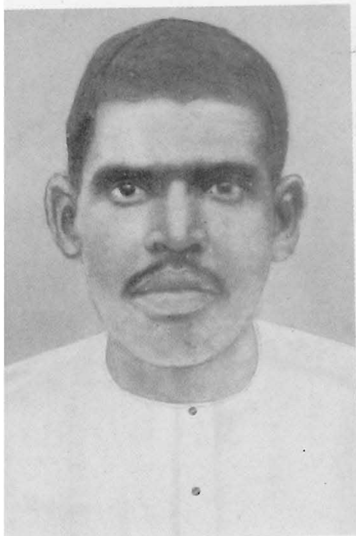
শীতল জ্যাঠা



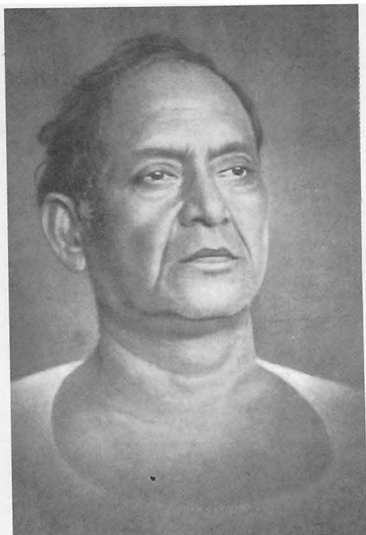
ঠাকুমা সরোজিনী রায়চৌধুরী



ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে তেওতার জমিদার ভবন। কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ি।



অনন্তকুমার সেন



সতীন্দ্রনাথ সেন

বরিশাল জিলা স্কুল

নিত। কর্তারা বছরে দু-তিনবার সম্পত্তি-সংক্রান্ত মিটিংয়ে বসতেন। যত দূর জানি, তাতে ঝগড়াঝাটিই হত, কোনও সিদ্ধান্ত হত না। বেশ কয়েক জন শরিকের সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মতো বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল না। বারবার আলোচনা হয়েছে সম্পত্তি পার্টিশন করে নেওয়ার, যাতে যে যার নিজের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকে তারাশঙ্কর আর বনফুলের কিছু কিছু রচনায় জমিদারি ঐতিহ্যের এক রোমান্টিক চেহারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্যি তারাশঙ্কর তাঁর শেষের দিকের লেখায় জমিদারদের অবক্ষয় এবং অপদার্থতার কথাই তুলে ধরেছেন। কোনও কালে তাঁদের পিতৃপুরুষ গরিব চাষির শ্রমের ফল শুষে নিয়ে চোখধাঁধানো বিলাসিতা করেছেন, ইংরাজ কোম্পানির সুবাদে বেনিয়ানির পয়সায় সম্পত্তি কিনে অভিজাত বনার চেষ্টা করেছেন—এ নিয়ে গৌরব করার হেতু কী, আমি কোনও দিনই বুঝতে পারিনি। অথচ অনেক মধ্যবিত্ত বাঙালিই জমিদার বংশের সন্তান বলে বিশেষ গর্ববোধ করেন। মধ্যস্বত্বভোগী নিম্নমধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরও 'ভূস্বামী' বলে দেমাক করতে দেখেছি।

অন্যের পরিশ্রমের ফল বংশানুক্রমে ভোগ করে নিষ্কর্মা জীবনযাপন করায় গর্বের কী আছে এ প্রশ্নের সত্যিই কোনও সদুত্তর নেই। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদাররা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির বংশধর। পুরনো আমলের রাজা-মহারাজারা বেশির ভাগই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'সূর্যাস্ত আইন'-এর ফলে পথে বসেন। আর রাজা-মহারাজারাও যে সংস্কৃতি এবং সুকৃতিতে উজ্জ্বল জীবন যাপন করতেন এমন না। মাত্র দু-চারজনই এ নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং অভিজাত শব্দটা এলোপাথাড়িভাবে জমিদার পরিবার সম্পর্কে প্রয়োগ করা ঠিক না, এমনকী জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারও কোম্পানির বেনিয়ানদের বংশধর।

ছেলেবেলায় আমাদেরও জমিদারের বাচ্চা বলে বেশ দেমাক ছিল। তার এক কারণ, গ্রামে গেলে চারপাশের লোক এবং 'প্রজাপুঞ্জ' অর্থাৎ রায়তরা আমাদের এত তোলা-তোলা করত যে, মিথ্যা আত্মাভিমান ফুলে ফেঁপে ওঠা ছাড়া উপায় ছিল না। অন্যত্র লিখেছি জমিদার বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাইকে প্রজারা 'মহারাজ' সম্বোধন করত। এটা যে কতটা হাস্যকর তা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। পূজার সময় পাঁচ গ্রামের লোক জমিদার বাড়ি দেখতে আসত। তাদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার ছিল। আর যদিও তখন ঘরে ছুঁচোর ঠিক কীর্তন না হলেও একক সঙ্গীত অবশ্যই শুরু হয়েছে, বাইরে কোঁচার পত্তন কোনও দিক থেকেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বারো মাসে তেরো পার্বণ যথারীতি চলছে। শাক্ত পরিবার বলে প্রতি পূজায়ই পাঁঠাবলি। অষ্টমীতে ১০৮টি। মানবিক কারণে মোষবলির বীভৎসতা বন্ধ হয়েছে (যদিও ছোট হিস্যারা ব্যাপারটা শেষ অবধি চালিয়ে গেছেন—অর্ধাশনে থেকেও), কিন্তু সেই খরচায় এলাহি চালে কাঙালিবিদায় হচ্ছে। আর পূজা-আর্চা, বিসর্জন, পুণ্যাহে রাজকীয় চাল সম্পূর্ণ বজায় আছে। নানা অনুষ্ঠানেই কিংখাবে মোড়া রৌপ্যদণ্ড সমন্বিত রাজছত্র বের হয়। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় রুপার আশাসোটা নিয়ে প্রহরীরা আগে আগে চলে। মেরধারা ল্যাজা-সড়কি হাতে জমিদার-বাড়ি পাহারা দেয়। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ির সামনের মাঠে লেঠেলরা প্রচণ্ড বিক্রমে খেলা দেখায়। সুতরাং রাজকীয় বৈভবে যে কোথাও ঘাটতি পড়েছে, তা গ্রামের দরিদ্র মানুষ কী করে বুঝবে? আর সেরেস্তার আমলা-কর্মচারী, প্রসন্নকুমারের নামে স্থাপিত স্কুলের

শিক্ষকরা (যাঁদের বেতন অনেকটাই জমিদারি সেরেস্তা থেকে আসে) আমাদেরই খরচায় চালু ডিসপেনসারির এল.এম.এস. ডাক্তার—এঁরা যে সুযোগ-সুবিধা পেলেই এসে কিছুটা চাটুকারিতা করবেন, এ আর আশ্চর্য কী? ফলে গ্রামবাসের অভিজ্ঞতা আমাদের মানসিকতার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ছিল না। একটা উদাহরণ দিই। দেশভাগের কয়েক মাস পরে—তখন আমাদের উদ্বাস্তুজীবন শুরু হতে দেরি নেই—বড় হিস্যার বাড়ির হলঘরে আমরা জ্যাঠতুত-খুড়তুত ক'ভাই আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছি। হঠাৎ কালুদা সগর্বে বললেন, "হেয়া যাই কও, এখনও বড় হিস্যার বাড়িতে কেউ একডা বাতকর্ম করলে কীর্তিপাশা গ্রাম কাপ্পিয়া ওডে।" ওঁর সহোদর মনুদা ম্লান হেসে বললেন, "ভাইডি, সেদিন আর নাই।"

বড় হিস্যা পরিবারের বায়বীয় প্রতাপে কালুদার এই অটল বিশ্বাসে ওঁর কোনও উপকার হয়নি। কলকাতার উদ্বাস্তুপল্লীতে নিজের হাতে বানানো ঝুপড়িতে ওঁর জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ কাটাতে হয়।

কিন্তু বাল্য এবং কৈশোরে গ্রামবাসের অভিজ্ঞতা আনন্দময়ই ছিল। অবক্ষয়, আর্থিক সমস্যা, ভবিষ্যতের আসন্ন অন্ধকার আমাদের জীবনে ছায়া ফেলত না। বোধ হয় তার একটা কারণ, আমরা যেতাম উৎসবের সময় অথবা অল্প কয়েকদিনের জন্য ফুর্তি করতে। গ্রামে জীবন বা জমিদারি ব্যবস্থার সমস্যা-সংকটে আমরা, অর্থাৎ অল্পবয়স্করা প্রত্যক্ষভাবে শরিক ছিলাম না। গাড়ি-ঘোড়াবিহীন শান্ত গ্রামজীবনে এক ধরনের নিবিড় শান্তির স্বাদ পাওয়া যেত, ব্যবহারিক জীবনের শত সমস্যা আর সংঘাত সম্ভবত তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারত না। তলিয়ে দেখতে গেলে সে শান্তি হয়তো অলীক। দুঃস্থ প্রজা, সমস্যাপীড়িত জমিদার অথবা তার সামান্য বেতনের কর্মচারী কেউই যে খুব নিশ্চিন্ত সুখের জীবন যাপন করত তা নয়। কিন্তু আমাদের নদীমাতৃক জেলায় জমির উর্বরতা আর নদীপুকুরে মাছের প্রাচুর্যের কৃপায় কেউই ঠিক না-খেয়ে থাকত না। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষও ওই অঞ্চলে মানুষকে ঘরছাড়া করেনি, কারও উপবাসে মৃত্যু হয়নি। দেশবিভাগের পর কিছু একদা-সচ্ছল মানুষ যে ভিক্ষাবৃত্তি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার পিছনে বিশেষ রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কারণ ছিল। মানুষের পেটে ভাত ছিল এবং ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে প্রত্যাশাও ছিল খুবই সীমিত। দরিদ্র বাড়িতেও মেয়েরা গৃহজাত তরিতরকারি আর মাঠ-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা প্রকৃতির তুচ্ছ দানগুলি সুখাদ্যে পরিণত করতেন। ফলে অনেকের জীবনেই এক ধরনের সুখ ছিল—এ কথা বললে বোধ হয় অতিরঞ্জন হবে না। গ্রামে ভেকধারী বোষ্টম ছাড়া কাউকে ভিক্ষা করতে দেখিনি।

বড় হিস্যার বাড়িতে পূজার সময়টা সকলেরই মহা আনন্দের দিন। আমাদের ছোট পরিবারটি বাদ দিলে ওই বাড়ির সবাই আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন যে, বোধনের দিন পুরুতঠাকুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তিন/চার দিন দেবী সপরিবারে আমাদের দুর্গাদালানে উপস্থিত। চালচিত্রে আঁকা শিবও এসেছেন। ওপর থেকে সব কিছু দেখছেন। গল্প শুনতাম—কে এক অবিশ্বাসী কথাগুলি সত্যি কি না পরীক্ষা করতে দেবীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দা দিয়ে কেটে ফেলে। কাটা পা থেকে অঝোরে রক্ত পড়ায় তার সন্দেহ নিরসন হয়।

বহু দূরের সব গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে মানুষ বড় হিস্যার বাড়ির পূজা দেখতে আসত। দুর্গাদালানের সামনে হাড়িকাঠে পাঁঠাবলি হত। একটা গভীর ভয়মিশ্রিত আকর্ষণবোধ নিয়ে দৃশ্যটা দেখতাম। বলির সময়ে চারদিকে ঢাক আর মন্দিরার শব্দে কানে তালা ধরত। তার সঙ্গে ভক্তদের 'মা' 'মা' ধ্বনি। আমার পরম ভক্ত মেজ জ্যাঠা দু' হাত জোড় করে মনে মনে স্তব পাঠ করতেন। আমাদের চোখে যে-দৃশ্য ভয়াবহ, তা দেখে ওঁর দু চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুবর্ষণ হত। আমার সবচেয়ে ফুর্তি ছিল অহিংস বলিতে—যখন হাড়িকাঠ সংলগ্ন মাটির ডেলার উপর লাউ, কুমড়ো, মোচা ইত্যাদি খড়্গাঘাতে কাটা হত। সব শেষে কিছু ফুলও ওইভাবেই কুচি কুচি করে কাটা হত। বলির তরকারিগুলি দীর্ঘাঙ্গ বলে আমি বলতাম 'লম্বাগলি বলি'। সামনের মাঠে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ির সামনে ছোট হিস্যার মোষবলি জীবনে একবারই দেখেছি। মোষটাকে নাকে কানে সর্ষে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তারপর টেনে এনে হাড়িকাঠে জোতা হত। ওই বীভৎস দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখার ইচ্ছে হয়নি। সন্ধ্যায় আরতি। গ্রামের কেউ কেউ আরতিনৃত্যে বিশেষ পটু ছিলেন। কালুদা ধূমায়মান ধুনুচি মুখে বা মাথায় নিয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে ভারী সুন্দর নাচত। পূজার কদিন বাড়ির মেয়েরা স্নান করে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরে প্রতিমা বরণ করতেন। জ্যেষ্ঠা থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত সবাই লাইন করে যেতেন। তারপর একের পর এক প্রত্যেকে সব দেবদেবীদেরই বরণ করতেন। এক অসুর আর বাহনরাই বাদ পড়ত। বিসর্জনের আগে বরণের সময় মেয়েদের অনেকের চোখেই জল। রাত্রে সবাই নৌকা করে বিসর্জন দেখতে যাওয়া হত। ফেরার সময় যাঁরা বেশি ভক্তিমতী তাঁদের চোখের জল আর বাধা মানত না। বাড়ি ফিরে শূন্য দুর্গাদালানে পা মুড়ে বসে পুরুতঠাকুরের ছেটানো শান্তিজল গ্রহণ। তারপর কোলাকুলি, বিজয়ার বিশিষ্ট জলখাবার ভক্ষণ—নাড়ু, নারকেলের চিড়াজিরা, ফুল, গঙ্গাজলি বা পদ্মচিনি, তক্তি যার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। গঙ্গাজলি বা চিড়াজিরা বহুদিনের মধ্যে কারও বাড়িতে আর দেখিনি। ওসব জিনিস বানানোর মতো সময় এবং উৎসাহ মহিলাদের নেই সে কথা বুঝতে পারি। কিন্তু খাদ্যগুলি কি মিষ্টি বা ভাজাভুজি ব্যবসায়ীদের পক্ষেও লাভজনকভাবে তৈরি করা অসম্ভব? বিজয়ার কোলাকুলির সময় একটি গ্রাম্য রসিকতা খুব চালু ছিল। প্রতিমা নামানোর সময় কোনও রসিক তরুণ সিংহের শিশ্নটি সযত্নে সংগ্রহ করতেন। কোলাকুলির পর আশীর্বাদস্বরূপ বস্তুটি তিনি কনিষ্ঠদের কপালে ঠেকিয়ে দিতেন। হাসির হররা উঠত। এই আশীর্বাদ যাতে পেতে না হয়, আমরা সবাই সে বিষয়ে সতর্ক থাকতাম।

গ্রামের বাড়ি যাওয়ার উৎসাহের প্রধান কারণ কিন্তু পূজার ঘটা বা ফুর্তি নয়—ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ভাইবোন কাকা-জ্যাঠা যাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন গভীর ছিল, তাদের সঙ্গলাভ। আর ফাউ হিসাবে পেতাম ইস্কুলের কিছু শিক্ষক, সেরেস্তার কয়েকজন কর্মচারী আর আমাদের বয়সি কয়েকটি ভদ্রসন্তানের সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগ। জমিদারির এজমালি ভৃত্যদেরও কেউ কেউ আত্মীয়র মধ্যেই গণ্য হত। স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্র দত্ত, তাঁর ভাই উপেন, তহশিলদার নসা এঁদের তিনজনকেই আমরা কাকা ডাকতাম। ভাণ্ডারি দামুকেও কাকা ডাকতাম। সকালের অনেকটা সময়ই কাটত কাকা এবং জ্যাঠতুত ভাইদের সঙ্গে বাড়ির সামনে পুকুরের জলে অথবা বাঁধানো ঘাটে। আর দুপুরে খাওয়ার পর আড্ডার প্রধান জায়গা

ছিল মহেন্দ্রকাকার বাড়ি। আড্ডার অকুস্থল বিকালে স্থানান্তরিত হত খালের উপরকার নড়বড়ে সাঁকোর উপর। আর রাত্রে ভাইরা সবাই চারতলার ঘরে জমা হতাম। এদের মধ্যে তিন-চার জনের গানের গলা খুব ভাল ছিল। আমাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বড় জ্যাঠার ছেলে বড়দা কবিতা আর গান লিখতেন। উনি 'মেঘদূতম্' ভারী সুন্দর ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। আমার ধারণা জমিদারিপ্রথা সত্যিই জমিদারদের শ্রেণি হিসাবে নিরুদ্যম করে ফেলেছিল। বড়দা সেই উদ্যমহীনতার শিকার। জীবতত্ত্বে এম.এসসি. পাস করে উনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগে চাকরি করতেন। কিন্তু ওঁর সত্যিকার প্রতিভাপ্রসূত গান আর কবিতাগুলি কখনও প্রকাশ করার চেষ্টাও করেননি। ওঁর সহোদর ভাই রতনদা, মন্টুদাও ভাল গাইতেন। আর জ্যোৎস্নারাতে চারতলার ঘরে সেজ জ্যাঠার ছেলে কালুদা দরাজ গলায় গান ধরত, 'যখন গাহে নীল পরি, বিজন রাতে, আকাশ পথে সঞ্চরি'। নিস্তব্ধ গ্রামের আকাশ-বাতাসে সে-গানের সুর বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেত। বিভাগোত্তর বাংলায় এইসব প্রিয়জনদের কারও জীবনই খুব সুখের হয়নি। রতনদা, মন্টুদা গান শিখিয়ে আর গেয়েই জীবিকা উপার্জন করেছেন, কালুদা বাঙালির সাবেকি পেশা কেরানিগিরি নিয়ে এবং ঝোপড়িবাসী হয়ে।

ইস্কুলটিকে এবং আমাদের বাড়িকে কেন্দ্র করে গ্রামে একটা সংস্কৃতির আবহাওয়া ছিল। শিক্ষকদের কেউ কেউ আমাদের লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত বই নিয়ে পড়তেন। মহেন্দ্রকাকা ভারী সুন্দর ইংরাজি লিখতেন, লেখার ব্যাপারে বাগাড়ম্বর যে দুর্বলতার লক্ষণ, এ কথা উনিই প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ইংরাজি ও বাংলার শিক্ষক দেবকুমারবাবু আধুনিক কবিতা লিখতেন। সব যে খুব রসোত্তীর্ণ হত এমন না। দুটো লাইন মনে আছে : "তুলো বের করা বালিশ। রুগ্ণা স্ত্রীর মতো পালিশ"। উনি রাবীন্দ্রিক আদর্শে নাটক লিখে ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করাতেন—আমাদেরই বাঁধানো স্টেজে। নিজেও অংশ গ্রহণ করতেন। সুন্দর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুপুরুষ এই দরিদ্র মানুষটির কাজেকর্মে ব্যবহারে সব কিছুতেই একটা সুরুচির ছাপ ছিল, হয়তো একটু কৃত্রিমতাও ছিল—কিন্তু তা নিতান্তই বাহ্যিক। উনি কালুদাকে গৃহশিক্ষক হিসাবে পড়াতেন। ওঁর সংস্কৃতিব্যঞ্জক উচ্চারণে 'কালাচাঁদ' ডাকটি আমরা নকল করে বিমল আনন্দ পেতাম। এই প্রসঙ্গে আর একটি মানুষের কথাও লিখি—যাঁকে দেখে মনে হত শরৎচন্দ্র-লিখিত 'দত্তা'র রাসবিহারী চরিত্র সামনে রেখে ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। ওঁর পরনে সূক্ষ্ম খদ্দরের কাপড়। মুখের ভাষা এত মার্জিত এবং সুমধুর যে, তার একমাত্র তুলনা ঢাকার বিখ্যাত মসলিন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে এক অশিক্ষিত জমিদারের ফ্রেন্ড-ফিলসফার অ্যান্ড গাইড হয়ে ঢুকে পড়ে উনি ওই পরিবারের হর্তাকর্তা-বিধাতা হয়ে বসেন। সুচ হয়ে ঢুকে উনি ফাল হয়ে বের হলেন। মূর্খ জমিদার আর তাঁর পরিবার গজভুক্তকপিত্থবৎ পথে নিক্ষিপ্ত হল। ষাটের দশকেও লোকটি বরিশাল শহরে বেশ জাঁকিয়ে বাস করছিলেন।

স্কুলের শিক্ষকরা দু-একজন বেশ বিচিত্র চরিত্রের ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ দরিদ্র জীবনের শূন্যতা পূরণ করতেন বিচিত্র কল্পনার সাহায্যে। বিহারীবাবুর দাবি ছিল—ওঁর যোগসিদ্ধি হয়ে নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতা জন্মেছে। আকাশে উড্ডীয়ন তার একটি। এই সব গুহ্য তথ্য তিনি উপনিষদের মতো শুধু নিতান্ত নিকটস্থ দু-একজনকে জানাতেন, যাঁরা

তৎক্ষণাৎ কথাটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র করতেন। মহেন্দ্রকাকাও ছোটবেলায় ওঁর ছাত্র ছিলেন। একদিন আমরা পুকুরের ঘাটে বসে আছি। কাকা একটু গলা নামিয়ে—যাতে সবাই শুনতে পায়, এইভাবে বিহারীবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"স্যার, কাইল সন্ধ্যাবেলা আপনে পুবদিকে কোথাও গেছিলেন নাকি?" প্রশ্নের অনুক্ত ইঙ্গিত—স্যার আকাশপথে কোথাও গিয়েছিলেন কি না। বিহারীবাবু স্মিত হেসে বললেন, "দেইখ্যা ফেলছ!" সেদিন সন্ধ্যায় তেতালার ঘরে স্কুলের সেক্রেটারি আমার বাবার সঙ্গে বিহারীবাবু দেখা করতে এলেন। ঘুরে ফিরে যোগসিদ্ধির কথাটাই উঠল। স্যার বললেন—সিদ্ধিটা এখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, যোগবলে উনি পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থাও বদলে দিতে পারেন। আমার স্বদেশিপন্থী বাবাকে উনি আশ্বাস দিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনও ওঁর প্রায় ক্ষমতার মধ্যে এসে গেছে। শুধু সাধনায় আর একটু সময় দেওয়া দরকার। পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই সেটা সম্ভব হতে পারে। মাসিক পাঁচ টাকা খরচা বাঁচাতে গিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কয়েক বছর পিছিয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ গ্রামবাসের পর আবার ওই বাড়ির পাশের খাল থেকেই কোশ নৌকা করে শহরে ফিরতাম। বাল্যে বোধহয় অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ ছিলাম। তাই গ্রামের আত্মীয়বন্ধুদের ফেলে আসতে বড় কষ্ট হত। তাঁরাও সব ম্লানমুখে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বরিশাল ফিরে বড় কোঠার মন্টুদাদা আর সেজ কোঠার কালুদাদাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতাম : "পূজার ছুটিটা বড়ই আনন্দে কাটিল। এখন তোমাদের জন্য বড়ই মনোকষ্ট হইতেছে।" বাস্তববাদী দাদারা সম্ভবত এই মনোকষ্ট ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেন না। মন্টুদাদা চিঠির উত্তর দিতেন : "তোমার পত্র পাইলাম। আমরা ভাল আছি। আশা করি তোমরাও ভাল আছ। আমার আশীর্বাদ জানিবা। ইতি—আশীর্বাদক মন্টুদাদা।" আশীর্বাদক মন্টুদাদা বয়সে আমার চেয়ে চার মাসের বড় ছিলেন। আমার বয়স তখন সাত কি আট।

সুহৃদ-বিরহ অসহ্য হলে হঠাৎ সাইকেল নিয়ে কীর্তিপাশা চলে যেতাম—কখনও বাড়িতে বলে, কখনও না বলে। কীর্তিপাশা থেকে প্রত্যাশিত তারবার্তা আসত "Sriman arrived safely"। খবরটা পৌঁছলে বাড়িতে যুগপৎ রৌদ্র এবং হাস্যরসের বান ডাকত। যখন বয়স বছর দশেক, তখন কীর্তিপাশা যাওয়ার এক সঙ্গী জুটল—অক্সফোর্ড মিশনের ব্রাদার কেটলি, যিনি বিশুদ্ধ বরিশালিতে বাক্যালাপ করতেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে গেলে হাঁটতে হত, সাইকেল চড়ায় উনি বিশ্বাসবান ছিলেন না। আর সে কি হাঁটা, ঘণ্টায় চার মাইলের কম নয়, বেশিই হবে। সকাল সাড়ে আটটা-নটায় রওনা হয়ে দুপুরের আগেই পৌঁছে যেতাম। রাত্রে সেজঠাকুমার খাস ভৃত্য অন্তাকে দিয়ে ব্যথায় জর্জর গা-পা টেপাতে হত।

কীর্তিপাশা যাওয়ার অন্যতম আকর্ষণ ছিল মেজঠাকুমা এবং তাঁর রান্না। মেজদাদু কামিনীবাবু স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন এক দরিদ্র বৈদ্য কন্যাকে। ইনিই আমাদের মেজঠাকুমা। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি অল্প বয়সে উনি বিধবা হন। আবেগপ্রবণ দুঃখী মানুষটির সহজেই চোখে জল আসত, আর ওঁর জীবনে চোখে জল আসার কারণের কখনও অভাব ঘটেনি। আমরা গেলে উনি এবং ওঁর ছেলে শম্ভুকাকা যে খুব খুশি হতেন তা বুঝতে অসুবিধে হত না। শম্ভুকাকা আমাদের সাঁতারের সঙ্গী ছিলেন।

আর ঠাকুমার খুশির অন্যতর এবং আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক প্রকাশ ছিল পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে আমাদের খাওয়ানোয়। সামান্য তরিতরকারি হাতের গুণে যে কী অমৃততুল্য হয়ে উঠতে পারে, ওঁর রান্না যে খেয়েছে সেই বুঝেছে। পরবর্তী জীবনে ফরাসি দেশে এবং চিনে শ্রেষ্ঠ রাঁধুনিদের রান্না খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সত্যি বলছি, মেজঠাকুমার রান্নার সঙ্গে তুলনা হয়, আহারের ক্ষেত্রে এমন কোনও অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। হলফ করে বলতে পারি—এ কথা শুধু নস্টালজিয়া-প্রসূত নয়।

আমার সঙ্গে কীর্তিপাশা অভিযানে অনেক সময়ই সঙ্গী হতেন কেটলি সাহেব এবং আমার দু-একটি মুসলমান বন্ধু। মেজঠাকুমা নির্দ্বিধায় এঁদের ওঁর ঘরে—যার এক দিকে ঠাকুর পূজার আর অন্য দিকে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা—আমার পাশেই পাত পেড়ে খাওয়াতেন। এ নিয়ে ওঁর মনে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এমন ভাবার কোনও কারণ কখনও হয়নি। কেটলি সাহেব কীর্তিপাশা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝেই থেমে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন, 'আইজ ঠাকুমার রান্না খামু' বলে। নাচানাচি করার মতো ব্যাপারই বটে।

ঠাকুমার চোখের জল কখনও থামেনি। বড় হিস্যার জমিদারবাড়ি ছেড়ে শেষ বয়সে উনি উদ্বাস্তুজীবন যাপন করেন—কলকাতায় ছেলের ভাড়া করা একটি ঘরে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এক সুপুরুষ স্মার্ট ডাক্তারের সঙ্গে। রূপহীনা হাবাগোবা মানুষ খুকনিপিসি জগদীশ গুপ্তর যোগ্য স্ত্রী ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভদ্রলোক মধ্যপ্রাচ্যে যান এবং সেখান থেকে ফিরে পূর্বপরিচিতা এক সুন্দরীকে বিবাহ করেন। দেশভাগের কিছুদিন পরে পিসির ছেলেটিকে রেখে দিয়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওঁকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে ওঁর বৈমাত্রেয় ভাই ব্যারিস্টার শশাঙ্ক সেনের (আমাদের নিনুকাকা) দরজায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। কিছুদিন পর ছেলেটি মাথা খারাপ হয়ে মারা যায়। শেষ জীবনে খুকনিপিসিরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর পিসির বেজায় খুশি খুশি মুখটা মনে পড়ে। আধুনিকমনা ডাক্তার ভদ্রলোকটি কেনই-বা ওঁকে বিয়ে করতে গেলেন, আর পরে কী করে এত নির্মম হলেন—এ সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাইনি।

কক্সবাজার : সমুদ্রের স্বাদ

চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে একটি মনোরম শহর আছে। ইংরাজ সরকারের এক কর্মচারী, মিস্টার কক্স-এর নামে মহকুমা শহরটির নাম ছিল Cox's Bazar। বাঙালি উচ্চারণে নামটি দাঁড়িয়েছিল ককসোবাজার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকেরা হাওয়া বদলাতে যেমন পশ্চিমে গিরিডি, মধুপুর, ঘাটশিলা যেতেন, তেমনই সমুদ্রের সন্ধানে যেতেন পুরী এবং কক্সবাজার। কক্সবাজারই ইংরাজ রাজত্বের আগে আরাকান রাজের রাজধানী রোসঙ্গ। আধা বৌদ্ধ আধা মুসলমান রোসঙ্গের মগ-নৃপতি জ্ঞানীগুণী সভাসদ সংগ্রহ করে বিক্রমাদিত্যের সভা বসিয়েছিলেন। এই সভারই অন্যতম সভ্য, কবি আলাওল কাব্যে আত্মপরিচয় লেখেন :

"রোসঙ্গেতে গুণীজন যতেক আছেন্ত।
তালেব আলিম বলি আদর করেন্ত ॥"

তালেব বা তালিব—যার বহুবাচনিক রূপ তালিবান বলতে আমেরিকান ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা বিভাগ সৃষ্ট আফগান গুন্ডাবাহিনী বোঝাত না—কথাটার অর্থ শিক্ষাব্রতী, অতএব সভ্য মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। অনেক কোশেশ করে এই সুন্দর শব্দটি পশুধর্মী কিছু দ্বিপদের অভিধায় পরিণত করা হয়েছে। সতেরো শতকে তালেব আলিম পূর্ণ রোসঙ্গ শহর বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শাহজাহান-নন্দন শাহ সুজা ভ্রাতৃযুদ্ধে হেরে এইখানে আশ্রয় নেন। এবং আশ্রয়দাতার রাজ্যটি দখল করার ষড়যন্ত্র করায় সপারিষদ আক্রান্ত এবং নিহত হন। তাঁর মেয়েদের নিয়ে চালু রোমান্টিক কাহিনিটি কবির সুমিষ্ট ছোট গল্প 'দালিয়া'র বিষয়বস্তু। কিন্তু আসলে কী ঘটেছিল তার তালাশ পাই ওলন্দাজ কোম্পানির কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে। মর্মন্তুদ কাহিনি। আধা বৌদ্ধ আরাকানরাজকে পারিষদরা বলেন, মেয়েদের রক্তপাত নিষিদ্ধ, তথাগতর নিষেধ আছে। তাই ধর্মপ্রাণ নরপতি ওঁদের পানাহার বন্ধ করে দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেন। ভদ্রলোক নারীর রক্তপাতরূপ পাপ থেকে রেহাই পেলেন। মানুষের করুণা আর ধর্মবোধ কখন কী রূপ নেয় বলা কঠিন।

সতেরো শতকে স্পেনের ইনকুইসিটররাও করুণাপরবশ হয়েই ধর্মভ্রষ্টদের পুড়িয়ে মারত। এ যুগে নবজন্মপ্রাপ্ত খ্রিস্টান বুশ সাহেবের করুণায় ইরাকের কী হাল হয়েছে সেটাও বিবেচনা করুন।

এই ইতিহাসকথার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্মৃতির কোনও সম্পর্ক নেই। কারণ কক্সবাজারের সঙ্গে আমার পরিচয় এইসব ঘটনার প্রায় তিনশো বছর পরে। আমাদের এবং সেবকবৃন্দ নিয়ে বাবা-মা যেসব জায়গায় 'চেঞ্জ'-এ যেতেন, কক্সবাজার তাদের মধ্যে প্রধান। শিলংয়ের গল্পও অনেক সময়ই শুনতাম। কিন্তু ওই পার্বত্য শহরটির কোনও স্মৃতি আমার নেই। অচেনা পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ কক্সবাজারে। সে পরিচয় বিস্ময়, ভয় আর বর্ণনাতীত আনন্দে ভরা। ১৯৭৪ সনে আর একবার কক্সবাজার গিয়েছিলাম—চট্টগ্রাম থেকে আবাল্য বন্ধু সামসুল হুদার সঙ্গে, একটা জিপ চালিয়ে। পথটি আগাগোড়াই স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষতচিহ্নে ভরা ছিল। ৬০ মাইল পথ যেতে বারো ঘণ্টা লেগেছিল। 'পথ' শব্দটা সৌজন্যবশত ব্যবহার করছি। মনে হয়েছিল—অন্তহীন খানাখন্দ পার হয়ে কক্সবাজার পৌঁছলাম। সেখানে তখন বড় বড় হোটেল হয়েছে, যার একটিও ত্রিশের দশকে ছিল না। তবে '৭৪ সনে সেসব হোটেলে অতিথি বিশেষ ছিল না। এতদিনে নবলব্ধ সমৃদ্ধিতে জায়গাটি গোল্লায় গেছে বলে আমার ধারণা।

'৩০-এর দশকের কক্সবাজার নিতান্তই ছোট শহর, গ্রাম বললেও খুব ভুল হয় না, পরিষ্কার, ছিমছাম জায়গা। বাংলার চেয়ে আরাকান-বর্মার ছাপই তার বহিঃ এবং অন্তঃপ্রকৃতিতে বেশি। চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে করে আমরা কক্সবাজার যেতাম। বন্দর নয়, তাই পাড়ের কাছ অবধি পৌঁছানো যায় এমন জাহাজঘাটা ছিল না। জাহাজ সমুদ্রেই নোঙর ফেলত। সেখান থেকেই বিস্ময়ের শুরু। এই সেই সমুদ্র যার পার দেখা যায় না, যেখানে

বড় বড় ঢেউ উঠে নৌকাটাকে বিষম দোলাতে থাকে, আর দূরে যে-জল দেখা যায় তার রং নীল! যে-সমুদ্র রামচন্দ্র শাসন করেছিলেন? যার উপর বানররা সেতু বন্ধন করেছিল? এমন অদ্ভুত জিনিসও পৃথিবীতে আছে? আর আমি তা স্বচক্ষে দেখছি? জাহাজ থেকে ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে যে নৌকায় নামলাম সেও বা কী বিচিত্র। এ আমাদের বজরা বা কোশ নৌকা না, নানা রঙে রং করা সাম্পান। দাঁড়িরা রঙিন লুঙ্গি পরা মগ। এরাই সমুদ্রবিহারী জলদস্যু—শীতল জ্যাঠার কাছে শুনেছি। বাচ্চাদের ধরে দাসব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। কখনও কখনও কেটেও ফেলে। আমাকে বেচে দেবে না তো? আমি তো কোনও কাজই করতে পারি না। আমার মতো ক্রীতদাস দিয়ে লোকের কী সুবিধে হবে? অ আ ক খ লেখা আর রান্নাবাড়ি খেলার জন্য কেউ ক্রীতদাস পোষে? তবে কেটে ফেলতে পারে! ভরসার কথা এরা তো আফ্রিকার মানুষখেকো না! শুধু শুধু কেটে কী লাভ হবে? তবে ছোট হিস্যার ওরা যে মোষবলি দেয়, সেও তো খাবার জন্য না। একটু মা'র কাছ ঘেঁষে বসি। কী জানি ওদের দেবী হয়তো মানুষবলি পছন্দ করেন। কিন্তু মাঝির লাল সবুজ ডোরাকাটা লুঙ্গিটা বড় সুন্দর। ওরকম কি একটা আমি পাব? হঠাৎ খেয়াল হল মগরা বিদেশি। এই আমি প্রথম বিদেশি দেখলাম। 'অগো' বেঙ্গি, 'মগো' বেঙ্গি, জগদীশ্যা, কালুদা, মন্টুদা কেউ কখনও বিদেশি দেখেনি। অবিশ্যি সাহেবরাও বিদেশি। কিন্তু ওরা তো ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের রাজা হয়ে বসেছে। তাই আর ঠিক বিদেশি নেই।

এইসব চিন্তা করতে করতে নগার কাঁধে চেপে সমুদ্রতীরের কাছেই যেখানে আমাদের জন্য বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, সেদিকে চলেছি। কত বালি আর বালিয়াড়ি। বালিয়াড়িগুলি প্রায় চাঁদমারির মতো উঁচু, একটু বেশিও হতে পারে। ওই রকম বালির উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লে ব্যথা লাগবে না একটুও। সমুদ্রের পাড়ে জায়গায় জায়গায় অল্প জল জমে আছে। ওখানে কি গামছা দিয়ে মাছ ধরা যাবে? আর পলাশ ফুলের মতো টকটকে লাল ওগুলি কী? আমরা কাছে আসতেই বালির নীচে পালাল। নগা বলল, "কাঁকড়া অছি।" কাঁকড়া! এত সুন্দর? লাল ফুলের মতো দেখতে? হঠাৎ নগা কাঁধ থেকে আমাকে নামাল। সামনেই একতলা কাঠের একটা বাড়ি। পুরো বাড়িটা কাঠের তৈরি হয়? বিস্ময়ের শেষ নেই।

মালপত্র নামানো শেষ হলেই বাবা সবাইকে তাড়া লাগালেন—"চল, সমুদ্রে স্নান করে আসি।" সঙ্গে শীতল জ্যাঠাও এসেছেন। উনি বললেন, "ওরে সব মূর্খের ডিম। তাড়াতাড়ি কর। সমুদ্র শুখাইয়া গ্যালে আর নাইতে পারবি না। অগস্ত্য মুনি আইল বল্লিয়া।" অগস্ত্য মুনি এসে সমুদ্র শোষণ করবেন এই আশঙ্কায় আমরা তাড়াতাড়ি করি। সমুদ্রের কাছাকাছি পৌঁছে হাত-পা পেটে ঢোকার অবস্থা। এত জল! এর যে তীর নেই। আর কত বড় বড় ঢেউ! কী বিপদেই পড়লাম! বাবা শক্ত করে হাত ধরে আছেন। উপেন্দ্রকিশোরের 'ছোটদের রামায়ণ'-এ দেখা রামচন্দ্র-কর্তৃক সমুদ্র-শাসনের ছবি স্মরণ করি। নিজেকে রামচন্দ্র কল্পনা করে সাহস সংগ্রহের শেষ চেষ্টা করি। কীসের কী! হঠাৎ একটা বড় ঢেউ এসে বাবার হাত থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিল। বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন আমরা বোধহয় মাত্র এক ফুট জলে দাঁড়িয়ে। ঢেউটা এসে পাড়েই আছড়ে পড়ল। কিন্তু কে কাকে বোঝায়? 'ভ্যাঁ ভ্যাঁ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরে গেল। শীতল জ্যাঠা চোখ পাকিয়ে সংক্ষেপে বললেন, "মূর্খের ডিম।"

যতিদিদি এসে কোলে তুলে নিল। সমুদ্রস্নান এবং সমুদ্র-শাসনের সেই ইতি।

কিন্তু সমুদ্রের প্রতি সভয় অনুরাগেরও সেই থেকেই শুরু। এখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্র দেখে কাটাতে পারি। কোনও ক্লান্তি বা বিরক্তি আসে না। আর কক্সবাজারে সমুদ্রস্নানই একমাত্র ফূর্তির উপায় ছিল না। জোয়ারের জল এসে সমুদ্রসৈকতের অনেকটাই কিছুক্ষণের মতো গ্রাস করত। ভাটার সময় জলরেখা স্বস্থানে ফিরে গেলেও জায়গায় জায়গায় জল জমে থাকত। সে জল আমার সাইজের মানুষের কোমর, কোথাও কোথাও গলা অবধি উঠত। যতিদিদির সাহায্যে আমার সমুদ্র-শাসনের উচ্চাশাটা ওই অল্প জলেই সারতাম। বেশ আত্মতৃপ্তি হত। মানে যে সাপের শিং নেই, দাঁত নেই, তাকে তেড়েমেড়ে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা আর কী! ওই জলে গামছা দিয়ে যেসব মাছ ধরা যেত, সেগুলি সবাই খুব ছোট না। একটি ছ ইঞ্চি মতো সাইজের মাছ ছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছিল পোটকা মাছ। কারণ তার পেট টিপে ধরলে সে শরীরটাকে ফুলিয়ে একটি টেনিস বলের মতো গোলাকার করে ফেলত। পোটকা মাছের আগ্রাসন শক্তি আমাদের জানা ছিল না। সে একদিন যতির হাত কামড়ে দিল। হাত ফুলে আকারে ও আয়তনে স্ফীত পোটকার সঙ্গেই তুলনীয় হয়ে উঠল। তৎসহ যতির আত্মবিলাপ। "ওরে বাবারে, পোটকা মাছের বিষ আছে রে।" এই শোকগীতিকে শীতল জ্যাঠা কীর্তনে পরিণত করলেন। সকালবেলা ঘুম ভাঙত সেই করুণ রসময় মাথুর শুনে, "ওরে বাবারে, পোটকা মাছের..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

সমুদ্রপাড়ের বালিয়াড়িগুলিও অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি। ওইখানেই আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান, ম্যালোরি-আরভিনের মতো পাহাড়ের চূড়ার কাছে মেঘ আর কুয়াশার আড়ালে অন্তর্ধান। বিয়োগান্ত কাহিনির নায়কের ভূমিকায় নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আর সহানুভূতিতে মন ভরে যেত। বালিয়াড়ির অন্যতম আকর্ষণ সোনকুঁচের ঝোপ। এক অংশ লাল এক অংশ কালো এই অতিক্ষুদ্র জিনিসটি স্যাকরাদের ব্যবহার করতে দেখেছি সোনা ওজন করার জন্য। শুনেছি সব সোনকুঁচেরই সমান ওজন—এক রত্তি। এর চেয়ে কম ওজনের কোনও জিনিস নাকি নেই—বালুকণা ছাড়া। ওটা যে ঝোপঝাড়ে জন্মায় এই বিস্ময়কর তথ্য আমার জানা ছিল না। বালিয়াড়ির দ্বিতীয় বিস্ময়—ওদের অস্থিরমতিত্ব। আজ এখানে রয়েছে, কাল সকালে তার চিহ্নও নেই। হাওয়ায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আর সমুদ্রতীরে বিস্ময়ের কি শেষ আছে? এত টকটকে লাল কাঁকড়া আর কোথাও দেখিনি। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওদের কাছে গিয়ে ধরে ফেলার কায়দাটা বসা সহজেই আয়ত্ত করে ফেলল। তারপর সুতোয় বেঁধে আমাদের বারান্দার রেলিংয়ে তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হত। কোনও মতে নড়েচড়ে ওরা পরস্পর কাছাকাছি এসে জড়াপোটলা হয়ে থাকত—বোধ হয় বন্দিদশায় স্বজাতির কাছে সান্ত্বনার আশায়। দৃশ্যটা আমার ভাল লাগত না। কিন্তু বসার এই নিষ্ঠুর খেলা থামানো যেত না। সমুদ্রপাড়ের আর এক বিস্ময় ছিল জেলিফিশ—যাদের পরিধি এক আঙুল থেকে তিন-চার ফুট অবধি। ওদের প্রায়স্বচ্ছ শরীরে নানা রঙের খেলা। আর ছিল কং। কাঠুয়া জাতীয় কোনও প্রাণী। এদের পেছনে শক্ত একটি কাঁটা—ওদের আত্মরক্ষার আয়ুধ। এরা আমার সমুদ্রভীতির অন্যতম কারণ। কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে সব চেয়ে বড় আনন্দ ছিল কড়ি কুড়ানো। ঢেউয়ের সঙ্গে কত বিচিত্র আকার এবং রঙের কড়ি,

শঙ্খ, ঝিনুক যে ভেসে আসত—তার কেউ হিসাব করেনি। আমাদের বরিশালের বাড়িতে দুটি কাচের আলমারি ভর্তি কড়ি, ঝিনুক আর শঙ্খ ছিল। সবই কক্সবাজার থেকে সংগ্রহ করা। বোধ হয় কোনও দুটি কড়ি এক চেহারার ছিল না।

ছোট শহরটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল ক্যাং অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির বা প্যাগোডা। এর সেবায় যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন, হলুদ কাপড় পরা সেই কৌমার্যব্রতী পুরোহিতগোষ্ঠী বা ভিক্ষুদের স্থানীয় নাম ছিল ফুঙ্গি। মন্দিরে সারি সারি কাঠের বুদ্ধমূর্তি। দুপুরবেলা কাঠের বারকোশে জল নিয়ে মূর্তিদের স্নান করানো হত। এই পুণ্যকার্যে আমরাও অংশ নিতাম। 'ওঁ' 'ওঁ' ধ্বনি তুলে বুদ্ধমূর্তির মাথায় জল ঢেলে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ বোধ হত। বুদ্ধকে স্নান করানোর মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ যাকে দেওয়া হয়েছে, সে যে সম্পূর্ণ সাবালক এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? বাড়ি ফিরে অবশ্যি সাবালকত্বটা নাকচ হত। বুদ্ধমন্দিরে যে ব্যক্তি বুদ্ধের সেবক, বাড়ি ফিরে সে স্বয়ং বুদ্ধত্ব দাবি করত। আত্মার বিবর্তন হয়ে সম্বোধি লাভ একদিন সব জীবাত্মারই হবে— এ তো জানা কথা। প্রজ্ঞা একটু তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে কারও কারও ক্ষেত্রে ৮৪ কোটি জন্মের অনেক আগেই বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি যদি ঘটে তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন? কক্সবাজারের ভাড়াটে বাড়ির স্নানাগারে নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা যে-দেহে তখন বাস করছেন, সেই সাড়ে তিন ফুট উঁচু দেহটি বদ্ধ পদ্মাসনে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হত। আর ফুঙ্গির ভূমিকায় নগা এবং বসা ওঁ ওঁ ধ্বনি তুলে বোধিসত্ত্বর মাথায় জল ঢালত। সে এক পবিত্র মুহূর্ত। প্রজ্ঞাটা পাঁচ বছর বয়সে লাভ হয়ে যাওয়ায় একটা সুবিধা হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে বহু বজ্জাত নানাভাবে জ্বালিয়েছেন, তাতে খুব বিচলিত হইনি। হলে পাগল হয়ে যেতাম।

সপ্তাহে এক বা দুদিন বুদ্ধ মন্দিরের কাছে হাট বসত। ফল, তরিতরকারি, বাসনকোসন, জামাকাপড় সবই এখানে পাওয়া যেত। হাটুরেরা অনেকেই মেয়ে—জাতিতে মগ, বর্মি আর পার্বত্য উপজাতীয়। নাক একটু চেপ্টা, কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর—বিশেষত বর্মিরা। আর তাদের পোশাক? বর্ণবৈচিত্র্যে এমন নয়নমনোহর দেহসজ্জা আর দেখিনি। এখনও মনে হয় রঙের ছটায় বর্মি মেয়েদের পোশাক সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। ওই পোশাকের উপর বড় লোভ ছিল। লুঙ্গি তো ওরা মেয়েপুরুষ সবাই পরে। একটা পেলে বেশ হত। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি—রঙিন ফিতেয় বাঁধা একটি প্যাকেট আমার বিছানার উপর রয়েছে। খুলে দেখি—লাল ডোরাকাটা সবুজ রঙের একটি ক্ষুদ্রকায় সিল্কের লুঙ্গি। আমার এক মার্কিনমুলুকবাসী একদা দরিদ্র বন্ধু মাঝে মাঝেই নিজের জীবন পর্যালোচনা করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন, "আমার কী সৌভাগ্য!" ওঁকে বলতে ইচ্ছে করে, পাঁচ বছর বয়সে কক্সবাজারে আমার সেই লুঙ্গিলাভজনিত সৌভাগ্যর সঙ্গে ওঁর বহু লক্ষপতি হওয়ার সৌভাগ্যর কোনও তুলনা হয় না। কারণ সৌভাগ্যর উপলব্ধিটা নিতান্তই সাবজেকটিভ (কথাটার উপযুক্ত মানে ইংরাজি না জেনেও বোঝা যায় এমন বাংলা প্রতিশব্দ কারও জানা থাকলে জানাবেন)।

কক্সবাজারের হাটে আমার জন্য যে আরও কল্পনাতীত সৌভাগ্য তোলা আছে, সে কথা আমার জানা ছিল না। এক সুপ্রভাতে শীতল জ্যাঠা বললেন, "চল, মূর্খের ডিমেরা। হাটে

লইয়া তগো বেচ্চিয়া দি।" দাদা আর আমি ওঁর দুই হাত ধরে হাটের দিকে রওনা হলাম। ওখানে ডিমের চাহিদা কিছু আছে দেখেছি, কিন্তু মূর্খের ডিমের একেবারেই নেই, ফলে আমরা নিশ্চিন্ত। শীতল জ্যাঠা অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা এক পার্বত্য রমণীর বেসাতির সামনে নিয়ে আমাদের দাঁড় করালেন। তাঁর পণ্যবস্তু দেখে আমি হতবাক। এমন জিনিসও পৃথিবীতে আছে, আর তা হাটে বিক্রি হয়। এ তো সোজা আলিবাবা কাহিনির চল্লিশ দস্যুর গোপন দৌলতখানা থেকে আমদানি। শীতল জ্যাঠা বললেন, "দ্যাখছো? হিরার লাঠি।" তাই বল, না হলে লাঠিতে এত বিচিত্র রং, সূর্যের আলো এরকম ঠিকরে বের হয়! দাদা বরাবরই সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ, সহজে ভুলত না (পরবর্তী জীবনে এক ব্যবসা করতে গিয়েই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করায় সর্বস্বান্ত হয়েছিল)। সে বেপরোয়াভাবে বলল, "হিরা না ছাই। রঙিন তার দিয়ে মোড়া।" শীতল জ্যাঠা চোখ পাকড়ে ধমকালেন। "চুপ কর, মূর্খের ডিম।" দরদস্তুর করে চার আনা দিয়ে আমাকে একটি হিরের লাঠি কিনে দেওয়া হল। দার্শনিক সন্দেহপ্রবণতার ফলে কী হারাইতেছে দেখে দাদা দুশ্চিন্তিত : "আমি?" —"ক্যান, তারের লাঠি দিয়া তুই কী করবি?" দাদা কেঁদে ফেলে আর কী। শীতল জ্যাঠা এবারকার মতো মূর্খের ডিমকে ছেড়ে দিলেন। তারও একটি চার আনা মূল্যের হিরার লাঠি লাভ হল।

'৪৮ সালে যেদিন বরিশাল ছেড়ে আসি, সেদিন জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেখি মরচে পড়া তারে জড়ানো ফেলে দেওয়া লোহার লাঠিটি আলনার পেছনে কাত হয়ে পড়ে আছে। ভাবলাম—ওর আর আমাদের অবস্থা একই দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ এক দিন বেশ ভোর ভোর সময়ে দেখি একটা ঝরঝরে গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে প্রস্তুত। কিছু বাক্স-পেঁটরাও দেখলাম নামানো হয়েছে। যতি এবং নগা-বসা সহ আমরা সবাই প্রস্তুত। শুনলাম আমরা হিমঝরা যাচ্ছি। সেখানে বনবিভাগের ডাকবাংলো আছে। সেখানে থেকে বাবা পাখি শিকার করবেন। ওখানকার বনমোরগ বিখ্যাত—সৌন্দর্যে এবং সুখাদ্য হিসাবে। বুনো শুয়োরও আছে—তবে তাদের দাঁত বেশ দশাসই। তাদের শিকার করা এবং তাদের হাতে বা দাঁতে শিকার হওয়া, দুটোই সম্ভব ঘটনা। ফলে মা ফতোয়া দিয়েছেন— শিকার-টিকার যা করতে হয়, ডাকবাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে থেকে। নিতান্তই নাবালক দুটি ছেলে আছে। অবুঝ লোকের হাতে পড়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে (এই প্রসঙ্গে দুর্ভোগের তালিকাটা আর একবার শুনতে হত), দুর্ভাগ্য আর বাড়তে দিতে উনি সম্পূর্ণ নারাজ।

ধুঁকতে ধুঁকতে থামতে থামতে ঠেলতে ঠেলতে আমাদের পুষ্পক রথ যখন হিমঝরার ডাকবাংলোয় পৌঁছাল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। নানা অচেনা জন্তু বা রাতপাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বাবা বেশ খুশি খুশি মুখে বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "একটু ঘুরে আসি।" মা বললেন, "না।" ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা বুঝলেন, এই 'না'-র আর 'হ্যাঁ' হওয়া সম্ভব নয়। বন্দুকটা তুলে রেখে দিলেন।

বন কখনও এর আগে দেখিনি। বন না অরণ্য। সমুদ্র যদি ভয় বা বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দেখা এই অরণ্য আরও যেন অভিভূত করল। এমন বনেই তো তাড়কা রাক্ষসী আর তার সহচরদের বাস ছিল। মুনি-ঋষিরা আগুন জ্বেলে তবু

ওদের কিছুটা তফাতে রাখতেন। আর রাম-লক্ষ্মণ কাছাকাছিই থাকতেন। দরকার হলে বিশ্বামিত্রকে দিয়ে খবর পাঠালেই এসে পড়তেন। নিজেকে বোঝাই—আরে ওগুলো তো গল্প, তাছাড়া দণ্ডকারণ্য থেকে হিমঝরা অনেকটা পথ। আর রাক্ষসরা কি মোটর গাড়ির চেয়ে তাড়াতাড়ি চলে? হোক সে লঝ্ঝর গাড়ি। কিন্তু আর যারা আছে শুনেছি? বাঘ, ভালুক, দাঁতাল শুয়োর? পরিত্রাণের ভরসা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঝে শুয়ে থাকি। চোখ খুললেই তো ওদের দেখতে পাব।

চোখ যখন খুললাম, পৃথিবীর চেহারা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আলোকের ঝরনাধারায় স্নান করে হিমঝরা তখন নন্দনকানন। পৃথিবীতে এত রূপও আছে! এত নানা রঙের পাখি, এত বিচিত্র বুনো ফুল। শহরের বাড়ি ছেড়ে কেন আমরা এই স্বর্গরাজ্যে বাস করি না? মুনি-ঋষিরা তো ফলমূল খেয়ে দিব্যি থাকতেন, রাম-লক্ষ্মণ তার সঙ্গে কিছু হরিণের মাংসের কাবাবও খেতেন। বড়রা কেন যে কী করে, ভেবে পাওয়া যায় না। পিকনিকের জন্য কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আমরা ঝরনা দেখতে বের হলাম। সে আর এক বিস্ময়। ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে জল নেমে আসছে তীব্র বেগে। মাঝে মাঝে সূর্যালোক যেখানে পড়েছে সেদিকে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে। মা'র ফতোয়া উপেক্ষা করে বাবা ওই হিমশীতল জলে নামলেন। "উনি কি কথা শোনার মানুষ?" (এই বিরক্তি প্রকাশের পেছনে প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল—এ কথা আমরাও বুঝতে পারতাম।) কিন্তু যখন আমাদেরও জলে নামাবার চেষ্টা হল, তখন মা সত্যিই বাধা দিলেন। "ছেলে দুইটারে মারতে চাও?" —"তয় তুমিই আসো" বলে এক হ্যাঁচকা টানে বাবা মা'কে ঝরনায় নামালেন। "কী পাগলের হাতেই যে কাকা দিলেন!" খুশিতে উজ্জ্বল মা'র তরুণ মুখটি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

হিমঝরা বাসের এই তীব্র আনন্দের শেষ দিনটায় একটা বিঘ্ন ঘটল। সন্ধেবেলা আমরা ডাকবাংলোয় ফিরলাম। বাংলোর পাশেই এক ঝাউগাছে একটি বনমোরগ বুক ফুলিয়ে এসে বসল। সে যেন ভয়ডর কখনও শেখেনি। 'উচ্চ শির উচ্চে রাখি সমুখে করে আঁখিপাত।' পাখিরও এত রূপ এর আগে কখনও দেখিনি। উজ্জ্বল সোনালি রঙের পালকের মাঝে মাঝে সবুজ আর লালের খেলা। মাথায় টকটকে লাল ঝুঁটি। আর পালকগুলি যেন সেই সকালেই কেউ মেজে ঝকঝকে করেছে। ময়ূরের রূপও এর কাছে তুচ্ছ। হঠাৎ রসভঙ্গ হল, 'দুম' করে একটি গুলির আওয়াজ। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করতে করতে পাখিটা উড়ে গেল। সেই আর্তনাদ আজও কানে বাজে। পাশে তাকিয়ে দেখি বন্দুক হাতে বাবা, মুখের ভাব অপরাধক্লিষ্ট। মা বলছেন, "এমন সুন্দর প্রাণীটারে তুমি মারতে পারলা।" মারতে উনি পারেননি। পাখিটা আহত হয়েছে শুধু। সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর হয়। বিকারের ঘোরে নাকি বারবার প্রশ্ন করি, "পাখিটা কোথায় গেল?" বাবা আর কখনও শিকারের জন্য বন্দুক ধরেননি।

অনেকদিন পর ঢাকায় বসে বাংলাদেশের পরিচালকদের করা কয়েকটি ছবি দেখি। তার মধ্যে একটি ছবি ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষস-খোক্কসের গল্প নিয়ে। বেশ ছবি, তবে দু-একটা ভুলচুক ছিল। যেমন রাজকন্যা আয়নার সামনে বসে প্রসাধন করছেন। প্রসাধন দ্রব্যের আধারটির উপর লেখা Pond's Cream। অবশ্যি রূপকথার রাজকন্যা Pond's Cream মাখবেন না, এমন কোনও শাস্ত্রীয় বিধান নেই। কিন্তু যে ঘটনাটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা

বোধ হয় একেবারেই চলে না। বনের ভিতর থেকে রাক্ষসের গর্জন শোনা যাচ্ছে, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মাঁনুষের গঁন্ধ পাঁউ'। (শুনলাম বাংলাদেশের পরিচালকরা নাকি হিমঝরাতেই অরণ্যের দৃশ্যগুলো তুলেছিলেন। আমার শৈশবের ভয়টা নিতান্ত অমূলক ছিল না।) রাক্ষস বন থেকে বেরিয়ে এল। বেশ ভয় করার মতো চেহারা। মুলোর মতো দাঁত, কুলোর মতো কান, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তার সঙ্গে বেমানান না। কিন্তু হঠাৎ রসভঙ্গ হল। রাক্ষসকে ঢাকা দিয়ে একটি ট্রাক চলে গেল। ট্রাক আর রাক্ষস? এদের সহাবস্থান বোধ হয় কোনও শিল্পশাস্ত্রই অনুমোদন করবে না।

কক্সবাজারে ফিরে একদিন সকালবেলা দেখলাম বাড়ির আবহাওয়া অন্য রকম। সকলেরই মুখ গম্ভীর কিন্তু শান্ত। কোনও বিরোধ বা অশান্তির ছায়া নেই। বাবা অন্য দিনের মতো খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন। অতিরিক্ত মাথায় একটি গাঁধী টুপি। মা'র পরনেও খদ্দরের শাড়ি। নগা কোথা থেকে খদ্দরের একটা ফতুয়া জোগাড় করেছে, ওরও মাথায় গাঁধী টুপি। বারান্দায় আমরা সকলে পা-মুড়ে বসলাম। মা দুটো গান করলেন, "বল বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" আর 'গান্ধী-গান্ধী বলে রব উঠল জগতে'। তারপর হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসন কিছু নিয়ে আমরা সমুদ্রের পাড়ে গেলাম। সেখানে কটা ইটের উপর হাঁড়ি চাপানো হল, নীচে কাঠকুটো আর খবরের কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। নগা মহা উৎসাহে সমুদ্র থেকে নোনা জল তুলে এনে হাঁড়িতে ঢালল। জল শুকিয়ে এলে নুনটা তুলে নিয়ে একটা মাটির পাত্রে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ধ্বনি, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়।" আমরাও চেঁচালাম, "জয়"। নগা বলল, "ইংরাজ সরকার নিপাত গেল।" দাদা মুরুব্বিয়ানা চালে আমাকে বুঝিয়ে দিল, "আমরা লবণ আইন অমান্য করলাম।" কথাটার অর্থ বুঝতে কয়েক বছর কেটে গেল। সমুদ্রের পারে আরও কিছু মেয়ে-পুরুষ সমুদ্রের জল এনে নুন তৈরি করছিল। দুটি পুলিশপুঙ্গব বালির উপর দাঁড়িয়ে এইসব ক্রিয়াকর্ম দেখছিল, বোধ হয় ওদের উপর হুকুম ছিল কাউকে কিছু না বলার। ওইদিনে উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে ডাণ্ডির সমুদ্রতীরে গাঁধী এবং তাঁর অনুগামীরা ইতিহাস রচনা করছিলেন।

প্রবাসে দৈবের বশে

বাংলা ভাষায় ছাপা প্রথম আত্মচরিতের লেখক দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্মোপলক্ষে বিদেশ বাস করতে হয়েছিল বলে অনেক আফসোস করেছেন। বিদেশ মানে কৃষ্ণনগর, ওঁদের পৈতৃক গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে। ১৯৩২ বা '৩৩ সালে এই দুর্ভাগ্য আমার কপালেও ঘটল। তার বেদনা যে কত তীব্র হতে পারে বয়স্ক মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন। ১৯৪৮ সনে বরাবরের মতো দেশত্যাগের সময়ও অত কষ্ট হয়নি।

বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখ ধরা পড়তে অনেক সময় চলে গেল। শেষে বোঝা গেল টাইফয়েড। বাড়িতে তিনটি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে মা একা। কীর্তিপাশায় খবর

পাঠানো হল। সেখান থেকে মেজজ্যাঠা আর নিজের গ্রাম থেকে শীতল জ্যাঠা এসে গেলেন। যত দূর জানি, টাইফয়েডের বিশেষ কোনও চিকিৎসা তখন ছিল না। শীতল জ্যাঠা এবং জেলার সিভিল সার্জন দু'জনেই বললেন, প্রাণের আশঙ্কা আছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়াই সমীচীন হবে। জ্বর একটু কমতেই শীতল জ্যাঠার সঙ্গে আমরা সবাই কলকাতা গেলাম। কবে ফেরা হবে ঠিক নেই। চোখের জলে বুক ভাসল। কিন্তু সামনে ঘোর অনিশ্চয়তা, সমূহ বিপদ। নির্বোধ ছেলেটার কান্নার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় কারও নেই। শুধু দাদা আড়ালে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিল, "কেঁদো না, ক'দিন পরেই আমরা পালিয়ে আসব।"

মা-বাবার সঙ্গে যাচ্ছি, সঙ্গে নগা, বসা, ধর্ম, এমনকী শীতল জ্যাঠাও আছেন। তবে কান্না কীসের জন্য? সে কথা কে বুঝবে? রাত্রে শোবার ঘরে জানলা দিয়ে হাসনুহানার ঝাড় থেকে যে গন্ধ আসে, কলকাতায় তা কোথা থেকে পাব? আর আঁকশি দিয়ে যে রোজ আঁশফল পাড়ি, যা নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে, তার কী হবে? ঘোড়ারা ততদিনে মরে গেছে, কিন্তু গোয়ালে যে দুটো গাই আর পাটকিলে রঙের বাছুর আছে, আমাকে ছাড়া তাদের চলবে? আর মেনার সঙ্গে দুপুরের পর রোজ কিস্‌সা আর নাচ-গানের আসর। হাসমাতালির কাছে ফুলগাছের তত্ত্ব নেওয়া। ছোট বউদি আর বুচিদিদির তৈরি নাড়ু ভক্ষণ, নদীতে শু-র হুস করে ভেসে ওঠা দেখা, মটফল নিয়ে মগো বেঙ্গির সাহায্যে পোলাও রান্না, ঠিকাবাসায় জুড়ানবাবু আর নায়েব মশায়ের সঙ্গে আড্ডা—কলকাতা নামের সেই বিশাল অচেনা বিচ্ছিরি শহরে এই চেনা পৃথিবীটা কোথায় হারিয়ে যাবে! ওখানে কি গুবরে শালিক আছে? আর বেজি আর কুখখা পাখি? সারাদিন মনের দুঃখে কাটে। রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি। দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, "বড় হয়েছ এখন। কাঁদতে নেই।"

কলকাতা আমার সম্পূর্ণ অচেনা ছিল না। দাঁতে পোকা ধরায় বাবা একবার কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলেন—দাঁত তোলাতে। ছিলাম পিসেমশায় কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ি। তেওতার জমিদার ভবন। ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে বিশাল বাড়ি। অবশ্যি আমাদের গ্রামের বাড়িও কিছু ছোট নয়। কিন্তু শিশুরও status-চেতনা থাকে, বয়স্করা তা খেয়াল করেন না। ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের ওই বিশাল বাড়িতে আমি হীনম্মন্যতায় ভুগতাম, পিসতুত বোনেরা মফস্বলবাসী গেঁয়ো ছেলেটাকে একটু করুণার চোখে দেখত। আর সাক্ষাৎ ডাকাত ছিল আমার পিসতুত ভাই। বয়সে সে আমার চেয়ে দু-আড়াই বছরের ছোট। উহ্‌, কী বজ্জাত, কী বজ্জাত! খেতে বসলে থালায় জল ঢেলে দিচ্ছে, পিঁপড়ে ধরে এনে মাথায় ছেড়ে দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই আঁচড়াচ্ছে খিমচোচ্ছে—সে এক মহামারী কাণ্ড। সাতদিনে আমার জান কয়লা করে ছেড়েছিল। পরবর্তীকালে ইনি ট্রেড ইউনিয়ান নেতা, রাজ্য সভায় C.P.I. দলের সভ্য কল্যাণশঙ্কর রায়। তিন বছর বয়সে যে-ব্যক্তি মানুষকে নাজেহাল করার আর্ট সম্পূর্ণ রপ্ত করে ফেলে, সে যে পরে রাজনৈতিক নেতা হবে এ আর বিচিত্র কী? কল্যাণ শুধু আত্মীয় না, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার অকালমৃত্যুটা এখনও ঠিক মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু তিন বছর বয়সে তার কীর্তিকলাপ স্মরণ করলে এখনও হৃদকম্প হয়।

প্রথম দর্শনে কলকাতা আমার হৃদয় জয় করেনি। অত লোকজন গাড়িঘোড়া গোলমালে

আমি এক অদ্ভুত আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। সেই আতঙ্ক চলে গিয়ে গভীর অনুরাগে পৌঁছাতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। মনোভঙ্গির দিক থেকে আমি শুধু ছেলেবেলায় না, পরিণত বয়সেও মফস্বলবাসী বাঙালই ছিলাম। এখনও কিছুটা রয়ে গেছি—গভীর কলকাতাপ্রীতি সত্ত্বেও।

পাঁচ বছর বয়সে প্রথম কলকাতা দর্শনের কয়েকটি স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। সম্পূর্ণ যুক্তিহীনভাবে তার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে প্রথম হচ্ছে লিফ্‌ট। আমার চকোলেটের কৃপায় পোকায় খাওয়া দাঁত ফেলাতে বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন বিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার আর আহমেদের কাছে। ভয়টা কাটানোর জন্য ওঁর ধর্মতলার সার্জারিতে যাবার আগে আমাকে সোডা ফাউন্টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গোলাপি রঙের রোজ মিল্ক শেক খেয়ে মনে হয়েছিল পৃথিবীতে এর চেয়ে আরও বেশি সুখ বোধ হয় সম্ভব না। তারপর লিফট চড়ে ডেন্টিস্টের সার্জারি। এ কী আশ্চর্য ঘটনা? আস্ত একখানা ঘর হুস করে উপরে উঠে গেল? অগো বেঙ্গি, মগো বেঙ্গি, জগদীশ্যা কি এই গল্প শুনে বিশ্বাস করবে? ডেন্টিস্টের ঘরে ঢুকে কোন মহাবীরের না হৃদকম্প হয়? চেয়ারে বসিয়ে মুখে গ্যাগ্‌ দিয়ে দিলে ভীমই কি খুব স্বস্তিবোধ করতেন? কিন্তু সমস্ত ভয় নিরসন করে ডক্টর আহমেদ ইথার স্প্রে দিলেন। আহ্‌ কী ঠান্ডা। কতগুলি দাঁত তুলে ফেলা হল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। দাঁত তোলার পর বীরদর্পে পিসিমার বাড়ি ফিরে এলাম। "দাঁত তোলার সময় কাঁদোনি?" সদর্প এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য উত্তর, "না।" পিসতুত বোনেরা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক। ছেলেটা হাবা হলে কী হয়, সাহস আছে! বাবা সন্ধেবেলা হাবা ছেলেটা আর বোনদের নিয়ে ম্যাডান থিয়েটারে গেলেন—ইংরাজি সিনেমা দেখতে। কী ঘটছে তার একবর্ণও না বুঝতে পারলেও রুপোলি পর্দার উপর মানুষজন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে—এই অচিন্তনীয় ঘটনার আমি দর্শক, কথাটা ভেবেই আমি আত্মহারা। তারপর ইন্টারভেলের সময় সবাইকে নিয়ে বাবা গেলেন ব্রাসেরিতে। ধপধপে সাদা সুগন্ধ আইসক্রিম এল, রুপার মতো ঝকঝকে বাটিতে। এত ঠান্ডা যে ধোঁয়া উঠছে মনে হয়। এত সৌভাগ্যও আমার কপালে লেখা ছিল? এ কি স্বপ্ন, এ কি সত্য, এ কি মায়া? কিন্তু মানুষের ভাগ্য—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। এক চামচে হিমশীতল আইসক্রিম মুখে দিতেই, সদ্য তোলা দাঁতের গোড়ায় তীব্র যন্ত্রণা, ফলে আমার হাহাকারে আকাশ-বাতাস পূর্ণ। পিসতুত বোনেরা হেসে গড়াচ্ছে। এত অপমান জীবনে কখনও সইতে হয়নি। কলকাতা-ভ্রমণ আমার কাছে বিষ হয়ে গেল।

কিন্তু দ্বিতীয়বার কলকাতা যাত্রার পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ আলাদা। বাবার চিকিৎসার জন্য যাওয়া হচ্ছে। ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারছি, ওঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখি মা চোখ মেলে শুয়ে আছেন। যতি দিনের মধ্যে দশবার বলে, "ঠাকুরের পায়ে ধর। বল বাবাকে ভাল করে দিতে।" এসব কথার পেছনে যে বিপদের কালো ছায়া তাকে চিনতে অসুবিধে হয় না। জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে। কারও মুখে হাসি নেই। সবাই গলা নামিয়ে কথা বলে। মেজজ্যাঠা আর শীতল জ্যাঠা সব সময় বাবার ঘরে থাকেন। মেজজ্যাঠা সুকুমার রায়ের লেখা নতুন বই, 'আবোল তাবোল' নিয়ে এসেছেন। বাবাকে পড়ে শোনান। ও ঘরে আমাদের যাওয়া বারণ। মাঝে মাঝে বাবা ডাকলে দু-এক মিনিটের জন্য

গিয়ে দাঁড়াই। বাবা অনেক রোগা হয়ে গেছেন। রোজ দাড়ি কামানো হয় না। চোখ লাল। ওঁকে দেখে কেমন যেন মনে হয় অপরিচিত মানুষ। অস্বস্তি লাগে।

এই থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে একদিন আমরা সত্যিই কলকাতা রওনা হলাম। শীতল জ্যাঠা সঙ্গে চলনদার। মেজজ্যাঠা আগেই চলে গেছেন। ওঁরা এখন কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন—মেয়ের লেখাপড়ার সুবিধে হবে বলে। আমরা প্রথমে গিয়ে ওদের বাড়িতেই উঠব। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে স্টিমারঘাট রওনা হলাম। ভুইঞা জ্যাঠা আর নেই। কিন্তু জ্যেঠিমা আর দাদা-দিদিরা অনেক আদর করলেন। সেরেস্তার কর্মচারীরা আর খেলার সাথী সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। মেনা চোখের জল ফেলছে, হাসমাতালিরও মুখখানা বেজার। স্টিমারে উঠে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমার বেজায় কান্না পেল। আর কি কখনও বরিশাল ফিরব? যদি ফিরিও তা কবে? দাদা বোধ হয় অবস্থার গুরুত্বটা আমার চেয়ে ভাল বুঝছিল। কিন্তু সে কখনও কলকাতা যায়নি। কলকাতা দেখার উৎসাহ তার কম না। সুতরাং তারও কান্না পাচ্ছিল কি না জানি না। স্টিমারের ডাইনিং রুমে ও বেশ রসিয়ে চিকেন কারি খেল। আমার তখন কিছুই খেতে ভাল লাগত না। ডাল-ভাত খেয়ে কেবিনের বাঙ্কবেডে শুয়ে রইলাম।

স্টিমারে খুলনা, সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদা। শিয়ালদায় পিসেমশায় আমাদের নিতে এসেছিলেন। ওঁদের হিলম্যান গাড়ি করে সোজা কালিঘাট—প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে মেজজ্যাঠার বাড়ি। তার পাশের বাড়ি আমাদের জন্য ভাড়া করা ছিল। সে বাড়ি গোছানো হলে কদিন বাদে আমরা উঠে গেলাম।

পাষাণকায়া রাজধানী আমার যেন গলা টিপে ধরত। বাড়িতে থমথমে আবহাওয়া। কোনও খেলার সাথী নেই। নগা-বসা সঙ্গে এসেছে। কিন্তু তারাও একটু জোরে কথা বললেই ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করতে বলে। বাড়ির থেকে বের হওয়া যায় না। বিকেলবেলা নগা বা বসা কিছুক্ষণের জন্য কালীঘাট পার্কে নিয়ে যায়। এটা কোনও বেড়াবার জায়গা? ঘাস উঠে যাওয়া মরা মরা একটা মাঠ, চারপাশে ভাঙাচোরা রেলিং, মাঠে কয়েকটা নোংরা নোংরা বেঞ্চি আর গোটা দুই দোলনা। কোথায় আমাদের নদীর পাড়ের সারি সারি ঝাউগাছ, ধানের ক্ষেত আর বেল্‌স্ পার্কের সবুজ ঘাস আর কোথায় এই খয়া খয়া পার্ক। বাড়িতে বাবা কেমন আছেন বুঝতে পারি না। পিসেমশায় একদিন মস্ত লম্বা এক ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। শুনলাম ইনিই ডক্টর বিধান রায়। তিনিও বিশেষ কিছু না বলে চলে গেলেন।

দিন পনেরো পরে বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। সবাই বেশ খুশি খুশি, শীতল জ্যাঠা নিজ মূর্তি ধারণ করেছেন। ডেকে বললেন, "শোন্ সব মূর্খের ডিম। যা বাপেরে দেইখ্যা আয়। বেশি জ্বালাইস না কইলাম।" মনে হল, আমাদের মাথার উপর অন্ধকার একটা মেঘ জমেছিল—সেটা যেন কেটে গেছে।

কিন্তু বিপদ কখন কোন দিক থেকে আসবে তা কি কারও আগে থেকে জানা থাকে? একদিন সকালবেলা মেজজ্যাঠা এসে বললেন, "অতু-তপু, এই দিকে শোনো। এদিক-ওদিক কোথাও যাইও না। শহরে কলেরা লাগছে। কর্পোরেশনের লোক আইবে ইনজেকশন দিতে।" ইংরাজি শব্দটার অর্থ আমার জানা ছিল না। ব্যাপারটার অভিজ্ঞতা আগে নিশ্চয়

হয়েছিল, কিন্তু তা আমার স্মৃতির অংশ ছিল না। কিন্তু দাদার মুখ দেখে বুঝলাম—সামনে ঘোর বিপদ, মহতী প্রণষ্টি। মেনার একটি প্রিয় গান স্মরণ হল, 'দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার কর নাইয়া।' কিন্তু এই মহা সঙ্কটে কে আমাদের পার করবে? ধ্রুব-প্রহ্লাদকে এ রকম সিচুয়েশনে বিষ্ণুও নানা চেহারা নিয়ে এসে বাঁচিয়ে দিতেন। কিন্তু আমরা কি সে রকম পুণ্যবান? আর বিষ্ণু হঠাৎ নৃসিংহমূর্তি ধরে এলে কি ভাল হবে? তিনি যে শুধু ইনজেকশানবাবুকেই সংহার করবেন এমন তো কোনও কথা দেননি। কিন্তু দাদা ছেলেমানুষ হলেও সহজে হার মানার পাত্র না। সে আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল, যেখানে অন্য কেউ নেই। বলল, "চল আমরা সন্ন্যাসী সেজে পালিয়ে যাই।" "গেরুয়া কাপড় পাব কোথায় আমরা?" "সব সন্ন্যাসীরা গেরুয়া পরে না। গায়ে ভস্ম মেখে কৌপীন পরলেই হবে।" "ভস্মই বা কোথায় পাব? আর কৌপীনও কি আমাদের আছে?" "ভস্ম আর কয়লার গুঁড়ো একই জিনিস। কৌপীনের দরকার নেই, ইজার পরলেই চলবে।" কলকাতার রাস্তায় ইজার-পরিহিত কয়লার গুঁড়াবৃত দুই বালক সন্ন্যাসী কল্পনা করে আমার চোখে জল এল। কপালে এত-ও ছিল? একে তো বাড়ি ছেড়ে এই যাচ্ছেতাই জায়গায় এসে পড়েছি। তার উপর আবার সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষে করে খেতে হবে? সকালবেলা ওভালটিনের সঙ্গে থিন অ্যারারুট বিস্কুট খাওয়া আমার অভ্যেস। কেউ কি আর বিস্কুট ভিক্ষে দেবে? কিন্তু তখন শিরে সংক্রান্তি। প্রাণ বাঁচানো নিয়ে কথা। সুতরাং দ্বিরুক্তি না করে, গায়ের জামা খুলে রেখে দাদার পেছন পেছন কলঘরের পাশে কয়লাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। গুঁড়ো কয়লা কিছু এদিক ওদিক ছড়ানো ছিল। মুখে গায়ে তার কিছু মাখলাম। পরিকল্পনা হল—ইনজেকশানবাবু এসে চলে গেলে সন্তর্পণে রাস্তায় বের হয়ে পড়ব। কিন্তু বিপদ কি প্ল্যান-মাফিক আসে? ইনজেকশানবাবু এসে পড়ামাত্র অতু-তপুর ডাক পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন পাওয়া গেল না, তখন যতি এক মারাত্মক সিদ্ধান্তে পৌঁছাল—ছেলে দুটোকে নিশ্চয়ই ছেলেধরায় নিয়েছে। সিদ্ধান্তটা মারাত্মক এই জন্য যে, ওটায় পৌঁছানমাত্র যতির স্বভাবসিদ্ধ শোকসঙ্গীত শুরু হয়ে গেল, "ওরে বাবা রে! ছেলে দুটোকে মেরে ফেলবে রে! আমি কোথায় যাব রে!" সেই সঙ্গীত যে কতটা হৃদয়, কর্ণ এবং মস্তিষ্ক বিদারক ছিল তা যে না শুনেছে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না। শিশু-চরিত্র-বিশারদ শীতল জ্যাঠা কিন্তু চট করে ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। যতিকে বললেন, "চ্যাঁচাইও না, নিশ্চয়ই ইনজিকশনের ভয়ে পলাইছে।" বলে একটুও সময় নষ্ট না করে সোজা কলঘরে উপস্থিত। তারপর দুই নবীন সন্ন্যাসীর কান ধরে সাধারণ্যে উপস্থিত করা হল। সবাই হেসে খুন। ইনজেকশান তো নিতে হলই। তার উপর অপমানের একশেষ।

কলকাতার নিরানন্দ-জীবনে একমাত্র ভরসা শীতল জ্যাঠাই। উনিই শত কাজের মধ্যেও সময় করে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, পরেশনাথ অর্থাৎ পার্শ্বনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যেতেন। কিন্তু এত গাড়িঘোড়া আর মানুষের ভিড়ে কিছুই ভাল লাগে না। রাস্তায় বের হলেই গাড়ি চাপা পড়ার ভয়ে কুঁচকে থাকি। তার উপর ছেলেধরার ব্যাপারটাও আছে। যতি বিপদটা সম্যকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। ছেলেধরারা নাকি ছেলে চুরি করে নিয়ে প্রথমেই

হাত-পা ভেঙে দেয়, তারপর রাস্তায় বসিয়ে দেয়— ভিক্ষে করার জন্য। রাস্তায় হাত-পা ভাঙা ভিখিরি তো রোজই দেখি। এরা সবাই ছেলেবেলায় চুরি গিয়েছিল—তাতে আর সন্দেহ কী? তবে সকলেরই হাত-পা ভেঙে দেয় এমন না। কেউ কেউ আড়কাঠিদের কাছে বিক্রি হয়ে আসামের চা বাগানে চালান হয়। সেখানেও জীবন কিছু সুখের না। রোজ সকালে ছোট হাজরি খেতে খেতে চা-কর সাহেবরা কুলিদের পঞ্চাশ ঘা বেত মারে। যেদিন কলকাতা রওনা হয়েছি, সেদিনই জানি কপালে অনেক দুঃখ আছে। দাদা পারসপেকটিভ প্ল্যানিং-এ বিশ্বাসী ছিল। চুরি যাওয়া এবং হাত-পা ভাঙার মধ্যে যে কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে তার সদ্ব্যবহার করে কীভাবে পালানো যাবে, তার সব অব্যর্থ উপায় বের করেছিল। তার কিছু কিছু আরব্যোপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের কাহিনি থেকে সংগৃহীত। এইসব শলা-পরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতাম। কিন্তু ইনজেকশান-বিভ্রাটের পর আর কিছুতেই বেশি ভরসা পেতাম না। বাকি জীবনটা হাত-পা ভাঙা অবস্থায় ভিক্ষে করেই কাটাতে হবে একথা স্থির জেনে হৃদিস্থিত হৃষীকেশের কাছে বীতরাগ হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলাম। ভদ্রলোক যদি ভিক্ষায় বা চা-কুলির কাজে নিযুক্ত করবেন মনস্থির করে থাকেন, তবে তাই-ই করতে হবে।

এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটু আশার আলো দেখা গেল। বাবা কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। ডক্টর রায় বলেছেন—চেঞ্জে যেতে। কিরণশঙ্করবাবুদের কার্শিয়াং পাহাড়ে একটা বাড়ি আছে। সেখানেই যাওয়া স্থির হয়েছে। 'চেঞ্জ' কথাটা আমার কাছে অপরিচিত না। 'চেঞ্জ' মানেই তো ককসোবাজার আর না দেখা শিলং। আমার চেতনায় ককসোবাজার তো স্বর্গের পরেই সেকেন্ড প্লেস। স্বর্গ দেখা হয়নি ফলে ফার্স্ট প্লেসও হতে পারে। কার্শিয়াংও ওই রকমই কিছু হবে। শুনলাম ওখানে সমুদ্র, বালিয়াড়ি, লাল কাঁকড়া এসব নেই। তবে বাড়ির সামনেই নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে একটা বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যায়। বরফ জিনিসটা অচেনা না। অসুখবিসুখ কিংবা ঠান্ডা পুডিং খাওয়ার শখ হলে স্টিমার কোম্পানি থেকে করাতের গুঁড়োয় ঢাকা বরফ চটের ছালায় করে আনা হত। চাঁদমারির পাহাড় (উচ্চতা বিশ ফুট) ওই বরফের গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিলে কী রকম দেখতে হবে— কল্পনা করার চেষ্টা করি। যা হোক, এই যাচ্ছেতাই জায়গা কলকাতা শহর থেকে তো পালাতে পারব—সন্ন্যাস না নিয়েই।

শেষ অবধি কার্শিয়াং যাওয়ার দিন এসে গেল। বড় ট্রেন, ছোট খেলনা ট্রেন চেপে কার্শিয়াং পৌঁছলাম। স্টেশনে পৌঁছতেই নেপালি আর ভুটিয়া মেয়েরা আমার ছোট বোনকে হাতে হাতে নিয়ে প্রায় উধাও। ওর নাক তখন পর্বতবাসিনীদের মতোই খ্যাঁদা ছিল। বোধ হয় সেই কারণেই একটা নৈকট্যবোধ থেকে ভুটিয়ানিরা ওর এত সমাদর করছিল। অতি কষ্টে তাকে উদ্ধার করে গাড়ি চেপে আমাদের বাসস্থানে পৌঁছলাম।

কাঠের তৈরি অতি সুন্দর বাড়ি। বারান্দার থামগুলি গোল। জড়িয়ে ধরে তাদের ঠান্ডা স্পর্শ বেশ কিছুক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম। বাড়ির সামনেই মরসুমি ফুলের বাগান। তার অন্যতম আকর্ষণ ভুটিয়া মালির ছেলে—যে আমার সমবয়সি। পারিপার্শ্বিক বিষয়ে তার প্রায় সহজাত জ্ঞান এত বেশি যে, তা লিখে ফেললে ছোটখাটো একটা

এনসাইক্লোপেডিয়া হয়ে যেত। আর ঝকঝকে সূর্যের আলোয় সামনেই দেখলাম— কাঞ্চনজঙ্ঘা। না, হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায় না ঠিকই, কিন্তু বেশ কাছেই তো মনে হয়। 'পাহাড় বসে আছে মহা মুনি।' অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। যে বালকের চেতনায় পাহাড় অর্থ বিশ ফুট উঁচু চাঁদমারি, সে আজ কোথায় এসে পড়েছে! পারহীন সমুদ্র সদাচঞ্চল। আর এখানে সমুদ্রের সবচেয়ে বড় ঢেউগুলি যেন সাদা বরফ হয়ে জমে আছে। যৌবনে যখন 'কুমারসম্ভবম' পড়ি, তখন 'অস্তি উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয় নাম নগাধিরাজ' এই শব্দ কয়টি পড়তেই প্রথম দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপার্থিব রূপ স্মরণ হয়েছিল। শুনেছিলাম সন্ন্যাসীরা শুধু অরণ্যে না, পর্বতের গুহায়ও থাকেন, যোগবলে ওঁদের ঠান্ডা লাগে না। মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে এক অমোঘ সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি পর্বতকন্দরবাসী সন্ন্যাসীই হব। ওই দেবতাত্মা হিমালয় আমার ভবিষ্যৎ বাসস্থান। ডুবে যাবার ভয়ে সমুদ্রের প্রতি অনুরাগটা নির্ভেজাল হয়নি। কিন্তু বরফের পাহাড়? এর কি তুলনা আছে? পিছলে পড়ে মরার সম্ভাবনাটা তখনও চেতনাগোচর হয়নি।

মালির ছেলেটি এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে দেখাল—তার মধ্যে কী যেন চিকচিক করছে। ভাঙা কাচ? উঁহু—আব। আব মানে অভ্র? তার টুকরো এরকম রাস্তায় গড়াগড়ি যায়? আরও বিস্ময়কর সব জিনিস নতুন স্যাঙাতের কৃপায় দেখতে পেলাম। কমলা রঙের ছোট ছোট ফল রাস্তার পাশে ঝোপে হয়ে আছে। বলল, "বুনা স্ট্রবেরি।" বেশ তো খেতে। মাটি খুঁড়ে একটা জংলা গাছের গোড়ায় ছোট ছোট পেঁয়াজের মতো দেখতে কী এক অজানা ফল বা মূল তুলে আমাকে দিল। রসে ভরা—চমৎকার খেতে। বুঝলাম, সন্ন্যাসজীবনে আহারাদি ভালই হবে। সাধুবাবাদের ভুঁড়িটি যে সাধারণত বেশ নেয়াপাতি হয়, তার কারণটা এখন জানা গেল। মনে মনে স্থির করলাম—বুঝেশুনে খেতে হবে। ভুঁড়ি বাগানো একেবারেই চলবে না। অল্পদিন আগেই ব্রতচারীদের নাচ দেখেছি। তাদের অন্যতর প্রতিজ্ঞা—"ভুলেও ভুঁড়ি বাগাইব না"—বেশ মনে ধরেছিল। ভূধরদাদু ছাড়া আর সব ভুঁড়িওয়ালা লোকদের বিশেষ অপছন্দ করি। আমার কেমন ধারণা—ওরা বেশি রাগী হয়।

বাড়ির সামনের বাগানে এক দিন এক কাণ্ড ঘটল। বাগানে অনেক পপি ফুটেছিল। মৌমাছিরা এসে পপির অন্তর্দেশে ঢুকে মধুপানে মত্ত। শাস্ত্রে বলেছে 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'। আমার মাথায় হঠাৎ বাঁদুরে বুদ্ধি চেগে উঠল। ভাবলাম—একটা মৌমাছিকে বন্দি করা যাক। যথা চিন্তা তথা কাজ। মৌমাছি-পূর্ণ একটি লম্বাটে ফুলের খোলা মুখটা চেপে ধরলাম। পরক্ষণেই হাহাকার। পাপড়ি ছেঁদা করে মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে। সবাই বলতে লাগল, "বেশ হয়েছে।" বুঝতে পারলাম মানুষের চিত্তে এমপ্যাথির ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত।

পাহাড়ে রাস্তায় বেড়াতে বেশ লাগত। কিন্তু মালি সাবধান করে দিয়েছিল—রাত করবেন না, নীচে তরাইতে ভালুক আছে, মাঝে মাঝে উপরে উঠে আসে। বরিশালের একটা চালু লোক প্রবাদ—'পাগলারে তুই শাগ (অর্থাৎ সাঁকো) লাড়াইস না।' "ভাল মনে করছ!" এই কথার উৎপত্তি বোধ হয় শীতল জ্যাঠাকে দেখেই। যেদিন শুনলেন, ভাল্লুকের ভয় আছে, সেদিন থেকে রোজ সন্ধেবেলা বের হতে শুরু করলেন। এবং বাবাকে সঙ্গে করে।

দু'জনেরই বক্তব্য একই। বুনো ভালুক কখনও দেখেননি। বুনো ভালুকও যে ওঁদের দেখেনি এবং সেই পারস্পরিক অসাক্ষাতের ফলেই ওঁরা এতদিন বেঁচে আছেন, সে কথা ওঁদের মনে হল না। একদিন বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে শীতল জ্যাঠা বৈকালিক ভ্রমণে বের হলেন। সান্ধ্য ভ্রমণও বটে, কারণ পাঁচটা না বাজতেই সন্ধে হয়ে যায়। লজ্জার মাথা খেয়ে ঘোমটা একটু বেশি টেনে মা এসে বললেন, "শীতলদাদা, ওদের কিন্তু ভাল্লুক দেখানোর চেষ্টা করবেন না।" সাত হাত জিভ কেটে শীতল জ্যাঠা বললেন। "পাগল হইছ?" পাগল কে হয়েছে, সে সম্বন্ধে মা'র ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। জ্যাঠা প্রথমে আমাদের কার্শিয়াং স্টেশনে নিয়ে গেলেন। সেখানে কাচের বাক্সে বীভৎস রকমের সবুজ এবং গোলাপি রঙের হালুয়া দেখে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, বাবা সঙ্গে থাকায় এই বদিচ্ছা পূর্ণ হয়নি। এখন অবশ্য কর্তব্যজ্ঞানে ওই হালুয়া খাওয়াতে শীতল জ্যাঠা আমাদের নিয়ে গেলেন। কিনে দিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, "তোরগো বাপে একডা মূর্খের ডিম।" মানবজাতির অধিকাংশই যখন মূর্খের ডিম, তখন আমাদের বাবা তার ব্যতিক্রম হবেন এমন মনে করার মতো ধৃষ্টতা আমাদের ছিল না। কিন্তু হালুয়া খাওয়া গেল না। কারণ পুরনো জুতার শুকতলিতে খুব নিকৃষ্ট ভুরা চিনি মাখালে বোধ হয় ওই ধরনের স্বাদ হত, জুতার শুকতলি খাওয়া হয়ে ওঠেনি তাই ঠিক বলতে পারছি না। ওই হালুয়া-গোষ্ঠির কুলাঙ্গার থু থু করে ফেলে দিলাম। শীতলজ্যাঠা নিতান্ত প্রত্যাশিতভাবেই বললেন, "মূর্খের ডিম।"

হালুয়াপর্ব শেষ করে যখন বাড়ির পথ ধরেছি, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুটা যেতেই দূর থেকে দেখা গেল অন্ধকারে কোনও একটা প্রাণী আসছে—চতুষ্পদ সন্দেহ নেই, আর কিছু তখনও বোঝা যাচ্ছে না। শীতল জ্যাঠা বেশ উল্লসিত : "বোধ হয় ভাল্লুকই হইবে!" বোধ হয় ভাল্লুকই হইবে? হেইলে আমাগো কী হইবে? এমন সুসমাচার আগে কখনও শুনিনি। আমাদের যৌথ ভীতি দাদা ভাষায় প্রকাশ করল, "অ জ্যাডা, কও কী? আমাগো যে মারিয়া ফেলাইবে!" শীতল জ্যাঠা নিশ্চিন্ত, "ক্যামনে মারবে? আমার হাতে লাডিডা আছে কী করতে?" কী করতে আছে তা আমাদের জানা নেই। তবে ওটা দিয়ে ভাল্লুক মারা যাবে এমন কোনও স্থির বিশ্বাসও আমাদের নেই। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে রইলাম, দাদা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। জন্তুটি আর একটু কাছে এলে দেখা গেল, সাইজে বেশ বড়। তবে ঘনকৃষ্ণ এবং লোমশ হলেও, জাতিতে সে ভাল্লুক না, কুকুর—সম্ভবত রিট্রিভার জাতীয়। তখনকার মতো আমাদের প্রাণ বাঁচল। শীতল জ্যাঠা আশাহত, বিমর্ষ : "ভাল্লুক দেখা আর হইল না।" জীবনে সব উচ্চাশা কি পূর্ণ হয়?

কার্শিয়াং থেকে কলকাতা ফিরে আর এক দুঃসংবাদ পেলাম। স্থির হয়েছে আপাতত আমরা কলকাতায়ই থেকে যাব। ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধা হবে বলে বাবা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুক ভেঙে যাওয়া কথাটার অর্থ কী, আমরা দু' ভাই এবার ভালই বুঝলাম। একে তো প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যে কোনও মুহূর্তে খসার আশঙ্কা, তার উপর আর এক উপদ্রব শুরু হল। দীর্ঘদিন থাকার জন্য কোনও বাড়িই বাবার পছন্দ হয় না। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড থেকে সর্দার শঙ্কর রোড, তারপর যতীন দাস রোড, সেখান থেকে হিন্দুস্থান রোড, তারপর সাউথ এন্ড পার্ক। হেনস্তার এক শেষ। দাদা আর আমি রোজই বসে পালিয়ে

বরিশাল ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতাম, বরিশালে সবাই আমাদের দেখে কী রকম অবাক হয়ে যাবে—বড়দা, ছোড়দা, বউদিরা, মেনা, হাসমাতালি সবাই কে কী বলবে, এই আমাদের প্রধান আলোচ্য ছিল। সাউথ এন্ড পার্কে এসে শেষ পর্যন্ত বছর দেড়েকের মতো থিতু হলাম। এ বাড়ির বাড়তি আকর্ষণ, পাশের বাড়ির বাসিন্দা সপরিবারে শীতল জ্যাঠা। মূর্খের ডিমরা সত্যিই উল্লসিত।

কলকাতার জীবন সম্পূর্ণ নিরানন্দ ছিল এমন না। 'এক এক আনা-দু আনা' বলে এক আনার ফিরিওয়ালা নানা লোভনীয় জিনিস বিক্রি করতে আনত। আর শালপাতায় পসরা সাজিয়ে আসত খোয়া সন্দেশ এবং শোনপাপড়ি বিক্রেতা। কাপড়ের বস্তা পিঠে চিনা ফিরিওয়ালা সম্পর্কেও আমাদের অপরিসীম কৌতূহল ছিল, বিশেষ করে ওরা আরশোলা খায় শুনে। এক অতি চৌখস ভৃত্য একটা ভাল জিনিস খাওয়াবে বলে আমাদের হাতখরচার দৈনিক দু পয়সা নিয়ে নিল। (তখন এক পয়সায় এক প্যাকেট নকুলদানা পাওয়া যেত।) সেই পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে আমাদের দু-ভাইকে একটা খেতে দিল। বাকিটা তার। বলল, "বিড়ি খেলে শরীরে ভীমের মতো বল হয়।" ওর মানা সত্ত্বেও এই শক্তিসাধনার কাহিনি মা-বাবাকে বললাম। বিড়ি খেয়ে দু ভাই ভীম হতে যাচ্ছি—এ কথা না জানানোর কোনও কারণ দেখলাম না। ফলে ভৃত্যপ্রবরের চাকরি গেল।

হিন্দুস্থান রোডের ফ্ল্যাটে থাকবার সময় বাবা হঠাৎ ঠিক করলেন—পোলট্রির ব্যবসা করবেন। ছোটমামা কুমিল্লা থেকে এসেছিলেন। সেখানে হাঁস-মুরগি সস্তা, সুতরাং প্রথম সাপ্লাইটা উনিই পাঠাবেন, পরে সুবিধে মতো ফার্ম করে তাদের বংশবৃদ্ধি করা হবে এবং ভাল মুনাফায় বিক্রি করে জমিদারি বাবদ আয়ের ঘাটতি পূরণ হবে। ছোট মামা করিৎকর্মা মানুষ। যাঁহা বলা, তাঁহা করা, কোনও কাজ ফেলে রাখা উনি পছন্দ করতেন না। ফলে এই আলোচনার সাতদিনের মধ্যে কুমিল্লা থেকে এক হাজার মোরগ-মুরগি ডাকযোগে আমাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছাল। তাদের ফ্ল্যাটে থাকতে দিলে, আমাদের অন্যত্র যেতে হত। সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। তাই তাদের তখনকার মতো ছাদে থাকার ব্যবস্থা হল। ভাড়াটে হিসাবে ছাদে যাওয়ার অধিকার আমাদের অবশ্যই ছিল, কিন্তু মুরগি রাখার অধিকার ছিল কি না এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ ভারতের আইনে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ ছিল বলে মনে হয় না। আর ঝাঁকা থেকে বের হয়ে একই বাড়ির বাসিন্দা সদাচারী ব্রাহ্মণ বাড়িওয়ালার শয়নকক্ষ এবং রন্ধনগৃহে প্রবেশ যে মুরগিদের অধিকারবহির্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। বাড়িওয়ালা ব্রহ্মতেজে জ্বলে উঠে লোকসভায় অচল সব ভাষা ব্যবহার করা শুরু করলেন (অবশ্যি প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের লোকসভায় অচল এমন ভাষা বা কাজ কি কিছু আছে?)। মোটকথা তাঁর বক্তব্য—যেদিন বাঙাল জমিদারকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন, সেদিনই জানেন পিতৃপুরুষের ধর্ম বিপন্ন হবে। মুরগি যে পথ প্রদর্শন করেছে সেই পথে যে অনতিবিলম্বে মদ এবং মদের অনুল্লেখযোগ্য সব আনুষঙ্গিক প্রবেশ করবে এ কথা কে না জানে? এরপর আর সেই ব্রাহ্মণভবনে থাকা সম্ভব হল না। আমরা সাউথ এন্ড পার্কে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের পৃষ্ঠপোষিত এক বিমা কোম্পানির সম্পত্তি, একতলা একটি বাড়িতে এসে উঠলাম।

আমরা যখন হিন্দুস্থান রোডের ফ্ল্যাটে বাসিন্দা, তখনই আমার জীবনে ইস্কুল পর্ব শুরু হয়। বরিশালে পাঁচ বছর বয়সে হলুদ রঙে ছোপানো ধুতি পরে সরস্বতী পূজার দিন আমার হাতেখড়ি হয়েছিল। বাড়ির পুরুতঠাকুর কালো পাথরের থালায় এক টুকরো খড়ি দিয়ে অ, আ, ক, খ লিখিয়েছিলেন। তারপর কিছুদিন তালপাতায় পেরেক দিয়ে খোদা অক্ষরের উপর খাগের কলম কালিতে চুবিয়ে অক্ষর লেখা মক্‌সো করেছিলাম। বাবার অসুখ বিসুখের ফলে এর পর আর নিয়মিত পড়াশুনো করা হয়নি। ভাসা ভাসা মনে পড়ে—ঠিকাবাসা নিবাসী আশ্রিত যুবক প্রতুল এবং জুড়ানবাবু আমাকে বর্ণপরিচয় আর ইংরাজি ফার্স্টবুক পড়িয়েছিলেন। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলাম না। ইংরাজিজ্ঞানও কিছুটা ছিল। "H A M, হ্যাম—Ham মানে শূকরের লবণাক্ত শুষ্ক মাংস" এই কথাটা খুব বিজাতীয় আনন্দের সঙ্গে তারস্বরে ঘোষাতাম। শুদ্ধাচারী ঠাকুমারা শুনলে বেশ বিরক্ত হতেন মনে আছে। সকালবেলা ঠাকুরের নাম না করে শুয়ার-কীর্তন কার ভাল লাগে?

ফার্ন রোডে জগদ্বন্ধু স্কুল। তার সেক্রেটারি ছিলেন বরিশালনন্দন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। সুরেনবাবুর সুপারিশে জগদ্বন্ধু স্কুলে ভর্তি হলাম। রীতিমতো লিখিত পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস ফোরে, ১৯৩৪ সনে। ওই স্কুলটি আমার ভাল লেগেছিল। মাস্টারমশাইরা সবাই বেশ ভালমানুষ ছিলেন। দেখেই বোঝা যেত—এঁরা গরিব, পরনের ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবি বোধহয় বাড়িতেই কাচা, নিপাট ইস্ত্রি করা না। কথাটা মাথায় আসার কারণ ছিল। ক্লাস ফোরে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে একটা বই পড়তে হত। তাতে ক্ষার দিয়ে কাপড় কী করে কাচা যায় সে-সম্পর্কে নিখুঁত নির্দেশ ছিল। পরবর্তী নির্দেশ—কী করে ধুতি আর কুর্তা সযত্নে ভাঁজ করে বালিশের নীচে রেখে দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে ইস্ত্রি নামক যন্ত্রের কোনও উল্লেখ ছিল না, মাস্টারমশাইদের দেখে মনে হত—ইস্কুল রওনা হওয়ার আগে এঁরা ধুতি-পাঞ্জাবি ক্ষার দিয়ে কেচে রোদে শুকোতে দিয়ে এসেছেন। আবার বিকেলে বাড়ি ফিরে ওগুলো সযত্নে ভাঁজ করে বালিশের নীচে রেখে দেবেন, পরদিন স্নানের পর পরে স্কুলে যাবেন। এঁরা কেউ বকাবকি মারধর করতেন না। সাধ্যমতো যত্ন করে পড়াতেন।

জগদ্বন্ধু স্কুলের এক অপ্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য ছিল ঘুষোঘুষি অর্থাৎ বক্সিং শিক্ষা। তার কারণ আমাদের ড্রিলমাস্টার ছিলেন বিখ্যাত ঘুষি-বীর জগা শীল। যার ইচ্ছে ঘুষি শিখতে পারত, অবশ্যি জগা শীল টিপেটুপে দেখে উপযুক্ত বিবেচনা করলে তবেই। অধিকারীভেদ বলে কথা। সন্ধেবেলা স্কুলে গেলেই দেখা যেত কিছু ছেলে চামড়ার দস্তানা পরে হুঁশ হুঁশ আওয়াজ করতে করতে ঘুষি ছুড়ছে। আমরাও বাড়ি ফিরে হুঁশ হুঁশ ধ্বনি তুলে ঘুষোঘুষি করতাম। তখন মুষ্ট্যাঘাতে সবাইকে ধরাশায়ী করা জীবনের মহত্তম আদর্শ বলে মনে হত।

শুধু ঘুষিখেলা শেখানো না, ছেলেদের স্বাস্থ্যর যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় সেদিকেও শীলবাবুর লক্ষ্য ছিল। উনি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য বই লিখেছিলেন। তার নাম 'শরীর সামলাও'। এই বই কিনতে সবাইকে উৎসাহ দেওয়া হত। উপযুক্ত পাত্রদের মাস্টারমশাই বইটা বিনামূল্যে উপহার দিতেন। উক্ত গ্রন্থে শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও প্রক্রিয়াই উপেক্ষিত হয়নি। একটি পরিচ্ছেদের নাম ছিল 'এক নিশ্বাসে মলত্যাগ'। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে ত্যক্ত বস্তুটির রূপ ও প্রকৃতি কী হবে তারও

বিশদ বর্ণনা ছিল। সে বর্ণনা পড়লে মনে হত জগা শীল কোনও উচ্চাঙ্গের শিল্পের ইতিহাস লিখেছেন।

ইস্কুলের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিলেন হেডমাস্টারমশাই—নীহার সেন। ওঁকে আমরা বেজায় ভয় পেতাম। বোধহয় হেডমাস্টার বলেই। অবশ্যি ওঁর জমকালো এক জোড়া গোঁফ ছিল। তবে গোঁফ থাকলেই মানুষ বাঘ-ভাল্লুক হয়ে যায়, কোনও শাস্ত্রে এমন লেখা নেই।

সেই যে কবে উপনিষদে লিখে রেখেছে, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি', (থুড়ি, মুনিঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা হলেও সাক্ষর ছিলেন না) আমাদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে বাবা সেই আদর্শ অবলম্বন করলেন। জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে বেশ ছিলাম। লেখাপড়া কিছু খারাপ হচ্ছিল না। হঠাৎ বাবা স্থির করলেন, আমাদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করবেন। সেটা নাকি আরও ভাল স্কুল। যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হলাম। এ স্কুলের ধরনধারণ আলাদা। প্রথমেই বুঝলাম—এখানকার মাস্টারমশাইরা ক্ষার দিয়ে কেচে ভাঁজ করে ধুতিকোর্তা বালিশের নীচে রেখে দেন না, কেউ কেউ রীতিমতো স্যুটবুট পরেন। আর ছাত্ররা? তাদের কেউ কেউ পয়লা নম্বরের কাপ্তান। টিফিনের সময় খেলার মাঠে দেওয়ালের কাছে গিয়ে সিগ্রেট ফোঁকে। উপরের ক্লাসের ছেলেরা অনেকে দিব্যি ফরফর করে ইংরিজি বলছে। শুনলাম কেউ কেউ বাড়িতে মা-বাপের সঙ্গেও ওই বিজাতীয় ভাষায়ই কথা বলে। বড় বড় গাড়ি চেপে তারা ইস্কুলে আসে যায়। কলকাতার বড় মানুষ নামক প্রাণীর সঙ্গে এর আগে সাক্ষাৎ হয়নি। এবার হল। ফিরে তাকিয়ে মনে হয় কিছু কিছু চালিয়াত ছেলে চালিয়াতির আবরণে তাদের অন্তঃসারশূন্যতাই ঢাকতে চেষ্টা করত। সেই অন্তঃসারশূন্যতা ব্যক্তিগত না, শ্রেণিগত। এই লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কিছু কিছু এখনও বেঁচে আছে—যাদের ছেলেপেলেরা মা-বাপকে মাম্মি, পাপা ডাকে, বাড়িতে চি-চি ইংরাজি বলে। লক্ষ্মীর কৃপা হয়তো লাভ হয়েছে, কিন্তু মা সরস্বতীকে অনেক আগেই ব্যর্থ নমস্কারে বিদায় দিয়েছে। ফিরিঙ্গি-পনাই এদের গৌরবের পতাকা।

একদিনের ছোট একটা ঘটনা মনে পড়ে। দুপুরে টিফিনের সময় চালিয়াত এক বালক পাশে এসে বসল। হঠাৎ সে নাক কুঁচকে জিগ্যেস করল, "তোরা পরিজ খাস?" এ প্রশ্নের অর্থবোধ হল না। পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে সকালবেলা পরিজ আমাদের খেতে হত। ওর চেয়ে স্বাদহীন জিনিস কিছু খেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। তাই অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন করছ?" উত্তর, "যাঃ যাঃ, বাজে বকছিস। তুই তো বাঙাল, বাঙালরা কখনও পরিজ খায়? পরিজ খাই আমরা। তোরা খাস মুড়ি, নয়তো পান্তাভাত।" ওই দুই বস্তুই আমার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। সে কথা বলায় মন্তব্য হল, "তা-ই বল্। তবে পরিজ খাস বলছিলি কেন?" মুড়ি খেলে পরিজ খাওয়া চলে না, এ তথ্য আগে জানা ছিল না। একটা কথা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবে বুঝতে পারলাম। চালিয়াত চন্দরের বক্তব্য : সাহেবরা পরিজ খায়। সাহেবরা কংসরাজার বংশধর। আমরাও সাহেবদের মতো পরিজ খাই। তাই আমরাও

অন্ততপক্ষে কংসরাজার খানসামার বংশধর। সেটা কি কম কথা! আর আমাদের সঙ্গে তোদের মতো ভেতো বাঙালির তুলনা হয়?

সাম্প্রতিক কালে দেশে একবার এই প্রজাতির কয়েকটি প্রাণীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। তার একটি হঠাৎ বেশ উচ্চৈঃস্বরে মন্তব্য করল, "Champagne is a much exaggerated drink." সুরুচির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কথাটা বলল ঠিক যখন গৃহস্বামী বহু ব্যয়ে কেনা শ্যাম্পেন পরিবেশন করছেন। শুনলাম লোকটা বড় ঘরের ছেলে, নিজের ব্যবসায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ভব্যতাজ্ঞানশূন্য জীবটির বক্তব্য খুব সরল : "চারবেলা শ্যাম্পেন খেয়ে খেয়ে থকে গেছি। ও আর আমাদের মুখে রোচে না। তোমরা যারা এ সব জিনিস ন' মাসে ছ' মাসে চোখে দেখ, তারা এ নিয়ে হইচই করতে পার।" মর্কটপ্রবরের কান মলে দেওয়ার প্রবল বাসনা অনেক কষ্টে সামলেছিলাম। না হলে বিপদ হত। কারণ জীবটি বেশ সফল আইনজীবী! ওই পরিজ খাওয়ায় গৌরববোধের অথবা শ্যাম্পেনের নিকৃষ্টতা ঘোষণার পেছনে একটা বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে বলে আমার ধারণা। বিদেশি শাসনের সময় সাহেবের লাথি খাওয়ার অভিজ্ঞতা অনেক ভারতীয়রই হয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণির বাঙালি যেভাবে প্রভুর সবুট চরণ মোক্ষজ্ঞানে বক্ষে ধারণ করেছিল তার তুলনা বোধ হয় উপমহাদেশের অন্যত্র কোথাও নেই। একেবারে 'তোমার চরণে আমার পরাণে বেঁধেছি প্রেমের ফাঁসি'। নির্বোধ অনুকরণের মর্কটবৃত্তি কার কতটা রপ্ত হয়েছে, তার পরিমাপ করে এরা নিজেদের মাহাত্ম্য বিচার ও ঘোষণা করে। বিশ্বায়নের টেঁসু-মার্কা জীবনাদর্শ সেই মহান ঐতিহ্য যেন আবার পুনরুজ্জীবিত করছে মনে হয়। তবে দাস্যবৃত্তি এবার শুধু বাঙালি শ্রেণিবিশেষে না, সব ভারতীয়দেরই গ্রাস করতে চলেছে বলে আশঙ্কা করি।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলের সব ছাত্রই টেঁসুমার্কা চালিয়াত ছিল—এটা আমার বক্তব্য না। তবে ওই বিশেষ প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে ওখানেই প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এবং সেই সাক্ষাতে যে বিবমিষা বোধ করি তা কোনও দিনই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। শুধু ভেবে অবাক হই—দেশ স্বাধীন হওয়ার ষাট বছর পরেও আমাদের সমাজে এই জাতীয় জীব এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে।

বালিগঞ্জ স্কুলের কয়েকটি চরিত্র এখনও বেশ মনে আছে। একটি অত্যন্ত সুপুরুষ তরুণ ভারী সুন্দর ইংরাজি কবিতা আবৃত্তি করতেন। শুনতাম তিনি লর্ড সিনহার নাতি। আর পাশেই ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ। সেখানকার অধ্যক্ষ মিস্টার লাহিড়ি বেজায় সাহেবি কেতার মানুষ ছিলেন। উনি আমাদের স্কুলে প্রায়ই আসতেন, কারণ ওঁদের ছাত্ররা অর্জিত বিদ্যা প্রথম পরীক্ষা করতেন আমাদের উপর। তরুণ শিক্ষকরা প্রাণমন দিয়ে পড়াতেন। বড় ভাল লাগত। স্থায়ী শিক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। মানুষটি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। স্কুলে কোনও উৎসব হলেই উনি গান করতেন, কিন্তু একটি স্ক্রিনের আড়ালে বসে। অনাদিকাল থেকেই বোধ হয় স্কুলের ছাত্রদের এক উৎকট আনন্দ শিক্ষকদের অর্থহীন অদ্ভুত নামে অভিহিত করা। 'কোনও তার অর্থ নেই সেই তার খোঁচা।' এরকম খোঁচার অন্যতর শিকার ছিলেন আমাদের বাংলা স্যার—ভ্যান পণ্ডিত। কেন এবং কীভাবে উনি এই নাম অর্জন করলেন তা কারও জানা ছিল না। কিন্তু উনি ক্লাসে

ঢোকার ঠিক আগেই "ভ্যান। ভ্যান" বলে একটা প্রচণ্ড রব উঠত। সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মতো উনি ক্লাসে ঢোকামাত্র সেই মহারব নিশ্চুপ হয়ে যেত।

সব মিলিয়ে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল আমার ভাল লাগেনি। কেমন যেন দম আটকে আসত। বোধ হয় ওখানকার সামাজিক পরিবেশ আমার ঠিক সহ্য হয়নি। যে-কারণেই হোক, মানুষে-মানুষে যে সহজ সম্পর্ক বাঙালি সমাজের বিশিষ্ট সম্পদ, তার স্বাদ আমি ওখানে পাইনি। শিক্ষক এবং সহপাঠী সবাইকেই কেমন দূরের মানুষ মনে হত। হয়তো সেটা আমার বাঙালপনারই ফল।

কিন্তু ওইখানেই দুটি বন্ধুত্বর সূচনা হয়, যা আমার বাকি জীবনের সম্পদ হয়ে থাকে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ছোট ভাই কামিনী দত্তর নাতি অশোক ওরফে টুকু আমার অতি শৈশবের সঙ্গী। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ। তার অনেক বছর পরে আবার দেখা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে। কয়েক বছর হল টুকু চলে গেছে। ও যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন আমাদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। দ্বিতীয় যে-ব্যক্তির কথা বলছি—তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। বর্তমানে ছোটখাটো শিল্পপতি দেলওয়ার হোসেন। প্রথম পরিচয় বালিগঞ্জ স্কুলে। তারপর কিছুদিন পরে বরিশাল জিলা স্কুলে আবার সাক্ষাৎ। তৃতীয় সাক্ষাৎ সেই প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেই থেকে নানা ওঠা-পড়ার ভিতর দিয়ে আমরা গিয়েছি, কিন্তু যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি।

আমরা স্কুলে যেতাম মাস হিসাবে ভাড়া করা রিকশা চেপে। সাউথ এন্ড পার্ক থেকে অনেকটা পথ, তার অনেকটাই ঘরবাড়িহীন মাঠ। ঢাকুরিয়ার ছোট লেক তখনও খোঁড়া চলছে। মাঝে মাঝে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের ভিতর দিয়ে রিকশা যেত। একতলা বাংলোর অনেকগুলিই তখন বিদেশি অধ্যুষিত। ওই পথে যেতে এক অপরিচয়ের উত্তেজনা বোধ করতাম।

একদিন স্কুলে ক্লাস করছি। শরীরটা বেশ খারাপ লাগতে শুরু করল। যিনি পড়াচ্ছিলেন তিনি হঠাৎ কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে তোমার?" তারপর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "তোমার তো খুব জ্বর হয়েছে। বাড়ি চলে যাও।" একটা রিকশা ডেকে আমাকে তুলে দেওয়া হল। বাড়ি ফিরে শয্যা নিলাম। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত হল—প্যারাটাইফয়েড। আমার বালিগঞ্জ স্কুলে পড়ার ওইখানেই ইতি।

ইতি ঘটার কারণ অবশ্যি আমার অসুখ না। অনেকদিন পর পারিবারিক বন্ধু চরামুদ্দির জমিদার খান ইসমাইল চৌধুরী আমাদের সাউথ এন্ড পার্কের বাড়িতে হঠাৎ এসে উপস্থিত। এটা-ওটা কথাবার্তার পর উনি বাবাকে সোজাসুজি বললেন—আমাদের জমিদারির অবস্থা খুব সঙ্গিন। বারোভূতে এমন লুটে খেয়েছে এবং খাচ্ছে যে, অনতিবিলম্বে লুটে খাওয়ার মতো আর কিছু বাকি থাকবে না। দু-একটা মহাল এর মধ্যেই নিলামে উঠেছে। বাকি সবও যাওয়ার মুখে। সম্পত্তি বাঁচাতে হলে অনতিবিলম্বে বাবার দেশে ফেরা দরকার। এরপর আর দেরি করা চলে না, 'Doll and Dummy' কোম্পানির সরঞ্জামপত্র শীতল জ্যাঠাকে দিয়ে বাবা আমাদের নিয়ে বরিশাল ফিরলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কলকাতা প্রবাসের কাহিনি একটি মানুষের কথা না লিখে শেষ করলে অসমাপ্ত থাকবে।

তিনি আমার প্রথম গৃহশিক্ষক পিতৃবন্ধু অনন্তকুমার সেন, বর্তমানে খ্যাতনামা নট রুদ্রপ্রসাদ সেনের বাবা।

এই প্রসঙ্গে একটা তাত্ত্বিক মন্তব্য করতে চাই। উনিশ শতকে বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে নবজন্ম বা রেনেসাঁস ঘটেছিল কি না, এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। এ সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য তা অন্যত্র লিখেছি। শুধু এক বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জাতীয়তাবাদ নিন্দনীয় কি প্রশংসনীয়, এ প্রশ্নের এক কথায় কোনও উত্তর নেই। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল হিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে কিছু মানুষ জন্মেছিল, মনুষ্যত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে বেশি পাওয়া যাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। জাগতিক স্বীকৃতির চূড়ায় যেমন গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেমনই অগণিত নামহীন মানুষ আদর্শনিষ্ঠ স্বার্থবোধহীন জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে এক নতুন এবং অত্যুজ্জ্বল জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই রকম বেশ কিছু মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম। স্বাধীনতা লাভের পর এঁরা যেন দৃশ্যপট থেকে সরে গেলেন। এঁদের সঙ্গে তুলনা করা যায় এরকম মানুষ হয়তো আজও আছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পরিচয় আমার হয়নি।

সম্পূর্ণ শুদ্ধচরিত্র মানুষ কাকে বলে, তেমন মানুষ আছে কি না বা সম্ভব কি না আমি জানি না। কিন্তু সেই ইউক্লিড-কল্পিত সরলরেখার কাছাকাছি যদি কেউ বা কারা পৌঁছে থাকেন, তাঁদের একজন প্রয়াত অনন্তকুমার সেন। অনন্তবাবু যৌবনে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। পরিণত বয়সে আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তিনি গাঁধীবাদী, পরিধানে স্বহস্তে কাটা সুতোয় তৈরি খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। অনেকদিন বরিশাল জেলায় নিজের গ্রামে অন্তরীণ থাকার পর ছাড়া পেয়ে উনি সপরিবারে কলকাতা আসেন। সেখানে উনি এক স্কুলের হেডমাস্টার হন। দুর্নীতি ওঁর সহ্য হত না, এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে বরাবরই দুর্লভ। ফলে কোনও স্কুলেই উনি বেশি দিন টিকতে পারতেন না। কিন্তু শিক্ষক এবং প্রধানশিক্ষক হিসাবে খ্যাতি হওয়ায় ওঁর চাকরির অভাব হয়নি। ওঁর বন্ধুদের কাছে ওঁর এক স্কুলে শেষ দিনটার একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা শুনেছি। প্রধানশিক্ষক অনন্তবাবু তাঁর অফিসে উপবিষ্ট। রাগে দুই চোখ রক্তবর্ণ। সামনের চেয়ারে অতিশয় বজ্জাত মালিক তথা সেক্রেটারিবাবু। অনন্তবাবুর আদেশমতো দশম শ্রেণির দুই ছাত্র সেক্রেটারির দুই কান মলে দিচ্ছে—বেশ সম্যক ভাবেই মলছে। কর্ণমর্দনপর্ব শেষ হলে অনন্তবাবু ওই সেক্রেটারিরই হাতে পদত্যাগপত্রটি দিয়ে বিদ্যালয়ভবন ত্যাগ করলেন।

সাত-আট বছর বয়সে মানুষের চরিত্রমাহাত্ম্য বোঝার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু মাস্টারমশাই যে অন্য পাঁচজন মানুষের থেকে স্বতন্ত্র, সেটা বুঝতে পারতাম। ওঁর চারিত্রিক শুচিতা ওঁকে কঠিন বা কঠোর করে তোলেনি। সদাহাস্য মানুষটি যে অফুরন্ত স্নেহের আধার সে কথা বুঝতে কষ্ট হত না। পাঠ্য এবং পাঠ্যের বাইরে বই পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কর্তব্য উনি নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিলেন। নিজের হাতে সেলাই করা নীল মলাটে মোড়া ছোট একটি খাতা উনি প্রত্যেক ছাত্রকে উপহার দিতেন। মলাটের উপর ওঁর সুন্দর

হস্তাক্ষরে লেখা থাকত—'আত্মপরীক্ষার খাতা'। প্রতি সপ্তাহের জন্য খাতার এক একটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকত—আর প্রতি দিনের জন্য এক একটি লাইন। বাঁদিকে এক দুই করে বালকের পক্ষে যে সব দুর্মতিমূলক কাজ বা মনোভাব সম্ভব তার একটা তালিকা থাকত। যথা—ক্রোধ, অবাধ্যতা, আলস্য, পাঠে অমনোযোগ, দেরি করে শয্যাত্যাগ, কলহ ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেলা এসেই খাতাটি খুলে উনি আমাদের দিনগত দুষ্কর্মের হিসাব নিতেন। যে খাতে অন্যায় করেছি, সে খাতে একটি ঢেরা পড়ত। বলতে হত কী করেছি। ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়, এবং তা কীভাবে সম্ভব উনি বুঝিয়ে দিতেন। আর কোনও দিন যদি কোনও খাতেই ঢেরা না পড়ত, তা হলে উনি সত্যিই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিয়ে নাচতেন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমরা কিছু কল্পনা করতে পারতাম না। নীরদ চৌধুরী মশায়ের কাছে শুনেছি ওঁরাও ছোটবেলা এবং কৈশোরে এইরকম একটি খাতায় আত্মসমীক্ষা করতেন। তবে আমাদের তুলনায় ওঁদের আত্মপরীক্ষার খাতায় দুর্নীতির ফর্দটা কিছু লম্বা ছিল। ফর্দে একটি অবাঞ্ছনীয় মনোভঙ্গির অভিধা ছিল—'রূপমোহ'। পরপর সাতদিন ওঁর দাদার খাতায় 'রূপমোহ'র খাতে ঢেরা দেখে ওঁদের পিতাঠাকুর উত্তমরূপে পুত্রের কর্ণমর্দন করেন। এ জাতীয় দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হয়নি। তবে এও বলি—ভদ্রলোকের দশ বছর বয়সে একাদিক্রমে সাতদিন রূপমোহ ঘটাটা ঠিক উচিত হয়নি, সে ফ্রয়েড এবং এলিস সাহেব যা-ই বলুন।

সব নিয়মের ব্যতিক্রম করে কোনও খবর না দিয়েই পরপর ক'দিন অনন্তবাবু আমাদের পড়াতে এলেন না। উনি থাকতেন উত্তর কলকাতায়। ওঁর বা ওঁর কাছাকাছি কোনও বাড়িতে টেলিফোন ছিল না, খবর নেওয়ার একমাত্র উপায় ওঁর বাড়ি যাওয়া। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার দিকে আমরা উত্তর কলকাতা রওনা হলাম। এই আমার প্রথম উত্তর কলকাতা অভিযান। ওখানকার গলির ভিতর ঢুকে মনে হল এক অপরিচিত জগতে এসে পৌঁছেছি। এত সরু গলি, এত অন্ধকার রাস্তা, এত পুঞ্জীভূত আবর্জনা এর আগে কখনও দেখিনি। সত্যিই মনে হচ্ছিল দম আটকে আসছে। কিছুক্ষণ খুঁজে ওঁর বাড়ির হদিশ পেলাম। দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে ডাকাডাকি করতে দোতলা থেকে এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। বোধ হয় মাস্টারমশাইয়ের ভাই। বাবা জিগ্যেস করলেন— "উনি আছেন কেমন?" আত্মীয় ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, "শেষ হইয়া গ্যাছে—কাইল।" বাবা অনুবাদ করলেন, "তোমাদের মাস্টারমশাই আর নেই।" নিতান্ত প্রিয়জনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কথাটা বুঝে কান্না আসতে বোধ হয় কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটা তীব্র অভাববোধ শরীরমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই শোকের স্মৃতি এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু একটা কথাই ভাঙা রেকর্ডের মতো মনের মধ্যে বারবার ঘুরছিল, "ওঁকে আর কখনও দেখতে পাব না।" ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে আমার বাল্যজীবনের উজ্জ্বল এক অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

শহর বরিশাল—'ভদ্রজনের বাসা'

কৈশোরে টুর্গেনিভের উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ইংরাজি অনুবাদে একটি উপন্যাসের নাম আমার খুব ভাল লাগত—'Nest of the Gentry', কেমন মনে হত, নামটা বরিশাল শহরের সঙ্গে খুব খাপ খায়।

প্রবাস-দুঃখ ভোগ করতে যখন বরিশাল ছাড়ি, তখন আমার বয়স ছয়-সাত। যখন ফিরলাম, তখন আমার এগারো বছর বয়স। বয়সের তুলনায় অকালপক্কতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নিজেকে বেশ কেওকেটা মনে করতে শুরু করেছি। বরিশাল জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েছি। সেখানে লেখাপড়ায় ভাল করায় এবং কীর্তিপাশার জমিদারনন্দন হিসাবে (এটা যদিও কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে) বেশ খাতির পাওয়ায় ল্যাজ কিছুটা স্ফীত হয়েছে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ছিলাম 'বিমর্ষ বানর'। আর জিলা স্কুলে হলাম 'বীরদর্প হনুমান'! এখানে একটা কথা বলি। লেখাপড়ায় ভাল মানে পৌরুষহীন গবেট, 'Sissy', এই বিশ্বাস আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুল-সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না। ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছেলেরাই ক্লাসে মনিটর হত, এবং তাদের ব্যবহার অসহ্য না হলে ছাত্র-মাস্টার সবাই তাদের খাতির করত। ফলে জিলা স্কুলের জীবন আমার পক্ষে সুখের হয়েছিল। আর ছেলের সুখ্যাতি করতে কোনও কোনও মাস্টারমশাই যে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তার সামাজিক তাৎপর্য বুঝতেও অসুবিধে হত না। এই অসম সম্পর্কের দুঃখ আর লজ্জার দিকটা উপলব্ধি হতে বেশ ক'বছর লেগেছিল। বৈষম্য যেখানে নিজের স্বার্থ, বিশেষত সামাজিক মর্যাদার অনুকূল, সেখানে আদর্শ হিসাবে সাম্যবোধ সহজে আসে না।

প্রথমেই বলেছি, 'ভদ্রজনের বাসা' এই নাম কৈশোরে বরিশাল শহরের সুষ্ঠু বর্ণনা বলে মনে হয়েছিল। কারণ চারপাশে যাঁদের দেখতাম, তাঁরা সবাই প্রায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। জীবনযাত্রার মানে কিছু উনিশ-বিশ তফাত থাকলেও মোটামুটি একই ধরনের। আর্থিক অবস্থার তফাত বোঝার জন্য একটি মাপকাঠি ছিল—পাকাবাড়ি, না কাঁচাবাড়ি (অর্থাৎ ইটের বদলে বেড়ার দেওয়াল, টালি বা 'টিন' অর্থাৎ করোগেটেড লোহার ছাদ)। পরে আবিষ্কার করি, অপরাধী বা রাজবন্দিদের শ্রেণিবিভাগ করার জন্য সরকার বাহাদুরও কাঁচা-পাকা বাড়ির মাপকাঠি মেনে নিয়েছিলেন। পাকাবাড়ির বাসিন্দা হলে উচ্চশ্রেণি, মাটিতে কম্বল শয্যার বদলে খাটপাট, দৈনিক খাইখরচা আট আনা না হয়ে পাঁচসিকে। পাঁচসিকের বাজার করলে বরিশালে তখন দুটো মুটের দরকার হত। সুতরাং উচ্চশ্রেণির বন্দির মাথাপিছু দৈনিক ওই বিপুল সম্পদ খরচা হত মনে করলে ভুল হবে। সমাজতাত্ত্বিকরা কিছুকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে 'উচ্চ-মধ্য' 'মধ্য-মধ্য' এবং 'নিম্ন-মধ্য' বলে তিন উপশ্রেণিতে ভাগ করতেন। বোধ হয় বরিশালের 'মধ্য-মধ্য' এবং 'নিম্ন-মধ্যবিত্ত'রা কাঁচাবাড়িতে থাকতেন। অবশ্যি এই মাপকাঠি সব ক্ষেত্রে খাটত না। আমরা অবশ্যই পাকাবাড়িতে থাকতাম এবং জীবনযাত্রার মান উচ্চ-মধ্যবিত্তেরই ছিল (যদিও সহপাঠী এবং মাস্টারমশাইদের মধ্যে অনেকের নিতান্ত ভুল ধারণা ছিল যে আমরা বড়লোক), তবে মাসিক আয় হিসাব করলে পরিচিত বেশ ক'জন কাঁচাবাড়ির বাসিন্দা উকিল-মোক্তার আমাদের তুলনায় চার-পাঁচগুণ রোজগার করতেন।

আর রীতিমতো ধনী সাহাবাবুর বাড়ির ছাদও টিনের ছিল। জীবনযাত্রার মান আয়ের চেয়েও সামাজিক সংস্কৃতির উপর নির্ভর করত। সেদিক থেকে বিচার করলে চমকপ্রদ বৈচিত্র্য চোখে পড়ত—লাখুটিয়ার জমিদার পরিবার আর শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীর স্বামী জার্ডিন রায় ছিলেন পাকা সাহেব, অন্য এক জমিদারবাড়িতে আহার-বিহারে পান্তাভাতভোজী গেঁয়ো বরিশালবাসীর সঙ্গে কোনও তফাত ছিল না।

আমরা যখন কলকাতা-প্রবাসী হই, তার ঠিক আগে শুধু আমরা একাই বরিশালের এজমালি বাড়িতে বাস করতাম। আমরা যখন কলকাতায়, তখন সপরিবারে মেজ জ্যাঠামশায়, আর তাঁর দুই ভাই—রাঙাজ্যাঠা আর শম্ভুকাকা গ্রাম ছেড়ে শহরের বাড়িতে চলে আসেন। রাঙাজ্যাঠা নিঃসন্তান ছিলেন, মেজঠাকুমার ছেলে শম্ভুকাকা বি. এম. কলেজে পড়তেন। ওঁদের আর এক ভাই, নিনু কাকা ওরফে ব্যারিস্টার শশাঙ্ক সেন, কলকাতাবাসী। আমরা বরিশাল ফেরায় মেজজ্যাঠারা বাড়ির যে-দিকটায় নদী সেই দিকটা আমাদের ছেড়ে দেন। এই সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রজন্মের পক্ষে সুখের হয়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যৌথ পরিবার না হওয়া সত্ত্বেও, যৌথ পরিবারে যে-ধরনের খিটিমিটি লেগে থাকে এবং মনোমালিন্য ঘটে তার থেকে রেহাই পাইনি। বাড়িতে জল সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না। ফলে দুই পরিবারের কে কখন কল খুলতে পারবে তার সময় বাঁধা ছিল। এই চুক্তি কেউই মানত না। ফলে চাপা স্বরে কটু কথার বিনিময় লেগেই থাকত। তবে উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়ার গ্রাম্যতায় কেউ পৌঁছাননি। আলাদাভাবে দুই পরিবারের জল সরবরাহর ব্যবস্থা করা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সে চেষ্টা কখনও হয়নি। হয়নি যে তা জমিদার পরিবারগুলির অবক্ষয়ের অন্যতম উদাহরণ বলে আমার ধারণা।

দুই পরিবারে মন-কষাকষি আমাদের প্রজন্মকে প্রত্যক্ষভাবে কখনও স্পর্শ করেনি। বড়দের মধ্যেও এক ধরনের সৌহার্দ্য ঝগড়াঝাটির সঙ্গেই সহাবস্থান করত। অসুখে-বিসুখে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো কখনও বন্ধ হয়নি। ওঁরা, বিশেষ করে মহিলারা, অনেকটা সময়ই পরস্পরের সঙ্গে কাটাতেন। নিন্দাবান্দাটা আড়ালেই হত। আমাদের জ্যাঠতুত ছোট ভাই অশোক আর আমাদের ছোট বোন প্রায় এক বয়সী ছিল। ওদের কখনও ঝগড়া করতে দেখিনি। আমাদের জ্যাঠতুত দিদি ব্রজমোহন কলেজে পড়তেন। বয়সে দাদার চেয়ে কিছু বড়। ওঁর সঙ্গলাভের জন্য আমরা দুই ভাই-ই বিশেষ ব্যগ্র ছিলাম।

কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় নাবালক লজে থাকার সব চেয়ে স্মরণীয় স্মৃতি, মেজ জ্যাঠামশায়ের সান্নিধ্যলাভ। বর্তমান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য এক লুপ্ত যুগের স্মৃতি পরিবেশন করা, এ কথা ভূমিকায় বলেছি। ত্রিশ বা চল্লিশের দশকের বাঙালি সমাজের সঙ্গে আমার দৃষ্টিতে আজকের যুগের সমাজের সব চেয়ে বড় তফাত প্রধানত এক বিষয়ে। সে সময় জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিছু মানুষ দেখেছি—যাঁরা আদর্শনিষ্ঠায় চরিত্রগুণে অনন্যসাধারণ। তাঁরা নানা পথের পথিক—কেউ দেশের বা সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কেউ জ্ঞানসাধক, কেউ সাহিত্য বা শিল্পপ্রেমিক, কেউ বা ধর্মপ্রাণ মানুষ। এক ব্যাপারে এইসব বিভিন্নধর্মী মানুষ কিন্তু একই পথের পথিক ছিলেন। এঁরা সকলেই ব্যক্তিস্বার্থ আর দৈনন্দিনতার বাইরে এমন কিছু জিনিসকে জীবনের প্রধান অবলম্বন বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ

যাকে মূল্যবান মনে করেছে। এঁদের বেশির ভাগই আমাদের রাজনৈতিক, সংস্কৃতিগত বা ধর্মীয় ইতিহাসে পরিচিত নাম নন। কিন্তু এঁদের জীবনচর্যা বহু মানুষকে বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে একটু উঁচু তারে বাঁধতে উদ্বুদ্ধ করত। তখন জীবনে সুযোগ-সুবিধা, বৈষয়িক উন্নতির সম্ভাবনা নিতান্তই সীমিত ছিল। বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত মানুষ ফলে একটা অভাব বা ব্যর্থতাবোধে ভুগত। আমি যাঁদের কথা বলছি, তাঁরা শ্বাসরোধকারী পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষা করে এক মহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

আমার মেজ জ্যাঠামশাই হিমাংশুবাবু এই শ্রেণির মানুষ ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওঁর সূক্ষ্ম রুচিবোধ ছিল। এক দিকে সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শনে উনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অন্য দিকে ওঁর শোওয়ার ঘরের কোনায় ছোট আলমারিটি কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের ইংরাজি অনুবাদে ঠাসা ছিল। রোজ সন্ধেবেলা উনি নিজের ছেলেমেয়ে এবং আমাদের ডেকে কালিদাসের কাব্য পড়ে শোনাতেন এবং প্রাঞ্জল বাংলায় তার অনুবাদ করতেন। 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইত্যাদি মহাকবির প্রধান রচনাগুলির সঙ্গে এইভাবেই প্রথম পরিচয় ঘটে। আরও একটি অনবদ্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গে উনি আমাদের পরিচয় করান—প্রবোধেন্দু ঠাকুরের অনুবাদে কাদম্বরী। ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে অভিজাত জীবনের সেই অপূর্ব বর্ণনা যেন অন্য এক জগতে নিয়ে যেত। লণ্ঠনের অপর্যাপ্ত আলোয় অপ্রশস্ত খাটে বসে সেই সাহিত্যচর্চার স্মৃতি জীবনের এক মহার্ঘ সম্পদ হয়ে রয়েছে। জ্যাঠামশাই রবীন্দ্রকাব্যও ভারী সুন্দর আবৃত্তি করতেন। যৌবনে লেখা ওঁর ছোট একটি কাব্যগ্রন্থ ছিল—'অনবসিতা'। রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত রচনা, কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে প্রথম পাঠ ওঁর কাছ থেকে পাই। কিন্তু ওঁর জীবনের যা মূল অবলম্বন, সেই গভীর ধর্মানুভূতির জগতে বিশ্বাসের অভাবে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না। সেই অবিশ্বাস ত্যাগ করার কোনও কারণ এখন অবধি খুঁজে পাইনি। ইতিহাসে ধর্ম নানা অনিষ্টের কারণ হয়েছে—এ কথা না মানারও কোনও হেতু দেখি না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস যে ব্যক্তিমানুষকে চেতনার উচ্চতম সম্ভাবনায় পৌঁছে দিতে পারে, ইতিহাস এবং নিজের অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ বারবারই পেয়েছি। এ কথাটা ঈশ্বর আছেন কি নেই—এ প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের মতো ধর্মচিন্তাও মানুষের সৃজনীশক্তির অন্যতর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এ তথ্যের প্রথম সন্ধান পাই জ্যাঠামশায়ের জীবনে।

উনি পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিদিন আদ্যোপান্ত 'চণ্ডী' পাঠ করতেন। কিন্তু ওই পৌরাণিক কাহিনির মর্মার্থ ওঁর কাছে কী ছিল জানি না। দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধের কাহিনি ওঁর চেতনা উদ্দীপ্ত করত—মনে হয় না। ওই কাহিনি কল্পনা করে সূক্ষ্ম রুচিবান মানুষের চোখ দিয়ে অনর্গল অশ্রুবর্ষণ হয়? ওঁর আর একটি প্রিয় স্তব ছিল 'কর্পূরাদিস্তোত্র'—যেখানে মহাকালীর ভয়াবহ বর্ণনা আছে। তাঁর কটিতে মানুষের কাটা হাতের মালা, গলায় নরমুণ্ডের, তাঁর কর্ণভূষণ দুটি শিশুর কাটা মাথা। লোল জিহ্বা থেকে রক্ত যুঝিয়ে পড়ছে। এ বর্ণনায়ও ওঁর অনর্গল অশ্রুবর্ষণ হত, যেমন হত পূজার সময় বলির দৃশ্যে। এইসব আপাত ভয়াবহ বর্ণনা বা দৃশ্যে উনি কোন করুণাময়ী বিশ্বমাতার রূপ দেখতে

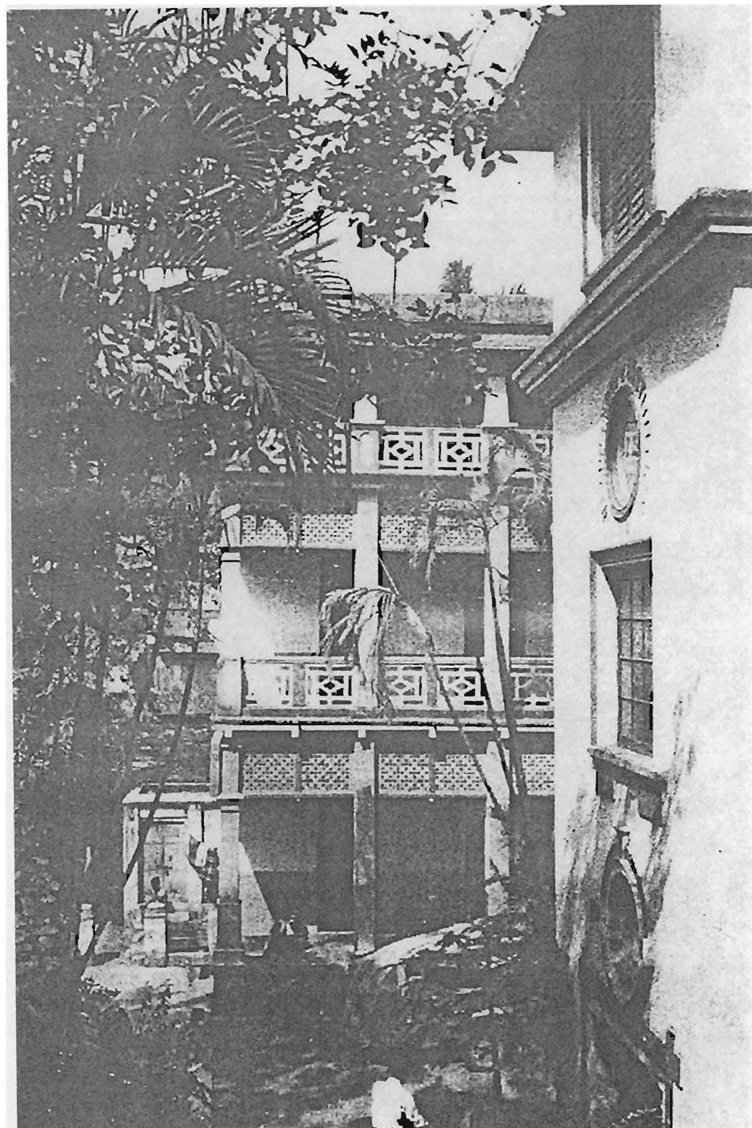
পেতেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু এসব সময় ওঁর অশ্রুসিক্ত মুখ দেখে বুঝতে পারতাম, অনুভূতি বা চেতনার যে-জগতে উনি পৌঁছেছেন, তা আমাদের নাগালের বাইরে।

ওই জগৎ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এবং বিস্ময়বোধ ছিল, কিন্তু বিশ্বাস কখনওই ছিল না। তাই জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে যা পেয়েছিলাম তা হল কাব্যসাহিত্যের জগতে প্রবেশপত্র। উনি এবং আমার বাবা দু'জনেই উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ছিলেন। কীর্তিপাশার স্টেজে গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতির ভূমিকায় ওঁদের অভিনয় কলকাতার পেশাদারি স্টেজে বিখ্যাত নটদের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। ওঁদের পড়া শুনে শুনেই প্রথম রবীন্দ্ররচনায় অনুরাগ জন্মায়। জ্যাঠামশায় 'কথা ও কাহিনি'কে সাহিত্য হিসাবে খুব উঁচু জায়গা দিতেন। বলতেন—গল্পকথা বলে সাহিত্যপ্রেমিকরা ওই কবিতাগুলিকে উচিত মূল্য দেননি। বাবার প্রিয় কাব্যগ্রন্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটি কবিতাগ্রন্থ—'বলাকা' আর 'পলাতকা'। ওঁদের পড়া শুনে শুনে যে-অলোকসামান্য জগতের পথ দেখতে পেলাম, তার বিচিত্র প্রকৃতি আবিষ্কারের উপায় অনেকটা বরিশালের বাড়িতেই ছিল। মেজজ্যাঠার বইয়ের আলমারিতে ইবসেন, মোপাসাঁ, টলস্টয়ের লেখার সন্ধান পাই। তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে 'রেজারেকশন' পড়ে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে ঐতিহ্যলব্ধ ধারণা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। আমাদের বসবার ঘরে বড় বড় তিনটে আলমারিতে ঠাকুর্দা এবং বাবার সংগ্রহ করা বইগুলি ছিল। বাংলা বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় লেখার প্রথম সংস্করণ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের উপন্যাস, বাঁধানো 'প্রবাসী' আর 'ভারতবর্ষ'। ইংরাজি বইয়ের সংগ্রহ অসম বৈচিত্র্যে ভাস্বর। একটা শেলফ্ জুড়ে ডিকেন্স-এর উপন্যাস-সমগ্রর চামড়ায় বাঁধানো রাজসংস্করণ। তা ছাড়া শেলি, কিটস্, ব্রাউনিং, বায়রন, গলসওয়ার্দি আর ক্নুট হামসুন, স্ট্রিন্ডবার্গ, ইয়োহান বয়্যার প্রমুখ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লেখকদের বেশ কিছু বই। নিচু সুরে বাঁধা জনপ্রিয় ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে ছিল রাইডার হ্যাগার্ড, বুলওয়ার লিটন, মারি করেলির লেখা। ইংরাজি ভাষা কিছুটা সড়গড় হওয়ার পর ভালমন্দ সবরকম লেখাই গোগ্রাসে গিলতাম। আর একটি আলমারি ভর্তি ছিল ঠাকুর্দার বিশেষ শখের সংগ্রহ—থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত যাবতীয় রচনা এবং তার সঙ্গে প্রেততত্ত্ব বিষয়ক আরও অনেক বই। ঠাকুর্দা ভগবানে বিশ্বাস না করলেও ভূতে বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে ভুরু কুঁচকে নাকি প্রতিপ্রশ্ন করতেন, "ভগবান নেই বলে ভূতও থাকবে না, এমন কোনও কথা আছে?" এসব বই ছাড়া, সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত বেশ কিছু বাংলা-ইংরাজি বই ছিল।

নানা বিষয়ে বইয়ের সংগ্রহ শুধু আমাদের বাড়িতেই ছিল এমন না। বরিশালে অনেক ভদ্রলোকের বাড়িতেই প্রচুর সংখ্যক বই ছিল। কীর্তিপাশা ইস্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রকাকার ছোট ভাই মোক্তার মনাই দত্তর বাড়িতে অন্তত দু-তিন হাজার বই ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য—তখন Everyman-এর বইয়ের দাম ছিল প্রতি খণ্ড এক টাকা দু-আনা। Penguin বোধ হয় ১৯৩৬ বা ১৯৩৭ সনে প্রকাশ শুরু হয়। দাম প্রতি খণ্ড ছয় আনা। Everyman, Worlds Classics, Nelsons Classics ইত্যাদি সিরিজের প্রত্যেকটি বই

মনাইকাকা কিনেছিলেন। উনি অল্প বয়সে বখে গিয়ে আই.এ. পাস করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দেন। ফলে পেশায় তিনি উকিল না, মোক্তার। কিন্তু উন্নাসিক ইংরাজি দৈনিক স্টেটসম্যানে এই মফস্বলবাসী আই.এ. পাস মোক্তারের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। বিখ্যাত লড়াকু পণ্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে কয়েক হাজার বই ছিল। শুনেছি ওঁদের বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা আট-দশ হাজারের কম ছিল না। শুধু শেখার আনন্দে দেবপ্রসাদবাবু আঠারোটি ভাষা শিখেছিলেন। সায়েস্তাবাদের নবাবের বাড়িতে রীতিমতো লাইব্রেরি ছিল। মাস-মাইনে দিয়ে লাইব্রেরিয়ান রেখে সেসব বইয়ের তত্ত্বাবধান করাতেন। পরিচিত ভদ্রলোকদের নিখরচায় এইসব বই ধার দেওয়া হত। এ ছাড়াও ছিল পাবলিক লাইব্রেরি, শঙ্কর মঠ এবং রামকৃষ্ণ মঠের গ্রন্থসংগ্রহ, প্রতিটি স্কুলে এবং ব্রজমোহন কলেজে বেশ চমক লাগার মতো গ্রন্থসংগ্রহ। বরিশাল জিলা স্কুলের লাইব্রেরিতে মোগল যুগের ইতিহাস সম্পর্কীয় আকর গ্রন্থের যা-কিছু ইংরাজি অনুবাদে পাওয়া যায় তার সবই ছিল। একজন মাস্টারমশাই ক্লাসে ওই বইগুলি থেকে পড়ে শোনাতেন। মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ওইভাবেই শুরু হয়।

এইসব পুস্তক সংগ্রহ আর গ্রন্থাগারের কথা তুললাম একটি কারণে। উনিশ শতকে যে-পশ্চিমি শিক্ষার শুরু হয়—বাঙালিজীবনে তার একটি মহৎ দান বিশ্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্তহীন কৌতূহল। ১৯১৭ সনে স্যাডলার কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন যে, শিক্ষিত বাঙালি যুবক শুধু নিজের দেশে কী হচ্ছে জেনে তুষ্ট না, লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কে জ্ঞানের জগতে কী হচ্ছে সে খবর জানার জন্য তার দুরন্ত আগ্রহ। বরিশালের শিক্ষিত মহলে এই প্রবণতা স্পষ্টতই নজরে আসত। টাউন হলের পাশেই কালা ভাইয়ের দোকানে নানা বিষয়ের বই পাওয়া যেত। একটা শেলফ্ জুড়ে ফরাসি বই ছিল। ওই ভাষাটি ভালভাবে পড়তে পারেন, এ রকম বেশ কয়েকজন লোক ছিলেন। এঁদের একজনের সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পাই। তিনি বঙ্কিম রায়চৌধুরী। জন্ম থেকে প্রায় দৃষ্টিহীন মানুষটি স্থানীয় গার্লস স্কুলে এবং পরে ব্রজমোহন কলেজে পড়াতেন। জীবনের অধিকাংশ কেটেছে পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরিতে। ওই সামান্য আয়ে উনি রীতিমতো চমকপ্রদ লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে উনি গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপের প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ায় ওঁর গবেষণা আর এগোয়নি। কারণ কিছুটা অর্থাভাব। বোধহয় একটা মান-অভিমানের ব্যাপারও ছিল। কারণ ও বছর স্কলারশিপটা যিনি পান, ওঁর সঙ্গে সত্যিই তাঁর তুলনা হত না। ইতিহাসের ছাত্র হলেও বঙ্কিমবাবুর প্রধান আনন্দ ছিল সাহিত্যে। সংস্কৃত কাব্য আর ইংরাজি কবিতা উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখস্থ বলে যেতেন। আর্থিক অনটন, লেখাপড়ার জগতে ব্যর্থ উচ্চাশা ওঁর জীবনে কোনও তিক্ততার সৃষ্টি করেনি। সাহিত্য শিল্প ইতিহাস থেকে উনি যে গভীর আনন্দ পেতেন, তা ওঁকে সমস্ত অভাব আর ব্যর্থতাবোধ উত্তরণ করে এক শুদ্ধ রসলোকে নিয়ে যেত। ওই দরিদ্র মানুষটি দুঃখী ছিলেন না। যে আনন্দর নাগাল উনি পেয়েছিলেন, কৃষ্টির দিক থেকে ওঁর তুলনায় নিচু স্তরের মানুষের তা পাওয়া সম্ভব না। প্রায় দৃষ্টিহীন মানুষটির গ্রন্থসংগ্রহে অপ্রত্যাশিত একটি জিনিস ছিল, রেনেসাঁসের সময়



জগদ্বন্ধু স্কুল। জীবনের প্রথম ইস্কুলটিকে বড় ভাল লেগেছিল



বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল



মেজ জ্যাঠামশাই হিমাংশু রায়চৌধুরী



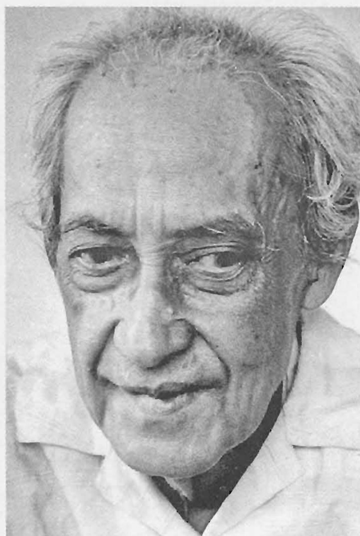
ফজলুল হক



সত্যব্রত ঘোষ



অধ্যাপক তারকনাথ সেন



অধ্যাপক সুশোভন সরকার



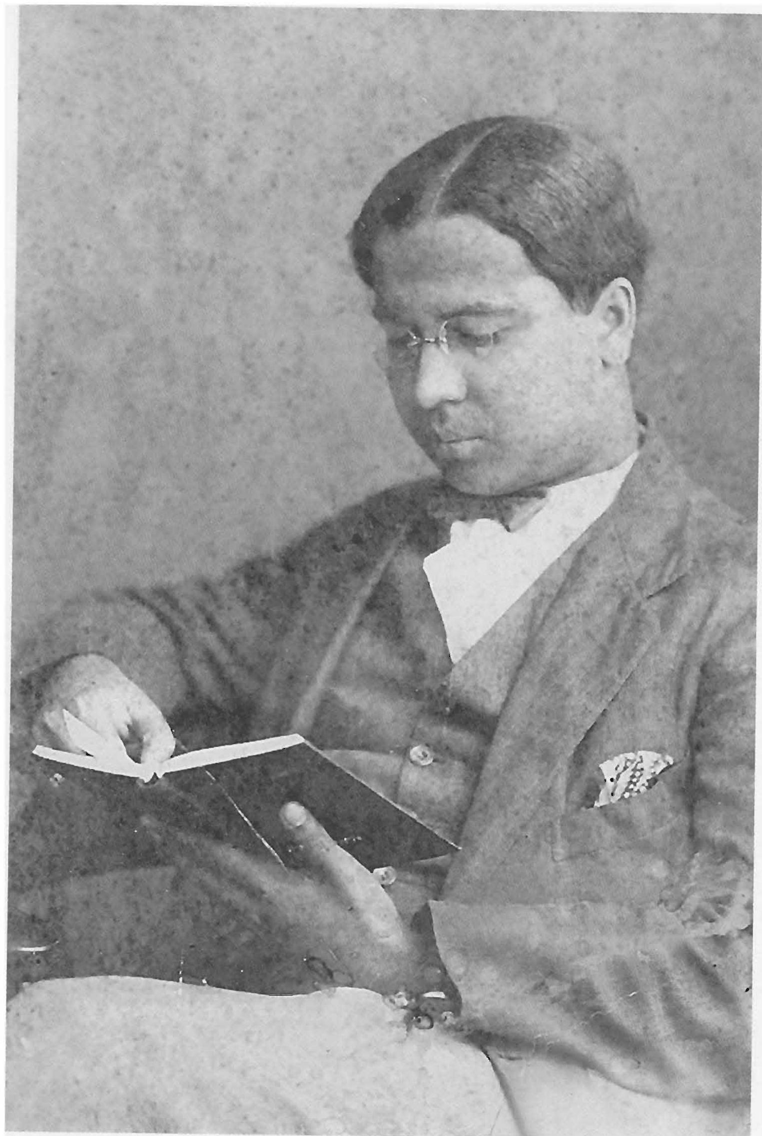
ডাফ হস্টেল



স্কটিশ চার্চ কলেজ



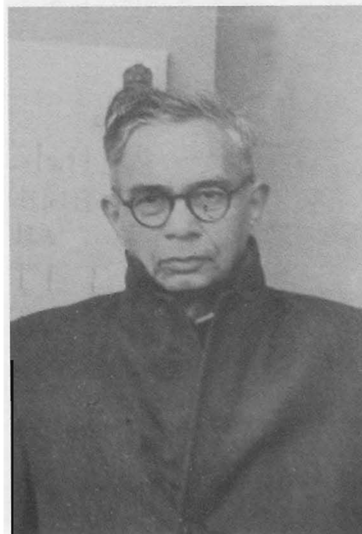
প্রেসিডেন্সি কলেজ



বিলেতে ছাত্রাবস্থায় কিরণশঙ্কর


ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত


কিরণশঙ্করের পুত্র কল্যাণশঙ্কর রায়


নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ


সুকুমার সেন

থেকে আধুনিক কাল অবধি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি। প্রায় চোখের সঙ্গে ঠেকিয়ে ওই ছবিগুলি উনি দেখতেন। ওই সীমিত পরিচয় থেকেই উনি অনেকটা তৃপ্তি পেতেন। সেই বিগত যুগের রেখাচিত্র আঁকতে গিয়ে একটা কথাই বারবার বলা প্রয়োজন মনে করি। সে যুগে শিক্ষিত সমাজে অনেক মানুষ ছিলেন যাঁরা অন্য কোনও ফলের প্রত্যাশা না রেখে শিল্প বা জ্ঞানের চর্চা অথবা কোনও আদর্শ অনুসরণ করে জীবনের সার্থকতা লাভ করতেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বহুমুখী সুযোগ-সুবিধা এবং কিছুটা আর্থিক সাচ্ছল্য পাওয়ায় আমাদের জীবনের সেই ধারাটি প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। প্রায়, কিন্তু সম্পূর্ণ না। যখন শুনি যে পশ্চিমবঙ্গের এক মফস্‌সল শহরে একটি সাইকেলের দোকান কেন্দ্র করে গ্রিক ভাষা, সাহিত্য, দর্শনচর্চার জন্য একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তখন বুঝি যে ত্রিশ-চল্লিশের দশকে আমাদের ছোট শহরটিতে যে-জীবনাদর্শের পরিচয় পেয়েছিলাম, তা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি।

'ভদ্রজনের বাসা' বরিশাল শহরে মানুষের হাতে অবসর ছিল যথেষ্ট। তার একটা বড় অংশ গালগল্প আড্ডায় খরচা হত সন্দেহ নেই। কিন্তু সব আড্ডাই নেহাত ভেরেন্ডাভাজায় ব্যয় হত না। মেজজ্যাঠার আসরে বঙ্কিমবাবু, সংস্কৃতের অধ্যাপক অতুল দাস, তাঁর ছেলে সাহিত্যিক অমূল্য দাস (ছদ্মনাম 'সম্বুদ্ধ') যখন আসতেন তখন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য আলোচনা হত। বাবার কাছে আসতেন স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা— কংগ্রেস থেকে শুরু করে মুসলিম লিগ অবধি নানা দলের মানুষ। এঁরা কখনও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, কখনও আলোচ্য বিষয় থাকত কোনও স্থানীয় সমস্যা যা আবেদন-নিবেদন বা আন্দোলনের পথে সমাধানের চেষ্টা হত।

বাবার বৈঠকখানায় যাঁরা আসতেন তাঁরা অনেকেই এক সময় বিপ্লবী ছিলেন— 'অনুশীলন' বা 'যুগান্তর' দলের সভ্য হিসাবে। পরে কেউ গাঁধীবাদী, কেউ বা কমিউনিস্ট অথবা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সভ্য। খান ইসমাইল চৌধুরীর ছেলে শাহজাহান চৌধুরী, আমাদের শাজু কাকা, স্থানীয় রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা। বিপ্লবীরা একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেন না—পুলিশি অত্যাচার। এঁরা কেউ কেউ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি-সংলগ্ন টিনের ঘরে রাত কাটাতেন। ওঁদের সঙ্গে কালেক্টরেটের পুকুরে স্নান করতে যেতাম। তখন দেখতাম অনেকের গায়ে মাথায় বীভৎস ক্ষতচিহ্ন। প্রশ্ন করলে অনেকে চুপ করে থাকতেন। কেউ কেউ বলতেন—ওগুলি পুলিশি কৃপার স্মৃতিচিহ্ন। কেউ তকমা পেয়েছেন শোভাযাত্রায় গুলি বা লাঠি চার্জের ফলে, আর কারও তকমা রুদ্ধদ্বার কক্ষে পুলিশের সঙ্গে নিভৃত বিশ্রম্ভালাভের স্মৃতি বহন করত। একদিন বৈঠকখানা ঘরে অনেকে বসে আছেন, একটি মানুষ ঢুকলেন যাঁর চুল উসকো-খুসকো, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। সবাই উঠে দাঁড়াল। উনি কিছুক্ষণ বসে থেকে আপনমনে বিড়বিড় করে কী বললেন। তারপর উঠে চলে গেলেন। শুনলাম ইনি উল্লাসকর দত্ত। আন্দামানে পুলিশি অত্যাচারে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বরিশাল জেলায় কংগ্রেসি দেশপ্রেমিকদের মুকুটহীন রাজা ছিলেন সতীন্দ্রনাথ সেন, সার্বজনীন সতীনদা। বলা বাহুল্য ওঁর শিরস্থিত অদৃশ্য মুকুট কণ্টকনির্মিত। বয়ঃপ্রাপ্তির পর

তাঁর পরিণত জীবনের অর্ধেকেরও বেশি কাটে জেলখানায়। শেষ বছরগুলি কাটে পাকিস্তানি জেলে। সেখানেই যক্ষ্মারোগে বিনা চিকিৎসায় ওঁর মৃত্যু হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতবাসী তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের পরিষদ ভবনে এবং লোকসভার দেয়ালে ওঁর ছবি ঝুলছে। কলকাতায় এক চৌমাথার মোড়ে ওঁর আবক্ষ প্রস্তরমূর্তিও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু ওঁর এবং ওঁর সহকর্মীদের আড়ম্বরহীন আত্মত্যাগ, আজীবন দুঃখবরণ আমরা মনে রাখিনি। আমাদের সাম্প্রতিককালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেকাংশে সেই ত্যাগের মূল্যে কেনা, এ চেতনা ক্ষীণ হতে হতে প্রায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া চরিত্রের সম্পর্কে আলোচনা যখন শুনি, তখন অনেকগুলি মুখ মনে পড়ে। সতীনদার সবসময়ের সঙ্গী তারাপদ ঘোষ, তাঁর ছোট ভাই কুট্টি, শান্ত স্বল্পভাষী গাঁধীবাদী কর্মী বিনোদ কাঞ্জিলাল, সর্বত্যাগী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা—এঁদের তুলনীয় মানুষ এখন আর দেখতে পাই না তো! কেমব্রিজের তরুণ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয় রাজনীতির স্বার্থভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তুখোড় বুদ্ধিদীপ্ত হাবিলদারচর্চা গোষ্ঠীর গবেষকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে এলিট-গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রয়াসই দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ওই যে সব মানুষ ঐহিক জীবনে অন্তহীন বঞ্চনা মেনে নিয়ে দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার কাজে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, এই সব ঐতিহাসিক হিসাবনিকাশে তাঁদের সন্ধান পাই না কেন? কোন স্বার্থবুদ্ধি তাঁদের প্রণোদিত করেছিল? তাঁদের সীমাহীন দুঃখবরণের পেছনে কোন ঐহিক সুখের আশা হাতছানি দিচ্ছিল?

কিন্তু ওঁদের রাজনৈতিক প্রয়াসে ফাঁকি না থাকলেও অনেক ফাঁক ছিল সন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট বা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির স্থানীয় নেতারা ছাত্রদের মধ্য থেকে নতুন কর্মী বা সভ্য জোটাবার চেষ্টা করতেন ঠিকই, কিন্তু কংগ্রেসের দিক থেকে এরকম প্রচেষ্টা আমাদের শহরে বিশেষ দেখিনি। এ. আই. সি. সি-র নির্বাচনের সময় এলে চার আনা চাঁদা নিয়ে সভ্য করার একটা চেষ্টা হত। কিন্তু সে চেষ্টাকে কর্মীসংগ্রহের চেষ্টা বলা চলত না। স্থানীয় বা দেশব্যাপী আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দিলে অনেক তরুণ কর্মী জুটত ঠিকই। কিন্তু স্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই ভাবে অবস্থা-নির্ভর কর্মীসংগ্রহ যথেষ্ট ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা—প্রায় কোনও রাজনৈতিক দলই মধ্যবিত্তর গণ্ডির বাইরে থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা দল এ বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিল সন্দেহ নেই। ওঁদের শোভাযাত্রায় গ্রামীণ কৃষকশ্রেণির লোক দেখা যেত, যেমন কমিউনিস্টদের শোভাযাত্রায় নিম্নবর্গীয় শহুরে মানুষরা অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু কোনও দলেরই পার্টি অফিসে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণির লোক দেখিনি। টাউন হলের উল্টো দিকে দরমার বেড়ার ঘরে পাশাপাশি সব বিভিন্ন দলের দফতর ছিল। সেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং যে-দল যে-মতবাদে বিশ্বাসী তার তত্ত্বকথা সম্পর্কিত বেশ কিছু বই থাকত। মার্কসবাদ, গাঁধীবাদ, সমাজতন্ত্রবিষয়ক তত্ত্বচিন্তার রূপরেখা, নানা দেশে বিপ্লবের ইতিহাস ইত্যাদি বহু বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় প্রথম ওইখানেই হয়। বলাবাহুল্য, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গণ্ডির বাইরে কেউ এই সব তত্ত্ব বা তথ্যের নাগাল পেতেন না। শুনতাম, কমিউনিস্টরা তাঁদের নিম্নবর্গীয় সভ্য বা সমর্থকদের রাজনৈতিক

শিক্ষার জন্য ক্লাস করতেন। এই ধরনের পঠন-পাঠন নিয়মিত হত কি না এবং হলেও কতটা ফলপ্রদ হত তা আমার জানা নেই। আমি কংগ্রেসি সমাজতন্ত্রীদের চেষ্টায় যে-রাজনীতির ক্লাস হত, তাতে গিয়েছি। ব্যাপারটা ঠিক নিয়মিত ভাবে হত না, কর্মীরা সুযোগ-সুবিধামতো ক্লাস নিতেন। ফলে আমাদের যদি পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান হয়ে থাকে, তা বক্তৃতা শুনে না, পার্টি অফিস থেকে বই ধার করে পড়ে।

রাজনৈতিক দলগুলির কর্মী/সমর্থক সংগ্রহের ব্যাপারে আর একটা বড় ফাঁক ছিল। মুসলিম লিগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি ছাড়া অন্য কোনও দলের কর্মীদের মধ্যে মুসলমানদের দেখা যেত না। এর ব্যতিক্রম ছিল শাহজাহান চৌধুরীর নেতৃত্বে রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির বরিশাল শাখা, কিন্তু ১৯৪১ সনে শাজুকাকা যখন মুসলিম লিগে যোগ দিলেন, সম্ভবত তখনই এই ব্যতিক্রমেরও অবসান ঘটল। ত্রিশের দশকেও মুসলমান কর্মীরা বরিশালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার পরিচিত বহু কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে একজনও মুসলমান ছিলেন না। তখন মুসলিম লিগ এবং কৃষক প্রজা পার্টির অভ্যুত্থানের যুগ, মুসলমান ছাত্ররা অধিকাংশ ফজলুল হক সাহেবের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ক্রমে মুসলিম রাজনীতিরও ধারা বদল হচ্ছিল।

ইস্কুলের জীবনে এই পরিবর্তনের ছায়া পড়েছিল। সরকারি ইস্কুল, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা দুটি লোহার ট্যাঙ্কে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। কোনও কোনও মুসলিম সহপাঠী আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে, তাঁরা হিন্দুদের ছোঁয়া খান না। সত্যিতে মুসলমানদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাত না। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক তথা সাম্প্রদায়িক চেতনার যুগে হিন্দুদের ছুৎমার্গের পাল্টা জবাব হিসাবেই ওঁদের মধ্যে এ জাতীয় ব্যবহারের সূচনা হয় বলে আমার বিশ্বাস। এই নতুন অর্জিত গোঁড়ামি যে অল্পদিনের মধ্যেই ঐতিহ্য-লব্ধ আচার বলে স্বীকৃতি পায়—তসলিমার আত্মচরিতে তার প্রমাণ পাই। একদিন আমরা কয়েকজন শোরগোল করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় এক ঘোড়ার গাড়ি থেকে কিছু সিনেমার হ্যান্ডবিল ছুঁড়ে দিল। বক্তব্য জগদীশ থিয়েটারে 'ভক্ত প্রহ্লাদ' নামের একটি ছবি দেখানো হচ্ছে। আমার এক সহপাঠী কাগজটা নিয়ে তাতে থুতু ছেটাল। "এটা কী করলি" জিগ্যেস করায় উত্তর হল, "তুই একদিন হাতেম তাই ছবির হ্যান্ডবিলে থুতু দিয়েছিলি।" এ রকম ঘটনা কখনও ঘটেনি, কারণ 'হাতেম তাই' বলে কোনও ছবি কখনও তৈরি হয়েছে বলেই আমার জানা ছিল না। কিন্তু বন্ধুটির উক্তির পেছনে কী মনোভাব কাজ করছিল তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। সেই মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটত মোহনবাগান-মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার দিনে। একবার ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছে। আমার ওই বন্ধুটিই মন্তব্য করলেন, "ইস্টবেঙ্গল জিতেছে তাতে মালাউনদের এত আহ্লাদ কেন?" বক্তব্যর হেতু—ইস্টবেঙ্গল দলেরও অনেকগুলি খেলোয়াড় মুসলমান। একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই বন্ধুটি পরে পূর্ব পাকিস্তানের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁর লেখায় সাম্প্রদায়িকতার কোনও চিহ্নমাত্র ছিল না। অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে গিয়ে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা গভীর মানবিকতাবোধকে স্বধর্ম বলে গ্রহণ

করেন। কিন্তু আমরা যখন ইস্কুলে পড়ি তখনও সে দিন বহু দূর।

স্কুলে দু'দিন দুটি ঘটনা ঘটে, তাতে হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হল না। একদিন ক্লাসে ইতিহাসের পরীক্ষায় প্রশ্ন এল, 'শিবাজী যে শুধুমাত্র ধূর্তামি, শঠতা আর মিথ্যাচারের বলে রাজ্যস্থাপন করেছিল, প্রমাণ-সহ তাহা আলোচনা কর।' এই মাস্টারমশাইয়ের ক্লাসে, ক্লাস শেষ হওয়ার সময় জহুর বলে একটি ছেলে নিতান্তই অকারণ পুলকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তুলেছিল। শিক্ষক ওঁকে বেদম পেটালেন, অথচ উনি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার কোনও লক্ষণ কখনও দেখাননি। আমি নিজে ওঁর খুবই স্নেহের পাত্র ছিলাম। চট্টগ্রাম শহরে ওঁর বাড়ি গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকেছি। সেখানে আদর-যত্নের কোনও অভাব হয়নি। যে-জাতীয় সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা আমরা আমাদের মুসলমান সহপাঠীদের অনেকের মুখে শুনতাম, হিন্দুদের মধ্যেও ঠিক এই রকম কথাবার্তাই হত বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের বাড়িতে হত না। সাম্প্রদায়িকতা যে জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু, এ কথা বাবা সব সময়ই বলতেন। আমাদের চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও প্রায় সবাই একই পথের পথিক। আর আমাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু ছিলেন খান ইসমাইল চৌধুরীর পরিবার এবং ফজলুল হক স্বয়ং। হিন্দু পরিচালিত খবরের কাগজে ওঁকে নিয়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা হত। উনি তাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু বরিশালবাসীর কাছে উনি ছিলেন সম্প্রদায়নিরপেক্ষ সর্বজনপ্রিয় মানুষ। রাজনীতির নানা হেরফের সত্ত্বেও এ ভালবাসা উনি কখনও হারাননি।

যখন দ্বিজাতি তত্ত্বর প্রথম অবতারণ হল, তখন একদিন বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "বাবা, এটা কি সত্যি কথা? মুসলমানরা আর আমরা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন নেশন?" বাবার স্পষ্ট উত্তর, "না, আমরা ভাই।" "তবে এ সব কথা উঠছে কেন?" "শরিকি বাড়ির ছেলে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কেন? সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে কাজিয়া বেধেছে।" "এর পরিণাম কী হবে? এ ঝগড়া কি মিটবে?" "না, এসব মেটে না। এ একবার শুরু হলে দুয়েরই সর্বনাশ ঘটে। 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি', আমাদের সর্বনাশ আসন্ন।" কলকাতা শহরে '৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সেই সর্বনাশের চেহারা দেখেছিলাম। কিন্তু সর্বনাশ ঘটলেও সব কিছু নাশ হয় না। তাই আমরা এখনও বেঁচে আছি। এখনও ভরসা রাখি যে দুই সম্প্রদায়েরই দুর্বৃত্তদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন মানবিকতাবোধে উদ্দীপ্ত শুভবুদ্ধিরই জয় হবে। বৃহত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার নিরঙ্কুশ জয়লাভ এখনও হয়নি।

আমার মুসলমান সহপাঠীদের মধ্যে শুধু একজনই সম্প্রদায়নিরপেক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল। মুজিবর রহমান ওরফে সোনা মিঞা। গ্রামের ছেলে। ক্লাসে ওই ফার্স্ট হত। হেডমাস্টার সিরাজউদ্দিন আহমেদ মুজিবকে ইস্কুল-সংলগ্ন হস্টেলে থাকার জায়গা দিয়েছিলেন—সম্ভবত নিখরচায়। মুজিব শাহজাহান চৌধুরীর দলে যোগ দিয়েছিল। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। সাতদিন পর ওকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাজতবাসের ফলে ইস্কুল-হস্টেলের ঘরে থাকা আর চলল না। ১৯৩৯ সনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বঙ্গের সর্বত্র আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের বাইরের চেহারাটা ছিল সর্বদলীয়। ফলে আমরাও এইসব জলুশ আর ধর্মঘটে যোগ দিই।

সরকারি স্কুল। ক্লাসের পরীক্ষায় ভাল করায় কিছু জলপানি পেতাম। স্কুলের নিয়মবিরুদ্ধ ওইসব কাজের জন্য জলপানি বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু স্নেহপ্রবণ হেডমাস্টার সাহেব আমাদের নষ্টামি দেখেও দেখতেন না। জলপানি বন্ধ হয়নি।

সিরাজউদ্দিন আহমেদের মতো সুপুরুষ কমই দেখেছি। ধবধবে ফরসা রং, কটা চোখ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা মানুষটির চেহারার সঙ্গে পঞ্চম জর্জের চেহারার বিশেষ মিল ছিল। উনি কাউকে কখনও বকেননি, বা শাস্তি দেননি। কারও সঙ্গেই বিশেষ কথাও বলতেন না। কিন্তু ওঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব ঘিরে এক রাজকীয় গাম্ভীর্য ছিল। তাতেই আমরা ভয় পেতাম। জিলা স্কুলে পড়বার সময় আমার একবার মরণাপন্ন অসুখ হয়। সিরাজউদ্দিন সাহেব দেখতে এসেছিলেন। চলে যাবার সময় মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে দেখলাম—ওঁর চোখে জল। উনি উঁচু ক্লাসে ইংরাজি পড়াতেন—বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং অত্যন্ত মার্জিত ইংরাজিতে। উনি আমাদের বাইবেল পড়তে উৎসাহ দিতেন। বলতেন এই সপ্তদশ শতকের ইংরাজি এখন অচল। কিন্তু জটিল কথা কীভাবে সহজতম ভাষায় বলা যায় তার উদাহরণ ইংরাজি বাইবেলের চেয়ে ভাল কোথাও নেই। অবসর নেওয়ার আগেই উনি এবং ওঁর স্ত্রী একই সঙ্গে অসুস্থ হলেন। কী অসুখ বুঝতে পারা গেল না। তিন-চার দিনের জ্বরে দু'জনেই চলে গেলেন—একদিন আগে-পরে। তখন ওঁর বয়স তিপ্পান্ন কি চুয়ান্ন।

ইস্কুলের বাইরেও মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আমাদের একটা সামাজিক সম্পর্ক ছিল। দু-তিনজন একত্র হয়ে আমরা ওঁদের বাড়িতে যেতাম। বেশির ভাগ সময় শুধু মুজিবর আর আমি। কখনও রবিবার সকালবেলা প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হলে মুসলমান শিক্ষকরা একটু বিদ্রূপের সুরে জিগ্যেস করতেন, "নাস্তা খাবা?" প্রশ্নটার মর্মার্থ না বুঝে এবং ওঁরা যাতে বিব্রত না হন সে কথা ভেবে প্রথম প্রথম মানা করতাম। পরে বুঝলাম—এই না বলার ভুল অর্থ হতে পারে। তাই একটু বেশি উৎসাহ দেখিয়েই খেতাম। কেউ কেউ প্রশ্ন করতেন, "তোমাগো মা-বাপে কিছু কইবে না তো?" সগর্বে উত্তর দিতাম, "আমাদের মা-বাবা এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না।"

নদীর পাড়ে একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে আমাদের এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফছি সাহেব বাস করতেন। ফছি নামে আরও একজন শিক্ষক ছিলেন। তাই নদীর পাড়ের বাসিন্দাটিকে সবাই বলত বড় ফছি সাহেব। একদিন আমাদের কলকাতা-প্রবাসী বড়দা আর আমি নদীর পাড়ে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ বড় ফছি সাহেবের সঙ্গে দেখা। বড়দার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উনি বিশেষ পীড়াপীড়ি শুরু করলেন—ওঁর বাড়িতে এক দিন চা খেতে হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা রাজি হলাম। ঠিক হল পরের দিনই আমরা যাব। বড়দা বললেন, "আশা করি কাবাব-টাবাব খাওয়াবে।" ভীষণ খুশি হয়ে ফছি সাহেব আমাদের আপ্যায়ন করে নিয়ে বসালেন। চা এল—তার উপর পুরু দুধের সর ভাসছে। বড়দাকে বললেন, "মোডা করিয়া মালাই দিছি। খায়েন তো?" বড়দা মিথ্যাভাষণ করলেন, "কয়েন কী? অমন জিনিস! খামু না!" তারপর এল পোড়া পোড়া ক'টুকরো পাউরুটি। অকৃতদার দরিদ্র মানুষটি এর বেশি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেননি। বড়দা একটু বিরক্তই হলেন। এই খাওয়াবার জন্য কেউ কাউকে নেমন্তন্ন করে? পরদিন বিকালে আবার ওঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। দেখলাম

বাড়ির বাইরে বেশ ভিড়। কিছু একটা ঘটেছে মনে হল। ঢুকে যা দেখলাম—তা কল্পনা করতে পারিনি। ফছি সাহেবের দেহটি ছাদের কড়ি থেকে ঝুলছে। উনি আত্মহত্যা করেছেন। ভদ্রলোকের বয়স তখন সত্তরের কাছে। কোন অজ্ঞাত দুঃখে উনি আত্মহত্যা করলেন তা কেউ জানতে পারেনি। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও তো উনি মহা উৎসাহে অতিথি আপ্যায়ন করছিলেন। তখন তো ওঁর জীবনের প্রতি কোনও বীতস্পৃহা দেখিনি!

আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন রাজনৈতিক চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ শিকড় গেড়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক সম্পর্কে তার ছায়া পড়েনি। স্থানীয় রাজনীতিতে শহরের মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কংগ্রেসপন্থী হিন্দুরা। আর জেলা বোর্ডে কৃষক প্রজা দলের মুসলমান প্রতিনিধিরা আধিপত্য করতেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর কংগ্রেস তাঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ করতে গররাজি হওয়ায় ফজলুল হক মুসলিম লিগের সহযোগিতায় খাজা-প্রজা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তপসিলি জাতির যোগেন মণ্ডল, বরিশালের উকিল হাসেম আলি খাঁ, এঁরা সব মন্ত্রিসভার সদস্য হন। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা আমাদের বৈঠকখানায় যেসব ভদ্রজনের পায়ের ধুলো পড়ত, তাঁরা সব সম্প্রদায়ের এবং সব দলেরই মানুষ। সামাজিকতা ছাড়া স্থানীয় সমস্যার সমাধানের উপায় আলোচনা হত। পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোকরা, বিশেষ করে ইসমাইল চৌধুরীর পরিবারের সবাই, নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। চৌধুরী সাহেবের বেগম এবং বাড়ির অন্যান্য মহিলারা আমাদের সামনে পর্দা করতেন না। ওঁদের বাড়িতে দাওয়াত বরিশালজীবনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরবর্তী জীবনে দিল্লি-লখনউর অভিজাত মুসলিম ভবনে খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। রামপুর-নবাবের বিখ্যাত বাবুর্চির রান্নাও খেয়েছি। কিন্তু চৌধুরী সাহেবের বাড়ির মোগলাই রান্নার চেয়ে স্বাদু খাবার কখনও কোথাও খেয়েছি এমন মনে পড়ে না। বেগম সাহেবা কিছু কিছু রান্না মাকে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু মা বলতেন—শেখাবার সময় উনি একটু কারচুপি করতেন, সুস্বাদের সব রহস্য প্রকাশ হত না, কারণ ভদ্রমহিলা ওঁর রন্ধনপটুত্বের কোনও প্রতিযোগী জোটে এটা একেবারেই চাইতেন না।

মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে ইদের নেমন্তন্ন বাঁধা ছিল। তখন বেশির ভাগ উচ্চ-মধ্যবিত্ত মুসলমান বাড়িতে গোমাংস ঢুকত না, ওটা প্রধানত দরিদ্র মুসলমান ভবনেই বেশি চালু ছিল। ক্বচিৎ-কখনও বাড়িতে গোমাংস রান্না হলে ছেলেদের উপর কড়া আদেশ থাকত তা যেন হিন্দু বন্ধুদের না দেওয়া হয়।। নিষিদ্ধ বস্তুর উপর আমার বরাবরই লোভ। আর মুসলমান-বন্ধুরা বলতেন—ভুনা গোস্ত আর শিককাবাব গোমাংসে যেমন জমে, আর কিছুতেই তেমন না। পরীক্ষা করে দেখলাম কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সুতরাং সুযোগ পেলেই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্যি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্পৃহার ফল। কিন্তু একদিন ধরা পড়লাম। যে বন্ধুটি নিষিদ্ধ মাংস খাওয়াত তার বাবা তাকে প্রচণ্ড ঠেঙালেন। আমাকেও খুব বকলেন, "আমার বাড়ি আইয়া তুমি জাইত খোয়াইলা। এহন তোমার বাপেরে আমি কী কমু?" কওনের আর কী বা ছিল? বিনয় সরকার মশাই বলতেন, বামনিরা এক থাল ষাঁড়ের ডালনা সামনে ধরে দিত, সেই খেয়ে তবে মুনিঠাকুররা উপনিষদ আর ঋক-সংহিতা রচনা করতেন। গোমাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা আর প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অবক্ষয়ের মধ্যে

যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। শরীরে উচ্চাঙ্গের প্রোটিন সরবরাহ বন্ধ করে দিলে, উচ্চাঙ্গের সৃষ্টিকর্ম যে বন্ধ হবে তাতে আর সন্দেহ কী? আর্যাবর্তে আজ এ কথা বলে পার পাওয়া কঠিন। গৈরিকপন্থী সোনার চাঁদেরা লেখা তো পোড়াবেই, সুযোগ পেলে লেখককেও পোড়াবে।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে আমার মোদ্দা কথা, রাজনৈতিক সম্পর্ক যেমনই হোক, ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার ছায়া পড়েনি। মুসলমান বন্ধু-বান্ধবরা সোজাসুজি বলতেন, "তোমাগো কংগ্রেসই আমাদের ডুবাইলে।" এ নিয়ে নির্দ্বিধায় তর্ক হত, কিন্তু মনোমালিন্য ঘটত না।

আমি অল্প বয়স থেকেই অতিশয় অকালপক্ব ছিলাম। তাই আমার সত্যিকার বন্ধুত্ব জমত বয়সে অনেক বড় মানুষদের সঙ্গে। যখন ১৩/১৪ বছর বয়স তখন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন বিখ্যাত বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। সঙ্গে এলেন তাঁর মার্কিন পত্নী এবং দুই সুন্দরী কিশোরী কন্যা। বরিশালের তরুণদের মধ্যে প্রেমের বান ডাকল। সে বানে আমিও ভেসে গেলাম। এসব কথা আলোচনার জন্য যোগ্য বন্ধুর প্রয়োজন। সে কাজ কি ইস্কুলের ক্যাবলা সহপাঠীদের দিয়ে চলে? বঙ্কিমবাবু আমার বন্ধুই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ব্যাপারটা বলব ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সাহস না পেয়ে রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনু ইত্যাদি বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনি উত্থাপন করে কী গুরুতর ব্যাপার ঘটছে তা পরোক্ষে বুঝিয়ে দিতাম।

উপযুক্ত শ্রোতা পেলাম মানিককাকাকে। মানিক ইসমাইল চৌধুরীর ভাইপো, আমার চেয়ে বয়সে ১২/১৩ বছরের বড়। উনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ ভয়াবহ সব কবিতা লিখতে শুরু করায় ওঁকে গুণমুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে পেলাম। সেসব কবিতা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। মানিককাকার সূক্ষ্ম রুচিবোধ ছিল এবং বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি এই চার ভাষাতেই উনি প্রচুর পড়াশুনো করেছিলেন। সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য কোনও কারণে উনি আমার কাব্যপ্রচেষ্টা অনুমোদন করলেন। উৎসাহের আধিক্যে বাংলার অধ্যাপক উদীয়মান কবি-সাহিত্যিক সুধাংশু চৌধুরীর কাছে আমার বিকচমান কবি-প্রতিভার কথা বললেন। একদিন মানিককাকার সঙ্গে সুধাংশুবাবুর বাড়ি গেলাম। মানিককাকার পীড়াপীড়িতে দু-একটা কবিতা ওঁকে দেখালাম। মনে হল—ভদ্রলোক গোঁফের আড়ালে হাসি চাপার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মুখে বললেন, "বেশ হয়েছে, আরও লেখ।" 'বেশ' যে হয়নি, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কোনও দৈবশক্তি আমাকে রক্ষা করল। বেশি দেরি হওয়ার আগেই কবি হওয়ার সাধনা ত্যাগ করি। সুধাংশুবাবুও অধ্যাপনা ও সাহিত্যকর্ম ছেড়ে ব্যবসায়ে নামেন। ওঁকে শেষ দেখি কলকাতার রাস্তায়। শোফার চালিত বিরাট গাড়িতে চলেছেন, মুখে সিগার, গোঁফ অন্তর্হিত।

মানিককাকা আমার কাব্যপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়ে ভাল করেননি। কিন্তু ওঁর কাছে বহু ফার্সি বয়েত শুনে আমার ভাষাটা সম্পর্কে কৌতূহল জন্মায়। বিশেষ করে একটি ধ্রুপদী গানের ফার্সি বয়েত আমার নবজাগ্রত প্রেমিক হৃদয়ে বড় ঝঙ্কার দিয়েছিল। বয়েতটি নিম্নরূপ—

“পা-এ সাগ বুসিদা মজনু
শখছ্-এ পুশ্‌ত্—ইয়ে চিস্‌ত
গোফত ইয়ে সাগ গাহে গাহে
রাহ্-এ লায়লা রফতাহ্ বুদ্।”

ভাবার্থ : মজনু একটি কুকুরের পদচুম্বন করলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, ‘এটা কী ব্যাপার?’ উত্তর হল, ‘লায়লার ভবন যে সরণিতে, এই সারমেয় মাঝে মাঝে সেই পথে যেত।’ অভিভূত হয়ে ইস্কুলের মৌলভি সাহেবের বাড়ি গিয়ে ফার্সি পড়া শুরু করলাম। জনাবের অনুকরণে মুখ বিকৃত করে ক্বাফ গাফ ধ্বনিতে বাড়ির সবার কান ও প্রাণ ঝালাপালা করতে লাগলাম। মানিককাকা খুশি হয়ে একখণ্ড ওমর খৈয়ামের রুবাইয়া উপহার দিলেন। সঙ্গে উপদেশ দিলেন, “এ কিন্তু প্রেমের কবিতা না, দর্শন। মহব্বত বুঝতে চাও তো নেজামি পড়।” সেই নেজামির সঙ্গে পরিচয় ঘটে অনেক পরে, ১৯৬৯ সনে হার্ভার্ডে যখন এক সেমেস্টার পড়াচ্ছি তখন আর একবার ফার্সির পাঠ নিতে গিয়ে। মানিককাকা নিজের অজান্তে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পথ নির্দেশ করে দিলেন। কিন্তু ফার্সি ভাষার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা ব্যর্থ প্রেমের। চোদ্দো বছর বয়স থেকে ভাষাটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি, বারবার বহু শিক্ষকের কাছে পড়েছি—দেশে এবং বিদেশে। কিন্তু ভাষাটার উপর সম্পূর্ণ দখল কখনও আসেনি। কৈশোরে দুরাশা ছিল—কখনও ইজিচেয়ারে শুয়ে অভিধানের সাহায্য ছাড়া হাফেজ আর রুমি পড়ব। ভাষাজ্ঞানটা কিছুতেই অত দূর এগোয়নি। দিল্লিতে দেখতাম পৃথ্বীনাথ ধর (তখন ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ-এর অধ্যক্ষ) হাফেজ-এর দিওয়ান হাতে নিয়ে পায়চারি করছেন আর সুর করে পড়ছেন। বাস্তবিক ভারী হিংসা হত।

স্কুলে পড়ার সময় আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন—একথা একটু আগেই লিখেছি। মানিককাকা আমার কাব্য ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গী ছিলেন। আর রাজনীতি এবং দর্শনের পাঠ পাই সত্যব্রত ঘোষ ওরফে রুণুদার কাছ থেকে। রুণুদা বিখ্যাত পণ্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষের ছোট ভাই। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে রুণুদা এবং ওঁর দিদি শান্তিসুধা ঘোষ বৈপ্লবিক দলের কর্মী ছিলেন। রুণুদা বহুদিন বরিশালের বাইরে কাশীতে নজরবন্দি ছিলেন, তারপর বেশ কয়েক বছর ওঁদের বরিশালের বাড়িতে। রুণুদা খুব সম্প্রতি মারা গেছেন। মৃত্যুর অল্পদিন আগে খবরের কাগজে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ত্রিশের দশকের এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রহস্য প্রকাশ করেন। ঘটনাটি ঘটে বরিশাল শহরে এক সরকারি প্রদর্শনীকে কেন্দ্র করে। আইন অমান্য আন্দোলন তখন চলছে। কংগ্রেসি ভলান্টিয়াররা প্রদর্শনীর পথ বন্ধ করে শুয়ে আছে। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট ওদের সাবধানে ডিঙিয়ে ভেতরে গেলেন। কিন্তু রাজভক্ত যতীশ দারোগা তাঁর ভক্তি প্রকাশ করলেন ভলান্টিয়ারদের লাথি মেরে সরিয়ে। যাঁরা লাথি খেলেন তাঁদের কয়েকজন গাঁধীবাদী

আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও গোপনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন। এঁরা চারজন—কারও বয়সই ষোলোর উপরে না—সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতীশকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। পরদিন দিনের আলোয় এঁদের একজন রমেশ যতীশ দারোগার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে পুলিশ যখন পনেরো বছর বয়স্ক রমেশকে আদালতে হাজির করে, তখন তার মাথায় একটি চুলও নেই—পুলিশ মুঠো মুঠো করে ছিঁড়েছে। রমেশ একবারও মুখ খোলেনি। প্রথমে ওর মৃত্যুদণ্ড হয়, তারপর অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। ঘটনার সত্তর বছর পরে রুণুদার প্রবন্ধে মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ প্রকাশ পায়। যে-চারজন কিশোর বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রুণুদা তাঁদের একজন।

আমার সঙ্গে যখন রুণুদার পরিচয় হয় তখন উনি অন্তরীণ থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ. পাস করেছেন। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে উনি তখন এম. এন. রায়ের অনুগামী। ওঁর কাছেই প্রথম হেগেল এবং মার্কসের পাঠ নিই। এবং এম. এন. রায়ের সমস্ত ঐতিহ্যলব্ধ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, বিশেষত গতানুগতিক নীতিবোধ সম্বন্ধে মতামতের সঙ্গে ওঁর মাধ্যমেই পরিচয় হয়। উনি আমাকে এম. এন. রায়ের 'মেমোয়্যার্স অফ এ ক্যাট' পড়ান। ওই বস্তুবাদী জীবনদর্শন তখন খুব মনে ধরেছিল। পরে মনে হয়েছে—কেন মানবেন্দ্রনাথ এবং কমলাকান্ত দু'জনেই মানুষের ভণ্ডামি উদ্‌ঘাটন করতে বিড়ালের আশ্রয় নিলেন? ওদের বুদ্ধির কাছে বাস্তব জীবনে আমাদের প্রায়ই হার মানতে হয় বলে?

বিদ্যাবুদ্ধির জন্য রুণুদা আমাদের কাছে হিরো ছিলেন। ওঁর নায়কোচিত গুণ আরও এক উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রকাশ পেল। রুণুদা তাঁর প্রেমিকা স্কটিশ চার্চ কলেজের ডান্ডাস হস্টেল-বাসিনী অঞ্জলি ওরফে মিনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই পরমা সুন্দরী অঞ্জলি মিনিবউদি রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মা-বাবার আপত্তি থাকায় 'ইলোপ' অর্থাৎ কন্যাহরণ করে বিয়ে করতে হয়েছিল। রুণুদা হিরো থেকে হিরোশ্রেষ্ঠর পদে উন্নীত হলেন। রুণুদার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার যোগাযোগ ছিল। শেষজীবনে বম্বের এক ফ্ল্যাটে উনি বাসা বাঁধেন। সম্পূর্ণ একাই থাকতেন। নব্বই বছর বয়সেও আগের মতোই পিঠ সোজা করে বসে মিনিটে দুশো শব্দ রেটে কথা বলতেন। ওঁর তারুণ্যে কখনও ঘাটতি পড়েনি।

বরিশাল জেলায় গুণিজনের অভাব ছিল না। সে যুগের মধ্যবিত্ত বাঙালির মূল্যবোধে অর্থ-প্রতিপত্তির তুলনায় সংস্কৃতি, জ্ঞান, দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে অবদানকেই বড় মনে করা হত। আদর্শ হিসেবে যাঁদের নাম সব সময় শুনতাম তাঁরা বেশির ভাগই পণ্ডিত ব্যক্তি। নামটা সবচেয়ে বেশি শোনা যেত দেবপ্রসাদবাবুর, কারণ সত্যিই ওঁর তুলনীয় পাণ্ডিত্য খুব কম লোকেরই ছিল। ওঁর বোন, অঙ্কে অনার্স নিয়ে ঈশান স্কলার, শান্তিসুধাদির নামটাও খুব শুনতাম। আর বিখ্যাত দুই ঐতিহাসিক—হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী আর সুরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালেরই সন্তান। রমেশচন্দ্র মজুমদার ফরিদপুরের লোক হলেও ওঁর শ্বশুরবাড়ি বরিশালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আর নাম শুনতাম অদ্ভুতকর্মা 'খোকা ভগবান' সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর। উনি তিন বছর বয়সে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ-উপনিষদ আবৃত্তি করতেন—এ কথার অনেক প্রমাণ ছিল। লোকে বলত—উনি জাতিস্মর। উনি মেজজ্যাঠার কাছে প্রায়ই

আসতেন। ওঁর পারিবারিক জীবনে প্রচণ্ড অশান্তির সময় উনি খুব ঘনঘন আসতেন। মেজজ্যাঠা বলতেন, "মানুষটা একটু শান্তি খোঁজে।" এক নিন্দুক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "শান্তি কি কোনও মাইয়ালোকের নাম?"

আমার সৌভাগ্য, এইসব বিখ্যাত মানুষের দরজা সব সময়ই খোলা থাকত, আমাদের মতো বালখিল্যরা গেলেও বিরক্ত হতেন না। হেমবাবু ওঁর প্রথম বিবাহসূত্রে আমাদের আত্মীয় ছিলেন। ওঁকে নির্দ্বিধায় ইস্কুলের পাঠক্রমের জন্য লেখা প্রশ্নোত্তর পর্যন্ত দেখিয়েছি। উনি যত্ন করে পড়ে মতামত দিতেন। সুরেন সেন মশাই পণ্ডিত মূর্খের তফাত করতেন না। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধে ওঁর গবেষণালব্ধ তথ্য সবাইকে শোনাতেন, রমেশবাবু 'দ্বীপময় ভারত'-এ হিন্দুদের কীর্তিকাহিনি বর্ণনা করতেন।

শুধু একটি মানুষের মূল্য বরিশালবাসী তাঁর জীবৎকালে বুঝতে পারেনি। মানুষটির নাম জীবনানন্দ দাশ। ওঁর কবিতার সমঝদার বরিশাল শহরে বেশি কেউ ছিল না। বরং 'শনিবারের চিঠি'র প্রতিধ্বনি করে ঠাট্টা-বিদ্রূপই বেশি শোনা যেত। মানুষটি নিতান্তই সঙ্গীহীন ছিলেন। রূপহীন কবির চলাফেরাও ছিল গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট। উনি একা একা নদীর পাড়ে হাঁটতে যেতেন। ওঁর পেছন পেছন কিছু বখাটে ছেলে ওঁকে ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে হাঁটত। কলেজেও উনি একা বসে থাকতেন, কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতে দেখা যেত না। ওঁর স্ত্রী রাজনৈতিক কাজে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁকে যেদিন পুলিশে গ্রেফতার করে সেদিন কবি হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন। এ নিয়ে হাসাহাসির অন্ত ছিল না। 'বনলতা সেন'-এর কবির ব্যক্তিগত জীবনের গভীর ট্র্যাজেডি ওঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গদ্য রচনায় ফুটে উঠেছে। ওঁর কবিতা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু মানুষটার জন্য কষ্ট হত।

ইস্কুলজীবন শেষ হয়ে এল। ১৯৪১ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। ক্লাসে সেকেন্ড হতাম। মাস্টারমশাইরা বলতেন—একটা ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেতেও পার। পরীক্ষার ফল বের হবার অল্প ক'দিন বাকি। কী কাজে বাবা কলকাতা গেলেন। হঠাৎ ওঁর টেলিগ্রাম এল—ফলটা আশাতীত রকমের ভাল হয়েছে। ফজলুল হক সাহেবও তার করলেন, "বরিশাল কি জয়।" দৈনিক পত্রিকায় ছবি বের হল। জীবনে এই প্রথম বড় রকমের সাফল্য। রাতারাতি বঙ্গবিখ্যাত হলাম, বরিশালবিখ্যাত তো বটেই। শহরে সবাই সবাইকে চেনে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেনা-অচেনা সবাই তাকাচ্ছে। বরিশালের লোক নিচু স্বরে কথা বলতে জানে না। কেউ বলছে "দেখাইলে বটে ছ্যামড়া।" কেউ, "কীর্তিপাশা গেরামের নাম রাখলে।" আহা, কানে যেন মধু ঢালছে সব। শিরায় শিরায় অ্যাড্রিনালিন টগবগ করছে। মানিককাকা এসে জড়িয়ে ধরলেন, "কামাল কিয়া!" জাগতিক সাফল্য ছোট জাতের জিনিস, ও নিয়ে বেশি লাফালাফি করতে নেই—বরাবর এই শিক্ষাই পেয়েছি। কিন্তু ওই বস্তুর প্রথম স্বাদ বড় মধুর লেগেছিল। কর্মজীবনে ওর তুলনীয় আনন্দ আর কখনও পাইনি।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকে ইস্কুলের পণ্ডিতমশায় কোনও অজ্ঞাত কারণে মাতৃকুলনাশিনী বলে খুব আনন্দ পেতেন। পরীক্ষার ফল বের হবার পর রাস্তায় দেখা হলেই বলতেন, "মাতৃকুল নাশ ত হইয়া গেল। যাও, এইবার যাইয়া পিতৃকুল নাশ কর।" বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খুব কিছুক্ষণ হা-হা করে হাসতেন। এই অর্থহীন রসিকতার পিছনে একটা ঐতিহ্যঘটিত ব্যাপার ছিল। সেটা হচ্ছে উদ্ভট শ্লোকের ঐতিহ্য : শব্দের ধ্বনির সুযোগ নিয়ে কিংবা সমাস-সন্ধি ধাতু-প্রত্যয়ের অপব্যবহার করে প্রতিপক্ষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া। পণ্ডিতমশায়ের প্রিয় একটি উদ্ভট শ্লোক : "হনুমতা হতারাম, সীতা হর্ষম্ উপাগতা।। ক্রন্দন্তি রাক্ষসাঃ সর্বে হারাম হারামারাম"। আপাত অর্থ—হনুমান কর্তৃক রাম নিহত, তাতে সীতা উৎফুল্ল আর রাক্ষসরা সবাই কেঁদে আকুল—হা রাম হা রাম বলে। প্রকৃত অর্থর ইঙ্গিত শব্দজোটের সন্ধিতে : তা ভাঙলে দাঁড়ায় হা আরাম, আরাম। অর্থাৎ, হনুমান কর্তৃক নিহত রাম না, আরাম মানে কানন, অশোককানন। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন কেন মাতৃকুলনাশ হবে তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। ধ্বনিসান্নিধ্যই রসিকতাটির মূল কথা। সে যাক, মোট কথা ওই ব্যক্যটি বারবার বলে পণ্ডিতমশায় অত্যন্ত আনন্দ পেতেন।

কিন্তু উনি যা-ই বলুন পিতৃকুলনাশের পথ সহজ ছিল না। এখনকার মতো কলেজে সিটের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত ছিল না। যেসব কলেজের নামডাক বেশি, সেখানেও যারা ভর্তি হতে চায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা শেষ অবধি ভর্তি হতে পারত। এখনকার মতো ভর্তির সময়ে ছাত্রর আত্মহত্যার অথবা মা-বাপের সন্ন্যাস রোগ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যেত না।

পরীক্ষায় খারাপ করলে ভর্তি হওয়া নিয়ে কিছু সমস্যা হয়তো হলেও হতে পারত, কিন্তু ভাল করলে যে ধরনের সমস্যা হত, তা এখন কেউ কল্পনা করতে পারবে না। তিরিশের দশকে এক পূজাসংখ্যায় একটি ব্যঙ্গরচনা বের হয়েছিল, যত দূর মনে পড়ে লেখক প্রমথনাথ বিশী। সঙ্গে কার্টুন ছিল—ছেলে পরীক্ষায় ভাল করেছে, পিতাঠাকুর স্মিতমুখে ইজিচেয়ারে শয়ান। পাশে কোনও কলেজের হতভাগ্য অধ্যক্ষ জোড় হস্তে জানু পেতে বসে আছেন। টেবিলের নীচে অনুরূপ আর একটি প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় একজন খাটের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছেন। কাহিনির বক্তব্য—ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভাল করেছে। ফলে তাকে নিজের কলেজে ভর্তি করার চেষ্টায় কলেজের সব অধ্যক্ষরা এসেছেন, তাঁদের পকেটে নানা প্রলোভনের ফর্দ। জোড় হস্ত, টেবিলতলাবাসী, খট্টান্তরালাশ্রয়ী এঁরা সবাই নিলামে নিজ নিজ ডাক পেশ করে চলে যাওয়ার পর বাড়ির সামনের ম্যানহোলে যে-অধ্যক্ষ লুকিয়েছিলেন, তিনি বের হয়ে এসে তাঁর অবিশ্বাস্য যৌতুকের পরিমাণ উল্লেখ করলেন। গৃহভৃত্যকে ঘুষ দেওয়া ছিল, তাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ডাকের মাত্রাটা ওঁর জানা থাকায় ডবল দাম হেঁকে উনি স্বচ্ছন্দে জিতে গেলেন।

কাগজে পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পর কোনও কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের বাড়ি এসে টেবিল বা খাটের তলায় লুকিয়ে থাকেননি ঠিকই, কিন্তু কলকাতার কোনও কোনও কলেজ

থেকে যে-ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে চিঠি এসেছিল, তা আজকের দিনে বিশ্বাস করা কঠিন হবে। আর একজন দূরদর্শী পিতা পনেরো বছর বয়স্ক ম্যাট্রিক পাস পাত্রটির সঙ্গে তাঁর দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সম্বন্ধ এনেছিলেন, পাত্রর বাকি পড়াশুনা ইস্তক বিলেত যাওয়া অবধি সব খরচ-খরচা দেবেন এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। নেহাত বাবা আদর্শবাদী স্বদেশিওয়ালা ছিলেন, পণপ্রথায় বিশ্বাস করতেন না, না হলে বিয়েটা হয়েই যেত। ধনীর একমাত্র কন্যা বিবাহ করে বাকি জীবন সুখেস্বচ্ছন্দে কেটে যেত। কপালে নেই তো কী করা যাবে!

এই বিসদৃশ আতিশয্যর পিছনে বিদেশিশাসিত ভারতবাসীর জীবনের যে-করুণ কাহিনি প্রচ্ছন্ন আছে, আমরা, বিশেষত যাঁরা সেই স্বর্গরাজ্যের কথা ভেবে মুকুলিত নেত্র হন তাঁরা, তা প্রায় ভুলতে বসেছি। বিশ এবং তিরিশের দশকে বেকার সমস্যা কী ভয়াবহ ছিল তা আমাদের স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে গেছে। বি.এ এবং এম.এ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েও অর্থনীতিবিদ ডক্টর ভবতোষ দত্ত প্রায় সাত-আট বছর বেকার ছিলেন। নীরদ চৌধুরী মশায়ের জীবনের বেশ ক'বছর কেটেছে দৈনিক এক টাকা রোজগারে। বেকারি বা প্রায়োপবাস অনেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তরই অভিজ্ঞতার অঙ্গ ছিল। আজ যেসব বাম এবং দক্ষিণপন্থী চিন্তাবীর জহরলাল নেহরুর পিতৃতর্পণ না করে প্রাতরাশ করেন না, তাঁরা মাঝে মাঝে ব্রিটিশ শাসনের স্বর্ণযুগ স্মরণ করলে দেশের কিছু উপকার হতে পারে।

যেখানে সুযোগ-সুবিধা এত সীমিত ছিল, সেখানে যাঁদের জীবনে কিছুটা সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাঁদের নিয়ে বঞ্চিত সমাজে একটু বাড়াবাড়ি হওয়া আশ্চর্য কিছু না, যদিও সবাই জানত যে, পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া ভাল রোজগারের কোনও গ্যারান্টিও নয়। তা ছাড়া উনিশ শতক থেকেই বাঙালি সমাজে পরীক্ষার ফল নিয়ে মাতামাতি করার একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন এই প্রবণতা কিছুটা কমেছে মনে হয়। তবে সম্ভবত মূল্যবোধের দিক থেকে কার কত মাইনে, কত বড় বাড়ি তা নিয়ে আলাপ-আলোচনার চেয়ে পরীক্ষার ফল নিয়ে মাতামাতিটা ভাল ছিল। শুনি আমাদের উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকালকার স্মার্ট ছাত্রীরা, যেসব মেয়েরা মন দিয়ে পড়াশুনা করে তাদের নাম দিয়েছে জবাকুসুম টাইপস। এই অভিধার সৃষ্টিকারিণীরা সম্ভবত মাথায় তেল দেয় না অথবা কেশবাস বহু বর্ণে রঞ্জিত করে। একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। প্রাইভেট কলেজগুলি ভাল ছাত্র জোটাবার জন্য ব্যস্ত থাকত, কারণ কলেজের সুখ্যাতি পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করত, এবং কলেজের ছাত্রসংখ্যা নির্ভর করত তার সুখ্যাতির উপর।

কিন্তু যাদের নিয়ে মাতামাতি করা হত তাদের পক্ষে এর ফলটা ভাল হত না। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে বেশির ভাগ মানুষের বুদ্ধি পাকে না। অবশ্যি পরেও যে পাকে তার কোনও স্থিরতা নেই। অপরিণতবয়স্ক মানুষকে নিয়ে বেশি আমড়াগাছি করলে সে তার নিজের সত্যিকার পরিমাপটা বুঝতে শেখে না। আমড়াগাছির ফলে আমি স্বয়ং নিজেকে মহাপণ্ডিত ভাবতে শুরু করেছিলাম। আমার মূর্খত্ব যে কত গভীর তা যতদিনে বুঝলাম ততদিনে সত্যিকার পাণ্ডিত্য অর্জনের সময় চলে গেছে। অনেক সময়ই দেখা যেত, প্রথম দিকের পরীক্ষায় যারা ভাল করত শেষে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারত না। কিন্তু নিজের সম্পর্কে ধারণা এবং প্রত্যাশাটা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বাকি জীবন ব্যর্থতাবোধে

ভুগত। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় 'স্ট্যান্ড' করেছিলেন অর্থাৎ তিনি প্রথম দশজনের মধ্যে একজন ছিলেন। আশি পার হয়েও তাঁর এই আক্ষেপ যায়নি যে, ম্যাট্রিকে যারা তাঁর থেকে মাত্র তিন-চার নম্বর বেশি পেয়েছিল তারা এখন করে খাচ্ছে। এই পরীক্ষাকেন্দ্রিক চিন্তার আর এক অপূর্ব উদাহরণ দেখেছিলাম সত্যজিৎ যখন ভারতরত্ন উপাধি পান। ওঁর সহপাঠী এক অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি মন্তব্য করলেন, "আরে ও তো বি.এ-তে আমার চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছিল।"

যা হোক, কলেজে ভর্তি হওয়ার কাহিনিতে ফিরে আসি। দাদাকে নিয়ে আমরা তিন পুরুষ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ইস্কুলে ছাত্রাবস্থায় পরে আমার ইংরেজি সাহিত্য পড়ার ইচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে তারক সেন, শ্রীকুমার ব্যানার্জি, সুবোধ সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখার্জি, সোমনাথ মৈত্র প্রমুখ ইংরেজি সাহিত্যের ডাকসাইটে শিক্ষকদের নাম শুনে আসছি। কিন্তু শেষ অবধি ভর্তি হলাম গিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে। তার কারণ কিছুটা বিচিত্র। আমার দাদা পড়াশুনায় কোনও অর্থেই খারাপ ছিলেন না। কিন্তু মা-বাবার ধারণা ছিল যে, উনি চেষ্টা করলে আরও অনেক ভাল করতে পারতেন। কথাটা অবশ্যই সত্যি। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষটি ওই চেষ্টাটি করতে রাজি ছিলেন না, কারণ ওঁর ধারণা ছিল—রূপরসবর্ণগন্ধময় জীবনের সব কিছু উপেক্ষা করে পরীক্ষায় ভাল করার চেষ্টাটাই সফল এবং সার্থক জীবনযাত্রার একমাত্র পথ না। এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে ছোটবেলা থেকেই ওঁর মেজাজটা বিদ্রোহী ধরনের হয়ে গিয়েছিল। কোনও অবস্থায়ই উনি যাঁদের হাতে ক্ষমতা, মানে ইংরেজিতে যাকে বলে 'অথরিটি ফিগার', তাঁদের সহ্য করতে পারতেন না।

বরিশালের বি.এম কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে আই.এ পাস করে উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ওখানকার অনেক কিছুই ওঁর ভাল লাগেনি। ওঁর বক্তব্য—ওখানে বেশ কিছু শিক্ষক বড়লোকের ছেলেদের বেশি খাতির করে। কলেজটা ছেঁদো স্নবারির একটি ডিপোবিশেষ। আর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের উপর বিশেষ নজর রাখা হয়। একজন শিক্ষক যে টিকটিকি সেকথা সবাই জানে। এইসব কথা দাদা বেশ নির্ভরযোগ্য উদাহরণ দিয়েই বলতেন। ফলে আমার ভক্তি ছুটে গেল। অনেক খোঁজখবর নিয়ে আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম। প্রধান আকর্ষণ—ইংরেজির বিখ্যাত অধ্যাপক মোয়াট সাহেব।

থাকার ব্যবস্থা হল বিডন স্ট্রিটের এক প্রান্তে মানিকতলা বাজারের উলটো দিকে ডাফ হস্টেলে। তার অন্যতম আকর্ষণ দুবেলা মাংস খেতে দেয়, যদিও তার পরিমাণ দশ থেকে পনেরো গ্রামের মধ্যে। খাওয়ার সময় অণুবীক্ষণ যন্ত্র হাতে থাকলে খুঁজে পেতে অসুবিধে হত না। ডাফ হস্টেল প্রধানত খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টান-সংসর্গে আহারবিহার সম্পর্কে কুসংস্কার ত্যাগ করে কিছুদিন বাস করলে হিন্দু ছাত্ররাও হয়তো সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, সম্ভবত এই আশায় এক সময় ওখানে অখ্রিস্টান ছাত্রদের নিখরচায় থাকতে দেওয়া হত। আমাদের সময় খরচা দিতে হত, কিন্তু অন্য কলেজের ছেলেদের তখনও থাকতে দেওয়া হত। সেই সুবাদে দাদা প্রেসিডেন্সির ছাত্র হয়েও হিন্দু হস্টেল ছেড়ে দুই ভাই একত্র থাকার সুবিধে হবে এই বিবেচনায় ডাফ হস্টেলে চলে এলেন।

আর একই নিয়মের সুযোগ নিয়ে বি.এ ক্লাসে উঠে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে গেলেও ছাত্রাবস্থায় পুরো সাত বছর আমি ডাফ হস্টেলের বাসিন্দা ছিলাম। জীবনের প্রথম বড় বড় ঘাত-প্রতিঘাতগুলির অভিজ্ঞতা ওইখানে থাকার সময়ই হয়। কলকাতার নেশাও ওইখানেই আমাকে প্রথম পেয়ে বসে। সে নেশা আজও কাটেনি।

সে সময়কার খরচ-খরচা সায়েস্তা খাঁর আমলের তুলনায় খুব বেশি ছিল এমন বলা চলে না। হস্টেলে দুবেলা খাওয়া, সকালের চা আর ইলেকট্রিক খরচা সহ ঘর ভাড়া ছিল একুশ টাকা। আমায় মাইনে দিতে হত না, ফলে চল্লিশ টাকায় মাস বেশ ভালই চলে যেত। হস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বাসিন্দাকেই পালা করে বাজার যেতে হত। তাই চল্লিশের দশকে কলকাতার বাজারদর আমাদের বেশ সড়গড় হয়ে গিয়েছিল। মাছের দর ছিল সের প্রতি ছ'আনা। বর্তমান প্রজন্মের বোঝার সুবিধের জন্য বলছি—সের আর কিলোগ্রাম প্রায় তুল্যমূল্য। আর ষোলো আনায় এক টাকা হত। মাংস আর গলদা চিংড়ি ছিল সের প্রতি বারো আনা। দুধ ছিল চার আনা সের। ছ' আনায় একটা মুরগি পাওয়া যেত। আর দু আনা খরচা করে হস্টেলের বাবুর্চিকে দিয়ে রাঁধিয়ে নেট আট আনা ব্যয়ে চারজনে একটা মুরগি মাঝে মাঝেই খেতাম। চিনা রেস্তরাঁয় পেট ভরে খেতে মাথাপিছু দু-তিন টাকার বেশি পড়ত না। আর ফারপোর বিখ্যাত তিন কোর্স লাঞ্চের বাঁধা দাম ছিল তিন টাকা। সিনেমার টিকিটের দাম ছিল ন আনা। উঁচু ক্লাসের টিকিট এক টাকা দু আনা। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পর থেকে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করে। বেড়েও '৪৭ সনে যখন হস্টেল ছাড়ি তখন হস্টেল খরচা মাসিক একুশ টাকার জায়গায় আটত্রিশ টাকা দাঁড়িয়েছিল। উনিশ শতকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মাইনেয় বাঙালিবাবুরা কেন এত শ্লাঘা বোধ করতেন গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের এই বাজার খরচার হিসাব থেকে তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়।

ডাফ হস্টেলে বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ। কিন্তু সংস্কৃতি বৈচিত্র্যে জায়গাটি সত্যিই অসাধারণ ছিল। যাকে বলে নানা দিগ্‌দেশাদাগত্য নানাবিধঃ পক্ষিণঃ নিবসন্তি। পক্ষীদের মধ্যে একটি বড় অংশ কেরল থেকে আসা সিরিয়াক খ্রিস্টান। তারা যে 'মাদ্রাজি' নয়, এ কথাটা বুঝতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু আমাদের সহাধ্যায়ী কিছু কিছু বঙ্গপুঙ্গবের কাছে ওদের মাদ্রাজিত্ব কিছুতেই ঘোচেনি। অবজ্ঞার ভাব প্রবল হলে বলত, মদ্র।

মহাভারত-অনুযায়ী মদ্রদেশটা বিন্ধ্যের দক্ষিণে না, পঞ্জাবে, কিন্তু সেকথা তাদের কে বোঝাবে? নানা দিক থেকেই ওদের আহারবিহার আমাদের থেকে স্বভাবতই অন্য ধরনের ছিল। পঁচানব্বই ভাগ জল আর পাঁচ ভাগ দই দিয়ে ওদের জন্য দহিপানি তৈরি থাকত। ভাতের সঙ্গে দহিপানি মেখে নিয়ে তারপর তারা ওই দিয়ে ডাল-তরকারি খেত। আর ওরা বাড়ি থেকে নারকেলের গুঁড়োর সঙ্গে মেশানো নানা মশলার একটা মিক্সচার নিয়ে আসত, সে বস্তুটিও ভাত আর দহিপানির সঙ্গে খাওয়া হত : বিস্বাদ না, কিন্তু ব্রহ্মতালু বিদারক রকমের ঝাল। আরও দক্ষিণ থেকে সিংহলদেশবাসী কিছু বৌদ্ধ ছাত্রও ওখানে থাকত। তাদের নামবৈচিত্র্যে চমৎকৃত হতাম। একটি স্মরণীয় নাম স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল—ডাম্বুরি লিয়ানাগি ধনপাল সমরশেখর। নামের মালিকটির সঙ্গে বহুদিন পর দিল্লিতে আবার দেখা হয়। তখন সে সিংহলের হাই কমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারি। সাক্ষাৎমাত্র তাঁকে তাঁর পুরো

নামটি গড়গড় করে বলে যাওয়ায় মানুষটি খুব খুশি। নিজের নামের চেয়ে প্রিয় জিনিস মানুষের আর কী-ই বা আছে? এরা ছাড়া বেশ কিছু পর্বতনন্দনও ওই মহাক্রমে বাসা বেঁধেছিল—বেশির ভাগই খাসিয়া বা ভুটিয়া, দু-একজন তিব্বতিও ছিল। তিব্বতিদের মধ্যে একজনের বাড়ি ছিল লাসা। আমরা ধরে বসলাম, লাসা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সে ভরসা দিল—এ আর এমন কী কথা? সে তার তিন নম্বর বাবাকে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ব্যাপারটা সে বুঝিয়েও দিল। ওদের অভিজাত পরিবারে ক'ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করে, সম্পত্তি যাতে ভাগ না হয়ে যায়। ফলে সব ভাইরাই বাবা, কেউ আর কাকা-জ্যাঠা না। ওর তিন নম্বরি বাবা দলাইয়ের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। তাঁর ভরসায়ই ও আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল।

পর্বত অঞ্চল থেকে যারা আসত, বিশেষত খাসিয়ারা, তারা দেখতাম অনেকেই আমাদের তুলনায় অর্থবান এবং তাদের জীবনযাত্রার ধরন অনেক বেশি পশ্চিমায়িত। আমরা সে যুগে ধুতি-পাঞ্জাবি-পায়জামা পরতে অভ্যস্ত ছিলাম। এরা বেশ দামি স্যুট-বুট-টাই পরত। তার চেয়েও বড় তফাত ছিল আর এক ব্যাপারে : এরা প্রায় সবাই এবং বেশ কিছু অহোমিয়া ছাত্র সন্ধে হলেই বোতল আর গেলাস নিয়ে বসত। এটা উপজাতীয় প্রথা না সাহেবদের কাছে শেখা তা কখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। বোধ হয় মদ্যপানটা উপজাতীয় ব্যাপার, হুইস্কিটা পশ্চিমাগত। তখনও বাঙালির ঘরে ঘরে হুইস্কিদেবীর নিত্যপূজা চালু হয়নি। ফলে রোজ সন্ধ্যায় কিছু ছাত্র একত্র বসে চুটিয়ে মদ খাচ্ছে, এ ব্যাপারটা একটু বিসদৃশ মনে হত।

কিন্তু মদ খাওয়া কাকে বলে এবং তার আনুষঙ্গিক বিলাস কত দূর যেতে পারে সেটা দেখাল রেঙ্গুন জাপানিদের হাতে যাওয়ার পর বর্মা থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু ছাত্ররা। প্রথম কথা, এরা বেশ ক'জন অত্যন্ত ধনী ঘরের ছেলে। রেঙ্গুন পতনের আগে এদের অবস্থা কী ছিল জানি না, কিন্তু পরে যা ছিল তা যে বেশ কয়েক পুরুষ অধঃপাতে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হত না। এইসব স্বর্ণমণ্ডিত তরুণ হস্টেলে আহারাদি কমই করতেন। সন্ধে হলেই চার-পাঁচ জন ইয়ার একত্র হয়ে দু-চার পাত্র পানাদি হত। রাত্রের আহারটা প্রায়ই ফারপো বা পেলেটির বাড়িতে সেরে নিয়ে ওই অঞ্চলেই বিহারটাও সারতেন। হস্টেলে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। কখনও কখনও দেখতাম এঁরা সকালের দিকে ফিরছেন—অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি গোছের অবস্থা। মানে তাম্বুলও যা লিপস্টিকও তা। বিহার বলে কথা!

আমাদের হস্টেলে সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের পরিপূরক ছিল বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সমাবেশ। বংশীবাদক দাশরথি, যার কথা রোমন্থনে লিখেছি, স্কটিশ চার্চ কলেজটাকে নিতান্তই অনুরাগচর্চার একটা সুযোগ—মানে ইংরিজিতে যাকে বলে 'ফেসিলিটি'—বলে ধরে নিয়েছিল। পুস্তক বস্তুটি তাকে স্পর্শ করতে কখনও দেখিনি। তবে মাঝে মাঝে হাতে একখানা গানের খাতা নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। ফলে ওর জীবনে এক অদ্ভুত প্যারাডক্স দেখা দিল। যে ক্লাসে ও কখনও যায়নি, বছরের পর বছর ও সেই ক্লাসেই রয়ে গেল। কতকটা সেই নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে গোছের ব্যাপার আর কী! ক্লাসে ও শেষ অবধি

এল—যখন ভাগ্যদোষে এম. এ পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে মাস দুই পড়াচ্ছি, তখন। দেখি ক্লাসে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশ্ন করলাম, এটা কী হচ্ছে? 'সিট খুঁজে পাচ্ছি না, স্যার!' অচেনা জায়গা, অসুবিধে হবারই কথা। বললাম, বাঁদরামি কোরো না, বসতে হয়তো বসো, না হলে কেটে পড়ো। অমনি চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল, "ঝগড়া করবেন না স্যার, ঝগড়া করবেন না।" মানে দাশু যে আমার ছাত্র না, ইয়ার—এ তথ্যটা ও সবাইকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। ইয়ার্কি করতে গিয়ে দাশুর একবার জীবন বিপন্ন হয়েছিল। অসমের খগেন চৌধুরিকে আমরা কেউ ঘাঁটাতাম না, কারণ বিচিত্র স্বভাবের মানুষটি কখন কী করে বসবে তার কিছু ঠিক ছিল না। ওর উচ্চারণ অনুকরণ করে আড়ালে আমরা ওকে শৌডরি বলতাম, কিন্তু তা নিতান্তই আড়ালে। কারণ মুষ্টিযোদ্ধা খগেন যে-কোনও সময় তার অর্জিত বিদ্যা ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল। খগেন-দাশরথি সংবাদটা খগেনের ভাষায়ই বলি, এবং যতটা সম্ভব তারই উচ্চারণে। "বোঝলেন, আইজ একটা কাণ্ড হৈআ গেল্। আমি দাশুর ঘরে গিশিলাম্। সে একটা কিছু কইল। কী কইল খেয়াল করি নাই তখন। বাইর হইয়া গেলাম। হেদুয়া পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ খেয়াল হইল, দাশু আমারে অপমান করছে। মেজাজ গরম হইয়া গেল। হস্টেলে ফিরিয়া আইলাম। তারপর দাশুর দরজায় গিয়া, টক্, টক্—দুইটা টোকা দিলাম। দাশু দরজা খুল্লিয়া দিল। ওর মুখের দিকে তাকাইলাম না, তাকাইলে রাগ পড়িয়া যাইত। দরজা খুলতেই, ধরাম, ডাইন হাতে একটা ঘুষি, একটা দাঁত পড়িয়া গেল। ধরাম, আর একটা ঘুষি—এইবার বাঁ হাতে। আর একটা দাঁত পড়িয়া গেল। আমারও রাগ পড়িয়া গেল। দাশুরে হেদুয়া নিয়া গিয়া একটা কুলফি খাওয়াইয়া দিলাম। ঠিক করি নাই?" প্রশ্নটার লক্ষ্য কোন দিকে—দাঁত ওপড়ানো না কুলফি খাওয়ানো—তা বুঝতে না পেরে নিরুত্তর থাকাই নিরাপদ মনে হল। চৌধুরি সাহেবের পরবর্তী ইতিহাস বড় করুণ। কোনও কারণে স্ত্রীর উপর উনি চটে যান। তারপর প্রথমে তাঁকে এবং তারপর নিজেকে গুলি করে জীবনান্ত ঘটান। এবার আর রাগ পড়ে গেলে কলহটা মিটিয়ে ফেলার পথ উনি খোলা রাখেননি।

আরও কয়েকটি চরিত্র বেশ মনে আছে। অসম থেকে আগত মওলা সাহেব উড়ুক্কু বাহিনীতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তাই আকাশে যা কিছু ওড়ে সে সম্বন্ধে উনি 'অন্তিম জ্ঞানের আধার', ফাইনাল অথরিটি। বড় কিছু আকাশে উড়ছে দেখলেই বলতেন, "ইডা? ইডা ত ইয়ারক্রাফট কেরিয়ার।" না, বানান ভুল করিনি। এয়ার শব্দটা ওঁর উচ্চারণে ইয়ারই হয়ে যেত। তাছাড়া আকাশে উড্ডীয়মান যানে কিছু ইয়ার-বখসি নিশ্চয়ই থাকত। শ্রীহট্টবাসী আলি সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পড়ুয়া ছেলে। রাত এগারোটায় হস্টেলে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দেওয়া হত, তখন উনি খ্যানখেনে গলায় রাস্তার ওপারে দোকানদার কাশীর শরণাপন্ন হতেন, "খাশী-ই-ই অ খাশী-ই, মুম আছে, মুম?" এই মোম সংগ্রহ ব্যাপারটা কেন রাত এগারোটার আগে সম্ভব হত না, এই রহস্যের কখনও সমাধান হয়নি। হস্টেলের পোয়েট লরিয়েট দাশু ব্যাপারটাকে কাব্যে অমরত্ব দিল :

মুম জ্বালাইয়া, দরজা আটকাইয়া
রোজ পড়ে কেডা?
আলি সাহেব এডা।

খুল্লোঁ থেকে আগত সাহাবাবু কিছুটা গাঁওয়ার ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তাঁর উচ্চাশার কিছু অভাব ছিল না (আজকাল রাজনৈতিক শুদ্ধতাবাদের যুগ, সুতরাং বলে রাখা ভাল যে খুল্লোঁ উচ্চারণটা আমার না, স্বয়ং সাহাবাবুর)। হস্টেলবাসীর মধ্যে বালাসোর-নন্দন ভবেশ রায় ছিলেন কলেজের প্রধান মহিলানবিশ। সর্বদাই দেখা যেত 'ভবেশদা, ভবেশদা' করে একপাল মেয়ে ওর পিছন পিছন ঘুরছে। এর কারণ, ব্রহ্মচর্য ভবেশের সহজাত প্রবৃত্তি। সে মেয়েদের ব্যবহার করত নিছকই সংগঠন আর চাঁদা আদায়ের কাজে। ফলে তারা শ্রদ্ধায় মুহ্যমান, ন্যুব্জদেহ। মাঝে মাঝে তার আদর্শবাদী কার্যকলাপে আমাদের বিশেষ হেনস্থা হতে হত। মে মাসের কাঠফাটা গরম। ঘরে কোনও রকমের পাখাই নেই। খালি গায়ে ইজার পরে শুয়ে হাঁসফাঁস করছি। এমন সময় দরজায় করাঘাত। কে আর আসবে এ সময়? যেমন ছিলাম তেমন থেকেই দরজা খুললাম। দেখি চাঁদার খাতা হাতে দুই সুন্দরী, তাদের একজন নীলাঞ্জনা মেহতা, পরবর্তী জীবনে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুভাষ ধরের স্ত্রী। অদূরে পালের গোদা ভবেশ। ভবেশের এক জোড়া গোঁফ ছিল। সত্যিই ইচ্ছে হল ওর গোঁফ ধরে খুব নাচি।

সে কথা যাক। মফস্‌সলের নারীসঙ্গবর্জিত জীবন থেকে হঠাৎ সহশিক্ষায় উত্তরণ সাহাবাবুর পক্ষে সহজ হয়নি। উনি স্পষ্টই বিচলিত। দুর্বার যৌবনের ভার লাঘব করার জন্য উনি ভবেশের কাছে পাঠ নেবেন ঠিক করলেন। ওর দ্বারস্থ হয়ে জিগ্যেস করলেন, "ভবেশবাবু, একটা কথা কয়েন দেখি। মাইয়ারা আপনারে এত পছন্দ করে ক্যান?" ভবেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, গোঁফ চুমরে বলল, "রোনাল্ড কোলম্যানের ছবি দেখেছেন?" "হেইডা আবার কেডা?" মেট্রোর লবিতে নিয়ে গিয়ে সাহাবাবুকে রোনাল্ড কোলম্যানের ছবি দেখিয়ে ভবেশ হেইডা কেডা বুঝিয়ে দিল। পারিশ্রমিক হিসাবে এক টাকা দু-আনার সিটে ভবেশকে ছবি দেখাতে হল। তদুপরি কাফে ডি মনিকোতে কবরেজি কাটলেট আর আইসক্রিম সানডি। এক চামচে আইসক্রিম মুখে তুলে ভবেশের প্রশ্ন, "বুঝলেন কিছু?" "ছবি দ্যাখলাম, হ্যাতে বোঝনের কী আছে?" "হুঁ। রোনাল্ড কোলম্যান হলিউডে মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় নায়ক।" "হ্যাতে আমার কী আউগ্গাইল? অর মতো চেহারা ত আমার সাত জন্মেও হইবে না!" নিরাশায় সাহাবাবু ভেঙে পড়লেন। ভবেশ আশ্বাস দিল, "মিস্টার সাহা, চেহারাটা কিছু না। কলেজে তো কত লালটু ছেলে আছে। তাদের পিছন পিছন মেয়েরা ঘোরে? আসল ব্যাপারটা বুঝুন। রোনাল্ডের গাল ভাঙা আর আমারও তাই। মেয়েদের কাছে ভাঙা গালের আকর্ষণ দুর্নিবার। ওইটেই হচ্ছে আসল কলকাঠি।" "তয় ত আমার কোনওই ভরসা নাই। যহন পোলাপান আছিলাম তহন থিয়া মায়ে দুধ-ঘি খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া খোদার খাসির মতো মোড়া করছে। এহন ভাঙা গাল হইবে কেমনে?" ভবেশের মুখে শার্লক হোমসের মতো রহস্যময় হাসি, "পথ আছে, আছে। তবে সাধনা করতে হবে।" বলে সাহার কানের কাছে মুখ নিয়ে সাধনার পথ বাতলে দিলেন। সাহা উদ্ভাসিত মুখ, "হেয়া তো পেরায়ই হয়।" "কয় বার?" "হফতায় বার দুই ত হয়ই।" "না, তার কাজ না। সংখ্যাটা বাড়াতে হবে।" এর পর থেকে ম্যালভোলিওর মতো আহ্লাদিত মুখে সাহাবাবু ঘুরে বেড়ায় আর রোজই ভবেশের কাছে বুলেটিন পেশ করে। "আইজ তিনবার। আইজ চাইর বার।" ইত্যাদি। সংখ্যাটা সাতে পৌঁছলে ভবেশের কাছে ডেলিগেশান গেল, "ভবেশদা, এবার

থামান। লোকটা মরে যাবে।" ভবেশ সাহাকে গাল ভাঙার অব্যর্থ মহৌষধ হিসাবে ব্যবস্থা দিয়েছিল—আত্মরতি।

আর যারা ছিল, তাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল,—ইতিহাসের ছাত্র কবি সত্যমাধব দত্তচৌধুরি আর স্ট্যাটিস্টিকসের ছাত্র জামান সাহেব ওরফে কামারুজ্জমান, হুমায়ুন কবীরের ভাগনে। এক জার্মান ভদ্রমহিলার কাছে জামান আর আমি ফরাসি শিখতে যেতাম। সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ভাষা শেখার ব্যাপারে ওর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাই এক সঙ্গে পড়াটা বেশিদিন চলেনি : ও যখন দশ নম্বর পাঠে পৌঁছে গেছে, আমি তখনও ছয়ে ঠেকে আছি। কিন্তু ওই যে ক্লাসের পর সাঙ্গুভ্যালির চায়ের দোকানে বসে দু-আড়াই ঘণ্টা আড্ডার অভ্যেস হয়ে গেল, তার কিছু রদবদল হল না। সাঙ্গুভ্যালি থেকে হস্টেল, তারপর নীচে খাওয়ার ঘরে গিয়ে কিছু অখাদ্য ভক্ষণ। দুটো নাগাদ বলি, "জামান সাহেব, এর পরের ক্লাসটা করব ভাবছি।" "কেন বাজে কথা বলছেন? গিয়ে তো হেদোয় বসে থাকবেন। ক্লাসটা কার?" "মিস রবির।" "ও, তাই এত উৎসাহ! আরে অনেক দেখেছেন। এমন কিছু দেখতে না। পড়াতে তো একেবারেই পারে না। রূপ দেখিয়েই রয়ে গেল। বসুন, বসুন। বেট ডেভিসের ছবি হচ্ছে। চলুন। সে রবির চেয়ে অনেক ভাল দেখতে।" মেট্রোতে বেট ডেভিসের ছবি দেখার আগে জহুরকে ডেকে সামনের দোকান থেকে বার দুই চা আনানো হল। এক চুমুক খেয়ে মুখ বিকৃত করে জামান সাহেব বল্লেন,"অপেয়।" বাকিটা মুখ না বিকৃত করেই খেলেন। রোজ একই ঘটনা ঘটে। সামনের দোকানের অপেয় চা দিনে পাঁচ-ছ কাপ খাওয়া হয়। চা খাওয়ার পর বেট ডেভিসের ছবি। তারপর কাফে ডি মনিকো। "একটু ইডেন গার্ডেনে ঘুরে আসবেন না কি? আরে একটু হাঁটাচলা করুন। বড্ডই আলসে হয়ে যাচ্ছেন।" তথাস্তু। ইডেন গার্ডেনে হাঁটাচলা করে আলসেমির চিকিৎসা। তারপর "চাং ওয়ায় না খেয়ে কি আর হস্টেলে ফিরবেন? আপনাকে আমি চিনি না?" সম্ভবত আমি নিজেই নিজেকে চিনতাম না। ফলে চাং ওয়ায় না খেয়ে হস্টেলে ফিরলাম না। চাং ওয়া এবং নানকিঙের সঙ্গে জামানের সূত্রেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। হস্টেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা। মোট এগারো ঘণ্টা নিরঙ্কুশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়েছে। অবশ্যি সাঙ্গুভ্যালি আর কাফে ডি মনিকোতে যেসব চপ-কাটলেট খাওয়া হয়েছে তাতে বিলাসের চেয়ে বেসনের অংশই বেশি। দেহমন আত্মগ্লানিতে অবসন্ন। শেষে কি বর্মার উদ্বাস্তুদের অনুগামী হব? সারা দিনে পুস্তক স্পর্শ হয়নি। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখি, থার্ড ডিভিশনে আই. এ. পাস করেছি। পাঠের শত্রু শুধু জামান সাহেব না। একদল সহপাঠী ক্লাস শেষ হতে না হতে ঘরে এসে জুটত, তারপর দু-তিন ঘণ্টা নিরেট আড্ডা। এই পালের গোদা ছিল বর্তমানে বিখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার, যার বাস ছিল পাশের রাস্তায়, প্যারী রো-তে। বাদলের নাট্যপ্রতিভা তখনও প্রকাশ পায়নি, কিন্তু আড্ডাপ্রতিভা অসামান্য। কে তখন ভেবেছিল যে এই বিজ্ঞানের ছাত্রটি একদিন নাটকের জগতে আসাধারণ প্রতিভা বলে স্বীকৃত হবে!

সত্যমাধবের কথাটা বলা হয়নি। সে ছিল নিরঙ্কুশ ভাল ছেলে। ঘড়ি ধরে ছ ঘণ্টা পড়াশুনো করত আর ইতিহাস অনার্সে যেসব প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা, ফিতে দিয়ে মেপে তার

প্রতিটির ঠিক খাতার পৃষ্ঠার তিন পৃষ্ঠা লম্বা উত্তর লিখত, কারণ ওর চেয়ে বেশি পরীক্ষার হলে লেখা সম্ভব না। এইসব সাধনভজনের পর যা সময় থাকত তা ব্যয়িত হত কবিতা লিখে, ইংরেজি-বাংলা উপন্যাস পড়ে আর সপ্তাহে একটা সিনেমা দেখে। তিনটের শোতে, কারণ ওই সময় টিকিটের দাম কম। শৈশবে পিতৃহীন সত্যমাধবের স্থির লক্ষ্য ছিল একটিই— অনিশ্চয়তামুক্ত সচ্ছল জীবন। এর বেশি কিছু ও চাইত না। কিন্তু বাঁধা পথের পথিক এই মানুষটি অনন্যসাধারণ ছিল জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তার মূল্যায়নে। শেক্সপিয়ার, নিউটন, আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের স্তরের মানুষ ছাড়া আর কারও জীবন বা কীর্তিতে প্রশংসনীয় ও কিছু পেত না। বাকি সবই দ্বিতীয় শ্রেণির, সেকেন্ড ক্লাস। কলেজের বিখ্যাত সব অধ্যাপক, সিনেমাজগতের জগদ্বিখ্যাত সুন্দরীরা, সত্যমাধবের হিসাবে এরা সবাই ছিল সেকেন্ড ক্লাস। কলেজ ছাড়ার অনেক বছর পর ওর সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন সে গুজরাত অঞ্চলে ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার। আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী'র কথা উঠল। ওর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'সেকেন্ড ক্লাস'। 'পথের পাঁচালী' সেকেন্ড ক্লাস! কার তুলনায়? উত্তর : "চার্লি চ্যাপলিন।" মূল্যায়নের মাপকাঠিটা ছোট করতে ও কখনও রাজি না। একবার ও ভ্যান গগকেও সেকেন্ড ক্লাস বলেছিল—দা ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলোর তুলনায়। প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। বাঙালি উশ্চারণবিশারদ আঁতেলরা খুশি হবেন। ভ্যান গগের নামের সত্যিকার উচ্চারণ ভান খখ, মানে খুব খারাপ রকম গলা বসে গেলে খ-টা যে রকম শোনাবে সেই রকম আওয়াজ করতে হবে। পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার বর্ণমালায় ওই বিকট ওলন্দাজ আওয়াজের তুলনীয় অক্ষর সম্ভবত নেই। গলা ব্যথা হলে মাঝে মাঝে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। চ্যবনপ্রাশ ছাড়াই ব্যাধিমুক্ত হবেন।

আর দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোকের কথা বলে প্রসঙ্গান্তরে যাব। প্রথম শম্ভু নন্দ— কলেজে প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে যে-ছেলেটি আমার পাশে বসেছিল সেই ছেলেটি। মহম্মদ আলি বা বরকত আলির তৈরি স্যুট পরে সে ক্লাসে আসত। ওরা থাকত নিমতলাঘাট স্ট্রিটের এক প্রান্তে, এক বহুতল বাড়ির ভিতর দুই ঘরের একটি ফ্ল্যাটে। প্রতি শনি-রবিবারে ওর বাড়িতে দুপুর বা রাতের খাওয়া আমার বাঁধা ছিল। বড় কাঁসার থালায় প্রায় থালার সাইজেরই পুরি, আর তার সঙ্গে ছোট ছোট কটোরায় একটু টকটক স্বাদের অতি মুখরোচক পাঁচ-ছ রকম তরকারি। শম্ভু বিহার অঞ্চলের অধিবাসী, পূর্বপুরুষ পঞ্জাবি। পরে উত্তর ভারতের নিরামিষ আহার খাওয়ার সুযোগ অনেকবার হয়েছে। কিন্তু শম্ভুর বাড়ির রান্নার মতো সুখাদ্য কোনও রাজা-মহারাজার বাড়িতেও কখনও খাইনি। ওদের ধরনধারণ ছিল সম্পূর্ণ সেকেলে। খাওয়াদাওয়া মেঝেতে আসন পেতেই হত। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছিলাম। ওদের সনাতনী জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ ছিল পরিমিত পরিমাণে মাদকদ্রব্য পান। গ্রামের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই দুই ধরনের বাড়িতে তৈরি ফলের মদ আসত—সান্তরে আর আনানস, মানে কমলা আর আনারসের রস রোদে দিয়ে গাঁজিয়ে তৈরি। পুরি তরকারির সঙ্গে কাঁসার গ্লাসে ঢেলে খাওয়া হত। অপূর্ব সুস্বাদু পানীয়। প্রথম যেদিন খাই জিনিসটার তেজ জানা ছিল না। শম্ভুর বাবা মহেশবাবু দু-একবার চেতাবনি উচ্চারণ করলেন, "বাচ্চোঁ, সোচকে পিনা।" তারপর আর কিছু মনে নেই। দিন দুই পরে

জ্ঞান হয়ে দেখলাম যেখানে বসে খাচ্ছিলাম সেখানেই শুয়ে আছি। বিশেষ বিশেষ দিনে সিদ্ধি ঘোঁটা হত। শম্ভুর এক মামা এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সিদ্ধি দেবাদিদেব মহাদেবের পেয়। একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হয়। সিদ্ধি বাটা হয়ে গেলে পেস্তা-বাদামের সরবতে মিশিয়ে মামাজি পুতাটিকে শিবজ্ঞানে ব্যোম ব্যোম মন্ত্রে পূজা করে তার মাথায় পানীয়টি ঢেলে দিতেন। আর সেই মন্ত্রপূত সিদ্ধি আমরা অমৃতজ্ঞানে সেবন করতাম। তূরীয়ানন্দে দেহমন পবিত্র হয়ে যেত।

প্রথম পরিচয়ের পর কিছুদিন শম্ভু বড় জ্বালাত। যখন তখন এসে উপদ্রব করত, লেখাপড়া করতে দিত না। শেষে কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ নীতি অবলম্বন করে জামান সাহেবকে বলতাম বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগিয়ে দিতে। শম্ভু চলে গেলে জামান এসে দরজা খুলে দিত। আমাদের পরিচয়ের ষষ্ঠিতম বার্ষিকীর দিনে এই অপরাধ আমি শম্ভুর কাছে স্বীকার করি। তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব এখনও অটুট আছে। কলকাতা শহরে কয়েক লক্ষ অবাঙালির বাস। তাদের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদান নেই বললেই চলে। শম্ভুর কৃপায় এই অপরিচয়ের পর্দা একটু সরেছিল।

নীরদবাবুর লেখা 'আত্মঘাতী বাঙালি' উপন্যাস নয়, প্রবন্ধ-সংগ্রহ। ওটা উপন্যাস হলে, ওই বইয়ের উপযুক্ত নায়ক হতে পারত এরকম একটি মানুষ ডাফ হস্টেলের বাসিন্দা ছিলেন। ভদ্রলোক বোধ হয় এখনও জীবিত। তাই তাঁর সত্যিকার নাম প্রকাশ করছি না। ম্যাট্রিকে পাঁচটা লেটার পেয়ে হীরকবাবু আই.এস.সি. পড়তে স্কটিশ চার্চ কলেজে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন উনি ওই কলেজেই ইকনমিকসে অনার্স পড়ছেন। অত্যন্ত ফিটফাট সৌখিন মানুষটি আবদাল্লা ৫৫৫-র টিন থেকে অনর্গল সিগারেট খেতেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সব মন্তব্য করতেন। অনেক সময় মন্তব্য নয়, মন্তব্যের ইঙ্গিত শুধু থাকত। তার গূঢ় অর্থ ওঁর বয়স্য, আমার দাদাই শুধু বুঝতেন। তারপর সেই গূঢ়ার্থ চিন্তা করে দু'জনেই খুব হো হো করে কিছুক্ষণ হাসতেন। ব্যাপারটা অন্য লোকের কাছে রহস্যময় থেকে যেত। কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে হীরকবাবুর মূল বক্তব্য আমি বুঝেছিলাম। পৃথিবীটা বড় নোংরা জায়গা। এখানে সবাই বিচিত্র মুখোশ পরে নিজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ধান্দাগুলিও নোংরা, নেহাতই ছোট জাতের। যদি কিছু হঠাৎ মনে হয় মহৎ বা শ্রদ্ধেয়, খুঁটে দেখ, ভিতরে পাবে শুধু কদর্য নোংরা। এখানে উচ্চাশারও কোনও মানে নেই। পূরীষ-পুষ্করিণীতে আকণ্ঠ ডুবে থেকে মানমর্যাদা ভোগ-ঐশ্বর্যে লাভ কী? এখানে একমাত্র করার মতো কাজ বসে বসে মজা দেখা—মানুষের বোকামি আর ভণ্ডামি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা। উচ্চাঙ্গের প্রহসন দেখার আনন্দ পাবে। হীরকবাবুর ক্ষমতা ছিল জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনোর। সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উনি ঠিক করলেন উনি কোনও অফিসের বড়বাবু হবেন। বড়বাবুর চেয়ারে বসে নীচের লোকের খোসামুদেপানা আর উপরের লোকের বোকা আত্মম্ভরিতা দেখে হো হো করে হাসবেন। এই সিদ্ধান্তে অটল থেকে জীবনের সব সম্ভাবনা উনি তিলে তিলে নষ্ট করেছিলেন। কীভাবে উনি ওঁর এই নেতিবাচক ভূয়োদর্শনে পৌঁছলেন, তা কখনও জানতে পারিনি। লোকে বলাবলি করত ওঁর জীবনে

একটা ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস ছিল। তখনকার দিনে অনেকেরই থাকত। কিন্তু ওই প্রচণ্ড বুদ্ধিমান মানুষটি কি কোনও নারীর কাছে বঞ্চনা পেয়ে সমস্ত মানুষকে অবিশ্বাস করতে শিখেছিলেন? এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছি গুরুকুলবাস। কিন্তু গুরুদের কথা এখনও পর্যন্ত কিছু বলা হয়নি। যে গুরুর কাছে পাঠ নেওয়ার উদ্দেশ্যে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম তাঁর নাম রেভারেন্ড মিস্টার মোয়াট। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে উনি স্কটিশ মিশনে যোগ দেন। মিশন থেকে ওঁকে জিগ্যেস করে উনি কলকাতার কলেজে ইংরেজির চেয়ারে যেতে রাজি আছেন কি না। উনি সানন্দে রাজি হয়ে এলেন। বলতেন, "এসে দেখি, চেয়ার টেয়ার কোথাও নেই। গোটা দুই বেঞ্চি আছে বটে।" এ দেশ ওঁর ভাল লাগেনি। পুরাতনপন্থী ব্রিটিশ ভদ্রলোকটি ভারতীয়দের এক ধরনের বর্বরই মনে করতেন। সম্ভবত আমি ভর্তি হওয়ার অল্পদিন আগে যে এক বছর ধরে ছাত্র ধর্মঘটে কলেজটির সর্বনাশ ঘটে, সেই ধর্মঘট ওঁর স্থায়ী বিরাগের অন্যতর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ড্রয়িং রুমের ভদ্রতার নিয়মকানুন মেনে ধর্মঘট হয় না। তার উপর ওই আন্দোলনের দু-একটি নেতার সঙ্গে পরে পরিচয় হয়ে দেখেছি—এমন দুর্বিনীত অসভ্য রকমের দেমাকি লোক বাজারে টেন্ডার দিলেও পাওয়া কঠিন হত। এঁদের কেউ কেউ বাংলার রাজনীতিটা পারিবারিক সম্পত্তি মনে করতেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে আমাদের অনেক দুর্ভাগ্য পোয়াতে হয়েছে। কিন্তু ঠিক ওই জাতীয় মানুষের রাজত্ব যে কায়েম হয়নি তার জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই। মোট কথা সাম্রাজ্যের সুফলে বিশ্বাসী মোয়াট সাহেবের মতো লোকের পক্ষে এইসব লোককে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ওঁর কাছে কলকাতায় বাস করা ঈশ্বরদত্ত শাস্তি বলেই মনে হত। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মযাজক হিসাবে কর্তব্যজ্ঞানে সেই শাস্তি উনি মাথা পেতে মেনে নিয়ে সমস্ত কর্মজীবন কলকাতায়ই কাটান।

কিন্তু এক ব্যাপারে সম্ভবত ওঁর কোনও আক্ষেপ ছিল না। উনি পড়তে এবং পড়াতে ভালবাসতেন। খ্যাতির লোভ ওঁর ছিল না। কখনও কিছু লিখেছেন বলে শুনিনি। ডাফ হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে এক বিরাট ফ্ল্যাটে উনি থাকতেন। সে ফ্ল্যাটের সব দেওয়ালই বইয়ের আলমারিতে ঢাকা ছিল। উনি তখন কলকাতার সব চেয়ে নামজাদা শিক্ষকদের একজন। ওঁর ক্লাস করতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও আসত। তখন আমি ইংরেজি অনার্স পড়ব ঠিক করেছি। উনি ওঁর গ্রন্থসংগ্রহ থেকে আমাকে বই ধার দিতেন—সাহিত্যে রুচি যাতে মার্জিত হয় সেই উদ্দেশ্যে এবং সমালোচনার অ-আ-ক-খ শেখাবার জন্য।

ইংরেজির অন্যান্য শিক্ষকদের কাছেও আমার যাওয়া-আসা ছিল। এঁদের চলাফেরা পোশাক-আশাকে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য বা স্টাইল ছিল যা আমাদের কলেজের অধ্যাপক সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মিলত না। এঁদের কাউকে কখনও ধুতি পরতে দেখিনি। সবারই ইংরেজি উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল। তা ছাড়া মহী বোস, সুশীল দত্ত এঁরা সবাই অসম্ভব রকমের স্মার্ট ছিলেন। মিস্টার দত্ত রামবাগানের দত্ত পরিবারের যে-অংশটি খ্রিস্টান হয়ে

যায়, সেই পরিবারের ছেলে। ওঁদের বাড়ি যেতাম মাঝে মাঝে। ড্রয়িংরুমটি ভিক্টোরীয় আসবাবপত্র আর শ্বেতপাথরের মূর্তি দিয়ে সাজানো ছিল।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত ঐতিহ্যের মানুষ ছিলেন বাংলার প্রধান অধ্যাপক বরিশাল-সন্তান এবং পিতৃবন্ধু ডক্টর সুধীর দাশগুপ্ত। উনি এক সময় বিপ্লবী দলের সভ্য হিসাবে সতীনদার সহকর্মী ছিলেন। খদ্দর পরতেন এবং নিয়মিত যোগাভ্যাস করতেন। নন্দনশাস্ত্র নিয়ে গভীর গবেষণাভিত্তিক একটি বই লেখেন উনি—যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল নতুন এক নন্দনতত্ত্ব—যা গ্রিক এবং সংস্কৃত দুই ধারা থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও বৈষয়িক জীবনে কখনও কোনও উন্নতি হয়নি। তখনকার দিনে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাব্রতীদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা একই ধরনের। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা শুধু পড়াশুনো করার আনন্দেই পড়তেন, জীবন থেকে কোনও প্রত্যাশাই ছিল না। বাংলা বিভাগের বিপিনবাবুর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। উনি যা একবার পড়তেন তাই ওঁর মুখস্থ হয়ে যেত। বেশ কিছু বই ওঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ ছিল। মেঘনাদবধ কাব্য তার একটি। অকৃতদার মানুষটির জীবন কাটে কলকাতার এক মেসে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় সব চেয়ে বিচিত্র চরিত্রের যে মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর নাম অরুণ সেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশ সেনের পুত্র এবং কবি সমর সেনের বাবা। একদিন কলেজে ঢুকছি, হঠাৎ উনি পেছন থেকে ডাকলেন। বললেন, "জানো, আমি তোমার জ্যাঠা হই?" কথাটা জানা ছিল কারণ দীনেশবাবু সম্পর্কে বাবার মামা ছিলেন। ওঁর উৎকেন্দ্রিকতার নানা গল্প বাবার কাছে শুনতাম। পরবর্তী প্রস্তাবে একটু হকচকিয়ে গেলাম। "ক্লাসের পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার এক দিদি আছেন জানো? জ্যোৎস্না? তাঁর কাছে নিয়ে যাব।" আমার দিদি আছেন, অথচ আমি জানি না। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হল। যা হোক, ক্লাসের পর বাধ্য ছেলের মতো অরুণবাবুর সঙ্গে জ্যোৎস্নার বাড়ি গেলাম। জ্যোৎস্না মানে অভিনেত্রী জ্যোৎস্না গুপ্ত। হঠাৎ মনে পড়ল বাবার আপন মামাতোভাই কুমার গুপ্ত এক সময় সিনেমা থিয়েটারের জগতে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। কুমারকাকাকে কখনও দেখিনি। কিন্তু চাপা গলায় মাঝে মাঝেই ওঁর বিষয়ে আলোচনা শুনেছি। উনি রঙ্গমঞ্চের এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করে কার্যত সমাজচ্যুত হন। এঁদো গলির মধ্যে ওঁদের বাড়ি গিয়ে একটু অদ্ভুতই লেগেছিল। তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। তখনও বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। মা-বাপ আর মেয়ে তিনজনেই মাটিতে মাদুর পেতে ঘুমাচ্ছিলেন। বাড়িতে আসবাবপত্র প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। অভিনেত্রীর বাড়ি কী রকম হতে পারে সে সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছিল। তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। শুধু অবাক হয়ে দেখলাম কুমার গুপ্তকে। শত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও কী অসাধারণ রূপ। বাবার মামাবাড়ির সবারই রূপের খ্যাতি ছিল—রূপের আর উৎকেন্দ্রিকতার। মাতুলক্রমে সেই রূপ বাবাও পেয়েছিলেন। আর কোনও কারণে চটে গেলেই মা বলতেন, "মামাবাড়ির ধারা। কিছু তো আসবে!" কিছু যে এসেছিল সেটা আমারও ধারণা।

জ্যোৎস্না গুপ্তের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। তার এক কারণ অরুণবাবু অল্পদিন পরেই কলেজ ছেড়ে দিলেন। আরও দুটি কাজ করলেন সেই সঙ্গে। প্রথম ওঁর বন্ধু শিশির

ভাদুড়ীকে শ্রীরঙ্গম নামের রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলার জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চিত পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেন। এটা শোনা কথা। দ্বিতীয় কাজটা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। উনি এক অভিনেত্রী বিয়ে করলেন। তার কিছুদিন পর যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় উনি আই. এন. এ-দের সঙ্গে যোগ রাখার অভিযোগে রাজবন্দি হন। একটা ট্রান্সমিটারে উনি ওদের প্রচারবার্তা শুনছিলেন। সেই সময় ওঁকে গ্রেফতার করে। ওঁর সঙ্গে আবার দেখা হয় অনেক বছর পর। গড়িয়াহাট কোয়ালিটির মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ উনি এগিয়ে এসে বিনা ভূমিকায় শুরু করলেন, "তোমাকে একটা কথা বলি। কালিদাসের মেঘদূতম্ প্রেমের কাব্য না, দেশপ্রেমিক কবির ভারত-বর্ণনা। যক্ষবিরহ শুধু একটা ছুতো।" কথাটা বলে উনি ট্রামে উঠে পড়লেন। আর কখনও ওঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার জীবনের ধারা বদলে দেন একটি মানুষ, তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে বলি। তাঁর নাম মহেন্দ্রলাল সরকার, আমার বন্ধু বাদলের বাবা। ইতিহাসের অধ্যাপক এই মানুষটি ভাল পড়াতে পারতেন না, ওঁর গলায় একটা অপারেশন হওয়ার ফলে ওঁর কথা বলতেও কষ্ট হত। ওঁর ক্লাসে গিয়ে অকারণ গোলমাল করা ছাত্রদের একটা ফুর্তি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগত। তাই মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেতাম। উনি আমাকে বলতেন, "ইংরেজি পড়ে কী করবে? দেশে বসে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। দেখ না, বড় বড় পণ্ডিতরা সব রয়েছেন, কারও কিছু অবদান নেই। ইতিহাস পড়ো। স্যার যদুনাথ রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছেন, তুমি মোগল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখো। কিন্তু সুশোভনের কাছে পালিয়ে যেয়ো না যেন।" কিছুদিন ভাববার পর ওঁর উপদেশটাই গ্রহণ করি। কিন্তু প্রথমটা, দ্বিতীয়টা না। ফারসি পড়া আবার শুরু করলাম। এবার প্রেম নয়, জ্ঞানের সন্ধানে।

'৪১ সনের অগাস্ট মাসে একদিন মোয়াট সাহেবের ক্লাস করছি। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। মোয়াট আমাকে বললেন দেখে আসতে কী ব্যাপার। বের হয়ে শুনলাম, একটু আগে রবীন্দ্রনাথ মারা গিয়েছেন। কথাটা এসে ক্লাসে বলতেই প্রচণ্ড একটা হইচই শুরু হল। মোয়াট সাহেবের চোখে সেই গভীর ব্যঙ্গের দৃষ্টিটা কখনও ভুলব না। ভারতবাসীরা যে বর্বর, তাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষটির প্রয়াণে শোকপ্রকাশের ভঙ্গি দেখে উনি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন।

নিঃসন্দেহ আমিও কিছুটা হলাম—শম্ভুর সঙ্গে জোড়াসাঁকো গিয়ে। এমন দ্বিধাহীন বর্বরতার দৃশ্য দেখতে হবে কখনও ভাবিনি। প্রচণ্ড চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি চলছিল। জনতার চাপে ঠাকুরবাড়ির লোহার গেট ভেঙে গেল। মানুষের ভিড় এত বেশি যে আমাদের পা প্রকৃতপক্ষে মাটি ছুঁচ্ছিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে মানুষের মাথায় মাথায় খাটের উপর শোয়ানো ওঁর দেহ বেরিয়ে এল। আর অনেক লোক ওঁর চুল দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল। কবির দেবদেহ শুধু মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। বাইশে শ্রাবণ আমার কাছে শুধু জাতীয় শোকের দিন নয়, জাতীয় গ্লানির দিনও হয়ে আছে। এই বর্বরতার নায়করা যত দূর দেখতে পেলাম তথাকথিত ভদ্র বাঙালি ছাড়া আর কেউ নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্বে অক্ষশক্তির সর্বত্রই জয় হচ্ছিল। সিঙ্গাপুর এবং বর্মা

জাপানিদের অধিকারে চলে যাওয়ার পর ওরা প্রায় ভারতবর্ষের দরজায় এসে পৌঁছেছে। ১৯৩৯-এই কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করে কতকটা নিষ্ক্রিয় অসহযোগের পথ নিয়েছে। কিন্তু অবস্থা যে ওইখানেই থেমে থাকতে পারে না এ কথা আমরা সবাই বুঝছিলাম। জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরেই একদল প্রত্যক্ষ আন্দোলনের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত না করার জন্য নেহরুর ব্যগ্রতার পিছনে খুব একটা জনসমর্থন ছিল মনে হয় না। একটা কিছু শিগগিরই ঘটবে এবং তাতে আমাদের ছাত্রসমাজের একটা ভূমিকা থাকবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। এই সময় ক্রিপস ভারতবর্ষে এলেন। আমরা খুব আশা করলাম— স্বাধীনতা এবার সত্যি আসবে। পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের বয়সি ছেলেরা লড়াই করছে, ইংরাজের সঙ্গে সমঝোতা হলে আমরাও সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেব, ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যাদের চিন্তায় কোনও অস্পষ্টতা ছিল না তারা অনেকেই মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু ক্রিপস মিশন সফল হল না। নেহরুর বন্ধু স্যার স্ট্যাফোর্ড ওঁকে এবং গাঁধীকে দোষ দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। আসলে ক্রিপসও জানতেন না যে, ভিতরে ভিতরে চার্চিল আর লিনলিথগো কলকাঠি নাড়ছিলেন মিশন যাতে সফল না হয়। নেহাতই আমেরিকা আর বামপন্থী সহকর্মীদের চাপে চার্চিল আলোচনায় বসতে নিমরাজি হয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ওঁর কোনওদিনই ছিল না। গত তিন দশকের গবেষণায় এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তখন কেউই কিছু জানত না।

ক্রিপস দেশে ফেরার পর পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। গাঁধীজি স্পষ্টই ইঙ্গিত দিলেন—উনি গণআন্দোলনের কথা ভাবছেন, যে আন্দোলনের মূল সূত্র হবে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব করা হল, 'ইংরাজ ভারত ছাড়ো'। কুইট ইন্ডিয়া। ৯ আগস্ট ভোরবেলা গাঁধী সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দি হলেন। ভারতবর্ষের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলল। কলকাতায় স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে গেল। তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম।

সন '৪২

১৯৪২ সনের ৯ আগস্ট গাঁধীজিসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দর গ্রেফতার হওয়ার খবর সকালবেলায়ই কলকাতায় পৌঁছে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে সত্যমিথ্যা নানা গুজবও আমাদের কানে আসে। সত্যি খবর—বোম্বাইয়ের রাস্তায় বলতে গেলে জনতার প্রকাশ্য বিদ্রোহ হয়েছে। সমস্ত কারখানা, অফিস, দোকানবাজার, স্কুলকলেজ সব বন্ধ হয়ে গেছে। বারবার গুলি চালানো সত্ত্বেও ক্ষিপ্ত জনতাকে সরকার বাগে আনতে পারেনি। ওই শহরে সরকারের অধিকার ফিরে পেতে তিন দিন লেগেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ভারতবর্ষের নানা জায়গায়ই রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। আর খবরের মধ্যে ভুয়া গুজব ছিল—সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে। অনেক জায়গায়ই পুলিশ সরকারের আদেশ অমান্য

করে বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। দেশের এক বিস্তৃত অঞ্চলে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গত চার দশকের গবেষণার ফলে আগস্ট আন্দোলনে সত্যিতে কী হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে, যদিও জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে ওই ঘটনা সংক্রান্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা ব্যবহার করে আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও কেউ লেখেননি। সেই ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য না। অন্য কয়েক লক্ষ কিশোরের মতো বর্তমান লেখকও ওই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ বরিশাল জেলা, সেখানে আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। সুতরাং এ বিষয়ে আমার স্মৃতির ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে মূল্য খুবই সামান্য, নেতিবাচক বললেও ভুল হয় না।

৯ আগস্ট সকাল থেকেই কলকাতায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে ঠিকই, কিন্তু পুলিশ সহজেই তার মোকাবিলা করতে পেরেছিল বলে আমার ধারণা। সকাল দশটা নাগাদ অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বেশ বড় একটি শোভাযাত্রা 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে হেদুয়া পৌঁছয়। ক্লাস সেদিন ঠিক বসেনি। ছেলেরা কলেজের চৌহদ্দির ভিতর এবং হেদুয়ায় জলাশয়ের চারপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বোধহয় গোলমালের আশঙ্কায় মেয়েরা প্রায় কেউই আসেনি। শোভাযাত্রা হেদুয়ায় পৌঁছান মাত্র সবাই দৌড়ে গিয়ে মিটিংয়ে যোগ দিল। একটি পুলিশের গাড়িও এসে পার্কের রেলিংয়ের বাইরে দাঁড়াল। দু-একটি বক্তৃতা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রস্তাবের পর মিছিল আবার রাস্তায় বের হল। পুলিশের গাড়ি আমাদের পিছু নিল, কিন্তু অনেকটা পথ কোনও বাধা দিল না। ঠিক কোথায় মনে পড়ে না, সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়ে পুলিশ আমাদের পথরোধ করল। তারপর কাঁদুনে গ্যাসের তীব্র গন্ধ নাকে এল এবং তার সঙ্গেই বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের শব্দ পেলাম। আওয়াজটা যে ফাঁকা তা আমরা তখন বুঝতে পারিনি। বলতে লজ্জা হয়, বন্দুকের শব্দে আমরা দৌড়ে পালালাম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনার প্রায় চার বছর পরে কলকাতার ছাত্ররা আই.এন.এ নেতাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করে। পর পর দু দিন তাদের উপর গুলি চলে। সত্তর-আশি জন ছাত্র মারা যায়। তখন কিন্তু কেউ পালায়নি। এই সময় একটা কথা খুব শুনতাম : বৈপ্লবিক অবস্থা, 'রেভোলিউশনারি সিচুয়েশন'। হয়তো ১৯৪৬-এর আগে আমরা ওই অবস্থায় পৌঁছইনি।

গাঁধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় ভাবী আন্দোলনের চেহারা কী হবে তা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়ে তিনি বা নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট কোনও নির্দেশ দিয়ে যাননি। শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নয়, জেলা, মহকুমা এমনকী গ্রাম পর্যন্ত যেসব স্থানীয় নেতা বা কর্মীদের নাম পুলিশের খাতায় ছিল, তাঁদের প্রায় সবাইকে কয়েকদিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হয়। অল্প যাঁরা ক'জন বাইরে থাকলেন তাঁদের উপর পুলিশ কড়া নজর রাখল। সেই নজর এড়িয়েও কয়েকজন নেতা এবং বেশ কিছু কর্মী গা ঢাকা দিয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। এঁদের কাছ থেকে নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে ইস্তাহার বের হতে লাগল। কলকাতা শহর দেওয়াললিপিতে ছেয়ে গেল : 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। আমরা শুনলাম—জয়প্রকাশ নারায়ণ আর অরুণা আসফ আলি সর্বভারতীয় আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার নিয়েছেন। প্রদেশে প্রদেশেও বৈপ্লবিক কমিটি তৈরি হয়েছে। আমরা তাদের কাছ থেকেই নির্দেশ পাব।

কে বা কাদের কাছ থেকে জানি না, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কর্তব্য কী হবে তার বিস্তৃত নির্দেশ সংবলিত একগোছা ইস্তাহার আমার হাতে আসে। যে-লোকটি এক সন্ধেবেলা এসে ওগুলি দিয়ে গেল, তাকে আমি কোনওদিন চোখে দেখিনি। সে শুধু বলল, যারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের প্রতি প্রাদেশিক হাইকম্যান্ডের নির্দেশ, নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাও, আর ফিরে গিয়ে জাতীয়তাবাদী কর্মী, যাঁরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েননি, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে তাঁদের কাছ থেকে নির্দেশ পাবে। ইস্তাহারে লেখা ছিল—বর্তমান আন্দোলনের প্রকৃতি এবং কর্মপদ্ধতি অসহযোগ আর আইন অমান্য আন্দোলনের থেকে ভিন্ন হবে। আন্দোলনকারীরা কেউ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করবে না। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য— ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টা বানচাল করে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা আবার আলোচনায় বসতে এবং যুদ্ধের পর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হয়। অক্ষশক্তির জয় আমাদের কাম্য না, কিন্তু ইংরেজকে বোঝানো দরকার যে, ভারতবর্ষকে পরাধীন রেখে যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা আশা করা বাতুলতা। আর ভারতবর্ষের সহযোগিতা ছাড়া জাপান-জার্মানিকে হারানো সম্ভব না। সুতরাং আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ হবে নাশকতামূলক। সংবাদ চলাচল, রসদ সরবরাহ আর যাতায়াতের ব্যবস্থা বানচাল করতে হবে। নিরঙ্কুশ অহিংসার পথে এইসব লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব না। সুতরাং শুধু ব্যক্তিমানুষের প্রতি হিংসাত্মক কাজই নিষিদ্ধ, অন্য কোনও ক্ষেত্রে নয়।

এই ইস্তাহার হাতে পৌঁছবার দু'দিন পর বরিশাল রওনা হই। খুলনায় স্টিমারে উঠে দেখি অনেক পরিচিত লোকই দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁদের অনেকের কাছেই ওই ইস্তাহার পৌঁছেছে, যদিও এ নিয়ে সামান্য যা আলোচনা হচ্ছে, তা নিতান্তই ফিসফিস করে। কিন্তু আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী—এ ছাড়া কোনও আলোচনা নেই। '৪২-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে

জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর মনে এক অসম্ভব আশার সঞ্চার হয়েছিল। চার্চিল যতই তড়পান, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে বেশ বিচলিত হয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ এখন পাওয়া গেছে। কিন্তু কাণ্ডারীহীন স্বতঃস্ফূর্ত ওই বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল মনে হয় না। যে-ন্যূনতম সংগঠন এবং বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ছাড়া আন্দোলন সফল হতে পারে না, নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস তার ব্যবস্থা করেননি।

বরিশাল পৌঁছে শুনলাম—কর্মী এবং নেতারা অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অনেকেই এখনও জেলের বাইরে। সতীনদা কলকাতায় গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে আছেন, সুতরাং বরিশালে আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য আছেন শুধু দ্বিতীয় সারির স্থানীয় নেতারা আর আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেশ কিছু পুরনো কংগ্রেস ভলান্টিয়ার। কিন্তু নতুন আন্দোলনের কার্যক্রম যে-রূপ নিচ্ছে, তার সঙ্গে এঁদের কারওই পরিচয় নেই। ফলে এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি আর পুলিশও এই নিষ্ক্রিয়তা দেখে হাত গুটিয়ে আছে, অকারণে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিচ্ছে না। এই অবস্থায় পুরনো কর্মীরা আমার বাবার কাছে এলেন। কারণ জেলের বাইরে যেসব স্থানীয় নেতা আছেন এবং আন্দোলনে যোগ দিতে অনিচ্ছুক নন, তাঁদের মধ্যে উনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে মিটিং বসল। সেখানে জনা পঞ্চাশেক কর্মী এলেন। আলোচনায় দেখা গেল যে, রেলগাড়ি-বর্জিত বরিশাল জেলায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া দুইভাবে সম্ভব। প্রথম, ডাক এবং তার বিভাগের কাজ বিপর্যস্ত করা। দ্বিতীয় পথ, বালাম চাল আর মুসুরির ডালের দেশ বরিশাল জেলায় সরকার যে ভরসা করে আছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, সেই গুড়ে যথাসম্ভব বালি ঢালা। এই দুই কাজের জন্য প্রস্তুতি গোপনে করতে হবে এবং বিশেষ বিশেষ কাজ পাঁচ-ছ'জনের ছোট ছোট দলের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রাথমিক সংগঠনের কাজটা অভিজ্ঞ কর্মীরা করবেন।

আমাদের বাড়ির এই মিটিং থেকে বাড়ি ফেরার পথেই কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। মিটিংয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হন। তখন এবং এর পরেও দেখেছি, ওই জাতীয় রাজনৈতিক অবস্থায় মানুষ কিছুটা ভারসাম্য হারায়। আমাদের বাড়িতে ঢোকার রাস্তার একপাশে পুলিশ কোর্ট। সেখানে সব সময়ই খাকি এবং সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকত। আন্দোলনের সময় দিনের আলোয় জনা পঞ্চাশেক সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী আমাদের বাড়িতে আসছেন, এ তথ্য পুলিশের কাছে গোপন থাকার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া মিটিংয়ে ওদের গুপ্তচর দু-একজন থাকাও খুবই সম্ভব। কিন্তু যেই গ্রেফতারের খবর শহরে ছড়াতে লাগল, অমনি আলোচনা শুরু হল—কার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্যাপারটা ঘটছে। একজন অনেকবার জেলখাটা রাজনৈতিক কর্মী প্রথম মিটিং থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। সকলের সন্দেহ পড়ল তাঁর উপর। দুঃখবরণই যদি রাজনৈতিক সততার প্রমাণ হয় তবে ওই লোকটি এবং ওর পরিবারের মানুষদের পাওয়া সোনার মেডেলগুলিতে কোনও খাদ ছিল না। কিন্তু পরে যখন সবাই জেলের একই ওয়ার্ডে বন্দি ছিলাম, তখন দেখতাম এই হতভাগ্য মানুষটির সঙ্গে কেউই কথা বলত না। যাঁরা ওকে একঘরে করেছেন, তাঁদের যদি জিজ্ঞেস করতাম যে ও

যদি টিকটিকিই হবে তবে ওকেও জেলে রেখেছে কেন? উত্তর হত, "এটা পুলিশের অতি পুরনো চাল। প্রথম কথা ও আমাদের উপর নজর রাখবে। তাছাড়া, ওকে যাতে আমরা সন্দেহ না করি এটা তারও চেষ্টা। নিশ্চয়ই পুলিশ ওর পরিবারকে মোটা টাকা দিচ্ছে। জেল থেকে ছাড়া পেলে ওকেও ভালভাবে পুষিয়ে দেবে।" জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওই হতদরিদ্র অকৃতদার মানুষটির বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। মোটা কেন, কোনও টাকারই মুখ ওঁরা কখনও দেখেছেন, তার প্রমাণ কিছু চোখে পড়েনি। এ নিয়ে বিপ্লবপন্থী কর্মী দু-একজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুনেছি, "আরে ওসব বুর্জোয়া ভাবালুতা ছাড়। রাজনৈতিক আন্দোলনে অমন দু-দশটা লোক বেঘোরে মারা পড়েই। ওটা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ার মতো ব্যাপার। ওসব ভাবতে বসলে আন্দোলন করা চলে না।"

যতদূর জানি, বরিশাল শহরে আগস্ট আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ঘটনা একটিই ঘটেছিল। যুদ্ধ প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে যে-মিটিং বসে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এই চাল জাহাজে তুলে কলকাতা নেওয়ার চেষ্টা হলে বাধা দেওয়া হবে। চালের বস্তা রাস্তায় ফেলে তখনই বিলি করে দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনা খুব সুচিন্তিত ছিল না। কারণ সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে লড়াই করতে যে-জনবল এবং সংগঠন দরকার, তা আমাদের ছিল না। আর রাস্তায় চালের বস্তা কেটে লুঠ করানোও অসম্ভব হত। পুলিশ নিশ্চেষ্ট থাকত না। পরিকল্পনাটি আমাদের কর্মীদের অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দিচ্ছিল মাত্র। কার্যত কিছুই ঘটল না। যে সব কর্মীরা পুলিশের হাত এড়িয়ে জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁরা কিছু ছেলেছোকরা একত্র করে রাস্তায় জলুস নামালেন। উদ্দেশ্য, এরা জাহাজঘাটায় গিয়ে জেটি থেকে চাল লুঠ করবে। কিন্তু পুলিশের লাঠিচার্জের সামনে শোভাযাত্রাকারীরা দাঁড়াতে পারল না, কয়েক মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। লাঠির ঘায়ে কিছু ছেলের হাত-পা বা মাথা ভাঙল। বাকি কিছু গ্রেফতার হল।

এই ঘটনার দু-একদিন পর পুলিশ এক অদ্ভুত চাল চালে। ওরা বাবাকে গ্রেফতার না করে অনির্দিষ্ট কাল গৃহবন্দি থাকার হুকুম নিয়ে আসে। দাদা কাগজটি পড়ে বললে, "এই কাগজে বর্ণিত লোক এখানে থাকেন না।" কারণ হুকুম যাঁর নামে এসেছিল, তিনি হচ্ছেন বিনোদবিহারী রায়চৌধুরীর পুত্র, অমিয়কুমার রায়চৌধুরী। আমার ঠাকুর্দার নাম বিনোদকুমার রায়চৌধুরী। পুলিশ বাধ্য হয়ে হুকুমনামা ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সেই রাত্রেই কোশ নৌকো করে আমরা কীর্তিপাশা চলে গেলাম। সেখানে বাবা রায়তদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যাতে তারা চাল লুকিয়ে ফেলে সরকারের সরবরাহ প্রচেষ্টা বানচাল করে। এ কাজে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঝুঁকি ছিল না। সুতরাং কিছুটা সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কার্যত এ চেষ্টাও বিফল হয়, কারণ গ্রামাঞ্চলে আমাদের কোনও সংগঠন বা কর্মী ছিল না। আমাদের শহরের বাড়ির দরজায় অন্তরীণ থাকার হুকুমনামা পুলিশ ফের লটকে দিয়ে যায়। এবার ঠাকুর্দার নাম সঠিক লেখা ছিল। এক মাস পর পুলিশ কীর্তিপাশায় এসে বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। ওঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হল— অভিযোগ, সরকারের আদেশ অমান্য করে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া। মামলা টিঁকল না— কারণ বিচারক বললেন, ওঁর

অনুপস্থিতিতে হুকুমনামা টাঙিয়ে দেওয়া হয়, আর উনি তখন কোথায় ছিলেন, তা পুলিশের অজানা ছিল না। যে-দুঃসাহসী বিচারক সরকারের আনা অভিযোগ নাকচ করেন, তাঁর নাম আবুল কাসেম খান, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামসুল হুদার বড় ভাই। পরবর্তী কালে ইনি পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান শিল্পপতি। ফৌজদারি মামলা নাকচ হয়ে গেলে বাবা ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজবন্দি হলেন।

নেতৃস্থানীয় সবাই গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন সজীব রাখার দায়িত্ব নিল নেহাতই অর্বাচীন কিছু ছেলে। আমার দাদার বয়স তখন আঠারো-উনিশ। অত্যন্ত রোমান্টিক প্রকৃতির মানুষটি এবার আন্দোলনে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কোথা থেকে জানি না, বেশ কিছু ইস্কুল-কলেজের খুবই অল্পবয়স্ক ছেলে একটু রাত হলে আমাদের বাড়িতে এসে জড়ো হত। তারপর রাত বারোটা-একটা অবধি কর্তব্যকর্ম নিয়ে আলোচনা চলত। প্রাদেশিক বিপ্লবী কমিটির ইস্তাহার বলে বর্ণিত যেসব কাগজ আমাদের হাতে আসত, তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজের চেষ্টা হত। কাজ প্রধানত তিনটি : পোস্টাফিস পোড়ান, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া এবং চাষিদের বুঝিয়ে সরকারি খাদ্যসংগ্রহের প্রচেষ্টা বানচাল করা। দাদা গ্রামে গ্রামে ঘুরে এইসব পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করতেন। আমার কাজ ছিল বিপ্লবপ্রচেষ্টা চালু রাখার জন্য অর্থসংগ্রহ। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, টাকা দিতে কেউ আপত্তি করতেন না। আর দাতাদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিলেন সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে দুজন আই. সি. এস. অফিসার। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এঁদের বিদ্বেষ কতটা তীব্র ছিল, রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হলেই তা বোঝা যেত। একজন বিখ্যাত সুপণ্ডিত আই. সি. এস অফিসার আমাকে বলেন, জাপানিরা শত্রুভাবেই আসছে এ কথা ধরে নেওয়ার সপক্ষে কোনও যুক্তি নেই। কারণ ওদের নিজেদের স্বার্থেই ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ওদের প্রয়োজন হবে। কিন্তু সামান্য লোকবল নিয়ে আর কোনও সংগঠন ছাড়া আন্দোলন চালু রাখা সম্ভব ছিল না।

দু-চারটে পোস্টাফিস পুড়ল, দু-চার জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কাটা হল, কোথাও কোথাও চাষিরা নিজেদের স্বার্থেই ধানচাল সরকারকে দিল না। কিন্তু বরিশাল জেলায় আন্দোলন যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। যুক্ত বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে আন্দোলন সত্যিতেই জোরদার হয়েছিল ঠিকই। এ প্রসঙ্গে মেদিনীপুর, আরামবাগ, বালুরঘাটের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। কিন্তু সেইসব জায়গায় আগের থেকেই সংগঠনের ঐতিহ্য ছিল—বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। ত্রিশের দশক থেকে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির চাপে পূর্ববঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন স্কুলে পড়ি তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোনও দলকে সক্রিয়ভাবে কর্মী সংগ্রহ বা তাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের চেষ্টা করতে দেখিনি। এদিক থেকে যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নিয়েছিল তাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানকার সুপরিচালিত ভলান্টিয়ার বাহিনীগুলি '৪২ সালে নেতৃত্বগ্রহণ করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানেও তাদের অবদান ছিল। কিন্তু বরিশালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জনগণের উপস্থিতি আমি দেখিনি, যদিও ওই অঞ্চলে ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনেও হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের চাষিরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভেজা তুবড়ির মতো বরিশালে '৪২-এর আন্দোলন একটু জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ডিসেম্বরের পর ওই জেলায় আর কোনও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়নি। তার আগেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পঙ্গু করতে পারে এমন কিছু ঘটেনি। অক্টোবর মাসে কোনও গ্রামাঞ্চল থেকে ফেরার পথে স্টিমার ঘাটে দাদাকে গ্রেফতার করে। তার এক মাস পরে বাড়ি থেকে আমাকে। থানা থেকে গোয়েন্দা দফতরের কর্তার অফিসে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিস। সাহেবটি আমাকে মুচলেকা নিয়ে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁর দয়ার দান গ্রহণ না করায়, পুলিশ হাজতে ফিরে গেলাম। সেখানে দুটি ফৌজদারি মামলায় আমাকে আসামি করা হল। কোনও গ্রামে তার কাটা হয়েছিল। অভিযোগ—আমি অপরাধীদের একজন। দ্বিতীয় অভিযোগ—চুরি। কী চুরি করেছি জানতে চাইলে সদুত্তর পেলাম—তার। আমরা নাকি তার কেটে চড়া দরে কালোবাজারিদের কাছে বিক্রি করেছি। আসলে এই রকম সত্যি-মিথ্যা কতগুলি মামলা পুলিশের খাতায় লেখা থাকত। তার কোনও একটার সঙ্গে গ্রেফতার করা ছেলেদের জুড়ে দেওয়া হত। পনেরো দিন অন্তর আমাদের কোর্টে হাজির করে পুলিশ আরও সময় চেয়ে নিত। তিন মাসের মধ্যে মামলা রুজু করতে না পারলে হয় মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিত, অথবা বন্দিটি বিপজ্জনক লোক বলে সিদ্ধান্ত হলে তাকে ভারতরক্ষা আইনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দি রাখা হত।

তার কাটা এবং চুরির মামলার আসামি হিসাবে আমাকে জেল হাজতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আবিষ্কার করলাম যে, শাস্তির ব্যাপারে ইংরেজ সরকার শ্রেণিসচেতনতা ত্যাগ করেননি। বন্দিদের প্রধানত দুটি শ্রেণি—বি এবং সি। সি-রা ভূমিশয্যায় মৎকুন-অধ্যুষিত কম্বলে শয়ন এবং অখাদ্য ভক্ষণ করে। আর বি শ্রেণির বন্দিরা খট্টাঙ্গশায়ী, আহারাদি—প্রচুর চুরি সত্ত্বেও—ভদ্রজনোচিত।

সদাশয় সরকার বাহাদুরের কল্পনায় 'এ' নামে একটি শ্রেণিও ছিল বটে, কিন্তু আমরা দেখলাম ও-ব্যাপারটা জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছে করলে এ-ক্লাস বন্দিকে বাড়ি থেকে খাবার আনার অনুমতি দিয়ে তার এ-ক্লাসত্বর সম্মান রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু এই উদারতা দেখিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাননি। ফলে আমার বাবা নামেই এ-ক্লাস হলেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব তাঁর উদার নীতির প্রমাণস্বরূপ বাড়ি থেকে বাবার জন্য কিছুটা দুধ পাঠাবার অনুমতি দিয়ে পরে শাস্তি হিসেবে হুকুমটি রদ করেন। কিন্তু সত্যিকার রহস্য ছিল শ্রেণিবিভাগের মূল নীতির ভিত্তিতে। এ বা বি ক্লাসের বন্দি হতেন যাঁদের পাকা বাড়িতে বাস, তাঁরাই। আর যেসব হতভাগ্য মাটি, টিন বা দর্মার বেড়ায় তৈরি বাড়িতে থাকত, তাদের জন্য সি ক্লাস নির্দিষ্ট ছিল। খুবই ন্যায্য বিচার। তবে বরিশালে দরিদ্র মানুষও ছারপোকার সঙ্গে সহবাসে অভ্যস্ত ছিল না। জেলার জনসংখ্যার ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। তা ছাড়া ওখানকার দরিদ্রতম মানুষও পচা ভাত খেতে অভ্যস্ত ছিল না। এ কথার প্রাসঙ্গিকতা পরে আলোচনা করব। এবার আসল রহস্যে আসি। বন্দি বা আসামির বাড়ি কাঁচা না পাকা সে তথ্য পুলিশের জানা না থাকলে, খোঁজ নিয়ে সাত দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নিয়ম ছিল। যতদূর জানি বাবা, আমি এবং দাদা একই বাড়িতে বাস করতাম। এবং এ

ব্যাপারটা সরকার বা তার পুলিশের কাছে গোপন ছিল—এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবা যেদিন গ্রেফতার হন সেদিনই এ-ক্লাসের বন্দি হন। আমি কোথায় থাকতাম তা আবিষ্কার করতে এক মাস লেগেছিল। আর দাদার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজের অভিযোগে মামলা তৈরির চেষ্টা চলছিল। ফলে সে কোথায় থাকত নির্ধারণ করতে সময় লেগেছিল ছ'মাস। আসলে যা আপাতদৃষ্টিতে পুলিশের দীর্ঘসূত্রিতা বলে মনে হয়, তা কোথাও সত্যিই গাফিলতি, আর কোথাও চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টার ফল।

জেল হাজতে প্রথম রাত্রের অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। সহবন্দিরা দেখলাম সবাই আমারই বয়সী, কারণ ওটা ছিল জুভেনাইল ওয়ার্ড। প্রথম চমক খেলাম যখন খাবার নিয়ে এল তার বিকট দুর্গন্ধে। ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। বাজার থেকে জেলবাসীদের খাওয়ার জন্য চাল না কিনে ধান কিনে তা থেকে চাল তৈরি করলে সস্তা হয়, সুতরাং জেল কর্তৃপক্ষ সস্তার পথ নেবেন এটা কিছু অযৌক্তিক না। কিন্তু ব্যাপারটা গোলমেলে ছিল এই কারণে যে, ধান আধা-সেদ্ধ করে সিদ্ধ চাল তৈরি করার পদ্ধতি জানা না থাকলে সেদ্ধ ধান ভেনে চাল বের করার আগেই তা পচে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। সি-ক্লাসবাসীদের যে-চাল খাওয়ানো হত তা এই পচা ধানের চাল, মানুষ কেন গোরু-মোষেরও খাওয়ার উপযুক্ত না। তা ছাড়া চালের অভাব ঘটতে শুরু হয়েছে এই অজুহাতে রাত্রে আটার রুটি দেওয়া হত। এমনিতেই পূর্ববঙ্গের মানুষ রুটি খেতে পারে না। তার উপরে সে রুটি তুলনাহীন। পাতে পাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ দুটি রুটি দু হাতে নিয়ে ঘষতে হত। ধুলো, বালি, মাটি, বিচিত্র সব খনিজ পদার্থ ওই ঘষাঘষির ফলে থালায় পড়ত। ঘষাপর্ব শেষ হলে রুটি দুটি বেশ ভাল করে কচলে কচলে ধুতে হত। কিন্তু আটা মাখার সময় যে সব অভক্ষ্য তার ভিতরে প্রবেশ করেছে তা নিষ্কাশনের টেকনিক কারও জানা ছিল না। ফলে ওই রুটি সত্যিতে খাওয়ার ক্ষমতা অল্প লোকেরই ছিল। জেল আইনের উদার নীতি অনুযায়ী সি-ক্লাসের হতভাগ্যদের জন্যও দৈনিক এক পোয়া তরকারি বরাদ্দ ছিল। তাই দিনের বেলা শুধু ডাল (ওরফে জল) আর ভাত বরাদ্দ থাকলেও, রাত্রে ডালের সঙ্গে তরকারি আসত। তবে সঙ্গে না, ডালের ভিতরে—মাথাপিছু পোয়াখানেকের একটি চাকা লাউ বা ছাঁচি কুমড়ো। ও বস্তু সিদ্ধ হওয়ার কোনও উপায় ছিল না। ফলে কারও ভোগে লাগত না। আর বস্তুটি যদি কচুর ডেলা হত, তা হলে তার সঙ্গগুণে ডালটাও বিষাক্ত হয়ে উঠত, মুখে দিলে গাল-গলা ফুলে ঢোল হয়ে যেত। ওই অখাদ্য খেয়ে সি-ক্লাসিরা সবাই সর্বক্ষণ নানারকম পেটের অসুখে ভুগত। আর এই হতভাগ্যদের জন্য দুটি ওষুধের বাঁধা ব্যবস্থা ছিল। উদরঘটিত যে কোনও ব্যারামেরই একমাত্র চিকিৎসা কাষ্ঠতৈল অর্থাৎ ক্যাস্টর অয়েল। আর যে-কোনও চর্মঘটিত ব্যাধিরই একমাত্র চিকিৎসা ছিল নারকেলের ছোবড়া দিয়ে শরীরের রোগগ্রস্ত অংশটি বেশ উত্তম রূপে ঘষে নিয়ে ঘটি ঘটি আইওডিন ঢালা। এই নারকীয় চিকিৎসার ভয়ে রুগিরা সহজে হাসপাতালে যেত না। বোধ হয় ওইটাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছিল। আর প্রাত্যহিক চিকিৎসার সময় হাসপাতাল থেকে যে-আর্তনাদ শোনা যেত, বোধ হয় রৌরব নরকের বাইরে সেরকম সচরাচর শোনা যায় না। একদিনের একটা দৃশ্য কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। আমি তখন নিজেই হাসপাতালে। দেখলাম একটি বিবস্ত্র মানুষ চিত হয়ে শুয়ে আছে। দুজন

দশাসই লোক তাকে চেপে ধরে রেখেছে। ব্যাধির প্রকোপে তার শরীর বীভৎসভাবে বিকৃত। কিন্তু তার উপরও দেখলাম নারকেলের ছোবড়া আর আইওডিন চিকিৎসা চলছে। দৃশ্যটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

সি-ক্লাসে দিন চারেক থাকার পর বেশ রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি ভদ্রসন্তান, সুতরাং আমার ক্ষেত্রে কাষ্ঠতৈল-আইওডিন চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না। জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলাম এবং সেখানে খাটেপাটেই শোয়ার ব্যবস্থা হল। এমনকী রক্ত পরীক্ষাও হল। শুনলাম কামলা বা জন্ডিস হয়েছে। মাসে এক দিন সিভিল সার্জন জেল হাসপাতাল পরিদর্শন করতে আসতেন। তিনি ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল, ডাবের জল, তরমুজ, পেঁপে ইত্যাদি ঠান্ডা ফল খেতে হবে। অকৃতজ্ঞ হতে চাই না। স্বীকার করতেই হবে জেল কর্তৃপক্ষ ঠান্ডা জলের ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করেননি।

আমার তিন মাস কারাবাস থেকে আমি একটি জ্ঞানই অর্জন করি যে, আমরা আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষকে সত্যিই মানুষ বলে মনে করি না। এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যি জেলে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথাটার শত সহস্র প্রমাণ সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু জেলে অত্যন্ত কাছে থেকে প্রতিদিন সহায়হীন মানুষের উপর যে ধরনের অকথ্য অত্যাচার হতে দেখেছি, তার তুলনা বাইরের জগতে অন্তত আমার চোখে পড়েনি। শুনেছি কৌলীন্য প্রথার যখন সংস্কার হয় তখন যেসব কুলীনদের বংশে আচারগত দোষের ভার বেশি জমেছিল, এক ধরনের শ্রেণিবিপ্লব ঘটিয়ে তাদেরই কৌলীন্যমর্যাদা তুলনায় উঁচু বলে স্থির হয়। জেলে ফৌজদারি মামলায় যারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের এক উলটপুরাণ চালু ছিল।

যারা ডাকাতি খুন জখম ধর্ষণ ইত্যাদি বাঘা বাঘা কুকার্য করে জেলে এসেছিল, তারা ওখানে নানা অর্থেই সম্মানিত ব্যক্তি। প্রথম কথা, কুকর্মেরও শ্রেণিভেদ আছে। পকেট মারায় কোনও আভিজাত্য নেই কিন্তু নরহত্যা জাতীয় বড় বড় অপরাধের মধ্যে যে-পৌরুষ আছে তা অস্বীকার করার উপায় কী? তাই জেলের ভিতর ছিঁচকে চোরকেও যদি জিগ্যেস করা যেত কী জন্য তার শাস্তি হয়েছে, তবে সে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিত 'র‍্যাপ' অথবা 'ডাকাইতি'। অপরাধীর শ্রেণিবিন্যাসের ব্যাপারে সরকারও এক অর্থে জাতিভেদের এই মাপকাঠি মেনে নিয়েছিল। যাদের জেলবাস দীর্ঘ মেয়াদের, ওখানকার ভাষায় তারা বি-কেলাসি। এদের কাজ ছিল—যারা তুলনায় স্বল্প মেয়াদের আসামি তাদের কাজের তদারক করা। তদারকির প্রধান আয়ুধ মোটা চামড়ার বেল্ট, যা তারা ছিঁচকে আসামিদের উপর বেধড়ক ব্যবহার করত। তার উপর জেলের আইনকানুন কোনওভাবে লঙ্ঘন করলে তার জন্য আলাদা শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। রোজ সকালেই দেখা যেত কিছু আসামিকে কোমরে দড়ি দিয়ে জেলের এক প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেদিক থেকে ঘণ্টাখানেক ধরে বিকট আর্তনাদ শোনা যেত। অভিজ্ঞ রাজবন্দিরা বলতেন "ও কিছু না। প্রাত্যহিক গাত্রসেবা হচ্ছে।" এক বিশেষ শ্রেণির আসামিদের জন্য গাত্রসেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমাজতত্ত্বঘটিত কোনও অজ্ঞাত কারণে আসামিদের মধ্যে মেথর জাতীয় লোক ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বেশ ক'জন লোক ওই কর্তব্যটি না করলে বাকি লোকদের পক্ষে



বাবার জীবনে একটা নিঃসঙ্গতা ছিল



সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ (এখন মৌলানা আজাদ কলেজ)



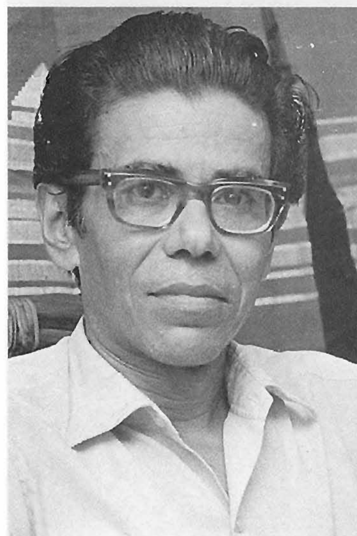
'৪৩-এর দুর্ভিক্ষে কলকাতার রাজপথে বুভুক্ষু মানুষ



নীহাররঞ্জন রায়



কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



অম্লান দত্ত



সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



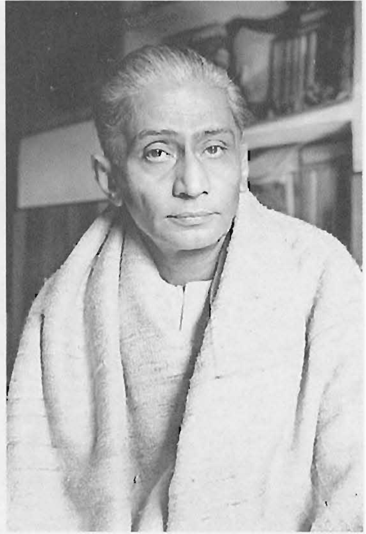
ক্রাইস্টচার্চ কলেজের সামনে আমি, কুমার মুখোপাধ্যায় ও রবি চক্রবর্তী। ১৯৫৬



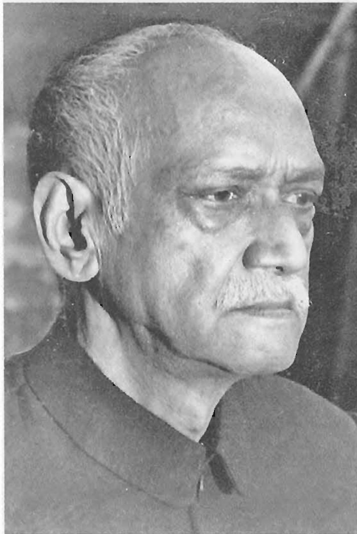
ওলন্দাজদের জগদ্বিখ্যাত অভিলেখাগার আলখমেইন রেইকসআরখিফ



অমলেশ ত্রিপাঠী



বিষ্ণু দে



স্যার যদুনাথ সরকার



বিলেতে ছাত্রাবস্থায় অমর্ত্য


অক্সফোর্ড হাই স্ট্রিট


বেলিয়ল কলেজ

জেলবাস অসম্ভব হত। সদাশয় সরকার ওই কাজ করতে যারা রাজি হবে তাদের জন্য ডবল রেশনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাথায় করে ময়লা বয়ে নিয়ে যেতে কেউ রাজি হত না। কিন্তু কারওকে তো রাজি হতেই হবে! সরকারি ব্যবস্থায় রাজি করানোর একটি পন্থাই জানা ছিল। কয়েকটি লোককে বেছে নিয়ে তারা মেথরের কাজ করতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত বেধড়ক চাবকানো হত। শুনেছি কেউ কেউ মাসখানেক চাবুক খাওয়ার পর ময়লা টানতে রাজি হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত চাবকানোর কাজটা করত বি-কেলাসিরা। বেশ মনপ্রাণ ঢেলেই করত।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলি। যেসব অনাচার অত্যাচারের কথা বললাম, ইংরেজের জেল ব্যবস্থাসংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজে তার কোথাও কোনও উল্লেখ কেউ পাবে না। বোধ হয় এই জাতীয় কারণেই সরকারি দলিলপত্রের ভিত্তিতে লেখা ইংরেজ শাসনের ইতিহাস পড়লে শাসকশ্রেণিকে অনেক সময়ই এত শিশুর মতো নিষ্পাপ মনে হয়। তাঁরা তো ভাল ভাল নিয়মটিয়মই করেছিলেন। নেটিভ কর্মচারীরা সব ব্যাপারেই তাদের স্বভাবসিদ্ধ বর্বরতা প্রকাশ করবে, তা নিয়ে প্রভুদের দোষ দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?

দশ-পনেরো দিন হাসপাতাল বাসের পর বি-ক্লাসভুক্ত হয়ে খাটেপাটে শোয়ার অধিকার পেলাম। মানে ততদিনে পুলিশ জেনে গেছে যে, আমিও পাকা বাড়ির বাসিন্দা। এখানে আর অর্বাচীনদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নেই। দেখলাম শহরে রাজনৈতিক কর্মী যাদের চিনতাম তাদের এক বড় অংশই ওখানে জমা হয়েছে। দুই সারিতে বিশটি করে পাশাপাশি সব খাট পাতা। এমনকী মশারি অবধি আছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অনেকটা বন্দিরাই করেন। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একঘেয়েমি ছাড়া অন্য কোনও কষ্ট নেই। জেলে থেকেই আই. এ পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেলাম। বাড়ি থেকে বইপত্র আনিয়ে পড়তে বসে গেলাম। বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন আর কী!

পশুসংরক্ষক জেরাল্ড ডারেলের লেখায় পড়েছি যে, বন্দিদশায় প্রায় সব প্রাণীরই ব্যবহারে একটা অস্বাভাবিকতা আসে। মুক্ত জীবনে যেসব কাজ তারা কখনও করবে না, চিড়িয়াখানার জন্তুজানোয়ার অনেক সময়ই তা করে। এই সাধারণ নিয়ম কি মানুষ নামক দ্বিপদ বানর জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? জেলে থাকার সময় কয়েকটি ঘটনায় এই প্রশ্ন বারবারই মনে হয়েছে। তার একটি উল্লেখ করি। কোনও অজ্ঞাত কারণে জেলে আহারের অনুষঙ্গ হিসাবে কাঁচা লঙ্কা বস্তুটি দুর্লভ ছিল। ভদ্র-অভদ্র সব বরিশালবাসীর কাছেই কাঁচালঙ্কাবিহীন আহার অনাহারেরই শামিল। একদিন দৈবগুণে আহার্যের সঙ্গে অল্প ক'টি কাঁচা লঙ্কা এসেছে দেখা গেল। ছেলেছোকরাদের তা নিয়ে কাড়াকাড়ি। একটি লঙ্কা গড়িয়ে এক খাটের নীচে আশ্রয় পেল। জনৈক প্রবীণ ভদ্রলোক ছোঁ মেরে সেটি সংগ্রহ করে সযত্নে লুকিয়ে রাখলেন। মানুষটি বহুবার জেলখাটা কংগ্রেসকর্মী, বড় ঘরের ছেলে, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কী ভেবে উনি একটি লঙ্কা সত্যি বলতে গেলে চুরি করে লুকিয়ে রাখলেন তা এখনও আমার বুদ্ধির অগম্য রয়ে গেছে।

জেলের নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ছেদ পড়ল। কারাগারের স্বদেশি বাবুদের সঙ্গে সেপাইসান্ত্রীদের বেশ সদ্ভাব ছিল। এই সদ্ভাবের সুযোগ

নিয়ে অনেকেই বাইরে চিঠিপত্র পাঠাতেন। মারাত্মক ষড়যন্ত্রমূলক কিছু না, সেন্সরের হাত এড়িয়ে নিতান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তা পরিবারের লোকদের জানানো আর কী! ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের জানা ছিল এবং ওঁরা এটা বন্ধ করার উপায় খুঁজছিলেন। একটি ঘটনার ফলে ওদের উদ্দেশ্য সফল হল। তা থেকে আমাদের ধারণা হয় যে, ব্যাপারটা ওদের চক্রান্তের ফল। এই সিদ্ধান্তটা সম্ভবত ঠিক ছিল না। কিন্তু ঘটনার পর ওদের কার্যকলাপ দেখে এ রকম সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিকই মনে হয়েছে।

ঘটনাটি এই। জুভেনাইল ওয়ার্ডে কিছু রাজনৈতিক বন্দি রয়েই গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে যে দু-চারটে পোস্টাফিসে আগুন লাগানো বা টেলিগ্রাফের তার কাটার ঘটনা ঘটে, এরা তার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। সুতরাং এদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া চলে না। এদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে পুলিশ অন্তত দু-চারটে মামলায় শাস্তির হুকুম বার করার জন্য ব্যগ্র। তা ছাড়া এরা সত্যিই গরিব ঘরের ছেলে, কাঁচা বাড়ির বাসিন্দা। অতএব এদের ক্ষেত্রে জেল হাজত মানে সি-ক্লাস—মৎকুনসহবাস আর অখাদ্য ভক্ষণ। কিন্তু এদের অফুরন্ত ফুর্তিতে তা সত্ত্বেও কোনও ভাটা পড়ার লক্ষণ দেখা যায়নি। ওয়ার্ডারদের সঙ্গে ওদের দহরম-মহরম বেড়েই চলছিল। একদিন গোলমালটা বাধল তার আতিশয্য ঘটায়। এক গুলিখোর ওয়ার্ডার বালখিল্যদের তার হুইসলটা দেখিয়ে শাসায় "এই, বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই বাঁশিটি বাজাব। আর যদি ওটা বাজাই তো পুলিশ এসে তোদের বেধড়ক পেটাবে।" এই কথার পর হুইসলটা নিয়ে টানাটানি শুরু হয় এবং অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে গুলিখোর হুইসলে ফুঁ দেয়। ব্যস, তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। ঢংঢং করে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠল। বেশ কিছু পুলিশ লাঠি আর বন্দুক হাতে মার্চ করে জেলের ভিতর ঢুকে এল। তখন বিকেল পাঁচটা নাগাদ, বন্দিদের জেলের ভিতরে খোলা জায়গায় বেড়াবার সময়। ওঁদের মধ্যে যাঁরা এ জাতীয় ঘটনা আগেও দেখেছেন, তাঁরা বললেন, "সবাই নিজের নিজের ওয়ার্ডে ফিরে যাও।" ওয়ার্ডে সবাই হাঁটুতে মাথা গুজে মণ্ডলাকারে বসলাম। যাঁদের শরীর কিছুটা শক্তপোক্ত, তাঁরা বাইরের দিকে বসলেন, যাতে প্রহারের ধকলটা তাঁদের উপর দিয়েই যায়। মণ্ডলীর ভিতরে বসলাম আমরা যারা দুর্বলশরীর, নিতান্ত অল্পবয়স্ক আর বয়োবৃদ্ধ। সমস্ত ব্যবস্থাটা মুহূর্তের মধ্যেই যেন ঘটে গেল। একটু পরেই পুলিশ আর বি-কেল্যাসি ওয়ার্ডারদের প্রবেশ। লাঠি আর চামড়ার মোটা বেল্ট দিয়ে প্রচণ্ড মার শুরু হয়ে গেল। অল্প কয়েক মিনিটের ব্যাপার। পুলিশ চলে গেলে দেখা গেল বেশ কয়েক জনের মাথা ফেটে অঝোরে রক্ত পড়ছে, কেউ কেউ মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচার সহ ওয়ার্ডাররা এসে যারা গুরুতর রকমের জখম হয়েছিল তাদের নিয়ে গেল।

তারপর যা ঘটল তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। জেলের ভুঁড়িষ্মান সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরদিন হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এলেন। করুণায় লোকটা প্রায় বিগলিত হবার দশা। ঠোঁট ছুঁচলো করে মুখে চুক চুক ধ্বনি, "আহাহা, আপনার তো বড্ড লেগেছে। কেন যে আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে পুলিশের সঙ্গে লাগতে গেলেন! জেলের এই উঁচু উঁচু দেওয়াল, এ ডিঙিয়ে পালানো কি সম্ভব? পুলিশরা ত বোঝেনই অশিক্ষিত মানুষ। ওদের আপনারা আক্রমণ করলে ওরা যে মারধর করবে এ তো জানা কথা। মেরে যে ফেলেনি এই আমাদের

ভাগ্য। ভাবুন দেখি সত্যি কেউ মারা গেলে কী দুঃখের কথা হত। আহাহা।" যাঁদের মাথা ফেটেছিল তাঁদের একজন এবার বেশ হাসিমুখে বিছানায় উঠে বসলেন। তার পর দ্ব্যর্থহীন বরিশালি ভাষায় যা বললেন তা কতকটা নিম্নরূপ, "ক্যান হারামজাদা, তুমি মরলে তো হগলেই খুশি হইত। হুয়ারডা মরছে দেইখখা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলাইয়া তোমার বউ আরেকডা নিকা করতে পারত। হারামজাদা এহান থিয়া ভালয় ভালয় যাইতে হয় যাও, না হইলে ঘুষ খাইয়া খাইয়া যে ভুঁড়ি বাগাইছ, হেয়া কইলাম ফাসামু।" অকুস্থলে আমার বাবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সদালাপের রকম দেখে একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "ছিঃ, ভদ্রলোককে কী যা তা বলছ!" নিষ্পাপ শিশুর হাসি মুখে ফুটিয়ে বক্তা বললেন, "ভদ্দর লোক আপনে কোথায় দ্যাখলেন, অমিয়দা? ওইডা? ওইড্ডা ত হুয়ারের বাচ্ছা!" এর পর সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্থানান্তরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। এ কথা মানতেই হবে ওঁকে বরাহশাবক বলে বর্ণনা করাটা ঠিক হয়নি। কারণ ওঁর চরিত্র যা-ই হোক, আচারে তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান। না-পাক জানোয়ারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথাটা সাধারণ্যে আলোচনা করাটা নিতান্ত অনুচিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা মনে রেখে এই প্রসঙ্গে ছুঁচোটুচো জাতীয় অন্য কোনও নিম্নবর্গীয় এবং অবিতর্কিত প্রজাতির উল্লেখ করলে বলার কিছু থাকত না!

খেলা কিন্তু ওখানেই শেষ হল না। যারা যারা ভালমতো জখম হয়েছিল তাদের নামে 'জেল রায়টিং' অর্থাৎ জেলের ভিতর হাঙ্গামা করার অভিযোগ আনা হল। ইংরাজ শাসনে বে-আইনি কিছু ঘটার উপায় ছিল না, এ কথা সবাই জানে। যাবতীয় বজ্জাতি আইনসঙ্গতভাবেই করা হত। তাই যথা সময়ে বিচারক সরেজমিন তদন্ত করতে এলেন। এই উপলক্ষে চারিদিকে বেশ কিছু পাথর, বড় বড় গাছের ডাল চারি দিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কিছু পুলিশ হাতেপায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরছে। পাথরের যা সাইজ, দেখে মনে হল ওগুলি হিমালয় পর্বত থেকে আনা। পলিমাটির দেশ বরিশালে পাথর জিনিসটা ঠিক রাস্তায় গড়াগড়ি যেত না। সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানালেন, ওগুলি দিয়ে নাকি বেচারা পুলিশদের রাজবন্দিরা আক্রমণ করেছিল। স্বয়ং যুধিষ্ঠির কথাটা বললেন, অবিশ্বাস করি কী করে? না হলে ভাবতাম সাক্ষাৎ হনুমান ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই যে ও পাথর বা ডাল নাড়াচাড়া করে। অভিযুক্তরা এই প্রহসনে অংশগ্রহণ করেননি, নীরব ছিলেন। প্রত্যেকের দু-চার বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গেল। তবে '৪৫ সনে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা শুরু হল তখন আর সবার সঙ্গে এঁরাও ছাড়া পান।

অনেকদিন পরে আমাদের জেলার তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অক্সফোর্ডে আমার দেখা হয়, সে কথায় পরে আসছি। ভদ্রলোককে এই জেল রায়ট ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন করি। একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে, তোমরা রাজবন্দিরা জেল ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেছিলে। পুলিশরা খুব মার খেয়েছিল।" আমি বললাম, "তা হবে, মাথা কিন্তু ফেটেছিল রাজবন্দিদেরই, পুলিশের নয়।" একটু চুপ করে থেকে সাহেব বললেন, "জানো, এ কথা আমাকে কিন্তু কেউ কখনও বলেনি।" মনে মনে ভাবলাম, সাহেব, তোমাদের কি কখনও কেউ কিছু বলত?

হঠাৎ এক সকালবেলা জেল অফিসে ডাক পড়ল। গিয়ে শুনলাম, আমার খালাসের হুকুম হয়েছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। কামলার প্রকোপে শরীর তখনও কাবু। বাড়ি পৌঁছে দেখি, গায়ে বেশ জ্বর। কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। দিন দশেকের মতো নিশ্চিন্ত। তখন আমাদের পরিবারের পুরানো বন্ধু ফজলুল হক সাহেব বাংলার প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি আমার ছাত্র বিক্রমজিত দে-র গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে তখন সমস্ত ক্ষমতা অল্প কয়েকজন ইংরেজ সিভিলিয়ানের কুক্ষিগত। তবে আমার মতো নির্বিষ চুনোপুঁটির ক্ষেত্রে ওঁর হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল। শুনলাম, ওঁর হুকুমেই আমার খালাস হয়েছে। ক'দিন পর হক সাহেব স্বয়ং এলেন। খাটের পাশে বসে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাত মুঠো করে ছোট্ট একটি ঘুষি মারলেন। বললেন, "জেলে যাওয়ার লোক অনেক আছে। তোমার অন্য কাজ আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করো।"

জেল থেকে বের হয়ে আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করলাম। আমাদের সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চলে গেছে। বারো শরিকের সম্পত্তি পরস্পর সমঝোতা করে ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা যখন আর থাকত না, তখন 'আমরা অপারগ, অপোগণ্ড' এই বাহানায় সম্পত্তিটি সরকার বাহাদুরের হাতে তুলে দেওয়া হত, তাদের নিযুক্ত ম্যানেজার জমিদারিটি দেখাশোনা করতেন। ব্যাপারটা সম্মানের কিছু না। সম্পত্তি কারও একার না, বারো শরিক ওই রোজগারের উপর নির্ভরশীল। মনে হয়, সেই কারণে জেলে থাকার সময় বাবাও এই অপমানজনক ব্যবস্থায় রাজি হয়ে কাগজে সই দিয়েছিলেন। এখন এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব জমিদারি থেকে আমাদের মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে মায়ের দিন চলছে। এই সময় আমার চেয়ে বয়সে সতেরো বছরের ছোট কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপুর আবির্ভাব হল। ভিক্ষের দানে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। পিতৃবন্ধু সরকারি উকিল শরৎ গুহ মশায় বললেন, নতুন ম্যাজিস্ট্রেট পামার সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি, কেমব্রিজের র‍্যাংলার। জেলায় তোমার ভাল ছাত্র বলে খ্যাতি আছে। চলো তোমাকে পামারের কাছে নিয়ে যাই। উনি নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা করবেন। আমি বললাম, "বেল যা করেছে তা তো সম্পূর্ণ বে-আইনি। মামলা করলে কী হয়?" সরকারি উকিল ভদ্রলোক ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মামলার কথায় একটু কুঁকড়ে গেলেন। বললেন, "যুদ্ধ চলছে। এখন অনেক আইন-কানুনই কার্যত শিকেয় তোলা। মামলায় জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। আর এই সময় কোনও উকিল ব্যারিস্টার তোমার মামলা নেবে না।" অতএব পামারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত হল। সেখানে ভালই সংবর্ধনা পেলাম। লোকটা আমাকে বসতে বলল না। আমি নিজেই চেয়ার টেনে বসলাম। তারপর পামারের উক্তি সংক্ষিপ্ত এবং দ্ব্যর্থহীন : "তোমার বাবা পঞ্চম বাহিনীর লোক। তোমাদের যে আমরা ঘরছাড়া করিনি, সেটা নিতান্তই দয়াপরবশ হয়ে।" ব্যস, সাক্ষাৎকার সমাপ্ত। খুব ইচ্ছে হয়েছিল বলি, "আমার বাবা তো বুঝলাম ফিফ্‌থ কলাম। কিন্তু তোমার বাবা সত্যিতে কে এবং কোন প্রজাতির জীব, একটু খোঁজ নেবে?" কিন্তু এ ধরনের বীরত্ব দেখাবার বিলাসিতা তখন আমার নাগালের বাইরে।

অনেক বছর পরে অক্সফোর্ডে এক পার্টিতে মিসেস আর্চারের সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি

কোম্পানি আমলের চিত্রকলা বিষয়ে জগজ্জয়ী পণ্ডিত। ওঁর সঙ্গে ওঁর স্বামীও ছিলেন। তিনিও ভারতীয় চিত্রকলা এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। মিস্টার আর্চার বললেন, "আমি কে জানো তো? ভারতবর্ষে আমার পরিচয় আর্চার দা বুচার!" আমি বললাম—ওঁর এই পরিচয় আমার জানা নেই। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন ভদ্রলোক। '৪২-এর আন্দোলনের গোড়ায় পটনা শহরে উনি কর্তাব্যক্তি। খবর পেলেন বিপ্লবীরা সেক্রেটারিয়েট ভবনের উপর যে-ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে সেটা নামাবার জন্য একটি দশ বছরের ছেলেকে ফ্ল্যাগপোস্টে তুলে দিয়েছে। পুলিশের কাছে খবর যে, ছেলেটি সফল হলে ব্যাপারটা এক বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহের সঙ্কেত বলে ধরা হবে। ওকে থামানো বিশেষ প্রয়োজন। আর্চার স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে চোঙা ফুঁকে ছেলেটিকে নেমে আসতে বললেন। সে ভ্রূক্ষেপও করল না। পুলিশ সাহেব আর্চারকে বললেন, "এখনও ওকে না থামালে সমূহ বিপদ হবে। আমরা সামলাতে পারব না।" নিরুপায় আর্চার গুলি করার হুকুম দিলেন। বাকিটা ওঁর জবানেই বলি। "ছোট্ট অনাহারক্লিষ্ট রোগা একটা শরীর ধনুকের মতো বেঁকে অনেক উঁচু থেকে মাটিতে পড়ল। মাথাটা থেঁতলে জায়গাটা রক্তে ভরে গেল। রোজ রাত্রে ওই দৃশ্যটা আমি স্বপ্নে দেখি আর সেই থেকে আমার নাম আর্চার দা বুচার।" রিটায়ার করার অল্প দিন পরে আর্চার আত্মহত্যা করেন। কেন তা কাউকে বলে যাননি। আমার ধারণা সাম্রাজ্য চালাতে যে ধরনের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন হয় ওই সংবেদনশীল মানুষটির চরিত্রে তার অভাব ছিল।

ওই পার্টিতেই মিসেস আর্চার আমাকে বললেন, "ও, তোমার বাড়ি বরিশাল। জানো, আমার ভাই এক সময় ওই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।" বললাম, "তাকে আমি চিনি।" কী করে? "উনি আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন।" সবাই খুব হো হো করে হাসল। মাস দুই পর বেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই : "একটা গুজব শুনলাম, তোমাকে আমি জেলে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা কী বলো তো!" পিতৃপরিচয় দিয়ে চিঠির উত্তর দিলাম। তার জবাবও এল প্রায় পত্রপাঠ, "আরে আরে তুমি অমিয়বাবুর ছেলে! তাই বলো!" যেন অমিয়বাবু ওঁর প্রাণের বন্ধু, জিগরি দোস্ত। সাহেবকে কলেজে খেতে এবং সেমিনারে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা করতে নেমন্তন্ন করলাম। বুড়ো রোগা জীবনের ভারে ক্লিষ্ট একটি মানুষ সিনিয়ার কমন রুমে এসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। ভারত সাম্রাজ্যের স্বর্গজাত চাকুরে, এক-একটি জেলায় কয়েক লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার বিয়ে ভেঙে গেছে, ছেলেপুলে হয়নি। বাতের রোগী। হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়। "বুড়ো হয়ে গেছি। এখন আর পেরে উঠি না।" মানুষটার জন্য কেমন যেন কষ্ট হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "জানো, তোমার বাবা লোক ভালই ছিলেন। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, ওই সতীন সেন, ও লোকটা মোটেই সুবিধের ছিল না।" মুখে বললাম, ধন্যবাদ। আর মনে মনে ভাবলাম—সতীন সেনরা সুবিধের লোক হলে তোমাদের সাম্রাজ্য তো অক্ষয় হত।

বরিশালে বসেই আই. এ পরীক্ষা দিই। ফল বের হলে কলকাতায় চলে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলাম। জীবনের এক নতুন পর্ব শুরু হল।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মোয়াট সাহেবকে চিঠি লিখি— দুটি কথা জানিয়ে। প্রথম—কারাবাসের খবর। দ্বিতীয়—আই. এ. পাস করে ইংরাজি না পড়ে ইতিহাসে অনার্স পড়তে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে যাব ভাবছি। এসব সত্ত্বেও ডাফ হস্টেলে জায়গা হবে কি? উত্তর পেলাম, "My dear boy, you belong to us. Of course you can come back." ছোট চিঠিটি আন্তরিক উষ্ণতায় ভরা। যে-মানুষটিকে চিনি বলে ধারণা ছিল, তার সঙ্গে এই পত্রলেখকের কোনও মিল খুঁজে পেলাম না।

১৯৪৩ সনের জুলাই মাসে কলকাতা ফিরে গেলাম। ওই বছরে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা হল। এক, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ শুরু—এক সানন্দ উত্তেজনার অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়, মন্বন্তরের বিভীষিকা, যার বীভৎসতা বর্ণনা করতে পারে এমন বিশেষণ আমি খুঁজে পাইনি।

স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে ভাল লেগেছিল, সন্দেহ নেই। বিশেষত মোয়াট সাহেব এবং অধ্যাপক সুধীর দাশগুপ্তর কাছ থেকে সাহিত্যবোধের যে প্রথম পাঠ পাই তা জীবনের মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। কিন্তু '৪০-এর দশক অবধি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া এক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। তার প্রথম কারণ, কয়েকজন অত্যন্ত খ্যাতনামা অধ্যাপকের পড়ানো। ইতিহাসে সুশোভন সরকার (এর অল্পদিন আগে অধ্যাপক জ্যাকারায়া), ইংরাজিতে তারক সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখার্জি, অর্থনীতিতে ডক্টর ঘোষাল, ভবতোষ দত্ত, সংস্কৃতে গৌরীনাথ শাস্ত্রী, শিবনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ অধ্যাপকদের নাম স্কুলে পড়ার সময় থেকে শুনে আসছি। অধ্যক্ষদের মধ্যে র‍্যাংলার বি এম সেন, প্রশান্ত মহলানবীশ, অপূর্ব চন্দ শিক্ষাজগতে প্রবাদপুরুষ। দ্বিতীয় কারণ, ওখানকার ছাত্রমণ্ডলী। ম্যাট্রিক বা আই. এ. পরীক্ষায় যারা প্রথম বিশটি স্থান অধিকার করত, তাদের সম্ভবত নব্বই শতাংশ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হত। বাকি ছাত্ররাও রীতিমতো উঁচুমানের। পরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরেও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, শিক্ষার উচ্চতম আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলেও '৪০-'৫০-এর দশকের প্রেসিডেন্সি কলেজ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির শিক্ষায়তনগুলির একটি বলে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে।

এক সময় ইংল্যান্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার কেন্দ্রস্থলে ছিল জ্ঞান-অর্জন এবং বিতরণ, গবেষণা না। পাণ্ডিত্যখ্যাতি শুধু ছাপানো বই বা প্রবন্ধের তালিকার উপর নির্ভর করত না। নির্ভর করত পাণ্ডিত্যের গভীরতা আর ব্যাপ্তির উপর। পণ্ডিতসমাজ ছিল স্বল্পায়তন। বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে যাঁরা চর্চা করতেন তাঁরা প্রায় সবাই সবাইকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিনতেন। কার বিদ্যার দৌড় কত দূর, বিদগ্ধ মহলে তা সকলেরই জানা ছিল। শুধু বিদ্যা না, পারস্পরিক আলোচনা বা বক্তৃতার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের ধী বা উদ্ভাবনীশক্তির চমৎকারিত্ব সম্পর্কেও সবাই অবহিত ছিলেন। যে-পাণ্ডিত্য ও মেধার ঔজ্জ্বল্য হাতে ধরাছোঁয়া যায় না, বা যার বিচার লিখিত বই আর প্রবন্ধের তালিকার দৈর্ঘ্য মেপে নিরূপণ করা চলে না, পণ্ডিতমহলে পাণ্ডিত্যখ্যাতি তার উপরই নির্ভর

করত। উনিশ বা বিশ শতকে পাণ্ডিত্যের যে-আদর্শ কলকাতা বা বৃহত্তর বাংলায় বহাল ছিল, তা কতকটা ওই অক্সব্রিজীয় ধ্যানধারণার প্রতিবিম্ব। বলা প্রয়োজন, আমাদের সনাতন শিক্ষাভাবনার সঙ্গে এই ধারণার মূলগত সাদৃশ্য ছিল। কাঁড়ি কাঁড়ি বই লেখা, বছরে বারোটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা পাণ্ডিত্যের চরম নিদর্শন বলে কখনও ধরা হত না। বিদ্যার গভীরতা আর অসামান্য ধী-শক্তিই ছিল বৈদগ্ধ্য বিচারের মাপকাঠি। লেখা ছাপাবার মার্কিনি ব্যাকুলতা ইউরোপ বা ভারত কোথাওই বৌদ্ধিক জীবনের অঙ্গ ছিল না।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপকরা ওই প্রাচীন শিক্ষাদর্শের আধুনিক প্রতিনিধি ছিলেন। 'Publish or perish'—এই মন্ত্র তাঁরা জপতেন না। ইংরাজির খ্যাতনামা অধ্যাপকদের মধ্যে এক শ্রীকুমারবাবু আর সুবোধবাবু ছাড়া কেউই কিছু বিশেষ লিখে ছাপাতেন না। প্রবাদপুরুষ প্রফুল্ল ঘোষ তো নয়ই। ইতিহাসে জ্যাকারায়া সাহেব বা সুশোভনবাবুও ওঁদের মেধা ও পাণ্ডিত্যের অনুপাতে অতি সামান্যই লিখেছেন। পঠন-পাঠন, বিদ্যারসসম্ভোগ, মানুষের জ্ঞান এবং সংস্কৃতির দীপশিখা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে হস্তান্তর করা—সে যুগের শিক্ষাবিদদের ধ্যানধারণার কেন্দ্রে ছিল এই প্রচেষ্টা। অল্প কিছু বিদ্বান মানুষ জ্ঞানের জগতে নতুন অবদান—গবেষণা এবং তার প্রকাশন তাঁদের কর্মসূচির অঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু বই বা প্রবন্ধ না ছাপালে শিক্ষকজীবন ব্যর্থ হল, এমন চিন্তা সে যুগের সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না।

প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের মধ্যেও লেখাপড়ার ব্যাপারে অসাধারণ উচ্চাশার লক্ষণ চোখে পড়ত। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন শিক্ষিত বাঙালি যুবকের বিশ্বগ্রাসী জ্ঞানপিপাসা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে জগৎ-জিজ্ঞাসা বিশেষ প্রকট ছিল। আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়দের মধ্যে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (ইনি প্রেসিডেন্সি না, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন), অমলেশ ত্রিপাঠী, দিলীপ বিশ্বাস, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ আর বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন, শিপ্রা সরকার, অশীন দাশগুপ্ত, পার্থসারথি গুপ্ত এঁরা ছাত্র অবস্থায়ই ডাকসাইটে পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত ছিলেন। পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার চেষ্টা আর এঁদের জ্ঞানান্বেষণের মধ্যে কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। ছাত্রদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় সব সময়ই একটা বৌদ্ধিক উত্তেজনার উত্তাপ ছিল। ফলে ক্লাসের চার দেওয়ালের ভিতরে যে-জ্ঞানার্জন হত, কফি হাউসের আড্ডায় তার চেয়ে কিছু কম হত না।

কিন্তু সে যুগেও প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা নিছক কণ্টকহীন পুষ্পশয্যা ছিল না। আমি পেশায় শিক্ষাজীবী, ফলে অন্য শিক্ষাজীবীদের জীবনের বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা থেকে বিরত থাকব। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান যুগের 'অধঃপতন' তুলনা করে যে-হাহাকার শোনা যায়, তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়—এ কথাটা বলা দরকার।

তখন ইতিহাস অনার্সে তিনটি আবশ্যিক (compulsory) এবং তিনটি নির্বাচন-ভিত্তিক (Optional বা Special) 'পেপার' পড়তে হত। পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'মধ্যযুগ' নিয়ে পড়াশুনোর ইচ্ছা থাকায় আমি ইউরোপীয় মধ্যযুগ, মুর-শাসিত স্পেন এবং আকবরের

শাসনকাল বিষয়ক 'পেপার'গুলি পড়া সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু সত্যি বলতে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুশোভনবাবুর কাছে পড়া। আমি যে তিনটি স্পেশ্যাল পেপার বেছে নিই, তার একটাও উনি পড়াতেন না। সেটা দুঃখের ব্যাপার ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও আরও দুঃখের ব্যাপার ছিল। দুটি স্পেশ্যাল পেপার যাঁরা পড়াতেন তাঁরা একদিনও পড়াননি। কথাটি অসম্ভব মনে হলেও আক্ষরিক অর্থে সত্যি। একজন স্যার আশুতোষের আমলের নানা কুট-কচালি নিচু গলায় বলে যেতেন, হঠাৎ একদিন—সম্ভবত বিভাগীয় প্রধান সুশোভনবাবুর মৃদু ধমকানি খেয়ে—মায়ার্স-এর 'মিড্‌ল এজেস' থেকে শার্লামেন-এর চরিত্রবর্ণনা পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। তিন-চার লাইন পড়ে হঠাৎ শার্লামেনের সঙ্গে নিজের চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। ইউরোপীয় মধ্যযুগ বিষয়ে অন্য কোনও আলোচনা ওঁর মুখে আমরা শুনিনি। আর আকবর এবং স্পেনে আরব শাসনের ইতিহাস যিনি পড়াতেন তাঁর একটিই আলোচ্য বিষয় ছিল : ডডওয়েলের আমলে 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ'। ওই বিষয়ে যে-জ্ঞান অর্জন করি তার ভিত্তিতে বেশ একটি প্রামাণ্য বই লেখা যায়। লিখলে বিশেষ করে ডডওয়েল সাহেবের সিগার-বিষয়ক পরিচ্ছেদটি বেশ জ্ঞানগর্ভ হত। এখানেই বলি, এঁদের দু'জনের শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। অনার্স এবং পাস দুই শ্রেণিতেই আর সবাই যত্ন করে পড়াতেন। শুধু ইংরাজি পাস ক্লাসে যিনি বাইবেল পড়াতেন তাঁর শিক্ষণপদ্ধতির রহস্য আমরা ভেদ করতে পারিনি। উনি দু-তিনটি লাইন পড়ে, একটি বিশেষ জায়গা নির্দেশ করে বলতেন 'পুট আ ডট'। আবার ক'লাইন পড়ে নতুন নির্দেশ, 'পুট আ ড্যাশ'। ডট আর ড্যাশে-খচিত বাইবেলখানা বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল। আমার বিশ্বাস, বেচারা ভদ্রলোকের কিঞ্চিৎ মাথার গোলমাল ছিল।

এই রকম কিছু উৎকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা বাদ দিলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার স্মৃতি নিরবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল আনন্দের। ইতিহাস বিষয়ে চিন্তা করতে যদি কিছুমাত্র শিখে থাকি, তা প্রধানত সুশোভনবাবুর ক্লাস লেকচার্স শুনে। যে-কোনও জটিল বিষয়ের উনি একটা পরিচ্ছন্ন খসড়া তুলে ধরতেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের এ রকম স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি আর কোথাও পাইনি। রণজিৎদা ('সাবঅলটার্ন'-গুরু রণজিৎ গুহ) বলতেন, "ওঁর কাছে আমরা ইতিহাসের অ্যানাটমি বুঝতে শিখেছি।" কথাটা সুশোভনবাবুর শিক্ষাপ্রণালীর সুষ্ঠু বর্ণনা। এই মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ক্লাসে কিন্তু কখনও মার্কসবাদ উত্থাপন করেননি।

বিশুদ্ধ কাব্যরসের স্বাদ পাই দু'জন শিক্ষকের পড়ানো থেকে। তারকবাবু পড়াতেন 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট' আর তারাপদবাবু 'জুলিয়াস সিজার'। দুটি ভিন্নধর্মী শেকসপিয়রের নাটক দুই ভিন্ন সুরে এঁরা পড়াতেন। তারাপদবাবুর পড়ানোয় ট্র্যাজেডির বিয়োগান্ত আবেগ ফুটে উঠত। তারকবাবুর লেকচারে বিদ্যা আর উজ্জ্বল বুদ্ধির ঝকমকি। ওঁদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হত—কেন ইংরাজি পড়লাম না!

প্রেসিডেন্সি কলেজেই জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি বন্ধুত্বের সূচনা, ইংরাজি অনার্সের ছাত্র অমল দত্ত, ইতিহাসের অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ দাশগুপ্ত, রণজিৎ গুহ, ইকনমিক্সের অম্লান দত্ত, কবি অমলেন্দু গুহ, হীরেন রায়ের সঙ্গে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়

থেকে যে-ঘনিষ্ঠতা জন্মায় তা বাকি জীবন অটুট থাকে। এঁদের কারও কারও সঙ্গে সম্পর্কে নানা কারণে ওঠা-পড়া ঘটেছে। কিন্তু প্রথম যৌবনের উষ্ণ আবেগ কোনও ক্ষেত্রেই ঠান্ডা হয়ে যায়নি।

আমাদের আড্ডাক্ষেত্র ছিল তিনটি—কফি হাউস, রায়মশায়ের চায়ের দোকান এবং ডবল-হাফ কাপ চা-বিখ্যাত বসন্ত কেবিন।

ডবল হাফের রহস্য বোধ হয় বর্তমান প্রজন্মের জানা নেই, তাই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। বসন্ত কেবিনের দুধ-চিনি সহ পুরো এক কাপ চায়ের দাম ছিল চার পয়সা। তার অর্ধেক হল হাফ কাপ—দাম দু' পয়সা। আর রহস্যমণ্ডিত ডবল হাফে চায়ের জলটা পুরোই থাকত, কিন্তু দুধ-চিনি অর্ধেক। দাম তিন পয়সা। হুঁশিয়ার খদ্দেররা 'বড্ড কড়া করে ফেলেছ', 'এ যে একদম পানসে' ইত্যাদি নানা ধান্দা তুলে দুধ এবং চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে নিতেন। ডবল হাফ বস্তুত ফুল কাপ হয়ে যেত, তিন পয়সা দিয়ে চার পয়সার চা সম্ভোগ করা যেত। এই এক পয়সার লড়াইয়ে দক্ষ যোদ্ধাদের আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতাম। পাঠিকা/পাঠক স্মরণ রাখবেন তখন লেকচারারদের মাইনে মাসে বড় জোর দুশো টাকা, ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া ছাত্ররা মাসিক জলপানি পেত চল্লিশ টাকা। সুতরাং টাকার চৌষট্টি ভাগের এক ভাগ যে এক পয়সা, তা নিতান্ত মূল্যহীন ছিল না। ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়ায় যে-বিরাট গণ-আন্দোলন হয়েছিল তা থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। আমরা এখনও বেশ গরিব। কিন্তু তখন আরও কত গরিব ছিলাম এ কথা স্মরণ করলে বাঙালি মধ্যবিত্তর আত্মবিলাপ হয়তো কিছুটা কমতে পারে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের একমাত্র যোগ্য স্থান আঁস্তাকুড় এই ধারণার কিঞ্চিৎ পুনশ্চিন্তনও হতে পারে।

বসন্ত কেবিনের গৌরবের একমাত্র ভিত্তি ডবল হাফ—এ কথা ভাবলে ভুল হবে। ওদের আর একটি বিশিষ্ট অবদান ছিল চার পয়সা দামের টোশ অর্থাৎ টোস্ট। রাঁধুনিটি ছিল টোস্ট শিল্পে নোবেলবিজেতা। আর আজকাল যে 'বাছবার অধিকার' বা 'চয়েস চয়েস' করে বিলেতের প্রধানমন্ত্রী মাথা খুঁড়ছেন, ওই রন্ধনশিল্পীর সে দিকেও নজর ছিল। টোস্ট দুই রূপে পরিবেশিত হত—চিনি দিয়ে বা গোলমরিচ মাখিয়ে। এমন সুব্যবস্থা অন্য কোনও টোস্টভোজী সংস্কৃতিতে চোখে পড়েনি। তার অসাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে গরিব বাঙালি, জ্যাম জেলি মারমাইটের কাজ স্বল্পমূল্য চিনি আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে সেরে নিয়েছে।

সস্তায় বিলাসের জায়গা বসন্ত কেবিনে ভিড় বড্ড বেশি হত। ওটা পা ছড়িয়ে আড্ডা দেওয়ার জায়গা ছিল না। সে প্রয়োজন মেটাত কফি হাউস, যদিও ভোগ্যবস্তুর দাম সেখানে তুলনায় কিছু চড়া। এক কাপ কফি চার আনা—কলেজ স্ট্রিট থেকে ঢাকুরিয়া লেক পর্যন্ত যাওয়া-আসার ভাড়া। প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক ছাত্রই যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা তা ওইখানেই হয়েছে, রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকের বাড়িটায় ঢুকবার কোনও প্রয়োজন হয়নি। কলেজসংলগ্ন রায়মশায়ের কাফেতেও অনেকে সময় কাটাতেন। কিন্তু দু'-চারজন স্বর্ণমণ্ডিত বখা একটু বাড়াবাড়ি করে রায়মশায় মারফত বিয়ার আমদানি শুরু করায় ভদ্রলোক বিতাড়িত হলেন। বখাদের অন্যত্র ঘাঁটি গাড়তে হল।

কফি হাউসের আড্ডায় নিছক অলস গালগল্প হত, এমন নয়। উত্তপ্ত রাজনৈতিক

আলোচনা, জ্ঞানপিপাসু তরুণদের সাহিত্য-দর্শনের জগতে নিত্যনতুন গুরু আবিষ্কার, পশ্চিমি চিত্রশিল্পের পোস্টকার্ড সাইজের প্রতিলিপি দেখে প্রচণ্ড উত্তেজনা, কখনও কোনও খ্যাতনামা মনীষী বা রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলে তাঁকে ঘিরে নানা সমস্যার বিশ্লেষণ—এ সবই কফি হাউস সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল। অম্লানদা (অম্লান দত্ত) তখনই আপসহীন বিশ্লেষণপ্রবণ মানুষ। দলবল নিয়ে কোনার একটি টেবিলে বসে মৃদুস্বরে ধ্বনি তুলতেন, "আজ আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব?" বাজে গালগল্পে ওঁর রুচি ছিল না, যদিও উনি মোটেই রামগরুড়ের ছানাজাতীয় কিছু ছিলেন না। উনি বলতেন, জ্ঞানের চর্চা তো অনেকেই করেন এবং করছেন। উনি চান চিন্তা করতে। কফি হাউসের আড্ডা ওঁর সেই চিন্তাচর্চার অন্যতর মঞ্চ ছিল। কখনও কখনও ওঁদের আড্ডায় মানবেন্দ্রনাথ রায় উপস্থিত থাকতেন। আমরা সম্ভ্রমের সঙ্গে দূর থেকে দেখতাম। আমি নিজে বরাবরই ছ্যাবলা প্রকৃতির মানুষ। বেশিক্ষণ গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনলে এখনও মাথা ধরে। অম্লানদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সংকটের মুহূর্তে ওঁর গভীর মানবতাবোধ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। কিন্তু ওঁর কফি হাউসের আড্ডার নিরঙ্কুশ গাম্ভীর্য আমার সহ্য হত না। আমার সঙ্গে সম্পর্কে ওঁর কৌতুকপ্রবণতা, ঝকমকে বুদ্ধির লঘু প্রকাশটাই বেশি দেখতাম।

কফি হাউসে আর দুটি মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁদের একজন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই, অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবী। উনি খুব গর্ব করে বলতেন যে, উনিই সেই মানুষ যাঁর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের অংশ হিসাবে ওঁকে ঘানি টানতে হয় এবং সেই উপলক্ষে বাঙালি মহিলারা রত্নগর্ভাজ্ঞানে ওঁর মাকে অভিনন্দন জানান। উনি নাকি মাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "মা, তুমি বিবেকানন্দের মা হয়েও এই সম্মান পাওনি।" আদি যুগের কমিউনিস্ট ডক্টর দত্ত লেনিনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ওঁকে মাঝে মাঝে বক্তৃতা করতে ডাকতাম। উনি শুধুই ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম নিয়ে বক্তৃতা করতেন, ওঁর দেশের বা রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলতে চাইতেন না। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে উনি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। বলতেন, "ওসব খুদের পাদের গল্প শুনে কী করবে? যেসব গল্প চালু আছে তার বেশির ভাগই ডাহা মিথ্যে কথা।" বিশেষ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি ওঁর অত্যন্ত অভক্তি ছিল। তাঁর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে যেসব কথা বলতেন, তা লিখলে ওঁর ভক্তরা মানহানির মকদ্দমা করতে পারে। যখন আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়, ভূপেনবাবু তখন দারিদ্রের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন মনে হত। ওঁর পরনে থাকত একটি আধময়লা ধুতি আর এক মটকার পাঞ্জাবি। ওই একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পাঞ্জাবি ওঁর সম্ভবত ছিল না। কফি হাউসে এসে এক কাপ কফি নিয়ে উনি অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। আমরা এসে ওঁর জন্যও স্যান্ডউইচ বা আর কিছু জলখাবার অর্ডার দিলে বেশ খুশি হতেন। বারবারই মনে হয়—আদর্শের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এইসব মানুষ যাঁরা বিনা দ্বিধায় অন্তহীন দুঃখ বরণ করেছিলেন, তাঁদের ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও কেন আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক জীবনে অবশিষ্ট রইল না? সেই দুঃখবরণের প্রয়োজনীয়তা কি সত্যিই আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে? সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-অনাচার আজ আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা, তার

থেকে মুক্তি তা হলে কোন পথে আসবে? যাঁরা সেই আদর্শে আজও অনুপ্রাণিত, তাঁদের প্রায় সকলেরই কর্মক্ষেত্র ক্ষমতাবর্জিত প্রতিবাদে সীমিত।

দ্বিতীয় যে-লোকটির সঙ্গে কফি হাউসের আড্ডায় পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল, তিনিও অন্য এক অর্থে আদর্শবাদী মানুষ। শিবরাম চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত নাম। ওঁর স্বতঃস্ফূর্ত বাধাবন্ধহীন ফুর্তির উৎস যে-জীবন, সেখানে কিন্তু আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ চিহ্ন ছিল না। তখনকার যুগের লেখক এবং বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই গভীর দারিদ্রের মধ্যে বাস করতেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণেই এর ফলে তাঁদের জীবন ও চরিত্রে একটা তিক্ততা নজরে পড়ত, যার অন্যতর প্রকাশ ছিল পারস্পরিক ঈর্ষা, বিদ্বেষ আর দলাদলি। এইসব ব্যাধি থেকে মুক্ত সদানন্দ মানুষ অল্প যে ক'জন দেখেছি, শিবরাম বা শিব্রাম তাঁদের একজন। যেসব লোক এক কাপ কফি নিয়ে অনেকটা সময় কফি হাউসে কাটাতেন, উনি ছিলেন তাঁদের একজন। তার বেশি খরচ করার রেস্ত এঁদের ছিল না। অল্প ব্যয়ে বেশ কিছুটা সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঠান্ডা একটা ঘরে বসে থাকাই এঁদের জীবনে স্বচ্ছন্দ বিশ্রাম আর বিলাসের স্বাদ বয়ে আনত। ওঁর জন্যে কিছু খাবার ফরমাস করতে গেলে উনি বাধা দিতেন। বলতেন, "ভাই, রিটার্ন দেব, এমন রেস্ত তো আমার নেই।" আমরা বলতাম, "দাদা, আপনার লেখা এত লোককে এত আনন্দ দেয়, তার পরিবর্তে আপনাকে আমরা সামান্য কিছু খাওয়াতে পারি না?" একটু কাঁচুমাচু হয়ে উনি রাজি হতেন, কিন্তু বেশি কিছু খেতে চাইতেন না। বোধ হয় ওঁর আত্মসম্মানে বাধত।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে মধ্যবিত্ত সমাজের সব স্তরেই আদর্শবাদী মানুষের সাক্ষাৎ মিলত—যাঁদের বিশ্বাস আর জীবনযাত্রার মধ্যে কোনও গরমিল ছিল না। সব রাজনৈতিক দলেরই শক্তির উৎস ছিল আদর্শনিষ্ঠ কর্মী। প্রেসিডেন্সি কলেজে দেখতাম, স্বর্ণমণ্ডিত তরুণরাও বিলাসব্যসনের ব্যাপারে একটু সামলে চলতেন। কলেজে গাড়ি চেপে খুব কম লোকই আসতেন। আর প্রায় সব ছাত্ররই পরিধেয় ছিল ধুতি বা পায়জামা-পাঞ্জাবি। এমনকী পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণাঞ্চল বা আলিপুরনিবাসী ধনী সন্তানরাও ধুতি বা পায়জামাই পরতেন। অবশ্যি তখন ধুতি পরে ট্রাম-বাসে চড়লে লজ্জানিবারণ দুঃসাধ্য ছিল না। সেই অবস্থার পরিবর্তনের ইতিহাস বিষয়ে আমাদের সহপাঠী এক শৌখিন কলকাতিয়া ফুলবাবু সম্পর্কে একটি মোক্ষম কাল্পনিক কাহিনি চালু ছিল। এই ব্যক্তি কোঁচানো ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ট্রামে-বাসে চলাফেরা করতেন। কোন মন্ত্রবলে জানি না, যে-বাসের সিঁড়িতে জীবন বিপন্ন করে যাত্রীরা ঝুলে আছে, তা থেকেও তিনি অক্ষত-ইস্তিরি পাঞ্জাবি, অপর্যুদস্ত কোঁচানো ধুতি নিয়ে স্মিত বদনে নেমে আসতেন। কোন জাদুমন্ত্রে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হত তা আমার জানা নেই। পরে দেখেছি—এই জাদুবিদ্যায় কবি বিষ্ণু দে-ও সার্থকসাধন ছিলেন। অবশ্যি উনি বলতেন যে, ওঁর পিতাঠাকুর কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে শুতে যেতেন। সকালবেলা যখন শয্যাত্যাগ করতেন তখন নাকি জামাকাপড়ে একটি ভাঁজও চোখে পড়ত না। অর্থাৎ বিষ্ণুবাবুর বক্তব্য, এ ব্যাপারে ওঁর কোনও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছিল না। ক্ষমতাটা জন্মসূত্রে

জিন্‌স মারফত পাওয়া। সে কথা যাক, আমাদের সেই ধুতিবিলাসী সহপাঠীটি ট্রামে-বাসেও সযত্ন-কুঞ্চিত কোঁচার মুঠিটি এক হাতে ধরে চলাফেরা করতেন। একদিন কোঁচা হস্তে বাস থেকে নেমেছেন। পিছনে প্রচণ্ড হইহই, রীতিমতো জনবিক্ষোভ। কারণ ওঁর হস্তধৃত কোঁচাটি ওঁর নয়, অন্য কোনও যাত্রীর। এই কাহিনি চালু হওয়ার পর তিনি ধুতির বদলে পায়জামা পরতে শুরু করেন। কাহিনিটিতে কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের এক করুণ পরিচ্ছেদের ছায়া আছে। পরিচ্ছেদটির নাম—'কেন বাঙালি ফিরিঙ্গিবেশ ধারণ করল?'

এর চেয়েও করুণ এক ইতিহাস আছে, কেননা কিছু বাঙালি তরুণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ত্যাগ করে 'হাই ইয়ার' মার্কা টেঁশু ইংরিজিকে মাতৃভাষা বলে বরণ করেছে। সেই মর্মন্তুদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করি এমন মনোবল আমার নেই। শুধু বলি, চল্লিশের দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজে অত্যন্ত ব্যাংরেজ পরিবারের ছেলেদেরও ইংরিজিতে আলাপ করতে কখনও দেখিনি। ওই অনাচার দুটি মিশনারি কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যখন অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দর উৎসাহে কলেজে মেয়েরা পড়তে এলেন, তখন কিন্তু দেখেছি ওই মিশনারি কলেজের মেয়েরাও বাংলাই বলতেন। স্বাধীনতা লাভের আগে মাতৃভাষা ছেড়ে শাসক জাতির ভাষা বলাটা বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষ লজ্জার ব্যাপার মনে করত। এখন যেমন আমরা লজ্জা ঘৃণা সব ত্যাগ করে মুক্তির আনন্দে হাবুডুবু খাচ্ছি, বিদেশি শাসনের যুগে ঠিক এতটা আত্মসম্মানবোধহীন নির্লজ্জ আমরা হয়ে উঠতে পারিনি।

'৪৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়ে একটা ব্যাপারে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। আমি যে-মফস্বল শহরে বড় হয়েছি, সেখানকার ছাত্রসমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রবল ছিল। অনেক ছাত্রই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক বা কর্মী ছিলেন। যাঁরা ছিলেন না তাঁদের মধ্যেও অনেকেরই স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আবার শুরু হলে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ, যেখানে বাংলার সব চেয়ে মেধাবী ছাত্ররা পড়তে এসেছিলেন, সেখানে তার তুলনীয় কোনও চেতনার পরিচয় পাইনি। সবাই নিজের পড়াশুনো, ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। দেশ বা বৃহত্তর সমাজ বলে কোনও সত্তা আছে, অথবা তার প্রতি শিক্ষিত তরুণদের কোনও কর্তব্য আছে, সে চেতনা যেন নিতান্তই ক্ষীণ ছিল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন অল্প কিছু কমিউনিস্ট এবং তার চেয়েও অল্পসংখ্যক কংগ্রেসপন্থী ছাত্র। দ্বিতীয়োক্তরা ফেডারেশনের আওতায় নিজেদের মত ও বিশ্বাস তরুণদের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলেন। কমিউনিস্টরা আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাই আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা ওঁদের সন্দেহের চক্ষে দেখতাম। কিন্তু এঁদের আদর্শনিষ্ঠা এবং নির্দ্বিধায় আত্মত্যাগ শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ আমাদের প্রজন্মে পশ্চিমবঙ্গে তুলনীয় চরিত্রের শিক্ষিত তরুণদের খুব বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের পর এই রাজ্যে কংগ্রেসি রাজনীতির দুর্বলতার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই।

কলেজে পড়ার সময় একজন জাতীয়তাবাদী নেতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়। তিনি আমার আত্মীয়, কিরণশঙ্কর রায়—আমার ছোট পিসিমা পদ্মাকে উনি বিয়ে করেছিলেন। এক সময় দেশবন্ধুর শিষ্য তথা সহকর্মী এবং সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই

মানুষটি পরবর্তী জীবনে বাংলা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রথম সারিতে থেকে বিধান রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী তখন পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। অত্যন্ত রক্ষণশীল প্রকৃতির এই মানুষটির সঙ্গে বয়স, সম্পর্ক এবং অবস্থার প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বৈষম্য সত্ত্বেও এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল যার কারণ আমি আজও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু সেই অসম বন্ধুত্ব আমার জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে। কিরণশঙ্করবাবুর মতো মানুষ এক সময় আমাদের সমাজে বহু সংখ্যায় ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু পরবর্তী যুগের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ওঁকে নানা দিক থেকেই অ-সাধারণ মনে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অক্সফোর্ডে পড়া এই মানুষটির রক্ষণশীলতায় এডওয়ার্ডীয় যুগের উচ্চবর্গীয় ইংরাজের মানসিকতার ছাপ ছিল।' শ্রেণিবৈষম্য শুধু ওঁর রাজনৈতিক আদর্শের অঙ্গ না, নিত্যকার জীবনচর্যার ভিত্তি ছিল বললে অতিরঞ্জন হবে না। স্বাধীনতা আমলোকের সুবিধার্থে নয়, ভদ্রলোকের ন্যায্য দাবি—এ বিষয়ে ওঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই কারণে কমিউনিস্টরা ওঁর চক্ষের বিষ ছিল (এরই প্রতিক্রিয়ায় বোধ হয় ওঁর ছেলে কল্যাণশঙ্কর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়)। যখন ফজলুল হক সাহেব 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই নারা তোলেন, কিরণশঙ্করবাবু মন্তব্য করেন, "এর পর আপনি বলবেন, 'পালকি যার, বউ তার'।" কিন্তু ইংরাজ আমলে বিদ্বিষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ওঁর তৎপরতার অভাব ছিল না। কলকাতার অ্যাসেমব্লি প্রাঙ্গণে ইংরাজের পুলিশ যখন জ্যোতিবাবুকে গ্রেফতার করে, তখন বিরোধী দলের নেতার ভূমিকায় উনিই প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করেন। অথচ একই মানুষ পশ্চিমবঙ্গের গৃহমন্ত্রী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করেন। রাজনীতির অন্যতর উদ্দেশ্য যে শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করা, সে সম্পর্কে ওঁর কোনও সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না। এই এডওয়ার্ডীয় বাঙালি ভদ্রলোকটি সমাজে পুরুষের আধিপত্য সম্বন্ধেও নিঃসঙ্কোচ ছিলেন। মেয়েদের প্রতি ওঁর একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। তিন মেয়েরই সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। এক মেয়ের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটায় তার প্রেমিককে জানান যে, লুকিয়ে বিয়ে তারা করতে পারে, কিন্তু পরদিন মেয়েকে কচুকাটা কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হবে, সে জন্য যেন তারা প্রস্তুত থাকে।

সত্যিতে উনি কন্যাবধ করতেন কি না জানি না, কিন্তু এ অবধি যা লিখেছি তা পড়লে মনে হতে পারে যে, কিরণশঙ্কর রায় ভয়াবহ, এমনকী বর্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সত্যিকার মানুষটি কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, সুরুচি, কৌতুকবোধ আর গভীর মানবিকতার সমন্বয়ে এক অলোকসামান্য পুরুষ ছিলেন। ওঁর চলাফেরা ব্যবহারে সবচেয়ে প্রকট গুণটি ছিল আভিজাত্য।

অভিজাত কথাটা গত কয়েক দশক ধরে বাংলা ভাষায় কিছুটা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হয়েছে। তিরিশ বা চল্লিশের দশকে বাংলা সিনেমায় নায়িকার পিতারা—যাঁরা সাধারণত সময় অসময় বিবেচনা না করে সব সময়ই ড্রেসিং গাউন পরে থাকতেন—শব্দটির অপব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণ দিকের অঞ্চল বা আলিপুর নিবাসী নতুন বড়লোক, বিদেশি কোম্পানির বাদামি বর্ণ মেজ সাহেব/ ছোট সাহেব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দাক্ষিণ্যে রাজা উপাধি পাওয়া মুৎসুদ্দি বা গোমস্তার পুত্র-প্রপৌত্র, কর্ণবালিস

সাহেবের কৃপায় জমিদার বনে যাওয়া দালাল বা কেরানির বংশধর—বিশ শতকের বাঙালি সাহিত্যিকরা এঁদের সবাইকেই অভিজাত শ্রেণিতে প্রোমোশন দিয়েছেন। সাবেকি অর্থে অভিজাত বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ সামন্ত শ্রেণির বংশধরেরা, অল্প কয়েক ঘর রাজা-জমিদার বাদ দিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর সূর্যাস্ত আইনের কৃপায় বাঙালি সমাজ থেকে তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। এ নিয়ে আফসোস করার কোনও হেতু নেই, কিন্তু আমাদের আত্মপরিচয় বোঝার জন্য ব্যাপারটা মনে রাখা ভাল। উত্তর কলকাতার বনেদি বড়লোক পরিবারগুলি, ইস্তক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, অধিকাংশই কোনও অর্থেই অভিজাত না, লুটেরা ইংরাজ কোম্পানির ছত্রচ্ছায়ায় ফুলেফেঁপে ওঠা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির বংশধর মাত্র। যে-বংশে কিরণশঙ্করবাবুর জন্ম, সেই তেওতার জমিদার পরিবারও এই নিয়মের ব্যতিক্রম না। কিন্তু বেশ কয়েক প্রজন্ম সম্পদ, ক্ষমতা আর নতুন ধারার শিক্ষাদীক্ষার ফলে এইসব পরিবারে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস আর কৃষ্টির ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। আধুনিক বাঙালি জীবনে আভিজাত্য বলতে সামন্ততান্ত্রিক আচারব্যবহার নয়, এই নতুন বুর্জোয়া সংস্কৃতিই বোঝায়। তবে জমিদার পরিবারগুলিতে, এমনকী উনিশ শতকের কলকাতার বাবু কালচারে, সেকেলে বড়লোকি অর্থাৎ নবাবি বা সামন্তশ্রেণির ধরনধারণের অনুকরণ কিছুটা থাকায় বাঙালি বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে পুরনো আভিজাত্যের ছোঁয়াচ লেগেছিল।

কিরণশঙ্করবাবুর ব্যক্তিত্বে বুর্জোয়া সংস্কৃতি আর পুরনো আভিজাত্যের সম্মিলন ঘটেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার অক্সফোর্ডে ডিগ্রি পাওয়া মানুষটি আচার-ব্যবহারে বনেদি বাঙালি পরিবারের ধরনধারণ থেকে এক চুলও সরে যাননি। নানাভাবে অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও উনি একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। বাড়িতে টেবিল-চেয়ারে খাওয়া বা কাঁটাচামচের ব্যবহার কখনও চালু হয়নি। আহার ব্যাপারটা মাটিতে পিঁড়ি পেতে বসে বড় বড় কাঁসার থালায়ই সম্পন্ন হত। অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় মানুষটি দেশি-বিদেশি নানা রেস্তোরাঁ থেকে খাবার বাড়িতে আনাতেন, কিন্তু ওঁকে কখনও রেস্তোরাঁয় যেতে দেখিনি। আসলে ওঁর মনে সংস্কৃতি আর আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড দম্ভ ছিল। আমরা অতি প্রাচীন সভ্য জাতি। আমরা কেন বর্বরদের মতো অন্যের অনুকরণ করতে যাব? ওঁর গভীর দেশপ্রেমের পিছনেও এই আত্মাভিমানই কাজ করত বলে আমার বিশ্বাস। দেশে ফেরার পর বোধ হয় আর কখনও বিদেশি পোশাক গায়ে ওঠেনি। না, কথাটা পুরো সত্যি নয়। বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন। সুতরাং সকলের প্রত্যাশা মেটাতে একদিন ধরাচূড়া পরে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ব্যস, ওই এক দিনই। স্টিফ কলার পড়লে ওঁর দম আটকে আসে এই দুর্লঙ্ঘ্য কারণে আর কখনও হাইকোর্টমুখো হননি।

তার চেয়েও বড় আর একটা কারণ ছিল। উনি বলতেন, ভদ্রলোকে পয়সা রোজগার করে না। ওটা সা-শুঁড়িদের কাজ। খাঁটি ভদ্রলোক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ভোগ করে সভ্য জীবন যাপন করে। তাতে যদি ভাগ্যে দারিদ্র জোটে, ক্ষতি নেই, তা বলে আমলোকের মতো কাজ করে পয়সা রোজগার করা চলে না। কিছু মানুষের অন্তহীন অবসরের ভিত্তিতেই নাকি মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ উনি গ্রিসের

দাসত্বপ্রথা আর আমাদের ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির কথা বলতেন। এই দুই সমাজের একটিতেও সভ্য মানুষ সত্যিতে কাজ বলতে যা বোঝায় তা কেউ করতেন না। অর্থাৎ নিরঙ্কুশ অবসরভোগী কোনও শ্রেণি না থাকলে সভ্যতার বিবর্তন সম্ভব নয়। অবশ্যই এ ধরনের সমাজব্যবস্থা ন্যায়ের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। কিন্তু সভ্য সমাজ শুধু ন্যায়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ক্ষমতা এবং ধনবৈষম্য সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, সেইটুকু দেখা দরকার। কারণ অত্যাচারের আতিশয্য ঘটলে সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। উদাহরণ ফরাসি বিপ্লব। ওঁর মতে ওই বিপ্লবের একমাত্র সুফল নেপোলিয়নের আবির্ভাব। এরকম আপসহীনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মতামত আমি আর কোনও মানুষকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

কিন্তু ওঁর মতামত আর জীবনচর্যার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি ছিল না। জীবনের অধিকাংশ সময় আপেক্ষিক অর্থে ওঁর দারিদ্রের মধ্যেই কেটেছে। কিন্তু ওঁকে অভাব নিয়ে হা-হুতাশ করতে কখনও শোনা যায়নি। জটিল রাজনীতির জগতে বাস করেও ওঁর সাংস্কৃতিক চেতনা সাহিত্য, ইতিহাস আর সঙ্গীতের রসে মগ্ন থাকত। একটা কথা থেকে ওঁর সত্যিকার মূল্যবোধের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। উনি ওঁর জীবনের গভীরতম আনন্দের দিনটি আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন। সে দিনটি ছিল পূর্ণিমা। ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনের বাড়িতে অতিথি সেদিন রবীন্দ্রনাথ। জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পুকুরপাড়ের সিঁড়িতে বসে কবি গান করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ওঁর জীবনে প্রায় ইন্দ্রিয়াতীত এক তীব্র সুখানুভূতির স্বাদ এনে দিয়েছিল। তুচ্ছ সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের মুহূর্তে তার স্মৃতি ওঁকে অবিচলিত রাখত। মানুষটি আপাতদৃষ্টিতে সিনিক মনে হলেও আসলে মনেপ্রাণে রোমান্টিক ছিলেন। ওঁর সবুজপত্রে প্রকাশিত সাতটি গল্প 'সপ্তপর্ণ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্রে ছিল ইয়েটসের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি

Had I the Heaven's embroidered cloths
I would have spread them under your feet

আমরা পরে জেনেছি উনি একজনকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু ভিক্টোরীয় সংস্কৃতি আর প্রচণ্ড নীতিবোধ এই ভালবাসা প্রকাশের কোনও পথ রাখেনি। তারাখচিত স্বর্গীয় গালিচাটি কার পদতলে উনি বিছাতে চেয়েছিলেন, ওঁর প্রেমাস্পদা বা অন্য কোনও মানুষ তা জানবার সুযোগ পাইনি। উনি স্ত্রীকে বলতেন, "দেশকে আমি কী দিয়েছি জানো? আমার চরিত্র।" নিজেকে উনি হেরে যাওয়া মানুষদের একজন বলেই গণ্য করতেন। মাঝে মাঝেই বলতেন, "উই দি ফেলিওরস অফ দি ওয়ার্লড।" কিন্তু ওঁর রোমান্টিক চেতনা ওঁর কৌতুকবোধকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। ওঁর একটি গল্প বিশেষ স্মরণীয়। তখন আই.এ. পড়েন। বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে জ্যাঠামশায় ওঁকে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, ভাইপো কিছুই করছে না, বসে বসে ভেরেন্ডা ভাজছে। ডেকে বললেন, "কিছু না করে বসে আছিস? আর কিছু না পারিস, দু-চারটে কবিতাও তো লিখতে পারিস। দ্বিজুর ভাই কবিতা লিখে বেশ দু'পয়সা করছে।" পাঠিকা/পাঠক, চিনলেন দ্বিজুর ভাইকে? কিরণশঙ্কর

কখনও কবিতা লেখেননি এমন নয়। সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির একটিতে এক অসাধারণ প্রাণীর পয়ারে বর্ণনা ছিল

"নিবারণ [?] নামে প্রাণী অতি বুদ্ধিমান
সর্বাঙ্গ আছয়ে তার আর দুটি কাণ।"

ওঁর কাছে অক্সফোর্ডের গল্প শুনে শুনেই আমার ওই জায়গাটি সম্বন্ধে প্রথম কৌতূহল জন্মায়। শহিদ সুরাবর্দি আর অপূর্ব চন্দ অক্সফোর্ডে ওঁর সহপাঠী ছিলেন। একদিন নাকি সুরাবর্দি সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, সবুজ শার্টের সঙ্গে নীল টাই পরা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসঙ্গত। বীতশ্রদ্ধ হয়ে মিস্টার চন্দ নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, "দ্যাট শোজ দা মিল্যু হি কামস ফ্রম!" এমন অশাস্ত্রীয় কথা চন্দ সাহেব কখনও শোনেননি। এর পর থেকে আমরা কারও প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করতে হলে বলতাম, "দ্যাট শোজ দা মিল্যু হি কামস ফ্রম"। আর একটি গল্প আমার খুব মনে ধরেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ যেদিন শুরু হয়, উত্তেজিত ছাত্ররা গ্রিক ইতিহাসের শিক্ষকের ঘরে গিয়ে বলে, "গ্রেট ওয়ার শুরু হয়ে গেছে।" সেদিনকার টাইমস পত্রিকায়ও ওই মর্মেই হেডলাইন ছিল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ছাত্রদের শান্ত হতে বলে বইপত্র নামালেন। তার পর নানা নজির দেখিয়ে বোঝালেন যে, গ্রেট ওয়ার শুরু হতে পারে না। বলো, কেবল ওয়ার শুরু হয়েছে। কারণ গ্রেট ওয়ার বলে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পেলোপোনেসীয় যুদ্ধকে। কিরণশঙ্করবাবু যখন ছাত্র তখনও নিউ কলেজের প্রবাদপুরুষ ডিন স্পুনার অবসরগ্রহণ করেননি। কথাবার্তা সব ওলটপালট করে ফেলতেন বলে ওঁর নামে ইংরাজি অভিধানে একটি শব্দ যোজনা করা হয়েছে, স্পুনারিজম। কিরণবাবুর কাছে স্পুনারিজমের একটি উদাহরণ শুনি, যা অন্যত্র কোথাও পাইনি। ক্লাসে ঢুকে স্পুনার দেখলেন ডেস্কের উপর একটি চিঠি পড়ে আছে। কেউ চিঠিটা ডাকে দিতে ভুলে গেছে আর কী। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অধ্যাপক প্রশ্ন করলেন, "হু হ্যাজ পিস্‌ড্‌ দা মোস্ট?" বলতে চেয়েছিলেন, "হু হ্যাজ মিস্‌ড্‌ দা পোস্ট?"

আবেগপ্রবণ মানুষটি সাহিত্যে আবেগপ্রবণতা সহ্য করতে পারতেন না। তাই ডিকেন্স উনি অপছন্দ করতেন। রোম্যাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' উনি বেশি বাক্যবহুল মনে করতেন, অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডি প্রফান্ডিস' ওঁর কাছে অনুভূতির ভড়ং বলে মনে হত। বঙ্কিমের ভক্ত হয়েও আনন্দমঠের যে দৃশ্যে সত্যানন্দ সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভবানন্দকে কোলে নিয়ে বসলেন সে দৃশ্যটি ওঁর অসহ্য লাগত। ওঁর প্রিয় ইংরাজ ঔপন্যাসিক ছিলেন থ্যাকারে আর ফিল্ডিং। ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা পড়তে উনিই প্রথম আমাকে উৎসাহ দেন। ওঁর প্রিয় উপন্যাস 'দা ক্রাইম অফ সিলভেস্ত্র্ বনার' পড়ে ওঁর চরিত্রের একটি দিক সম্বন্ধে সচেতন হই। বনার অকৃতদার বৃদ্ধ অধ্যাপক, একটি বিশেষ ল্যাটিন পুঁথি নিয়ে তাঁর গবেষণা। বিদ্যাচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ এই বৃদ্ধ তাঁর যৌবনের ব্যর্থ প্রেমের নায়িকার মেয়েটিকে ক্যাথলিক কনভেন্ট থেকে উদ্ধার করেন। এই তাঁর শাস্তিযোগ্য অপরাধ, ক্রাইম। রাজনীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত চার সন্তানের পিতা ঘোর রক্ষণশীল এই বাঙালি ভদ্রলোক কোথাও কি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ফরাসি পণ্ডিতটির জীবনবোধ আর মানবিক অর্থে নিজের মৌলিক

নিঃসঙ্গতার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন? আমার সঙ্গে ওঁর নিতান্ত অসম বন্ধুত্ব কি সেই নিঃসঙ্গতারই অন্যতম ফল? ইতিহাসে ওঁর প্রিয় নায়ক ছিলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু নেপোলিয়ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বারেবারেই উনি পরাজিত নেপোলিয়নের কথায় ফিরে আসতেন। উঁচু তারে বাঁধা ওঁর মনে ব্যর্থতাবোধ এক অসম্ভব সম্ভাবনার সঙ্গে জড়ানো ছিল। বলতেন, "দ্যাখ, আমরা কী নিকৃষ্ট জীব। মানুষ হয়ে জন্মে আমরা যে বুদ্ধ বা শেকসপিয়ার হলাম না, তার জন্য ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ যে, যথেষ্ট টাকা হল না অথবা মেয়েটার আর একটু ভাল বিয়ে হতে পারত।" অন্তিম অসুখের সময়ে বারবারই বলতেন, "এই অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কী গ্লানিকর দ্যাখ। আমাদের বুদ্ধ-সক্রেটিসের প্রজাতিতে জন্ম। ডুশ দিয়ে, ক্যাথিটার দিয়ে আমাদের পশুর স্তরে নামিয়ে আনে।" ওঁর নৈরাশ্যবোধ চেতনার যে-স্তরে স্থিতি পেয়েছিল, সেখানে আটপৌরে সান্ত্বনার ভাষা পৌঁছায় না। বলতে পারেন—এ ধরনের ব্যর্থতাবোধ মেগালোম্যানিয়ারই নামান্তর। কিন্তু আমার ধারণা যে, এই সরলীকরণ জটিল মনোভঙ্গির ফার্স্ট ইয়ারি অপব্যাখ্যা মাত্র। একটি অ-সাধারণ মানুষের অলোকসামান্য ব্যর্থতাবোধের পরিচয় পেয়েছিলাম, আমার ব্যক্তিজীবনের এ এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

একটি কথার এখানে পুনরাবৃত্তি করি। বর্তমান রচনাটি অনেকাংশেই বিস্মৃত বা লুপ্ত এক জগতের কাহিনি। লুপ্ত কী অর্থে? যে-ধরনের মানুষ এক সময়ে দেখেছি, সেই ধরনের মানুষ তাঁদের বিশিষ্ট জীবনচর্যা, মনোভঙ্গি আর বিশ্বচেতনা নিয়ে পৃথিবী থেকে সরে গেছেন। তাঁদের পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সঙ্গে পূর্বগামীদের সাদৃশ্য কম। এটা ভালমন্দ বিচার বা উন্নতি/অবক্ষয়ের কথা না। গভীর অথচ প্রায় অদৃশ্য সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস। কিরণশঙ্কর রায়, অন্তত আমাদের মূল্যবোধ নিয়ে বিচার করলে, কোনও অর্থেই আদর্শ পুরুষ ছিলেন না। কিন্তু তিনি আক্ষরিক অর্থেই অ-সাধারণ মানুষ ছিলেন। পরস্পরবিরোধী নানা দোষগুণের সমষ্টি ওই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়, পরবর্তী প্রজন্মে এমন মানুষের সাক্ষাৎ আমি পাইনি। তাই বিগত কালের বর্ণনা করতে গিয়ে ওঁর চরিত্রচিত্রণ বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হল।

আমাদের প্রজন্মেও কিছু লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিল, যাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি এমন মানুষের সাক্ষাৎ পরবর্তীকালে আমি পাইনি। এখানেও আবার বলি, তাঁরা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন দাবি আমি করছি না। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মূল্যবোধে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। যাঁদের কথা বলব তাঁরাও দোষে-গুণে ভরা রক্তমাংসের মানুষই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মূল্যবোধ আজকের জীবনে বিশেষ দেখতে পাই না। ফলে তাঁদের জীবনচর্যার ধারাও লুপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়।

যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন পরবর্তী কালের ডাকসাইটে আই এ এস অফিসার অমল দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অমল ছিল জাত-রোমান্টিক মানুষ। জীবনের সব কিছুতেই সে এক উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেত। প্রেমে পড়বার জন্য উন্মুখ এই তরুণ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়ে প্রথম সাক্ষাতেই তার ভাবী পত্নী অরুণার প্রেমে পড়ে। প্রথম সন্তানটি ছ' বছর বয়সে ব্রেন ক্যানসারে মারা যাওয়ার

পর অরুণা উন্মাদ হয়ে যায়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর এই উন্মাদ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করেও অমলের জীবনরস কখনও শুকিয়ে যায়নি। চাকুরি জীবনের প্রথম দিকে সে তার উপরিওয়ালা আই সি এস অফিসার কমিশনার সাহেবের অনাচারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবেই হাইকোর্টে নালিশ করে। কমিশনার তিরস্কৃত হন। ফলে দীর্ঘদিন ওর ন্যায্য পদোন্নতি বন্ধ থাকে। মহাত্মা গাঁধীর জীবন নিয়ে ছবি করতে গিয়ে চিত্রপরিচালক অ্যাটেনবরো তখনকার সংস্কৃতিসচিব অমল দত্তর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর বর্ণনায় 'ফরমিডেবল মিস্টার ডাট' অনেক বাধাবন্ধ উপেক্ষা করে ছবিটি তৈরি করতে ওঁকে সাহায্য করে। কিন্তু তার ফলে ওর প্রিয় সংস্কৃতি দফতর ওকে ছাড়তে হয়। শেষ জীবনে চির-রোমান্টিক অমল অরুণার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। সেও এক উন্মত্ত প্রেমের বিবাহ। গভীর ট্র্যাজেডির মধ্যে অমলের জীবন শেষ হয়। কিন্তু ষাট বছর বয়সেও ওর রোমান্টিক চেতনা আর গভীর জীবনানুভূতি অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রচণ্ড পৌরুষের অধিকারী চিরকিশোর এই মানুষটির সমগোত্রীয় দ্বিতীয় কোনও চরিত্রর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

অমল এবং আমার অন্যান্য যেসব সহপাঠী প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা চাকরিতে যোগ দেয়, তারা স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে এইসব ক্যাডারে প্রথম ব্যাচের চাকুরে। শিক্ষিত বাঙালি তখনও সরকারি চাকরির চেয়ে বড় সৌভাগ্য কিছু কল্পনা করতে পারত না। আর হঠাৎ এই জাতীয় চাকরি বেশি সংখ্যায় খালি হওয়ায় ভাল ছাত্রদের মধ্যে নতুন আশার উদ্দীপনা দেখা দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই যৌবনসুলভ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, যে আদর্শের মূল কথা জাতীয়তাবোধ বা স্বজাতিপ্রেম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার প্রকাশ চমকপ্রদ আত্মত্যাগে নয়, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করায়। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অনাচার এই আদর্শভিত্তিক কর্তব্যবোধকে ক্রমে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এক সময়ে বোধটা কত বাস্তব ছিল অমলের জীবন থেকে তা বুঝতে পারি। আই এ এস-এর চাকরি নেবার আগে নবগঠিত ইউ. এন-এ অমল কাজ পেয়েছিল। সে কাজ ও নেয়নি। না নেওয়ার কারণ হিসাবে ও বলে সারাজীবন বিদেশে কাটালে জীবনের বাস্তব ভিত্তি বোধ হয় শিথিল হয়ে যায়। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। এখন এখানে অনেক কিছু করার আছে। অনেক ধাক্কা খেয়েও শেষ অবধি ওর এই বিশ্বাস অটুট ছিল।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আমাদের আর একজন সহপাঠী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আই এ এস-এ যোগ দিয়ে ওড়িশায় চাকরি নিয়েছিলেন। আমাদের ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' ঈশান স্কলার অশোক হাকিম হওয়ার জন্য জন্ম নেয়নি। ওর অসাধারণ প্রতিভার এটাই সুষ্ঠু ব্যবহার, এমন কথা কারও কেন মনে হয়েছিল বলতে পারি না। অশোক সাবেকি অর্থে যাকে স্কলার বা পণ্ডিত বলে তা ছিল না। অর্থাৎ ইতিহাসের ছাত্র হয়েও দলিল-দস্তাবেজ বা পুঁথি-অনুশাসনে মুখ গুঁজে জীবন কাটানোর সম্ভাবনা ওকে উদ্দীপ্ত করত না। ওর প্রতিভা, যার আভিধানিক অর্থ 'নব নব উন্মেষশালিনী বুধী', বর্তমান জগৎ আর সমাজকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। ওর যদি আর কয়েক বছর পরেও জন্ম হত, তবে ও হয়তো সাংবাদিক হত এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের পথে এগিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষকদের একজন বলে গণ্য হত। অনার্স ক্লাসের সেমিনারে ওর পড়া ফরাসি বিপ্লবের

উপরে একটি প্রবন্ধ মনে পড়ে। সুশোভনবাবু প্রবন্ধটি শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আদর্শবাদ আর বাস্তব অবস্থার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত আলোচনা করতে গিয়ে ও দেখায় যে, রুশো-ভল্‌তেয়ারের চিন্তা এক দিকে যেমন বিশিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি, তেমনই তার প্রভাবও সেই অবস্থা দিয়েই নির্ধারিত ও সীমিত হয়েছিল। চল্লিশের দশকে এই ধরনের চিন্তা আর কেউ করেছিলেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত সমাজে বাঁধা সরকারি চাকরির সম্ভাবনা থাকলে অনিশ্চয়তায় ভরা অন্য কোনও জীবিকার কথা কেউ ভাবত না। অশোকের চাকুরিজীবন সাফল্যমণ্ডিতই ছিল। রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহের একান্ত সচিব হয়ে ও কাজ থেকে অবসর নেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা যার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র ছিল, তাকে শাসনযন্ত্রের ঘানিতে জুড়ে দিয়ে একটি অসাধারণ সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনাশ করা হয়েছিল।

অবস্থার চাপে পথভ্রষ্ট আমাদের প্রজন্মের আর একটি মানুষের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ব্যক্তিটি শৈলেন সেন, আমার ভগ্নিপতি। ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের ছেলে শৈলেন সাম্প্রতিক জগৎ, বিশেষত আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে গভীর পড়াশুনো করেছিল। সে-আমলের এক ডাকসাইটে সাংবাদিকের কাছে সুরেনবাবু পরামর্শ চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর চুরুটটি ঠোঁটের এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, "যদি ছেলে উপোস করে এই দেখতে চান, তা হলে সাংবাদিকতা করতে বলুন।" ভদ্রলোক নিজে অবশ্যি ঠিক উপবাস করেননি। এমনকী যথাস্থানে তৈল নিকেশ করে ইংরাজ সরকারের কৃপায় নাইটহুডও পেয়েছিলেন। কিন্তু জিনিয়াসদের বেলা নিয়ম আলাদা, এ কথা কে না জানে? শৈলেন তার কর্মজীবনের প্রস্তুতি হিসাবে অক্সফোর্ডে পড়বে ঠিক হয়েছিল। মহাপুরুষের উপদেশ অনুযায়ী সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসে ও আয়কর বিভাগে চাকরি পায়। সে কাজ সে নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। আর সততা এবং কর্মদক্ষতার জন্য প্রচুর সুনাম নিয়ে চাকরিতে যতদূর ওঠা সম্ভব তা উঠে অবসর নেয়। কিন্তু ওই কাজ ওর কাছে বিষবৎ ছিল। সমস্ত অবসর সময় পড়াশুনোয় কাটিয়ে ও প্রায় হাজার ছয়েক বই সংগ্রহ করেছিল। ইচ্ছে ছিল অবসর নেওয়ার পর ঐতিহাসিক গবেষণা করবে। যে দিন অবসর নিল তার পরদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শৈলেন মারা যায়। ওর পথিক দুরাশা লক্ষ্যে পৌঁছবার কোনও সুযোগ পেল না।

স্বাধীনতালাভের আগে শিক্ষিত ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুর জীবনে জীবিকা উপায়ের পথ কত সীমিত ছিল আজকের প্রজন্মের পক্ষে তা কল্পনা করা কঠিন। দীর্ঘ দিন বেকার থাকা বা জীবনের অধিকাংশ সময় অতি সামান্য রোজগারে পরিবার প্রতিপালন করা— শিক্ষিত বাঙালির প্রত্যাশা এর উপরে যেত না। যেসব লোক মাঝারি বা ছোট সরকারি চাকরি পেতেন তাঁদের সবাই বিশেষ ভাগ্যবান মনে করতেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ক্যাডারভুক্ত চাকরি অথবা অপেক্ষাকৃত মোটা মাইনের বেসরকারি কোম্পানিতে যাঁরা চাকরি পেতেন তাঁদের ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়েছে বলে সবার ধারণা ছিল। এই শ্রেণির ভাগ্যবানদের অনেকেই অনিবার্যভাবেই 'আমি কী হনু রে' এই চিন্তায় মশগুল থাকতেন। এইসব হনুদের সহ্য করা কঠিন ছিল, কিন্তু বেচারিদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায়

না। দেশব্যাপী দুরবস্থার সমুদ্রে এঁদের জীবনযাত্রা সাচ্ছল্যের ছোট ছোট দ্বীপ হয়ে ভেসে থাকত। ভাগ্য যাঁদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়নি তাঁদের সম্বন্ধে সহানুভূতি থাকার মতো সুরুচি বা সত্যিকার শিক্ষা এঁদের অনেকেরই ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন জীবিকা উপায়ের সুযোগ-সুবিধা যে আগের তুলনায় বেড়েছে এবং বাড়ছে, এ উপলব্ধি মানুষের হয়নি। ফলে অনেকেই গতানুগতিক পথেই জীবিকার সন্ধান করেছে। ক্ষমতা বা প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ পায়নি। অশোক বা শৈলেনের মতো প্রতিভাশালী মানুষ বিদেশি শাসনের যুগের মনোভাব বা আশাপ্রত্যাশার শিকার।

আমাদের প্রজন্ম জাতীয় জীবনের দুই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে—প্রথম '৪৩ সালের মন্বন্তর। দ্বিতীয় '৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বর্তমান পরিচ্ছেদে প্রথম ঘটনাটি বিষয়ে কিছু বলব। ইতিহাসে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নজির হিসাবে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক বর্ণনা কোনও অর্থেই 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' নয়। এই সত্য 'আধুনিকতাপরবর্তী' বা পোস্ট-মডার্নিস্ট ঐতিহাসিকরা তথ্যপ্রমাণ দিয়েই সম্যকভাবে প্রমাণ করেছেন। সোজা কথায় বলতে গেলে প্রশ্নটা দাঁড়ায়—সমসাময়িকরা কোনও ঘটনাবিশেষ বা ঘটনাপ্রবাহের কতটা সত্যিকে প্রত্যক্ষ করেন? 'প্রত্যক্ষদর্শন' অনেক সময়ই অন্য লোকের মুখে শোনা কথা। তার উপর নিজের মত ও বিশ্বাস—যা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিতরণে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থানের উপর অনেকটাই নির্ভর করে—দেখা ঘটনা এবং শোনা কথার কী ব্যাখ্যা হবে তার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। মোট কথা, প্রত্যক্ষদর্শী হলেই ঘটনাবিশেষ সম্পর্কে তার বক্তব্য বেদবাক্য হয়ে দাঁড়ায় না।

'৪৩ সালের মন্বন্তর আমি যেটুকু স্বচক্ষে দেখেছি তা 'রোমন্থন'-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি, এখানে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'৪৩-এর জুলাই মাসে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কলকাতা ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই। যতদূর মনে পড়ে, নভেম্বর মাস নাগাদ শহরের রাস্তায় এক নতুন দৃশ্য চোখে পড়তে থাকে। গ্রামাঞ্চল বা মফস্বল শহর থেকে দলে দলে লোক এসে রাস্তা বা ফুটপাথে বাসা বাঁধতে শুরু করে। কলকাতার রাস্তায় ভিখারি কিছু নতুন দৃশ্য নয়। কিন্তু এই নবাগতরা অন্য ধরনের মানুষ। এক—এদের দেখলেই বোঝা যেত যে, ভিক্ষাবৃত্তি এদের স্বাভাবিক পেশা না। অনেক সময়েই দেখা যেত মা-বাপ-ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা পুরো পরিবার এসে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে। কলকাতায় ভিক্ষাবৃত্তির এটা সাধারণ লক্ষণ নয়। দ্বিতীয় কথা— প্রথম প্রথম এরা ভিক্ষা চাইত না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। বোঝা যেত এরা গৃহস্থ মানুষ। সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ভিক্ষা করতে পারছে না। কখনও কখনও শহরবাসীরা এদের দুরবস্থা দেখে নিজের থেকেই কিছু ভিক্ষে দিয়ে যেত। কিন্তু তখন চালের দাম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মন প্রতি তিন/সাড়ে তিন টাকা থেকে বেড়ে মন প্রতি চল্লিশে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দুঃস্থ পরিবারগুলির সবচেয়ে যা প্রয়োজন সেই চাল দেওয়ার মতো অবস্থা বেশি লোকের ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তায় মৃত বা মৃতপ্রায় মানুষের শরীর চোখে পড়তে লাগল। আর ফুটপাথবাসীর সংখ্যা যেন রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠল। রাস্তায় বের হলেই মৃত মানুষ পড়ে আছে দেখা নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এরকম

কতজন মৃত বা অর্ধমৃত মানুষ দেখেছি যদি জিজ্ঞেস করেন তো সঠিক উত্তর দিতে পারব না। তবে তার সংখ্যা ছ'-সাত সপ্তাহে পাঁচ-ছ' হাজারের কম হবে মনে হয় না। দুঃস্থ মানুষের ভিড় সবচেয়ে বেশি দেখা যেত চৌরঙ্গি অঞ্চলে। তখন বিদেশি সৈন্যের ভিড়ে কলকাতা শহর সরগরম। ওইসব অল্পবয়সি ছেলেরা বোধহয় ভিক্ষে দেওয়ার ব্যাপারে মুক্তহস্ত ছিল। কিন্তু পয়সা দিয়ে কী হবে? বাজারে চাল কোথায়? মার্কিন সৈন্যদের জন্য টিনে করে খাবার আসত। ওইসব খাদ্য সামান্য দামে রাস্তায় বিক্রি হতে দেখেছি। আমরাও কিনতাম। কখনও কখনও জি. আই-রা ভিক্ষে হিসাবে টিনগুলি দিত। কিন্তু কোনও দুঃস্থ মানুষকে বহুদিনের সংস্কার কাটিয়ে উঠে ওই সব খাদ্য খেতে কখনও দেখিনি। ক্রমে শহরের পথে সেই অবিস্মরণীয় আবেদন শোনা যেতে লাগল। চাল ভিক্ষা করা বৃথা জেনে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ অন্য সুর ধরল : "ফ্যান দাও গো, ফ্যান দাও।" ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আর কখনও বুভুক্ষু বাঙালি ফ্যান খেয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে এমন নজির ইতিহাসে নেই। কিছু কিছু জনহিতকারী সংস্থা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খোলে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নিতান্তই মরুভূমিতে জলবিন্দুর শামিল হয়ে দাঁড়ায়। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। তার একটা বড় অংশ কলকাতার রাস্তায়। এই বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো সত্যিকার কোনও চেষ্টা সরকার বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রকৃতপক্ষে কেউই করেনি।

সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে করি। '৪৩-এর কলকাতা রীতিমতো 'বুম টাউন'। চৌরঙ্গি অঞ্চলের রাস্তায় নানা বর্ণের সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা এবং তা তারা মুড়ি-মুড়কির মতো খরচা করছে। নতুন নতুন সব রেস্তোরাঁ আর ক্যাবারে হয়েছে। শহরের অলিতে-গলিতে মাসাজ পার্লারেরও সমারোহ, যদিও এই ব্যবসা সত্যিতে জমে ওঠে দেশ ভাগ হওয়ার পর। কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে কিছু সন্ধানী ব্যক্তি যাঁরা মাসাজ পার্লারে যাওয়া-আসা করতেন, তাঁদের কাছে শুনতাম যে, ওইসব প্রতিষ্ঠানে ভোগ্যবস্তু কলকাতার রাস্তা থেকেই সংগ্রহ করা, তবে তারা ভদ্র ঘরেরই মেয়ে। মানে পার্লারের স্ত্রীরত্নরা মোটেই দুষ্কুলাৎ নয়। মোট কথা কলকাতার ফূর্তি-আমোদে দুর্ভিক্ষের জন্য একটুও ভাঁটা পড়েনি, বরং ফূর্তির জোয়ার ফেঁপে ফুলেই উঠেছিল। চাল এবং আর সব ভোগ্যবস্তুর দাম বাড়ায় কালোবাজারের কৃপায় অনেকের পকেটেই প্রচুর কাঁচা পয়সা। সে পয়সা নানা বিলাসব্যসনে খরচ করার উপায় শহর কলকাতায় অজস্র। রেস্তোরাঁর কথাই ধরুন না কেন। কোনও রহস্যজনক কারণে চালের দাম হু-হু করে বাড়া সত্ত্বেও রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম প্রায় একই ছিল। এমনকী ফারপোর সেই বিখ্যাত তিন পদ লাঞ্চের দাম দুর্ভিক্ষ যখন চরমে তখনও মাত্র তিন টাকা। হ্যাঁ, আমাদের মতো মিচকিন মোবারক ব্যক্তিরাও সেই বিলাস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলাম না। 'রোমন্থন'-এ লিখেছি পঞ্চাশের দশকে ইংল্যান্ডে একজন ডাক্তারের অ্যালবামে পাশাপাশি দুটি জিনিস দেখেছিলাম। প্রথমটি ফারপোর এক স্পেশ্যাল লাঞ্চের মেনু ন' টাকায় সাত পদ। তার পাশে একটি ফোটো—দুর্ভিক্ষপীড়িত মৃতপ্রায় কিছু মানুষ ফারপোর দরজার কাছে শুয়ে-বসে রয়েছে। চৌরঙ্গি অঞ্চলের রেস্তোরাঁগুলির সামনে দুঃস্থ মানুষের ভিড় কিছু বেশি হত, কারণ ওখানে ভিক্ষেটা একটু মোটা অঙ্কের হওয়ার সম্ভাবনা। মোট কথা বাড়ির দরজার বাইরে

মানুষ আক্ষরিক অর্থেই না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছে, এবং তারা সংখ্যায় একজন-দু'জন না, বিশ-ত্রিশ লক্ষ, এই দৃশ্য দেখে বা এই তথ্য জেনে সাহেব বলুন, দেশি লোক বলুন কারওই গলায় ভাত আটকে যায়নি। আমাদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা তথা ফুর্তি-আমোদেও কোনও বাধা পড়েনি। হস্টেলের ছেলেরা দু'-এক বেলা উপোস করে সেই ভাত দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দিয়েছি এবং ফলে নিজেদের মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেছি। ওই কাজ করতে গিয়ে প্রসঙ্গত বুঝতে পারি আমাদের মতো ভাগ্যবান মানুষের সঙ্গে সত্যিকার হতভাগ্যদের কত তফাত। অনভিজ্ঞ হাতে সমাজসেবা করতে গিয়ে আমরা বুভুক্ষুদের বেশ এক পেট লপসি খাইয়ে দিই। ফলে যারা দীর্ঘ দিন খেতে পায়নি তাদের অনেকেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেদবমি হয়ে মারা যায়। অনেক দিন না খেতে পেলে মানুষের শরীর যে আহার কী করে গ্রহণ করতে হয় সে কথা ভুলে যায়, এ তথ্য আমরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পাওয়া মানুষ কী করে জানব? আমাদের শুভেচ্ছাজনিত মৃত্যুর ঘটনায় আমরা ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

এতক্ষণ যা লিখেছি, তা তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের একজন 'প্রত্যক্ষদর্শী'র বর্ণনা। এ থেকে ঘটনার স্বরূপ বা কার্যকারণ কিছু বোঝা যায় না। তার বীভৎসতার হয়তো কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। সত্যিতে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ইতিহাস লেখা হয়নি। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আংশিক বিশ্লেষণ হয়েছে ঠিকই, অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক পটভূমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। জনৈক মার্কিন গবেষক এক চমকপ্রদ কাহিনি শুনিয়েছেন। মেয়েরা ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে স্বেচ্ছায় কম খাওয়ার ফলেই নাকি দুর্ভিক্ষে অত লোক মারা যায়। সীতা-সাবিত্রীর দেশ বলে কথা! এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা শুধু সেই দেশেই সম্ভব যেখানে বুশের মতো জীব প্রচুর ভোটে জিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। সে কথা যাক। দিল্লির বি. এম. ভাটিয়া সাহেব তাঁর দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে বাংলার মন্বন্তর নিয়েও আলোচনা করেছেন। আরও বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় মন্বন্তরের অল্প পরে সংকলিত স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায়। বছর দুই আগে ডক্টর বিক্রমজিৎ দে তাঁর অক্সফোর্ডের পি.এইচ. ডি. থিসিসে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে ইংরাজ সরকারের অবদান বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এইসব ছড়ানোছিটানো নানা বিশ্লেষণের ফলাফল একত্র করে মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার সময় হয়েছে।

আবার প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমরা যারা সেই চরম দুর্ভাগ্যের সময় জীবিত ছিলাম, কেন কী ঘটছে তা জানার বা বোঝার আমাদের বিশেষ কোনও সুযোগ ছিল এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। আমরা শুধু দেখতাম চালের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে আর নানা দিক থেকে খেতে না-পাওয়া মানুষ কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষান্নর আশায় জড়ো হচ্ছে। সে ভিক্ষান্ন না জোটায় হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক রাস্তায় পড়ে মরছে। কেন এমন হচ্ছে তা নিয়ে অনেক মন্তব্য কানে আসত। তার সত্যাসত্য বিচার করার উপায় আমাদের ছিল না। শুনতাম যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরাজ সরকার চাষিদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছে, কিন্তু সেই শস্য বণ্টনের সুব্যবস্থা কিছু হয়নি। আর চালের দাম বাড়ছে দেখে কালোবাজারিরা সব চাল লুকিয়ে ফেলায় দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

কোথাও কোথাও নাকি এক মন চাল একশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর সরকারের সংগৃহীত খাদ্যশস্য শিবপুরের বোট্যানিকাল গার্ডেনে স্তূপীকৃত পড়ে আছে। তা বণ্টনের ব্যবস্থা ঠিকমতো করা হয়ে উঠছে না। এই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে যেসব লোক ফায়দা উঠাচ্ছে তাদের মধ্যে বেশ কিছু নামী-দামি লোকেরও নাম শোনা যেত। আরও শুনতাম—দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ এতই নির্জীব হয়ে পড়েছে যে, তাদের চোখের সামনেই কালোবাজারিরা চড়া দামে চাল বিক্রি করছে দেখেও তারা নিষ্ক্রিয় থাকছে। পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও একটি চালের গুদাম বা মুদির দোকান লুট হয়নি।

পরবর্তী গবেষণা থেকে যা জানা গেছে তাতে মনে হয় '৪৩-এর মন্বন্তর কোনও অর্থেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা নৈর্ব্যক্তিক অর্থনৈতিক শক্তির টানাপড়েনের ফল নয়। ওই ভয়াবহ ঘটনা সম্পূর্ণভাবেই মানুষের তৈরি। ইংরাজ সরকারের অবিশ্বাস্য গাফিলতি আর কিছু দেশি মানুষের অন্তহীন লোভের পরিণাম এই দুর্ভিক্ষ। বছরের গোড়া থেকেই কতগুলি জেলার অধিকর্তারা চেতাবনি পাঠাচ্ছিলেন যে, সরকারের খাদ্যসংগ্রহ এবং জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে অবলম্বিত কিছু ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। সরকারের খাদ্যসংগ্রহ নীতির পিছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য—যেন পূর্ব সীমান্তে যুযুধান ফৌজদের কখনও খাদ্যের অভাব না হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যর পিছনে ছিল তথাকথিত 'ডিনায়াল পলিসি'। অর্থাৎ জাপানিরা ভারত আক্রমণ করলে তাদের পক্ষে খাদ্যসংগ্রহ এবং যানবাহনের অভাবে চলাচল যাতে কঠিন হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা নেওয়া। জাপানিদের সত্যিতে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারত আক্রমণের কোনও মতলব কখনওই ছিল না। ইংরাজের গোয়েন্দা বাহিনী এই তথ্য আবিষ্কার করতে পারেনি। পারলে তাদের অনেক অকারণ উদ্বেগ এবং মিথ্যা শ্রম বেঁচে যেত। তার চেয়েও বড় কথা, '৪৩-এর মন্বন্তর সম্ভবত ঘটত না। কারণ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইংরাজের যুদ্ধপ্রচেষ্টার অঙ্গ 'ডিনায়াল পলিসি'র একটি কার্যক্রম ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল থেকে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় যানবাহন সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেশি লোকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া। এই নীতির ফলে গ্রামবাসীর কাছে অল্পস্বল্প খাদ্যশস্য যা রয়ে গিয়েছিল তা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। নিরন্ন গ্রামবাসীর পক্ষে খাদ্য সংগ্রহের কোনও উপায় থাকে না। তা ছাড়া যাদের জীবিকা নির্ভর করত নৌকা চলাচলের উপর, যেমন জেলেরা, তাদের উপার্জনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এই শেষের শ্রেণির মানুষই দুর্ভিক্ষর প্রথম শিকার হয়।

বিক্রমজিতের গবেষণায় যে-তথ্য প্রকাশ হয়েছে তা সত্যিই ভয়াবহ। ভারতে এখনও যাঁরা ইংরেজ রাজত্বের উৎকর্ষ স্মরণ করে দশাপ্রাপ্ত হন, এই তথ্যগুলি তাঁদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্ত বাংলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রথা নামেই চালু ছিল। সমস্ত ক্ষমতা গুটিকয়েক সরকারি-বেসরকারি ইংরেজের কুক্ষিগত হয়। এঁরা মন্ত্রীদের তোয়াক্কা রাখতেন না। এমনকী এঁদের পরামর্শে লাট সাহেব প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে গ্রেফতার করার হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এক সময়ে দেশবন্ধুর সহকর্মী এবং শিষ্য হক সাহেবের প্রথম থেকেই চেষ্টা ছিল কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ শাসন

করা। নীতিগত কারণে কংগ্রেস ওঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ করেনি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যদি করত তবে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হত না এবং সম্ভবত পূর্ব বাংলা পাকিস্তানে যেত না। হক সাহেবই মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ কথা ঠিক। কিন্তু পাকিস্তানের অর্থ যে দাঁড়াবে ভারতবিভাগ, তখন জিন্না সাহেবও এমন কথা চিন্তা করেননি। কিছুদিন লিগের সঙ্গে সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা চালিয়ে হক সাহেব শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা করেন। যখন দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থায় মেদিনীপুরে সর্বধ্বংসী বন্যা হয়, তখন ইংরাজ বড় আমলারা বেশ কিছুদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। বন্যার খবরটাও কিছুদিন চাপা থাকে। লাটসাহেব ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে উড়োজাহাজ থেকে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে তাঁর কর্তব্য শেষ করেন। মন্ত্রীরা মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে তাঁদের পদে পদে বাধা দেওয়া হয়। মেদিনীপুর আগস্ট আন্দোলনের এক প্রধান ঘাঁটি ছিল। আমলাতন্ত্রের সৎমা-সুলভ নীতির পিছনে যে মেদিনীপুরবাসীদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে কাজ করছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। কিন্তু যেসব ঐতিহাসিক ইংরাজ সরকারের দলিলপত্র বেদবাক্য বলে মনে করেন, এ কথা তাঁরা স্বীকার করবেন না। কারণ সাহেবরা তো কোথাও লিখে যাননি যে, তাঁরা বিপ্লবীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মেদিনীপুরে সময়মতো সাহায্য পাঠাননি। আর সময়মতো পাঠাননি, এও তো কুলোকের কথা। কেলে মন্ত্রীগুলো ওইরকমই বলেছে বটে। কিন্তু ভারতীয় নেতারা যে মিথ্যা ছাড়া সত্য বলে না, এ কথা তো সর্বজনবিদিত। পাঠিকা/পাঠক এই যে কথাগুলি লিখলাম, মনে করবেন না এগুলি শুধু আমার বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। এই ধরনের 'ঐতিহাসিক আলোচনা' আমার স্বকর্ণে শোনা।

ইংরেজ সেক্রেটারি আর বেসরকারি ফোঁপরদালালদের পেজোমি অসহ্য হয়ে ওঠায় শ্যামাপ্রসাদ শেষ অবধি পদত্যাগ করেন। বাংলা ক্যাবিনেটের মিটিং যখন বসত তার এক কৌতুকজনক বিবরণ বিক্রমজিৎ আবিষ্কার করেছেন। এইসব মিটিংয়ে গভর্নর এবং সেক্রেটারিরা এমন ব্যবহার করতেন যে, মনে হত নির্বাচিত মন্ত্রীরা সেখানে উপস্থিত নেই। হক সাহেব উত্ত্যক্ত হয়ে ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় শ্যামাপ্রসাদকে বাংলায় নোট পাঠাতেন। শ্যামাপ্রসাদ তা পড়ে দলামোচড়া করে মেঝেয় ফেলে দিতেন। এইসব নোট ইংরাজের টিকটিকিরা সযত্নে সংগ্রহ করে অনুবাদ সহ হুজুরকে পেশ করতেন। একটি চিরকুটে লেখা ছিল, "সুভাষ আসতেছে। এগুলার পিঠের ছাল ছালাইয়া নেবে।"

ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য শ্যামাপ্রসাদের ছিল না। উনি পদত্যাগ করে ব্যবস্থাপক সভায় যে-বক্তৃতা দেন তা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পিসেমশায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে অ্যাসেম্বলি হলে বিতর্ক শুনতে যেতাম। সুরাবর্দি আর হক সাহেবের বাচনভঙ্গি বিশেষ ভাল লাগত। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা হয় এমন আর কোনও ভাষণ আমি কখনও শুনিনি। উনি ফজলুল হক সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কখনও কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে কারও পক্ষে গুটিকয় সেক্রেটারি আর তাদের স্যাঙাত কিছু বেসরকারি ইংরাজ ফোঁপরদালালদের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। উনি নানা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে

দুর্ভিক্ষের জন্য এইসব লোকগুলির দায়িত্ব প্রমাণ করেন, আর কীভাবে তারা পদে পদে মন্ত্রীদের কাজে বাধা দিয়েছে তাও দেখান। এই বিশ্লেষণ অসহ্য বোধ হওয়ায় সভার এক মনোনীত ইংরাজ সভ্য চেঁচিয়ে ওঠে, "তুমি তোজোর কাছে যাও। সেই তোমার রক্ষাকর্তা।" (গো টু তোজো। হি ইজ ইওর সেভিয়ার।) শ্যামাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, "দুশো বছর শাসনের পর এই যদি তোমাদের অবদান হয়, তবে তোজো আমাদের রক্ষাকর্তা কি না জানি না, কিন্তু তোমরা যে নও, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।" (আই ডু নট নো ইফ তোজো ইজ আওয়ার সেভিয়ার, বাট ইফ আফটার টু হানড্রেড ইয়ারস্ অফ ব্রিটিশ রুল, দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ গিভন আস, আই নো ফর সার্টেন দ্যাট ইউ আর নট।)

ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে, কিছু মানুষকে রাতারাতি কোটিপতি বানিয়ে '৪৩-এর মন্বন্তর হঠাৎই একদিন শেষ হয়ে গেল। স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের গো-মহিষের এক-তৃতীয়াংশও ওই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। ফলে ওই অঞ্চলের কৃষিব্যবস্থার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে বহু বছর লাগে। অঞ্চলটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিল, তা থেকে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য আজও হয়েছে কি না, এ বিষয়ে কারও কারও সন্দেহ আছে।

'৪৩ থেকে '৪৫—এই দুই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি তার ভিত ওইখানেই হয়েছিল। এবং এর জন্য আমার ব্যক্তিগত ঋণ মুখ্যত একটি মানুষের কাছে। তাঁর নাম সুশোভন সরকার।

বিশ্ববিদ্যালয় : রাজনীতির হেরফের : দাঙ্গা : দেশবিভাগ

বি.এ পাস করে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম তখনও আমরা নামে প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ছাত্র। কিন্তু মাসিক মাইনেটা কলেজের অফিসে জমা দেওয়া ছাড়া তখন কলেজের সঙ্গে আমাদের আর কিছু বিশেষ সম্পর্ক রইল না। এই বিচ্ছেদ আমার পক্ষে সত্যিতে বেশ বেদনাদায়ক হয়েছিল এবং তার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। এক সময় স্নাতকোত্তর বিভাগের পড়ানোও কলেজেই হত, কিন্তু সে ব্যবস্থা অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কতকটা অক্সব্রিজের পুরনো আদর্শে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাল করে পড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। তবে অক্সব্রিজের সঙ্গে ওখানকার পড়ানোর এক ব্যাপারে মৌলিক তফাত ছিল। অক্সব্রিজে পাঠন ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে টিউটোরিয়াল প্রথা, যার মূল কথা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের নিজেদের পড়াশুনো, চিন্তা করা এবং লিখতে শেখা। প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতার অন্যান্য ভাল কলেজে কোথাও কোথাও টিউটোরিয়াল প্রথা নামে চালু থাকলেও, আসলে জোর দেওয়া হত অধ্যাপকের বক্তৃতার উপর। এ নিয়মের যে যথেষ্ট ব্যতিক্রম ছিল সে কথা আগেই লিখেছি। তবে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পাণ্ডিত্য এবং প্রকাশভঙ্গি দুদিক থেকেই অসাধারণ কিছু শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের কাছে পড়তে পারা যে সৌভাগ্যের কথা এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। ভাল শিক্ষক আর

ভাল ছাত্রর সমন্বয়ের ফলে প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা প্রায় সব বিষয়েই ফার্স্ট সেকেন্ড হত। সুতরাং আমাদের মাটিতে পা পড়ত না, ধরাকে সরাজ্ঞান করতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের পর স্নাতকোত্তর বিভাগের অভিজ্ঞতা অন্তত আমার কাছে কিছুটা জোলো মনে হয়েছিল। ওখানে এসে মনে হল—ক্লাসে পড়ানোটাকে তাঁদের প্রধান কর্তব্য মনে করেন এরকম শিক্ষক কমই আছেন। সুশোভনবাবু তখনও স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ান, কিন্তু তা নামে মাত্র। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ওঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ওঁর পড়ানোর মান কিছুটা নষ্ট করত। ক্লাসে যে-বক্তৃতা সম্পূর্ণ অসাধারণ মনে হত, পরে তার অনেক কথাই কোনও না কোনও বিখ্যাত বই খুলে পাতার পর পাতা ঠিক সেই কথাগুলিই হুবহু দেখতে পেয়ে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়ে যেতাম। মানুষটির স্মৃতিশক্তি সত্যিই অসাধারণ ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে ওঁর রামায়ণ এবং মহাভারত ব্যাখ্যা এক সময় কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। উনি প্রথমে কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন, তারপর তার ব্যাখ্যা করতেন। সামনে কোনও বই থাকত না। আমার দৃঢ় ধারণা—ওই দুই মহাকাব্য ওঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। ক্লাসে পড়ানোর ব্যাপারেও ওঁর উৎসাহ এবং উত্তেজনায় আমরা কিছুটা অংশীদার হতাম সন্দেহ নেই। তবুও সব মিলিয়ে স্নাতকোত্তর ক্লাসের পঠন-পাঠন আমাদের মন আকর্ষণ করতে পারেনি। আমরা প্রায় যৌথ উদ্যোগ নিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিতে শুরু করি। এমনকী নিতান্ত ভাল মানুষ, আমাদের 'ফার্স্ট বয়' অশোকও ক্লাস পালানোর উৎসবে যোগ দিল। মাস্টারমশাইরা সবই জানতেন, কিন্তু কিছু গা করতেন না। শুধু একদিন ত্রিপুরারিবাবু বললেন, "তপন, মাঝে মাঝে ক্লাসে এলেও পারো।" খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। কারণ সত্যিতে উনি ভাল পড়াতেন। ওঁর ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার সপক্ষে কোনও যুক্তি ছিল না। আসলে ব্যাপারটা একটা ছেলেমানুষি বাহাদুরিতে দাঁড়িয়েছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের ভিত্তি ছিল ক্লাসে পড়ানোয় নয়, অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার খ্যাতিতে। সে সময়ে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, হেম রায়চৌধুরী, সুরেন দাশগুপ্ত, সুকুমার সেন, দীনেশ সরকার, নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর হবিবুল্লাহ এঁরা সবাই শুধু জীবিত নন, এঁদের প্রতিভা তখন মধ্য গগনে। আমরা যাঁরা পরবর্তী জীবনে শিক্ষা বা গবেষণা পেশা হিসাবে গ্রহণ করি এইসব মহারথীদের জীবন ও কর্ম তাঁদের প্রেরণা জোগায়। গভীর গবেষণায় রত অধ্যাপকরা অনেক সময়ই যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তা না। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ভাল পড়াতেন না। কিন্তু সরকারি দলিলপত্রর ভিত্তিতে ওঁর গভীর গবেষণা পরবর্তী প্রজন্মের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমরা যখন ছাত্র, তখন দেখতাম ক্লাস শেষ হলেই উনি ট্রামে চেপে কলকাতা হাইকোর্টে চলে যেতেন—ওখানকার নথিপত্র দেখতে। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হতে কখনও দেখিনি।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমাদের দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যই প্রধান লক্ষ্য ছিল, বিশ্লেষণ নয়। তখন গবেষণাভিত্তিক ডিগ্রি একটিই ছিল—পিএইচডি। আমাদের সময়ই প্রথম পিএইচডি-র তুলনায় নিচু মানের ডিফিল ডিগ্রি চালু হয়। কাজটা ঠিক হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। নতুন ডিগ্রি চালু হওয়ার ফলে সহজে কেল্লা ফতে করার একটা প্রবণতা

আসে। তখনকার দিনে পিএইচডি ডিগ্রি পেতে দশ-বারো বছর লেগে যেত। থিসিসগুলি আর যেদিক থেকেই কাঁচা হোক, পাণ্ডিত্যে কোনও ত্রুটি থাকত না। এখন অনেক উচ্চাঙ্গের কাজ হচ্ছে ঠিকই, আজকালকার গবেষকরা সে যুগের তুলনায় অনেক বেশি কইয়ে বলিয়েও, কারও কারও দুনিয়ার হাটে খুবই নামডাক। কিন্তু সে যুগে কাঁচা সংস্কৃতজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা করার সাহস কারও হত না। এখন মনে হয় নগদ পাওনার দিকে নয়া পণ্ডিতদের নজর একটু বেশি। সে সময় বেশির ভাগের কপালে নগদ কেন, কোনও পাওনারই সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে সারা জীবন গবেষণা তথা শাস্ত্রচর্চায় কাটাতেন। কিন্তু তাঁদের ছিন্নতন্ত্রী বীণার সুর কারও কানেই পৌঁছাত না। এঁরা গবেষণা করতেন জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়। দ্বিতীয় প্রয়োজন যতটুকু মিটত তা প্রায় উঞ্ছবৃত্তি করে। যখন অক্সফোর্ডে পড়ি তখন নরেনবাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পাই : "জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লেকচারার থেকে রিডার হয়েছি। মাইনে আটশো টাকা। যাক, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলাম, আর উঞ্ছবৃত্তি করে পরিবার পোষণ করতে হবে না।"

স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়তে গিয়ে যেসব পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্পর্শে আসি, তাঁদের মধ্যে নানা কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয় বহুভাষাবিদ পণ্ডিত সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক বিনয় সরকার। উনি কথায় এবং লেখায় অনেক সময় বিচিত্র ভাষা ব্যবহার করতেন। বাঙালির পাণ্ডিত্যে একটা গোমড়ামুখো দিক ছিল। মনে হয় ওঁর ভাষাশৈলীর ভিতর তাকে মুখ ভেঙানোর একটা প্রবণতা দেখা যেত। অধ্যাপক সরকারের শিষ্য হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের সংকলিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'-শীর্ষক বইয়ে ওই ভাষাশৈলীর বহু উদাহরণ আছে। উনি তরুণ সমাজকে আত্মপ্রকাশ এবং কিছুটা আত্মপ্রচার করতে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। বলতেন, "নো বডি উইল পিটাবে ইওর ঢাক আনলেস ইউ পিটাও ইট ইওরসেলফ।" যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৫ সনে ওঁরই উৎসাহে স্নাতকোত্তর বিভাগের তিন উজ্জ্বল রত্ন 'যুদ্ধ যখন থামবে' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেন। ভূমিকায় অধ্যাপক সরকার লেখেন, "বিশ বাইশ বছরের যুবক বাংলার মগজের চৌবাচ্চায় কী রকম ঘিলু কিলবিল করে?" অর্থাৎ সেই কিলবিলায়মান ঘিলুর চমৎকারিত্ব এই চটি বইটি পড়লে বোঝা যাবে। তাছাড়া সমাজতত্ত্ব পড়াতে গিয়ে উনি কিছু সমীকরণের আশ্রয় নিতেন। যথা শেক্সপিয়ার + কালিদাস = রবীন্দ্রনাথ; কার্ল মার্কস + জোনাথন সুইফট = বার্নার্ড শ' ইত্যাদি। ওঁর কিছু কিছু বক্তব্য উনি হাইকু মার্কা কবিতায় প্রকাশ করতেন। যথা "ক' বোতল মদ গিলে গো রঘুবংশম্ যায় লেখা?" "গ্রামগুলি নয় গুড় মাখানো, শহরটা নয় আঁস্তাকুড়।" বলতেন, "ওই শুধু ঘাসপাতা খেলে কি মানুষের মাথা খোলে? এক থাল ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে তবে মুনিঋষিরা উপনিষদ লিখতে বসতেন।" নীরদ চৌধুরীর মতো ওঁরও সম্ভবত বিশ্বাস ছিল যে, শাকাহারী হয়ে ভারতীয় প্রতিভার অনিষ্ট হয়েছে। দেশপ্রেমিক এই মানুষটি দেশপ্রেমের ভড়ং বরদাস্ত করতে পারতেন না। সে সময় ছাত্রদের এক বিকট উল্লাস ছিল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কালির বোতলগুলি দেওয়ালে ছুঁড়ে মারা। ফলে আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দেওয়ালগুলি কখনও মসীমুক্ত থাকত না। ওই কালিমাখা দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে অধ্যাপক প্রশ্ন করতেন, "তোরা তো সব সোসিওলজি পড়িস। বল দেখি এই সব কেন হয়?"

একটু থেমে নিজেই উত্তর জোগাতেন, "তাও জানিস না? ১৭৫৭! পলাশির যুদ্ধ! সকলই ইংরাজের দোষ! পরাধীনতার পরিণাম। এ কথা কখনও ভুলবি না! খুব সাবধানে থাকবি! আমরা যে অমানুষ, সে কথা যেন লোকে জানতে না পারে।" ওঁর বক্তৃতা শুনে দুটি ব্যাপারে চক্ষুরুন্মীলন হয়। প্রথম কথা, ইতিহাস এবং সমাজশাস্ত্রগুলির মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য গণ্ডি টানা অর্থহীন, কারণ এইসব বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পৃক্ত। দ্বিতীয়, ওয়েবার এবং ডুর্কহাইমের চিন্তা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় কতটা প্রাসঙ্গিক তাও ওঁর আলোচনা থেকেই প্রথম বুঝতে পারি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ে বিদ্যাবুদ্ধি কতটা এগিয়েছিল বলতে পারব না। কিন্তু ওই সময়ই মনস্থির করি যে, এম. এ. পাস করে মুঘল যুগের সামাজিক/অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করব। এ ব্যাপারে উৎসাহ দেন অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরী ওরফে মৌলানা মাখ্‌খনলাল। তাই আবার তোড়জোড় করে ফারসি পড়া শুরু করলাম, যদিও ওই প্রচেষ্টা কখনওই একেবারে ত্যাগ করিনি। চোদ্দো বছর বয়স থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত পঁয়ষট্টি বছর ধরে ওই ভাষা-সরস্বতীর প্রসাদ ভিক্ষা করছি। কিন্তু দেবীটি আমার প্রতি সদয় হননি। আগেই বলেছি, আমার বড় শখ ছিল অভিধানের সাহায্য ছাড়াই আরামকেদারায় বসে কখনও রুমি-হাফিজের রস গ্রহণ করতে পারব। কিন্তু আমার ফারসিজ্ঞান সেই পর্যায়ে কখনও পৌঁছায়নি। পেশার প্রয়োজনে এবং কিছুটা নিজের শখ মেটাতে দেশি-বিদেশি কয়েকটি ভাষা মোটামুটি রপ্ত করেছি—মানে পড়তে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার ফারসিজ্ঞান সেই পর্যায়ে কিছুতেই পৌঁছাল না। গবেষণার ক্ষেত্রে যে ক্রমে মুঘল যুগ ছেড়ে উনিশ শতকে চলে এলাম তার একটা কারণ এই ব্যর্থতা।

এবার ফারসি শেখার জন্য যাঁর ঘরে নাড়া বাঁধলাম তিনি বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। নাম আবদুল আলিম রাজি। 'রাজি' পৈতৃক সূত্রে পাওয়া নামের অংশ নয়, সাহিত্যিক হিসাবে ছদ্মনাম, নিজেরই দেওয়া। সে সাহিত্য বড় বিচিত্র। সে কথায় পরে আসছি। রাজি সাহেব ফরিদপুর অঞ্চলের এক পিরের ছেলে, মাদ্রাসায় পড়া আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বিরাট পণ্ডিত। কিন্তু সে পাণ্ডিত্যে উনি তৃপ্ত নন। ওঁর উচ্চাশা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাস করে লন্ডন গিয়ে ডক্টরেট নেবেন এবং ব্যারিস্টার হবেন। পিরের শিষ্যদের কাছে ওয়াজ করে টাকা তুলে এই উচ্চাশা উনি মিটিয়েছিলেন এবং শুনেছি পরে ঢাকায় প্র্যাকটিস করতেন। খবরটা শুনে ওঁর মক্কেলদের জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা হলেও, ওঁর কথা ভেবে খুশিই হয়েছিলাম। দুঃখের কথা শুধু এই যে, রাজি সাহেব ব্যারিস্টার বনায় বাঙালি সমাজ এক বিরাট প্রতিভাকে পণ্ডিত হিসাবে পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হল। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, উনি তখন স্নাতকোত্তর বিভাগে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র। কিন্তু ওঁর মনপ্রাণ তখন অন্যত্র বাঁধা পড়েছে। সাহিত্যসরস্বতী তখন পেত্নির মতো ওঁর স্কন্ধারূঢ়া। সেই সাহিত্যসাধনার রোমহর্ষক ফল একটি গভীর বিয়োগান্তক উপন্যাস—নাম 'আরাকানের পথে'। বিষয় বার্মা থেকে পলায়মান উদ্বাস্তুদের দুর্দশা। মূল্য আট আনা। যতদূর জানি এই

মহৎ সাহিত্য আমি ছাড়া আর কেউ পয়সা দিয়ে কেনেনি। গুরুদক্ষিণা হিসাবে আট আনা পয়সা আমি ব্যয় করেছিলাম—দু কাপ কফির দাম।

পয়সাটা অপব্যয় হয়নি। কারণ অন্য কোনও সাহিত্যকর্ম থেকে এরকম অনাবিল আনন্দ কখনও পাইনি। স্মৃতি থেকে এই মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনির শেষ পরিচ্ছেদের কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। নায়িকা আয়েষা (?) পথশ্রমে পিপাসায় মুমূর্ষু। তাঁর স্বামী ইমরান (?) বিধ্বস্ত, পরাজিত, নিরুপায়। "রুদ্ধ কণ্ঠে আয়েষা কহিল, 'পা-আ-আ-নি, পা-আ-আ-নি।' ইমরান কী করিবে? কোথায় পানি? পানি তো কোথাও নাই। নিরুপায় ইমরান মৃতপ্রায় পত্নীর মুখবিবরে তার জেহ্বা ঢুকাইয়া দিল। কিন্তু হায়, সে জেহ্বাও শুখা।" রাজি সাহেব প্রশ্ন করলেন, "বোঝলেন কেমন?" উত্তরে সত্যি কথাই বললাম, "এমন জিনিস বিশ্বসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই।" রাজি সাহেব করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুখে বললেন, "থ্যাংক ইউ। আমারও তাই ধারণা। এহন থিকা আর অন্য কাজে সময় নষ্ট করব না। জিন্দিগিটা সাহিত্যের সেবায়ই ব্যয় করব।" পাঠকদের সৌভাগ্য—এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শেষ অবধি বজায় থাকেনি। শুধু লাভের মধ্যে আমাকে ফারসি পড়ানো উনি বন্ধ করে দিলেন। সাহিত্যসেবায় নিবেদিতপ্রাণ বিরল প্রতিভার বাজে কাজে নষ্ট করার মতো সময় কোথায়? ফারসির মাধ্যমেই উনি ভাষাটা শেখাতেন, ফলে ভাষাজ্ঞানটা বেশ দ্রুতগতিতেই এগুচ্ছিল। গুরু মহত্তর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করায় শিক্ষাটা মাঝপথে ঠেকে রইল।

ফারসি শেখার চেষ্টায় গুলবদন বেগমের 'হুমায়ূন-নামা' মূল থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম—ইংরাজি অনুবাদের সাহায্য ছাড়াই। বাবরকন্যা ওই মহিলাটি সহজ সরল ভাষায় বইটি লিখেছিলেন। আবুল ফজলের মতো এক একটি বাক্য জড়িয়ে পেঁচিয়ে সাত-আট মাইল লম্বা না। অনুবাদটি ছাপাবার চেষ্টায় সজনী দাসের কাছে যাই। তার অল্পদিন আগে কোনও সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে উনি বরিশাল এসেছিলেন। সেই সূত্রে পরিচয়। লেখাটা উনি নিলেন এবং কিছুদিন পরে ফেরত দিলেন। মনে হয় না খুলে দেখেছিলেন। একটু দমে গেলাম। কবে যেন হস্তলিপিটি হারিয়েও গেল। কিন্তু এইভাবে সজনীবাবুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। মাঝে মাঝে উনি নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাতেন। আমার ধারণা ওঁর অনেক কবিতা বেশ উঁচু দরের। কিন্তু তার চেয়েও উঁচু দরের ছিল শত্রুপক্ষীয় সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ওঁর চোখা চোখা সব মন্তব্য। এঁদের কয়েক জনের বর্ণনা প্রসঙ্গে একদিন বললেন, "এরা কী জানো? এরা অতি অমায়িক খচ্চর।" বর্ণনাটি আমার বেশ রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে দেশে, বিশেষ করে আমার স্বজাতি বাঙালিদের মধ্যে, বেশ কিছু অমায়িক খচ্চরের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের দু-একটি এখনও পিছনে লেগে আছে। এরা অমায়িক হাসি হেসে হঠাৎ পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়, তারপর অত্যন্ত বিব্রত মুখে বলে, "আহা, লাগল নাকি!" আমার ধারণা এই প্রজাতির জন্ম ইংরাজ সংস্পর্শে। পারফিডিয়াস অ্যালবিয়নের জারজ সন্তান ন্যাকা-বজ্জাত ভারতীয়, বোকা বজ্জাতের অগ্রজ/অগ্রজা। বুদ্ধিমান বাঙালিদের মধ্যে প্রাণীটি সংখ্যায় কিছু বেশি। কিন্তু দেখবেন উনিশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যে এই প্রাণীর সাক্ষাৎ পাবেন না। হীরা মালিনী ন্যাকা না, ফিচেল ছেনাল।

স্নাতকোত্তর বিভাগে ক্লাস ফাঁকি দিতে শুরু করায় হাতে বেশ অফুরন্ত সময়। তার বেশ বড় একটা অংশ কাটে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় আমাদের কয়েক জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাদের নিয়েই আমাদের কফি হাউস চক্র গড়ে উঠল। গোষ্ঠীপতি হলেন আড্ডাবাজদের শিরোমণি অমল দত্ত, যে কিনা প্রেমও যূথবদ্ধভাবে করার পক্ষপাতী ছিল। অন্যান্য সভ্য অর্থনীতির হীরেন রায়, ইতিহাস বিভাগের অশোক, তরুণ ব্যানার্জি এবং আমি। অশোক এবং অমলের জীবনে প্রেমের আবির্ভাব ঘটায় তাঁদের ভাবী পত্নীরা অরুণা সেন আর পূর্ণিমা সেনও এই আড্ডাচক্রের সভ্যা হলেন। নারীসঙ্গে অনভ্যস্ত আমরা এই দুই তরুণীর আবির্ভাবে বেশ খুশি। আড্ডার রথ সবেগে ধাবমান হল।

কফি হাউসের আড্ডা নিছক এরন্ড-ভর্জনের রসুইখানা ছিল এ কথা ভাবলে ভুল হবে। শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি খুব পিছিয়ে ছিল না। রাজনীতি থেকে ফুটবল পর্যন্ত পৃথিবীতে যা-কিছু আলোচ্য বিষয় আছে তার সব কিছুরই ওখানে বিদগ্ধ বিশ্লেষণ হত। অমল তখন নিত্যনতুন গুরু আবিষ্কারে ব্যস্ত—যথা বারট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ', অলডাস হাক্সলি ইত্যাদি। ওর সুবাদে আমাদেরও এইসব গুরুবাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভারতীয় রাজনীতির তাপমান তখন আবার বাড়তে শুরু করেছে। তার গতিপ্রকৃতি অশোক যা বিশ্লেষণ করত, কোনও পত্রপত্রিকায় তার তুলনীয় কিছু পাওয়া যেত না। সবাই তখন পাল্লা দিয়ে অনেক কিছু পড়ে ফেলতে ব্যস্ত। ফলে কফি হাউসের আড্ডা জ্ঞানান্বেষণের প্রতিপন্থী ছিল না। মাঝে মাঝে অম্লানদা (অম্লান দত্ত) এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

১৯৪৬ সালে কফি হাউসের আড্ডায় নতুন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল। ধূর্জটিপ্রসাদের পুত্র কুমার বার্ড কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসে আমাদের আড্ডায় যোগ দিল। কিন্তু সত্যিতেই সে তো আগমন নয়, আবির্ভাব। নাতিদীর্ঘ সুপুরুষ মানুষটির পরনে ভাল দর্জির কাটা দামি স্যুট, হাতে সম্ভবত তার চেয়েও দামি সিগারেটের টিন, চলাফেরা এক ফিয়াট (?) গাড়িতে। আমাদের বয়সি কোনও মানুষ নিজের গাড়ি চালিয়ে চলাফেরা করছে, এ ব্যাপারটা বুঝতে এবং হজম করতে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তার চেয়েও ভয়ানক—সমাজশাস্ত্র থেকে সব থানথান কথা কুমার আলগোছে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানে ধরা ক্রিকেট বিষয়ক বই কফির টেবিলে অবহেলায় ফেলে দিয়ে ও যখন আমাদের আড্ডায় এসে বসত, হীনম্মন্যতায় আমরা কেঁচো বনে যেতাম। আমরা সব প্রেসিডেন্সি কলেজের ডাকসাইটে ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও ভারতবর্ষে পয়লা নম্বর (অন্তত আমাদের তাই ধারণা)। কোথাকার কোন লখনউ থেকে এই লোকটি এসে আমাদের কিনা টিট করে দিল! ওকে সহ্য করা গেল মুখ্যত এক কারণে— ওর অফুরন্ত কৌতুকবোধ, যা থেকে ও নিজেকেও রেহাই দিত না। ওর বাল্যকাল সম্পর্কে ওর কাছেই শোনা একটা গল্প বলি। অশোক মিত্র (আই.সি.এস) ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সিঁড়ির উপর গোলমুখ এক বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ—বয়স আট-নয় হবে। অশোকবাবু বললেন, "কী খবর কুমার? কী করছ আজকাল? কিছু লিখছ-টিকছ?" উত্তর, "না, তেমন কিছু না। এই দু-চারটে হালকা প্রবন্ধ, কিছু ছোট

গল্প, গদ্য কবিতা দু-একটা—এই আর কী!" ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে উত্তরটা অন্তত পঞ্চাশ ভাগ সত্যি হয়েছে। সব আপ্তবাক্য এতটা নির্বিষ ছিল না। কোনও বিবাহসভায় এক পিতৃবন্ধু হঠাৎ স্মৃতিচারণে রত হলেন, "এই যে কুমার! সে কতকালের কথা! সেই তোমার বাবার বিয়ের সময়..." কথা শেষ করতে না দিয়ে কুমারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তখন আমি খুবই ছোট ছিলাম।" এরপর বাক্যালাপ আর বেশি এগোয়নি। ওর ভাবটা ছিল এই যে, বর্বরায়মান কলকাতা শহরে বাস করা আর সম্ভব হচ্ছে না। সভ্যতার অপস্রিয়মাণ অঞ্চল আশ্রয় করে কোনও মতে সে বেঁচে রয়েছে। কিন্তু বড়ই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। কফি হাউসের দেওয়াল ঘেঁষে কপালের রগ টিপে বসে থাকত। ভাবটা— "আর সহ্য হয় না। মা তারা, এই সর্বব্যাপী বর্বরতা থেকে উদ্ধার করো মা।" আমাদের এক নব-অনুরাগী কিঞ্চিৎ পশ্চিমায়িত এক সহপাঠী তার স্বভাবসিদ্ধ ইংরিজিঘেঁষা বাংলা উচ্চারণে কুমারকে ঘাঁটাতে গিয়েছিল : "কী কুমার, আই সে, ইউ লুক রাদার ডিপ্রেসড!" উত্তর, "কী করা যাবে! সবাইর তো তোমার মতো বাঁধা '—' নেই।" এরপর প্রেমিক পুরুষটি বেশ কিছুদিন কুমারের সঙ্গে কথা বলেনি।

এই সময় দিয়ে আমাদের গোষ্ঠীজীবনে এক নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ে। সেই ঘটনার প্রতিধ্বনি প্রায় ষাট বছর পরেও মাঝে মাঝে কানে আসে। প্রতিধ্বনি নয়, বিকৃত প্রতিধ্বনি। সেই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান কুশীলবরা কেউ বেঁচে নেই। তাঁদের সন্তান-সন্ততি এখন প্রাপ্তবয়স্ক, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। আশা করি তারা অপরাধ নেবে না।

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে প্রথম বিবাহ করেন শম্ভু নন্দ। ওদের নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের ছাদে এই উপলক্ষে চায়ের পার্টি হয়। সেখানেই অমল প্রস্তাব করল, নব দম্পতিকে একদিন চাং ওয়ায় খাওয়ানো যাক। এসব ব্যাপারে ও ছিল অত্যন্ত কর্মতৎপর। ব্যাপারটা 'আচ্ছা দেখা যাবে' বলে ফেলে রাখায় মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। তাই পার্টি শেষ হতেই আমাদের কফি হাউসের আড্ডাগোষ্ঠীকে নিয়ে হেদোর পাড়ে এক বেঞ্চিতে মিটিং বসাল। আলোচ্য বিষয়— কী খাওয়ানো হবে এবং তা কবে। সবাই অল্পবিস্তর উৎসাহী। এক তরুণ ব্যানার্জি বারবারই বলছিল পরিকল্পনা থেকে ওকে বাদ দিতে। ওর মনমেজাজ ভাল নেই, নানা সমস্যার ভিতর রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এত সহজে ছাড়ার পাত্র অমল নয়। ফলে শেষ অবধি তরুণও নিমরাজি হল, তখনকার মতো সভা ভঙ্গ।

পরদিন সকালবেলা হিন্দু হোস্টেল থেকে আমাদের চেনা একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল—তরুণ আত্মহত্যা করেছে। হিন্দু হোস্টেলে গিয়ে দেখি, হোস্টেলের বাইরে একটি দড়ির খাটিয়ায় তরুণের শরীরটি শোয়ানো। চারিদিকে পুলিশ। এক অতি উৎসাহী ইনস্পেক্টার সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তার বক্তব্য—ব্যাপারটা জটিল এবং প্রেমঘটিত। কোনও ব্যক্তি নিজের স্বার্থে তরুণকে আত্মহত্যায় মদত দিয়েছে। সে ব্যক্তির হাতে হাতকড়া পরাতে ইনস্পেক্টর বদ্ধপরিকর। তার শুভ চেষ্টা সফল হয়নি।

কিন্তু পরদিন কলেজে গিয়ে দেখি চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। ওয়াকিবহাল মহলরা নাকি সবই জানতেন, অনেকদিন থেকেই তাঁরা এরকম কিছু ঘটবে আশঙ্কা করছিলেন। নেহাত পরের ব্যাপারে তাঁরা নাক গোঁজা পছন্দ করেন না, তাই এতদিন চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এখন, সম্ভবত ধর্মের খাতিরে, নাক গোঁজার ব্যাপারে তাঁদের কোনও অনীহা দেখা গেল

না। এঁদের বক্তব্য—অমলের বাগদত্তা অরুণা আসলে অতি ঘোড়েল মেয়ে। যুগপৎ দু'জনের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছিল। শেষ অবধি অনেক হিসেব-নিকেশ করে অমলকেই মাল্যদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই আত্মহত্যা। সহজ সমস্যা, সরল সমাধান।

ক্লাসের অনেক মেয়ে এই গর্হিত ব্যবহারের জন্য অরুণার সঙ্গে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিল। তাঁদের মতো সব সুযোগ্যা নায়িকা থাকতে তরুণ ওই বিশ্রী মেয়েটার প্রেমে পড়তে গেল? কী আর এমন দেখতে অরুণা! (পাঠিকা/পাঠক বঙ্কিমরচিত আয়েষার বর্ণনা স্মরণ করুন: "পাঠিকা স্মরণ করুন, যাহাকে দেখিয়া বলিয়াছেন 'এমন আর কি দেখিতে,' ") কিছু লোক এমন দৃষ্টিতে অমলের দিকে তাকাত যেন সে বন্ধুহত্যা করেছে।

বহুদিন আগের এই ঘটনার সত্যিকার কারণ যতটা বুঝেছিলাম তা লেখা প্রয়োজন মনে করি। শোকের মুহূর্তে তরুণের বাবা বলেছিলেন, ওঁদের পরিবারে আত্মহত্যার চেষ্টা এই প্রথম নয়। যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি, তখন একবার তরুণের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন আমাকে আন্ডার কারেন্টে টেনে নিয়ে যায়, নুলিয়ারা কোনও মতে আমাকে উদ্ধার করে। তরুণকে বলেছিলাম, যখন ঘটনাটা ঘটে তখন ভয়ে আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তরুণ অবাক হয়ে বলল, "কেন? আমার এরকম কিছু হলে আমি তো খুশিই হতাম।" বুঝতে পেরেছিলাম যে ও ছেলেমানুষি বাহাদুরি করছে না, কথাটা মনের থেকেই বলছে। কেন, তার কারণ জানতে পারিনি। বি.এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে ও ভীষণ মুষড়ে পড়ে। তখনও বিদেশি রাজত্ব, চাকরি-বাকরির বাজার খুব খারাপ। ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ার অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই শেষ অবধি কেরানিগিরি করে জীবিকা অর্জন। সুতরাং মুষড়ে পড়াটা কিছু আশ্চর্য না। মনের যখন এই অবস্থা তখন ওর অরুণার সঙ্গে পরিচয় হয়, অমলের বাগদত্তা হিসাবেই, এবং আমাদেরই কফি হাউসের আড্ডায়। তার বাইরে অরুণার সঙ্গে ওর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু ও যে অরুণার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অমল ওর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। তাই ওর সম্পূর্ণ নির্দোষ ভালবাসা ওর মনে এক গভীর অপরাধবোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারই শেষ পরিণাম ওই আত্মহত্যা।

মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, আত্মহত্যা সাধারণত কোনও বিশেষ কারণে হয় না। হয় মানসিক একটা প্রবণতা থেকে, অনেক সময়ই যা বংশানুক্রমিক। ঘটনাবিশেষ সে প্রবণতাকে উসকে দিতে পারে। গভীর ডিপ্রেশনের সময়ে অরুণার সঙ্গে ওর পরিচয়। এবং ওর নীতিবোধ অনুযায়ী ওর নির্দোষ ভালবাসা নিজের চোখেই পাপ মনে হয়েছে। এই কল্পিত পাপের জন্য অমলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ও একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল। কিন্তু নীতিবাগীশদের রোষ তাতে প্রশমিত হয়নি। যখন অরুণার প্রথম সন্তানটি ক্যানসারে মারা গেল এবং অরুণার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল, তখন এমন কথাও শুনেছি যে মেয়েটা শেষ অবধি তার পাওনা শাস্তি পেল। আমাদের সমাজে নীতিবোধের এই বিচিত্র প্রকাশ নিজের জীবনেও ভুগতে হয়েছে। গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের রাজনীতি আর বিদেশি শাসনে জীবনের সব ক্ষেত্রেই গভীর নিরাশা মিলিয়ে আমাদের সমাজজীবনে কিছু বিকৃতি সৃষ্টি করেছিল। আমার ধারণা যে-ধরনের বিকৃত মানসিকতার কথা লিখলাম তা সেই ব্যাপকতর সামাজিক মনোবিকলনেরই বহিঃপ্রকাশ।

স্নাতকোত্তর বিভাগে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে এক ব্যাপারে বিশেষ পার্থক্য দেখলাম। কলেজে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছাত্রর সংখ্যা অনুপাতে কম ছিল। পড়াশুনো, ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়েই প্রায় সবাই ব্যস্ত। এখানে দেখলাম অনেকেই সক্রিয়ভাবে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। জেলখাটা লোকের সংখ্যা কম নয়। আন্দামান ফেরতও দু-একজন আছেন। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা আট আর ছয়ে চোদ্দোয় না পৌঁছালেও ষেটের কৃপায় একেবারে নগণ্য না। যুব কংগ্রেস রীতিমতো শক্তিশালী। ছাত্র মুসলিম লিগ অত্যন্ত সক্রিয় এবং শেষোক্ত দলের ভিতরেও ডান-বাঁর রেষারেষি লক্ষণীয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে-নির্বাচন হল তাতে এইসব ছাত্রকর্মী এবং নেতারা রীতিমতো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। '৪৫ সালে দেশনেতারা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। শোনা গেল ইংরাজ শাসক সমঝোতার চেষ্টায় আছেন, হয়তো ক্ষমতা হস্তান্তরও অসম্ভব না। কিন্তু একটা কিছু যে শিগগিরই ঘটবে এবং তাতে আমাদের ছাত্রদের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকবে সে বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় ছিল না।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় এলেন। দেশপ্রিয় পার্কের সভায় ওঁর কথা শুনতে কয়েক লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল। কিন্তু মাইক্রোফোন কাজ না করায় একটি কথাও শোনা গেল না। আমরা শুধু অনেক দূর থেকে দেখলাম—পণ্ডিতজি অত্যন্ত চটে গিয়ে ওঁর পাশের লোকদের খুব বকাবকি করছেন। পরদিন কাগজে ওঁর বিবৃতি পড়লাম। উনি দেশের লোককে আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন। পরে মৌলানা আজাদের আত্মচরিতেও দেখি, যুদ্ধের শেষে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করেননি যে, ইংরাজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কথা সত্যিতেই চিন্তা করছে।

'৪৬ সালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নতুন মোড় নিল। যুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু উড়ো কথা মাঝে মাঝে কানে এসেছে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটছিল সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। শুধু মনে পড়ে একদিন কিরণশঙ্করবাবুর বসবার ঘরে আমরা ক'জন বসেছিলাম। এমন সময় খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছ থেকে ফোন এল, "রেডিওটা খুলুন, সুভাষ বলছেন।" বক্তৃতাটা সিঙ্গাপুর থেকে প্রচার হচ্ছিল। এর বেশি কিছু বোঝা গেল না। আসলে ওয়াকিবহাল মহলে অনেকেই আই.এন.এ-র খবর রাখতেন। কিন্তু এ নিয়ে কাউকে কখনও কিছু আলোচনা করতে শুনিনি। তাই আই.এন.এ-র নেতৃবৃন্দর বন্দিদশা এবং বিচারের খবর হঠাৎ একটা বোমা ফাটার মতো আমাদের রাজনৈতিক চেতনা উচ্চকিত করল। ঠিক তার আগেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পরেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়েছে। তা নিয়ে সর্বত্রই প্রচণ্ড জল্পনাকল্পনা। অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করেনি। আর বৌবাজারের মোড়ে কাগজবিক্রেতারা রোজই চেঁচাচ্ছে, "নেতাজি আ গিয়া, নেতাজি আ গিয়া।" সেই আওয়াজ অল্প কিছুদিন আগেও শুনেছি। প্রসঙ্গত বলি, ওই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয় এ কথা অবিশ্বাস করার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রচারিত ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে ভাইসরয়ের স্বরাজ্যসচিব ওঁর কর্মসমিতির বিবেচনার জন্য একটি সুদীর্ঘ গোপন মন্তব্য লেখেন। সেই মন্তব্যটি পরে ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে 'ট্র্যান্সফার অফ পাওয়ার ইন

ইন্ডিয়া'-শীর্ষক বহু খণ্ডে প্রকাশিত দলিলসংগ্রহে ছাপা হয়েছে। মন্তব্যটির প্রধান আলোচ্য—নেতাজিকে নিয়ে কী করা হবে। কিন্তু এই প্রামাণ্য দলিলটির কোথাও, উনি যে জীবিত নেই বা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে একটা গুজব উঠেছে, এরকম কোনও কথার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই। একাধিক তদন্ত কমিশন চূড়ান্ত মত দিয়েছে যে ওই দুর্ঘটনায়ই নেতাজির মৃত্যু হয়। তা হলে ওই দলিলটির কী ব্যাখ্যা হয় সে বিষয়ে কিন্তু সবাই নিশ্চুপ। নেতাজির জীবনীলেখক, যুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগের গোয়েন্দা আমার বন্ধু কর্নেল হিউ টয়কে আমি এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, তখন গোলমালের সময়। সব খবর সকলের কাছে ঠিকমতো পৌঁছাত না। তাই স্বরাজ্যসচিব ভুলভাল সব লিখেছেন। এ কথা আমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। নেতাজির মৃত্যুসংক্রান্ত গুজব নিয়ে দেশ তখন তোলপাড়। কিন্তু সে গুজব স্বরাজ্যসচিবের কানেও পৌঁছয়নি—অথচ তিনি যেভাবে লিখছেন তাতে নিঃসন্দেহে মনে হয় নেতাজি কোথায় তা তাঁর ভালই জানা আছে—এমন অসঙ্গতিপূর্ণ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব না। এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। নেতাজি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কোথায় বা কত দিন বেঁচে ছিলেন সে সম্বন্ধে আমার কোনও মতামত নেই, কারণ এ ব্যাপারটা অনেকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন, আমি তাঁদের একজন নই। শুধু ওই বিমান দুর্ঘটনায় ওঁর মৃত্যুর কাহিনিটা কেন সত্যি হতে পারে না, তার কারণ আমি ব্যাখ্যা করলাম। এ নিয়ে আর কোনও তর্ক-বিতর্কে জড়াবার ইচ্ছে বা একতিয়ার আমার নেই, সে কথা ছাপার অক্ষরে কবুল করাও দরকার মনে করলাম। কারণ এ সব ব্যাপারে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

আই. এন. এ-র যুদ্ধপ্রচেষ্টার সংবাদ দেশে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বিদেশি শাসনের প্রতি পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ কতটা তীব্র এবং সর্বব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যুদ্ধের গোড়া থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল। রেডিওতে অক্ষশক্তির বিজয়সংবাদ শুনে জনসাধারণ কী পরিমাণ উল্লসিত হত, সে যে না দেখেছে তাকে বোঝানো সম্ভব না। ইংরাজ শাসকের প্রতি সাধারণের বিতৃষ্ণা অক্ষশক্তির প্রতি এক নির্বোধ আকর্ষণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার এক পুলিশ কমিশনার তাঁর গোপন রিপোর্টে লেখেন যে, জাপানিরা কলকাতায় এলে নিউ মার্কেটের ফুলের দোকান সব লুট হয়ে যাবে। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে মহাত্মার অহিংস রাজনীতি কখনওই পূর্ণ সমর্থন পায়নি। সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী অগ্নিযুগের দাদারা সকলের চোখেই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্র—দু'জনের সঙ্গেই বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, এ কথা এখন সর্বজনবিদিত। যুক্ত বঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম প্রধান সমর্থক 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স', এক সময় যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়েছিলেন তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে সুভাষচন্দ্র বহিষ্কৃত হওয়ার পর তাঁর নীতি এবং ব্যক্তিত্বও ভারতবর্ষের সর্বত্রই বহু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীর এবং জনগণের সমর্থন পায়। সেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতীয় যোদ্ধারা সংগঠিতভাবে অস্ত্রধারণ করেছে, এই সংবাদ যেন অসংখ্য ভারতবাসীর অনেক দিনের গোপন ইচ্ছা পরোক্ষভাবে পূরণ করল। আই. এন. এ-র নেতৃবৃন্দকে লাল কেল্লায় বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে বিচার করা হবে আর সে বিচার করবে বিদেশি সরকার, এই সংবাদ জনগণের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। যাঁরা এক

সময় নেতাজির বিরোধিতা করেছিলেন, জাপানিদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার নিন্দা করেছিলেন, তাঁরাও এখন আই. এন. এ-র সমর্থনে সোচ্চার হলেন। পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং তাঁর বহুদিনের পরিত্যক্ত ব্যারিস্টারি গাউন আবার গায়ে চড়িয়ে লাল কেল্লার ক্যাঙ্গারু আদালতে হাজির হলেন। আগস্ট আন্দোলনের সময়ও অন্তত যুক্ত বঙ্গে এত উত্তেজনা দেখা যায়নি। কলকাতার যুবসমাজ, বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উত্তেজনা এক নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তখন শাসকরা এক দিকে আই. এন. এ. বন্দিদের বিচারের ব্যবস্থা করছে, অন্য দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলাপ-আলোচনারও উদ্যোগ চলছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোঝা দরকার, যে কথা পরবর্তী গবেষণার ফলে জানা গেছে এবং যা '৪৬-'৪৭ সনে সম্ভবত পাক-ভারতীয় নেতাদের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে— "নশো মুসো খাকে বিল্লি হজকো চলি"। অর্থাৎ নশো ইঁদুর খেয়ে বিড়াল হজে চললেন। বিড়ালতপস্বী সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ ক্ষমতা হস্তান্তর বলতে সত্যি কী ভেবেছিল তা শুধু অল্প ক'জন কর্তাব্যক্তিই জানতেন। ওঁদের ভরসা ছিল যে, বাবা-বাছা করে পিঠে হাত বুলিয়ে ভারতীয় নেতাদের দেশটাকে ডোমিনিয়ন থাকতে রাজি করানো যাবে। তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু তাদের আরও ভরসা ছিল যে স্বাধীন ভারত তার অনভিজ্ঞতার কারণে নিজের স্বার্থেই ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় শামিল হবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ভারতবর্ষে ইংরাজের বাণিজ্যগত স্বার্থ এবং মূলধন নিয়োগের ব্যাপারেও কোনও রদবদল হবে না। ত্রিশের দশকে এক আদর্শবাদী তরুণ পেন্ডেরেল মুন আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করে ইন্ডিয়া অফিসের বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে যান। ভারতবাসীদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে উনি যা চিন্তা করেছিলেন সেসব বড় কর্তাদের কাছে নিবেদন করেন। কিছুক্ষণ শোনার পর ওঁরা যা বললেন তার মর্ম এই : "দেখ বাছা, ভারতবাসীদের গণতন্ত্র শেখানোর জন্য আমরা ওখানে বসে নেই। ও দেশে আমাদের হাজার কোটি পাউন্ড বিনিয়োগ আছে। আমাদের কাজ তার রক্ষণাবেক্ষণ।" আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ঝুনো আই.সি.এস. অফিসার লর্ড হেইলি প্রস্তাব করেছিলেন—নরমপন্থী নেতাদের ডেকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিয়ে দাও। শুধু খেয়াল রেখো, আমাদের অর্থনৈতিক আর সামরিক স্বার্থ যেন বজায় থাকে। '৪৫-'৪৬-এর ইঙ্গ-ভারতীয় আলাপ-আলোচনার পিছনেও যে এই জাতীয় চিন্তা কাজ করছিল এখন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে যা অর্থহীন মনে হয়— মানে ইংরাজ কেন এক দিকে পাততাড়ি গোটাতে ব্যস্ত অথচ একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক ভারতীয় সৈন্যদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছে—আসলে তা মোটেই অর্থহীন ছিল না। ভবিষ্যতে যদি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ইংরাজের তাঁবে রাখতে হয়, তবে ইংরাজবিরোধী ভারতীয় সৈন্যদের বরদাস্ত করা চলবে না। ইংরাজের তৈরি ওই বাহিনী যাতে অটুট থেকে ইংরাজের স্বার্থরক্ষার কাজে লাগে এ নিয়ে ইংলন্ডে ফৌজি বড়কর্তাদের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবং সেই কারণেই তাঁরা নাটকের শেষ অঙ্কে ভারতবিভাগ বন্ধ করার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে খেলাটা তাঁদের হাতের বাইরে চলে গেছে। ভারতবর্ষে শেষ অবধি আই.এন.এ. নেতৃবৃন্দের বিচারের

প্রহসন থেকে সরকার বাহাদুর যে পিছিয়ে এলেন তার কারণ দুটি। প্রথম কথা, তাঁরা দেখলেন এই বিচারপ্রচেষ্টায় সৈন্যদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ নিয়ে দেশব্যাপী প্রতিরোধের আশঙ্কা ওঁরা আদৌ করেননি। অল্প কিছু দুর্বৃত্ত বাদ দিলে ভারতবাসী যে মনেপ্রাণে ইংরাজ শাসনের অনুরাগী এই অন্ধ বিশ্বাস বহু ইংরাজেরই শেষ অবধি বজায় ছিল এবং এখনও আছে। কর্তৃমহলের ভারতবর্ষকে ইংরাজের অঞ্চলাশ্রয়ী করে রাখার ইচ্ছা যে পূর্ণ হয়নি, তার কারণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাজনীতির চেহারা আশাতীতভাবে বদলে যায়। ফলে ব্রিটেনের ডোমিনিয়নগুলি তার পক্ষপুটে থাকবে এ আশাও পূর্ণ হল না। যুদ্ধোত্তর জগতে ব্রিটেন বৃহৎ শক্তি ঠিকই, কিন্তু আমেরিকা আর সোভিয়েট রাশিয়া, ওই দুই মহাশক্তির ছায়ায় তার ক্ষমতা কিছুটা ম্লান। নতুন স্বাধীনতা পেয়ে ব্রিটেনের অধীনস্থ দেশগুলি সত্যিতেই স্বাধীন হল। দরিদ্র জনগণের ভাগ্যে যাই জুটুক, এই নবলব্ধ আজাদি ঝুটা হয়ে দাঁড়ায়নি। এই সত্য উপলব্ধি করতে ইংরাজদের বেশ কিছু সময় লেগেছিল। নেহরুর নিরপেক্ষতা নীতি তাদের হিসাবের ভিতরে ছিল না।

কলকাতায় প্রগতিবাদী ছাত্রদের মধ্যে যুদ্ধের পর স্পষ্ট কোনও কর্মসূচির জন্য তীব্র আগ্রহ দেখা যায়। ভারতবর্ষের যুবসমাজ স্বাধীনতালাভের জন্য আর অনন্তকাল অপেক্ষা করতে রাজি নয়, নানা ঘটনা আর রাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনার ভিতর দিয়ে সে কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দ্বিতীয় কথা, গাঁধীজির কারামুক্তির পর জিন্না সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রাজনীতির সব মহলেই এক গভীর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বিরোধ কী ভয়াবহ রূপ নেবে তখনও কেউ তা কল্পনা করেনি ঠিকই, কিন্তু পাকিস্তানের দাবি যে শেষ অবধি ভারত সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করবে, আগস্ট '৪৬-এর আগে এ কথাও অধিকাংশ ভারতবাসীর কল্পনায় আসেনি। পাকিস্তান দাবির সত্যিকার স্বরূপ কী তা নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা প্রায় শেষ অবধি ছিল। দুই পরস্পরবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের প্রস্তাব অনেকদিন পর্যন্ত দুই মুসলমানপ্রধান প্রদেশ—অর্থাৎ যুক্তবঙ্গ এবং পঞ্জাবের নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তো কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা চালু ছিল। বেলুচিস্তানেও পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়নি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে ক্রমেই বাড়ছে, সে কথা কারও কাছে অস্পষ্ট ছিল না।

যুক্তবঙ্গ সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে সত্যি। সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই কথা বোঝার জন্য আমরা যারা সেই সময় সাবালক হয়েছি তাদের গবেষণার আশ্রয় নিতে হয় না। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যেভাবে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করা হত, তা সাম্প্রতিক কালের সঙ্ঘ পরিবারের ভাষার থেকে খুব কিছু আলাদা নয়। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের অবস্থা অবশ্যি তখন খুবই সঙ্গিন। একেই বিদেশি শাসনের আওতায় চাকরি-বাকরির সম্ভাবনা কম, তার উপর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চাকরি মুসলমানরা পাবে এই নিয়ম হওয়ায় হিন্দুদের যুক্তবাংলায় চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ এই নিয়ম যখন চালু হল, তখন

প্রায় নব্বই ভাগ চাকরি হিন্দুদের হাতে। আনুপাতিক সংখ্যাটা নব্বই থেকে পঞ্চাশে নামাতে হলে কার্যত হিন্দুদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করতে হয়। সরকারি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানে নতুন নীতির ফল প্রায় তাই-ই দাঁড়িয়েছিল। সরকারি কলেজে মুসলমান ছাত্রদের নামের পাশে ইংরাজিতে 'এম' অক্ষরটি লেখা থাকত, আর তপশিলভুক্ত বা শিডিউলড কাস্ট ছাত্রদের নামের পাশে লেখা থাকত 'এস'। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম আমাদের নামের পাশে 'ও' অর্থাৎ অপ্রেসড লেখা থাকা উচিত। প্রায় সম্পূর্ণভাবে চাকরিনির্ভর বাঙালি হিন্দুর সত্যিতেই মরণদশা ঘটেছিল। ওই অবস্থায় আমরা যে সবাই মুসলমানবিদ্বেষী হয়ে উঠিনি তাতে প্রমাণ হয় যে, জাতীয়তাবাদ আমাদের চেতনায় কিছু সুবুদ্ধির বীজ বপন করতে পেরেছিল। দোষটা যে মুসলমানের না, বিদেশি শাসনের, সে কথা মনে রাখা তখন কোনও অর্থেই সহজ ছিল না। পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়েও দীর্ঘদিন বেকার থাকার সম্ভাবনা বিভীষিকার মতো বাঙালি হিন্দুর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকত। আর যারা সাধারণ ছাত্র, খুব শক্ত খুঁটির জোর না থাকলে তাদের চাকরি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ফলে অনেকেই ভাবত যে, মুসলমান আর ইংরেজ যোগসাজসে হিন্দুর মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে। আর হিন্দু জমিদার এবং কুসীদজীবী যে তাদের মুখের ভাত কাড়ছে, বর্ধিষ্ণু কৃষক সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা নতুন মুসলমান মধ্যবিত্তের এ তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কংগ্রেস জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি রাখে, সেই কংগ্রেসই যে কৃষক এবং অধমর্ণের অত্যন্ত ন্যায্য দাবির সমর্থনে আইন পাস করতে রাজি হয়নি, সে কথাই বা তারা ভোলে কী করে? কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী পত্রিকা যেভাবে মুসলমানদের রাজনীতি নিয়ে বিদ্রূপ করত, তাতে শিক্ষিত মুসলমানের ক্ষিপ্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য ছিল না। এরকম একটি পত্রিকা সম্বন্ধে ফজলুল হক সাহেব একদিন মন্তব্য করেছিলেন, "দ্যাখ, আমি হিন্দুবিদ্বেষী, ছালান্নিয়া পাডা [বরিশালবাসী হিসাবে এই শব্দসমষ্টির জন্য আমি বিশেষ গর্ব বোধ করি। এমন অর্থবহ বর্ণনা বাংলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই। ছালান পাঁঠা হচ্ছে যাকে ইংরেজিতে বলবে এসেন্স অফ পাঁঠা, মানে যার নির্বুদ্ধিতায় কোনও ভেজালের স্পর্শ পড়েনি। এরকম মানুষ দু-চারটি দেখিনি এমন নয়। এরা না থাকলে আমাদের জীবন অত্যন্ত বর্ণহীন হয়ে যেত।] ছাড়া এ কথা কেউ কইবে না। কিন্তু সকালে উড্ডিয়া ওই কাগজখান পড়লে আমারও ইচ্ছা করে হিন্দুগো মুন্ডু চিবাইতে।" ওই পত্রিকার এক পূজা সংখ্যায় 'ছহি হকনামা' বলে একটি রসরচনা বের হয়েছিল। সেটি পড়ে সমস্ত শিক্ষিত মুসলমান যদি ক্ষেপে উঠে থাকেন তো বলার কিছু নেই। মোট কথা যার চোখ আছে সেই দেখতে পাচ্ছিল যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাঙালিকে এক অজানা সর্বনাশের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই অশুভ সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা ছাত্ররা বিশেষ সচেতন ছিলাম।

আই. এন. এ.-কে ঘিরে উত্তেজনা আমাদের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার পথ দেখাল। জাতীয় ফৌজে নেতাজির অন্যতর অবদান জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করা। যুবনেতারা দেখলেন ওই আদর্শে এক সত্যিকার জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। এ ব্যাপারে বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলন, বিশেষ করে ছাত্র ফেডারেশন যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। '৪৫-এর নভেম্বরে

আই. এন. এ. দিবস পালন করা হয়। '৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'রশিদ আলি দিবস' পালনের ডাক এল। আই. এন. এ. নেতা রশিদ আলির তখন সাত বছর কারাবাসের হুকুম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রথম সভা হবে তারপর বন্দিদের মুক্তি দাবি করে যেসব প্রস্তাব পাস হবে তা নিয়ে ডালহাউসি স্কোয়ারে শোভাযাত্রা করে গিয়ে, আমাদেরই নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে তার প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হবে। এর মধ্যে সর্বদলীয় ঐক্যের সম্ভাবনা আমরা দেখেছিলাম, কিন্তু সংঘাতের সম্ভাবনা কেউই দেখেনি। কারণ আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভার তখন প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের হাতে না। এবং তখন আই. এন. এ-র প্রতি অন্তত মৌখিক আনুগত্যে কোনও রাজনৈতিক দলই পিছ-পা না।

নভেম্বর মাসে আই. এন. এ. দিবসে কয়েক হাজার ছাত্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমা হয়েছিল। সেখান থেকে মিছিল বের হয়ে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই ডালহাউসি স্কোয়ারের দিকে এগুচ্ছিল। কিন্তু ধর্মতলা স্ট্রিটে পুলিশ শোভাযাত্রাকে বাধা দিল। কারণ ডালহাউসি স্কোয়ার নিষিদ্ধ অঞ্চল। সেখানে যাওয়া চলবে না। শোভাযাত্রীরা রাস্তার ওপর বসে পড়ে। পুলিশ শোভাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ দেয়। সে কথায় কেউ কর্ণপাত না করায় গুলি চলে। বেশ কয়েকটি ছেলে খুনজখম হয়। এদের কেউই শহিদ হওয়ার জন্য ওখানে এসেছিল মনে হয় না। প্রথম যে ছেলেটি মারা পড়ে, তার নাম রামেশ্বর। তার পকেটে পরবর্তী শোয়ে মেট্রো সিনেমার একটি টিকিট পাওয়া যায়। বেচারার নিতান্তই অপঘাত মৃত্যু ঘটে, কারণ মনে হয় না ও মিছিলে যোগ দিতে এসেছিল। কিন্তু ওই দিনকার প্রতিবাদ এক কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ গুলি চলার পরও ছেলেমেয়েরা পালায়নি। রাস্তার উপরই বসেছিল। বেশ অনেক রাত অবধি পুলিশ আর শোভাযাত্রীরা মুখোমুখি বসে থাকে। পুলিশও আর দ্বিতীয়বার গুলি চালায়নি। সত্যিকার বিপ্লব চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু তার পরের ক'দিনের ঘটনায় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কাকে বলে তার কিছু আঁচ পেয়েছিলাম। উপরি উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যৌথভাবে সভা, মিছিল এবং ডালহাউসি অভিযানের আহ্বান হল। এদিন ধর্মতলার সভায় যুক্ত বঙ্গের দূর দূর অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে ছাত্র কলকাতা শহরে উপস্থিত হয়েছিল। এবারকার প্রতিবাদ ছেলেখেলা না, মনে মনে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে নামা। এসব সময় মিছিলে কত লোক শামিল হয়েছিল তার সঠিক হিসাব কখনও পাওয়া যায় না। যদি বলি কয়েক লাখ লোক মিছিলে যোগ দিয়েছিল তাহলে বোধ হয় অতিরঞ্জন হবে না। এদিনের প্রতিবাদের আর এক বৈশিষ্ট্য, সভা এবং মিছিলে ছাত্র মুসলিম লিগের এক অংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ফেব্রুয়ারি মাসে রশিদ আলি দিবসে মুসলিম লিগ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নভেম্বর মাসে আই. এন. এ. দিবসের পরদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় কংগ্রেসের তেরঙ্গা ঝান্ডার সঙ্গে মুসলিম লিগের সবুজ পতাকা আর ছাত্র ফেডারেশনের লাল ঝান্ডা এক সঙ্গে বাঁধা হল। সেই তিন ঝান্ডা নিয়ে মিছিল ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে কিছুটা এগুতেই, সশস্ত্র পুলিশ পথ আটকাল। শোভাযাত্রীরা পথ জুড়ে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে শরৎ বসু এবং কংগ্রেসি নেতা কিরণশঙ্কর রায়

এলেন। তাঁরা ছাত্রদের কাছে আবেদন করলেন, "আপনারা ফিরে যান। আপনাদের দাবি যাতে যথাস্থানে পৌঁছায় তার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি।" কিন্তু এই আবেদনে কেউ সাড়া দিল না। নেতারা ফিরে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পর পুলিশ ছত্রভঙ্গ হওয়ার হুকুম দিল। কিন্তু যে যেখানে বসেছিল বসেই রইল। বোধ হয় একজনও নড়েনি। তারপর গুলি চলল—সম্ভবত একাধিকবার। কারণ পরবর্তী হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে, আহতের সংখ্যার ঠিক হিসাব কখনও শুনিনি। এরপর প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব স্বয়ং এলেন। সঙ্গে শরৎবাবু। পুলিশের অবিবেচনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে এবং তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উনি বললেন যে, ডালহাউসি অভিযানে উনি নিজেই নেতৃত্ব করবেন। মিছিল ডালহাউসি চলল, পুরোভাগে সুরাবর্দি সাহেব আর শরৎবাবু। অবাক বিস্ময়ে এই প্রহসনে অংশ গ্রহণ করি। শেষ অবধি যদি যেতেই দেবে, তবে এতগুলি ছেলেমেয়েকে খুন করার কী দরকার ছিল? কার নির্দেশে এবং কেন পরপর দুদিন গুলি চলল? আমার দু'জন ছাত্র এই সময়কার ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরাও এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পাননি। পুলিশের গোপন দলিলপত্র যদি সত্যিতে কখনও নির্দ্বিধায় গবেষকদের দেখতে দেওয়া হয়, তবে হয়তো আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাবে। প্রতিশ্রুত তদন্ত কখনও হয়নি। একটা কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। সেদিন পুলিশের গুলিতে যারা খুন হয় তাদের অনেকেরই পকেটে নিজেদের নাম-ঠিকানা লেখা চিরকুট পাওয়া যায়। মানে এরা জানত— হয়তো আর বাড়ি ফেরা হবে না। আত্মীয়স্বজনদের ওরা অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখতে চায়নি। অনেকদিন পরে, তখন আমি অক্সফোর্ডে শিক্ষক, বন্ধু হিউ টয় যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়কার কিছু ফোটো দেখাচ্ছিলেন। একটা ছবি দেখিয়ে বললেন, "এটা কলকাতার ধর্মতলার ছবি। আই. এন. এ. ডে মনে আছে?" বললাম, "আছে।" হিউ বললেন, "এ হরিড অ্যান্ড স্টুপিড বিজনেস।" ওঁর দুর্ভাগ্য, ওঁর সেখানে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। বললাম, "আমিও ছিলাম— আর কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের মতো।" আলাপটা সেদিন আর এগোয়নি।

'৪৬ সনের গোড়ায় শীতের সময় আই.এন.এ-র বিচার-প্রহসন নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হল। শেষ অবধি সরকার মামলা তুলে নিলেন। আই.এন.এ-র নেতৃবৃন্দ এবং সৈনিকদের অসম্মানজনকভাবে বরখাস্ত [ডিস-অনারেবল ডিসচার্জ] করেই মনের ঝাল মেটাতে হল। এর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত বদলাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই হক সাহেবকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। সে এক বিচিত্র ঘটনা। এখন যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, '৩৭ সনে দেশে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু হয়, যুক্ত বাংলার ক্ষেত্রে সেটা অনেকাংশে প্রহসনে দাঁড়ায়। অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নর অল্প কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি উপদেষ্টার সাহায্যে সত্যিকার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই ব্যবস্থার ভিত আরও শক্ত করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে কর্তাদের কোনও আপত্তি ছিল না—যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা তাঁদের মর্জি মতো চলছে। কিন্তু ফজলুল হক সাহেব ছোট লাটের গৃহ-মার্জার হতে রাজি না হওয়াতেই যত গণ্ডগোল শুরু হল। গোদের উপর বিষফোঁড়া—মন্ত্রিসভায় উনি প্রথমে শ্যামাপ্রসাদের মতো বাঘের

ছানাকে নিয়ে এলেন, তারপর কিছু কংগ্রেসিকে জোটালেন, শেষে শোনা গেল জাপানিদের সহযোগী সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শরৎ বসুকে মন্ত্রিসভায় আনবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কত আর সহ্য হয়? ছোট লাটসাহেব প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে পদত্যাগপত্রের খসড়া তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ফজলুল হক বলেন, বিধানসভার অধিকাংশ সভ্য ওঁকে সমর্থন করছে। তাছাড়া মন্ত্রিসভা ওঁর পৈতৃক সম্পত্তি না। ওঁর দলের লোকদের সঙ্গে আলোচনা না করে উনি কী করে পদত্যাগ করেন? ছোটলাট এসব শুনতে রাজি না। পদত্যাগপত্রে সই না করা অবধি উনি হক সাহেবকে ঘর থেকে বের হতে দিলেন না। বিধানসভায় তাঁর বিবৃতিতে বরখাস্ত প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই রসালাপের সময় লাট সাহেবের টেবিলের উপর একটি রিভলবার রাখা ছিল। সেটি ব্যবহার করতে বড়কর্তা প্রস্তুত ছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। তবে লীলাচ্ছলে সেটি নাকি মাঝে মাঝে হাতে তুলে নিচ্ছিলেন।

ইংরেজ ছোটলাট এবং তাঁর হাতে গোনা কয়েকটি আমলা আর বেসরকারি পেয়ারের লোক মিলে কার্যত বাঙালিদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর বাছা মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করলেন। ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় যুক্ত বঙ্গে স্বর্গরাজ্য নেমে আসেনি ঠিকই, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর রাজনৈতিক প্রত্যাশার মধ্যে একটা সমঝোতার সম্ভাবনা হয়েছিল, সন্দেহ নেই। মধ্যবিত্ত হিন্দু আর উঠতি মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়, হিন্দু জমিদার-মহাজন আর মুসলমান রায়তের সম্পর্কে, দুর্লভ-সমাধান কিছু স্বার্থের সংঘাত ছিল ঠিকই। তার উপরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থনিরপেক্ষ কিছু বিদ্বেষের বীজ ঐতিহাসিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে লালিত হচ্ছিল। এই বিদ্বেষের গতিপ্রকৃতি এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট না। কিন্তু এই সমস্যা আমরা এক দিক থেকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি, আর বহু লোক এই বিদ্বেষকে হয় নিজেদের স্বার্থে, নয়তো নিজেরাই অন্ধ বিদ্বেষের বাহক হয়ে, শুধু বাঁচিয়ে রাখা না, নানাভাবে লালনপালন করতে যত্নবান হয়েছে। দুঃখের কথা—দু-চারজন সত্যিকার পণ্ডিত মানুষ এই খেলায় মেতেছিলেন, যদিও অধিকাংশ খেলুড়েরা সাধারণ গুন্ডা-বদমাসের সমধর্মী ছাড়া অন্য কিছু না। গণতন্ত্রের খেলায় বাজি জিতে আর পাঁচটা বদমাসের মতো এরাও পঙ্কিল রাজনীতির উপরের স্তরে ভেসে উঠেছে। চরম দুঃখের কথা, বেশ কিছু 'শিক্ষিত' বাঙালি এখন খাতায় নাম লেখানো মুসলমানবিদ্বেষীর দলে যোগ দিয়েছে। এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ। আবারও বলি, এই মারাত্মক সমস্যার মূল অনুসন্ধান এখনও হয়নি।

'৪৫ সনে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শেষ নির্বাচন। যুক্তবঙ্গে ছোটলাট এবং ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই মুসলিম লিগ নির্বাচনে জয়ী হল। নতুন প্রধানমন্ত্রী শহিদ সুরাবর্দি। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে লিগ সারা ভারতবর্ষে অল্প সংখ্যক মুসলমানেরই সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু '৪৫-৪৬-এ হাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তখন মুসলিম লিগ এবং পাকিস্তান দাবির সমর্থক। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার বা অবিচার হয়েছে, মুসলিম লিগের এই প্রচার হয়তো তাঁদের অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন। '৩৯ সনে যখন কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করল, তখন

লিগের নেতৃত্বে 'মুক্তিদিবস' পালন করা হয়। কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করায় বড়লাট লিনলিথগো জিন্না সাহেবের পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা না করার পক্ষে রায় দিলেন, ফলে ও-ব্যাপারে ইংরেজ সরকার তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে। যুদ্ধ শেষ হলে যখন নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হল, তখন জঙ্গি লাট ওয়াভেল সাহেব যে নীতি অবলম্বন করেন তার অর্থ দাঁড়ায় লিগ এবং কংগ্রেস সমতুল্য প্রতিষ্ঠান। একজন বিশেষজ্ঞের মতে—জিন্না সাহেব যে পাকিস্তানকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে পরিকল্পনা করেন, তা ওয়াভেলের নীতিরই ফল। প্রথমে ওঁর উদ্দেশ্য ছিল—মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি ভারতবর্ষের ভিতরেই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে স্বীকৃত হবে। যুদ্ধ শেষ হলে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এল। মন্ত্রিসভার তিন প্রতিনিধি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন। পুরনো পাকিস্তান প্রস্তাবই কেটেছেঁটে স্বাধীন ভারতের মানচিত্র তৈরি হল। জিন্না বললেন, 'মথ-ইটন পাকিস্তান।' পোকায় খাওয়া পাকিস্তান। হোক পোকায় খাওয়া, তবু তো পাকিস্তান! কায়েদ-ই-আজম নিমরাজি হয়ে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিলেন। দিল্লিতে সাংবিধানিক সভা—কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বসল। শাসনভার 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর হাতে। লিগ আর কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা। কিন্তু ব্যবস্থাটা নেহাতই নড়বড়ে। এ হ্যাঁ বলে তো ও না বলবেই। এভাবে যে রাজ্য চলতে পারে না তা বুঝতে কারও বাকি নেই। ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে নেহরুজি বললেন—সাংবিধানিক সভা সার্বভৌম। কোনও রকম শর্তাধীন নয়। ব্যস। জিন্না সাহেব বললেন, এদের রকম দেখ। ইংরেজ এখনও যায়নি আর এরা এখনই বলছে এরা কোনও শর্তাধীন নয়। তার মানে ক্যাবিনেট মিশনের যে প্রস্তাব এরা মেনে নিয়েছে, সে অনুযায়ী চলতে এরা বাধ্য নয়। এই যাদের মতিগতি তাদের বিশ্বাস করা চলে না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পাকিস্তান ছিনিয়ে নেওয়া ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করা হল।

সেই বিভীষিকার কাহিনি বলার আগে ওই উত্তাল দিনগুলির কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। '৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাস কলকাতার ছাত্র সমাজের দুঃখের দিন, কিন্তু সুখের দিনও বটে। আই. এন. এ. এবং রশিদ আলি দিবসে ধর্মতলার পথে অতগুলি ছেলে সত্যিতে অকারণে খুন হল—এ কথা ভোলবার নয়। কিন্তু এই অর্থহীন রক্তস্নানে আমরা অর্বাচীনরা এক ক্ষীণ আশার আলো দেখেছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের প্রতীক তিন পতাকার ঘনিষ্ঠ সহাবস্থানের দৃশ্যটা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। আমরা কল্পনা করতে পারিনি যে যারা সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বন্দুকের গুলি উপেক্ষা করেছে ছ' মাস পরে তারাই নির্দ্বিধায় পরস্পরের বুকে ছুরি বসাতে পারে। তা ছাড়া তখন নিত্যনতুন দারুণ উত্তেজনার সব ঘটনা ঘটছে। স্বাধীনতা যে ঘরের দুয়ারে এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। দিল্লি শহরে সাংবিধানিক সভা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের খসড়া তৈরি করছে। রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যত জনপ্রিয় নেতাদের হাতে। শুধু নামে ছাড়া সব অর্থেই দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কিন্তু ইংরেজ চলে যাওয়ার পর রাষ্ট্রব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের মধ্যে

সমঝোতা হয়েও হচ্ছে না। ইতিমধ্যে জিন্না সাহেব প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। সে সংগ্রাম কী রূপ নেবে কারও জানা নেই। মরিয়া হয়ে ইংরেজ সরকার রাজার সম্পর্কে খুড়ো মাউন্টব্যাটেন সাহেবকে ভারতবর্ষের ভাইসরয় করে পাঠিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন—আগস্ট '৪৮-এর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে—কংগ্রেস-লিগ সমঝোতা হোক চাই না হোক। অবস্থা কতকটা সেই রূপকথার মতো—কন্যাদায়গ্রস্ত রাজা সকালবেলা উঠে যার মুখ দেখবেন তার হাতেই কন্যা সম্প্রদান করবেন।

তখন শীত প্রায় শেষ হয়ে এসে বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। পিসেমশায় কিরণশঙ্করবাবু একদিন ডেকে বললেন, "আমাদের সঙ্গে দিল্লি চল। কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির বৈঠক চলছে। দেশ স্বাধীন হবে। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা রঙ্গমঞ্চের কাছাকাছি বসে দেখবি চল। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে এই সুযোগ ছাড়িস না।" তল্পিতল্পা বেঁধে, ওঁদের সঙ্গে দিল্লি চললাম। এর অল্পদিন আগে একবার দিল্লি গিয়েছিলাম—ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পাঠান-মুঘল যুগের পুরাকীর্তি দেখতে। সে কথা পরে লিখছি। সেবার নতুন দিল্লি দেখিনি বললেই চলে। এবার যে-শহর কাছে থেকে দেখলাম, সে শহর আসন্ন স্বাধীনতার যুগের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। অপর পক্ষে সেই শহর বিদেশি শাসকের স্পর্ধিত জয়স্কন্ধাবার। '৪৬ সনের কলকাতা বর্তমান কলকাতার তুলনায় প্রায় স্বর্গপুরী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজের তৈরি এই শহর তখনই অনেকটা জরাজীর্ণ। নতুন দিল্লির রোয়াব তার কোথায়? বাঙালের হাইকোর্ট দেখার মতো নয়া দিল্লি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অমলকে চিঠি লিখি, "দিল্লি দেখে আমি হতবাক। ভবিষ্যতে এখানে কাজ করার সুযোগ পেলে খুশি হব।" সেই সুযোগ ঠিকই এসেছিল। কর্মজীবনে পনেরো বছর দিল্লি বাস করতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা খুব সুখের হয়নি। জীবনে তিন-চারবার এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে : নেহাতই কথার কথা ভাবে একটা কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেছি, কখনও অল্পদিনের মধ্যে, কখনও-বা অনেকদিন পরে সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়েছে। দু-তিনবার হওয়ার পর এ বিষয়ে আমার প্রায় একটা কুসংস্কার জন্মে যায়। এই প্রসঙ্গে আমার বিখ্যাত ইংরেজি ছোটগল্প 'মাংকি'স প' মনে পড়ত। মনে হত—সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় না, কারণ ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারে কোথায় কী অলিখিত শর্ত লেখা থাকে তা আমাদের জানা নেই। পাঠিকা/পাঠক আশা করি এই কথাটা আপনারা আক্ষরিক অর্থে নেবেন না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে শরৎ বসু দিল্লির ক্যানিং লেনে একটা সরকারি বাংলো পেয়েছিলেন। '৪৬ সনে পিসেমশায় ওই বাড়িটিতে উঠেছিলেন। নয়া দিল্লির প্রশস্ত ঝকঝকে রাস্তা, ছিমছাম সরকারি বাংলো, চারিদিকে মুঘল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দম্ভভরা সব পূর্তকীর্তি, ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনায় শহরময় একটা চাপা উত্তেজনা—সব মিলিয়ে দিল্লির আকাশ-বাতাসে তখন একটা মাদকতার স্বাদ পেয়েছিলাম। সেই সময় দিয়ে প্রকাশিত 'যাযাবর'-এর বিখ্যাত বইটি দিল্লির রোমান্টিক সম্ভাবনা যেন আরও উজ্জ্বল করে তোলে। উত্তেজনায় পরিপূর্ণ দিল্লিতে একটি দিনের দৃশ্য বেশ মনে পরে। কনট প্লেসের

উপর চা-খাওয়ার বিখ্যাত জায়গা ডেভিকো। বিকেলে চায়ের সময় সেখানে সাহেব-মেমদের চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যান্ড বাজত। একদিন বিকেলে ওখানে চা খেতে গিয়েছি। দেখলাম একটু উঁচু পাটাতনের উপর বড় একটি টেবিলের চারপাশে অসাধারণ রূপবান/রূপবতী মধ্যবয়স্ক কিছু স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসে চা খাচ্ছেন। বেশ চোখ ঝলসানো সব চেহারা। যিনি আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি গলা নামিয়ে বললেন, "শহরে মুসলিম লিগের কর্ম সমিতির মিটিং চলছে। এঁরা সব তার সভ্য-সভ্যা অথবা সভ্যদের স্ত্রী।" বেশ নিলর্জ্জভাবেই সেই রূপের হাট অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। এক জিন্না সাহেব ছাড়া লিগের প্রথম শ্রেণির সব নেতাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সেবারকার দিল্লিবাসের সব চেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ঘনিষ্ঠ পরিবেশে জাতির পিতা মহাত্মা গাঁধীর দর্শনলাভ। একদিন সকালবেলা পিসেমশায় বললেন, "গাঁধীজির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুইও আমার সঙ্গে চল।" হঠাৎ এইরকম সৌভাগ্য হবে এ আমার কল্পনার অতীত। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে গাঁধী-সন্দর্শন করতে রওনা হলাম।

মহাত্মা তখন ভাঙ্গি কলোনিতে বাস করছিলেন। ছোট একটি ঘর। সেখানে আসবাবপত্র বলতে প্রায় কিছুই নেই। ঘরটি যে ভাঙ্গি কলোনিরই, আলাদা করে গাঁধীজির জন্য তৈরি নয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। তফাত শুধু এক ব্যাপারে : ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝের উপর হালকা একটি গদি, সাদা খদ্দরের কাপড়ে ঢাকা। ঘরটিতে কোনও দরজা নেই, শুধু খসখসের একটি টাটি ঝুলছে, তার সুগন্ধে ঘরটি ভরে আছে। মহাত্মা পা মুড়ে—যে-ভঙ্গিতে অনেক ছবিতেই ওঁকে দেখা যায়, গদির উপর বসে আছেন। পাশে একটি তাকিয়া। মানুষটির চেহারায় যা দেখে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম সে হচ্ছে তাঁর প্রায় চকচকে মসৃণ ত্বক—কোথাও একটি ভাঁজ পড়েনি। তখন ওঁর বয়স প্রায় আশি ছুঁয়েছে। আর একটি জিনিস দেখে বেশ মজা পেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন এবং আসবাবহীন ঘরটিতে তাকের উপর শুধু একটি প্রসাধন দ্রব্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে একটি পন্ডস ক্রিমের ডিব্বা। মনে মনে ভাবলাম স্বদেশির প্রবক্তা বিলাসবিমুখ জাতির পিতা কি পন্ডস ক্রিম মাখেন, না ডিব্বাটিতে গুজরাটিদের প্রিয় কোনও মুখশুদ্ধি রয়েছে! এই প্রসঙ্গে দিল্লিতে শোনা উর্দু কবি ফেরাখের নামে চালু একটি কাহিনি মনে পড়ছে। ফেরাখ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুদিন সবরমতী আশ্রমে বাস করেন। সেখানে রোজকার খাদ্য চাপাটি আর নিমপাতা বাটা। হুইস্কি পানে অভ্যস্ত কবি নিমপাতার তেতো স্বাদ খুশি মনেই গ্রহণ করেন। একদিন তিনি বাপুর কাছে তাঁর এই অপ্রত্যাশিত তৃপ্তির ব্যাপারটা নিবেদন করলেন, "বাপু, এটা তো বেশ খেতে।" চমকে উঠে মহাত্মার প্রশ্ন, "ওটা তোমার খেতে ভাল লাগছে?" "হ্যাঁ বাপুজি, বেশক!" "তা হলে ওটা খাওয়া বন্ধ করো। আহারের উদ্দেশ্য দেহধারণ, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না।"

গাঁধীজির সঙ্গে কিরণশঙ্করবাবুর কোনও গোপনীয় আলোচনা ছিল না, থাকলে আমার সেদিন গাঁধীদর্শন হত না। ওঁদের কথাবার্তার মাঝে মাঝে অন্য লোকজনও যাওয়াআসা করছিলেন। নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাঙালি হিন্দুর স্বার্থরক্ষা কীভাবে সম্ভব এ নিয়ে কিরণশঙ্করবাবু কিছু প্রশ্ন তোলেন। এর মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী মধু (সুরেন) ঘোষ এসে বসলেন।

যত দূর বুঝলাম—ওঁর মতে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গাঁধীজি হেসে বললেন, "মধুবাবু, তোমাদের পুরনো অভ্যেস গেল না! সশস্ত্র প্রতিরোধের পথে তোমরা কি সুফল পেয়েছিলে? এ বিষয়ে আমার মতামত তো তোমাদের জানা। আমার নতুন কিছু বলার নেই। সত্যিই যদি গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে প্রতিরোধের উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম না, অহিংস সত্যাগ্রহ।" ওঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। দেখলাম নেহরুজির মতো ওঁর প্রণামে আপত্তি নেই। প্রথম জ্ঞান হওয়া অবধি যে-মানুষটির কথা শুনে এসেছি, তাঁর চরণ স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য মনে হল। আমাদের নাস্তিক পরিবারে ঈশ্বরের স্থান উনিই গ্রহণ করেছিলেন।

জিন্না সাহেব প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান দেওয়ার পর কলকাতা শহরের আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ১৬ আগস্ট যখন প্রায় এসে গেছে, তখন শোনা গেল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম রণস্থল হবে কলকাতা শহর। এই অসামান্য সম্মান কলকাতার ভাগ্যে কেন জুটল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। যাঁদের ধারণা, মুসলিম লিগ সংগ্রাম বলতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথাই চিন্তা করেছিল, তাঁরা বলতেন যে, ওই সময় এক যুক্তবঙ্গেই নিরঙ্কুশ লিগ রাজত্ব। সুতরাং সরকারি আওতায় দাঙ্গা করার এমন সুবিধা আর কোথাও হবে না। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে রয়ে গেছেন এ রকম কিছু প্রগতিশীল মুসলমানদের মুখে শুনেছি যে, তাঁদের সপরিবারে ময়দানের সভায় যেতে বলা হয়েছিল এবং অনেকে তাই গিয়েছিলেন। যদি দাঙ্গা বাঁধানোর মতলব নিয়েই লিগ মন্ত্রিসভা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনে উদ্যোগী হয়ে থাকে, তা হলে কি তারা মুসলমান মেয়ে এবং বালক-বালিকাদের জীবন বিপন্ন করত? ময়দানের সভা শেষ হবার আগেই জোর দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস সরওয়ার্দি সাহেবের আশ্রয়ে মুসলিম লিগ দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তেমনি অনেক মুসলমান বলতেন— হিন্দুরাই তাঁদের উপর হামলা করার জন্য অনেকদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল। না হলে ময়দানের সভা থেকে মুসলমানরা যখন ফিরছে তখন হাওড়া পুলের উপর তারা সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হল কী করে?

যা হোক, আগস্ট মাসের গোড়া থেকেই শহরে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। দাঙ্গা নাকি হবেই। শোনা গেল লিগের পক্ষ থেকে গুন্ডাদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। কোনও কোনও অঞ্চলে হিন্দুদের বাড়ি আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি হয়েছে। রাজাবাজার এবং অন্যান্য মুসলমানপ্রধান পাড়ায় রোজ সন্ধ্যায় নাকি ট্রাকে করে লিগের প্রচারকরা দাঙ্গা করার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্রও বিলি হয়েছে। এইসব গুজব নিয়ে কলকাতার রক এবং চায়ের দোকানের আড্ডা তখন সরগরম ঠিকই, লোকের মুখে প্রায় অন্য কোনও কথা নেই, কিন্তু একটা কারণে আমার ধারণা যে, হুজুগপ্রিয় কলকাতাবাসী তাদের নিজেদেরই ছড়ানো গুজব খুব একটা বিশ্বাস করেনি।

আমার এই ধারণার প্রধান কারণ—দাঙ্গা বাধার আগে কলকাতাবাসী হিন্দু-মুসলমান কেউই নিজের বাসস্থান ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। সকলেই জানেন

শহর কলকাতার আবাসনে একটা বিশেষ ছক আছে। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অল্প কিছু হিন্দু এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে সামান্য সংখ্যায় মুসলমানের বাস। যে-কলকাতাবাসীরা জাপানি বোমার আশঙ্কায় প্রায় মুক্তকচ্ছ হয়ে মফস্বলে পালিয়েছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা করলে তারা যে নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। আর মন্ত্রিসভার আওতায় মুসলিম লিগ যদি ব্যাপক দাঙ্গার পরিকল্পনা করে থাকে, তো সে কথা রাজনীতির উপরমহলের লোকেরও জানা ছিল না। কিরণশঙ্কর রায়ের বড় মেয়ে এবং জামাই ক্রিস্টোফার লেনের একটি বাড়িতে থাকতেন। তার চারপাশে অত্যন্ত দরিদ্র অবাঙালি মুসলমানদের বাস। পিসেমশায় দাঙ্গা বাধার পর মেয়ে-জামাইয়ের খবর নিতে গিয়ে দেখেন আততায়ীরা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছে। জামাইকে ছোরা মেরে কোলের ছেলেটাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছে। উনি যদি ঘুণাক্ষরেও আশঙ্কা করতেন যে, এই রকম ঘটার সম্ভাবনা আছে, তা হলে মেয়ে-জামাইকে ওইভাবে বিপদের মধ্যে ফেলে রাখতেন না। সিমলে পাড়ায় বিবেকানন্দ রোডে একটি মুসলমান মেয়েদের হস্টেল ছিল—নাম মুন্নুজান হল। ওখানে স্নাতকোত্তর বিভাগের মুসলমান ছাত্রীরা থাকতেন। অধিকাংশই বেশ বড় ঘরের মেয়ে। লিগের কর্তৃস্থানীয়দের সঙ্গে এঁদের সব পরিবারেরই ভাল জানাশুনো ছিল। ওই মহিলারাও প্রায় সবাই দাঙ্গার দিন হস্টেলেই ছিলেন—মুসলমানপ্রধান পাড়ায় আত্মীয়স্বজনের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাননি।

লিগ সরকারের কুমতলবের প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার অল্প ক'দিন আগে সুরাবর্দি সাহেব কলকাতার পুলিশি ব্যবস্থা আগাগোড়া বদলে দেন। এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা কিন্তু প্রচলিত গুজবের সপক্ষে কিছু লেখেননি। লেখার অসুবিধেও আছে। এ সময়কার পুলিশ দফতরের কাগজপত্র সত্যিতে এখনও গবেষকের কাছে অধিগম্য নয়। আর যদি আপত্তিজনক কোনও আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, তার নজির রেখে দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে পুলিশি কাগজপত্র গবেষকদের দেখতে দেওয়া হলে হঠাৎ লিগের পেয়ারের লোকদের মোক্ষম সব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এ কথা সত্যি কি না তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হতে পারে। তবে কলকাতার পুলিশে হঠাৎ উঁচু পদে দুই মুসলমান কর্মচারীকে বহাল করা হয়—এ কথা অনেকেরই মনে আছে।

দাঙ্গা যেদিন শুরু হয় সেদিনকার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে অন্যত্র লিখেছি। এখানে ঘটনাবলির আর একটু বিবরণ দেব। মানিকতলা বাজারের প্রায় উলটো দিকে বিডন স্ট্রিটের উপর আমাদের হস্টেল। পাড়ার বাসিন্দা প্রায় সবাই বাঙালি হিন্দু। শুধু হস্টেলের সামনে এক সারি দোকানের পিছনকার বস্তিতে কিছু ফিরিওয়ালা শ্রেণির গরিব বিহারি আর উত্তরপ্রদেশের লোকের বাস। আর আমাদের পাঁচমিশালি হস্টেলের বাবুর্চি খিদমতগার সবাই বিহারি মুসলমান। আমাদের পাড়ায় কোনও গোলমালের আশঙ্কা আছে এমন আমাদের মনে হয়নি।

সকাল ন'টা নাগাদ সার্কুলার রোডের বস্তি থেকে হতদরিদ্র কিছু মুসলমান লিগের ঝান্ডা হাতে স্লোগান দিতে দিতে বিডন স্ট্রিটে ঢোকে এবং মোড়ের মিঠাইয়ের দোকানটি লুঠ করে। পরে শুনি, কলকাতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এটাই নাকি প্রথম ঘটনা।

ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত মনে হয় না। জলুশধারীরা মিঠাই লুঠ এবং লুণ্ঠিত মিঠাই ভক্ষণ ছাড়া আর কোনও হিংসাত্মক কাজ করেনি বলেই আমার ধারণা। তার পরই পালা জমে উঠল। আমাদের হস্টেলের এক মুসলমান আবাসিক এসে খবর দিলেন—অবস্থা ভাল নয়। তিনি রাজাবাজারের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছেন। উনি স্বচক্ষে দেখেছেন—ওখানকার কসাইরা বড় বড় ছুরি আর দায়ে শান দিচ্ছে। ওঁর পরনে ধুতি থাকায় ওঁর দিকে সবাই বিষদৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তবে কেউ আক্রমণ বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করেনি। এখানে বলি—দাঙ্গা ভালমতো শুরু হওয়ার পর মুসলমান পাড়ায় ধুতি অথবা হিন্দু পাড়ায় লুঙ্গি-পাজামা পরে ঢোকার কথা কেউ আর চিন্তা করতে পারত না। আবাসিকটি এই খবর আনার অল্পক্ষণ পরেই নানা গুজবে হস্টেলের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। রাজাবাজার, কলুটোলা, পার্ক সার্কাসে নাকি হাজার হাজার হিন্দু খুন হয়েছে। কত হিন্দু মেয়ে যে লাঞ্ছিত বা ধর্ষিত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। একজন কোথা থেকে একটা চোথা খবরের কাগজ নিয়ে এল যার নাম আগে বিশেষ শুনিনি। লোমহর্ষক সব কাহিনিতে ভরা ওই কাগজটির বিক্রি নাকি তিন দিনে বেশ কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছিল। এবং তার অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী সম্পাদকটি শুনেছি সমস্ত কাগজখানা নিজের বৈঠকখানা ঘরে বসে লিখতেন। বাইরে বের হওয়া তখন নিরাপদ ছিল না। আর দাঙ্গার আগে ওই কাগজটির যা বিক্রি তাতে সম্পাদক ছাড়া অন্য কোনও কর্মচারী রাখার মতো সামর্থ্য বা প্রয়োজন হয়েছে এমন মনে হয় না। এখন ওই বিরল প্রতিভাটি সম্পূর্ণ নিজের মস্তিষ্ক থেকে কলকাতার কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ওই বজ্জাতের মনোভূমি কলকাতার রাস্তার চেয়ে দাঙ্গার জন্মস্থান হিসাবে সত্যের আকর হয়ে উঠল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাতারাতি ওই চোথা পত্রিকাটি স্মৃতিশ্রুতির স্থান অধিকার করল। শহরের সর্বত্র কী ঘটছে না ঘটছে তা ওই অশ্লীল নির্জলা মিথ্যা কথায় ভরা প্রকাশনটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে সবাই আলোচনা করতে লাগল। যদি প্রশ্ন করা হত—এসব যে সত্যি তা তোমরা কী করে জানলে, তাহলে লোকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিত। ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন, কয়েক দশক ধরে বিপ্লব বা গণসংঘর্ষে গুজবের অবদান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যুক্তবঙ্গে দাঙ্গার ঐতিহাসিক সুরঞ্জন দাস '৪৬ সনের ঘটনায় গুজবের অবদান নিয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু ওই বিষাক্ত পত্রিকাটির কোনও কপি এখন আর পাওয়া যায় না। নগণ্য একটি প্রকাশন মিথ্যা প্রচারের মারফত কত অনিষ্ট করতে পারে, বাঙালির দুর্ভাগ্যের বিবরণীতে সে ইতিহাস অলিখিত রয়ে গেল।

গুজবের সুফল কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বচক্ষে দেখতে হল। ন-দশ বছর বয়সি একটি মুসলমান ছেলে আমাদের পাড়ায় আম বিক্রি করতে আসত। সেদিনও একটু বেলা হলে ঝাঁকা মাথায় করে ছেলেটি এল। হঠাৎ একটি তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনলাম "মোছলমান! মোছলমান!" তারপর দৌড়োদৌড়ির আওয়াজ। হস্টেলের বারান্দায় গিয়ে দেখি রাস্তায় ছোটখাটো একটি ভিড় জমেছে। তার মধ্যে বাঙালি 'ভদ্রলোক'ই সংখ্যায় বেশি। কিছু দরিদ্র বস্তিবাসীও আছে। সকলেরই হাতে লাঠিসোটা। একটা আর্ত চিৎকার কানে এল। তারপর সব চুপ। লাঠি হস্তে বীরবৃন্দ তখন পলায়নতৎপর। দেখলাম রোগা ছেলেটার অর্ধাহারক্লিষ্ট

রক্তাক্ত শরীরটা রাস্তায় কুঁকড়ে পড়ে আছে। হিন্দু জাতি এবং কৃষ্টির সম্মান রক্ষা হয়েছে দেখে বড় গর্বিত বোধ করলাম। তাছাড়া শিক্ষিত বাঙালির মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথাটাও ভুললে চলবে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি বলে কথা!

ওই ছেলেটা আমাদের হস্টেলেও আম বেচতে আসত। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা হত। বিধবা মাকে নিয়ে ও কলকাতার দক্ষিণে শহরতলির এক বস্তিতে থাকত। ওর রোজগারেই মা-ছেলের আহার জুটত। প্রতিবন্ধী মায়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছু রোজগার করার মতো ক্ষমতা ছিল না। সহায়সম্বলহীন ওসমানের কিন্তু উচ্চাশার অভাব ছিল না। একটু পয়সা জমাতে পারলেই ও নাকি গড়িয়াহাটের বাজারে একটা ফল-তরকারির দোকান খুলবে। ওর আরও একটা উচ্চাশা ছিল। মাঝে মাঝে ও আমাদের গান শোনাত। লাজুক লাজুক মুখে বলত, যখন একটু পয়সা হবে তখন ওর ইচ্ছা মাস্টার রেখে গান শিখবে। অবিনাশী আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। করলে বলতাম, যদি নিষ্পাপ অসহায় মানুষের জন্য ঈশ্বর নামক কোনও সত্তা স্বর্গ বা বেহেস্তের বন্দোবস্ত করে থাকেন, তা হলে আমার সহায়-সম্বলহীন ছোট ভাই ওসমানের জন্য সেখানে যেন একটা ফল-তরকারির দোকান খুলে দেন। আর যেন কোনও দেবদূত ওকে গান শেখায় তারও ব্যবস্থা করেন। আর ওসমান, নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তোমার অমানুষ এই দাদাটি, তোমাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করেনি। পারো তো তুমি তাকে ক্ষমা কোরো। তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম তোমার গান শেখার খরচটা আমি দেব, সেই প্রতিশ্রুতি রাখার তো আর পথ রইল না।

দিন যতই গড়াতে লাগল গুজবে গুজবে হাওয়া ক্রমেই গরম হয়ে উঠল। বিকেল নাগাদ নতুন এক রাজনৈতিক থিসিস কানে এল, 'অফেনস্ ইজ দা বেস্ট মিনস্ অফ ডিফেন্স' অর্থাৎ "হে হিন্দু সন্তানগণ, খরকরবাল হাতে নিয়ে এবার তোমরা যবননিধনের জন্য প্রস্তুত হও।" হস্টেলের স্পোর্টস রুম থেকে সব হকি স্টিক বের হয়ে এল। দু-চারটে বন্দুক, কিছু গোলাগুলিও অজ্ঞাত কোনও উৎস থেকে সংগৃহীত হল। কোথা থেকে যেন বেশ কয়েক টিন কেরোসিনও জোগাড় হয়েছে দেখলাম। সংগ্রামী পুরুষদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বামপন্থী ছাত্রও আছেন দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অন্য সকলের সঙ্গে কোনও আলোচনা তখন আর সম্ভব না। তাই আগ্রাসী হিন্দু বনে যাওয়া বামপন্থীদেরই শুধু প্রশ্ন করি—নীতির কথা ছেড়ে দিলেও তারা যা করতে যাচ্ছে তাতে কার কী লাভ হবে। উত্তর পেলাম—মুসলমান খুন হচ্ছে এই খবর যথাস্থানে পৌঁছলে হিন্দু হত্যা বন্ধ হবে। বললাম—হিন্দু হত্যার খবর বা গুজব যথাস্থানে পৌঁছনোর ফলে তো তোমরা মুসলমান মারার জন্য উদ্যোগী হয়েছ। মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া তোমাদের থেকে ভিন্ন হবে মনে করছ কেন? উত্তর—এখন কাজের সময়। বাজে কথা শোনার তাদের অবসর নেই।

অন্ধকার একটু ঘন হওয়ার পর আসল 'কাজ' শুরু হল। বেশ ভাল করে খাওয়াদাওয়া সেরে বীরবৃন্দ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। হাতে কেরোসিনের টিন এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ভাবলাম আমাদের পাড়ায় তো মুসলমান নেই। তবে বীরকৃত্যটা এঁরা কোথায় করবেন? পার্ক সার্কাস বা রাজাবাজার অভিযান করে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা হবে? না, না! অকারণ ঝক্কি নেওয়ার লোক এঁরা না। আর একটু রাত বাড়লে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে সশস্ত্র

যোদ্ধারা সার্কুলার রোড পার হয়ে রাস্তার পাশের মুসলমান বস্তি আক্রমণ করলেন। ওখানকার হতদরিদ্র বাসিন্দারা কোনও হিন্দুকে হত্যা করেনি অথবা কোনও হিন্দু নারীকে লাঞ্ছনা করেনি। দুষ্কর্মের মধ্যে তাদের কেউ কেউ সকালবেলার মিষ্টান্ন লুণ্ঠনে শরিক হয়েছিল। কাজটা গর্হিত সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্য প্রাণদণ্ডটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

আমার চেনা হিন্দু বীরবৃন্দ কওমের সেবায় কী মহৎ কর্ম করেছিলেন তা আমার সঠিক জানা নেই। কিন্তু তাঁরা যখন বীরকৃত্য সেরে ফিরে এলেন, তখন তাঁদের মুখভাবে উদ্দীপ্ত গৌরবের কোনও লক্ষণ দেখিনি। বরং তাঁদের দেখে যে-প্রাণীটির কথা মনে এসেছিল সে পশুরাজ সিংহ না, গৃহস্থের তাড়া খাওয়া লেজ গুটিয়ে পলায়মান রাস্তার কুকুর। প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা কলকাতার দাঙ্গার বিবরণ বেশি পড়িনি। তাই ওই দুঃসময়ের মানবিক অভিজ্ঞতার দিকটা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি। অন্যত্রও লিখেছি—আমার ধারণা, '৪৬ সনে কলকাতা শহরে দাঙ্গা বলতে যা বোঝায় তা বিশেষ ঘটেনি। দুই দল ক্ষিপ্ত মানুষ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে, এ দৃশ্য যতই বেদনাদায়ক হোক, মানুষের ইতিহাসে সংঘাত অপরিহার্য জেনে ওই দৃশ্যে কোথায় যেন একটু মনুষ্যত্বের তলানি পাওয়া যায়। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় যা ঘটেছিল তার ভিতর মনুষ্যোচিত কোনও ব্যবহারের লক্ষণ দেখা যায়নি। বিবেকবর্জিত কিছু দ্বিপদ সম্পূর্ণ অসহায় কিছু নারী-পুরুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হিন্দু পাড়ায় মুসলমান আর মুসলমান পাড়ায় হিন্দু নর-নারী-শিশু কোতলে-আম নীতির শিকার হয়। প্রতিরোধের প্রশ্ন প্রায় কোথাওই ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি। আমরা, বিশেষত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা, অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ভিয়েতনামে আর ইরাকে মার্কিনরা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা কী করেছে তা আলোচনা করে ধিক্কার দিই, কিন্তু নিজেদের দেশে আমাদেরই আপনজনেরা অন্য ধর্মী স্বজাতীয় মানুষের উপর কী বীভৎস অত্যাচার করেছে, তা নিয়ে হিন্দু বা মুসলমান কাউকেই কখনও নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করতে দেখিনি। ওই পাশবিক কাজগুলির জন্য যেন আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরেজ যে-বীভৎসতার আশ্রয় নিয়েছে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করি। কিন্তু আমাদের করা বিচিত্র কুকর্মের জন্য আমাদের কোনও লজ্জা নেই। দেশভাগের সময় পশ্চিম ভারতে যেসব অমানবিক ঘটনা ঘটে, তার ইতিহাস সম্প্রতি লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা, সংস্কৃতিবান বাঙালিরা, কী করেছি, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে উত্তরপুরুষকে তা জানানো প্রয়োজন।

নিজের চোখে দেখা ঘটনার বিবরণে ফিরে যাই। হস্টেলের বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম রাস্তার ওপারে আগুন জ্বলছে। বুঝলাম ব্যাপারটা আমার চেনা মহাপুরুষদেরই মহান কীর্তি। হস্টেলের ছাদে উঠে দেখলাম—আগুন শুধু আমাদের পাড়ায় না, যত দূর চোখ যায় সর্বত্র আকাশ লালে লাল। তিন দিন তিন রাত কলকাতার পথে ঘাটে নিরবচ্ছিন্ন পিশাচনৃত্য চলে। কোথাও একটি পুলিশের দেখা পাওয়া গেল না। আগুন নেভাতে কোথাও কোনও দমকল এল না। সুরাবর্দি সাহেব স্বেচ্ছায় দাঙ্গার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন কি না জানি না। কিন্তু এই পুলিশ এবং দমকলের অন্তর্ধান কেন এবং কীভাবে হল, তার ব্যাখ্যা কেউ দেয়নি। আর যে-ছোটলাট টেবিলে রিভলবার রেখে হক সাহেবের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র আদায়

করেন, তাঁর উত্তরসাধকটি রাস্তায় ফৌজ নামাতে কেন তিন দিন সময় নিলেন, এই সময় তাঁর পেয়ারের সরকারি-বেসরকারি গোরাচাঁদরা কেন হাত গুটিয়ে বসেছিলেন, সে বিষয়েও সরকারি দলিলপত্র সম্পূর্ণ মৌন। ফিলিপস সাহেব কলকাতার ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে বলেন, কয়েক হাজার লোক কলকাতার রাস্তায় নিহত বা অঙ্গহীন হয়েছিল। কিন্তু শুধু একটি মাত্র হত্যাকাণ্ডের আদালতে বিচার হয়। শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল বলে তিনি রায় দেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী তিন দিনে তিন হাজার স্ত্রী-পুরুষ-শিশু খুন হয়। বেসরকারি হিসাবে নিহতর সংখ্যা দশ থেকে পঞ্চাশ হাজার। সত্যিতে গণহত্যার শিকারের সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব নয়, কারণ বহু মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। আর রাস্তার ম্যানহোল খুলে যেসব শরীর নীচের নর্দমায় ফেলা হয়, তারও পরিসংখ্যান সম্ভব না। মর্গে যেসব শরীর এসেছিল তারই ভিত্তিতে সরকারি হিসাবটা করা। কিন্তু ওই হিসাব সত্যিতে হতাহতের নিতান্তই সামান্য একটি অংশ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ওই তিন দিন কলকাতায় শাসনব্যবস্থা কি সত্যিতে ভেঙে পড়েছিল? তার পরবর্তী ঘটনাবলি বিচার করলে তা মনে হয় না। যখন ফৌজ, পুলিশ, দমকল সব রাস্তায় নামল তখন তো পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে কোনও সময় লাগেনি। তার মানে একটাই দাঁড়ায়। কর্তৃপক্ষ হয় ইচ্ছে করে, নয় নেহাত নির্বুদ্ধিতাবশত হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু রাস্তা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করে দাঙ্গাকারীদের যথেচ্ছ খুনজখম করার পথ পরিষ্কার করা শুধু অনবধানতার ফল—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

দাঙ্গার প্রথম ধাক্কা থামবার পর বিপজ্জনক এলাকায় যেসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ছিলেন, তাঁদের খোঁজ নিতে বের হই। প্রথমেই গেলাম মুন্নুজান হলে। '৪৫-এর শেষ দিকে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রদের সঙ্গে উত্তর ভারতে ইন্দো-মুসলিম যুগের পুরাকীর্তি দেখতে গিয়েছিলাম— ডক্টর হাবিবুল্লার সুযোগ্য নেতৃত্বে। দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, আজমির শরিফ আমরা বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখেছিলাম। হাবিবুল্লা সাহেবের অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার ফলে ওইসব পুরাকীর্তি এক নতুন আলোয় দেখতে পাই। আমাদের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুন্নুজান হলের বাসিন্দা বেশ কয়েকজন ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এঁরা অনেকেই বংশের প্রথম মহিলা যিনি নাকি স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়তে এসেছেন অথবা সহশিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে এঁদের চিত্ত কিছুটা টলমল ছিল, কিন্তু এঁদের আচার-ব্যবহারে কোনও রকম জড়তা অথবা প্রগলভতা কখনও নজরে আসেনি। এঁরা কেউ কেউ ছাত্র মুসলিম লিগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কোনও লক্ষণ এঁদের কথায় বা ব্যবহারে কখনও পাইনি। মুসলমানদের কিছু ন্যায্য দাবি আছে। তারই জন্য এদের লড়াই, হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষবশত না। নিরঙ্কুশ হিন্দু পাড়ার মধ্যে ওদের হস্টেল। তবে ভদ্র বাঙালি পাড়া। সুতরাং প্রথমটায় কিছু দুশ্চিন্তা করিনি। কিন্তু দাঙ্গা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালির রুচি-সংস্কৃতির যেসব নমুনা দেখলাম, তাতে সন্দেহ হল যে, মুন্নুজান হলবাসিনী আমার বন্ধুদের গিয়ে আর জীবিত দেখব না।

হস্টেলের কাছাকাছি পৌঁছে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে ভয়ে আমার বাক্যরোধ হল।

বাড়িটার সামনে রাস্তায় কিছু ভাঙা স্যুটকেস আর পোড়া বইপত্র ছড়ানো। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। ফুটপাথে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন—একটু আগে পুলিশের গাড়ি এসে মেয়েদের নিয়ে গেছে। ওঁদের জিনিসপত্র লুঠ বা পোড়ানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কারও গায়ে হাত পড়েনি।

আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল দু-একদিন বাদে, আশুতোষ বিল্ডিংয়ে। মনে হল, ওঁদের মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কেমন একটা ভীত ত্রস্ত ভাব, রক্তহীন পাংশু চেহারা—যেন যে-বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে ওরা গিয়েছে, তার রেশ এখনও কাটেনি। শুনলাম—১৬ই বেলা এগারোটা নাগাদ একদল সশস্ত্র লোক হঠাৎ হুড়মুড় করে হস্টেলে ঢুকে পড়ে। প্রথমে তারা অশ্রাব্য গালিগালাজ করে যার মূল বক্তব্য—মুসলমান স্ত্রীলোক আর রাস্তার গণিকার মধ্যে কোনও তফাত নেই। তারপর বাক্সপ্যাটরা বইপত্র সব রাস্তায় টেনে নামানো হয়। গায়ে হাত দেওয়ার শুভ চেষ্টা হয়নি তা নয়, তবে সেটা নাকি বন্ধ হয় কিছু বস্তিবাসীর হস্তক্ষেপের ফলে। আমার বিশিষ্ট বন্ধু হাজেরা আরও একটা কথা বললেন। হামলাকারীরা অধিকাংশই ছিলেন ভদ্রশ্রেণির মানুষ এবং তাঁদের কেউ কেউ ওঁদের বিশেষ পরিচিত, পাড়ার দাদা। হাজেরা হিন্দু ভদ্রলোক নামক প্রাণীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ক্রমে ক্রমে আরও সব বীভৎসতার কাহিনি এল। রাজাবাজারে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হস্টেলের ছ'টি ছেলে খুন হয়েছে শুনলাম। একজন ক্ষতবিক্ষত হয়েও বেঁচে ছিল। আমার পিসতুতো দিদির বাড়িতে আক্রমণের কথা আগেই লিখেছি। নানা খুনজখম বলাৎকারের কাহিনি চারিদিক থেকে আসতে থাকে। তার কিছু সত্যি, অধিকাংশই মিথ্যা। বীভৎস সব কাহিনি রটিয়ে কিছু লোক এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পায়। তার চেয়েও অবাক হলাম যখন দেখলাম কয়েকজন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত লোক মুসলমানদের উপর নানা অত্যাচারের সত্যি বা কল্পিত কাহিনি বলে বা শুনে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে দু-তিনজন রীতিমতো বিখ্যাত লোক। প্রয়াত এক পণ্ডিত ব্যক্তি, যাঁর নাম শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এখনও যুক্তকরে প্রণাম জানায়, তাঁকে এবং সমবেত অধ্যাপকদের কাছে নিকাশিপাড়ার মুসলমান বস্তি পোড়ানোর কাহিনি বলা হচ্ছিল। যিনি বলছিলেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিশ্বাসযোগ্য লোক। বেড়া আগুন দিয়ে বস্তিবাসীদের পুড়িয়ে মারা হয়। একজনও নাকি পালাতে পারেনি। ছেলেটি বলছিল—কয়েকটি শিশুকে আগুনের বেড়া টপকে তাদের মায়েরা আক্রমণকারীদের হাতে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যাতে ওদের প্রাণগুলি বাঁচে। বাচ্চাগুলিকে নির্দ্বিধায় আবার আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আমরা শুনেছিলাম, এই কুকীর্তির নায়ক কিছু বিহারি কালোয়ার। তাই ভয়াবহ বর্ণনাটি শুনে সুশোভনবাবু মন্তব্য করেন, "এর মধ্যে নিশ্চয়ই বাঙালি ছেলেরা ছিল না?" শুনে সেই পণ্ডিতপ্রবর গর্জে উঠলেন, "কেন, বাঙালি ছেলেদের গায়ে কি পুরুষের রক্ত নেই?" আমি বরিশালের বাঙাল। ফলে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, ভেবেছিলাম প্রশ্ন করি, "বরাহশাবক, তোমার ধমনীতে কোন জানোয়ারের রক্ত, একটু বলবে?" কিন্তু সব সদিচ্ছা পূর্ণ হয় না। কী আর করা যাবে!

তিন দিন দক্ষযজ্ঞের পর আম-খুন অগ্নিদাহ বন্ধ হল ঠিকই, কিন্তু পথেঘাটে মৃতদেহের

স্তূপ সরাতে বেশ ক'দিন লেগেছিল। আর সেই স্তূপে নতুন মাল সরবরাহের কাজও চলতেই থাকে। এক বছর ধরে রোজই দু-চারটে খুন-জখমের সংবাদ পাওয়া যেত। কয়েকটা জায়গায় দিনের মধ্যে কয়েকবার ট্রাম বাসে অ্যাসিড বাল্‌ব আর স্টেনগান থেকে গুলি চালানো নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ঠনঠনের মোড় এইসব কাজের একটি প্রধান অকুস্থল ছিল। ওই পথে রোজই কলেজ যাওয়াআসা করেছি। কিন্তু কখনও আক্রমণের অভিজ্ঞতা হয়নি। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে ব্যাপারটা কিছু অস্বাভাবিক না। বহু লক্ষ মানুষের বাস কলকাতা শহরে কয়েক হাজার লোক খুনজখম হলে ব্যক্তিবিশেষের গায়ে আঁচ লাগার সম্ভাবনা শতকরা একেরও কম। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে ক্ষতিটা প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। আমাদের চেনা কলকাতা শহর হারিয়ে গিয়েছিল। কোথাও দূরে যেতে হলে আগে হিসাব করতে হত—কোন পথে যাব? হিন্দু না মুসলমান পাড়ার ভিতর দিয়ে? একদিন পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গি অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। অনেক ভেবেচিন্তে পাজামা পাঞ্জাবি পরে বাসে উঠি। কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে উঠেছি। হিন্দু পাড়া। তাই দু-একজন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেও কেউ খুব একটা নজর করছিল না। কারণ ওপাড়া তখন মুসলমানশূন্য। আর কোনও মুসলমানের এমন সাহস নেই যে, পায়জামা পরে ওপাড়ায় চলাফেরা করে। কিন্তু রব উঠল যখন পার্ক স্ট্রিটে নামলাম। শুনলাম, "শালা নেড়ের বাচ্চাকে ছেড়ে দিলি? দেখলি তো! কেমন হিন্দু হিন্দু ভাব করে পার পেয়ে গেল?" চিৎপুরের আমজাদিয়া রেস্টুরেন্ট আমাদের মতো স্বল্পবিত্ত ছাত্রদের সস্তায় বিলাসব্যসনের একটি অতি প্রিয় জায়গা ছিল। দাঙ্গার পর আর ওমুখো হইনি। যত দূর জানি আমজাদিয়ার গৌরবের দিনও এই সময়েই অস্তমিত হয়।

কলকাতার দাঙ্গার অল্পদিনের মধ্যে সরকারি ঘোষণা হল কংগ্রেস পাকিস্তানের দাবি মেনে নিয়েছে। দেশ ভাগ হওয়া এখন সুনিশ্চিত। আগস্ট '৪৮-এর মধ্যে ইংরেজ দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদায় নেবে। এই প্রসঙ্গে এক সময় মহাত্মার সেক্রেটারি অধ্যাপক নির্মল বসুর কাছে যে-কাহিনিটি শুনেছিলাম সেটা লিখছি। নির্মলবাবু বলেন—দেশবিভাগের প্রস্তাব নিয়ে নেহরু মহাত্মার সঙ্গে যখন আলোচনা করতে আসেন, অধ্যাপক তখন উপস্থিত ছিলেন। সব শুনে গাঁধীজি বলেন—তাঁর মন এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারছে না। তাঁর প্রথম প্রস্তাব ছিল জিন্না সাহেবের হাতে অবিভক্ত ভারতের রাজ্যভার তুলে দিয়ে ইংরেজ বিদায় নিক। তারপর আমাদের সমস্যার মোকাবেলা আমরা করব। জিন্না এ প্রস্তাবে রাজি হননি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও রাজি হতেন মনে হয় না। নেহরু জিজ্ঞেস করেন—পাকিস্তান প্রস্তাব না মেনে মহাত্মা তার বিকল্প পন্থা কী চিন্তা করছেন। এ প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তর—"আর একবার গণআন্দোলন করতে হবে।" নেহরুজি বলেন, কলকাতার রক্তপাত দেখার পর ওঁর আর সাহস নেই। একটু সময় চুপ করে থেকে মহাত্মা বললেন, "তোমরা কি ভাবছ যে, ভারত স্বাধীন হবে আর তার জন্য অন্তত দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দেবে না? রক্তপাত হবেই। তবে তা মহৎ উদ্দেশ্যে হবে, না বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হবে, তা নির্ভর করবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কোন পথ গ্রহণ করবেন তার উপর।"

এর পরবর্তী ইতিহাস কারও অজানা নয়। দেশবিভাগের সিদ্ধান্তে কোনও নড়চড় হল না। শুধু কোন অংশ পাকিস্তানে যাবে আর কোন অংশ ভারতবর্ষে থাকবে তা নিয়ে দর কষাকষি

চলল। কংগ্রেস এবং শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দুরা পঞ্জাব এবং যুক্তবঙ্গ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব আনলেন। ব্রিটিশ সরকার আর মুসলিম লিগ শেষ অবধি এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। জিন্না সাহেব নিরুপায় হয়েই 'পোকায় খাওয়া পাকিস্তান'ই গ্রহণ করতে রাজি হলেন। কিন্তু যে-বিষাক্ত রক্তপাতের সম্ভাবনা তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে গাঁধীজি দেখতে পেয়েছিলেন, সেই রক্তপাত এড়ানো গেল না। কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য মহাত্মার আগমন এবং অনশনের কাহিনি এখন সর্বজনবিদিত। কলকাতার দাঙ্গা থামতে না থামতে নোয়াখালিতে হিন্দু এবং বিহারে মুসলমানদের উপর আক্রমণ এবং বীভৎস অত্যাচার শুরু হয়। মহাত্মা আগুনে জল ঢালার চেষ্টায় প্রথম নোয়াখালি এবং তারপর বিহার গেলেন।

অনেক সময় এইসব ঘটনার বিবরণ যেভাবে লেখা হয় তাতে মনে হতে পারে এদের মধ্যে কোনও কার্য-কারণ জাতীয় যোগসূত্র আছে। কিন্তু নোয়াখালির মুসলমান জনগণ কলকাতার সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে হিন্দুনিধনে তৎপর হয়, এরকম মনে করার কোনও কারণ আছে মনে হয় না। কৃষকবিদ্রোহের অঙ্গ হিসেবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কখনও ঘটেনি এমন নয়। কিন্তু ওই জাতীয় সংঘাত যুক্তবঙ্গে প্রধানত কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। কতকটা অর্থনৈতিক কারণেও গ্রামজীবনে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ সম্ভব ছিল না। না হলে দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরনির্ভরতার ভিত্তিতে গঠিত অর্থনৈতিক তথা সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ত। মোট কথা, নোয়াখালির ঘটনা নিম্নবর্গীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রাসন নয়, একটি বজ্জাত ধান্দাবাজের সুপরিকল্পিত বদমাইসির পরিণাম। প্রাণীটির নাম গোলাম সরোয়ার। পেশা মোক্তারি। অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরীর দাদা রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী নোয়াখালি বারে ওকালতি সূত্রে তার বিশেষ পরিচিত এবং শোনা যায়, ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। নিতান্তই আদর্শগত কারণে সরোয়ার সাহেব শহর থেকে দলবল নিয়ে গ্রামে বন্ধুর জমিদারি প্রাসাদ আক্রমণ করেন। এর মধ্যে লোভ বা বিদ্বেষের কোনও ব্যাপার ছিল না। এই আদর্শবাদী কর্মযজ্ঞে ওই পরিবারের যে কটি পুরুষমানুষ সেদিন গ্রামের বাড়িতে ছিলেন তাঁরা সবাই আহুতি হন। স্থানীয় মুসলমানরা আশ্রয় দেওয়ায় বাড়ির মেয়েরা বেঁচে যান। সরওয়ার কিছুদিন কারাবাস করেন। সে সময় অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী অবিশ্বাস্য এই জন্তুটিকে দেখতে নোয়াখালি জেলে গিয়েছিলেন। সরওয়ার বলে যে, কাগজে যেসব খবর বের হয়েছে সবই মিথ্যে কথা, হিন্দু সাংবাদিকদের বানানো গল্প। ও নাকি ইসলামের চোখে অন্যায় বলা চলে এমন কোনও কাজ করেনি। আর ওর যা কৈফিয়ত তা ও নেতাদের কাছে দেবে। নেতারা লোকটাকে স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। যথাকালে এই জানোয়ার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সভ্য হয়।

নোয়াখালির ঘটনার পর গাঁধীজি দীর্ঘদিন গিয়ে ওখানকার বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে কাটান। এখানে বলা প্রয়োজন—গোলাম সরওয়ারের আদর্শনিষ্ঠা ফলপ্রসূ হয়েছিল। নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শিকড় গেড়েছিল। দাঙ্গা এক দিনে শেষ হয়নি। মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু এই সময় বাংলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে রায় দেয়। সিদ্ধান্ত হয়—পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অংশ হবে আর পূর্ববঙ্গের নতুন নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান। এইসব সাতবাসি পুরনো কথা পুনরাবৃত্তি করছি, কারণ দেখেছি আমাদের বর্তমান প্রজন্মের অনেক

ছেলেমেয়ে এইসব অতিপরিচিত তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন।

নতুন বঙ্গভঙ্গের যখন আয়োজন হচ্ছে, সেই সময় পাশাপাশি দুটি পরস্পরবিরোধী প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এক পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আর কলকাতা শহরে যেখানেই পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের আস্তানা সেখানেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠিবিশেষকে কেন্দ্র করে ডজন ডজন ম্যাপ, সেন্সাস রিপোর্ট আর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নিয়ে আলোচনাচক্র বসল। উদ্দেশ্য খুব সরল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর র‍্যাডক্লিফ সাহেব মানচিত্রের উপর একটি লাইন টেনে বাংলা এবং পঞ্জাবের কোন কোন অংশ ভারতে এবং কোন কোন অংশ পাকিস্তানে যাবে তা নির্ধারণ করবেন। কংগ্রেস-লিগ হিন্দু-মুসলমান সবাই এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। যে-আলোচনাচক্রের কথা বললাম আসলে সেগুলি আবেদনচক্র। উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করা, "প্রভু, যাও গো যাও, যাবার আগে আমায় হিন্দুস্থানে (বা পাকিস্তানে) রেখে যাও।" আবেদনের ভাষাটা অবশ্যি মেষসুলভ নয়, উকিলি সিংহগর্জনের—রীতিমতো তথ্যপ্রমাণ দিয়ে জোরালো দাবির ভাষা। তবে সেসব দাবি কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানবিক যুক্তিতর্ক ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয় জগৎকে স্পর্শ করেছিল বলা চলে। যেসব অঞ্চল হিন্দুস্থানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হয় তার মধ্যে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম কোনও অঞ্চলই বাদ পড়েনি। মানচিত্রে কলকাতা থেকে ট্যারাবেঁকা সব লাইন টেনে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ভারতভুক্তির দাবি করা হয়। তার সবগুলি মানলে পূর্ব পাকিস্তান জন্মের আগেই লুপ্ত হত। পঞ্জাবে এর সঙ্গে তুলনীয় কোনও চেষ্টা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। তবে শিখরা তাঁদের স্বশাসিত রাজ্যের দাবি করেছিলেন ঠিকই। র‍্যাডক্লিফ সাহেব এইসব সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কে সমৃদ্ধ দাবির কোনও তোয়াক্কা করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই।

ভারতভুক্তির দাবি নিয়ে এই আন্দোলনের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এক প্রচেষ্টা হয়। সে চেষ্টা স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তবঙ্গ রাষ্ট্র স্থাপনের। শরৎ বোস, সুরাবর্দি, কিরণশঙ্কর—এই তিনজন পরামর্শ করে সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা করেন। জিন্না সাহেব এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ সম্ভবত তাঁর বরাবরই দুই পাকিস্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কত দূর কার্যকরী হবে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। অপর পক্ষে কারও কারও ধারণা যে মুসলমানপ্রধান স্বাধীন বঙ্গদেশ কালে কালে পাকিস্তানেই যোগ দেবে—ওঁর এই ভরসা ছিল। কংগ্রেস এ প্রস্তাবে কখনওই রাজি হয়নি। বলা হয় কলকাতাবাসী অবাঙালি গোষ্ঠীবিশেষের প্রবল আপত্তিই তার কারণ। তখনকার বাঙালির রাজনৈতিক মনোভাব দেখে মনে হয় এই প্রস্তাব যুক্তবঙ্গেও ধোপে টিকত না। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের কাছে ওঁর ভাইসরয়-সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনি। অভিজাত ইংরাজের স্বভাবসিদ্ধ চটুল ভঙ্গিতে বড়লাট নাকি ওঁর বুকে এক মৃদু ধাক্কা দিয়ে একটি চেয়ারে বসিয়ে দেন এবং নিজে সামনের টেবিলে বসে বলেন "ইউ উইল গো ডাউন ইন হিস্টরি অ্যাজ আ বাঞ্চ অফ স্কাউন্ড্রেলস—কাটিং আপ দা কান্ট্রি হিয়ার কাটিং ইট আপ দেয়ার!"

না, সে যাত্রা দেশটাকে এখানে সেখানে কেটে তিন টুকরো করার ব্যবস্থা হয়নি। সে সমাধান আর এক দিনের জন্য তোলা ছিল, সম্পূর্ণ অন্য পরিস্থিতিতে। বৃহৎ সার্বভৌম বাংলাদেশের পরিকল্পনা বড় দেরিতে এসেছিল। তখন এর পিছনে গণ-সমর্থনের সম্ভাবনাও

বিশেষ ছিল না। ফজলুল হক সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভা গঠনের সময় বারবারই কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা সফল হলে কি বাঙালির ইতিহাস অন্য পথে যেত, না হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের সংঘাত যে জায়গায় পৌঁছেছিল তাতে দেশভাগ ছাড়া তখন আর অন্য কোনও সমাধানের পথ ছিল না? 'যদি-ভিত্তিক ইতিহাস' বা কী হতে পারত তার বিশ্লেষণ এখন ঐতিহাসিকদের চোখে সত্যানুসন্ধানের শ্রদ্ধেয় উপায়। আমার ওই পথে আস্থা নেই। কেন, কী ঘটেছিল তা আমাদের বোঝার ক্ষমতা নিতান্তই সীমিত। কী ঘটতে পারত তার নির্দেশ আমরা কোথা থেকে পাব? শুধু বলতে পারি—বঙ্গভঙ্গ হয়ে উভয় বঙ্গে সব সম্প্রদায়ের বাঙালিরই সর্বনাশ ঘটেছিল, এটা আমার স্থির বিশ্বাস। ইতিহাসের সেই রদবদল করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ভারত বিভাগের এবং বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন কঠিন সত্য বলে মেনে নিতে হল, তখন পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু সবাই যে ঠিক মাথায় হাত দিয়ে বসে, তা নয়। তাদের জীবনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে এটা বোধহয় প্রায় সবাই বুঝতে পেরেছিল। অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটা মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজতে শুরু করে, কিন্তু ওই চেষ্টার পথ সহজ ছিল না। প্রথম কথা, হঠাৎ অন্য জায়গায় গিয়ে বাড়িঘর কিনে বসতি করার সামর্থ্য অল্প লোকেরই ছিল। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরিজীবী। মধ্যবয়সে নতুন জায়গায় গিয়ে চাকরি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে উদ্বাস্তুর ঢল নামার সময়ানুক্রমিক হিসাব কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণা যে, ঢলটা নামে দেশবিভাগের পর, আগে নয়। এ ধারণা ভুল হতে পারে। সম্ভবত কলকাতার দাঙ্গার পর থেকেই কিছু মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পালাবার পথ খুঁজছিলেন। বাড়ির দাম এবং বাড়িভাড়া দুই-ই আকাশচুম্বী হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় সে চেষ্টা সফল হওয়া সহজ ছিল না। অনেকে এসে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে ওঠেন। সে অভিজ্ঞতা কারও পক্ষেই সুখের হয়েছিল মনে হয় না।

আমাদের পরিবার কয়েক পুরুষের জমিদার। ঠাকুর্দারা চার ভাই ছিলেন। বড় ভাইয়ের ছেলেরা কলকাতার সাউথ এন্ড পার্কে একটা বাড়ি করেছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজন একটা চাকরি করতেন। বাকি তিনজন জমিদারির আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর তিন 'কোঠা'র বাকি আটজন শরিকের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যারিস্টার, আর দু'জন ছোটখাটো কোনও কাজ করতেন। কিন্তু প্রায় সবারই প্রধান নির্ভর ছিল জমিদারির আয়ের উপর। এই আয় যে হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে—এই সম্ভাবনা কেউই ঠিক পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে হয় না। হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করবেন সে কথা সরাসরিই বলেছিলেন। বছরে দু-তিনবার শরিকরা একসঙ্গে বসে মিটিং করতেন, সম্পত্তির ছোটবড় সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত বা হত না। কিন্তু সেইসব মিটিংয়ে সামনে যে সম্পত্তিনাশের সম্ভাবনা, এবং সে জন্য কী করা দরকার এ নিয়ে কখনও কোনও আলোচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মধ্যস্বত্বভোগী ঘরের ছেলে মিহির সেনগুপ্ত দেশভাগের সময় এবং সম্পত্তি চলে যাওয়ার পর ওঁর বাপ-জ্যাঠারা কীভাবে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তার বিবরণ লিখেছেন, পূর্ববঙ্গের প্রায় সব জমিদার-তালুকদার পরিবারের ইতিহাস ঘাঁটলে প্রায় ওই একই ছবি চোখে পড়বে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক এবং কৃষির কী অনিষ্ট হয়েছে এ নিয়ে এক সময় ঐতিহাসিক এবং অর্থনীতিবিদরা উত্তপ্ত আলোচনা করেছেন। মোটামুটি সবাই এ সম্বন্ধে একমত যে, জমিদারি প্রথার ফলে জমির আয়ের সিংহভাগ রায়তের পেটে না গিয়ে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং আমলা-তহশিলদারদের পেটে যায়। কর্নওয়ালিস সাহেবের যে ভরসা ছিল জমিদাররা নিজের স্বার্থে কৃষির উন্নতি করবে—সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি। দোল-দুর্গোৎসব-বাইনাচে চাষির কষ্টার্জিত পয়সা খরচা হয়েছে। আয়েসে অভ্যস্ত জমিদারশ্রেণি এক দিকে বংশবৃদ্ধি করেছেন আর অন্য দিকে নায়েব-গোমস্তার হাতে সম্পত্তি দেখাশুনোর ভার ছেড়ে দিয়ে ক্রমে নিজেরা দারিদ্রের প্রান্তসীমায় পৌঁছেছেন। এই অবক্ষয়ের ইতিহাস কেউ লেখেননি। তারাশঙ্কর-বনফুলের উপন্যাসে জমিদারদের এক রোমান্টিক ছবি তুলে ধরা হয়েছিল, যদিও শেষের দিকের লেখায় তারাশঙ্কর শ্রেণি হিসাবে জমিদারদের অন্তঃসারশূন্যতার কথাই বলেছেন। খুব অল্পসংখ্যক জমিদারই সত্যিতে ধনী ছিলেন। কিন্তু বংশানুক্রমিকভাবে খাওয়া-পরার সংস্থান বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকায় এঁদের মধ্যে অদ্ভুত এক উদ্যমহীনতা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মিহির জমিদারদের সামন্ত বলে বর্ণনা করেছেন। কিছু কিছু জমিদার সামন্ত বা অভিজাতজনোচিত হাবভাব অবলম্বন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রেণি হিসাবে এঁদের সত্যিকার চরিত্র বর্ণনা করতে গেলে ফরাসি শব্দ রাঁতিয়ের, অর্থাৎ জমি বা বাড়ির ভাড়ার উপর নির্ভরশীল এক গোষ্ঠী বলে বর্ণনা করতে হয়। এমনকী এঁদের মধ্যে যাঁরা মধ্যযুগের ছোটবড় রাজা-মহারাজার বংশধর, সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরাও শ্রেণি হিসাবে ভাড়া-উপজীবীই হয়ে গিয়েছিলেন।

নিজেদের কথায় ফিরে যাই। বাবা-জ্যাঠাদের এস্টেট সংক্রান্ত মিটিংয়ে সম্পত্তি পার্টিশন করার কথা কয়েকবারই হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত কখনও নেওয়া হয়নি। যদি হত, তা হলে নিজেদের ছোট ছোট অংশগুলি বর্ধিষ্ণু জোতদারদের কাছে বিক্রি করে প্রত্যেকেই কিছু সম্বল হাতে পেতেন, কারওকেই একেবারে নিঃস্ব হতে হত না। কিন্তু সম্পত্তি বিক্রি করা শরিকদের কেউ কেউ মহাপাপ বলে মনে করতেন। ফলে পার্টিশন বা সম্পত্তি বিক্রি—এর কোনও পথেই আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা হয়নি। কুখ্যাত সাহাবাবু আমাদের সম্পত্তির অংশ কিনে নিতে চেয়েছিলেন। অপমানজনক জ্ঞানে এই প্রস্তাব বাবা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেষে যখন বিক্রির চেষ্টা করেন তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন অবস্থায় আমরা পাকিস্তান ছেড়ে আসি। যত দূর জানি আমাদের তুলনায় অন্যান্য শরিকরা আরও বিপন্ন হয়েছিলেন।

ক্রমে স্বাধীনতা তথা দেশবিভাগের দিন কাছে এসে গেল। আমরা যারা কলকাতার দাঙ্গা নিজের চোখে দেখেছি তারা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার কথা একবারও চিন্তা করিনি। কিন্তু বাবাকে যখনই লিখতাম এবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার উদ্যোগ করো, খুব যে একটা উৎসাহ দেখাতেন তা নয়। শেষ অবধি যখন এলেন তখনও বরাবরের মতো দেশত্যাগ করছেন এ ধারণা ওঁর ছিল না। আসলে অনেকেই ভেবেছিলেন যে, দেশে থেকে যাওয়া কিছু অসম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ '৪০-এর দশকে পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি ছাড়া আর কোথাও দাঙ্গা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর আগেই লিখেছি—নোয়াখালির ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত

গণসংঘর্ষ নয়, এক বদমাইস ব্যক্তির ব্যক্তিগত শুভ প্রচেষ্টার ফল। তা ছাড়া সহায়সম্বলহীনভাবে পশ্চিমবঙ্গে এসে রুজির জোগাড় কী করে হবে সে দুশ্চিন্তাও ছিল। অত্যন্ত অভিমানী মানুষ আমার বাবা ছেলেদের রোজগারে খাবেন, এ চিন্তা কিছুতেই করতে পারতেন না।

ফলকথা, ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের পরিবার বরিশালে। পরীক্ষা পিছানোর ঐতিহ্য কলকাতায় দাঙ্গার পর থেকেই শুরু হয়েছে। তাই যে এম. এ. পরীক্ষা জুন-জুলাইয়ে হত তা ডিসেম্বর অবধি পিছিয়ে গিয়েছে। দেশবিভাগের তিন-চারদিন আগে হস্টেল ছেড়ে বরিশাল চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সারা শহর আসন্ন দাঙ্গার গুজবে টলমল করছে। এরকম সময় মানুষের মনের অবস্থা কী হয় তার একটা উদাহরণ দিই। একদিন বিকালবেলা বিবির পুকুরের পাড় দিয়ে বাড়ি ফিরছি। দেখি বেশ কিছু মুসলমান চাষি সার দিয়ে নদীর পাড়ের দিকে চলেছে। অন্য সময় হলে এ দৃশ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতাম না, কিন্তু বোধ হয় দাঙ্গার গুজবের ফলেই নজর করলাম সবারই হাতে দা বা কাস্তে। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। ভাবলাম এরা নিশ্চয়ই দাঙ্গা করার জন্যই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলেছে। নদীর পাড়ের পথে প্রথমেই তো আমাদের বাড়ি। দৌড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। একটু পরে মনে হল—আরে এরা তো হাটুরে। কেনা-বেচা শেষ করে নদীর দিকে রওনা দিয়েছে—নিজের নিজের ডিঙি নিয়ে বাড়ি ফিরবে বলে। ভয়ের তো কোনও হেতু নেই।

ভয়ের সত্যিতে কোনও হেতু ছিল না। কারণ হিন্দুপ্রধান বরিশাল শহরে দাঙ্গা করার কথা তখন কেউ চিন্তা করেনি। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কোনও গোলাম সরওয়ারের আবির্ভাব ঘটেনি। যেমন ১৬ আগস্টের আগে কলকাতায়, তেমনই দেশভাগের ঠিক আগে বরিশাল শহরে, দাঙ্গার গুজবটা সত্যিতে বোধ হয় বেশি কেউ বিশ্বাস করেনি। কারণ শহরের বেশির ভাগ হিন্দু যেখানকার লোক সেখানেই ছিল। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দিবস। সকাল থেকেই মিছিলে মিছিলে শহর উত্তাল। কিছু বামপন্থী হিন্দুও সেইসব মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। দাঙ্গার আশঙ্কায় প্রতিরোধের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা কেউ করছিলেন বলে আমার জানা নেই। আমাদের বাড়িতে দেখলাম বাবার কথামতো বামনবীর বসা আমাদের একমাত্র বন্দুকটি বের করে সেটা পরিষ্কার করছে। এবং তার সঙ্গে ওর স্বভাবসিদ্ধ তড়পানি। সত্যিতে দাঙ্গা বাধলে ওই একটি বন্দুকে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হত বলে আমার ধারণা।

রাত বারোটায় নদীতে জড়ো হওয়া সব স্টিমার, লঞ্চ, মোটরবোট ভেঁপু বাজিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল। সারা শহর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত হল। সারা রাত বাবা বন্দুকটি হাতে নিয়ে বসে রইলেন। একটি কথাও বলেননি। সাতাশ বছর ধরে মানুষটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ওঁর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার সমাপ্তি এইভাবে হবে, এ কথা নিশ্চয়ই কখনও কল্পনা করেননি।

পরদিন সকালে টাউন হলের বাইরে দাঁড়িয়ে রেডিওতে কায়েদ-ই-আজমের বক্তৃতা শুনলাম। তিনি বললেন—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই। ওঁর এই আশ্বাসবাণী

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্ষরিক অর্থে নিতে পারেনি। অবস্থা তা পারবার অনুকূল ছিল না।

১৫ আগস্ট কলকাতা শহরে অন্য এক নাটক অভিনীত হচ্ছিল। আমার দুর্ভাগ্য সেই অভাবনীয় নাটক শুধু ছায়াছবিতেই দেখেছি। সেদিন সকালবেলা চিৎপুরের মুসলমান পাড়া থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে তাজিয়া সাজিয়ে জরির টুপি মাথায় সব লোক আতর আর মিঠাই ছড়াতে ছড়াতে হিন্দু পাড়ায় এল। কোলাকুলি আর আনন্দাশ্রুপাতে সারা কলকাতা শহর আবেগে ভেসে গেল। নতুন সরকার রাজভবন জনসাধারণের জন্য খুলে দিলেন। লাখ লাখ লোক লাটভবনে ঢুকে পড়ে। বড় বড় বিছানা আর বাথটাবে বিনা বাধায় গড়াগড়ি দিয়ে ক্ষণিকের রাজকীয় আরাম উপভোগ করল সবাই। বেশ কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গের সব সিনেমাহলে এই ঘটনার তথ্যচিত্র দেখানো হত। আমার মনে হয় ওই অভূতপূর্ব ঘটনার ছবিটি এখনও মাঝে মাঝে দেখালে ভাল হয়।

কলকাতার ওই অবিশ্বাস্য আনন্দের দিনটি আরও একটি স্মরণীয় শিল্পকর্মে ধরা আছে। ওই দিনটিকে কবি বিষ্ণু দে এক গভীর আবেগভরা কবিতায় স্বাগত জানান : "আনন্দ আজ আনন্দ অসীম... নীল আকাশের নীচে, মিলেছে আজ হিন্দু-মুসলমান।" ওঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এই কবিতাটি উনি একদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন। রীতিমতো সিনিকাল মানুষটির চোখে সেদিন জল দেখেছিলাম।

কর্মজীবন : প্রথম পর্ব

১৯৪৭-এর শেষাশেষি এম.এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। দেশ তখন স্বাধীন। কিন্তু চাকরিবাকরির ব্যাপারে, অর্থাৎ ওইসব বস্তুর অভাবের ব্যাপারে, ইংরেজ শাসনের স্বর্ণযুগ তখনও সব ক্ষেত্রে শেষ হয়নি। সুযোগসুবিধার দিক থেকে অন্তত মধ্যবিত্তর জীবনে স্বাধীনতা কী বিরাট পরিবর্তন এনেছিল সে বিষয়ে—যে-আঁতেলবৃন্দ তার সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করে সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপের পরামর্শ দেন, তাঁদের সংবিৎ ফেরাবার জন্য—সবিনয়ে কিছু তথ্য নিবেদন করি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার সর্বস্তরে বেশ কিছু নতুন চাকরি সৃষ্টি করেন। ইংরেজ চলে যাওয়ায় উপরের দিকে বেশ কিছু পদ খালি হয়। তাছাড়া ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে সর্বভারতীয় ক্যাডারগুলিতে নতুন লোক নেওয়া প্রায় বন্ধ ছিল। আর স্বাধীন ভারত সরকার আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার জন্যও অনেক নতুন পদ সৃষ্টি হয়। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে যাঁরা পরীক্ষায় মোটামুটি ভাল করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সর্বভারতীয় সরকারি চাকরিগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসেন। যাঁদের পরীক্ষার ফল সে তুলনায় নিরেস, তাঁরা রাজ্য সরকারের চাকরিগুলির চেষ্টায় পরীক্ষা দেন। এ স্তরেও মুসলমান কর্মচারীরা পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় বহু পদ খালি হয়েছিল। ফলে চাকুরিজীবী বাঙালির জীবনে স্বাধীনতা কিছু

সুযোগ-সুবিধা এনে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। বাঙালি মধ্যবিত্তর জীবনে যেসব সমাধানহীন সমস্যার আবির্ভাব হয়, তার মূলে ছিল দেশবিভাগ।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরনো জমানার রেশ বেশ কিছুদিন চলে। আমি মাস্টারি করব সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বন্ধুবান্ধব শুভার্থীদের মধ্যে দুই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখি। আমার মা-বাবা ছাড়া অন্যান্য গুরুজন এবং তাঁদের প্রজন্মের বন্ধুবান্ধব পরিচিত মানুষরা আমার জন্য কিছুটা শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নতুন সব সুযোগসুবিধা আসছে, সেগুলি উপেক্ষা করে এমন ভুলও কেউ করে? বাবার এক বন্ধু বললেন, "ছেলেটাকে এখনও বোঝাও। বাকি জীবন আধপেটা খেয়ে থাকবে?" ব্যবসাদার এক পাঠান বন্ধু ভারি চমৎকার একটি গল্প বললেন। সরদারদের জিরগা বসবে। প্রধান সরদার ভৃত্যকে হুকুম দিয়েছেন—যেন প্রত্যেক সরদারের জন্য এক একটি ভেড়ার মাথার ব্যবস্থা থাকে। পাঠানদের প্রিয় খাদ্য ভেজা বা মগজ। সুতরাং হুকুম হল যেন যথেষ্ট মগজওয়ালা ভেড়া জোগাড় হয়। কিন্তু মেষমুণ্ড যখন ভাঙা হল তখন দেখা গেল কোথাও কোনও মগজের চিহ্ন নেই। ক্রোধে গরগর ঘূর্ণিতমুণ্ড সরদার নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মেষবিক্রেতার বাড়ি হাজির। এই মারে তো সেই মারে অবস্থা। জোড়হস্ত ভেড়াওয়ালা বলল, "করহ প্রভু অবধান। তুমি মগজওয়ালা ভেড়া চেয়েছিলে। তাই বেছে বেছে আমি সব এলেমদার মাস্টার পণ্ডিত ভেড়ার মুণ্ড পাঠিয়েছিলাম। এখন দেখছি ওটা ভুল হয়েছিল। পড়িয়ে পড়িয়ে বেচারাদের মগজ একেবারেই ক্ষয়ে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।" দীর্ঘ দিন মাস্টারি করে কাহিনিটির অন্তর্নিহিত সত্য কিছুটা উপলব্ধি হয়েছে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া সম্ভবত করা যায় না, তবে ওই অপচেষ্টায় বেশি দিন নিযুক্ত থাকলে, যে পেটায় তার গাধা বনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমার যেসব শুভার্থী বন্ধুবান্ধব "কে তুই, ওরে দুর্মতি, মরিবার তরে করিস আরতি" বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন না, তাঁরা আমার দুঃসাহসকে স্বাগত জানিয়ে জ্ঞানপীঠে আত্মনিবেদিত শহিদ বলে আমাকে অভিনন্দিত করলেন। এর ফলটা খুব ভাল হয়নি। যেমন ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর নিজেকে মহাপণ্ডিত জ্ঞান করতে শুরু করেছিলাম, তেমনই বন্ধুবান্ধবের এই স্তুতিবাক্য শুনে বিদ্যার হাড়িকাঠে স্বেচ্ছায় নিবেদিত বলি বলে নিজেকে কল্পনা করে বড়ই গরিমা বোধ করেছিলাম। যখন চাকরিবাকরি জোটে না তখন এই ধরনের আত্মতৃপ্তি অনেকটা সান্ত্বনা দেয় সন্দেহ নেই।

আসলে আমার শুভার্থীরা একটা ভুল করেছিলেন। কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা জীবনে শুধু বিশেষ একটা কোনও কাজই করতে পারে। আর সব কিছুই তাদের কাছে ভয়াবহ পরধর্ম। সেইসব পথে যাওয়া তাদের পক্ষে সত্যিতেই মহতী প্রণষ্টি। বেশ অল্প বয়সেই বুঝতে পারি যে, বইপত্র ঘাঁটা, পড়ানো আর লেখা ছাড়া অন্য কোনও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ওই পথে গিয়ে অর্ধাহারে থাকলেও যে-তৃপ্তিটুকু পাব, আর কোনও উপায়ে তা পাওয়ার আমার সম্ভাবনা নেই। আমার বাবা এই কথাটা বুঝেছিলেন। তাই কিছুটা দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও অন্য কিছু করার জন্য কখনও কোনও চাপ দেননি।

স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক পরে পরে অন্য সুযোগ থাকতে যে-লোক মাস্টারি করতে গেল তাকে হয় শহিদ নয় পাঁঠা মনে করাটা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ ছিল না। আমার বন্ধুবান্ধবরা যখন

চাকরির সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আমি তখন গবেষণা করব বলে মাস্টারমশাইদের দ্বারস্থ হলে তাঁরা আমাকে অন্য পথ দেখার পরামর্শ দেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁরা স্পষ্টই বলেন, "দেখ বাপু, শিগগিরই কোনও টাকাকড়ি পাওয়ার ভরসা কোরো না কিন্তু।" ইতিহাস বিভাগে তখন একটিই রিসার্চ ফেলোশিপ। তার অর্থমূল্য মাসিক একশো টাকা। সেটি পেয়েছে বি.এ. এবং এম.এ. দুই পরীক্ষায়ই ফার্স্ট ঈশান স্কলার অশোক। সে আই.এ.এস হওয়ার আশায় পরীক্ষা দিচ্ছে। যতদিন না সে তার নতুন চাকরিতে যায় ততদিন ফেলোশিপটি পাওয়া যাবে না। প্রাইভেট কলেজে পার্ট টাইম চাকরি মাঝে মাঝে খালি হয় ঠিকই, মাইনে মাসিক পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে। তবে ঠিক তখন কোনও জায়গায় কোনও পদ খালি নেই। সুতরাং রোজগারের একমাত্র পথ প্রাইভেট টিউশনি। সবে পাস করে বের হয়েছি, তাই ও ব্যাপারেও একটু অসুবিধে আছে। তা হলেও সপ্তাহে তিন ঘণ্টা পড়ালে মাসে অন্তত পঁচিশ টাকা তো পাবই। তিন-চারটে টিউশনি করলে মোটামুটি চলে যাওয়া উচিত (সত্যিতে এই সময় মাসে একশো টাকায় একজন লোকেরও চলা সম্ভব ছিল না, যদি না সে পিতার হোটেলে বাস করত)। আর একটা উপদেশও মাস্টারমশাইরা দিলেন। অনেক প্রাইভেট কলেজই কোনও না কোনও বনেদি পরিবারের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল। জানলাম—তাঁদের বাড়ি এক-আধটুকু যাওয়া-আসা রাখলে আখেরে কাজ দিতে পারে। সে চেষ্টাও করিনি এমন বলব না। কিন্তু ও করতে গিয়ে বিবমিষা প্রবল হওয়ায় চেষ্টাটা ছেড়ে দিতে হল। সকলের শরীরে সব কিছু পোষায় না। আমি এম.এ. পরীক্ষার পরও কয়েক মাস ডাফ হস্টেলেই থেকে যাই। সাত বছর সেখানে ছিলাম। পরীক্ষার ফলও বরাবরই ভালই হয়েছে। সুতরাং ওটুকু কৃপা কর্তৃপক্ষ করেছিলেন। মাসে তখনও আটত্রিশ টাকায় থাকা-খাওয়া। এমন সুবিধা আর কোথায় পাওয়া যাবে? তবুও চক্ষুলজ্জা বলে একটা ব্যাপার আছে। কতদিন আর অন্যায্য সুবিধে নেওয়া যায়? '৪৮ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ডাফ হস্টেল থেকে সাত বছরের বাস তুলে বিচিত্র এক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম।

তিব্বত ভ্রমণকারী এবং সম্ভবত ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা শরৎ দাস ৮০ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে একটি বাড়ি করেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'লাসা ভিলা'। দাঙ্গার সময় ওঁর পরিবার-পরিজন লাসা ভিলা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নেন। আমাদের এক বন্ধু দিলীপ ভাওয়ালের সঙ্গে শরৎবাবুর এক মেয়ের পরিচয় ছিল। সেই সুবাদে আমরা বাড়ির দোতলাটা ভাড়া পেলাম— মাসিক দেড়শো টাকায়। আবাসটির নাম দেওয়া হয় ব্যাচিলর্স ডেন। পাঁচজনে মিলে ভাড়া নিলাম। তারপর একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করা হয়। ভাড়া কমানোর জন্য রেন্ট কন্ট্রোলে মামলা রুজু করা হল। খুব বড় বড় তিন-চারটে ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটটির ভাড়া কমে মাসিক পঁচাত্তরে নামল। পাঁচজন ভাড়াটে মাথাপিছু মাসে পনেরো টাকা দিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলাম। কিন্তু পাঁচজনের মধ্যে চারজনই বেকার। পনেরো টাকা দেওয়াও কারও কারও পক্ষে বেশ কঠিন। তাই আরও দু-একজন ভাড়াটে জুটিয়ে মাথাপিছু গচ্ছার অঙ্কটা দশ টাকায় নামানো হয়। তবে এ ব্যাপারে আমরা বাছবিচার না করায় এক-আধটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। একজন এলেন—দু'দিনেই বোঝা গেল তিনি

সমকামী। তখন সমকামিতা বিষয়ে এখনকার মতো উদার সহিষ্ণুতা ছিল না। আর আমাদের মধ্যে আর কেউই সমকামী ছিল না। ফলে ভদ্রলোক একটু অসুবিধেয় পড়েন। আর আবাসিকদের ভিতর দু-তিনজন রীতিমতো প্রাচীনপন্থী। তারা ওঁকে চলে যেতে বাধ্য করে।

ব্যাচিলর্স ডেনে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। ওই ফ্ল্যাটে আসবাবপত্র একুনে দুটি। একটি বেশ জমকালো ফোর পোস্টার খাট আর একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো। পিয়ানো বাজানোর কেউ না থাকায় ওই দ্বিতীয় আসবাবটিও খাট হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু আবাসিকরা সবাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তাই খাট বা পিয়ানোতে কেউ বেশিদিন শুতে পারত না, পালা করে শুতে হত। এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের জীবনে বেশ একটা বৈচিত্র্য এবং অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ এসেছিল। কারণ কে খাটে-পাটে শোবে তা লটারি করে স্থির করা হত। সেই অনিশ্চয়তা আমাদের আরব বেদুইনদের সমধর্মী করে তুলেছিল। মানে আজ যেখানে শুচ্ছি কাল সেখানে শোব তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আর ঘোড়া ছুটিয়ে বালি ওড়াবার সুযোগ আমাদের না থাকলেও মেঝেয় পুঞ্জীভূত ধুলো সে অভাব পূরণ করত। কারণ খবরদারি করার কেউ না থাকায়, আমাদের যে 'কাজের লোক' ছিল সে কখনও কোনও কাজ করত এমন অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারত না। কথাটা অবশ্যি ঠিক বললাম না। আসলে লোকটি ছিল যাকে ভাল বাংলায় বলে কম্বাইন্ড হ্যান্ড—মানে একাধারে পাচক এবং গৃহভৃত্য। [রাজনৈতিক শুদ্ধতার খাতিরে ভৃত্য এবং তার বাংলা প্রতিশব্দটি আমাদের ভাষা থেকে উঠে গেছে। একদিন শুনলাম এক প্রগতিবাদিনী গায়িকা মীরাবাইয়ের সেই বিখ্যাত ভজনটি একটু সংশোধন করে গাইছেন, 'কাজের লোক রাখ, কাজের লোক রাখ, কাজের লোক রাখ, জি!' না, সত্যিতে এরকম শুনিনি! তবে শুনব ভরসা রাখি।] ঘর ঝাঁট দেওয়া জাতীয় নিম্নবর্গের কাজ আমাদের কম্বাইন্ড হ্যান্ড করত না ঠিকই, কিন্তু কম্বিনেশনের একটি অর্ধের ব্যাপারে চট্টগ্রামের ওই বড়ুয়ানন্দন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল—মানে সত্যিকার শিল্পী। আমাদের মতো হতদরিদ্র বেকার যুবকরা ওই রত্নের সেবা পেয়েছিলাম, পূর্বজন্মকৃত পুণ্যফল ছাড়া এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় না।

কিন্তু কাজে যোগ দেওয়ার সময় বড়ুয়াপুঙ্গব একটি শর্ত করেছিল। সে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ। অতএব রক্তপাত তার দ্বারা সম্ভব হবে না। মানে সে কি মাছ-মাংস রাঁধবে না? স্বল্পভাষী মানুষটির সংক্ষিপ্ত উত্তর—এমন কথা সে বলেনি। তার রান্না মাছ-মাংস খেয়ে আমরা উলটে যাব বলেই তার বিশ্বাস। ব্যাপারটা আমরা আর ঘাঁটাইনি। রক্তপাতমুক্ত তার আমিষ রন্ধন পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছি, কদিন পরপর ওর রান্না কই-মাগুর ইত্যাদি জিয়লমাছ খেয়ে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, "বড়ুয়া, রক্তপাত না করে এসব তুমি কি করে রাঁধো?" মোনালিসাকে হার মানানো রহস্যময় হাসি হেসে রন্ধনলোকের সেই চাটগেঁয়ে দা ভিঞ্চি বললেন, "খাইল [=কাল] আফনারে দ্যাহামু।"

বাড়িটার সঙ্গে ছোট একটুখানি জমি ছিল। সেখানে অল্পক'টি অযত্নে মুমূর্ষু বিদেশি গাছ। সেই 'বাগানে' নিয়ে গিয়ে বড়ুয়া তার বিনা রক্তপাতে জিয়লমাছ রান্নার রহস্য উদ্ঘাটন করল। আসলে ব্যাপারটা খুবই সরল। মাটিতে দেখলাম একটি গর্ত খোঁড়া হয়েছে। মাছ কটি তাতে ফেলে মাটি দিয়ে গর্ত বোজানো হল। কয়েক মিনিট পর আবার যখন তাদের তুলে

আনা হল, তখন তাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছে। রক্তপাত হয়ে বড়ুয়ার ধর্মনাশের কোনও সম্ভাবনাই ঘটেনি। স্মিত হেসে পাচকশ্রেষ্ঠ জানাল—সে মুরগিও একইভাবে বিনা রক্তপাতে সংহার করে। অনেকদিন পর ওলন্দাজ নথিপত্রে পড়ি যে, আরাকানের বৌদ্ধ রাজা আরাকানি বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী মেয়েদের রক্তপাত করা নিষিদ্ধ বলে নিরম্বু উপবাসে রেখে শাহ সুজার পরিবারবর্গকে হত্যা করেন। চট্টগ্রাম এক সময় আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল।

কয়েক মাস এমনই ভাবে কেটে গেল। দিগন্তে কোনও চাকরির ছায়াও দেখা গেল না। নতুন পাস করা মাস্টারের টিউশনির রেট দেখলাম পঁচিশ-তিরিশ না, দশ-পনেরো। কলেজে পড়ার সময় জলপানির কৃপায় বাড়ি থেকে পয়সা খুব সামান্যই নিয়েছি। এখন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জীবনধারণের জন্য হাত পাততে হল। এর মধ্যে দিল্লির জাতীয় মহাফেজখানা ওরফে ন্যাশনাল আর্কাইভসে ছোটখাটো একটি চাকরি খালি হল। বাবার কাছ থেকে রাহাখরচা নিয়ে গেলাম। চাকরিটা হল না। এখন ভাবি—ওটা হলে বিশ বছরের মাথায় অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর হয়ে আরও বছর দশেক চাকরি করে সগৌরবে অবসরগ্রহণ করতাম।

দিল্লি থেকে ফিরে ধূর্জটিবাবুর কনিষ্ঠ এবং কুমারের কাকা বিমলাপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে একটা ফোন পেলাম, "আরে তুমি কোথায় ছিলে হে? তোমার জন্যে আমরা একটা চাকরি নিয়ে বসে আছি।" আহ্লাদিত চিত্তে আমার জন্য তুলে রাখা সেই চাকরিটি নিলাম। কর্মস্থল হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ। শুনলাম পর্তুগিজ বা আধা-পর্তুগিজ ব্যবসায়ী বেলিলিওস সাহেবের পত্নী সাহেবের দেওয়ান নরসিংহ দত্তের নামে কলেজটি স্থাপন করেন। ভদ্রমহিলা নাকি দত্তজকে বিশেষ স্নেহ করতেন। এরকম ঘটলে কুলোকে কুকথা বলবেই। সেসবে কান দিতে নেই। বেলিলিওস সাহেব সিঙ্গাপুরে ভেড়া চালান দিয়ে পয়সা করেছিলেন। ভেড়া বিক্রির টাকা গাধা পেটানোয় নিয়োগ করায় যুক্তিবিরুদ্ধ কিছু নেই।

হাওড়া স্টেশন থেকে বাস ধরে নরসিংহ কলেজে যেতাম। তখন কলেজটিতে অনার্স ক্লাস ছিল না। ফলে অন্যের কথা জানি না, আমাকে একটার পর আর পড়াতে হত না। যত দূর মনে পড়ে একটায়ই কলেজ বন্ধ হয়ে যেত। মাইনে ছিল মাসে একশো টাকা। এর উপরে মাগ্‌গি ভাতা হিসাবে আমাদের আরও দশ টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু ভাতা হিসাবে টাকাটা যথেষ্ট নয় বলে কলেজ শিক্ষক সমিতি সভ্যদের ওই দশ টাকা নিতে মানা করেন। ফলে আমরা মাসের শেষে একশো টাকাই পেতাম। কলেজে কানাঘুষা চলত যে, অর্থনীতিতে যাকে রিয়াল ইনকাম বলে তা কারও কারও একশোর চেয়ে বেশি। কারণ ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে একটি বিষয় ছিল বায়োলজি। মাস্টারমশাইরা বায়োলজির প্র্যাক্টিকালে ব্যাঙ না কেটে জ্যান্ত চিংড়ি কাটতেন। পরে ওটা ভেজে খাওয়া হত। তবে এতে ইন্দ্রিয়সুখ কিছুটা বৃদ্ধি হলেও রিয়াল ইনকাম খুব বাড়ার কথা নয়। কারণ তখনকার দিনে দাম বেড়েও চিংড়ির সের [আজকের হিসেবে কিলো] এক টাকা পাঁচ সিকের বেশি না। হাওড়ার বাজারে বস্তুটি আরও সস্তা ছিল।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবনের মস্ত বড় এক পরিবর্তন এসে গেছে। আটচল্লিশের জুলাই মাসে মা-বাবা বরিশাল ছেড়ে আমার অবিবাহিতা ছোট বোন সুজাতা এবং পাঁচ বছর বয়স্ক

ছোট ভাই অপুকে নিয়ে কলকাতা চলে এসেছেন। এই সিদ্ধান্ত আমাদেরই পীড়াপীড়ি এবং উদ্যোগের ফল। তখনও যে বরিশালে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বা স্পষ্টত নিরাপত্তার কোনও অভাব হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে পাকিস্তানে জীবিকা উপার্জন সম্ভব হবে না, একথা বোঝা যাচ্ছিল। জমিদারি প্রথা আর বেশি দিন চলবে না সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। এ অবস্থায় কলকাতা আর বরিশাল দুই জায়গায় দুটি সংসার চালাবার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তা ছাড়া কলকাতার দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে একটা ভয় ধরে গিয়েছিল। নোয়াখালির ঘটনা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেই ভয়টা আরও বেড়ে যায়। ভয়টা যে অমূলক ছিল না বরিশাল শহরে '৫০ সনের দাঙ্গায় সেটা প্রমাণ হয়। আমরা বরিশাল থেকে চলে না এলে যে ওই নরমেধযজ্ঞের বলি হতাম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। ওই যজ্ঞের প্রধান অকুস্থল ছিল আমাদের বাড়ির প্রায় সংলগ্ন স্টিমারঘাট।

মা-বাবা বরিশাল থেকে চলে আসবার সময় ওঁদের সাহায্য করবার জন্য আমিও বরিশাল গিয়েছিলাম। তার আগেই জাতীয় জীবনে এক চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘপন্থী উগ্র হিন্দুত্ববাদী নাথুরাম গডসের হাতে জাতির পিতা নিহত হয়েছেন। দিনটা তপ্ত লৌহের অক্ষরে স্মৃতিতে লেখা আছে। সেদিন দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে দিলীপ রায় গান করছিলেন। উপাচার্য ডক্টর প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। উপাচার্যর আসতে দেরি দেখে দিলীপকুমার রায় গান শুরু করে দেন। গানে খুব মন বসছিল না। কারণ গায়ক নানা ভাষার গান শোনাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, "আজ আপনাদের কিছু গুজরাটি হাসির গান শোনাব।" ভাষাটা জানা না থাকায় খুব যে একটা হাসি পাচ্ছিল, এমন না। হঠাৎ খুব দ্রুতপদে কয়েকজন হলে ঢুকলেন এবং তাঁদের একজন ডেইসে বসা কোনও কর্তাব্যক্তির হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাদের এক মর্মান্তিক দুঃখের সংবাদ শোনাতে হচ্ছে। জাতির পিতা মহাত্মা গাঁধী এক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।" ডেইসে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সভা জুড়ে একটা অর্ধস্ফুট কান্নার আওয়াজ উঠল। সবারই সঙ্গে আমিও কলেজ স্ট্রিটে বের হয়ে এলাম। দেখলাম রাস্তার পাশের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কখন, কীভাবে পায়ে হেঁটে হস্টেলে পৌঁছলাম স্মরণ নেই। দেখলাম বারান্দায় বসে হাঁটুতে মাথা গুঁজে অনেকে কাঁদছে। নিজের ঘরে গিয়ে আমিও নিজেকে সান্ত্বনাহীন শোকের হাতে সমর্পণ করলাম।

বরিশাল যাওয়ার পথে স্টিমারে পুরনো পরিচিত একজন মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে দেখা হল। কথায় কথায় গাঁধী হত্যার প্রসঙ্গ উঠল। বন্ধুটি বললেন, "তোমরা হিন্দুরা না করতে পারো এরকম কাজ বোধ হয় নাই।" দেশভাগ এবং সাম্প্রতিক কালে গুজরাটের ঘটনাবলী দেখে কথাটার সত্যতা অস্বীকার করার পথ আর নেই। তবে অমানুষিকতার ব্যাপারে অন্য সম্প্রদায়রা পিছিয়ে ছিলেন— এমন কথা বলা চলে না। গাঁধী হত্যায় কিছু শিক্ষিত হিন্দুর কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মিহির সেনগুপ্তর সাম্প্রতিক বইটিতে তার বর্ণনা আছে। একজন জগদ্বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত খবরটা শুনে মন্তব্য করেন "কী আর এমন হয়েছে। উনি তো কলেরায়ও মারা যেতে পারতেন।" কথাটা শুনে প্রমথ বিশী ওঁকে জুতো

মারতে চেয়েছিলেন। তবে পাক-ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস আলোচনা করলে মনে হয় আমাদের দেশের মানুষ—হিন্দু মুসলমান শিখ—কেউই অমানুষিক ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে খুব পিছিয়ে নেই। আর শিক্ষিত সভ্য মানুষ কোথায় নামতে পারে জার্মানিতে নাৎসিরা এবং বর্তমানে মার্কিন নিও-কন গোষ্ঠী তার উজ্জ্বল সব উদাহরণ পরিবেশন করেছেন। আমাদের প্রজাতি হিসেবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অহমিকাবশত যেসব ব্যবহারকে পাশবিক বলে বর্ণনা করা হয়—এবং যেসব কার্যকলাপ মানুষ ছাড়া অন্য প্রজাতির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না—বোধহয় যে-কোনও মানবগোষ্ঠী প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে জাতীয় কাজ করতে পারে। নীরদ চৌধুরী একটা কথা বলতেন, সে কথাটা আমিও বিশ্বাস করি। উনি বলতেন স্বভাবদত্ত নীতিজ্ঞানের দিক থেকে পশুরা মানুষের তুলনায় অনেক উঁচুতে। মানুষের ইতিহাসের এক বিরাট অংশ তার অকল্পনীয় কুকর্মের ইতিহাস। জাতীয় গৌরবের ইতিহাসের পাশাপাশি এই অগৌরবের ইতিহাস প্রতি দেশে অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যেন মন্ত্রপাঠের মতো বলতে শেখে "আর কখনও না, আর কখনও না।"

প্রথমে বরিশাল, পরে কীর্তিপাশা গেলাম। কীর্তিপাশা থেকে চলে আসার সময় মাটির তৈরি পুরনো বাস্তুভিটায় পূর্বপুরুষদের প্রণাম জানাতে যাই। ষোড়শ শতকে কোনও সময় বিক্রমপুর থেকে এসে আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রী পূর্বপুরুষ ওইখানে ভিত গেড়েছিলেন। গ্রামে গেলে প্রথমে ওই মাটির তৈরি বাড়িটিতে ঢুকে পূর্বপুরুষদের প্রণাম করতাম। গ্রাম ছাড়বার সময়ও শেষকৃত্য ছিল বাস্তুভিটায় গিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রণাম জানানো। ১৯৪৮ সালে গ্রাম ছাড়ার সময় শেষবারের মতো এই পুণ্যকর্ম করি। এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই—বুক ফেটে কান্না আসছিল। কারণ যেই যা ভাবুক, আমরা ভালই জানতাম যে ওখানে আর ফেরা হবে না। বাহান্ন বছর পরে আবার যখন কীর্তিপাশা যাই তখন আর সেই মাটির বাড়ি অবশিষ্ট নেই। কিন্তু গ্রামের লোক তার অস্তিত্ব ভুলে যায়নি। একজন বৃদ্ধ মুসলমান পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। বললেন, "আপনাগো বাস্তুবিটা এইহানে আছেলে।" দেখলাম একটা মাটির ঢিবি পড়ে রয়েছে।

বাবা অল্প কথার মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে ওঁর গভীর দুঃখ বা সুখের কথা নিয়ে কারও সঙ্গে কখনও কোনও আলোচনা করতেন না। ফলে ওঁর জীবনে একটা নিঃসঙ্গতা ছিল। দেশ ছাড়ার পর কী ফেলে এসেছেন তা নিয়ে আক্ষেপ বা তার কোনও উল্লেখ ওঁকে কখনও করতে শুনিনি। ওঁর বোধহয় আশা ছিল যে, কখনও বরিশাল ফিরে যেতে পারবেন। অন্তত ওদিকে যাওয়া-আসা একেবারে বন্ধ হবে না। তাই অনেক জিনিসপত্র—যেগুলি তখনও নিয়ে আসা সম্ভব ছিল, তা উনি আনেননি। বললেই বলতেন—"পরে নিয়ে যাব।" সেই সুযোগটা ওঁর জীবনে আর আসেনি।

কলকাতায় এসে আমাদের দুঃখের দিন শুরু হল। বাড়ি কিনবার মতো সম্বল আমাদের ছিল না। আর বাড়িভাড়া তখন হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। বাঙালগুলি এসে কলকাতাবাসীর কী সাঙ্ঘাতিক অনিষ্ট করছে—এ আলোচনা তখন প্রায়ই শুনতে হত। অথচ বাঙালরা আসায় কিছু কলকাতাবাসীর যে পোয়াবারো হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যাঁর একটা ভাড়া দেওয়ার মতো ঘর আছে তিনিই তখন রাজা। যাঁরা আরও বুদ্ধিমান—তাঁরা

এই সময় জমি তথা বাঙালদের জন্য কলোনির ব্যবসা খুললেন। এই ব্যবসায় বেশ কিছু বাঙালও নেমে পড়েন। এই ধড়িবাজদের পাল্লায় পড়ে অনেকে সর্বস্বান্ত হলেন। আমাদের সামান্য পুঁজিরও প্রায় সবটাই গচ্চা গেল। শেষ অবধি টালিগঞ্জে ভবানী সিনেমার পিছনে দোতলা-তিনতলা মিলিয়ে একটা চার ঘরের ফ্ল্যাট দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে ভাড়া করা হল। বাড়ির মালিক—জনৈকা মিসেস দাস। কোনও যন্ত্রণাদায়ক অসুখের জন্য উনি রোজই কয়েকবার মর্ফিন ইনজেকশান নিতেন। আর যখন তাতেও কোনও কাজ হত না তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করতেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'গৃহস্থালিতে পাতলুন পরা' অর্থাৎ পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ তা ওই পরিবারে নিঃসন্দেহে মিসেস দাসই করেছিলেন। শিশুর স্বাভাবিক বোধি দিয়ে আমার পাঁচ বছর বয়স্ক ছোট ভাই ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিল। তার প্রমাণ ও মিসেস দাসের বিষণ্ণ গুম্ফবান স্বামীটিকে পুরুষ মিসেস দাস বলে বর্ণনা করত। এই বর্ণনার কোনও বিদ্রূপাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। শিশুর সত্যদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে কলহ কলকাতার জীবনে অতি পরিচিত ঘটনা, 'মানবিক অভিজ্ঞতা' বা হিউম্যান কন্ডিশনের অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের উদ্বাস্তু জীবনে এই অভিজ্ঞতা খুব শিগগিরই এল। প্রথম মাসের ভাড়া দেওয়ার সময় রসিদ চাইলে মিসেস দাস বললেন—রসিদ তিনি দেবেন না। কারণ বাড়ি তো উনি ভাড়া দেননি, উদ্বাস্তু দেখে দয়াপরবশ হয়ে উনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তারপর যা যা ঘটার সবই ঘটল। রেন্ট কন্ট্রোলের শরণাপন্ন হওয়া, বাড়িওয়ালা কর্তৃক জল বন্ধ করা, প্রতিকারের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সব চেয়ে কষ্টকর এবং একই সঙ্গে কৌতুকময় দিক ছিল বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিসেস দাসের ঘণ্টা ধরে গালিবর্ষণ। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যে, আমরা হলাম 'নির্লজ্জ বেহায়া'। টটোলজি কথাটা বোধ হয় বেচারির জানা ছিল না। না হলে বুঝতেন শব্দ দুটি সমার্থক, একটা ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

মিসেস দাসের আশ্রয়ে বাস করা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন আরও দুটি বিপর্যয় ঘটল। আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসি, তখন জমিদারি থেকে রোজগার কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মফস্বল শহরে নিজের বাড়িতে থেকে সেই রোজগারে একরকম চলে যেত। কলকাতা চলে আসার ব্যাপারে বাবার এক প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বরিশাল ছাড়লে ছেলেদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। অত্যন্ত সম্মানী মানুষটির সে ব্যবস্থায় মোটেই মন সায় দিচ্ছিল না। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই উনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি হন। তবু সম্পত্তি থেকে কিছু রোজগার থাকায় ওঁকে সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভর করতে হয়নি। তবে সে রোজগার ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছিল। একে বাবুরা বরিশাল ছেড়ে আসায় তহশিলদার-গোমস্তাদের পোয়াবারো হয়েছিল। মুখোপাধ্যায় পদবির এক তহশিলদার হঠাৎ রায়চৌধুরী বনে গেলেন। তাঁর হালচালও সেই সঙ্গে রায়চৌধুরী জনোচিত হয়ে গেল এবং তার খেসারতটা রায়চৌধুরীদেরই দিতে হল। এই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিই ব্যবস্থা করেন যে, আমাদের মাসোহারাটা বরিশালে এক মারোয়াড়ির হাতে দেওয়া হবে। সে ব্যক্তি শতকরা চল্লিশ টাকা কেটে রেখে শ' প্রতি ষাট টাকা কলকাতায় আমাদের দেবে। এই ব্যবস্থায় সদ্য রায়চৌধুরীত্ব প্রাপ্ত মহাপুরুষটির কী লভ্য ছিল আমাদের জানা নেই। কিন্তু এই সমস্ত

ব্যবস্থাটির মূলে একটি বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কারণ পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে টাকা পাঠানো তখন আইনসঙ্গত নয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার হঠাৎ একদিন এইভাবে টাকা চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলেন। শাস্তি মোটা জরিমানা এবং দীর্ঘদিন কারাবাস। মারোয়াড়ি ব্যবসাদারটি হাত গোটালেন। রাতারাতি সম্পত্তি থেকে যেটুকু প্রাপ্য ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। আক্ষরিক অর্থেই আমরা নিঃস্ব হলাম।

আমরা সবাই জানি—বিপদ কখনও একা আসে না। আমার রোজগার তখনও মাসিক একশো টাকা। দাদা ব্যবসা করতেন। ওঁর রোজগার ভালই ছিল, কিন্তু সব সময় না। হঠাৎ এই সময় দিয়ে উনি এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েন এবং বিনা নোটিসে ওঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। তার উপর জোচ্চোরটি ওঁকে এক জটিল মামলায় জড়াল। বাড়িতে পুলিশের যাওয়া-আসা শুরু হল। তাঁদের শুভাগমন বন্ধ করার জন্য বেশ কিছু ধার করতে হল। মানে অবস্থা সব দিক থেকেই ভাল বাংলায় যাকে বলে চিত্তির।

এমন সময় আমার সদ্য ভাঙা কপাল আংশিকভাবে জোড়া লাগল। অর্থাৎ নরসিংহ দত্ত কলেজে চাকরিটির উপরে আর একটি স্বল্পমেয়াদি পার্ট টাইম চাকরি জুটল। হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা বললেন 'ঈশ্বরের করুণা'। এই ঈশ্বরের করুণা ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যময় ঠেকে। হবেই তো। ঈশ্বর বলে কথা! প্রথম প্রশ্ন, কোন সুবাদে ভদ্রলোক সবাইকে ফেলে আমাকে কৃপা করতে যাবেন? আর কৃপা করারই যদি সদুদ্দেশ্য থাকে তবে তার আগে পথে বসাবার কী প্রয়োজন হয়েছিল? যাতে কৃপার মাহাত্ম্যটা বেশ ভাল করে বুঝতে পারি? পৃথিবীর শতকরা সত্তর ভাগ লোক অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে বাস করছে। প্রাণিজগতে যে যাকে পারে ধরে ধরে খাচ্ছে। উডি অ্যালেনের ভাষায়, জগৎটা যেন পরস্পরকে খাবার এক বিশাল রেস্তোরাঁ। এই যদি ঐশ্বরিক করুণার নমুনা হয়, তবে আমার আবেদন—করুণাটা একটু ভেবেচিন্তে করলে হয় না! দুর্বল প্রকৃতির মানুষ—তোমার প্রেম যে সইতে পারি এমন সাধ্য নেই।

ঈশ্বর অথবা গুরুকৃপায় যে-পার্ট টাইম চাকরি পেলাম তার বিষয়ে দু-একটি তথ্য নিবেদন করি। কথা ছিল রোজ দেড়টা থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে পড়াতে হবে। সপ্তাহে ছ'টার বেশি ক্লাস না। তখন আমারই এক পুরনো শিক্ষক কলেজে কর্তাব্যক্তি। তিনি বললেন—তুমি আরও এক জায়গায় পড়াচ্ছ, তাই একশোর বেশি দেওয়া যাবে না। এতে ওঁর ব্যক্তিগত কোনও লাভ ছিল না। পরে যখন স্নাতকোত্তর বিভাগে চাকরি পাই, তখন স্কেলের গোড়া থেকে শুরু না করে গোটা পঞ্চাশেক টাকা বেশি ধার্য হওয়ায় একজন সহকর্মী সোজাসুজি বলেছিলেন, "আমাদের এত কষ্ট করতে হয়েছে। ওকে অতিরিক্ত সব সুবিধে দেওয়া হবে কেন?" সত্যিতেই সে-আমলের শিক্ষাজীবীরা সারা জীবন এত কষ্ট পেয়েছেন যে, তাঁদের এই মনোভাবের জন্য দোষ দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ঈশ্বরকৃপায় পাওয়া পার্ট টাইম চাকরিটিতে আরও একটি ব্যাপার ঘটল। কথা ছিল সপ্তাহে ছ'ঘণ্টা পড়াবার। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র আমার আর এক পুরনো শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক রীতিমতো দশাসই ছিলেন। বোধ হয় অগ্নিমান্দ্যের প্রকোপ হয়েছিল। যকৃৎঘটিতও কিছু হয়ে থাকতে পারে। সেসব রোগের প্রধান লক্ষণ সর্বকর্মে অনীহা। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লক্ষ

করছি। আমাকে দেখলে অনেক লোকই তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বোধ হয় অ্যালার্জি জাতীয় কোনও সমস্যা হয়। যা হোক, আমাকে বলা হল—"ওঁর ক্লাসকটাও ক'দিন চালিয়ে নাও হে। এই তো কটা দিন।" কটা দিনই বটে। যতদিন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াই ভদ্রলোককে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে সবই আপেক্ষিক। এই নশ্বর জগতে আমরা কটা দিনই বা বাস করি। মোট কথা ওখানে ছ'য়ের জায়গায় সপ্তাহে ষোলো ঘণ্টা পড়াতে আরম্ভ করলাম। তা ছাড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে সকালের খেপে দশ ঘণ্টা। একুনে ছাব্বিশ ঘণ্টা। পড়ানোর অভিজ্ঞতায় একটা সময় আসে যখন নিজের কণ্ঠস্বর শুনলে নিজেরই ঘুম পায়। সেই অবস্থায় পৌঁছতে তখনও কিছু দেরি আছে। সুতরাং অহোরাত্র পড়ানোর অভিজ্ঞতাটা খুব যে খারাপ লাগত, তা নয়।

প্রায় আক্ষরিক অর্থে অহোরাত্রই বটে। কারণ দুশো টাকায় ছ'জন মানুষের সংসার চলে না। আবারও ঈশ্বর কৃপা করলেন। এবার একটু খোলা হাতে। এম.এ. ক্লাসের এক সহপাঠিনী বিয়ে করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্বামীর উৎসাহে আবার পড়তে শুরু করলেন। আমাকে মাস্টার রাখা হল। মাইনে রীতিমতো ভাল। ফলে রুটিনটা দাঁড়াল কতকটা নিম্নবৎ। সকাল সাড়ে আটটায় টালিগঞ্জ থেকে বাসে ঝোঝুল্যমান হয়ে হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে আর এক বাসে নরসিংহ দত্ত কলেজ। একটায় হাওড়া স্টেশনে এসে ওখানকার রেস্তোরাঁয় ভোজন—যার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অগ্নিমান্দ্য হল। তারপর স্কটিশ চার্চ কলেজে 'পার্ট টাইম' ষোলো ঘণ্টা পড়ানো। সেখান থেকে কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে সহপাঠিনীর বাড়ি। ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু বেশি উৎসাহ ছিল। কারণ বাঙালবাড়ি এবং এঁরা উদ্বাস্তু নন। লুচি-তরকারি-মিষ্টান্ন সহযোগে বৈকালিক আহারটা ভালই হত। ওই রকম জলযোগ করার অবস্থা তখন আমাদের আর নেই। মোটকথা সকাল আটটা-সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বের হয়ে রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরতাম। রাত্রে খাওয়ার পর পরদিন যা পড়াতে হবে তা কিছুটা ঝালিয়ে নিতাম। তবে এই রুটিনের ভিতরে গবেষণার কোনও স্থান ছিল না। কিন্তু বইপত্র তখনও সস্তা। ওই আয়ের থেকেই পয়সা বাঁচিয়ে কিছু কিছু বই কিনতাম। বারট্রান্ড রাসেল এবং অলডাস হাক্সলির লেখার সঙ্গে এই সময়েই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। আর কী একটা প্রাইজের টাকায় এভরিম্যানের প্রকাশিত অনুবাদে গ্রিক ক্লাসিকস-এর প্রধান প্রধান বইগুলি কিনে ফেললাম। মূল্য একুনে চল্লিশ টাকা। দোতলায় বারান্দার এক দিকটা পার্টিশন করে ছোট একটি ঘর বানানো হয়েছিল। সেইটা আমার পড়ার ঘর হল। ওখানে বসে অনেক রাত অবধি পড়তাম। কোনও ক্লান্তি বোধ হত না তখন।

যে-জীবনযাত্রা বর্ণনা করলাম বিলিতি উপন্যাসের ভাষায় তাকে সম্ভবত 'স্ট্রাগল' বলে। কিন্তু বাইশ বছর বয়সে কষ্টবোধটা কমই থাকে এবং সে তুলনায় উৎসাহটা কিছু বেশি। সুতরাং ওই জীবনযাত্রাকে জীবনযন্ত্রণা মনে হত না। বেশ খোশমেজাজেই ছিলাম। শুধু অনেক কিছু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকত। ইচ্ছেমতো বই কেনা, ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ভাল জামাকাপড় পরা, ভাল সিটে বসে সিনেমা-থিয়েটার দেখা—এ সব কিছুই সম্ভব হত না। তবে যখন মাস্টারি করার সিদ্ধান্ত নিই, তখনই জানতাম যে, ঠিক রাজার হালে থাকা হবে

না। অতএব খুব যে কিছু ব্যর্থতাবোধে ভুগতাম, তা নয়। যৌবনে আকাশ-বাতাসে এক মাদকতার স্বাদ পাওয়া যায়। সেই স্বাদ ছোটখাটো সব অভাববোধকে ছাপিয়ে উঠে এক তৃপ্তির অনুভূতিতে মন ভরে রাখে। অন্তত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই। সুতরাং কর্মজীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার সুখেরই হয়েছিল, দুঃখের নয়। তার একটা বড় কারণ পেশা বাছবার ব্যাপারে আমার ভুল হয়নি। পড়াতে আমার প্রথম থেকেই খুব ভাল লাগত। আর সেই ভাল লাগাটা সম্ভবত আমার চেতনা থেকে শ্রোতাদের চেতনায় কিছুটা সঞ্চারিত হত। পড়ানো থেকে অবসর নিয়েছি প্রায় বারো বছর হতে চলল। উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে এখনও ভাল লাগে।

উদ্বাস্তু হিসেবে নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার আরও কারণ ছিল। যাঁদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে ওঠাবসা করে বড় হয়েছি, দেশভাগের পর তাঁদের কারও কারও জীবন আমাদের তুলনায় শতগুণে নির্মম হয়েছিল। আমাদের 'সেজ কোঠা' অর্থাৎ সেজ ঠাকুর্দার ছেলে এবং নাতি-নাতনিরা কেউ কেউ কীর্তিপাশায় থেকে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সেজ জ্যাঠার ছোট ছেলে কালুদার সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রীতির বন্ধন ছিল। একদিন শুনলাম কালুদা রিজেন্ট পার্কে উদ্বাস্তুদের জবরদখল করা জমিতে নিজের হাতে বাড়ি তুলেছে। খুব উৎসাহের সঙ্গে সেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দেখলাম একটি খোলার ঘর, মেঝে মাটির। স্নান বা পায়খানার কোনও ব্যবস্থা নেই। যে-সেজ জ্যাঠামশাইকে সবাই বাঘের মতো ভয় পেতাম, তিনিও দেখলাম ওই একটি ঘরের মধ্যেই আছেন। কীর্তিপাশার জমিদারভবন ছেড়ে ওই ঝুপড়িতে এসে থাকতে ওঁদের কেমন লাগছিল তা আমার জানা নেই। সেজ জ্যাঠা এখানে থাকতে পারেননি। বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে উনি কীর্তিপাশা ফিরে যান। সেখানেই ওঁর মৃত্যু হয়। কালুদা সপরিবারে ওই ঝুপড়িতেই থেকে যায়। শুনেছি ওই কাঁচা বাড়ির পরে কিছু সংস্কার হয়েছিল। ওই প্রিয়জনটির তুলনায় আমরা যে প্রায় স্বর্গে বাস করছি, এই কথা জেনে ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করার কুরুচি থেকে নিষ্কৃতি পাই।

আমাদের কিছু ভাগ্য পরিবর্তন ঘটল '৪৯ সনে। প্রথম, পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের ফলে আমরা মিসেস দাসের আশ্রয় ছেড়ে বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে বেশ বড় একটি ফ্ল্যাটে এসে উঠি। বেনেপুকুর অত্যন্ত ঘিঞ্জি জায়গা। তাই বাইরে থেকে ওই ফ্ল্যাটের মাহাত্ম্য বোঝা যেত না। আসলে আমাদের নতুন বাসস্থানটি ফ্ল্যাট না, উনিশ শতকের ছোটখাটো একটি প্রাসাদের নীচের তলা। সবাই জানে মহীশূর রাজ্য জয় করার পর ইংরেজরা টিপুর ছেলেদের কলকাতা নিয়ে আসে এবং তাদের কিছু জমিদারি সম্পত্তি দেওয়া হয়। তার একটি টালিগঞ্জ এবং কালীঘাট অঞ্চলে। অন্যটি এন্টালির কাছে তাঁতিপাড়া-বেনেপুকুর এলাকায়। দ্বিতীয় সম্পত্তিটির অধিকারীরা তাঁতিপাড়ার নবাব বলে পরিচিত ছিলেন। আমরা যে-বাড়িটিতে তখন ভাড়াটে হয়ে ঢুকলাম সেটি আসলে তাঁতিপাড়ার নবাববাড়ি। এক সময় এই বাড়িটির সঙ্গে বিস্তৃত জমি, বাগান এবং অনেক আউট হাউস ছিল। বর্তমান বেনেপুকুর বাজারের সমস্তটাই এই বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতরে ছিল। ওই বাজারের প্রবেশপথে নিতান্তই বিসদৃশভাবে একটি সাবেকি তোরণ আছে। সেই তোরণটি এককালে নবাববাড়ির সিংদরজা ছিল। এইসব তথ্য আমার আবিষ্কৃত না। কথাগুলি কোথাও পড়েছি এমনও না। নেহাতই

লোকমুখে শোনা। তবে যত দূর জানি খবরগুলি নির্ভুল। নবাববাড়িটি সম্ভবত এক হাত ঘুরে অহিধর ঘোষ নামে এক জমিদারের কাছে বিক্রি হয়। এই বিলাসব্যসনপ্রিয় ভদ্রলোকটি বাড়িখানা লর্ড সিনহার কাছে বাঁধা রাখেন। আমরা যাঁদের কাছ থেকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিই, সেই নন্দীবাবুরা লর্ড সিনহার কাছ থেকে বাড়িটা কেনেন। মাঝের বিরাট হলঘরটা ছাড়া পুরো নীচতলাটা আমরা ভাড়া নিই। ওই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন হয়নি। নন্দীবাবুরা কখনও আমাদের উৎখাত করার বা এক পয়সাও ভাড়া বাড়াবার চেষ্টা করেননি। এই নিপাট ভদ্রলোক পরিবারটির সঙ্গে লেনদেন আমাদের বিশেষ সুখের কারণ হয়েছিল। ওই বাড়িতেই আমার বাবা, মা এবং দাদা মারা যান এবং দাদা মারা যাওয়ার পর আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিই। নন্দীদের সঙ্গে আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কোনও আত্মীয়র কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা বা বিপদে-আপদে সাহায্য আমরা পাইনি।

এই যে-বাড়িটিতে আমাদের পরিবারের অনেকগুলি বছর কাটে সেই বাড়িটি সম্বন্ধে আরও দু-এক কথা বলতে চাই। লিনটন স্ট্রিট এবং মধ্য কলকাতার আর পাঁচটা ঘিঞ্জি গলির ভিতর আপাতদৃষ্টিতে তফাত কিছু নেই। কিন্তু ওই রাস্তায় বড় গেটওয়ালা দু-তিনটে পুরনো জমিদার বাড়ি ছিল। ২৭ নম্বর লিনটন স্ট্রিট তাদের একটি। এইসব বাড়ির গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকলে মনে হত সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে ঢুকেছি। আমরা যে বাড়িতে ভাড়াটে, সেখানে কম্পাউন্ডের ভিতরে অনেক জমি এবং বড় একটি পুকুর ছিল। সংস্কারের অভাবে নষ্ট হওয়ার আগে বেশ কয়েক বছর ওই পুকুরে আমরা স্নান করেছি। আর ছিল নানা সৌখিন গাছপালা। যত্নের অভাবে তার বেশ কিছু জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। ঝোপঝাড়ের ভিতরে কোথাও কোথাও আধভাঙা পাথরের মূর্তিও উঁকিঝুঁকি মারত। বাড়িটির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছেলেপিলেদের অপার আনন্দের কারণ হয়েছিল। নন্দীবাবু বাগানের পরিচর্যা করার বদলে তার বড় একটি অংশ এক ফিরিঙ্গি ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছিলেন। ২৭ নম্বর লিনটন স্ট্রিটের বাসিন্দারা তাঁকে পাখি সাহেব আখ্যা দিয়েছিল। সাহেবটি প্রজাতি হিসাবে পাখি নন, মানুষই ছিলেন। কিন্তু ওঁর ব্যবসা ছিল পশুপাখির—মানে যেসব পশুপাখি মানুষের পোষবার সম্ভাবনা—সেই সুবাদে উনি পাখি সাহেব। সচরাচর দেখা যায় না এই রকম নানা পশুপাখি নিয়ে ওঁর কারবার। নন্দীবাবুদের অযত্নলাঞ্ছিত বাগানে ছোট-বড় খাঁচায় এদের সাময়িক বাসস্থান নির্দিষ্ট হত। দক্ষিণ ভারতের জঙ্গল থেকে আনা লরিস বা লজ্জাবতী বাঁদর তার মধ্যে সংখ্যায় কিছু বেশি ছিল। এই ছোট বাঁদরের সাইজের জন্তুটি আসলে লিমার জাতীয় প্রাণী। এরা নিশাচর জীব। সারা দিন তারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দলা পাকিয়ে থাকত। সন্ধে হলে দলা থেকে বের হয়ে এসে তারা নিজ নিজ বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যাপৃত হত। আর সে চেষ্টার প্রধান অভিব্যক্তি প্রচণ্ড মারামারি, রক্তারক্তি কাণ্ড। বিদেশে বাঙালি গোষ্ঠীর ভিতর এই আচরণের প্রতিফলন অনেকবার দেখেছি। দশ-বিশটি পরিবার পরস্পরসম্পৃক্ত হয়ে প্রায় দলা পাকিয়ে বাস করেন। কিন্তু দেখবেন, এই বছর যারা পরস্পরকে ছেড়ে একদিনও থাকতে পারে না, পরের বছর হয়তো তাদের পরস্পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। লরিসরা তাদের আচরণ প্রবাসী বাঙালিদের কাছে শিখেছে না শেষোক্ত

গোষ্ঠী লরিসদের ঘরে নাড়া বেঁধেছিল, সঠিক বলতে পারব না। ঈশপ বা পঞ্চতন্ত্রের লেখক এ জাতীয় ব্যাপার দেখলে সম্ভবত একটি নীতিবাক্য আবিষ্কার করতেন—বেশি জড়াজড়ি বা দলা পাকানো সুবুদ্ধির কাজ না।

আমাদের পারিবারিক জীবনে আরও দুটি ঘটনা ঘটল '৪৯ সালে। দাদা নেতাজির শিক্ষক বেণীমাধব দাসের দৌহিত্রী এবং বিপ্লবী বীণা দাসের দিদির মেয়ে মাধুরী সেনকে বিয়ে করলেন। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অল্পবিস্তর যে-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার সুবাদে আমাদের পরিবারকে কলকাতায় একটি বাস চালাবার লাইসেন্স দেওয়া হল। ওই বাসটি দিয়ে আমার মা-বাবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হল। বাবা ছেলেদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। শুভার্থীরা বলতে লাগলেন, এতদিনে খদ্দর পরিধানের সুফল ফলল। 'লাইসেন্স পারমিট রাজ' তার অন্যতম তাঁবেদারকে পুরস্কৃত করল। অর্থাৎ ১৯৪৯ সনে বাসের লাইসেন্স পাওয়া যাবে এই হিসাব করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুবক অমিয় রায়চৌধুরী ১৯২০ সনে নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে এম.এ. ক্লাস থেকে বের হয়ে এসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই অপবাদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার উৎসাহ বা প্রবৃত্তি বাবার হয়নি। কলকাতা চলে আসার পর বহু জনের সঙ্গপ্রিয় মানুষটি সমস্ত রকমের সামাজিকতা থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। পিতৃভূমি এবং সাত পুরুষের সম্পত্তি হারিয়ে ওঁর যদি কোনও আঘাত লেগে থাকে তবে এ ছাড়া তার আর কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

ওই বছরই নরসিংহ দত্ত এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে সরকারি কলেজে চাকরি পেলাম। আগেই লিখেছি—সরকারি চাকরিতে হিন্দু এবং মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা সমান সমান করার চেষ্টার ফলে বেশ কিছু বছর ধরে যুক্তবঙ্গে হিন্দুদের চাকরি পাওয়া অসম্ভব না হলেও রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থার উলটো পিঠ হল সব সরকারি কাজেই বেশ কিছু মুসলমান বহাল হয়েছিলেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর এঁদের বেশ একটা বড় অংশ পাকিস্তানে চলে যান। অতএব হঠাৎ অনেক পদ খালি হল—বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগে। তারই সুবাদে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ-এ—যার আগে নাম ছিল ইসলামিয়া কলেজ এবং বর্তমান নাম মৌলানা আজাদ কলেজ—একটি চাকরি জুটল। এই চাকরির মান এবং প্রকৃতি বিষয়ে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন, তা থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের অনুচ্চারিত মূল্যবোধ বুঝতে কিছুটা সুবিধে হতে পারে। এবং সে মূল্যবোধ সমূলে উৎপাটন করতে যে বেশ কিছু সময় লেগেছিল সে কথাও বুঝতে সুবিধে হবে।

সরকারি চাকরিতে যে জাতিভেদ প্রথা—বামুন-কায়েত ভেদাভেদ অত্যন্ত প্রবল একথা সকলেরই জানা। গ্রেড শব্দটা চাকরির জগতে বর্ণ-ধর্মেরই নামান্তর। সে হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পাস করা চাকুরেরা ব্রাহ্মণ, অবশ্যি তাঁদের মধ্যেও কুলীন-অকুলীন, নৈকষ্য ইত্যাদি সূক্ষ্মতর ভেদাভেদ আছে। কেন্দ্রীয় সরকারে পরীক্ষা পাস করে চাকরি যারা পেত, তারা বি.এ, এম.এ-তে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস, যদিও তা হতেই হবে এমন কোনও নিয়ম ছিল না। বিশেষ সৌভাগ্য জ্ঞান করে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে যে-চাকরি আমি নিলাম, তার সরকারি নাম সাবর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস। হাকিম

গোষ্ঠীর মধ্যে এর তুলনীয় ছিল সাব-ডেপুটির চাকরি, গেজেটেড কর্মচারীদের মধ্যে নিম্নতম পদাধিকারী। তার নীচে শুধু করণিক এবং পিয়ন। যখন আমি সাবর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসে ঢুকি তখন এম.এ-তে ফার্স্ট ক্লাস না পেলে ওই চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সত্যিতে অনেক আই.এ.এস, আই.এফ.এস পদাধিকারী ডিগ্রির হিসাব করলে সাবর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিসের চাকুরেদের তুলনায় নিরেশ ছিলেন। সরকারি শিক্ষা বিভাগে আরও এক বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল। সাবর্ডিনেট সার্ভিসের উপরের স্তর ছিল প্রভিন্সিয়াল বা বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিস। পদমর্যাদায় ডেপুটিদের সঙ্গে তুলনীয়। এই স্তরে সোজাসুজি ঢোকা প্রায় অসম্ভব ছিল, সাবর্ডিনেট সার্ভিস দিয়ে শুরু করতে হত। কিন্তু প্রশাসনিক বিভাগে চাকরির ক্ষেত্রে এ নিয়ম ছিল না। মানে ডেপুটি হতে হলে প্রথমে সাব-ডেপুটির চাকরি নিতে হত না। আর ওই স্তর থেকে উচ্চতম স্তর সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস—যেখানে নাকি হাতে গোনা অল্প কয়েকটি চাকরি ছিল, সেখানে পদোন্নতির প্রায় কোনও উপায় ছিল না। সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে প্রবেশাধিকার বিলাতি ডিগ্রি ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই ভারতবিখ্যাত প্রফুল্ল ঘোষ যখন বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে চাকরি করছেন, তাঁর তরুণ ছাত্র অপূর্ব চন্দ তখন অক্সফোর্ড থেকে সদ্য পাস করে এসে সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে ঢুকলেন। এই বিলিব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি খুব স্পষ্ট। শিক্ষাটা প্রাদেশিক সরকারের আওতায়, সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি চাকুরেরা কখনও সর্বভারতীয় আমলাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। দ্বিতীয় কথা, প্রাদেশিক স্তরেও শিক্ষকদের আমলাদের সমকক্ষ হতে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এগোতে হবে। আর তুমি মহামহোপাধ্যায়ই হও বা সামস-উল-উলেমাই হও, সদ্য পাস করা অক্সব্রিজের ছোকরা সাহেবের সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না। এরপর ভারতীয়দের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বিষয়ে ইংরেজ সরকারের চিন্তাধারা সম্পর্কে আর কিছু বলা প্রয়োজন মনে হয় না। নুরুল হাসান সাহেব শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার আগে অবধি এই চিন্তাধারার পুনর্বিচার হয়েছিল এমন কোনও প্রমাণ নেই। শুধু একটা ব্যাপারে বোধ হয় হয়েছিল। অধ্যাপক হামফ্রে হাউসের 'আই স্পাই উইদ মাই লিটল আই' গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু শিক্ষককে গোয়েন্দার কাজে লাগানো হত। আমাদের ছাত্রাবস্থায়ও এই ব্যবস্থা চালু ছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আজাদ হিন্দুস্থানে অন্তত ওই ব্যাপারটায় দাঁড়ি টানা হয়।

সরকারি কলেজে চাকরির অভিজ্ঞতাটা আমার নানা কারণেই সুখের হয়নি। প্রথমেই গোলমাল বাধল স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে। চক্ষু পরীক্ষক রায় দিলেন—সরকারি চাকরিতে চশমার পাওয়ার যত দূর পর্যন্ত বরদাস্ত করা হয় আমার তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং চাকরি নাকচ। কিঞ্চিৎ খুঁটির জোর ছিল। বিধান রায় এবং শিক্ষামন্ত্রী দু'জনেই পরিচিত। তাঁরা চোখের ব্যাপারটা মকুব করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু ওভাবে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে আমলারা সাধ্যমতো বাধা দেয়। সুতরাং রফা হল দশ বছরের চুক্তিতে আমার চাকরি হবে, তবে প্রতি বছরই চোখ দেখাতে হবে, অন্ধত্বের লক্ষণ দেখা দিলেই চাকরি খতম। ঘোড়া না ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার আমার উপায় ছিল না, কিন্তু এতে যে ঘোড়ারা বেজায় চটে যাবেন, সে বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ ছিল না।

এই সময় থেকে একটি ক্ষমতাশালী মানুষের সঙ্গে আমার দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত শুরু হয়। নানা কারণে এই বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু লেখা কঠিন। কিন্তু কিছু না লিখলে আমার কর্মজীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তার চেয়েও বড় কথা—বর্তমান রচনাটি একটি বিগত যুগের বর্ণনা। একজন সাধারণ মানুষের স্মৃতিকথা মারফত সেই অভিজ্ঞতার ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। সমাজ এবং শাসনযন্ত্রের চাপে পড়ে ব্যক্তিমানুষের কী হাল হতে পারত আমার বিবরণীর অন্যতম বিষয় তাই। সুতরাং পরবর্তী ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ চেপে গেলে আমার লেখার উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হবে।

আমার দ্বিধার কারণ—আমার অত্যন্ত কাছের কিছু মানুষ (যাঁদের একজন আমার স্ত্রী) যাঁর কথা বলব তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং তাঁর কাছ থেকে স্নেহ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। ভারতীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যাঁর জীবনে, আমার আলোচ্য ব্যক্তি তাঁর স্নেহধন্য। তাঁর কিছু কীর্তি বাঙালি জীবনে সম্পদ হয়ে রয়েছে এবং ভারতের অন্যত্র উচ্চপদে তিনি বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন। এই বহু গুণসম্পন্ন উঁচুদরের মানুষটির আমার সঙ্গে বিরোধ ঘটেছিল বলেই তিনি ব্রাত্যপদবাচ্য এ কথা ভাবলে আমার ইতিহাস লেখার স্পর্ধা ত্যাগ করা উচিত। এক শিক্ষাব্রতীর আত্মচরিতে ওঁকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। সে গালিগালাজ ওঁর প্রাপ্য এ কথা আমি কোনও মতেই মনে করতে পারি না। সবচেয়ে বড় কথা তিনি প্রয়াত। আমার জবানি আমি লিখে যাব অথচ প্রতিপক্ষর জবাব দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই, এটা ভদ্রলোকের কাজ না। মৃত লোকের নিন্দা না করে ইতিহাস লেখা চলে না। কিন্তু যেখানে বিষয়বস্তু নিজের সঙ্গে বিবাদ সেখানে ঐতিহাসিকের কর্তব্য প্রতিটি অক্ষর সাবধানে হিসাব করে লেখা। তাই প্রথমেই একটা কথা বলে নিই। আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে ভদ্রলোক এমন কোনও কাজ করেননি যার একটিকেও ক্ষমতার অপব্যবহার বলা চলে। তবে যা আইনসঙ্গত, তা-ই ন্যায়সঙ্গত কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানেও বলি—একটা সংঘাতের বিবরণে এক পক্ষের জবান অর্ধসত্য হওয়ার আশঙ্কা সব সময়েই থাকে। সুতরাং ঘটনাগুলি বলার আগে বর্তমান ভণিতাটির প্রয়োজন ছিল।

সরকারি কলেজে চাকরি করতে গিয়ে একটি দুঃখময় ব্যাপার আমার নজরে আসে। কতগুলি বিশেষ কারণে ওই প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক হাত-কচলানোর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। শিক্ষাদপ্তরে কেরানি শ্রেণির একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি এক শক্তিশালী পদাধিকারীর একান্ত সচিব। ছুটি, বদলি, পেনশন, এই জাতীয় সব ব্যাপারেই এই লোকটি প্রকৃতপক্ষে সর্বেসর্বা ছিলেন। আর বিরাট বিরাট পণ্ডিত মানুষগুলিকে তিনি কখনও অপমান করে, কখনও তাচ্ছিল্য দেখিয়ে, কখনও বা দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ করে নিজের ক্ষমতা বেশ রসিয়ে উপভোগ করতেন। দুঃখের কথা এই যে, বিদ্বান বুদ্ধিমান সব লোক এই অপমান মাথা পেতে মেনে নিতেন। অনেক সময় হয়তো অন্য কোনও পথ থাকত না। কিন্তু যে-প্রবল আত্মসম্মানবোধ থাকলে মানুষ দুঃখকষ্ট সহ্য করেও অন্যায় অপমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সেই আত্মসম্মান তখন আমি খুব অল্পসংখ্যক সংসারী লোকের মধ্যেই দেখেছি। আমার ধারণা আত্মসম্মানবোধের এই অবক্ষয় দীর্ঘ দিন বিদেশি শাসনের ফল। আমাদের

জীবনে গাঁধীজির সবচেয়ে বড় অবদান এই হীনম্মন্যতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা। শুধু সরকারি কলেজ কেন, কোনও কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও দেখেছি, ডাকসাইটে সব পণ্ডিত ব্যক্তি পরিবারবিশেষের বৈঠকখানায় মোসাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এই পরিবেশে শিক্ষিত রুচিবান মানুষেরও কিছুটা সাংস্কৃতিক অবনতি না ঘটাই আশ্চর্য।

যে-সংঘাতের কথা বলছি, তা তিনটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত। একটির কথা পরে যথাস্থানে বলব। আর দুটি ঘটনা আমার কর্মজীবন শুরু হওয়ার সময়কার। এবং দুটি ঘটনাই ঘটবার বেশ কিছু পরে আমার কানে আসে। আমার সরকারি চাকরি সংক্রান্ত ঘটনার কিছুদিন পর মার্কিন সংবাদ দপ্তর ইউ.এস.আই.এস-এর পক্ষ থেকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপের বিজ্ঞাপন বের হয়। আমি দরখাস্ত করি এবং স্কলারশিপটি আমি পেয়েছি জানিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমাকে চিঠি দেন। তার আগের বছর অমলেশ ত্রিপাঠী ওই স্কলারশিপেই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। ওঁর পরামর্শমতোই আমিও কলাম্বিয়াতেই ভর্তি হই। যাত্রার প্রস্তুতির জন্য কী কী কেনা প্রয়োজন তা জানিয়ে আমাকে চিঠি দেওয়া হয় এবং আমি তার অনেক কিছু কিনেও ফেলি। যখন যাত্রার দিন প্রায় এসে গেছে তখন চিঠি এল যে, অনিবার্য কারণে স্কলারশিপ আমাকে দেওয়া যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ এজন্য দুঃখিত। এ বাবদ আমার কিছু খরচা হয়ে থাকলে তাঁরা তার জন্য খেসারত দিতে রাজি। ধন্যবাদ দিয়ে ওঁদের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি। অনেক বছর পর যে-ভদ্রমহিলা প্রোগ্রামটা চালাতেন তাঁর সঙ্গে আমার আমেরিকায় দেখা হয়। তিনি সেই পুরনো কথা তুলে বলেন যে, স্কলারশিপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎ বদল হওয়ার কারণ তখন ওঁরা আমাকে জানাতে পারেননি। আসলে সিদ্ধান্তটা ওঁদের নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তাঁরা নাকি চিঠি দিয়ে জানান যে, আমি চাকরির শর্তাবলী উপেক্ষা করে ওঁদের অনুমতি ছাড়াই দরখাস্ত করেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সত্ত্বেও যদি মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমাকে স্কলারশিপ দেন তা হলে তাঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভবিষ্যতে কোনও সহযোগিতা করতে পারবেন না। এই চিঠির পর ওঁদের পক্ষে আমাকে স্কলারশিপ দেওয়া আর সম্ভব ছিল না। সত্যি কথা বলতে, আমার জানা ছিল না যে, স্কলারশিপের জন্যও কর্তৃপক্ষের মারফত আবেদন করতে হয়। কারণ একই সময় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, তা সরকারের মাধ্যমেই। আমি চাকরিসংক্রান্ত আইন ভেঙে থাকলে সে বিষয়ে প্রথমে আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার কথা। কিন্তু আমার যে কোনও অন্যায় হয়েছে এবং সেজন্য আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হচ্ছে—সেসব কথা কখনওই আমাকে জানানো হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াও হয়নি। আমার ধারণা আমার কিছুটা খুঁটির জোর না থাকলে অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমার চাকরিটি যেত।

ফুলব্রাইট স্কলারশিপ না পেয়ে শেষ অবধি কিন্তু আমার শাপে বর হয়। পরের বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্টেট স্কলারশিপের জন্য বিজ্ঞাপন দিলেন। ততদিনে আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইসলামিক ইতিহাসে লেকচারারের পদ পেয়েছি। তখনও মাস্টারি করতে এসে এত অল্পদিনের মধ্যে ওই বিভাগে পাকা চাকরি পাওয়া প্রায় অভাবনীয় সৌভাগ্য। ইসলামিক ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান' অধ্যাপক

মাখনলাল রায়চৌধুরী সমর্থন করায় এই অসম্ভব সম্ভব হয়। তবে মাইনে তখনও দুশো থেকে চারশোর স্কেলে। যা হোক, বেড়ালের ভাগ্যে আরও একটি শিকে ছিঁড়ল। আমি স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম। আর পরের ঘটনাটি ইংরেজিতে যাকে বলে সাক্ষাৎ ঘোড়ার মুখ অর্থাৎ স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শোনা। আমাকে স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যাপারে যিনি আমার মার্কিন স্কলারশিপ পাওয়া বন্ধ করেছিলেন তিনিই আবার আপত্তি তোলেন। এবারকার যুক্তি আমার মেডিক্যাল রিপোর্ট। স্টেট স্কলারশিপের অন্যতর শর্ত, ফিরে এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-চাকরি দেবে সেটা নিতে হবে। এই চাকরি সাধারণত কলেজে পড়ানোর কাজই হয়। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির কারণে আমাকে পাকা চাকরি দেওয়া যায়নি, অতএব...। এবার আমার খুঁটির শরণাপন্ন হতে হয়নি। খুঁটি স্বয়ংই ঠিক করেন যে, এই যুক্তি শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত না। ফলে সচিবের পরামর্শ বাতিল হয়। আমি অক্সফোর্ড যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে আমি দু' বছর পড়িয়েছিলাম, প্রথম বছরটা পার্ট টাইমার হিসেবে। কর্মজীবনে ওই দুটি বছর আমার সুখের সময়। সহকর্মী আমার মাস্টারমশাইরা। তাঁদের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা এবং স্নেহের বন্ধনে কোনও খাদ ছিল না। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ সত্যিসত্যিই আদর্শবাদী জীবনযাপন করতেন। জীবনের নানা ব্যর্থতা, অভাব-অভিযোগ উপেক্ষা করে এক মনে নিজের কাজ করে যেতেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সাধনা বলে একটি শব্দ আছে। এঁদের কারও কারও জীবন সত্যিকার সাধনাকে কেন্দ্র করে উদযাপিত হত। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহকে দেখতাম—প্রতিদিন পড়ানো শেষ হওয়া মাত্র ট্রামে বা বাসে চড়ে হয় প্রাদেশিক সরকারের মহাফেজখানা, নয়তো হাইকোর্টের নথিপত্র দেখতে রওনা হচ্ছেন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে কখনও দেখিনি। তখন রীতিমতো অসুস্থ অধ্যাপক হেম রায়চৌধুরী সপ্তাহে একদিন পড়াতে আসতেন। শক-কুষাণ আক্রমণ বিষয়ে ক্লাসে ওঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। উনি মধ্য এশিয়ার স্তেপ থেকে ঘোড়ার পিঠে একটার পর একটা যাযাবর দল ভারতবর্ষের সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে তার বর্ণনা দিতেন। তাদের পোশাক-আশাক, আহার-বিহার, যে-প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের হাজার হাজার মাইল পার হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করছে সব কিছু যেন চোখের সামনে ফুটে উঠত। হেমবাবু অত্যন্ত স্পর্শকাতর সাবধানী মানুষ ছিলেন। বই লেখার সময় ওঁর এক প্রধান চিন্তা থাকত—কোথাও কোনও ভুল না হয়। এই দিকটায় নজর বেশি দেওয়ায় ওঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সব লেখা কিছুটা রসকষবিহীন হত। কিন্তু ওঁর ক্লাসে পড়ানো সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের জিনিস ছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী এবং দিলীপকুমার বিশ্বাস দু'জনের কাছেই ওঁর বক্তৃতার বিস্তৃত নোট ছিল। তা ছাপাবার কথা অনেকবারই হয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি কিছু করা হয়ে ওঠেনি। এখন ওঁরা দু'জনেই প্রয়াত। বাঙালি সংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার মান কী ছিল তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে হেমবাবুর পড়ানোর কথা উল্লেখ করলাম। আরও সব বিরাট পণ্ডিতদের চারপাশে দেখতে পেতাম। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় রোজই আসতেন। অত্যন্ত বিদগ্ধ আলোচনার পাশাপাশি দমফাটা সব হাসির গল্প উনি বলতেন। ওঁর একটি কাহিনি ছিল প্রথম বিলেত যাবার সময়

ওঁর এক পশ্চিম রাজস্থানী সহযাত্রীকে নিয়ে। এডেনে জাহাজ থামতেই সবাই বেড়াতে চলেছে—ওই ছেলেটি ছাড়া। ও অপেক্ষা করছে 'ঠাস কুক'-এর জন্য। কারণ পিতাজি বলে দিয়েছেন বিলেতে "ঠাস কুক মেরা গার্জিয়ান হ্যায়।" যখন সে শুনল সুনীতিবাবু ডক্টরেট করতে যাচ্ছেন, তখন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, "ও মেরা ভি একঠো চাহিয়ে।" ওর কাম্য বস্তুটি কী জানতে চাইলে সে ব্যাখ্যা করল, "জিসকো বারে মে আপনে কহা—ওহি—ডগডরেড। সুনা হ্যায় ওহ বহৎ বঢ়িয়া চিজ হ্যায়।" অধ্যাপক বললেন, কিন্তু তুমি যে শুধু ম্যাট্রিক পাস। স্মিত হাস্যে মারবাড়নন্দনের উত্তর—"আরে আপকো পতা নেই। ঠাস কুক মেরা গার্জিয়ান হ্যায়। পয়সা দেনেসে ও সব কুছ লা দেতা।" সত্যিই তো, যে-পয়সা নিয়ে সাতসমুদ্র পার করে দিচ্ছে, ডগডরেড তো তার কাছে ছেলেখেলা! সুনীতিবাবুর আর একটি বিখ্যাত 'অ্যাক্ট' ছিল মাউন্টব্যাটেন-রাজেন্দ্রপ্রসাদ পত্নীর সাক্ষাৎকার। রাষ্ট্রপতি নাকি তাঁর হুক্কাপানপ্রিয় পত্নীকে 'মৃত্যুঞ্জয় কি মায়ী' বলে সম্বোধন করতেন। রাজনৈতিক শুদ্ধতা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক সুসম্পর্কের কথা মনে রেখে কাহিনির বাকি অংশটা চেপে গেলাম।

স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানোর অভিজ্ঞতা বিষয়ে আর কিছু লেখার আগে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের কথায় একবার ফিরে যেতে চাই। ওখানে সহকর্মী হিসাবে পেলাম ইতিহাস বিভাগের প্রধান অমলেশদাকে। আর অর্থনীতি পড়াতে এল সহপাঠী কল্যাণ সেন। এ ছাড়া ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক সুনীল সেন এবং কল্যাণের দাদা দিলীপ। আর সব চেয়ে বড় লাভ হল সহকর্মী হিসাবে কবি বিষ্ণু দে-কে পেলাম। অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির মানুষ বিষ্ণুবাবু একটি ব্যাপারে বড় স্পর্শকাতর ছিলেন। উনি ওঁর কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে কোনও ঠাট্টা সহ্য করতে পারতেন না। আর সুনীল সেন খালি ওই প্রসঙ্গ তুলে ওঁকে খোঁচাতেন। একদিন উত্ত্যক্ত হয়ে বিষ্ণুবাবু বললেন—ওঁর কবিতা মেয়েদের আর শিশুদের বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। ওঁর মুশকিল হয়েছে শুধু অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নিয়ে। বিষ্ণুবাবুর কবিতা পড়ে বোঝে এরকম শিশু বোধহয় সংখ্যায় কিছু কমই হবে। কিন্তু ইচ্ছে হলে উনি সত্যিই এমন সব কবিতা লিখতেন যা কোনও শিশুরই দুর্বোধ্য মনে হওয়ার কথা নয়। এমনকী আমাদের মতো অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্তরও বুঝতে অসুবিধে হত না। কল্যাণের দাদা দিলীপ সেনের বিয়ে উপলক্ষে উনি ওই রকম একটি চটুল কবিতা লিখেছিলেন। প্রথম লাইনটা শুধু মনে আছে : "দিলীপ সেনের কেন এত ঘোরাঘুরি।" আর ওঁর ওই পনেরোই আগস্টের লেখা কবিতা, "আনন্দ আজ আনন্দ অসীম"—তার চেয়ে মর্মস্পর্শী অন্তর থেকে উঠে আসা কবিতা আমি আর পড়িনি।

বিষ্ণুবাবু, কল্যাণ আর আমি ক্লাসের পর (কখনও কখনও ক্লাস ফাঁকি দিয়ে) মাঝেমাঝেই কমলালয় স্টোরের ভিতরকার চায়ের দোকানে যেতাম। ওখানে প্রায়ই পরস্পরকে জগ দেওয়ার একটা প্রতিযোগিতা হত। বলা বাহুল্য, বিষ্ণুবাবু এই খেলায় শামিল হতেন না। বেশির ভাগ দিন উনিই আমাদের খাওয়াতেন। আর রোজই আমরা সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখতাম। তিল ধারণের স্থান নেই এমন সব বাস বা ট্রাম থেকে উনি নামতেন, কিন্তু ওঁর

ধুতি বা পাঞ্জাবিতে একটি ভাঁজও পড়ত না। বিষ্ণুবাবুর মারফত ওঁর পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে পরিচয় হল। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জিষ্ণু দে ওরফে পপা আমার ছোট ভাইয়ের সমবয়সি। বয়স আট। তারা দু'জনে এক সঙ্গে আমাদের পুকুরে মাছ ধরতে বসত। ওকে আমি একটা ছিপ কিনে দিয়েছিলাম। শুনেছি সেটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ছিল। ওর দিদি তারাও তখন নেহাতই ছেলেমানুষ। মস্ত বড় বড় চোখ নিয়ে ও যেন যামিনীবাবুর ছবি থেকে নেমে এসেছে মনে হত। আর বড় মেয়ে ইরা? ও এখন যেমন তখনও তেমনই ছিল। সাংঘাতিক বিচ্ছু! ওকে রীতিমতো সমীহ করে চলতে হত। বিষ্ণুবাবু বাড়ি ফিরেই অর্ধশায়িত একটা ভঙ্গিতে সুন্দর চাদরে ঢাকা একটি চৌকির উপর দেয়ালে হেলানো কুশনে মাথা রেখে বসে বা শুয়ে পড়তেন। পারতপক্ষে আর নড়াচড়া করতেন না। দেখতেন ওঁর স্ত্রী প্রণতিদি একবার বের হচ্ছেন, একবার ঘরে ঢুকছেন, কখনও-বা দোকানদারদের পয়সা দিচ্ছেন। মানে, সে এক মহামারী কাণ্ড। কিন্তু বিষ্ণুবাবু নির্বিকার। কখনও গ্রামোফোনে বাখ শুনছেন, কখনও এলিয়ট বা পাউন্ডের কবিতা পড়ছেন, কখনও বিদেশ থেকে আসা পিকাসোর ছবির প্রতিলিপি দেখছেন আর অনেক সময়ই অলস বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, "আচ্ছা আপনি এই যে অরিজিনাল বিষ্ণুর মতোই যোগস্থ হয়ে শায়িত থাকেন আর আপনার সংসারের যাবতীয় কাজ প্রণতিদি করেন, এতে আপনার কোনও অস্বস্তি হয় না?" উনি উত্তর দিতেন, "আসলে কী জানো? আমাকে যে চাকরি করতে হয় এর জন্য আমার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত।" এ কথার কোনও জবাব নেই।

উনি একবার আমাদের ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যামিনী রায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলাম ওঁর ছবিগুলি মেঝের উপর দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা আছে। উনি যে এক সময় সাবেকি পাশ্চাত্য ধরনে শহর-গ্রামের ছবি আঁকতেন তা আমার জানা ছিল না। অ্যাকাডেমিক ঢঙে আঁকা এই ছবিগুলি আমার খুব অসাধারণ লেগেছিল। যামিনীবাবু অনেক কথা বললেন। তখনকার ইংরেজ গভর্নর ওঁর ছবির সমঝদার ছিলেন। লাট-সাক্ষাৎকার বর্ণনা প্রসঙ্গে উনি বললেন, "বুঝলে, লোকটা ঘর থেকে বের হয়ে এল। মনে হল যেন একটা কেউটে সাপ। আর ওর পিছন পিছন—যখন বের হল, মনে হল যেন ঢোঁড়া সাপ।" ওই ঢোঁড়া সাপই ওঁকে গভর্নরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মানুষটি বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তি। তাই ঢোঁড়া সাপের পরিচয়টা চেপেই গেলাম। বিষ্ণুবাবু একটু গলা নামিয়ে বললেন, "সম্ভব হলে ওঁর দু-একটা ছবি কিনো। একটু টানাটানি যাচ্ছে।" দেড়শো-দুশো টাকায় এক একটা ছবি বিক্রি হচ্ছিল। এমনকী আমাদের মত হা-ভাতেরও এক আধখানা কেনা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কেন যে কিনিনি, জানি না। বোধহয় গাধা পিটানোর শুরুতেই আমি গাধা বনে গিয়েছিলাম। না হলে এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? তাছাড়া মাসের মাইনের অর্ধেক দিয়ে একখানা ছবি কিনতে যে-মানসিকতা প্রয়োজন, জমিদারি সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেটি বোধহয় আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিল।

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে যখন পড়াই তখন আমার বয়স বাইশ-তেইশ বছর। নানা অসুবিধে কষ্ট সত্ত্বেও সব সময়ই একটা কারণহীন ফুর্তি বোধ করতাম। আমার স্বাভাবিক ফাজলামির প্রবণতা মাঝে মাঝেই সীমা ছাড়িয়ে যেত। অধ্যাপকজনোচিত গাম্ভীর্য কিছুতেই

আয়ত্ত হত না। এখনও হয়নি। বহু লোককে দেখলেই ভয়ানক রকম হাসি পায়। আমি যে হাসি চাপার চেষ্টা করছি উপহাস্য ব্যক্তির তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এর ফলে প্রবীণ সহকর্মীরা অনেকেই আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এঁদের মধ্যে একজন একটু দূর থেকে আসতেন। আর প্রিন্সিপাল পেরেরার অভ্যেস ছিল ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের মতো ঘুরে ঘুরে দেখা—অধ্যাপকরা সময়মতো ক্লাসে এসেছেন কি না। আমি বা সুনীল সেনের মতো পাকা ফাঁকিবাজরা কদাচিৎ হাতেনাতে ধরা পড়তাম। পড়লে 'হ্যালো' 'গুড মর্নিং' ইত্যাদি শুভাকাঙ্ক্ষামূলক সদ্‌বাক্য উচ্চারণ করে সাহেবের পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। ওঁকে আর চেতাবনি উচ্চারণের সুযোগ দেওয়া হত না। কিন্তু যে-সহকর্মীটির কথা বলছি, তিনি ছিলেন নিপাট ভাল মানুষ। উনি রোজই পেরেরা সাহেবের মুখোমুখি পড়তেন আর ভদ্র ভাষায় কিছু গালিগালাজ শুনে স্টাফ রুমে আসতেন। এবং সেখানে ওঁর সেই বিখ্যাত আত্মবিলাপটি শোনার জন্য আমরা ওত পেতে থাকতাম। ওঁর সেই স্মরণীয় উক্তিটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না : "সাহেব আমাদের কষ্টটা কী করে বুঝবেন? উনি আসেন পাশের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে। আর বালিগঞ্জ থেকে এসে রোজ যদি ধর্মতলার পেডেরাস্টিয়ান ট্র্যাফিকের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসতে হত, তা হলে মজাটা বুঝতেন।" উচিত কথাই বটে। তবে আমরাও ধর্মতলা দিয়ে রোজই হেঁটে আসতাম। বোধহয় ভিড়ের চাপে 'পেডেরাস্টিয়ান'দের চিনতে পারিনি। পারলে নিশ্চয়ই আমরাও শঙ্কিত হতাম।

আর ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক বাকি সাহেব। কাবাবের লোভে কলেজফেরতা ওঁর ওয়েলেসলি স্ট্রিটের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। উনি সুশোভনবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এক ব্যাপারে বন্ধুর সঙ্গে বাকি সাহেবের মতের মিল কখনও হয়নি। এবং এই মতানৈক্যের কথাটা দেখা হলেই উনি অন্তত একবার স্মরণ করিয়ে দিতেন। "সুশোভন সেজ ইট ইস ম্যাটার। আই সে ইট ইজ মাইন্ড।" জগৎচিন্তার এই দুই মেরুর মধ্যে কী করে সমঝোতা হওয়া সম্ভব?

সহকর্মীদের মধ্যে সত্যিকার বিরাট পণ্ডিত ছিলেন সাবের খান। আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি যাবতীয় ইসলামি ভাষায় ওঁর অসাধারণ দখল ছিল। আমরা যখন অক্সফোর্ডে পড়ি, তখন উনিও গিবসের কাছে খুব উঁচু দরের গবেষণা করে ডক্টরেট পান। ইসলামি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গবেষক হিসাবে ওঁর খুবই খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু চাকরির দিক থেকে যথেষ্ট উপরে উঠলেও দেশে ওঁর যোগ্যতার অনুপাতে স্বীকৃতি উনি পাননি। নিতান্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে এই পণ্ডিত মানুষটি বেনেপুকুরের এক বস্তিতে থাকতেন। ওঁর চলাফেরায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ ছিল না। পরে উনি ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সব ভাষাও শিখেছিলেন। এবং ওই সব ভাষায় ইসলাম বিষয়ক নামজাদা সব পত্রিকায় ওঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাটার উপর ওঁর দখল কিছু কমই ছিল। উনি বরাবরই পরীক্ষার ফার্স্ট, সেকেন্ড পেপার ইত্যাদি প্রশ্নপত্রগুলিকে ইউরোপের রাজা-মহারাজাদের কথা মনে রেখে পেপার দা ফার্স্ট, পেপার দা সেকেন্ড ইত্যাদি বলে বর্ণনা করতেন। ফলে আমরাও ওঁকে আড়ালে বলতাম—সাবের দা খান।

কোনও এক সমাজতান্ত্রিক ইউরোপীয় দেশগুলির এশিয়া এবং আফ্রিকাস্থ

উপনিবেশগুলির বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে এঁরা বেশির ভাগই জীবন থেকে এঁদের যা ন্যায্য প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত হন। ফলে যে-স্বীকৃতি এঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে পাননি, তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনেক সময়ই আত্মপ্রশংসার আশ্রয় নেন। এই ধরনের অকুণ্ঠ আত্মপ্রশংসার দৃষ্টান্ত জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়েছে। যে-রোগটা সামাজিক ব্যাধির রূপ নেয়, ব্যক্তিজীবনে অনেক সময় তার আপাতদৃষ্টিতে কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণ থাকে না। ফলে মনে হয়, আত্মপ্রশংসাকারী মানুষটা হয় বোকা, নয়তো অসহ্য রকমের দাম্ভিক। আসলে সে হয়তো মনের দিক থেকে নিতান্তই হতভাগ্য মানুষ। জীবন তাকে যাই দিয়ে থাকুক, নিজের চোখে সে নিতান্তই পরাজিত ভাগ্যহীন ব্যক্তি। তাই তার বাহ্যিক সাফল্যের ফলগুলি বারবারই লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে হয়। পাছে অন্য লোকেও জেনে ফেলে যে, সে জীবনযুদ্ধে পরাজিত ব্যর্থকাম এক মানব।

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে একজন অত্যন্ত স্নেহশীল মধ্যবয়স্ক সহকর্মী ছিলেন। তিনি এই ব্যাধির এক চরম দৃষ্টান্ত। মানুষটির অনেক গুণ ছিল। সত্যিতেই ভাল বলতে পারতেন। এবং শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজে ওঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। কার্যত কলেজটা উনিই চালাতেন। কিন্তু এইসব সুকৃতির তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলে ওঁর মন ভরত না। কল্যাণ এবং আমাকে দেখতে পেলেই উনি আক্ষরিক অর্থেই পাকড়াও করতেন। পাকড়াবার টেকনিকটা ছিল অসাধারণ। আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে পেলে দু হাতে দু'জনের টাই চেপে ধরতেন। তারপর সওয়াল জবাব। "সবাই বলছে তোমরা দু'জন আন্ডার মাই উইংস, আন্ডার মাই প্রোটেকশন, বেশ খোশ মেজাজে আছ। তোমরা কী বলো?" কিছু বলা তখন খুব কঠিন, কারণ টাইয়ের টানে কণ্ঠ প্রায় রোধ হয়ে এসেছে। ক্ষীণস্বরে উত্তর দিতাম। "কথাটা ঠিকই বলে।" আবার টাই-আকর্ষণ, "আচ্ছা বলো দেখি, এই যে সেদিন আমার বক্তৃতা শুনে তোমরা দু'জনেই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করলে, সত্যি বলো তো, এর চেয়ে ভাল বক্তৃতা কখনও কোথাও শুনেছ?" প্রাণ তখন কণ্ঠ ছেড়ে ওষ্ঠাগ্রে পৌঁছেছে। অতি কষ্টে উত্তর দিতাম, "ন্-না।" দু'জনে একত্র থাকলে তবু কিছুটা রক্ষা। শ্বাসনালী যখন বন্ধ হয়ে আসছে দেখতেন, ভদ্রলোক তখন ছেড়ে দিতেন। কিন্তু একা ওঁর হাতে পড়লে বিপদটা আরও মারাত্মক হত। কারণ তখন উনি সব্যসাচী রূপ পরিগ্রহ করতেন। বাঁ হাতে টাই চেপে ধরলে ডান হাতটা খালি থাকত। সে হাতটা অন্য কাজে ব্যবহৃত হত। প্রশ্ন নিক্ষেপ করেই উনি ডান হাতে পেটে প্রচণ্ড খোঁচা মারতেন। সেই খোঁচা খাওয়ার পর উনি যা-ই বলতে বলবেন তা-ই স্বীকার করা ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। শেষাশেষি টাই পরা ছেড়ে দিলাম। মানুষের শরীর। কত আর সহ্য হয়! আমার দৃঢ় ধারণা, গুয়ান্টানামোতে স্বীকারোক্তি বের করার জন্য যেসব টেকনিক ব্যবহৃত হচ্ছে তার অনেকটাই ওই ভদ্রলোকের কোনও গোপন নোটবই থেকে সংগ্রহ করা। উনি অশেষ সাধনার ফলস্বরূপ উৎপীড়নের একটি ঘরানা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

তবে পেটে খোঁচা খাওয়া বোধহয় কোনও কোনও লোকের ললাটলিপি। আমাদের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন ইতিহাসের লেকচারার তড়িৎ মুখোপাধ্যায়। নরেনবাবুর কাছে মেয়রস কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে ভাল কাজ করেছিলেন। এক জোড়া গোঁফওয়ালা

কাঠখোট্টা মানুষ। ওঁর চিত্ত যে নন্দনরসে পূর্ণ—এরকম সন্দেহ করার কোনও কারণ কখনও ঘটেনি। বাইরে থেকে মানুষকে আমরা কতটুকুই বা চিনি? নরেনবাবু স্থানীয় দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধানের জন্য সরকারের কাছ থেকে সামান্য অনুদান জুটিয়ে রিজিয়নাল রেকর্ড সার্ভে কমিটি বসালেন। আমাদের মতো কয়েকটি সবুজ শিংওয়ালা গবেষককে সেই কাজে পাঠাতে লাগলেন। ওঁর উৎসাহ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একবার তড়িতের সঙ্গে মেদিনীপুর গেলাম। খাওয়াদাওয়ার পর কংসাই নদীর উপরকার পুলে উঠে নদীটির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রূপ দেখে মোহিত হলাম। কিন্তু মুগ্ধ যে আমি একাই হইনি, অল্পক্ষণের মধ্যেই তার অলঙ্ঘ্য প্রমাণ পেলাম। হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড খোঁচা খেলাম। আর তৎসহ কানে এল তড়িতের উচ্ছ্বাসবাণী, "তপন, বঃ বঃ।" প্রশংসাবাণীটির উদ্দিষ্ট আমি না, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কংসাই। শুধু সেই সৌন্দর্যরস ভোগে যেন আমিও শামিল হই, পেটে প্রাণঘাতী খোঁচার উদ্দেশ্য শুধু তাই। একজনের অনাবিল আনন্দ যে আর একজনের এত বেদনার কারণ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। বাকি ক'দিন তড়িতের থেকে একটু দূরে দূরে থাকারই চেষ্টা করি।

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে পড়ানোর সময় ঠিকভাবে গবেষণার কাজ শুরু করি। আমার সুপারভাইজার নিযুক্ত হলেন বিভাগীয় প্রধান ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভদ্রলোকের দেহ স্থূল হলেও বুদ্ধিতে কোনও সূক্ষ্মতার অভাব ছিল না। নিরভিমান মানুষটি জীবদ্দশায় ওঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। তা নিয়ে ওঁর যে খুব মাথাব্যথা ছিল এমনও নয়। কিন্তু শিখ ইতিহাস বিষয়ে ওঁর কাজ বোধ হয় ভারতীয় ইতিহাস গবেষণায় প্রথম সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমদানি করে। সম্প্রতি এক শিখ বিশ্ববিদ্যালয় ওঁর নামে একটি পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করে ওঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু গবেষণায় ইন্দুবাবু আমার শিক্ষক ছিলেন বললে সত্যের অপলাপ হবে। আমার বিষয় নির্বাচনের পেছনে প্রেরণা ছিল অল্পদিন আগে প্রকাশিত নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'। এবং আমার থিসিস সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা ওঁর সঙ্গেই হত। উনি বাঙ্গালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব, অর্থাৎ মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে রাজি হলেন না। সেই অভাব আংশিকভাবে পূরণ করবার উচ্চাশা নিয়ে মোগল যুগে বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখব ঠিক করি, অনেকটা ওঁরই উৎসাহে। দিনের পর দিন অকৃপণভাবে ওঁর অত্যন্ত মূল্যবান সময় উনি আমাকে দিয়েছেন। উনি যে বিরাট পণ্ডিত আর আমি গবেষণার ক্ষেত্রে অজ্ঞ নবাগত, এই বিরাট পার্থক্যের কথা মনে রাখার কখনও কোনও কারণ ঘটত না।

আর আমার কাজে অত্যন্ত মূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলাম অধ্যাপক সুকুমার সেনের কাছে। ওঁর গভীর সাহিত্যরসবোধ সঙ্গীতপ্রিয়তা অসাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষটির বাইরের ধরনধারণে বোঝা যেত না। বরং ওঁকে অনেক সময় রসকষহীন শুষ্ক কাষ্ঠ বলে ভুল ধারণা হতে পারত। রবীন্দ্রকাব্যপ্রিয় এই বিরাট পণ্ডিতটির কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানের রেকর্ড ছিল। বেদ উপনিষদ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য অবধি ভারতীয় সংস্কৃতির যাবতীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে ওঁর গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও আলোচনা উঠলেই উনি বলতেন—আমাদের সংস্কৃতির শেষ কথা রবীন্দ্রনাথ।

রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, কালিদাস কারও বা কোনও কিছুরই ওই একটি মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা হয় না। সুকুমারবাবু ছিলেন চলমান বিশ্বকোষ। যে-কোনও বিষয়ে তথ্যের প্রয়োজন হলে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই তা পাওয়া যেত। কিন্তু মূর্খত্বর ব্যাপারে উনি সহনশীল ছিলেন না। যা আমার জানা উচিত এরকম কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করলেই খেঁকিয়ে উঠতেন, "এটাও জানেন না? তবে লেখাপড়া করতে এসেছেন কেন?" আসাটা যে ঠিক হয়নি সে-কথা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে তখন নরেনবাবু। ওঁর অন্তহীন উৎসাহ 'দীপেন প্রজ্বালিত দীপবৎ' আমাদের উৎসাহকে বাঁচিয়ে রাখত। ওঁর ইতিহাসচিন্তায় তত্ত্ব বা থিওরি সম্বন্ধে একটা অসহিষ্ণুতা ছিল। কিন্তু থিওরির সঙ্গে যে উনি অপরিচিত ছিলেন না, ওঁর লেখায় তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নরেনবাবুর কাছে আমার সবচেয়ে বড় ঋণ একটি ব্যাপারে। উনি আমাকে আচার্য যদুনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন স্যার যদুনাথ আইন-ই-আকবরির ব্লকম্যান-কৃত অনুবাদের এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য নতুন সংস্করণ করছেন। ওঁর কাজে সাহায্য করার জন্য একটি লোক দরকার। নরেনবাবু আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তার আগে আর একবার নরেনবাবুর সঙ্গেই ওঁর কাছে গিয়েছিলাম—আমার গবেষণা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন নিয়ে। প্রশ্ন ক'টি লিখে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সামনে বসবার ঘরে ঢুকতেই অন্য দরজা দিয়ে উনি ঢোকেন। বসতে বলার বালাই ওখানে ছিল না। উনি নিজেও বসলেন না। আমার প্রশ্নগুলি নিতান্তই কাঁচা ছিল। তা নিয়ে উনি কোনও মন্তব্য করলেন না। শুধু প্রশ্নের উত্তরে যা বললেন তার মোদ্দা কথা—আমার গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে সমস্যা আছে। প্রধান কারণ তথ্যের স্বল্পতা। অল্প বয়সে বুদ্ধি অবশ্যই কাঁচা থাকে। তাই ওঁর কথায় আমি দমিনি। কিন্তু জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে ওই কঠোর মানুষটির উদারতার অভাব ছিল না। আমার থিসিস লেখা হয়ে গেলে উনি পরীক্ষক হতে রাজি হন। এই নিয়ে আমার খুব গর্ব ছিল। কারণ স্যার আশুতোষের আমল থেকে ওঁর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের বিবাদ। মাস্টারমশায়রা বললেন যে, উনি পরীক্ষক হিসেবে আমার মৌখিক পরীক্ষা নিতে যখন আশুতোষ বিল্ডিংয়ে এলেন সেটি ওঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন দশক পরে পদার্পণ। কোনও কোনও জীব নতুন শিং গজালে মহীরুহের কাণ্ডে গুঁতো মেরে নিজের শক্তির পরীক্ষা করে। আমিও আমার থিসিসে স্যার যদুনাথের নাম উল্লেখ না করে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে ওঁর মতামতের সমালোচনা করেছিলাম। উনি ওঁর রিপোর্টে লেখেন যে, ওই বিষয়ে আমি যা লিখেছি সেটাই ঠিক কথা। যদুনাথ সরকারের মত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ওই রিপোর্ট দেখে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

আইন-ই-আকবরির কাজ শেষ হওয়ার পর স্যার যদুনাথ ওঁর মোগল সাম্রাজ্যের পতন বিষয়ক বিরাট গ্রন্থটির শেষ খণ্ডটি প্রেসে দেন। এই সময় প্রুফ দেখা ইত্যাদি ছোটখাটো কাজে আমি ওঁকে সাহায্য করতাম। গ্যালি থেকে শুরু করে শেষ প্রুফ পর্যন্ত তিনবার উনি প্রুফ দেখতেন। আমি প্রত্যেকটা প্রুফই একবার দেখতাম। কিন্তু তাতে উনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। ওঁর নিজের হাতে শোধরানো কিছু কিছু গ্যালি প্রুফ আমি রেখে দিয়েছিলাম। ১৯৫৩ সনে অক্সফোর্ডে পড়তে যাই, তারপর ফিরে এসে আর খুঁজে পাইনি।

স্যার যদুনাথের সংগ্রহে ওঁর কাজে লাগতে পারে এ-রকম যাবতীয় নথিপত্র হস্তলিপির কপি ছিল! ওঁর অন্যতর বিখ্যাত আবিষ্কার প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত মোগলদের বঙ্গবিজয়ের কাহিনি 'বাহারিস্তান-এ-গায়েবী'-র হস্তলিপি। পুঁথিটির মাইক্রোফিল্‌ম কপি আনিয়ে তার ফোটোকপি করে কোনও মৌলবিকে দিয়ে সুন্দর নাস্তালিক অক্ষরে তার অনুলিপি করিয়েছিলেন। ওঁর সংগৃহীত অনেক পুঁথি এবং দলিল-দস্তাবেজই ওইভাবে মাইক্রোফিল্‌ম থেকে কপি করা। উদ্দেশ্য—ব্যবহারের সময় যেন কোনও অসুবিধা না হয়। বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর প্রতিলিপিটি পড়বার জন্য আমি স্যার যদুনাথের বাড়ি যেতাম। উনি ওঁর বাইরের ঘরটিই পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। হাতে লেখা বাঁধানো বইটি এনে দিয়ে নিজেও আর কোনও কাজ নিয়ে জানালার ধারে বসে যেতেন। অত্যন্ত তটস্থ হয়ে বসে পড়তাম। একজন অসাধারণ মানুষ ওই একই ঘরে বসে কাজ করছেন, যে কোনও কিছুতেই হয়তো তাঁর কাজের ব্যাঘাত হবে, এই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। উনি মাঝে মাঝে উঠে এক-আধটা প্রশ্ন করতেন। কথাটা অনেক সময়ই ইংরেজিতে বলতেন। "উড ইউ লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক?" "শ্যাল আই টার্ন দা ফ্যান অন?" ইত্যাদি অত্যন্ত সাধারণ কোনও কথা। উনি বেশির ভাগ সময়ে পাখা ব্যবহার করতেন না। তাই আমিও পাখা চালাতে সঙ্কোচ বোধ করতাম। জুন মাসের গরমেও বিনা পাখায় কাজ করার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

আমার জীবনে প্রথম স্মরণীয় স্বীকৃতি ওঁর কাছ থেকেই পাই। বাহারিস্তান সেনাপতির লেখা যুদ্ধ আর রাজ্যজয়ের ইতিহাস। স্যার যদুনাথ ঠিকই বলেছিলেন—ওর ভিতর সামাজিক ইতিহাসের মালমশলা পাওয়া যাবে না। ঠিক, কিন্তু শতকরা একশো ভাগ ঠিক না। যুদ্ধবিগ্রহের ধারাবিবরণীতে খুঁজলে জনজীবনে শাসনব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণাম সম্পর্কে অনেক টুকরো টুকরো তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি একত্র করলে যে, ছবি ফুটে ওঠে, মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিবরণীর সঙ্গে তার মিল কমই। আমি ওইভাবে ছড়ানো-ছিটানো তথ্যগুলি একত্র করে বাংলায় মোগল শাসন ব্যবস্থার একটি বিবরণী লিখি। স্যার যদুনাথ সেটি পড়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদের সামনে লেখাটি পড়ার প্রস্তাব পেশ করেন। সে সময় আমার বয়সি অচেনা গবেষকের পক্ষে এ এক বিরল সম্মান। সেই রাতটা উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। আমি গুরুবাদে বিশ্বাসী। জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রে সার্থকসাধন ব্যক্তির নির্দেশ পেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজ হয় বলে মনে করি। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে লেখা ওঁর দু লাইনের চিঠিটি আমি গুরুর আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলাম।

স্যার যদুনাথের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে। বিশ বছর বয়সে এম.এ পাস করে উনি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করবেন বলে মন স্থির করেন। প্রথম বিশ বছর তার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ভাষা শেখা এবং উপাদান সংগ্রহে কেটে যায়। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপের দশ হাজার টাকা দিয়ে উনি ওঁর গবেষণার জন্য দরকারি মূল পুস্তক সংগ্রহটি প্রথম গড়ে তোলেন। উনি ওঁর কাজ সাহিত্য বিষয়ক, 'লিটারারি' বলে মনে করতেন। ওঁর গ্রন্থসংগ্রহে ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক বহু বই ছিল। যত দূর জানি ওঁর গবেষণাভিত্তিক লেখা প্রথম যখন বের হতে শুরু করে ওঁর

বয়স তখন চল্লিশ ছুঁয়েছে। চল্লিশ থেকে ষাট বছর বয়স অবধি পাঁচ খণ্ডে উনি আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করেন। সে শুধু আওরঙ্গজেবের ইতিহাস না, মোগলের জয়স্কন্ধাবারের অনুগামী হয়ে সারা ভারত পরিক্রমা, সমস্ত স্থানীয় রাষ্ট্রশক্তিরই উত্থান-পতনের ইতিহাস। ষাট বছর বয়সে উনি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন, শেষ করেন আশি বছর বয়সে। এই সময় আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়—কোন সুকৃতির ফলে তা আমার জানা নেই। দেখতাম, দিনের প্রতিটি প্রহর প্রতিটি কাজ ওঁর জীবনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যটির সঙ্গে বাঁধা। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ওঁর কিছু মজার ধারণা ছিল। মস্তিষ্কের পক্ষে কিছু কিছু খাদ্য বিশেষ পুষ্টিকর বলে উনি মনে করতেন—যথা কলা, ছোট মাছের মুড়ো এবং দই। রোজ নিজে বাজারে গিয়ে এই জিনিসগুলি কিনতেন। বলতেন, খাঁটি জিনিস খেতে হলে নিজে বাজারে যেতেই হবে। আশি বছর বয়স না হওয়া অবধি স্যার যদুনাথ রোজ আট ঘণ্টা কাজ করতেন, আট ঘণ্টা ঘুমোতেন। 'আশি পৌঁছে কাজের সময়টা ছ' ঘণ্টায় নামিয়ে আনেন। সকাল বিকেল ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা করে হাঁটতেন। এই সব কাজেরই উদ্দেশ্য এক। শরীরটা ঠিক রাখতে হবে—যাতে একটি দিনও নষ্ট না হয়।' ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, বেশি গরমে আয়ুক্ষয় হয়। সেই জন্যই দার্জিলিঙে বাড়ি করেছিলেন। অনেক হিসেব করে বইপত্র ভাগ করে রেখেছিলেন। গ্রীষ্মে যা নিয়ে কাজ করবেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সব বইপত্র দার্জিলিঙে রাখা ছিল। একটা বয়সের পর উঁচু জায়গা শরীরের পক্ষে অনুপযোগী মনে করে গ্রীষ্ম কাটানোর উনি অন্য ব্যবস্থা করলেন। ওঁর মারাঠা ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় বইপত্র দলিল-দস্তাবেজ উনি মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সরদেশাইকে দিয়ে দেন। গ্রীষ্মের মাসগুলি তারপর থেকে উনি পুনার কাছের ছোট্ট শহরটিতে ওই বন্ধুর বাড়িতে কাটাতেন। আমি যখন অক্সফোর্ড থেকে ফিরে দিল্লিতে জাতীয় মহাফেজখানায় চাকরি করতে যাই তখন উনি খুব উৎসাহ দেন। কিন্তু এ কথাও বলেন, আমি যেন মনে রাখি যে, দিল্লিবাসের ফলে পাঁচ থেকে দশ বছর আয়ু কমে যাবে। কথাটা ফলেছিল ঠিকই—তবে তার কারণ সম্ভবত তাপের আধিক্য নয়।

স্যার যদুনাথের ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। একটার পর একটা মর্মান্তিক শোক ওঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ওঁর এক জামাই নৌবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাহাজডুবি হয়ে মারা যান। ওঁর বড় ছেলে ছেচল্লিশ সনের দাঙ্গায় আততায়ীর হাতে নিহত হন। এক মেয়ে লন্ডনে পাঠাবস্থায় আত্মহত্যা করেন। শেষের ঘটনার খবর পেয়ে রমেশ মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এঁরা সবাই দেখা করতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন উনি চিরকালের অভ্যেস অনুযায়ী জানলার পাশে বসে একটা বই পড়ছেন। রমেশবাবুদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। তারপর বললেন, "ও, আপনারা খবর পেয়েছেন? হ্যাঁ, কাল মাঝরাতে টেলিগ্রাম এল।" বলে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা, আপনারা তা হলে এখন আসুন।" ওঁরা দেখলেন—শোকতপ্ত মানুষটি নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

নরেনবাবুর কাছে শুনেছি—একদিন এক জ্যোতিষী স্যার যদুনাথের কাছে এক অনুরোধ নিয়ে আসে। সে লোকটি সব বিখ্যাত বাঙালিদের হাতের ছাপ নিয়ে সামুদ্রিকবিজ্ঞান

অনুযায়ী তার বিচার করে একটি বই লিখছে। বিধান রায়, মেঘনাদ সাহা, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সব জ্ঞানীগুণী লোক ওঁকে হাতের ছাপ দিয়েছেন। এখন স্যার যদুনাথ যদি দেন তা হলে সে বাধিত হবে। স্যার যদুনাথ লোকটিকে বকাবকি করে তাড়িয়ে দিলেন। নরেনবাবু সাহস করে বললেন, "স্যার, গরিব মানুষ, এই করে খায়। দিলেওবা পারতেন!" স্যার যদুনাথ এই প্রসঙ্গে নরেনবাবুকে অদ্ভুত এক কাহিনি শোনান।

ওঁর যখন নিতান্তই অল্প বয়স তখন এক সন্ন্যাসী এসে ওঁদের বাড়ির অতিথিশালায় কিছুদিন থাকেন। যাবার সময় সন্ন্যাসীটি খুশি হয়ে যদুনাথের এক কুষ্ঠিবিচার করে ওঁর বাবার হাতে দিয়ে যান। যখন ওঁর জীবনে একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটতে থাকে তখন উনি প্রথম ওই নথিটি খোলেন। দেখলেন ওর জীবনে যা যা ঘটেছে তা সবই ওতে লেখা আছে। এর পর উনি আর কখনও জ্যোতিষ নিয়ে মাথা ঘামাননি।

ওঁর জীবনের আর এক মর্মান্তিক দিনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ওঁর দুই নাতি ফৌজি শিক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা পাস করে ফুর্তি করতে বের হয়েছিল। জিপ উলটে তাদের একজন মারা যায়। পরদিন সকালে কিছু কাজ নিয়ে ওঁর কাছে যাবার কথা। অনেক ইতস্তত করে শেষ অবধি গেলাম। এইদিন প্রথম উনি নিজের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন, "শুনেছ তো? আর যে ক'টা আছে তারাও কেউ থাকবে না। এটাই আমার ভাগ্যলিপি।"

আর এক শুভ দিনে ওঁর কাছে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেদিন 'ফল অফ দা মুঘল এম্পায়ার'-এর শেষ ক'টি পৃষ্ঠার শেষ প্রুফ দেখা হয়ে গেছে। দীর্ঘ ষাট বছরের সাধনার সার্থক সমাপ্তির দিন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। ওইদিন উনি কাজে বসেননি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসেছিলেন। এই প্রথম শুনলাম উনি গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছেন। মনে হল সহস্র দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে উনি সার্থকতার কূলে পৌঁছেছেন। না, কথাটা ঠিক হল না। ওঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তো সার্থকতায় ভরা ছিল। চেতনার যে-স্তরে এই মহান পুরুষ সর্বদাই স্থিতধী হয়ে বাস করতেন, শোক দুঃখ তো সেখানে পরাজিত।

যখন থিসিস লিখছি, তখন একজন সহপাঠী এবং সহকর্মীর উৎসাহ আমার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান হয়েছিল। অরুণ দাশগুপ্ত তখন সদ্য বিয়ে করে কালীঘাট পার্কের পাশে একটি একতলার ফ্ল্যাটে ঘর বেঁধেছেন। আমরা তখনও সংসারহীন ভবঘুরে। গৃহস্থবাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করা আমাদের পক্ষে তখন নিতান্তই স্বাভাবিক কর্ম। অরুণের স্ত্রী মানসী সুভাষিণী এবং সুগৃহিণী। দুটোই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। ফলে ও-বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। সামাজিক এবং মানবিক আকর্ষণ ছাড়া ওখানে যাওয়ার আরও একটা বড় কারণ ছিল। তখন আমি থিসিসের পরিচ্ছেদগুলি একটার পর একটা লিখে যাচ্ছি। যেমন শ্রোতা ছাড়া গান জমে না, তেমনই পাঠক ছাড়া কিছু লিখে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সন্ধে হলেই পায়ে পায়ে গিয়ে অরুণের বাড়ি উপস্থিত হতাম এবং আমার সদ্যলিখিত চ্যাপ্টারগুলি নির্মমভাবে ওর প্রতি নিক্ষেপ করতাম। এ ব্যাপারে কোনও দয়া-মায়ার প্রশ্ন ছিল না। অরুণ কখনও আপত্তি করেনি। মুখে অন্তত বলত, শুনতে ভাল লাগছে। হয়তো সত্যিই লাগত। না লেগে আর উপায় কী? দাম্পত্য সন্ধ্যাগুলি এইভাবে জলাঞ্জলি যাওয়ায় মানসী কী ভাবতেন কখনও

বলেননি। তবে অনেক সময়ই মনে হয়েছে—দরজা খুলেই আমাকে দেখলে ওঁর মুখ কিঞ্চিৎ মলিন হত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য যখন থিসিস লেখা চলছে, তখনই আমি একটু এগিয়ে ভবিষ্যতে কী করব ভাবতে শুরু করেছি। আমার ফারসি ভাষাজ্ঞান একটা পর্যায়ে পৌঁছে আর এগুতে চাইছিল না। ফলে আমার মনে হয় যে, নতুন কিছু বলতে হলে নতুন অনাবিষ্কৃত তথ্যের সন্ধান করতে হবে। মোগল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের পথিকৃৎ মোরল্যান্ড এবং সরদার পানিক্কর-লিখিত মালাবার অঞ্চলে পর্তুগিজ এবং ওলন্দাজদের কীর্তিকাহিনি পড়ে আমার ধারণা হল যে, ওই দুই ভাষায় ভারতীয় ইতিহাস-বিষয়ক মালমশলা প্রচুর পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে। সে মালমশলা যে কত প্রচুর তা গবেষণা করতে গিয়ে জানতে পারি। আমি হঠকারী প্রকৃতির লোক। মানে, যা মনে হয় তখনই তা হট করে শুরু করে দিই। ফলটা কদাচিৎ ভাল হয়। কিন্তু যার যা স্বভাব।

আমি ডাচ ভাষা শেখাতে রাজি এরকম একজন অসাধারণ শিক্ষক পেলাম—জেসুইট ফাদার ভান এক্সেম, হাওড়ার ক্যাথলিক গির্জার ভারপ্রাপ্ত পাদ্রি। ভদ্রলোক বিশুদ্ধ বাংলা বলতেন। পর্দার আড়াল থেকে শুনলে বোঝার উপায় থাকত না যে উনি বাঙালি নন। পাদ্রি সাহেব একুনে আঠেরোটি ভাষা জানতেন। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আরবি। কীভাবে ওই ভাষাটি শিখেছিলেন তা ওঁরই কাছে শুনি। একখানা কোরান, একটি আরবি ব্যাকরণ আর একটি আরবি-ফরাসি অভিধান হাতে করে ভাষাটা মোটামুটি শেখা না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবেন না ঈশ্বরের নামে এই শপথ নিয়ে উনি ঘরের দরজা বন্ধ করেন। কপাট খুলে রোজ ওঁকে একটি পাউরুটি আর একপাত্র জল দেওয়া হত। এক মাস পরে যখন ওই ঘর থেকে বের হলেন, তখন অভিধানের সাহায্য ছাড়াই কোরান পড়ে বুঝতে পারছেন।

আরবি ভাষা শিক্ষার পরবর্তী পদক্ষেপ আর একটু সমস্যামূলক ছিল। ওঁর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উপরিওয়ালারা এবার ওঁকে আরবদের দেশে হেজাজে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে এক বেদুইনদের তাঁবুতে থেকে ওঁকে ভাষাশিক্ষা করতে হবে। ব্যাপারটার ব্যবস্থাদি কোনও ব্রিটিশ কাউন্সিল বা সরকারি দূতাবাস করে দেয়নি। জায়গাটার নির্দেশ ওঁর কর্তৃপক্ষ দিয়ে দিয়েছিলেন। জেদ্দা অবধি একটা টিকিট আর খরচা বাবদ কিছু টাকা-পয়সাও ওঁরা দিয়েছিলেন। তাছাড়া ওঁকে বলা হয়—বেদুইনরা খুবই দিলদরিয়া লোক। খুবই খাতিরযত্ন করবে—যদি না প্রথম দর্শনেই হত্যা করে। সবাইকে ওভাবে ওরা হত্যা করে, এমন নয়। তবে কথা কি জানো, ইসলামে দু-একটি কাজের কোনও ক্ষমা নেই। ইসলাম থেকে ধর্মান্তরণ তার মধ্যে একটি। আর মিশনারিদের কাজ যে ধর্মান্তরণ, সে বেদুইনরাও জানে। সুবিধের কথা এই যে, একবার অতিথি হিসাবে কাউকে গ্রহণ করলে তার গায়ে ওরা হাত তোলে না। সেই সৌভাগ্য লাভের আগেই মুণ্ডহীন হলে একটু অসুবিধে হতে পারে।

এইসব ভরসার কথা শুনে পাদ্রি সাহেব বুঝলেন যে, সত্যিতে একমাত্র ভরসা ঈশ্বর। আর প্রভু যদি তাঁর বান্দাকে শহিদের মুকুটে ভূষিত করে ক্রোড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।

বেদুইন তাঁবুতে পৌঁছে ভান এক্সেম প্রথমেই বলেন যে, তাঁর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য

হজরত নবী যে-ভাষায় কথা বলতেন সেই ভাষা শেখা। বেদুইনরা ওঁকে স্বাগত জানায়। তাঁবুর ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রথমে ওঁকে রুটি আর নুন দিয়ে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে। তারপর সব কিছু সহজ হয়ে যায়। প্রথমে তাঁবুর প্রতিটি অংশের নাম ওঁকে শেখানো হয়। সে শিক্ষা শেষ হলে বিভিন্ন ধরনের উটের বিভিন্ন নাম, এবং তাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আরবি বিশেষ্য। এইভাবে অল্প দিনের মধ্যেই উনি কথ্য আরবিতে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। তার চেয়েও বড় কথা, যখন দেশে ফিরলেন, ঈশ্বরকৃপায় তখনও মুণ্ডটি ঘাড়ের উপরেই রয়েছে।

ভান এক্সেম সাহেবের কাহিনি শুনে বড় শখ হয়েছিল ফারসি অভিধান, ব্যাকরণ (ওটা অবশ্যি সমস্যা নয়, এক পৃষ্ঠায় লেখা হয়ে যায়) আর শেখ সাদির গ্রন্থাবলী হাতে করে ভাষাশিক্ষার শপথ নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিই। কিন্তু রুটি-জল সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি হল না। আর তাছাড়া ঈশ্বরকৃপা ছাড়া ওসব হয় না। ভদ্দরলোকের সাফ জবাব : আমাকে মানিস না! তবে দেখ বেটা নিজের চেষ্টায় কত দূর এগুতে পারিস! ফলে মাঝপথেই ঠেকে রইলাম।

ভান এক্সেম সাহেবের শিক্ষাগুণে আধুনিক ডাচ ভাষাটা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু উনি সাবধান করে দিলেন যে, সতেরো শতকের ডাচ ভাষা এবং লিখনশৈলী আলাদা। সেটা ওঁর জানা নেই। সেই ভাষা এবং শৈলী হল্যান্ডে গিয়ে কেঁচেগণ্ডূষ করে ফের শিখতে হয়। সেকথা যথাস্থানে বলব।

ডাচ ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগিজও শিখতে শুরু করি। স্যার যদুনাথ বলেছিলেন—একটা শিখে তার পর অন্যটা শুরু করো। সে কথায় কান দেওয়ার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। ফলে পর্তুগিজ ভাষাশিক্ষাটা আমার কিছুটা কাঁচা থেকে যায়। তবে গবেষণার কাজে ওই ভাষার ব্যবহার আমি অল্পই করেছি। পর্তুগিজ শেখার চেষ্টায় আমি একটি গোয়ান ছেলের সাহায্য নিই। ওর মারফত কলকাতার জীবনের এক অচেনা দিকের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ঘটে। ছেলেটি থাকত ধর্মতলার এক মেসে। মস্ত লম্বা একটা ঘরে গোটা কুড়ি খাট পাতা। তার পাশেই লম্বা বেঞ্চি পাতা একটি খাওয়ার ঘর। বাসিন্দারা সবাই হয় পর্তুগিজ, নয় ফরাসি উপনিবেশগুলির বাসিন্দা। পরস্পর আলাপের ভাষা ফরাসি বা পর্তুগিজ। কারও সঙ্গে কোনও বাঙালির পরিচয় নেই। এরা সবাই কোনও ছোটখাটো চাকরি করত, নয়তো কোনও কারিগরি শিক্ষায় নিযুক্ত। কিন্তু এক একজন দেখতাম কন্টিনেন্টাল সাহিত্য বেশ ভাল করে পড়েছে। এইসব গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের যে কোনও আদান-প্রদান নেই, তা আমাদের দুর্ভাগ্য বলেই মনে করি।

ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে আমার ছটফটানি দেখে স্যার যদুনাথ নরেনবাবুকে বলেন যে, আমার সম্বন্ধে ওঁর একটাই আশঙ্কা। মনটা যেন সব সময়ই হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনওখানে করে অজানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিষয় ধরে থেকে গভীর থেকে গভীরে যাওয়ার ধৈর্য থাকলে ভাল হয়। কথাটা উনি ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু আমার গবেষণার ব্যাপারে চিত্তচাঞ্চল্যের একটা কারণ ছিল। আমি নানা ভাবে নানা দিক থেকে একটি প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছি। এই সন্ধান যে আমার সফল হয়নি, তার কারণ ক্রমাগত বিষয়

পরিবর্তন নয়, গবেষণার অগভীরতা। স্যার যদুনাথ, ইরফান হাবিব, কীর্তি চৌধুরী এবং বর্তমান প্রজন্মে সঞ্জয় সুব্রহ্মণ্যম যেভাবে তাঁদের বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন, আমার তা করা হয়ে ওঠেনি। আমার অসাফল্যের জন্য আমার কাজের অসম্পূর্ণতাই দায়ী, বিষয় পরিবর্তন নয়। তবে দুটোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে।

যে-প্রশ্নের উত্তর গবেষণার মারফত আমি খুঁজেছিলাম, তার উৎস পুঁথিগত বিদ্যা নয়, আমার প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা। ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক হিসেবে বরিশাল জেলা উপমহাদেশের সভ্যতার প্রত্যন্ত দেশ। সেখানে পৌঁছনই কঠিন কাজ। অথচ শৈশব থেকেই দেখেছি আমাদের গ্রাম এবং শহরের জীবনে বহু দূর দূর দেশের সংস্কৃতির গভীর প্রলেপ। প্রপিতামহ আরবি-ফারসি জানা আলিম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সংগৃহীত বইগুলির মধ্যে একটা বড় অংশ সুফিদের রচনা। পরে শুনেছি উনি কোনও সুফি পিরের শিষ্য ছিলেন। আমাদের সম্পত্তির দক্ষিণ অংশে সম্পূর্ণ গণ্ডগ্রামের অধিবাসী কিছু লোক রোমান ক্যাথলিক। তাদের নাম গোমেজ, আলভারেজ ইত্যাদি—মানে খাঁটি পর্তুগিজ। গ্রামবাসী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা নিষ্ঠাচারী হিন্দু, তাঁদের আচার-ব্যবহার প্রতি পদে রঘুনন্দন-লিখিত অনুশাসন মেনে চলে। প্রপিতামহর মাতা এবং পিতামহী দু'জনেই সতী হয়েছিলেন। কোনও অজ্ঞাত অতীতে উত্তর ভারত থেকে আমদানি পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম স্থানীয় লোকসংস্কৃতি এবং তান্ত্রিক আচার-অনাচারের সঙ্গে মিশে আমাদের ধর্মচেতনা গড়ে তুলেছিল। অথচ আমার পিতামহ নিরীশ্বরবাদী পজিটিভিস্ট। ওগুস্ত কোঁতের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী তিনি কীর্তিপাশার স্কুল লাইব্রেরিকে দান করেছিলেন। ছোট মফস্‌সল শহরটির অখ্যাত বইয়ের দোকানে উঁচু মানের ফরাসি সাহিত্যগ্রন্থ বিক্রি হয়। আমাদের এই প্রত্যন্ত দেশের জীবনে দূর দূর থেকে নানা সভ্যতার বীজ নানা ভাবে উড়ে এসে পড়েছে। কেন, কীভাবে আমরা এই দূরের অতিথিদের নিজেদের জীবনে গ্রহণ করেছিলাম, ছোটবেলা থেকেই এই প্রশ্ন বারবারই আমাকে বিস্মিত করেছে। আমার সীমিত গবেষণায় নানা ভাবে এই প্রশ্নেরই আমি উত্তর খুঁজেছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লেখা থিসিস, এবং তারই ভিত্তিতে রচিত আমার প্রথম গবেষণাগ্রন্থ আকবর-জাহাঙ্গিরের আমলে সদ্যবিজিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস সেই প্রচেষ্টারই প্রথম ফল। দিল্লি-আগ্রা থেকে শাসিত বাংলাদেশ সব অর্থেই বিদেশি শাসনের আওতায় এসেছিল। অপর পক্ষে সুলতানরা তো আধা-বাঙালি বনে গিয়েছিলেন। দিল্লিকেন্দ্রিক এই শাসনের ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালি জীবনে নতুন কোনও দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছিল কি? এই প্রশ্নেরই ছেলেমানুষি উত্তরের প্রচেষ্টা ওই বইয়ে। এখন পড়তে লজ্জা করে। কিন্তু লেখকের প্রচণ্ড উৎসাহ বোধহয় পাঠকের মন ছুঁতে পেরেছিল। তাই বইটি তখন প্রশংসা পেয়েছিল। এক এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে মহাপণ্ডিত দানীসাহেব ন্যায্য নিন্দা করেছিলেন। '৫৩ সনে এ. মুখার্জী এন্ড কোম্পানির অমিয়বাবু আমাকে বললেন, "আমাদের জন্য একখানা বুকস আপনি ল্যাখেন।" প্রকাশকের দৃষ্টি নিয়ে উনি ওঁর প্রকাশিত সব বই এগারোশো বা দু হাজারের সংস্করণ ভাবে প্রত্যক্ষ করতেন। তাই লেখকদের উনি অনুরোধ করতেন একখানা 'বুকস' লিখতে, সর্বদাই বহুবচনে। ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা আমার বুকসটি উনি যত্ন করে প্রচার এবং বিক্রি করেছিলেন। পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত

বইটি এখনও কিছু কিছু বিক্রি হয় দেখে মাঝে মাঝে বেশ বিব্রত বোধ করি। ওই 'বুকস'খানা বোধহয় না ছাপালেই ভাল ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার পুনরাবৃত্তি করি। কলকাতার ডি.ফিল ডিগ্রি যারা পায় তাদের প্রথম কয়েকজনের মধ্যে আমি একজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই অপেক্ষাকৃত নিচু মানের ডিগ্রিটি চালু করে বিশ্ববিদ্যালয় ভাল কাজ করেননি। এর ফলে সস্তায় কেল্লা ফতে করার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। গবেষণার ভবিষ্যতের পক্ষে ব্যাপারটা ভাল হয়নি।

আমার 'বুকস'খানা প্রকাশিত হওয়ার অল্প পরেই স্কলারশিপ পাওয়ার পাকা খবর পেলাম। অক্সফোর্ড যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হল। ওখানে পড়া অনেক দিনকার ইচ্ছা। কখনও সম্ভব হবে মনে করিনি। স্টেট স্কলারশিপ বেশ কিছু দিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় '৪৭ সনে রোডস স্কলারশিপ ভারতীয়দের জন্যও চালু হয়—বছরে দুটি। বার দুই চেষ্টা করে পাইনি। দিল্লির স্মার্ট ছেলেদের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতাম না, যদিও প্রথম ভারতীয় রোডস স্কলার অসীম দত্ত, আমাদের অসীমদা। তার উপর ওই স্কলারশিপের একটি শর্ত ছিল—খেলাধুলায় পারদর্শিতা। ছোটবেলা থেকেই ও ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছি। স্টেট স্কলারশিপের বেলায় ওসব বালাই না থাকায় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। এখানে বলা উচিত—পশ্চিমবঙ্গে স্টেট স্কলারশিপ যাঁর উদ্যোগে চালু হয় তিনি, আর আমি যাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলাম, দু'জনে একই ব্যক্তি। স্কলারশিপ পেয়েছি খবর পেয়েই স্যার যদুনাথ কলিন ডেভিসকে চিঠি দিলেন। সেই সুবাদে বেলিয়ল কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ ধরব বলে বম্বে রওনা হলাম হাওড়া স্টেশন থেকে। আমার কর্মজীবনের প্রথম পর্বের এইখানেই সমাপ্তি।

উক্ষতারণ (১৯৫৩-১৯৫৭)

কলকাতায় স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ার সময় ম্যাক্স মুলার-সম্পাদিত 'সেক্রেড বুকস অফ দা ইস্ট'-এর একটি খণ্ডের ক্রোড়পত্রে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থকারের নাম প্রসঙ্গে লেখা ছিল : "উক্ষতারণস্য অধ্যাপকেন শ্রীমন্মোক্ষমূলরেণ বিরচিতম"। বর্ণনাটি বড় মনে ধরেছিল। সুদূর শ্বেতদ্বীপে আইসিস নদীর পাড়ে একটি শহর আছে। সেখানে নদীর অগভীর কোনও জায়গায় পার হওয়ার সুবিধে ছিল। পিঠে মাল নিয়ে ষাঁড় এবং তার নিকটাত্মীয় অন্যান্য সব চতুষ্পদ নদী পার হত। তাই নদীতীরের শহরটির নাম অক্সফোর্ড—সেই স্থান যেখানে ষাঁড় নদী পার হয়। সেই জায়গায় এক সময় যে বিদ্যাচর্চা হবে, সেকথা শহরটির নাম যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁদের জানা ছিল না। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক সংস্কৃতের পণ্ডিত ম্যাক্স মুলার (যিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতে সম্ভবত সায়নাচার্যের অবতার ছিলেন) শহরটির নাম সংস্কৃতায়িত করে রাখেন উক্ষতারণ। আর ম্যাক্স মুলার ভোল পালটে মোক্ষ মূলর হলেন। সেই যে শূন্যপুরাণে আছে—বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর ব্রহ্মা হৈলা মোহাম্মদ আদম্ফ হৈলা শূলপাণি, — কতকটা সেই রকম আর কী।

ইংরেজ রাজত্বের সময় আমরা শুনতাম বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে অক্সফোর্ডই শেষ কথা—পরো নাস্তি। ইউরোপ মহাদেশের বুদ্ধিজীবীরা অবশ্য কথাটা কখনও মানেননি। অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এক সময় তাঁরা প্রশ্ন করতেন, "কোন বিষয়ে ডিগ্রি? ক্রিকেট না ফুটবল?" মানে ইংরেজরা একটু অতিরিক্ত ক্রীড়াসক্ত। তার প্রতি কটাক্ষ। অক্সফোর্ডের নানা গল্প প্রথম শুনি আমার পিসেমশায় কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে। উনি প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অক্সফোর্ডে পড়তে গিয়েছিলেন। ১৯১৩ সনে রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পান, তখন ইউনিয়নে ভারতীয় ছাত্ররা ওঁর সম্মানার্থে এক ডিনারের আয়োজন করেছিল। সেই উপলক্ষে কালো টাই এবং ডিনার জ্যাকেট পরা সব ভারতীয় ছাত্রদের একটি গ্রুপ ফোটো ওঁর বসবার ঘরের দেওয়ালে ঝুলত। ওই ছবিটি দেখে জায়গাটা কীরকম তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা করতাম। কলেজের একটি বই সাজানো ঘরে জানালার ধারে টেবিল ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলোয় তরুণ কিরণশঙ্কর বসে পড়াশুনো করছেন এবং হয়তো একদিন আমিও ওইভাবে পড়বার সুযোগ পাব, ভাবতে ভাল লাগত। তারপর সুশোভনবাবুর কাছে পড়বার সুযোগ পেয়ে ওই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়েছিল।

ইচ্ছে ছিল ওখানকার অনার্স ডিগ্রি করার। কারণ কিরণশঙ্করবাবু এবং সুশোভনবাবু দু'জনের কাছেই একই কথা শুনতাম—অক্সফোর্ডে পড়তে হলে ফার্স্ট ডিগ্রি করাই ভাল। আমাদের সময়ও ওই কথাটাই সত্যি ছিল। এখন এখানে শিক্ষাব্যবস্থার কিছু রদবদল হয়েছে। যারা গবেষণা করতে আসে তাদের জন্যও পঠন-পাঠনের কিছু সুব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু গত শতাব্দীর ষাটের দশক অবধি অক্সব্রিজের শিক্ষার প্রায় একমাত্র লক্ষ্য ছিল যারা প্রথম ডিগ্রি করতে আসত তাদের সুশিক্ষা দেওয়া। গবেষণার কাজটাও যে শিখতে হয়—এই চিন্তার উৎসস্থল আমেরিকা। এখন বিশ্বায়ন তো আর শুধু বিনিয়োগ আর ভোগ্যবস্তুতে সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষা সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই ছড়িয়েছে। তাই প্রভু মার্কিন মুলুক যথা নিযুক্ত করছেন সবাই সে পথেই চলছে। তবে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার শিক্ষা এর ফলে কিছুটা উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই। যা হোক, উনিশশো পঞ্চাশের দশকে অক্সফোর্ডে ডক্টরেট-প্রত্যাশীরা নেহাতই দুয়োরানির সন্তান। সেকথা জেনেই গবেষক ছাত্র হিসেবে বেলিয়ল কলেজে ভর্তি হলাম। বয়স সাতাশ পার হয়ে গিয়েছে। ও বয়সে গোঁফ কামিয়ে বি.এ ক্লাসের ছাত্র হতে একটু সঙ্কোচও বোধ করছিলাম।

হাওড়া স্টেশন থেকে যখন বম্বের ট্রেনে উঠলাম, তখন আমার সহযাত্রী হলেন ডক্টর আশুতোষ সেন, তাঁর পত্নী অমিতাদি এবং সদ্য বি.এ পাস করা পুত্র অমর্ত্য। অমর্ত্য যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে এরকম লোক এবং নিকটাত্মীয়ের সংখ্যা বেজায় বেড়ে যায়। তাই দু-একটি পত্র-পত্রিকা থেকে অনুরোধ এলেও ওঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে আমি রাজি হইনি। কারণ, মনে হয়েছিল—ভিড় বাড়িয়ে কোনও লাভ নেই। এখন কয়েক বছরে ব্যাপারটা একটু থিতিয়েছে। হয়তো ঘনিষ্ঠ পরিচিতের সংখ্যাও কিছু কমেছে। তাই ওই অসাধারণ মানুষটি সম্বন্ধে দু-চারটে কথা লিখব ভাবছি। কারণ বম্বের

ট্রেনে যে-পরিচয়ের সূচনা, তা বয়সের তফাত সত্ত্বেও এক সময় সত্যিই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল এবং কর্মজীবনে নানা জায়গায় একত্র কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন অন্তহীন কর্মযজ্ঞ। আর সাফল্যের যে-স্তরে তিনি পৌঁছেছেন, সেখানে তাল রেখে চলার সামর্থ্য আমার নেই। ফলে যে-অনিবার্য দূরত্ব এসে গেছে, সেটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। কিন্তু জীবনে যে-ক'জন অসাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে, অমর্ত্য তার প্রথম সারিতে, সুতরাং তাঁর বিষয়ে আমার ধারণা এবং ভাবনা ঐতিহাসিক—বিশেষত বাঙালি চেতনার ঐতিহাসিক হিসাবে—লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য মনে করি। কারণ ওঁর মধ্যে বিশিষ্টভাবে বাঙালি প্রতিভার চরম বিকাশ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস, যদিও তিনি নিজেই বলেছেন যে, ওঁর নিজের চোখেই ওঁর ব্যক্তিপরিচয় এক নয়, বহুমুখী।

১৯৫৩-র সেপ্টেম্বর মাসে বম্বে থেকে স্ট্র্যাথনেভার জাহাজে আমরা ইংল্যান্ড রওনা হলাম। জাহাজে অনেক ভারতীয় ছাত্র। আমাদের সম্মতি নিয়েই কাপ্তেন সাহেব ভারতীয় ছাত্রদের আলাদা একটা টেবিলে খাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা আপত্তি করলে কী হত জানি না। তবে প্রস্তাবটা যে আমাদের প্রতি শুভেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি। জাহাজে আমাদের পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন পার্থসারথি গুপ্ত, অক্সফোর্ডে কুইনস কলেজে ইতিহাস পড়তে চলেছেন। ফার্স্ট ক্লাসে যাত্রীদের মধ্যে একজন ভারতীয় ছাত্রী বলরুম শৈলীতে নৃত্যপটীয়সী বলে খ্যাতি অর্জন করেন। নাম রমিলা থাপার। তখন আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। যত দূর মনে পড়ে, অমর্ত্যও ছিলেন ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, যদিও তিনি বেশির ভাগ সময়টা আমাদের সঙ্গেই কাটাতেন।

জাহাজে দুটি মহিলা হকি খেলোয়াড়ের দল ছিল—যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের হয়ে কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাচ্ছেন। লোহিত সাগর এবং সুয়েজ খালে উষ্ণতা কিছু বেশি। সেখানে এঁরা যা পরে থাকতেন, ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। এ জাতীয় দৃশ্য দেখার অভ্যাস না থাকায় আমরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্করা কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিলাম—একথা কবুল না করলে মিথ্যাচার হবে। এখানে প্রসঙ্গত বলি, জাহাজে প্রথম দেখলাম যে শরীর বিষয়ে লজ্জার ব্যাপারে পশ্চিমিদের সঙ্গে আমাদের তফাত খুব বেশি। পুরুষ মানুষের স্নানের জায়গায় রোজ সকালে যাঁরা লাইন দিতেন তাঁদের কাঁধে একটা করে তোয়ালে থাকত ঠিকই, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিশুর মতো নিরাবরণ। উনিশ শতকে ইউরোপীয়দের শরীর বিষয়ে লজ্জার অভাব নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করে ব্যাপারটার একটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। এই লজ্জাহীনতার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইতিহাস শাস্ত্রের জনক হেরোডোটাস, পারসিকরা যে বর্বর তার প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, তারা খেলা এবং ব্যায়ামের সময় কাপড়চোপড় পরে থাকে, সুসভ্য গ্রিকদের মতো সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কুস্তি করে না।

প্রথম ইউরোপ যাবার সময় সমুদ্রযাত্রাটা যতটা আনন্দদায়ক হবে আশা করেছিলাম, কার্যত তা হয়নি। জাহাজের জীবন পশ্চিমি জীবনযাত্রারই এক সানন্দ প্রকাশ। সেই সারা দিন খেলাধুলা উৎসবে যোগ দেওয়ার সামাজিক বা মানসিক প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। তাই

অবস্থাটা কতকটা মাছ ডাঙায় পড়লে যেমন হয় সেই গোছের হয়েছিল। আর ভারতীয় ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে হইহল্লা করার একটা অভিনয় করত, যেন সব ব্যাপারটা তারা খুব উপভোগ করছে, তাতেও কেমন একটা গ্রাম্যতার গন্ধ থাকত। আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। আর সূক্ষ্ম অথচ সন্দেহাতীতভাবে জাহাজের সমাজজীবনে সর্বব্যাপী যে-জাতিভেদপ্রথা ছিল, তার ফলে সহজ আনন্দ উপভোগের কোনও উপায় ছিল না।

জাহাজে কয়েকটি বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণবটু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিটি প্রাতরাশের সময় আস্তিন গুটিয়ে হাতে বাঁধা একটি মাদুলি বের করতেন। তারপর সেই মাদুলি গ্লাসের জলে চুবিয়ে প্রথমে সেই বিশুদ্ধিকৃত জল পান করতেন। তারপর আহার। হিন্দুর অস্পৃশ্য নয় এরকম মাংসে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাংসের পর আইসক্রিম খাওয়া চলত না। কারণ 'মাংসের পর দুধ খাইলে গোমাংস ভক্ষণের ফল হয়'। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য এরকম কোনও ব্যবস্থা দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু সেকথা কে শোনে? একদিন দেখি নিষ্ঠাবান চাটুজ্যে লাঞ্চের সময় 'ভিইল' অর্থাৎ গোবৎসের মাংস ফরমাস করছেন। প্রশ্ন করলাম, "ওটা কী খাচ্ছেন?" উত্তর, "ক্যান? ভেড়ার মাংস? খাইয়া দ্যাহেন। খুব ভাল।" ভাল, তাতে আর সন্দেহ কী!

মাস তিনেক পরে লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে উপরতলার কাফেটেরিয়ায় বসে সস্তায় ঝোল-ভাত খাচ্ছি। জাহাজের একজন সহযাত্রী কাছে এসে বসলেন। তারপর গলা খুব নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "চাটুজ্যেকে মনে আছে?" 'ভিইল'ভোজী সদ্‌ব্রাহ্মণকে কি ভোলা যায়? বললাম, "অবশ্যই।" প্রশ্ন, "সে আজকাল রোজ সন্ধেবেলা কী করে জানেন?" ভাবলাম নিশ্চয়ই কুসঙ্গে পড়ে বেচারা বড় রকম কোনও কুকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রশ্নকর্তা বললেন, "সে আপনারা ভাবতে পারবেন না।" ভাবতে পারি না এরকম জিনিস দুনিয়ায় বেশি নেই। তাই সত্যিই চিন্তিত হলাম। ভাবলাম শিগগিরই 'নিউজ অফ দা ওয়ার্লড'-এ খবর বের হবে—এক ভারতীয় ছাত্র বৃহৎ অপরাধচক্রে জড়িত। আর তার সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে নানা নিন্দাসূচক মন্তব্য থাকবে। না, ব্যাপার আরও জটিল। সহযাত্রীটি গলা আরও নামিয়ে বললেন, "রোজ সন্ধে হলেই সে নাচে মোশাই, নাচে!।" এই গুরুপাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যথাকালে ফলেছিল। চাটুজ্যে যখন দেশে ফেরে, ব্রাহ্মণসন্তান তখন ধর্মান্তরিত ক্যাথলিক। সঙ্গে সহধর্মিণী। জাতে ইতালিয়ান।

প্রথম ইউরোপের সাক্ষাৎ পেলাম যখন জাহাজ মার্সেই থামল। মার্সেই থেকে প্রমোদভ্রমণে নিয়ে যায় সমুদ্রতীরের অনিন্দ্যসুন্দর দুটি গ্রামে—কাসি আর লা সিওতা। জায়গাগুলি তখনও ট্যুরিস্টের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়নি। মনে হয়েছিল—স্বর্গ কি আর এর চেয়ে বেশি সুন্দর? প্রথম দর্শনেই ইউরোপের প্রেমে পড়েছিলাম। সেই তীব্র আকর্ষণ আজও কাটেনি।

আমাদের দেশে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, অসাধারণ পুরাকীর্তির অভাব নেই। কিন্তু দারিদ্রদোষ যেন আমাদের সব গুণরাশি নাশ করেছে। সব কিছুরই রূপ ধুলায় মলিন। আর সেই মলিনতা যেন আমাদের অন্তরেও প্রবেশ করেছে। প্রকৃতির অসামান্য সব দান, পিতৃপুরুষের অবিস্মরণীয় সব কীর্তি—কিছুর প্রতিই যেন আমাদের সত্যিকার কোনও

মমতা নেই। যে বালুময় সমুদ্রতীরের সন্ধানে ইউরোপীয়রা বহু ব্যয়ে বহু দূর চলে যায়, আমাদের সৈকত ধরে তা তো সর্বত্র ছড়ানো। কিন্তু ঝগ্গি-ঝুপড়ি আর রূপহীন দোকান-বাজারের ভিতর দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। সম্প্রতি পশ্চিমি ট্যুরিস্টের তুষ্টিসাধনের জন্য ওদিকে আমাদের কিছুটা নজর পড়েছে। কিন্তু তার পরিণামও তো পাঁচতারা হোটেলের ছড়াছড়ি। দেশে অভ্যন্তরীণ ট্যুরিজম যেটুকু বেড়েছে, তার ফলও ভয়াবহ। দার্জিলিং-কার্সিয়াং-পুরী বস্তিতে পরিণত হতে চলেছে, যদিও তিনতারা, পাঁচতারারা ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র গজাচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক অধোগমন শুধু দারিদ্রের ফল নয়। মনের তথা রুচির দারিদ্র। নীরদবাবু একটা শব্দ ব্যবহার করতেন—রিবার্বারাইজেশন, পুনর্বর্বরায়ণ। মানে একটা সভ্য জাতির আবার বর্বর বনে যাওয়া। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট স্বর্ণমণ্ডিত ছিল না। কিন্তু মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা পড়লে দেখি যে, দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলি তখনও বস্তিতে পরিণত হয়নি। আর দারিদ্রের সঙ্গে কুরুচির যে অঙ্গাঙ্গী কোনও সম্পর্ক নেই, তা সাঁওতালদের গ্রামে গেলে বোঝা যায়।

আমাদের জাহাজের লক্ষ্যস্থল মার্সেইয়ের পরবর্তী বন্দর লন্ডনের টিলবেরি ডক্স। সেখানে পৌঁছে মনে হল—"এ কোথায় আইয়া পড়লাম?" ভূমধ্যসাগর উপকূলের রোমান্টিক উত্তেজনা মুহূর্তে ধুলিসাৎ। নোংরা নোংরা সব জেটি, অন্ধকার নোংরা জলের মতো আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি—জান কয়লা করার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, বিধাতা তার সব কিছুই যেন এখানে ঢেলে রেখেছেন। শুনেছি—হায়দরাবাদের নিজাম ইংল্যান্ডে পদার্পণ করে মন্তব্য করেন, "গিদ্ধৌর কা মুলুক।" কিন্তু এই যদি দেশের সর্বকালীন চেহারা হয় তো স্বেচ্ছায় কোনও খেঁকশিয়ালের এখানে আশ্রয় নেওয়ার কথা না। কোথায় শেক্সপিয়ারের 'গ্রিন অ্যান্ড প্লেজেন্ট ল্যান্ড'? টিলবেরি ডক্স থেকে সে দেশ বহুতই দূর অস্ত। এই দেশে তিন-চার বছর বাস করতে হবে ভেবে বুকটা নিতান্তই দমে গেল।

জাহাজে ভারতীয় হাই কমিশন থেকে এক মেজকর্তা এসে কিছু পিঠ-চাপড়ানো মুরুব্বিয়ানাসূচক কথা বলে গেলেন। মূল বক্তব্য—দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে এবং আমরা তোমাদের দেখাশুনো করায় কী সুখে থাকবে তা তোমরা এখনও বোঝনি। আর আমরা যারা ইংরেজ রাজত্বের যুগের বিলাতফেরত, তাদের যে কী অপমান সহ্য করতে হত তোমরা তা ভাবতে পারবে না। যে-সাহেব ছোকরা জুতো পালিশ করত সেও নাকি পয়সা নিয়ে সেলামের বদলে প্রশ্ন করত, "স্যার, আমাদের শাসন কেমন লাগে তোমার?" সেদিন যে সম্পূর্ণ বিগত নয় তার বহু প্রমাণ পরে পেয়েছি।

টিলবেরি থেকে লন্ডনের ভারতীয় হস্টেল। অতি ওঁছা। ফলে বিলাতবাস সম্বন্ধে উৎসাহ আরও কমে গেল। আর সেই সেপ্টেম্বর মাসের অবিশ্রান্ত টিপটিপ বৃষ্টি। ইচ্ছে হচ্ছিল—এখনই দেশে ফিরে যাই।

অক্টোবরের পাঁচ তারিখের আগে কলেজে বাসস্থান পাওয়া যাবে না। ইচ্ছে হল একবার তার আগে অক্সফোর্ড শহরটা দেখে আসি। পার্থসারথি গুপ্ত আর আমি একসঙ্গে রওনা হলাম। ট্রেনে যেতে প্রথম চোখে পড়ল একটি চেনা নাম। রেডিং স্টেশন পৌঁছবার আগে বিস্কুট কোম্পানি হান্টলি অ্যান্ড পামারের ফ্যাক্টরির বাইরে কোম্পানির নাম লেখা বিরাট

সাইনবোর্ড। ছোটবেলা থেকে চেনা নামটি দেখে কেমন যেন একটা পরিচয়জনিত স্বস্তি বোধ করলাম।

তারপর অক্সফোর্ডের ছোট্র স্টেশনটি। এখন প্রগতির ফলে সেটি ভেঙেচুরে ঝকঝকে নয়া ইস্টিশান হয়েছে। দেখলে মনে হয় কোনও নিকৃষ্ট শপিং আর্কেড। কী করা যাবে? প্রগতি বলে কথা। কার সাধ্য রোধে তার গতি। কিন্তু অক্টোবরের সেই মধ্যাহ্নে মেঘলা আকাশ আর টিপটিপ বৃষ্টি সত্ত্বেও ছোট স্টেশন আর আমাদের হিসেবে ছোটই ওই শহরটিকে দেখে ভাল লেগেছিল। স্টেশন থেকে হেঁটে হাই স্ট্রিটে যখন পৌঁছলাম, ততক্ষণে মধ্যযুগের ইংল্যান্ড আমাকে আত্মসাৎ করেছে। আমি ক্যান্টারবেরি টেলসের জগতে পৌঁছে গেছি—মধ্যযুগের দরিদ্র ছাত্র। শুধু দেহবর্ণ শ্বেত নয়। কিন্তু চসারের ছাত্রের কাহিনির নায়ক সাদা লোক এমন কথা তো কবি লেখেননি। পার্থকে বলেছিলাম, "পার্থ, এই শহরে যদি জীবন কাটত তাহলে বড় খুশি হতাম।" সেই কল্পনার শহর বিশেষ কোনও দেশ বা জাতীয় সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গ—একথা আমার তখনও মনে হয়নি, এখনও মনে হয় না। বহু শত বছরের পুরনো সৌধমালায় সাজানো মানুষের তৈরি এই জ্ঞানপীঠ সর্বকালের তথা সর্বমানবের সম্পদ—এই চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। আমার অসম্ভব ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়েছিল ঠিক বিশ বছর পরে। সে অভিজ্ঞতা সুখ-দুঃখে মেশানো। কিন্তু ওই ইচ্ছেপূরণে আমার কোনও মোহভঙ্গ হয়নি। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর রোমান্টিক ধ্যানধারণা কখনওই সম্পূর্ণ মেলে না। কিন্তু আচার্য মোক্ষমুলরের উক্ষতারণ আমাকে নিরাশ করেনি।

বেলিয়ল কলেজের উনিশ নম্বর সিঁড়ির পাশের একটি ঘরে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেখানকার জানালা দিয়ে কলেজের পিছনকার কোয়াড্রাঙ্গল অর্থাৎ চক চোখে পড়ে। সবুজ লন, বিরাট মহাদ্রুম, বন্ধ্যা চেরি গাছ, শুধু ফুল ফুটিয়েই যার জীবনের সার্থকতা, সব মিলিয়ে দৃশ্যটি মনোরম সন্দেহ নেই, যদিও বেলিয়ল কলেজ হিসেবে প্রাচীন হলেও তার দালানকোঠা প্রায় সবই উনিশ শতকের। আত্মবিদ্রূপের সুরে ছাত্ররা বলত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ক্লেমাঁসো বেলিয়ল কলেজ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "সে মানফ্রিফিক, ম্যা সে নে পা লা গার।" অর্থাৎ এই সৌধ অত্যাশ্চর্য হলেও ঠিক রেল স্টেশন হয়ে ওঠেনি। সত্যিতে ক্লেমাঁসো বিখ্যাত চার্জ অফ দা লাইট ব্রিগেড সম্পর্কে অনুরূপ একটি উক্তি করেছিলেন ঠিকই, "সে মানফ্রিফিক, ম্যা সে নে পা লা গের।" অর্থাৎ ঘটনাটি অসাধারণ হলেও এই নিরর্থক প্রাণদানকে যুদ্ধ বলা চলে না। যুদ্ধের ফরাসি 'গের'। তার বদলে 'গার' অর্থাৎ রেল স্টেশন কথাটি বসিয়ে বেলিয়ল কলেজ সম্পর্কে এই কাহিনিটির সৃষ্টি। বাস্তুশিল্প সম্পর্কে আমার রুচিবোধ উল্লেখযোগ্য না। তাই বেলিয়লের ভিক্টোরীয় যুগসুলভ নকল গথিক স্থাপত্য আমার চোখে ভালই লাগত। যুগে যুগে মানুষের রুচি পরিবর্তন হয়। রুচিবাগীশ রাসকিন সাহেব যে-কিবল কলেজের নকল-গথিক স্থাপত্য যাতে না দেখতে হয় এই উদ্দেশ্যে উলটোবাগে ছ মাইল ঘুরে কাজে যেতেন, সেই কিবল কলেজের স্থাপত্যের সুখ্যাতি সাম্প্রতিক কালে বিদগ্ধজনের মুখেই শুনেছি।

কলেজের স্থাপত্য যেমনই হোক, তার মানবসম্পদ চমকে দেওয়ার মতো—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা ই. এইচ. কার—কেমব্রিজে

নানারকম সমস্যা হওয়ায় সাময়িকভাবে বেলিয়ল কলেজে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার জন্য দুটি ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে—একটি শোয়ার একটি বসার। বসার ঘরের পাশেই টমি বেলঘের ঘর। এই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা ওঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপকে বিশেষ ভয় করে চলত। এক হতভাগ্য বালিকাকে উনি বলেছিলেন, "ডার্লিং, ইউ মে হ্যাভ বিউটিফুল থাইস, বাট ইউ ইউল নেভার লার্ন ইকনমিক্স।" আজকের দিনে এমন কথা কেউ বললে নারীবাদীরা তাকে শূল্যপক্ক করে কাবাব বানাত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে উনি ডার্লিং বলে সম্বোধন করতেন। যখন দিল্লি আসেন তখন পরবর্তীকালে শ্রীমতী গাঁধীর উপদেষ্টা পি. এন. ধারকে উনি 'ধারলিং' বলে আপ্যায়ন করতেন। টমির প্রতিবেশী হলেও আমার সঙ্গে ওঁর কখনও পরিচয় হয়নি। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক আমাকে 'বয়' বলে সম্বোধন করতেন। এই আহ্বানের তাৎপর্য কখনও ঠিক বুঝে উঠিনি। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এবং পরবর্তীকালে বেলিয়ল কলেজের মাস্টার বা অধ্যক্ষ ক্রিস্টফার হিল। উনি থাকতেন আমার উপরতলার ঘরে, কিন্তু স্নানের ঘরটি আমাদের ভাগ করে ব্যবহার করতে হত। সেই সূত্রেই প্রথম পরিচয়। তারপর প্রায়ই ওঁর ঘরে বিয়ার খাওয়ার আমন্ত্রণ হত। এবং ওঁর সূত্রেই অনেক প্রগতিবাদী ছাত্রছাত্রী, ঐতিহাসিক হবসবম, প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড এঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। এইসব আলাপ-পরিচয়ের এক অপ্রত্যাশিত ফল ফলেছিল। সেকথা যথাস্থানে বলব।

বেলিয়লের ঘরে বিলাস ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। বিরাট শোওয়ার ঘরটি গরম করার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। পুরুষ স্কাউট, অর্থাৎ খেদমতগার বিল রাত্রে পুরনো আমলের ডাকবাংলোর ব্যবস্থার মতো একটি বেসিন আর এক জাগ গরম জল ঘরে দিয়ে যেত। পাথরে তৈরি বাড়ি, ফলে সকালবেলা সেই জল বরফ হয়ে থাকত। বসা-তথা-পড়ার ঘরটিতে গ্যাসের আগুনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর একটি করে শিলিং ফেলে ওটিকে চালু রাখতে হত। শীতের ক'মাস কলেজবাসটা শারীরিক সুখের কারণ হয়েছিল এমন কথা বলা কঠিন। আর আহার যদি জৈবিক সুখের অন্যতর ভিত্তি হয়, তবে বেলিয়লের বিরাট হল বা ভোজনাগারে যে-অভিজ্ঞতা রোজ হত তাকে পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব না। এর কারণ ইংরেজি খানার বহু প্রচারিত বিস্বাদ নয়। পরে দেখেছি ফরাসিদের মতো অমৃতবৎ খাদ্য ইংরেজরা রাঁধে না ঠিকই, কিন্তু ভাল ইংরেজি রান্না কোনও অর্থেই অখাদ্য নয়। আসলে আমাদের কলেজে প্রধান পাচকটি অসৎ লোক ছিল। রন্ধনশালার এই সম্রাট নাকি আমাদের টাকায় দু-দুটি বাড়ি তুলেছিলেন। যে-বছর আমি অক্সফোর্ড ছাড়ি সেই বছর নতুন এক বারসার এসে তার কুকীর্তি ধরে ফেলে এবং বেলিয়লে আহার্যের ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই সৌভাগ্যের ভাগীদার মাত্র অল্প ক'দিনই হয়েছিলাম।

প্রথম যেদিন কলেজে থাকতে আসি, সেদিনই সিনিয়র টিউটর ডেকে একটি কথা বলেন। তার সারমর্ম এই যে, অক্সফোর্ডে গবেষক ছাত্রদের জীবন কিছুটা নিঃসঙ্গ। কারণ তাদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের জন্য কোনও বাঁধাধরা ব্যবস্থা নেই। নিজেই নিজের পথ করে

নিতে হয়, খুব কারও কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। এখন আর এ কথাটা তখনকার মতো সত্যি নেই। গবেষণার পরিদর্শকদের কর্তৃপক্ষের কাছে রীতিমতো জবাবদিহি করতে হয় যে, তাঁরা কতটা দেখভাল করছেন এবং ছাত্রদের কাজ কীরকম এগোচ্ছে। আর ছাত্র যে-বিষয়ে গবেষণা করতে চায় সে বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ না থাকলে ভর্তি করা হয় না। আমাদের সময় এত নিয়ম-কানুনের বালাই ছিল না। অনেক গবেষণা-পরিদর্শক প্রথমেই বলে দিতেন যে, ছাত্রর থিসিসের পঞ্চাশ ভাগ তাঁরা পড়বেন। এর বেশি কিছু তাঁদের দায়িত্ব নেই। তারপর ডোবা বা ভাসা—সে তোমার ব্যাপার।

আমাদের সময় অক্সফোর্ডে যাঁরা ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে আসতেন, তাঁরা সবাই কলিন ডেভিসকে পরিদর্শক বা সুপারভাইজার হিসাবে পেতেন। ডক্টর পুরি কুষাণ যুগ নিয়ে গবেষণা করবেন, পরিদর্শক কলিন ডেভিস। ইরফান হাবিব মোগল আমলের কৃষি এবং রাজস্বব্যবস্থা নিয়ে থিসিস লিখলেন, তাঁরও পরিদর্শক ডেভিস। এই ব্যবস্থার সমর্থনে বলা হত যে, বিষয়-বিশেষজ্ঞ না হয়েও গবেষণার রীতিপদ্ধতি জানা থাকলে ছাত্রর কাজ পরিদর্শন করা যায়। একথার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না।

ডেভিস সাহেবের নিজের গবেষণার বিষয় ছিল এক দিকে ওয়ারেন হেস্টিংস, অন্য দিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। একদা ফৌজে মেজর এবং কেমব্রিজের ডক্টরেট পাওয়া জাতিতে ওয়েলশ এই মানুষটি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাস ভালই জানতেন। এবং সে যুগে রাজনৈতিক ইতিহাস সাধারণত যেভাবে চর্চা করা হত—অর্থাৎ যত্ন করে নথিপত্র ঘেঁটে ধারাবিবরণী রচনা এবং নিজের বুদ্ধিসাধ্য মতো কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওঁকে ভাল ঐতিহাসিক বললে কিছু ভুল হত না। কিন্তু আধুনিক অর্থে বিশ্লেষণ বা ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহার ওঁর আয়ত্ত ছিল না। এবং কথাবার্তা ধরনধারণ কিছুতেই উনি 'ইনটেলেকচুয়াল' ছিলেন না। রক্ষণশীল অক্সফোর্ডে অনাধুনিক ভাবনাচিন্তা পাপ বলে গণ্য হত না ঠিকই, কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারাকে বর্জন করার ধ্বজা তুলতেও এক ধরনের ভাষা তথা বুদ্ধির খেলা চালু ছিল। কলিন ডেভিস চিন্তাজগতের ওইসব দাবা-বোড়ের চাল জানতেন না। এক কথায় বলতে গেলে ভদ্রলোক নেহাতই সাদামাটা মানুষ ছিলেন। অক্সব্রিজের চালবাজি ওঁর সম্পূর্ণই আয়ত্তের বাইরে। ওঁর আরও একটি ক্ষমার অযোগ্য দোষ ছিল। ওঁর পিতা ছিলেন শ্রমিকশ্রেণির লোক। এসব কথা অবশ্যই কেউ মুখে কখনও বলত না। উদার চিন্তার শেষ আশ্রয়স্থল অক্সফোর্ড শ্রমিকশ্রেণির লোক বলে কাউকে উপেক্ষা করবে? এমন কথা তুমি চিন্তা করতে পারলে? পারলাম কারণ শ্রেণিচেতনার ব্যাপারে ভণ্ডামির উচ্চতম সোপানে পৌঁছতে হলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ইংল্যান্ডে যে রকম পাওয়া যাবে তেমন আর কোথাও না। মোট কথা অক্সফোর্ড ডেভিসকে গ্রহণ করেনি। ব্রাত্যজনজ্ঞানে তার সামাজিক এবং বৌদ্ধিক জগতের সীমানার বাইরে মানুষটির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেনাবিভাগে ওঁকে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়—বাপু এখানে তোমার খুব সুবিধে হবে না। মেজর হয়েছ—ওই পর্যন্তই। বড় ঘরের ছেলে না হলে এর উপরে ওঠা যায় না। অক্সফোর্ডে প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতি এর চেয়ে কম নিষ্করুণ না। এখানে চাকরি এবং উন্নতির দুটি সিঁড়ি আছে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি—যথা লেকচারার,

রিডার, প্রফেসর আর দ্বিতীয়টি কলেজের ফেলোশিপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত প্রফেসর ইত্যাদি সবাই এখন কোনও না কোনও কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। এঁরা মাইনেটা পান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। আহার বাসস্থান জোগান কলেজ। আগে এই নিয়ম ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরেরা সবাই ফেলোশিপ পেত না। আর ফেলোশিপ না পাওয়ার মানে ছিল এই যে—অক্সফোর্ডের সুধীসমাজ তোমাকে তাঁদের একজন হিসাবে মেনে নিল না। ডেভিস কোনও দিনই কোনও কলেজের ফেলো নির্বাচিত হননি। ওঁর শুধু বেলিয়ল কলেজে ডাইনিং রাইটস অর্থাৎ পানাহারের অধিকার ছিল। বারবার তিনবার ওঁকে ফেলো নির্বাচনের প্রস্তাব বাতিল হয়। এই অপমান ওঁকে অত্যন্ত আঘাত করেছিল। জীবনের শেষ দশ বছর অক্সফোর্ডে থেকেও ইনি ওখানকার কোনও কলেজের সীমানার মধ্যে পদার্পণ করেননি। আমরা যখন ছাত্র তখন কলেজে 'ডাইনিং রাইটস'-এর অনুষঙ্গ হিসাবে ওঁর যেসব পাওনা ছিল, তার একটি রীতিমতো মধ্যযুগীয়। উনি ওঁর পরিবারের জন্য দৈনিক যে-পাউরুটি আর দুধ প্রয়োজন সেটা পেতেন। এবং রোজ সকালে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুধ-রুটি উনি সংগ্রহ করতেন।

অক্সফোর্ড বাসের প্রথম দিনই কাউলি পাড়ায় ১০০ নম্বর ডিভিনিটি রোডে ওঁর বাড়ি যাই। বহু বছর ধরে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত এই বাড়িটি আমার ভাল লেগেছিল। ডেভিসের স্ত্রী বাড়িটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন। ওঁরা বেশ গর্ব করে বলতেন যে, ওঁদের বিয়ের সময় দু'জনেরই বয়স আঠারো। এবং ওঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে আমৃত্যু কখনও কোনও চিড় ধরেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য—সে সময় কাউলি নিরঙ্কুশভাবেই শ্রমিক পাড়া ছিল। কিন্তু অক্সফোর্ডে শ্রমিক পাড়া মানে বস্তি বা পাশ্চাত্যের বড় শহরগুলির শহরকেন্দ্রের মতো মুমূর্ষু চেহারা না। দিব্যি পরিষ্কার ছিমছাম। তবে অধ্যাপকশ্রেণির আর কোনও মানুষ তখন ও পাড়ায় থাকতেন বলে আমার জানা নেই। ডেভিসের বসবার ঘরে একটি জিনিস আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওঁর প্রশিক্ষণে যত থিসিস লেখা হয়েছে তার প্রতিটির একটি করে কপি সুন্দর করে বাঁধিয়ে শেল্ফে রাখা ছিল। ছাত্রদের কাজ সম্পর্কে গৌরববোধের এই রকম সুষ্ঠু প্রকাশ আমার আর কোথাও নজরে আসেনি।

বিধিমতো অক্সফোর্ডে আমার যা-কিছু শিক্ষা তা ডেভিস সাহেবের কাছে। কারণ উক্ত বিদ্যাস্থান আর কারও কাছে আমার অন্য কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করেনি। গবেষণাভিত্তিক ডিগ্রি নিতে গেলে তখন সুপারভাইজার ছাড়া আর কারও কাছে কোনও শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ছিল না। এর বাড়তি যা-কিছু তা তোমার নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করতে হবে—অর্থাৎ সেটা হচ্ছে ফাউ। হিল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—এত খরচা করে সাতসমুদ্র পার হয়ে ডেভিসের কাছে পড়তে এলে? এই প্রশ্নের কোনও সরল উত্তর সম্ভব ছিল না। না, শুধু ডেভিসের কাছে পড়ার জন্য সাতসমুদ্র পাড়ি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হত না। পড়তে গিয়ে আর কী লাভ হয়েছিল সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আইনত অক্সফোর্ডে আমার একমাত্র শিক্ষক এই হেরে যাওয়া মানুষটি সম্পর্কে আরও দু-এক কথা বলতে চাই।

ডেভিস যদি বড় ঘরের ছেলে হতেন, তা হলে ফৌজের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করতে আসতেন না। যথাকালে অন্তত ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ অবধি পৌঁছে বক্ষদেশ অনেক

মেডালে সুশোভিত করে নামের পিছনে ইংরেজি বর্ণমালার অনেকগুলি অক্ষর লাগিয়ে সগৌরবে অবসর গ্রহণ করতেন এবং জীবনান্তে সাঁজোয়া গাড়ি চেপে পুরোদস্তুর সামরিক সম্মানসহ কবরস্থ হতেন। কিন্তু ওঁকে স্পষ্টই বলে দেওয়া হয় যে, এসব উচ্চাশা করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না। তাই অনেক লড়াই করা মানুষটি পুরস্কার হিসাবে কেমব্রিজে পড়ার সুযোগ পান এবং তিরিশের দশকের শেষাশেষি অক্সফোর্ডে চাকরিও জোটে। তবে শেষের ব্যাপারটা খুব সম্মানসূচকভাবে হয়নি। পাঁচ বছর পাঁচ বছর করে বাঁধা মেয়াদে বহাল হতেন। বোধহয় জীবনের শেষ ক'বছর এই অপমান সহ্য করতে হয়নি। এসব ব্যাপারে ইংরেজদের এক বাঁধা বুলি আছে : "কী করা যাবে? নিয়ম!" নিয়ম যে বদলানো যায় এবং খুঁটির জোর থাকলে বদলানো হয়েও থাকে, সুনীতির মুখোশধারী এই সামাজিক সংস্কৃতিতে সেসব কথা উল্লেখ করা ভদ্রজনোচিত নয়। ডেভিস সম্পূর্ণ অহঙ্কারমুক্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোনও ঘোরপ্যাঁচ বা অসত্য ভাষণ করতে কখনও দেখিনি। কিন্তু ব্রিটেনের অতিরিক্ত শ্রেণিসচেতন সমাজ ওঁকে একটি অর্ধসত্য বলার প্রেরণা জুগিয়েছিল। উনি বলতেন যে ওঁর বাবা একটি টুইড ফ্যাক্টরির মালিক ছিলেন। অনেক পরে জানতে পারি উক্ত টুইড ফ্যাক্টরিতে মানুষটি মালিক না, শ্রমিক ছিলেন।

জীবনের অনেকটা সময় কলিন ডেভিস পেশাদার সৈনিক হিসাবে কাটিয়েছেন। ওঁর স্মৃতিচারণে ফৌজি জীবনের কথা একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গে উনি যেসব ভয়াবহ কাহিনি শোনাতেন তা আমি অন্য কারও কাছে শুনিনি বা কোথাও পড়িনি। উনি বলেন যে, অনেক সময়ই কোনও জার্মান সৈন্য ধরা পড়লে ছোকরা ইংরেজ সেপাইরা তাদের প্যান্টের ভিতর সলতেয় আগুন ধরিয়ে বোমা ঢুকিয়ে দিতেন। জার্মান ছেলেগুলি ভয়ে চিৎকার করতে থাকত। তারপর বোমা ফেটে ওদের শরীর চৌচির হয়ে যেত। জার্মানরাও ইংরেজ বন্দিদের নিয়ে একই খেলা খেলতেন।

অফিসারদের কোয়ার্টারে মৃত্যু নিয়ে নানা বিকট ঠাট্টা হত। যোদ্ধাদের মধ্যে চালু একটি কুসংস্কার ছিল যে, সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে কারও রক্তপাত হলে সেদিন তার মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব প্রবল। যেদিন ওঁর নিজের এই দুর্ঘটনা ঘটত সেদিন উনি ভয়ে কুঁকড়ে থাকতেন। একবার ওঁর গায়ে গুলি লাগে। সে গুলি শরীরের কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল বহু বছর পরে তার হদিস পাওয়া যায়। ডেভিসের শরীরে ভ্রমণের ফলে সেটা বেঁকে ইংরেজি 'এল' অক্ষরের আকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের জাদুঘরে এই বিচিত্র জিনিসটি বহুদিন রাখা ছিল। পরে ডেভিস ভারতে গোরখা রেজিমেন্টের মেজর হন এবং দীর্ঘদিন সৈন্যদের সঙ্গে ধরমশালায় বাস করেন।

গোরখাদের সম্পর্কেও উনি গা-শিউরানো সব কাহিনি শোনাতেন। ডেভিস শেষ ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে লড়েছিলেন। তারপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'শান্তিরক্ষা'র কাজে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। শান্তিরক্ষার মানে অনেক সময়ই যে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এ কথা গোপন করার চেষ্টা উনি কখনও করেননি। ওঁর কাছেই শুনি যে, শান্তির সময় গোরখারা শিশুর মতো সরল। সীমান্তের পাঠান গ্রামগুলিতে ওরা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে খুব ভালবাসত। কিন্তু পরদিনই ওই অঞ্চলে বিদ্রোহ হলে শান্তি স্থাপনের জন্য যখন গোরখারা

যেত তখন কাল যাদের সঙ্গে খেলা করেছে সেই বাচ্চারা নির্ভয়ে ওদের কাছে এলে বিনা দ্বিধায় তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করত। আর তার সঙ্গে অট্টহাস্য—যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত নখদন্ত গোপন করার চেষ্টা ডেভিস কখনও করেননি। উনি বলতেন, "আমি যদি ভারতীয় ভদ্রলোক হতাম তা হলে কংগ্রেসের সভ্য হতাম সন্দেহ নেই।" মানুষের রাজনীতি তার শ্রেণিস্বার্থের উপর নির্ভর করে, সহজ বুদ্ধিতে উনি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতির এক বিশেষ মুহূর্তে উনি অভিনেতা না হলেও দর্শকের ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার অল্প ক'দিন আগে ডেভিস অমৃতসর হয়ে কর্মস্থল ডালহাউসি যান। ফেরার পথে দেখেন—হঠাৎ যেন চেনা পৃথিবীটা বদলে গেছে। রাস্তার মানুষগুলি হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে—যেন পারলে ওদের ছিঁড়ে ফেলবে। ওঁর কাছে শুনি যে, ওঁর কোনও কোনও সহকর্মী দেশি ভৃত্যদের নিয়মিত চাবকাতেন। এই তথ্য উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গেই উনি বলতেন, "আমার গায়ে কেউ হাত তুললে আমি অবশ্যই তাকে খুন করতাম। ভারতীয়রা মার খেয়ে তার প্রতিশোধ কেন নিত না, একথা আমি আজও বুঝতে পারিনি।" ভারতীয় মনিবরাও যে ভৃত্যদের পেটাত, এ কথা বলার মতো সৎ সাহস সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

অক্সফোর্ডে ওঁর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে রাজনীতির খেলা ছিল—এ কথা উনি অকপটে স্বীকার করতেন। পদটির জন্য ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন টমসন—যাঁর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস ঠিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী না হলেও, ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রচনা। ত্রিশের দশকে গাঁধীর আন্দোলনে ভারতে ইংরেজ শাসনের ভিত রীতিমতো নাড়া খেয়েছে। সময়টা ঠিক রাজনৈতিক উদারতা দেখাবার জন্য অনুকূল না। ওই দশকের গোড়ার দিকে শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভা সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যাপারে কোনও দয়ামায়া দেখিয়েছেন এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। সুতরাং টমসনের নরম মনোভাব তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। চাকরিটা ডেভিস পেলেন। টমসন যে ওঁর তুলনায় অনেক উঁচুদরের ঐতিহাসিক সে কথা ডেভিস নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন।

অক্সফোর্ডে আইনত আমার একমাত্র শিক্ষক ডেভিসের কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছু কি পেয়েছিলাম? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক। শুধু ইতিহাস কেন, মানববিষয়ক যে কোনও শাস্ত্রেই বক্তব্য কীভাবে বাছতে এবং পরিবেশন করতে হবে তার কতকগুলি সনাতন নিয়ম আছে। এ নিয়মগুলি কোথাও লেখা নেই। কিন্তু তাদের ভিত্তি মানবমনের কতগুলি স্বাভাবিক প্রবণতা—যে-নন্দন এবং বৌদ্ধিক চেতনা জাতীয় সংস্কৃতির সীমা ছাড়িয়ে সমস্ত পরিশীলিত মনকে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে। আধুনিকোত্তর চিন্তায় যথাযথভাবেই যুগে যুগে রুচির পরিবর্তন, শ্রেণিতে শ্রেণিতে রসবোধের বিভিন্নতা এই সব মনে রেখে 'রিয়াল রিডার' বা সত্যিকার পাঠকের কথা তোলা হয়েছে। সে পাঠক কোনও সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী সাহিত্য বা শিল্পর বিচার করে না, করে তার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পটভূমি দ্বারা নির্ধারিত ভালমন্দ বিচার দিয়ে। একথা স্বীকার করলেও সাহিত্য বা শিল্পের প্রামাণ্য রীতিনীতি বা 'ক্যানন' সম্ভবত বাতিল হয়ে যায় না। বোধহয় এসব ব্যাপারে

সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ কতগুলি ধারা সব জায়গায়ই চোখে পড়ে। দু-একটা নেতিবাচক উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। লিখতে বসে একগাদা অবান্তর কথা সম্ভবত কোনও সংস্কৃতিই আনন্দদায়ক বলে মনে করে না। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলে প্রচলিত প্রবাদটিতে অবান্তর কথার বর্জনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তেমনই অতিকথন দোষ কোনও সংস্কৃতিতেই জনপ্রিয় না। ভীমরতিপ্রাপ্তির ফলে আমার যদি এই দোষ জন্মে থাকে তা হলে 'দেশ' পত্রিকার পাঠকসংখ্যা অন্তত কিছুদিনের মতো হ্রাসপ্রাপ্ত হবে সন্দেহ নেই। আর দুর্বোধ্যতা? প্রতিভাবান পুরুষ হোমি ভাবার লেখা পড়ে যদি সত্যিতে কেউ আনন্দ পেয়ে থাকেন তো তিনি নিশ্চয়ই শিরোপা পাওয়ার যোগ্য। এইসব উদাহরণের উলটো উদাহরণও অনেক দেওয়া যায়। আমরা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এবং তিন যুগব্যাপী কাহিনি ভালবাসি। গ্রিকরা সীমিত স্থান-কালের বাইরে গেলে বিরক্ত হতেন। এ তর্কের শেষ নেই। তবে ডেভিসের কাছে কী শিখেছিলাম সে প্রসঙ্গে এই আলোচনার গভীরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ওঁর কাছে যা শিখি তা কতকটা হাতেনাতে কারিগরি শিক্ষার মতো। উনি কোনও তত্ত্ব আওড়াতেন না। একটা লেখা নিয়ে দেখালে তার ভাল-মন্দ বিচার করে কীভাবে লেখা উচিত বা অনুচিত সেটা বুঝিয়ে দিতেন। আনকোরা গবেষকদের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যা-কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে তার সবই লেখার মধ্যে ঢোকানো। সেই সুকুমার রায়ের উন্নতিশীল যুবক ভবদুলালকে মনে পড়ে? যা-কিছু শুনছেন তার সবই তাঁর পরিকল্পিত বই 'চলচিত্তচঞ্চরী'র ভিতর ঢুকিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করতেন? এই ভবদুলালী প্রবৃত্তি নতুন গবেষকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত মারাত্মক শত্রু। ডেভিস সাহেব 'ডেড ইনফরমেশন' অর্থাৎ প্রাণহীন তথ্য—যাতে বিষয়টি সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা একটুও এগুচ্ছে না, তা কী করে নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হয় হাতে ধরে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখন এবং পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে এসে দেখেছি—এত যত্নে এই শিক্ষা আর কেউ দিতেন না বা দেন না। অথচ অনেক নয়া গবেষকেরই এই শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। ওঁর কাছে কাজ করে তথ্যসমুদ্র থেকে সার গ্রহণ করার ক্ষমতা অন্তত কিছুটা অর্জন করতে পেরেছি বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয় কথা, ঐতিহাসিক রচনায় বিবরণী এবং যুক্তি দুদিকেই সমান নজর রাখতে হয়। বিষয়-নিরপেক্ষ বক্তৃতায় ব্যাপারটা বোঝানো যায় না। দিনের পর দিন প্রতিটি পরিচ্ছেদ বারবার লিখিয়ে ডেভিস এই শিল্পকর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। আজ যদি মোটামুটি লিখতে শিখে থাকি তো তার জন্য যে শিক্ষক আমার উত্তমর্ণ তাঁর নাম কলিন ডেভিস। উন্নাসিক আঁতলামি ভঙ্গি নিয়ে এই কথা অস্বীকার করলে আমার দশ হাজার বছর রৌরব নরকবাস সাজা হওয়া উচিত।

থিসিস তথা ঐতিহাসিক রচনা লেখার শিক্ষা আরও একটি মানুষের কাছে পেয়েছিলাম। তিনি সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অধ্যাপক ভিনসেন্ট হারলো। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে সেমিনার তখন খুব চালু ছিল না। এক হারলো সাহেব নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি করতেন। ওঁর বিশেষ জনপ্রিয় সেমিনারের বিষয় ছিল কী করে থিসিস লিখতে হয়। উনি প্রথমেই ছাত্রকে বলতেন যে, গবেষণা শুরু করার আগেই বিষয়টি সম্বন্ধে কীরকমের

সব প্রশ্ন তার মনে আসছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে। সেই প্রাথমিক প্রশ্নমালা থেকেই ক্রমে ক্রমে থিসিসের মূল কাঠামো রূপ পরিগ্রহ করত। এ শিক্ষাও উনি হাতেনাতেই দিতেন। আর অনেকটাই বিভিন্ন বয়সে নিজের লেখা থেকে উদাহরণ দিয়ে অধ্যাপক দেখাতেন কীভাবে অল্প বয়সের লেখায় কাব্য বা আঁতলামি করে বিষয়বস্তুকে অকারণে ঘোলাটে করে তোলার আশঙ্কা থাকে। আর ওই সেমিনারে অত্যন্ত দরকারি একটি আলোচনা ছিল পাংচুয়েশন নিয়ে। ব্যাপারটা যে কত দরকারি তা ওই সেমিনারের অভিজ্ঞতা না হলে কখনও বুঝতাম না। এখন অবশ্য আঁতলামি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইতিহাস আর বস্তু-উত্তীর্ণ মায়াবাদে কোনও পার্থক্য থাকছে না। আর দুর্বোধ্যতাই যখন বক্তব্যের শ্রেষ্ঠত্বর নিদর্শন, তখন কমা সেমিকোলোন নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

অক্সফোর্ডে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমার সংস্পর্শ আর শুধু একটি মানুষের মারফত হয়েছিল। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ স্যার জর্জ ক্লার্ক। ডেভিস নিজেই আমাকে ওঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বারতিনেক ওঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। আমি ভারতবর্ষের উপকূলে ডাচ কোম্পানির ব্যবসা নিয়ে গবেষণা করব শুনে উনি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। ওঁর প্রথম প্রশ্নটি আমার খুব মনে আছে। সতেরো শতকে এশিয়ার সঙ্গে ডাচদের ব্যবসার প্রধান উপজীব্য ছিল মশলা। স্যার জর্জ জানতে চান যে, ওইসব মশলাগুলি আমি স্বচক্ষে দেখেছি কি না এবং কোনটা কী কাজে লাগত এবং এখনও লাগে তা আমার জানা আছে কি না। ইংল্যান্ডে ইতিহাসচর্চার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য বস্তুনিষ্ঠা। স্যার জর্জের প্রশ্নে তারই প্রমাণ পেয়েছিলাম।

আমাদের সময় যারা গবেষণা-ভিত্তিক ডিগ্রি করতে যেত তাদের সঙ্গে প্রথম অর্থাৎ অনার্স ডিগ্রি করতে যারা যেত তাদের পঠন-পাঠনে কতটা তফাত ছিল একটা হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। আমার গবেষণা-পরিদর্শক বা সুপারভাইজারের সঙ্গে আমার আট সপ্তাহের টার্মে দুবার দেখা হত। তাও তিনি যতটা ছাত্রদের দেখাশুনো করতেন আর কেউ ততটা করতেন বলে আমার জানা নেই। কোনও কোনও নামজাদা অধ্যাপক গবেষক ছাত্রদের ক্ষমাঘেন্না করে বছরে দু-একবার মাত্র দেখা দিতেন। তারপর পাস করো ফেল করো সে তোমার ললাটলিপি। ডি.ফিল পরীক্ষায় কোনও কোনও বিষয়ে ফেলের সংখ্যা ছিল শতকরা ষাট এবং তার একমাত্র কারণ পরীক্ষার কাঠিন্য নয়। ডেভিস ছাড়া আর যে দু'জনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছুটা শিক্ষালাভ করেছিলাম, সে একান্তই নিজের উৎসাহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে নয়। আর আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত একজন, কখনও কখনও দু'জন, বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে তাদের লেখা প্রবন্ধ বা প্রশ্নোত্তর নিয়ে আলোচনা করতে হত। সুতরাং অক্সফোর্ডের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে তারা যে তুলনায় অনেক বেশি ফায়দা ওঠাত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে ছাত্রাবস্থায় সব চেয়ে মূল্যবান শিক্ষা যা পেয়েছি তা বাঁধাধরা ব্যবস্থার বাইরে। যে-কেউ যে-কোনও বক্তৃতা শুনতে যেতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের বক্তৃতা শুনে অনেক সময়ই হতাশ হয়েছি। তখন সেই বাঁদরের বাঁশে চড়ার আদর্শে প্রতি বছর কেঁচেগণ্ডূষ করে বিষয়টি আগাগোড়া বক্তৃতা মারফত বুঝিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল না। নিজের ইচ্ছে এবং রুচি

অনুযায়ী সাধারণত যখন যে বিষয় নিয়ে কেউ চিন্তা বা গবেষণা করছেন তারই কোনও দিক নিয়ে বক্তৃতা করতেন। বিরাট বিরাট সব পণ্ডিত কীভাবে তাঁদের কাজে এগুচ্ছেন বক্তৃতা মারফত তার আঁচ পাওয়া যেত। কিন্তু এঁরা অনেকেই বক্তা হিসেবে নিরেস ছিলেন। তাই অনেক সময়ই বক্তৃতা শুনে কোনও রস পেতাম না। তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম যথেষ্টই ছিল। ইতিহাসে ট্রেভর রোপার, সাহিত্যে হেলেন গার্ডনার এবং এনিড স্টার্কি, শিল্পের ইতিহাসের অধ্যাপক উইনডট—এঁদের বক্তৃতায় পাণ্ডিত্য, অভিনব চিন্তা, রসবোধ আর ভাষাচাতুর্যর যে অদ্ভুত সমন্বয় দেখেছি তার তুলনা অন্যত্র কোথাও পাইনি। উইনডট-এর বক্তৃতায় এত ভিড় হত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও হলে শ্রোতাদের স্থান সঙ্কুলান হত না। স্থানীয় থিয়েটার 'প্লেহাউস'-এ বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে হত এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা শুনত তাদের জন্য মাইকের ব্যবস্থা থাকত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে, ভিড় করে বক্তৃতা শোনা অক্সফোর্ডের স্বভাবধর্ম নয়। বেশির ভাগ বক্তৃতায়ই দু-চার জনের বেশি শ্রোতা জোটে না। শুনেছি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতায় প্রথম দিন জনা পঞ্চাশেক লোক আসত। ক'দিন পর শ্রোতার সংখ্যা দাঁড়াত দুই—মিস্টার স্পল্ডিং এবং তাঁর পত্নী। ওঁর চেয়ারটির জন্য টাকা স্পল্ডিংই দিয়েছিলেন।

উইনডট-এর বক্তৃতা প্রতি বছরই শুনতে যেতাম। রেনেসাঁস ইটালির চিত্রশিল্পের এই ঐতিহাসিক বহু বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। যে-বক্তৃতামালা আমার বিশেষ করে মনে আছে তার বিষয়বস্তু ছিল 'দা মাস্ক ইন মডার্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিং'। ব্রাখ, ক্লে, পিকাসো—এঁদের সবার ছবি বিশ্লেষণ করে উনি দেখান যে, অনেক ক্ষেত্রেই খুব সাধারণ কোনও বিষয়, যার বেশ কিছুই ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে 'লা পেতি মানিয়ের' অর্থাৎ ছোট মাপের শিল্পপ্রচেষ্টার গণ্ডির ভিতর পড়ে, তার উপর অসাধারণ মুনশিয়ানা দেখিয়ে দুর্বোধ্যতার মুখোশ চাপিয়ে দর্শককে ধাঁধা লাগানোর চেষ্টা হয়। অর্থাৎ পাকা কারিগররা তাঁদের চিন্তার সামান্যতা দুর্বোধ্যতার মুখোশে ঢেকে মহৎ শিল্প বলে পরিবেশন করেছেন। কথাটা সত্যি কি না বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যখন শুনেছিলাম তখন মনে হয়েছিল কথাটা ঠিকই বলছেন।

তখনকার এবং সাম্প্রতিক কালের অক্সফোর্ডের মধ্যে একটা বড় তফাত ঘটেছে মার্কিন চিন্তাধারার প্রভাব এবং বাজারু অর্থনীতি মানবজীবনের পরা-সত্য বলে গ্রহণ করার ফলে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থায় গবেষণার উপর চাপ খুব বেশি দেওয়া হয়। বেশ কিছু লেখা নিয়মিত না ছাপালে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে উন্নতির আশা থাকে না। 'পাবলিশ অর পেরিশ' এই শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। পুরনো অক্সফোর্ডে এ বালাই ছিল না। বলা হত—তোমার কিছু বলার থাকলে তবেই লেখা প্রকাশ করো, চাকরি রাখার জন্য লেখা ছাপাতে হবে এই কারণে না। গাদি গাদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির লেখা ছাপানোর চেয়ে কিছু না লেখা ভাল। গবেষণার দাম হয় তার গুণ বিচার করে, পরিমাণ হিসেব করে নয়। বরং একটা ধারণা ছিল যে, অল্প কিছু লোক বাদ দিলে যারা বেশি লেখে তারা অধিকাংশই চিন্তার গভীরতা বা নতুনত্বর বিচার করলে নিরেস। আর হিউম্যানিটিস-এর ক্ষেত্রে গাদি গাদি লেখা কি খুব দরকার? রোজ সকালবেলা উঠে

আদাজল খেয়ে চসারের উপর বছরে বারোটা প্রবন্ধ না লিখলে মানব-সংস্কৃতি কি খুব সঙ্কটাপন্ন হবে? যদি বলো যে, পরিমাণে বেশি গবেষণা আর গুণগত সৌকর্য দুটোর দিকেই নজর দেওয়া দরকার, তার উত্তর—আসলে ওটা ভুয়ো কথা। পরিমাণের দিকে বেশি নজর দিয়ে সবাইকে গবেষণা করতে বাধ্য করলে চিন্তার গভীরতায় শেষ অবধি ঘাটতি পড়া ছাড়া উপায় নেই। সম্প্রতি এক আলোচনায় বলা হয় যে, কিথ টমাস তাঁর প্রথম বই, যা নাকি ইতিহাসচিন্তায় বিপ্লব ঘটায়, সেটি লিখতে আঠারো বছর সময় নিয়েছিলেন। এখনকার দিনে এইভাবে চললে চাকরি জোটে না। ফলে আর কিথ টমাসেরও আবির্ভাব হয় না। এই আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বললেন, 'উই ক্যান নট অ্যাফোর্ড ইট দিস ডেজ'। কেন? হঠাৎ কোন বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটিশ সংস্কৃতি যুগান্তকারী কাজের জন্য সময় দিতে অক্ষম? উত্তর—বাজারু জীবনাদর্শ। ম্যাগি থ্যাচারের রাজত্বকাল থেকে সরকার ঠিক করেছেন যে, করদাতার টাকা যারা খরচা করছে তাদের প্রতিটি পয়সার হিসাব দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই হিসাব কীভাবে হবে? বছরে ক-পৃষ্ঠা লিখেছ তা গুনে। আর যদি না লেখো তবে উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দাও। এর নাম রিসার্চ অ্যাসেসমেন্ট। যে-ব্যক্তি সারা জীবন একমনে জ্ঞানের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে তাঁর বিদ্যা আর মননের সুফল দিনের পর দিন ছাত্রদের দিয়েছেন এবং তার ফলে তাদের মনোজগতে বিপ্লব ঘটেছে, তাঁর এই ব্যবস্থায় কোনও স্থান নেই। তারক সেনের মতো মানুষের এই নয়া জমানায় সম্ভবত চাকরি যেত, কিথ টমাসের অধ্যাপক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকত না। এই ব্যাধি এখন পৃথিবীময় ছড়িয়েছে। আমার ধারণা শিক্ষাকে অশিক্ষায় পরিণত করার এর চেয়ে ভাল ফর্মুলা কেউ চেষ্টা করেও আবিষ্কার করতে পারত না। এখানকার এক কোপনস্বভাব স্কট পণ্ডিতকে এক মার্কিন গবেষক প্রশ্ন করেছিলেন, "হোয়াট ইস ইওর ফিল্ড?" ক্রুদ্ধ অধ্যাপকের সগর্জন উত্তর, "আই অ্যাম নো কু [অর্থাৎ কাউ], মান! আই ডোনট হ্যাভ নো ফিল্ড।" এখন গবেষকরা নিজের নিজের ফিল্ড বেছে নিয়ে শুধু সেখানেই চরে বেড়াচ্ছেন। আধা হজম হওয়া ঘাসপাতা অনর্গল ছাপার অক্ষরে উগরে দিচ্ছেন। দুর্গন্ধে মা সরস্বতী পালাবার পথ পাচ্ছেন না।

অক্সফোর্ডে শিক্ষার একটা বড় অংশ পাওয়া যেত সহপাঠী এবং ছাত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে। আমার ধারণা এখনকার তুলনায় সেই সময়ে ছাত্ররা পড়াশুনো অনেকটা বেশি করতেন। তার অন্যতম কারণ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। এখন দেখি অনেক ছাত্রই প্রায় প্রতি ছুটিতেই বাইরে কোথাও চলে যায়। বছরে বেশ লম্বা একটা ছুটি নেয় না এরকম ছাত্র সংখ্যায় বোধহয় কম। ছুটিটার উদ্দেশ্য যদি ভ্রমণ হয়, তবে তার জন্য পয়সা দরকার। এবং এই পয়সা অনেকেই নিজেরা রোজগার করে। তার জন্যও বেশ কিছুটা সময় যায়। সুতরাং সব মিলিয়ে পড়াশুনোর জন্য যে সময় বাকি থাকে তা বোধহয় আগের তুলনায় কম।

একটা ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। পঞ্চাশের দশকে যারা প্রথম শ্রেণিতে পরীক্ষা পাস করত তারা ইংরেজি ছাড়া অন্তত অন্য আর একটা কোনও ভাষা—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

ফরাসি—স্বচ্ছন্দে পড়তে পারত। এই ভাষাজ্ঞানের ঐতিহ্য এখন প্রায় লুপ্ত হয়েছে। তবে বিদ্যায় কিঞ্চিৎ ঘাটতি যদি-বা হয়েও থাকে, বুদ্ধি বা ধীশক্তিতে কোনও তারতম্য সম্ভবত ঘটেনি।

ক্রিস্টফার হিলের দৌলতে, কতকটা রাজনৈতিক মতবাদের মিল থাকায়, বেশ কিছু বামপন্থী ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁরা হলেন পরবর্তীকালে হিস্ট্রি ওয়ার্কশপের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা র‍্যালফ [বা র‍্যাফায়েল] স্যামুয়েল, ট্রটস্কির জীবনীকার পিটার সেজউইক, ডিকেন্স-বিশারদ গ্যারি বা গ্যাব্রিয়েল পিয়ারসন, ট্রটস্কিপন্থী দক্ষিণ আফ্রিকার বুদ্ধিজীবী মাইকেল কিড্রন প্রমুখ। আরও কয়েকজন ছিলেন যাঁদের একটু দূর থেকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতাম, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। এঁদের মধ্যে প্রধান আমাদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কিথ টমাস বর্তমানে প্রফেসর স্যার কিথ টমাস, নতুন ইতিহাসচিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবশীল 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে যাঁরা মানুষের অতীতকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, স্যার কিথ তাঁদের পুরোধা। কিথের সঙ্গে পেশাগত আদানপ্রদান হয়েছিল অনেক পরে এবং আমার কিছু কাজে ওঁর প্রভাব রয়েছে। আর কানাডা থেকে আগত রোডস স্কলার চার্লস বা চাক টেলর পরে অক্সফোর্ডে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্ল্যাডস্টোন অধ্যাপক হয়েছিলেন। কানাডার প্রগতিবাদী রাজনীতিতে ওঁর অবদান আছে। বামপন্থী যেসব সহপাঠীর কথা লিখলাম এঁদের অনেকেই ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। কিথের কাছে গল্প শুনেছি—যেদিন স্তালিন মারা যান সেদিন নাকি র‍্যালফ সজল নয়নে ওঁকে বলেন, "কিথ। আঙ্কল জো ইস ডেড।" কিন্তু হাঙ্গেরির ঘটনার পর এঁদের অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। বেলিয়লের কমিউনিস্ট ছাত্ররা দল বেঁধে পদত্যাগ করে। ক্রিস্টফার হিল পলিটব্যুরোর সভ্য ছিলেন। উনি দলের ভিতরে থেকে সোভিয়েত নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেন। শেষে যখন দেখলেন পার্টির মত বা নীতি বদলানো সম্ভব নয়, তখন পদত্যাগ করলেন।

অক্সফোর্ডে ছাত্রদের কতকগুলি সভা বা প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে নানা দেশের প্রগতিবাদী ছাত্ররা একত্র হতেন। আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি এবং প্যান-আফ্রিকান পার্সোনালিটি—এই দুটি কথা খুব শোনা যেত। মনে রাখা ভাল তখনও ষাটের দশকের ম্যাকমিলান-বর্ণিত 'উইন্ড অফ চেঞ্জ' অর্থাৎ আফ্রিকায় বিদেশি শাসনের উপর যবনিকা পতন শুরু হয়নি। কিকুয়ুদের বিদ্রোহ তখন তুঙ্গে। আর মালয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। ভিয়েতনামে মার্কিনরা তখনও আসরে নামেনি। তবে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। অল্পদিন আগেই চার্চিল সাহেব লৌহযবনিকা কথাটি ব্যবহার করেছেন। অক্সফোর্ডে ছাত্রদের মধ্যে দেখলাম রাজনৈতিক মতভেদ খুব স্পষ্ট। বড় ঘরের ছেলে বা টাকাওয়ালা কিছু ছাত্র দামি রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়ে নেচেকুঁদে ফুর্তি করে সময় কাটায়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় তারা দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর কালো বো-টাই পড়ে আলাদা একটা টেবিলে বসে শ্যাম্পেন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাজনীতিতে তাদের কোনও উৎসাহ নেই। কিন্তু একটু আঁচড়ালেই দেখা যেত তারা অত্যন্ত রক্ষণশীল। শ্রেণিভেদ এবং পশ্চিমের

শ্রেষ্ঠত্বে ঘোর বিশ্বাসী। এদের কেউ কেউ ন্যাশনাল সার্ভিসের অঙ্গ হিসেবে মালয়ে লড়াই করে এসেছে। খাওয়ার ঘরে একদিন শুনলাম কীভাবে জঙ্গলের ভিতর ষোলো-সতেরো বছর বয়সের সব বিপ্লবী ছেলেমেয়েদের গুলিবিদ্ধ শরীর পড়ে থাকতে দেখেছে একজন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই তা বর্ণনা করছে। এই ব্যক্তিই একদিন আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও কলেজের গেটের কাছে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "পাঁচটা পাউন্ড ধার দিতে পারো?" মহানুভবতা নয়, নেহাতই চক্ষুলজ্জাবশত টাকাটা দিলাম। ওটা আর ফিরে পাইনি। রালফ বলল—বখে যাওয়া ইংরেজ ধনীসন্তানদের এটা একটা বহুপ্রচলিত কায়দা। বিনা দ্বিধায় লোকের কাছ থেকে পয়সা ধার নেয়। নামেই ধার, কারণ ফেরত দেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। প্রভু যে কৃপা করে তোমার দিকে তাকিয়েছেন, এমনকী অনুগ্রহের চরম দেখিয়ে তোমার পয়সা ট্যাঁকস্থ করেছেন, এতেই কৃতার্থ হওয়া উচিত। ফেরত পাওয়ার কথা কী করে মুখে আনলে?

ডিয়েন বিয়েন ফু বিপ্লবীরা কব্জা করার উপলক্ষে আমরা ছোটখাটো এক উৎসব করলাম। ফল হল—আমি কট্টর কমিউনিস্ট এই বার্তা চারিদিকে রটে গেল। সত্যিতে কৈশোরে কংগ্রেসের চার আনা চাঁদা দিয়ে সভ্য হয়েছিলাম। তার পরে আর কোনও দলের সভ্য কখনও হইনি। নির্বিচারে কোনও মত সম্পূর্ণ মেনে নেওয়ার মানসিকতা আমার ছিল না। সুতরাং সাবালক হওয়ার পর কোনও রাজনৈতিক দলের সভ্য হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই নতুন ভ্রান্ত পরিচয় চালু হওয়ায় এক ধরনের 'খ্যাতি' বা কুখ্যাতি হল ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে মুখ্যত অস্বস্তিকরই হয়েছিল। কারণ যুদ্ধের সময়কার ইংরেজ-রুশি ভাই-ভাইয়ের দিন তখন অস্তমিত। দক্ষিণপন্থী ছাত্ররা তো বটেই, রাজনীতি নিয়ে সাধারণত মাথা ঘামায় না যেসব ছাত্র, তাদের কাছেও 'কমি' শব্দটা এক ভয়াবহ আদর্শগত বিকৃতির দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ করলাম বেশ কিছু ছাত্র আমার মুখোমুখি হলে একটু বিব্রতভাবে না-দেখি না-দেখি করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। নবলব্ধ এই অযাচিত গৌরবে বেশ বিব্রতই বোধ করতাম।

যে-রাজনৈতিক ঘটনাটি আমাকে সত্যিতেই বিস্মিত করেছিল সেটি হল সুয়েজ খালে ইঙ্গ-ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-অফিসের কর্মীদের যৌথ প্রতিবাদ। অ্যান্টনি ইডেন তখন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতায় রক্ষণশীল দলের মন্ত্রিসভা। মিশরের গামাল আবদুল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করলেন। আর ইজরায়েলের প্ররোচনায় ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে মিশর আক্রমণ করল। দেশব্যাপী এত বড় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন ইংল্যান্ডের ইতিহাসে কখনও হয়নি। এই প্রতিবাদের ফলে ইডেনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। অক্সফোর্ডের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার পূর্ণ ধর্মঘট হল। এর আগে শুধু ১৯২৬ সনে সাধারণ ধর্মঘটের সময় অক্সফোর্ডে ছাত্র-শিক্ষক সবাই যোগ দিয়েছিলেন। জি. ডি. এইচ কোল স্বয়ং ইউনিভার্সিটি প্রেসের কর্মীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুয়েজ খাল আক্রমণের বিরুদ্ধেও দেখলাম প্রতিবাদ মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, অফিস এবং ঘরেলু কর্মী সবাই পথে নামলেন। রক্ষণশীল বলে বিখ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয় এত বড় এক গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিতে পারে দেখে বিস্মিত

হয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে ঝুটা নয়, সে কথা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সাম্প্রতিক কালেও এদেশে ইরাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সে আন্দোলন ব্লেয়ার সাহেবের আসন টলাতে পারেনি।

অক্সফোর্ডে বামঘেঁষা রাজনীতির বেশ একটা কৌতুকের দিক ছিল। 'আফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি'র মুখ্য প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন আল-মাহদি পদবিধারী সুদানের দুই খুড়ো-ভাইপো। হ্যাঁ, যে মাহদি জেনারেল গর্ডনের জীবনান্ত ঘটান এঁরা তাঁরই বংশধর। প্রগতিপন্থী কোনও সভা বা অনুষ্ঠান হলেই 'আফ্রো-আশিয়ান-সোলিদারিটি' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ভাইপো সাদিক মঞ্চে আবির্ভূত হতেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যেত, সম্ভবত ওই মন্ত্রে অভিভূত হয়ে কারও-না-কারও বান্ধবী অদৃশ্য হয়েছেন। সাদিককেও আর দেখা যাচ্ছে না। ঔপনিবেশিকতার শিকার দুই মহাদেশের সোলিদারিটি যে এইভাবে খুবই সমৃদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। দেশে ফিরে খুড়ো-ভাইপো দুই পরস্পরবিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খুড়ো যখন প্রধানমন্ত্রী, ভাইপো তখন বিরোধী দলের নেতা, আর ভাইপো সরকার বানালে খুড়ো বিরোধীদের নেতৃত্ব করেন। তবে বিরোধীদের নেতৃত্বে কাজ কিছু কম। কারণ ওই পদাধিকারী সাধারণত জেলে থাকতেন। এইভাবে খুড়ো-ভাইপোর রাজত্বে সুদান মনে হয় সুখেই ছিল। এক ডারফুরের বাসিন্দারা সেই স্বর্গসুখের ভাগীদার হয়নি। কী করা যাবে? সব কি আর হয়?

বামপন্থী সমাবেশে যাঁদের সব সময়ই দেখা যেত, পার্থসারথি গুপ্ত আর রঘুবীর চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন তোলার আহ্বান হলেই প্রথম যে-হাতটি উত্তোলিত হত সেটির মালিক পার্থসারথি। একটা দীর্ঘ বিবৃতির পর পার্থ তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে বক্তার মত কী জানতে চাইত। বক্তার উত্তর সাধারণত খুবই সংক্ষিপ্ত হত, "আই এগ্রি।" আর বামপন্থী জলসায় অবশ্যম্ভাবীভাবেই কোনও সময় শোনা যেত, "উই আর ট্রাইং টু পারস্যুয়েড কমরেড গাপটা টু সিং।" কমরেড গাপটার এসব ব্যাপারে অকারণ অভিমান ছিল না। উপরোধ শেষ হওয়ার আগেই তার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত ধ্বনিত হত। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বেচারি রঘুবীর বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে। এমন সচ্চরিত্র বালক কলিতে সাধারণত চোখে পড়ে না। সম্ভবত দ্বাপরেই প্রজাতিটি শেষ হয়ে গেছে। সে শুধু দুটি ব্যাপারে উত্তেজিত হত। এক, কোনও বামপন্থী চিন্তাবীরের বক্তৃতা শুনে অথবা মিল্ক শেক খেয়ে। দ্বিতীয় বস্তুটা কলকাতায় থাকতে কোনও অজ্ঞাত কারণে তার খাওয়া হয়ে ওঠেনি। অক্সফোর্ডে এসেই সে প্রথম এই অমৃত আস্বাদন করে। প্রথম পরিচয়েই আমাকে রঘু বলেছিল, "চলো, তোমারে দারুণ এক জিনিস খাওয়াই।" আমি ভেবেছিলাম কোকেন-টোকেন কিছু হবে। কিন্তু মিল্ক শেকেই রঘু তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। কিন্তু এক ব্যাপারে রঘু অত্যন্ত সেয়ানা ছিল। ওর গবেষণার বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক আইন। ভাবী পত্নীর জন্মদিনে সে সব সময়ই মোটামোটা আইন বিষয়ক বই উপহার দিত। বইগুলি অত্যন্ত দামি। মেয়েটি ওর প্রেমের গভীরতার এই নিদর্শনে মুগ্ধ হয়ে যেত। প্রিয়তমাকে ঝট করে পঞ্চাশ পাউন্ড দামের বই কে দেয় বলুন, তা তার বিষয় যা-ই হোক। বইগুলি রঘুর

গবেষণার কাজে খুবই লাগত। রঘু যখন তার মনোনীতাকে বিয়ে করা মনস্থ করে, তখন খবরটা বরুণ দে-র মারফত পিতাঠাকুরকে জানায়। পাত্রীটি বৈদ্যকন্যা। খবর শুনে রঘুর বাবা বলেন, "আমার এখনই হার্ট অ্যাটাক হবে।" ভদ্রলোক নাকি রঘুর জন্য একটি না দু-দুটি পাত্রী দেখে রেখেছিলেন। নেহরু সরকার তখন অবধি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বরুণ বলে, "আমি একটু অপেক্ষা করব?" মানে ব্যাপারটা শেষ অবধি কী দাঁড়ায় সেটা দেখে যাওয়ার জন্য নিতান্তই মানবিক কৌতূহল তো হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের সময় বেশ কয়েকজন ভারতীয় এবং পাকিস্তানি ছাত্র অক্সফোর্ডে পড়তে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা ছিলেন রোডস স্কলার রাঘবন আয়ার। অত্যন্ত প্রতিভাবান এই মানুষটি উৎকেন্দ্রিকতায়ও সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এঁর সম্বন্ধে নানা সত্যমিথ্যা গল্প চালু ছিল। কীভাবে ইনি অহমিকা জয় করেছেন তা ব্যাখ্যা করে উনি নাকি বলেছিলেন যে রোজ সকালে মন্ত্রপাঠের মতো উনি নিজেকে বলেন "যে রাঘবন আয়ার রোডস স্কলারশিপ পেয়েছে আমি সেই ব্যক্তি নই। যে পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে সেও আমি নয়। যে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছে সে আর আমিও এক লোক নয়। আমার শুধু একটিই পরিচয়। আমি শুধু ঈশ্বরপুরুষের কিরণমণ্ডলীর একটি ছটা—আ স্পার্ক অফ দা ডিভাইন।" যখন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের নির্বাচনে ভোট গোনা চলছে, রাঘবন তখন নিজের ঘরে বদ্ধপদ্মাসনে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ। যখন কোনও অনুগামী জয়ের বার্তা নিয়ে এল, চোখ খুলে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে রাঘবন বললেন, "দা ভিক্টরি ইস ইওর্স, নট মাইন।" ঈশ্বর তথা ধর্মের জয় যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা কে না জানে। তখন অনেক সময়ই শোনা যেত কালে রাঘবন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ডামাডোলে ডুবে না গিয়ে ভেসে থাকার মতো ক্ষমতা মানুষটির ছিল না। সে চেষ্টাও তিনি শেষাশেষি করেননি।

আমাদের সময়কার আর একজন রোডস স্কলার ছিলেন অনন্তরমণ। ইনি পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। কেমিস্ট্রির ছাত্র এই সনাতনপন্থী হিন্দু যুবক সমাজসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। তখনকার দিনে ট্রিনিটি কলেজের বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে কিছুটা দুর্নাম ছিল। সত্যিতে অনন্তরমণের আগে তারা কোনও অশ্বেতবর্ণ ছাত্র কখনও নেয়নি। রোডস স্কলারদের কলেজ বাছবার অধিকার থাকে। অনন্ত ট্রিনিটিতে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এবং সগৌরবে সেখানে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে একটু অসুবিধে ছিল। সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপারে ভালমন্দ জ্ঞান সব সমাজে যে এক না, এই তত্ত্বে অনন্তরমণ বিশ্বাসী ছিলেন না। যা অশালীন তা সর্বত্রই অশালীন—তাঁর এই বিশ্বাস আমরা কেউ টলাতে পারিনি। ফলে কোনও প্রেমিকযুগলকে রাস্তাঘাটে চুম্বনরত দেখলে বীতশ্রদ্ধ অনন্তরমণ তাদের বাধা দিতেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পিছনে যে-যুক্তি, তার ভিত্তিমূল কিন্তু নীতিবাগীশতা নয়, মানবিকতা। বিস্মিত প্রেমিকযুগলকে আরও বিস্মিত করে অনন্ত বলতেন, "তোমরা কি কখনও অন্য লোকের কথা ভাবো না? এসব বাড়ি বসে করতে পারো না? কখনও ভেবে দেখ না যে যাদের এইসব সুযোগসুবিধা [ফেসিলিটি] নেই তাদের

কীরকম লাগে? বৃদ্ধবৃদ্ধা, অবিবাহিত বা সঙ্গীহীন নারীপুরুষ—এদের কথা তোমাদের একবারও মনে হয় না?" পরাহত প্রেমিক-প্রেমিকা অধোবদনে মঞ্চ ত্যাগ করতেন।

দেশ থেকে যারা এসেছিল তাদের কেউ কেউ আমার ছাত্রস্থানীয়। এদের মধ্যে বরুণ দে এবং পার্থর ছাত্র হিসাবে খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। আমার পরিচিতদের মধ্যে অক্সফোর্ডের শিক্ষাব্যবস্থার যদি কেউ পুরো সদ্ব্যবহার করে থাকে তো এরা দু'জন। এরা অল্পদিনের মধ্যে যে-পরিমাণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল তা সত্যিই ঈর্ষা করার মতো। ওদের দেখে আফসোস হত—কেন দ্বিধা ত্যাগ করে প্রথম ডিগ্রি করলাম না। আমার ধারণা এখনকার তুলনায় সে সময়ে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আরও কঠিন ছিল। পার্থ আর বরুণ ফার্স্ট ক্লাস পেতে পেতে পায়নি। সেই অসাফল্য সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছে বরুণের কন্যা উর্মিলা—ইতিহাসে অনার্স লিস্টে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

আর আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেলিয়লেই সমসাময়িক রোডস স্কলার অযোধ্যানাথ কওলের সঙ্গে। পরে কওল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান হন। আর অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবের ছেলে ইরফান ওঁরই পুরনো কলেজ নিউ কলেজে প্রথমে অনার্স ডিগ্রি করতে এসেছিলেন। ভাল না লাগায় ডি.ফিল ডিগ্রির জন্য কাজ শুরু করেন। তার ফল জগদ্বিখ্যাত বই 'দা অ্যাগ্রারিয়ান সিসটেম অফ মুঘল ইন্ডিয়া'। ডেভিস বলতেন—এর তুলনীয় থিসিস উনি আর দেখেননি। মেয়েদের মধ্যে আমাদের সমসাময়িক ছিল কাজল বোস [পরে সেন]—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপিকা হিসাবে কলকাতায় সুপরিচিতা। আর পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন কামাল হোসেন—যিনি পরে মুজিবের সঙ্গে বন্দি ছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। আমাদের পরের বছর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এলেন। দিনে চোদ্দো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করে, আগে না জানা দুটি ভাষা শিখে ছয় টার্মে অর্থাৎ তিন মাস কম দুই বছরে মিলটনের কাব্যচিন্তা বিষয়ে থিসিস লিখে ডিগ্রি নিয়ে উনি দেশে ফিরে যান। আমাদের মনে হয়েছিল উনি অসাধ্যসাধন করলেন। ইংরেজি সাহিত্যে ডি.ফিল ডিগ্রিপ্রার্থীদের মধ্যে তখন ফেলের সংখ্যা শতকরা ষাট। ওঁর অক্সফোর্ডে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হত। কতকটা সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য মেয়েকে নিয়ে ওঁর স্ত্রী চলে এলেন। একদিন দেখি ওল্ড বডলেয়ানে বেশ দামি একটি ট্যুইড জ্যাকেট পরে বসে পড়াশুনো করছেন। বললেন, "দেখছ কী? সে রবি দাশগুপ্ত আর নেই। সে এখন সস্ত্রীক বাস করছে। দুবেলা পেট পুরে খায়। গায়ে নতুন জ্যাকেট। তবে ডিগ্রি পাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহটা রয়েই গেছে।" নীতিবান মানুষ রবিবাবু অক্সফোর্ডে একবার এক নীতিগত সমস্যার সম্মুখীন হন। উনি যে পাকিস্তানি রেস্তোরাঁয় মাস হিসেবে খেতেন সেখানকার মালিক যুগপৎ দুটি মহিলার স্বামী হয়ে বসায় ইংরেজের অন্যায্য আইনে জেলে গেলেন। রবিবাবু বিপদে পড়লেন। শেষ মাসের টাকাটা কাকে দেবেন? আমরা বললাম দুই স্ত্রীকে ভাগ করে দিন। নীতিগত কারণেই এই সমাধান ওঁর মনঃপূত হয়নি। উনি বহুবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না—তা স্মৃতি বা শরিয়তে যাই ব্যবস্থা থাক।

কেমব্রিজে আমাদের সমসাময়িক ভারতীয়দের সঙ্গে আমাদের বেশ যাওয়া-আসা ছিল। পরিচয়টা ঘটে প্রধানত অমর্ত্যর মারফত। ১৯৫৪ সনের ইস্টারের ছুটিতে ওদের সঙ্গে বাসে

লেক ডিস্ট্রিক্ট বেড়াতে যাই। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা মেহতা (বর্তমানে বসু), দীপক মজুমদার (পরে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উচ্চ পদাধিকারী), অমর্ত্য, রঞ্জনা রায়। সারা পথ দীপক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। না গাইলে কোনও অনিষ্ট হত, এমন কথা জোর করে বলতে পারব না। মাঝে মাঝে অমর্ত্যও যোগ দিত। ওটা না করলে বঙ্গসংস্কৃতি বিপন্ন হত না বলেই আমার ধারণা। ওর নিজের মুখেই শুনি—শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে প্রথম দিনের গানের ক্লাসে সঙ্গীতশিক্ষক ওর কণ্ঠস্বর শুনে ওকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে বলেন, "গাও তো সা-আ-আ।" অমর্ত্য গাইল। শিক্ষক বললেন, "এবার গাও তো রে-এ-এ।" অমর্ত্য তাও গাইল। শিক্ষক ওকে গানের ক্লাস থেকে বরাবরের মতো ছুটি দিয়ে দিলেন। অর্থনীতিতে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের যতটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঠিক ততটা হয়নি, একথা সর্বজনবিদিত। তবে ওর একটি গান বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল, "কে তুমি দাঁড়িয়ে আড়ালে, ন হাত লম্বা পাটি বাড়ালে?" অর্থনীতিতে ওর ভবিষ্যৎ কী চেহারা নেবে তাও কেমব্রিজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। অল্পদিন পর পরই খবর পেতাম ওখানে কোনও ছাত্রের পক্ষে যা-কিছু সম্মান পাওয়া সম্ভব, একে একে তা সবই ও পাচ্ছে। ও যে কালে কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদদের একজন হবে প্রথম থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

এক সময় আমাদের পররাষ্ট্রসচিব এবং বেলজিয়ান কঙ্গোয় ডাগ হ্যামারশোল্ডের সহকারী রাজেশ্বর দয়াল উনিশশো ত্রিশের দশকে অক্সফোর্ডে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাস করার পর কিছুদিন পড়েছিলেন। উনি না ঢেকে-চেপে স্পষ্টই লিখেছেন যে, ইংরেজ ছাত্ররা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশত না। আমাদের সময় ঠিক এই অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে কিছু ছাত্র যে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বিশেষ উৎসাহী ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। মধ্যবিত্ত ইংরেজ, বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে যাদের বাস, অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তাদের আড়ষ্টতা জগৎ-কুখ্যাত। কিন্তু এটার কারণ নাক উঁচুপনা না এক ধরনের চক্ষুলজ্জা বা ইংরেজিতে যাকে বলে গকিনেস, তা কোনও দিনই ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে একটা জিনিস বরাবরই লক্ষ করেছি, আমাদের দেশে বন্ধুত্ব বলতে যে-বাধাবন্ধহীন ঘনিষ্ঠতা বোঝায়, এদের সমাজে তার সঙ্গে তুলনীয় সম্পর্ক সম্ভবত যৌন সম্বন্ধের বাইরে হয় না। এমনকী সেখানেও মনে হয় মনের দিক থেকে কিছু আব্রু থাকে। ছাত্রাবস্থায় তবু যেটুকু স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক হয়, মানুষ সংসারী হওয়ার পর সেটুকুও আর থাকে না। একটা উদাহরণ দিই। যখন ছাত্র ছিলাম অনেকে খবর না দিয়ে ঘরে এসে বসতেন। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। কোনও সংসারী লোককে এই ধরনের ব্যবহার করতে কখনও দেখিনি। যাদের সঙ্গে সারারাত আড্ডা দিয়েছি, তাদের সঙ্গে এখন ক্বচিৎ কখনও দেখা হয়। আর বিনা নোটিসে কেউ দেখা করতে চলে আসবে—এমন কথা কল্পনাও করা যায় না।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। আমরা যখন ছাত্র তখনও এখানে শ্রেণিসচেতনতা শুধু প্রবল নয়, তার প্রকাশ রীতিমতো নগ্ন। বিখ্যাত পাবলিক স্কুলগুলির ছাত্ররা নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই থাকত। হঠাৎ না বুঝে খাওয়ার সময় তাদের পাশে গিয়ে বসলে রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থা হত। কেউ অনাহূত ব্যক্তিটির সঙ্গে কথা বলত না। বাঙালপনা করে কথা

বলার চেষ্টা করলে নাকাল হতে হত। অবশ্যি এ নিয়মের ব্যতিক্রম যথেষ্টই ছিল। ইটনের একটি ছাত্রর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তার নাম টিমথি টার্টন। ওর বাবা রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার বেশ ভারী ওজনের সভ্য ছিলেন। একটা ব্যাপারে বিরাট এক পরিবর্তন নজরে পড়ে। ১৯৫০-এর দশকে ইটন-হ্যারোর ছাত্র কথাটা গায়ে লেখা না থাকলেও ওই সৌভাগ্য কাদের হয়েছে বুঝতে কিছু অসুবিধে হত না। আর এখন কেউ বিখ্যাত পাবলিক স্কুলে পড়ে থাকলে, কথাটা জাহির না করার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এটা যে সামাজিক মানসিকতায় কত বড় বিপ্লবের দ্যোতক তা অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো কঠিন।

প্রত্যেক সমাজেরই কিছু বিশিষ্ট দোষগুণ থাকে। স্নবারি মধ্যবিত্ত ইংরেজের সামাজিক ব্যাধি। ও কথাটার বাংলা হয় না, যদিও বাঙালিদের মধ্যে স্নবের অভাব আছে এমন নয়। এ ব্যাধির লক্ষণ দুটি। প্রথম, নিজের তুলনায় যাদের সামাজিক মানমর্যাদা কম তাদের ক্ষেমাঘেন্না করা। দ্বিতীয়, যারা ওই হিসাবে উপরতলার লোক তাদের পিছনে ল্যাকল্যাক করা। বামপন্থী রাজনীতির অনুরাগী আর অন্যতর জীবনযাত্রার অনুসারীদের বাদ দিলে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ইংরেজই এই ব্যাধিতে ভুগত বললে বোধ হয় খুব অন্যায় হবে না। এই সত্যের চরম প্রকাশ দেখেছিলাম একটি ভারতীয় ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। ধ্রাঙ্গাধ্রার মহারাজা গুজরাতের একটি ছোট দেশীয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। নেহরুজির কৃপায় ওঁদের রাজত্ব তখন অতীতের ইতিহাস। বছরে দেড়-দুই লাখ টাকা ভাতা পেতেন। আর ভাতা বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝেই আবেদন করতেন। অক্সফোর্ডে নৃতত্ত্ববিভাগে যজ্ঞোপবীত সম্পর্কে থিসিস লিখবেন বলে এসেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনার জন্য ওঙ্কার মণ্ডল নাম দিয়ে উনি একটি সমিতি স্থাপন করেন। ওঁর আহ্বানে আমি ওই মণ্ডলীর সভ্য হই। ওঁর বিগত রাজ্যের আয়তন যাই হোক, রাজকীয়তার ব্যাপারে মহারাজের কুলোপনা চক্কর। ওঁর লেটারহেডে লেখা ছিল 'কোর্ট অফ ধ্রাঙ্গাধ্রা, ক্যাম্প অক্সফোর্ড, ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ, অক্সফোর্ড'। অভিজাত ঘরের ছেলেদের কলেজ ক্রাইস্ট চার্চ, ছাত্রদের থাকবার জন্য সেখানে এমন সাইজের ঘরও আছে যেখানে দুশো লোককে পার্টি দেওয়া যায়—তাকে ধ্রাঙ্গাধ্রার ক্যাম্প বলে বর্ণনা করায় যে-বিরাট আত্মশ্লাঘার পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ওঁর দুটি অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী সেক্রেটারি ছিল। একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি আর দ্বিতীয়টি মিলিটারি সেক্রেটারি। দ্বিতীয় জন কার সঙ্গে যুদ্ধ ব্যাপারে মহারাজকে পরামর্শ দিতেন তা জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি। মহারাজা সকালবেলা বাথরুমে সিংহাসনারূঢ় হয়ে দরজার বাইরে বসা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে চিঠির শ্রুতিলিপি লেখাতেন। মুখচোখ লাল করে মেয়েটি লিখে যেত। এই মহা চালিয়াত মহারাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বড় ঘরের ইংরেজ ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ওদের এই আদেখলে স্নবারিতে মহারাজা খুবই মজা পেতেন।

প্রাচ্যবিদ্যার ছাত্র তিনটি ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁদের একজন হচ্ছেন পোলান্ড থেকে যুদ্ধের সময় পলাতক এক পরিবারের ছেলে ইয়ান ওয়েরিহো। ইয়ান ফারসি ও আরবির ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ওর বিশেষ দুর্বলতা ছিল ভারতীয় মেয়েদের সম্পর্কে। অরুন্ধতী রায়ের মাতুল জর্জ আইসাক (অনেকে বলেন, উপন্যাসটির মাতুল চরিত্র

ওকে নিয়েই রচিত) বলতেন যে, কেরলে নারকেল গাছে জড়িয়ে শাড়ি শুকোতে দেওয়া হয়। ইয়ান যদি কেরল যেত তা হলে নাকি সেই দৃশ্যও মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত। এ কথার সত্যতা বিচারের সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু ওর জীবনের এক ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতার মুহূর্তে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল। ইয়ান কোথায় শুনে এল যে, হোলির দিন ভারতীয় ছেলেরা মেয়েদের আবির পাঠায়। সেই আদর্শে ও লেফাফায় মুড়ে বেশ কয়েক জন ভারতীয় মেয়েকে 'আবির' পাঠাল। লেফাফা খুলে সেই আবির নাকে-চোখে যাওয়ায় মেয়েদের তো মরণদশা। কারণ আবির জিনিসটা অক্সফোর্ডে পাওয়া যেত না। যা পাওয়া যেত সে হচ্ছে লঙ্কার গুঁড়ো। এই সামান্য তফাতটা ইয়ান ধর্তব্য মনে করেনি। মেয়েরা কেউ কেউ প্রোক্টরের কাছে নালিশ করবে ঠিক করেছিল। অনেক কষ্টে তাদের নিবৃত্ত করি। কোনও ভারতীয় সুন্দরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে কীভাবে নতজানু হয়ে সে তার প্রেম নিবেদন করবে, শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ট্র্যাডিশনে অভিনয় করে ইয়ান তা আমাদের দেখাত। কিন্তু ভারতীয় নারী তো আর তাদের পশ্চিমি ভগিনীদের মতো লজ্জাহীনা নয়, তাই তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে : "শি উইল হাইড হার ফেস ইন দা ম্যান্টিলা।" বলে ঘোমটায় মুখ ঢেকে লজ্জাবতী রমণীর ভূমিকায় ইয়ান ওড়িশি নৃত্যের স্টাইলে পোজ মেরে দাঁড়িয়ে থাকত। সঙ্গিনীর সন্ধানে বিবাগী হয়ে বেচারা সিন্ধুনদী অতিক্রম করতে পারেনি বটে, কিন্তু তার পূর্বাভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। সে শেষ অবধি বাগদাদের এক আরব মেয়েকে সাদি করে।

আর আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মধ্যে ছিল দুই সংস্কৃতের ছাত্র—ভ্লাদিমির জোয়াঙ্ক এবং সিরিল ল্যুইস। দু'জনেই বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি। ভ্লাদিমির আমস্টার্ডামের ইহুদি। যুদ্ধের গোড়ায় ওঁর মা-বাবা ওকে আর ওর বোনকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। ওঁদের পরিবারের আর সবাই হিটলারের গ্যাস চেম্বারে নিহত হন। ভ্লাদিমির সত্যিকারের কসমোপলিটান ইহুদি। ওঁর দাদামশায় ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের প্রধান র‍্যাবাই। ফলে অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা ও জন্মসূত্রেই শিখেছিল। তার সঙ্গে গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আরও কয়েকটি ভাষার জ্ঞান ও নিজের চেষ্টায় অর্জন করে। ওর মাতৃভাষা ডাচ। সেই ভাষাশিক্ষার সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে এই দেশে আমার জীবনযাত্রার নানা পর্যায়েই ভ্লাদিমির এবং তার স্ত্রী আইলিনের সাহায্য পেয়েছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যাদের জীবনে বিপর্যয় এনেছিল, ভ্লাদিমিরের মারফত তাদের সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয় হয়। আর পরোক্ষই বা বলি কী করে? ওর দাদামশায়-দিদিমা সবারই তো জীবন শেষ হয়েছিল আউসউইৎসের গ্যাস চেম্বারে। যুদ্ধের ভয়াবহতার অন্যতম পরিচয় পেয়েছিলাম আর একটি ছেলের মারফত। সে জাতিতে জার্মান। নামটা ভুলে গেছি। পঞ্চান্ন সনে সে বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু পড়তে বেলিয়ল কলেজে আসে। বার্লিনের পতনের সময় যেসব অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয় ও তাদের একজন। ওর বয়স তখন দশ। বাড়ির ছাদে বিমানধ্বংসী কামান চালানোর কাজে ওদের লাগানো হয়েছিল। ভয় পেয়ে যাতে পালিয়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যে কামানের সঙ্গে শিকল দিয়ে ওদের বেঁধে দেওয়া হত। ছেলেটি বলত—শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজ মাথার উপর এলে ভয়ে ওরা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত। কিন্তু তা বলে সামরিক কর্তব্য থেকে নিস্তার পাওয়া যেত না।

সিরিল ল্যুইসের মতো বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আমি আর দেখিনি। ব্রিটেনে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে লর্ড স্কারবরা প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি ইডেনকে এক প্রস্তাব দেন। ইডেন স্বয়ং অক্সফোর্ডে ফারসিতে ডিগ্রি নিয়েছিলেন। তিনি বন্ধুর প্রস্তাব গ্রহণ করে কতগুলি এশীয় ভাষা এবং সাহিত্য পড়বার জন্য অত্যন্ত লোভনীয় কিছু স্কলারশিপ প্রতিষ্ঠা করেন। যারা কোনও না কোনও ভাষা নিয়ে পড়ে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে পাস করেছে, তারাই শুধু এই স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করতে পারত। ব্রিস্টল থেকে ল্যাটিন এবং ফরাসিতে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি নিয়ে সিরিল অক্সফোর্ডে সংস্কৃত আর প্রাকৃত পড়তে আসে। ও ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে গিয়ে রোজ বাঁধা চার ঘণ্টা পড়াশুনো করত। কিন্তু এ ছাড়া ওকে কখনও পড়াশুনো করতে দেখিনি। ঘরে একটিও বই ছিল না, শুধু টেনিস সম্বন্ধে একটি মাসিক পত্রিকা ছাড়া। গত বিশ বছরের যাবতীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ফল ওর মুখস্থ ছিল। বলত—অভিজাত সমাজে চলাফেরা করতে হলে ওই জ্ঞান ওর কাজে লাগবে। তিনটি ফল কামনায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেত। প্রথম ফার্স্ট ক্লাস এবং ডক্টরেট পেয়ে পরবর্তী জীবনে অধ্যাপকের পদ পাওয়া, দ্বিতীয় নাইটহুড পাওয়া এবং তৃতীয় বড় ঘরে বিয়ে করা। তৃতীয় উচ্চাশা ফলবতী করার জন্যই টেনিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। মাঝে মাঝে দেখতাম কোনও না কোনও অভিজাত চেহারার মেয়ের সঙ্গে ও পায়চারি করছে। পরে প্রশ্ন করলে বলত, "নো গুড। উড নট স্ট্যান্ড এনি শেকিং।" এই মানদণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা কখনও বুঝে উঠতে পারিনি। জীবনসঙ্গিনীকে কেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করতে হবে—সে ব্যাপারটা সিরিল আমাদের বোঝাতে পারেনি। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ—এই ভেবেই সিরিলের বিস্ময়কর বাসনা মেনে নিয়েছিলাম।

সিরিল স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগত। একবার সাময়িকভাবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল। ওই অবস্থায় সে বারবারই বলছিল, "আই ওয়ান্ট টু ডাই উইদ এন আই।" পরে সুস্থ হলে ওকে প্রশ্ন করি—কী বলছিল ওর মনে আছে কি না। ও বলল—"অবশ্য।" জিজ্ঞেস করলাম—"এ কথার তাৎপর্য কী?" উত্তর, "আই লাইক টু বি প্রেসাইস। আই ডু নট ওয়ান্ট পিপল টু থিংক দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু ডাই উইদ এ ওয়াই।" সব ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। সিরিল মরতে চাইছিল—'ডাই উইদ অ্যান আই'। লোকে যাতে না ভাবে যে ও কাপড় রাঙাতে চাইছে—'ডাই উইদ এ ওয়াই'— সেই জন্য ওর সাবধানতা। এ রকম ভুল হওয়া তো খুবই সম্ভব।

সিরিল যথা সময়ে সংস্কৃতে ফার্স্ট ক্লাস পেল এবং তার পর দু বছর ভারতবর্ষে কাটাবার জন্য যাবতীয় খরচ-খরচা। একদিন ওর ঘরে ঢুকে দেখি ও একটা অয়েল হিটারের সামনে খালি গায়ে বসে আছে। তখন আগস্ট মাস। প্রচণ্ড গরম। জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী করছ?" উত্তর, "আই অ্যাম ট্রাইং টু অ্যাক্লিমেটাইজ মাইসেলফ টু দা ইন্ডিয়ান ওয়েদার।" ভারতযাত্রার প্রস্তুতি যাতে পূর্ণাঙ্গ হয় এ ব্যাপারে সাবধানী মানুষ সিরিল কোনও খুঁত রাখতে চায়নি।

অক্সফোর্ডে কয়েকশো বছর ধরে কিছু ভূত-পেত্নি বাস করছে। এ খবরটা বাইরের লোকের ভাল জানা নেই। এখনও অক্সফোর্ডে ট্যুরিস্টদের জন্য ভৌতিক ট্যুরের ব্যবস্থা

আছে। আস্ত ভূত দেখিয়ে দেবে—গাইডরা এমন প্রতিশ্রুতি দেয় না। তবে কোথায় কোথায় ভূতেরা বাস করে সে জায়গাগুলি দেখিয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে রাতে থেকে দেখতে পার। কতকটা সুন্দরবনে বাঘ দেখতে যাওয়ার মতো। অনেকবার গিয়েছি। বাঘ কখনও দেখিনি, তবে কিউরেটর আশ্বাস দিয়েছিলেন—বাঘ কিন্তু আপনাদের দেখছে। শুনে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

বেলিয়ল কলেজের অ্যানেক্স হলিওয়েল ম্যানর। সেখানে সিরিল এবং আমি দু'জনেই বাস করতাম। সিরিল একটু রাত করে পানাগার অর্থাৎ পাব থেকে ফিরত। এবং মাঝে মাঝেই নাকি শুনতে পেত পিছনে ক্ল্যাং ক্ল্যাং ধ্বনি। পশ্চিমি লোকবিশ্বাস—নরকস্থ আত্মাদের হাতে পায়ে শিকল বাঁধা থাকে। সেই শৃঙ্খলের ঝনঝনাৎ সিরিল শুনতে পেত। এ সৌভাগ্য আমার কখনও হয়নি। তার একটা কারণ বোধহয় বেশি বিয়ার আমার পেটে সহ্য হত না। তা ছাড়া যে-হতভাগাদের আগুনে ফেলে কাবাব বানানো হচ্ছে, তারা কী করে অক্সফোর্ডে এসে ক্ল্যাং ক্ল্যাং আওয়াজ তুলে লোকের ঘুমের ব্যাঘাত করবে—এ কথাও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। আরও কথা আছে। নরকবাস এবং নানাবিধ পৈশাচিক শাস্তি তো হবে শেষ বিচারের পরে। তার আগেই সব হাতে পায়ে শিকল বেঁধে ঘুরে বেড়াবে কোন আইনে? বিনা বিচারে শাস্তি দেবেন—ঈশ্বর কি গুয়ান্টানামোর ম্যানেজার? আর রোজকেয়ামতের আগে অবধি সবার তো কবরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবার কথা। কথা নেই বার্তা নেই যত্রতত্র চরে বেড়ালেই হল?

তবে শাস্ত্রে যাই বলুক—একবার পাশ ঘেঁষে ভূত বেরিয়ে গিয়েছিল মনে হয়। আমাদের পাশের ঘরে একটি ছেলে পিয়ানো বাজানো প্র্যাকটিশ করত। সেই বাজনা খুব জনপ্রিয় ছিল বললে মিথ্যাভাষণ হবে। গ্রীষ্মের এক বিকালে ও পিয়ানো বাজাচ্ছিল। হঠাৎ ধুম করে একটা আওয়াজ শোনা গেল। আমরা সবাই দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ছেলেটা হতভম্ব হয়ে বসে আছে। আর ওর নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। শুনলাম হঠাৎ কে যেন ওর নাকে প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে। কিন্তু বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না সে ব্যাপারটা এই যে, পিয়ানোটা দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো এবং ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘুষিটা দেওয়ালের দিক থেকেই এসেছিল। যা হোক, পিয়ানো বাজানো সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। হস্টেলবাসীদের সিদ্ধান্ত হল যে, ভৌতিক কিছু নয়, আবাসিকদের সম্মিলিত মনোবলই ঘুষিরূপে মেটিরিয়ালাইজ করেছিল। মানে ওই বাজনা আর সহ্য হচ্ছিল না।

'সত্যিকার ভূতের' কাহিনি শোনান হলিওয়েল ম্যানরের ওয়ার্ডেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাসেল মেগস। উনি হস্টেলবাসীদের পালা করে খেতে বলতেন। আমাদের যেদিন খেতে বলেন সেদিন ভদ্রতার নিয়ম ভেঙে আমি প্রশ্ন করি, এ কথা কি সত্যি যে ম্যানরে প্রেতাত্মা আছে এবং পণ্ডিতপ্রবর তা স্বচক্ষে দেখেছেন! এই প্রসঙ্গে আগেই বলি, ম্যানর এক সময়ে আটশো বছর আগে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের পরিচালিত অনুশোচনাগার বা পেনিটেন্সিয়ারি ছিল। অভিজাত ঘরের যেসব মেয়েদের পদস্খলন হত, মানে যাঁরা বেচাল কিছু করে ধরা পড়তেন, তাঁদের ওইখানে থেকে পরের নোংরা কাপড় ধুয়ে নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তাদেরই একজন সহ্যের সীমা ছাড়ানোয় বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই

মর্মন্তুদ ঘটনারই স্মৃতি বহন করছে এক প্রেতাত্মা। মানে জনপ্রবাদ তাই। মেগস একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, আমরা ঠিকই শুনেছি। শুধু উনি না। ওঁর পরিবারের অনেকেই দেখেছেন—সাদা কাপড়ে ঢাকা এক মূর্তি ম্যানরের সিঁড়ি থেকে নেমে মাঝের চক পার হয়ে আস্তে আস্তে কবরখানার দিকে চলে যায়। এই কাহিনি আমাদের শোনাবার পর উনি বলেন—এ বিষয়ে আর আলোচনা না হলেই উনি খুশি হবেন। প্রশ্নটা শুনে যে উনি খুব খুশি হননি সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

অক্সফোর্ডে গবেষণার অনেকটা সময় আমার কাটে হল্যান্ডে। কারণ আমি ঠিক করেছিলাম যে, প্রধানত ডাচ নথিপত্রে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসের মালমশলা যা আছে তা নিয়েই আমি কাজ করব। কাজটা ঠিক কী হবে তা হল্যান্ড গিয়ে কাগজপত্র কিছু ঘাঁটাঘাটি করার পর ঠিক করা যাবে। আমার গবেষণার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। এক—মোরল্যান্ডের পর মুঘল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে কাজ আর বেশি এগোয়নি। ওঁর শেষ প্রকাশন ১৯২৯ সনে। অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা গবেষণাপদ্ধতি তারপর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে যে প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল এই সূত্রে তারও কিছু উত্তর পাব ভরসা ছিল। আমার মূল প্রশ্ন যদি হয় বিদেশি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের জীবন ও সংস্কৃতি কীভাবে তার মোকাবিলা করেছিল, অপরিচিত কর্মধারার সংস্পর্শে আমাদের জীবনে অনন্যপূর্ব কোনও প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল কি না, তবে ইংরেজ শাসনের আগে দূরদেশের সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসার বিশ্লেষণ থেকে তার কিছু উত্তর পাওয়া সম্ভব। আর শিল্পবিপ্লবের আগে সতেরো শতকে বাণিজ্যবিপ্লব ঘটায় ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনেও রদবদল হয়েছিল। তাই ওই যুগের বাণিজ্যের ইতিহাস নানা দিক থেকেই মূল্যবান। এ ছাড়া ডাচ নথিপত্রর বিপুলতা বিষয়ে আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে ওই সূত্র থেকে ভারতীয় জীবনের যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যাবে তার মূল্যও হবে অসাধারণ।

১৯৫৪-র এপ্রিল মাসে হারউইচ থেকে জাহাজে চড়ে হল্যান্ডের অন্যতম প্রধান বন্দর হুক অফ হল্যান্ড রওনা হলাম। এর আগে একবার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছি, প্যারিস দেখার জন্য। সমুদ্র পার হওয়ার ওই অভিজ্ঞতা খুব সুখের হয়নি। ছোট ছোট জাহাজগুলিতে তখন স্ট্যাবিলাইজার থাকত না। ফলে সারা পথ বমি করতে করতে যেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য, শক্ত মাটিতে পা দিতেই শরীর সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। নর্থ সি পার হতে সারা দিন কেটে গেল। সারা পথ কিছু মুখে দেওয়ার অবস্থা ছিল না। কিন্তু আবার সেই একই অভিজ্ঞতা। মাটির ছেলে মাটিতে পা দিতেই সব কুছ ঠিক। প্রথম দর্শনেই হল্যান্ড আমার ভাল লেগেছিল : "এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে।" ভান এক্সেম ভাষা শেখানোর জন্য যে-বইটি ব্যবহার করতেন তাতে হল্যান্ডের কোনও বন্দরের একটি ছবি ছিল। ছবিটির প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল অসংখ্য সিগাল। এখানে পৌঁছে ঠিক সেই দৃশ্যই দেখলাম। ডাচরা নরম-সরম চুপচাপ মানুষ। কিন্তু তাদের সিগালদের চরিত্র ঠিক বিপরীত। এমন গোলমালপরায়ণ প্রাণী বোধহয় দুনিয়ায় আর নেই। দু-মিনিটেই কান এবং তৎসহ প্রাণ ঝালাপালা করে দিল। হুক ভান হল্যান্ড আসলে রটেরডামের বন্দর। ওখান থেকে ট্রেনে ডেন হাগ যেতে আধ

ঘণ্টাখানেক লাগল। হল্যান্ড ছোট জায়গা। ওর বিখ্যাত শহরগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি। ট্রামেও যাতায়াত করা যায়। দা হেগ বা ডেন হাগ নেদারল্যান্ডসের রাজধানী। কিন্তু নিতান্তই ছোট শহর। লোকে বলে ইউরোপের সবচেয়ে বড় গ্রাম। সত্যিতে দেশটির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে অ্যামস্টারডাম। ডেন হাগে শুধু সরকারি দফতর আর দূতাবাসগুলির অবস্থান। ফলে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে এ শহরে কোনও ভিড়ভাড় ছিল না। ছবির মতো সাজানো শহর। খালের পাড় ধরে ঝকঝকে পরিষ্কার সব রাস্তা। আর তার পাশ ধরে বাড়িগুলি বেশির ভাগই সতেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি। সাম্প্রতিক কালে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেই পুরনো ডেন হাগ হারিয়ে গেছে। আমার এই অতি প্রিয় শহরটিতে প্রতি বছরই দু-তিনবার যেতাম। এখন আর উৎসাহ পাই না।

যেসব ইউরোপীয় দেশের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য ছিল, নেদারল্যান্ডস তাদের অন্যতম। দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্রান্সের মতো এই দেশটিও যুদ্ধের পর জাপানিদের কেড়ে নেওয়া এশিয়ায় তাদের সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে অনেক লোকক্ষয়ের কারণ হয়। এবং এই প্রচেষ্টায় স্বাধীনতাপ্রেমিক ব্রিটেন তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করেছিল। ওলন্দাজরা তাদের এশিয়ার সাম্রাজ্য ফিরে পায়নি। কিন্তু কয়েক শো বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজত্ব করার ফলে বেশ কিছু ডাচ পণ্ডিত ব্যক্তি ওই অঞ্চলের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। আধুনিকতা-পরবর্তী, মানে পোস্ট-মডার্নিস্ট তাত্ত্বিকরা এই জাতীয় বিদ্যাকে পাওয়ার-নলেজ নাম দিয়েছেন। মানে যে-জ্ঞান ক্ষমতা অর্জন বা দৃঢ়ীকরণের জন্য অর্জিত। এই অভিধা যুক্তিযুক্ত হোক বা না হোক, মোদ্দা কথা যুদ্ধোত্তর হল্যান্ডে বেশ কিছু লোক ছিলেন, এশিয়া সম্বন্ধে মূল্যবান অভিজ্ঞতা যাঁদের আয়ত্তাধীন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে এঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কাজে লাগানোর জন্য ডাচ সরকার ইউনেসকোর কাছে এক প্রস্তাব দেন। তার ফল ডেন হাগে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ। এখানে মুখ্যত এশিয়ার ছেলেমেয়েরা ডাচ পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে আসবেন—এই উদ্দেশ্যে ইউনেসকো মোটা টাকা মঞ্জুর করেন। আর হল্যান্ডের রানি জুলিয়ানা হেগ শহরে তাঁর বাসভবনটি এই শুভকাজের জন্য দান করেন। পরে অবশ্য তাঁর কন্যা বিয়াট্রিক্স রানি হয়ে প্রাসাদটি ফিরিয়ে নেন। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কীসব হয় বলে বাঙালিদের যে লোকবিশ্বাস আছে, সে খবরটা হল্যান্ড অবধি পৌঁছয়নি। ওই রাজপ্রাসাদে কিঞ্চিৎ নজরানা দিয়ে অন্য দেশের ছাত্রদেরও থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি সেই সুবাদেই ওখানে একটি থাকার ঘর পেয়েছিলাম।

সে অতি সুব্যবস্থা। রাজপ্রাসাদ বলে কথা। আধুনিকতায় অক্সফোর্ডের তুলনায় অনেক এগিয়ে। ইউরোপে বাস করছি অথচ ঘরের মধ্যে শীত করছে না। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। খাওয়াদাওয়া নিয়ে ভারতীয় আবাসিকরা কিঞ্চিৎ ঘ্যানঘ্যান করলেও এখানকার ভোজনব্যবস্থা বেলিয়লের তুলনায় স্বর্গীয়। দু সপ্তাহেই গায়ে রীতিমতো গত্তি লাগল। বলতে নেই—গায়ে গত্তি লাগার ব্যাপারে ওলন্দাজরা ইউরোপে অগ্রগণ্য। প্রচুর পরিমাণে চিজ আর বিয়ার খাওয়ার ফলে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষই দিব্যি গোলগাল, মোটাসোটা। লন্ডনে একটি মেয়েদের পোশাক-আশাকের দোকান আছে, নাম 'ইয়াং আউটসাইজেস'। খোঁজ

নিয়ে জেনেছিলাম—দোকানটির বেশির ভাগ বিক্রি হল্যান্ডে। হেগ-এ বাস করার অন্যতম সুফল হল ইন্দোনেশীয় খানা আবিষ্কার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রন্ধনশৈলীদের মধ্যে না পড়লেও রীতিমতো সুস্বাদু। আর ডাচরা তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা প্রকাশ করে ওই খানা থেকে রাইসটাফেল সৃষ্টি করেছে—দশ-বারো থেকে চল্লিশ পদের ভোজ। আমরা সাধারণত তিন-চারজন একত্র হয়ে একটি বহু পদের রাইসটাফেল অর্ডার দিতাম। বিশ্বাস করুন—মাত্র একজন ওলন্দাজ ব্যক্তিকে একা বসে পুরো একটি চল্লিশ পদের রাইসটাফেল খেতে দেখেছি। গভীর মনোযোগ দিয়ে, দিব্বি রসিয়ে রসিয়ে।

ভূতপূর্ব রাজপ্রাসাদে বাস করার সময় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের মধ্যে দুটি চরিত্র বিশেষ স্মরণীয়। একজন কেরলের লোক, এবং পরে কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। ডাচরা ক্রিসমাসে তত হইচই করে না, যত করে নভেম্বর মাসে সান্টাক্লস দিবসে। আমাদের এই বন্ধুটি ডাচ প্রথানুযায়ী সান্টাক্লসের সহগামী জোয়ার্তো পিট (কৃষ্ণবর্ণ পিটার)-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কৃষ্ণকায় পিটের সঙ্গে বিরাট থলে। সারা বছর শিশুরা ভালমন্দ কী করেছে শুনে সন্ত হুকুম দিতেন—এ অতি উত্তম বালক বা বালিকা। একে পুরস্কার দাও। পিট নর্তনকুর্দন সহযোগে থলে থেকে উপহার বের করে সুকর্মের পুরস্কার দিত। আর বছরটা যদি সদাচারে না কেটে থাকে তো নাবালকের ভাগ্যে মহতী প্রণষ্টি। কালো পিটার তাকে ঝোলার মধ্যে ভরার উপক্রম করত। আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হত। এই মানুষটি প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে একদিন প্রেমে পড়ল। ওঁর স্বভাবটা ছিল কতকটা মধ্যযুগের নাইটদের মতো। প্রেমে পড়ে চুপচাপ থাকবেন সে বান্দা তিনি নন। সর্বত্র ঘোষণা করে বেড়াতে লাগলেন—"আই অ্যাম ইন লাও।" এই 'লাও' যথাকালে ফলবতী হয়েছিল। ভদ্রলোক ওলন্দাজ পত্নী নিয়ে দেশে ফেরেন।

সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন হৃষীকেশ ব্যানার্জি। কতকটা যাকে নৈতিক মৌলবাদ বা মরাল ফান্ডামেন্টালিজম বলা চলে উনি তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। সব ব্যাপারেরই, হয় নৈতিক নয় যুক্তিভিত্তিক, যাথার্থ্য প্রমাণ না হলে ওঁর সক্রিয় সম্মতি পাওয়া কঠিন হত। বিখ্যাত ওলন্দাজ অর্থনীতিবিদ নোবেলবিজয়ী অধ্যাপক টিনবার্খেনের ছাত্র এই ভদ্রলোক হঠাৎ প্রায় খেপে গেলেন। মানে, কাজ যতটা এগোনো দরকার তা এগোচ্ছিল না দেখে উনি প্রায় আহারনিদ্রা ত্যাগ করে প্রাসাদের হলঘরে এসে আশ্রয় নিলেন। সেখানে সিগারেট মুখে দিনে গড়পড়তা ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা গ্রামোফোনে রামধুন বাজাতে লাগলেন। কেউ মৃদু আপত্তি জানালে বলতেন—আমাকে দেখাও কোথায় লেখা আছে হলঘরে রামধুন বাজানো নিষিদ্ধ। কথাটা কোথাও লেখা ছিল না। ফলে রঘুপতি রাজারামের প্রশস্তিতে ডেন হাগের আকাশবাতাস ধ্বনিত হতে লাগল। বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু রামভক্ত ধর্মান্তরণের বিষয় খোঁজখবর নিতে লাগলেন। টিনবার্খেন সাহেব সেন্টারের রেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে এক মনস্তাত্ত্বিককে পাঠালেন। লোকটি ঘণ্টা দুয়েক ব্যানার্জির সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে অবনত মুখে বাড়ি ফিরে গেলেন। ওঁদের কী কথাবার্তা হয়েছিল তা ব্যানার্জির কাছেই শুনলাম। ব্যানার্জি অত্যন্ত ভদ্রভাবেই মনস্তাত্ত্বিককে বুঝিয়ে বলেন যে, সে নিশ্চয়ই

স্বীকার করবে যে পশ্চিমে মনস্তত্ত্ব ঠিক বিজ্ঞানের স্তরে পৌঁছয়নি। আর বিষয়টা কখনও ঠিক বিজ্ঞান হতে পারে কি না সে বিষয়ে কি কিছুটা সন্দেহের অবকাশ নেই? আর একটু দ্বিধার সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষের অন্তর্জগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা তুলনায় কিছুটা বেশি এগিয়েছে। ভদ্রলোক যদি চান তা হলে ব্যানার্জি ওকে ইংরেজিতে পাওয়া যায় এরকম তন্ত্রবিষয়ক কিছু বইয়ের সন্ধান দিতে পারে। তবে ঠিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে হলে সংস্কৃত শেখা ছাড়া পথ নেই। টিনবার্খেন ব্যানার্জির গুরু। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে নেই। না হলে ব্যানার্জি ভদ্রলোকের অকারণে সময় নষ্ট করতেন না। এরপর পশ্চিমি মনস্তাত্ত্বিকের আর কিছু বলার বা করার ছিল না। তিনি গুটিগুটি পশ্চাদপসরণ করলেন। আমার ধারণা উনি ডেন হাগে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে তারাপীঠে অঘোরীবাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মরিয়া হয়ে সেন্টারের কর্তৃপক্ষ শেষাশেষি আমাকে ধরলেন, "তুমিই না হয় করো না ভাই চেষ্টা।" বাবা, ওকে একটু বোঝাও, অন্যত্র খুব ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দেব। ভয়ে ভয়ে কথাটা তুললাম। প্রতিপ্রশ্ন, "কেন যাব?" "লোকে যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।" "তাতে আমার কী?" "মানে কোড অফ কনডাক্ট বলে একটা জিনিস আছে।" "ডিফাইন কোড, ডিফাইন কনডাক্ট!" আমি সম্পূর্ণ পরাজিত। বয়স থাকতে অ্যারিস্টটল ভাল করে পড়া হয়নি। এখন এই কূট প্রশ্নের জবাব দিই, আমার সাধ্য কী? ব্যানার্জির মুখে এর পরবর্তী প্রস্তাব শুনে সসম্মানে পশ্চাদপসরণই বুদ্ধির কাজ মনে হল। তিনি বললেন, "আপনাকে যদি জানালা দিয়ে ফেলে দিই, তবে?" তাহলে আর কিছুই বলার উপায় থাকবে না, অতএব—

কয়েক বছর পরে কলকাতার রাস্তায় ব্যানার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ। খুব উৎসাহের সঙ্গে নেমন্তন্ন করে বাড়ির ঠিকানা দিলেন। বললাম, "একটু পথ বাতলাবেন?" উত্তর, "কোনও অসুবিধে হবে না। যে-বাড়িটার সামনে একটা ষাঁড় বসে আছে দেখবেন, সেইটে।" "ষাঁড়টা আপনাদের?" "না।" "ওখানে ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা থাকে?" "না, কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না। রোজই আসে।" যথা সময়ে ব্যানার্জির বাড়ির রাস্তায় ঢুকলাম। সেখানে কোনও ষাঁড় নেই। কিন্তু ব্যানার্জি পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। স্মিতমুখে ব্যানার্জি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, "ষাঁড়টা আজ আসেনি।" কিন্তু ব্যানার্জি এসেছেন। অতএব আমার কোনও অসুবিধে হল না।

ডেন হাগের অফিসপাড়ায় জগদ্বিখ্যাত অভিলেখাগার আলখমেইন রেইকসআরখিফ। ডাচ ভাষার শব্দসমষ্টি অন্য কোনও ভাষার বর্ণমালায় পাঠান্তরিত করা যায় না। যত দূর সম্ভব চেষ্টা করলাম। ডাচরা নিজেরাই বলেন—ওদের ভাষাটা আসলে একটা কণ্ঠপীড়া। খুব খারাপ রকমের সর্দি-কাশি হলে মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণ করা যায়। ওই যে সবাই বলে ভ্যান গঘ, ওটা আসলে হবে ভান খখ্। না, অত সোজা না, খুব ভাল করে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন, কাছাকাছি পৌঁছতে পারবেন—মানে, হয়তো পারবেন। ঠিক কিছুতেই হবে না। যাক সে কথা। ওলন্দাজদের ওই কেন্দ্রীয় অভিলেখাগারে পৌঁছে মুন্ডু ঘুরে গেল। এশিয়া-সংক্রান্ত

নথিপত্রের রক্ষক ডাকসাঁইটে পণ্ডিত শ্রীমতী মেইলিংক-রুলফসন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝলাম, সতেরো-আঠারো শতকে ওলন্দাজ কোম্পানির ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কাগজপত্রের পরিমাণ বহু লক্ষ পৃষ্ঠা। তার কোনও ছাপানো বা টাইপ করা তালিকা নেই। বছর প্রতি একটি বা দুটি ভল্যুম। প্রতিটি ভল্যুমের সঙ্গে হাতে লেখা তালিকা আছে। তার থেকে খুঁজে বের করতে হবে তোমার জ্ঞাতব্য কোথায় আছে। তবে নথিপত্রগুলি পড়ে দেখলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এ আর এমনকী কথা! কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠা। পড়ে শেষ করতে একশো-দেড়শো বছরের বেশি লাগা উচিত না। মানে, অভিলেখাগার দিনে আট ঘণ্টা খোলা থাকে। আর মাইক্রোফিল্ম করারও ব্যবস্থা আছে। সস্তা একটা রিডার কিনে নিলে বাড়িতে আরও ঘণ্টা দশেক পড়া যায়। মানে একটু চেপে কাজ করলে শতখানেক বছরে হয়ে যাওয়া উচিত। মনে হল এই ধরনের চিন্তা রাইসটাফেলভোজী সংস্কৃতিতেই সম্ভব। না, শ্রীমতী রুলফসন আমাকে একশো বছর নথিপত্র ঘাঁটার পরামর্শ দেননি ঠিকই। কিন্তু তার চেয়ে খুব যে কিছু কম কাজের কথা বলেছিলেন, তাও নয়।

পরিমাণ ছাড়া আরও দু-একটা অসুবিধে আছে দেখলাম। প্রথম অসুবিধে—যে ভাষায় নথিপত্রগুলি লেখা, সেই সতেরো শতকের সওদাগরি ডাচ ভাষা আমি শিখিনি। ও ভাষা যাদের জানা আছে সেই অল্পসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির এমন সময় নেই যে আমাকে বসে ভাষাশিক্ষা দেবেন। আর সেই হস্তলিপি? অক্সফোর্ডে এসে সতেরো শতকের ইংরেজি হস্তলিপি পড়তে শিখেছি ঠিকই। কিন্তু সেই লেখা আর এই লেখা এক না। তিন বছরের মধ্যে থিসিস শেষ করতে হবে। তার ছ' মাস চলে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। "দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার কর নাইয়া।"

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে ক্ষীণ রবিরশ্মি দেখতে পেলাম। শ্রীমতী রুলফসনের সহকর্মী হের ইয়াপিকস। তাঁর পত্নী বিনা পয়সায় পুরনো হস্তলিপি শেখাতে রাজি হলেন। মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়িতে কলাটা-মুলোটা নিয়ে যেতাম। কিন্তু এই মহানুভব দম্পতির কাছে পেয়েছি অনেক, তার বদলে ওঁদের দিয়েছি অতি সামান্যই। রোজ মিসেস ইয়াপিকসের সাহায্যে কয়েক পৃষ্ঠা পুরনো দলিল নকল করতাম। আর শ্রীমতী রুলফসন একটি বই হাতে ধরিয়ে দিলেন। সতেরো শতকের শেষ ভাগে লেখা পিটার ভান দামের ডাচ কোম্পানির ইতিহাস। তার ভাষা আর আমার পাঠ্য দলিলগুলির ভাষা এক। আর একজন শিক্ষকও ঠিক করে দেওয়া হল। তিনি ইস্কুলে ইংরেজি পড়ান। ভান ভেইলোর ইংরেজি জ্ঞানে কোনও খুঁত নেই। ওঁর সঙ্গে বসে ভান দামের বই নিয়ে রোজ কুস্তি হত। গলিয়াথের সঙ্গে বালক ডেভিডের লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত দানবের পরাজয় ঘটল। হঠাৎ একদিন দেখি দলিলগুলি পড়ে বুঝতে পারছি। সে কী প্রচণ্ড উল্লাস! পাশের রাস্তায় কাফেতে গিয়ে বোতল দুই হিমশীতল আমস্টেল বিয়ার খেলাম। আহা! যেন অমৃত!

মাস খানেক অহোরাত্র দলিল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থিসিসের বিষয়ও ঠিক করে ফেললাম—করমণ্ডল উপকূলে ডাচ কোম্পানির ব্যবসার সূত্র ধরে ভারতীয় বাণিজ্য এবং অর্থনীতির ইতিহাস। প্রতি পনেরো দিনে কোম্পানির ছোট ছোট কুঠির কর্তারা বড়কুঠির বড়কর্তাকে রিপোর্ট পাঠাত—ব্যবসা এবং স্থানীয় রাজনীতি বিষয়ক সব খবর দিয়ে। অতি

পুঙ্খানুপুঙ্খ সেই বর্ণনা। আমি সেই তথ্যসমুদ্রের কণামাত্র ব্যবহার করেছি। আমার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী গবেষকরা আরও কিছু কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল তথ্যভাণ্ডারের অধিকাংশই এখনও অব্যবহৃত। আশা করি ভবিষ্যৎ গবেষকরা এই কাজটা ছেড়ে দেবেন না। গবেষণার যে এক রোমাঞ্চকর দিক আছে, ডাচ কোম্পানির কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হই। তিনশো, চারশো বছর আগেকার নিতান্ত বিষয়ঘটিত চিঠি আর রিপোর্টগুলিতে যেন বহুদিন আগেকার জীবিত মানুষের প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেতাম। এক বছরের কাগজপত্র পাওয়া যায়নি, কারণ জাহাজডুবি হয়ে সেগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। পরে সেই ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে চিঠিগুলি উদ্ধার হয়। সেই কাগজে সমুদ্রের জলের দাগ ছিল। কত অপ্রত্যাশিত খবর এইসব চিঠিপত্রে হঠাৎ চোখ পড়ত। রোসাঙ্গের কুঠিয়ালের কয়েকটি চিঠি থেকে শাহ সুজার পরিবারের ভয়াবহ মৃত্যুর সংবাদ জেনেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'দালিয়া'র সুমিষ্ট কাহিনি নিদারুণ সত্যের নিষ্ঠুর চাপে কোথায় তলিয়ে গেল। একবার পড়াটা সহজ হয়ে যাবার পর ওই দলিলপত্র ঘাঁটা একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

অভিলেখাগারে ন'টা-পাঁচটা কাজ করা একটা সানন্দ দিনপঞ্জীর কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। সকাল সাড়ে আটটায় পায়ে হেঁটেই রওনা হতাম। যেখানে থাকতাম সেখান থেকে আফিসপাড়া খুবই কাছে। মানুষের খোঁড়া এক প্রাচীন দিঘি—নাম ভেইভেরবার্গ (কী করা যাবে, বলুন), —তার পাশ দিয়ে দু'পাশে গাছের সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ রিডেরজাল, ওরফে হল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভবন—ইউরোপে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তীর্থভূমি। ষোড়শ শতকে স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এইখানে স্বাধীন নেদারল্যান্ডস রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়। পার্লামেন্টের চৌহদ্দি পার হয়ে শহরের প্রধান চক, প্লাৎস—ভারী সুন্দর। অফিসপাড়া এত সুন্দর হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। চকের চারপাশ ঘিরে সব সরকারি দফতর—সতেরো থেকে উনিশ শতকের মধ্যে তৈরি সব প্রাচীন সৌধ। আর একটু বিসদৃশভাবেই তার মাঝে মাঝেই নাইট ক্লাব, রেস্টোরেন্ট, কাফে এবং একটি অতি সুন্দর অভিজাত ভবন, মাউরিটসহাউস (ইংরেজিতে মরিস হাউস)। কাফেগুলিতে নগরবধূরা দিনের বেলায়ই খদ্দেরের সন্ধান করে, নিতান্তই গদ্য ছন্দে, যেন টুরিস্টদের কাছে পোস্টকার্ড বিক্রি করছে। এর মধ্যে ঢাকা-চাপা কিছু নেই। মিল্ক শেক খেতে খেতে শিশু বাপকে প্রশ্ন করে "ওরা কারা?" নিরুত্তাপ স্বরে অন্য দিকে তাকিয়ে পিতা উত্তর দেন "হুরচ্যা।" হুর মানে গণিকা। চ্যা-টা প্রত্যয়, অর্থ ছোট। অনেক সময়ই আদরের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন ওলিফ্যানচা—অর্থাৎ ছোট হাতি। হাতি আর কত ছোট হতে পারে? তেমনই জাতীয় সৌন্দর্যের আদর্শ অনুসরণ করে হুরচ্যারাও অনেক সময়ই রীতিমতো দশাসই! এই ক্ষেত্রে 'চ্যা'টা স্নেহ এবং কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতির দ্যোতক। বোধহয় ওলিফ্যানচ্যার খাঁটি বাংলা অনুবাদ হবে হাতি-সোনা। সহনশীল এবং স্নেহপ্রবণ ডাচদের কাছে সবাই চ্যা। আমিও শিগগিরই তপনচ্যা হয়ে গেলাম, যদিও যে রেটে চিজ-রুটি-বিয়ার খেয়ে দেহের আয়তন বাড়ছিল তাতে আক্ষরিক অর্থে ওই ক্ষুদ্র প্রত্যয়টি আর আমার প্রতি প্রযোজ্য ছিল না। ইংল্যান্ডের সঙ্গে হল্যান্ডের সামাজিক এবং আবেগঘটিত ব্যাপারে তফাত বোঝাতে একটি কথা বলাই যথেষ্ট : প্রথমোক্ত দেশে আমাকে

কেউ লিটল তপন বা তার সমতুল্য কোনও শব্দে বর্ণনা করবেন এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তবে বিপণি বালিকারা স্ত্রী-পুরুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে ডার্লিং সম্বোধন করে বটে। কিন্তু সেই সম্বোধনকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

আর্কাইভস যাওয়ার পথে মাউরিটসহাউস। ডাচ চিত্রশালাগুলির মধ্যে এটি একটি ক্ষুদ্র রত্নভাণ্ডার। পঞ্চাশের দশকে ওখানে ঢুকতে পয়সা লাগত না। ফলে প্রায় রোজই কিছুটা সময় ওখানে কাটিয়েছি। মাউরিটসহাউসের জানালা দিয়ে ভেইভেরবার্গ দেখা যেত। সেখানে নানা জলচর পাখির ভিড়। আর চিত্রশালার ভিতরে জগদ্বিখ্যাত সব ডাচ ছবি। সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের জায়গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবির তালিকায়। এইখানেই রেমব্র্যান্ড্টের আঁকা নিজের সব প্রতিকৃতি, ওঁর বিখ্যাত অ্যানাটমি লেসন, ভেরমিয়ারের মুক্তার দুল পড়া বালিকা এবং তাঁর অতুলনীয় ডেলফ্‌টের দৃশ্য। শেষে উল্লিখিত ছবিটি থেকে যে লোকোত্তীর্ণ আনন্দ পেয়েছি তার তুলনীয় অন্য কোনও অভিজ্ঞতার কথা আমি ভাবতে পারি না। ওই ছবি দেখার পর সুযোগ পেলেই ডেলফ্‌ট চলে যেতাম। খালপাড়ের এই শহরটির একটা নিদ্রালু ছায়াময় রূপ আছে। আধুনিকতা তাকে নষ্ট করতে পারেনি। শহুরে জীবনে এত নিরিবিলি শান্তির সন্ধান বোধহয় আর কোনও সংস্কৃতি আবিষ্কার করতে পারেনি। সতেরো শতকের বিখ্যাত ডাচ চিত্রশিল্পে সেই সচ্ছল নগরজীবনেরই সানন্দ প্রকাশ। বাড়ির চত্বরে গৃহকর্তা একটি লম্বাটে গেলাস থেকে বিয়ার খাচ্ছেন। রান্নাঘরে টেবিলে কিছু রুটি আর চিজ, খালের পাড় ধরে শহরের বাড়িগুলি বিকেলের সূর্যালোকে কোথাও আলোকিত কোথাও ছায়াময়, ঘরের ভিতরে, মানুষের অবয়বেও সেই আলোছায়ার খেলা। সব মিলিয়ে জীবনের তুচ্ছ দৈনন্দিনতার মধ্যে গভীর তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া। খজেলিখ, লেকের, হেরলেঈখ—তৃপ্তিব্যঞ্জক এই শব্দগুলি দিনের মধ্যে কতবার শুনেছি যে মনে হত এদের জীবনে অতৃপ্তির কোনও স্থান নেই। ডাচ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অনেকের জীবনই খুব নিরুপদ্রব বা নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না। কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্মে জীবনযন্ত্রণার ছাপ প্রায় নেই।

আনন্দ বা এক্সট্যাসির সঙ্গে ডাচ সংস্কৃতির পরিচয় আছে কিনা বলতে পারব না। কিন্তু অতি সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলি থেকে গভীর তৃপ্তি বা সুখ আস্বাদনের ক্ষমতা ওদের অসাধারণ। দুপুরে খালের পাড়ে বসে একটা চিজের স্যান্ডউইচ বা মেশিন থেকে এক কোয়ার্চ্যা বা গিলডারের চতুর্থাংশ (আমাদের তখনকার হিসাবে ছ' আনার সমান) দিয়ে একটা লুম্পিয়া অর্থাৎ ইন্দোনেশীয় স্প্রিং রোল কিংবা মাংসের ক্রকেট কিনে খেতে খেতে, যে খাচ্ছে তার সে কী আনন্দ। "লেকের, হ্যা?" দারুণ খেতে, কী বলো। সহকর্মী তার লুম্পিয়ায় কামড় বসিয়ে সানন্দ প্রত্যুত্তর জোগালেন, "ইয়া, হোর, এখত লেকের!" হাঁ ঠিকই বলেছ, সত্যিই দারুণ। শীতের সন্ধ্যায় শরীর গরম করার ভরসায় দু-তিন বন্ধু মিলে সাত-আট মাইল সাইকেল চালিয়ে এসে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে এক কাপ কফিতে চুমুক দিয়ে তৃপ্ত কণ্ঠে উক্তি, "খজেলিখ, হোয়ে?" উত্তর, "ইয়া, এখত খজেলিখ!" হ্যাঁ, সত্যি বড় আরাম। এই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে বাচ্চারা খাওয়া নিয়ে কোনও নকশা করে না। দিনের পর দিন প্রাতরাশ আর দ্বিপ্রাহরিক আহার্য ওই সেই এডাম বা খাউদা চিজের

স্যান্ডউইচ। কিন্তু তা নিয়ে বাচ্চাদের কী উদ্দাম ফূর্তি। "লেকের বটেরহাম, লেকের বটেরহাম!" লেকের মানে অতি সুস্বাদু, বটেরহাম স্যান্ডউইচ, যদিচ জিনিসটায় বাটার বা হ্যাম দুটোর কোনওটাই থাকে না। আর খজেলিখ? দেহমনের এই সুখের অনুভূতিবোধক শব্দটির কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তবে অনুভূতি দিয়ে যদি অনুভূতির অনুবাদ সম্ভব হয় তো বলি—শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে বসে যে আরাম, গ্রীষ্মের দুপুরে শীতলপাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অথবা শৈশবে হিমশীতল বিছানায় লেপের নীচে ঢুকে যে প্রাথমিক উল্লাস তার পরিবেশ বর্ণনার সুষ্ঠুতম বিশ্লেষণ খজেলিখ। তবে অনুভূতিটা বিশিষ্টভাবে ডাচ আর শব্দটার উচ্চারণ তো বটেই। দুটোর একটারও ঠিক বঙ্গীকরণ সম্ভব নয়।

আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতিতে ডাচদের জায়গা প্রথম সারিতে নয়। ওদের বুদ্ধি বা বোধির জগৎ জীবনযন্ত্রণায় তিক্তবিচ্ছিন্ন নয়। ওদের জীবনের মূল সুর শান্তরসে বাঁধা। ফরাসি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ওদের নেই। ওদের জীবনচর্যায় চমক লাগার মতো কিছু নেই। কিন্তু শান্ত সুস্থ বুদ্ধির চর্চায় ওরা ইউরোপ তথা পৃথিবীর জীবন সমৃদ্ধ করেছিল। ইরাসমাস মানবিকতাবাদের জনক, হিউগো গ্রোটিয়াস আন্তর্জাতিক আইনের, স্পিনোজা যুক্তিভিত্তিক দর্শনের। আর ডাচ চিত্রকলায় ওদের জীবনানুভূতির অনবদ্য প্রকাশ সর্ব মানবের হৃদয় হরণ করেছে। ঘরের ভিতর এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে—তার রূপের শেষ নেই। এক টুকরো রুটি আর চিজের স্বাদ—সে বড় তৃপ্তিদায়ক। এক গ্লাস হিমশীতল লাগার যখন গলা দিয়ে নামে, তখন কি আর জগতের কোনও দুঃখ-কষ্টের কথা মনে থাকে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ অতীন্দ্রিয় আনন্দের সংবাদ বয়ে আনে। অসংখ্য অবিরত ছোট ছোট সুখের প্রবাহ এই জীবন—বড় তৃপ্তিকর, বড় খজেলিখ। বেঁচে থাকা বড় সুখের, বড় সৌভাগ্যের আকর। বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। সমস্ত স্নায়ুপথে এই সৌভাগ্য সানন্দে স্বীকার করার শিক্ষা হল্যান্ডে থেকে পেয়েছিলাম।

ডাচ জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম একটি বিশেষ কারণে। আমি দীর্ঘদিন একটি ডাচ পরিবারে অতিথি হয়েছিলাম। আমি যখন ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিজের বাসিন্দা তখন একদিন পরিচিত একজন বললেন, "অকারণে এত খরচা করছ কেন? এখানে এর প্রায় অর্ধেক খরচায় থাকা যায়।" কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। ছাত্রাবাসে পরিণত রাজপ্রাসাদে মাসিক থাকা-খাওয়ার খরচা, পঁচিশ পাউন্ড। এই খরচায় কোথাও থাকা ইংল্যান্ডে কল্পনা করা যায় না। আরও সস্তা কীভাবে সম্ভব? কিন্তু অসম্ভব সত্যিতেই সম্ভব হল। মাসিক দেড়শো গিলডার বা পনেরো পাউন্ডে এক ভদ্র ভবনে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর হাতখরচা মাসিক পাঁচ পাউন্ডের মতো। এতে যে হালে থাকতাম তা ঠিক রাজার না হলেও উজির নাজিরের তো বটেই। ফলে হাতে এত পয়সা জমে গেল যে স্কলারশিপ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রায় ছ' মাস নিজের খরচায় ইউরোপে থাকা সম্ভব হয় এবং বহু দেশ ঘুরে দেশে ফিরতে পারি।

যে-বাড়িতে ছিলাম সে বাড়ির কর্তা হেগ শহরের বিখ্যাত আর্কিটেক্ট। কিন্তু ডাচরা কৃপণ না হলেও হিসেবি। তিন ছেলের বাবা হেরম্যান লেলি দুই ছেলে সাগ্নিক হওয়ায় তাদের ঘর দুটি অদানে অব্রাহ্মণে ফেলে রাখতে রাজি নন। তাই পেয়িং গেস্ট নেওয়া। ওদের

পারিবারিক ইতিহাস খুব সুখের নয়। মিস্টার লেলির বাবা ছিলেন ইহুদি। কিন্তু যুদ্ধের সময় নাৎসিদের আর্কিটেক্ট প্রয়োজন। তাই ওঁকে বলা হয় জার্মান রাইখের সেবায় লাগতে অথবা আর পাঁচজন ইহুদির মতো সপরিবারে গ্যাস চেম্বারে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে। বীরত্ব সকলের আসে না। ফলে লেলি সাহেব নাৎসিদের হয়ে কাজ করেন। এর জন্য যুদ্ধের পরে ওঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ওঁরা প্রায় একঘরে হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য ওইখানেই শেষ হয়নি। বড় ছেলে হেরম্যানের বয়স তখন ষোলো। চারিদিকে সবাই লড়ছে? সে শুধু ঘরে বসে থাকবে? নাৎসি তরুণদের পাল্লায় পড়ে শেষে ও জার্মান ফৌজে যোগ দিল। তবে লড়াই করার সুযোগ সে খুব পায়নি। তার প্রথম দিনের লড়াইয়ের প্রথম ঘণ্টায়ই কামানের গোলায় তার ডান পা উড়ে যায়।

লেলি পরিবারে মেজ ছেলে ইডো আমার সমবয়সি এবং কালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। সেও আর্কিটেকচারের ছাত্র, তবে ডিগ্রি পেতে ওর বহুদিন লেগেছিল। তার কারণ গতানুগতিক স্থাপত্যে ওর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেসব খামখেয়ালি কাজ করা যায়, ছাত্র অবস্থায় তা করতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবেই। ইডোর আর একটি পেশা বা শখ ছিল। সে মাটির আর কাঠের মূর্তি বানাত। মানুষেরই সব প্রতিকৃতি। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের মুখভাবে। পৃথিবীর সব কিছুর প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা বা বিস্ময়বোধ ফুটিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ইডোর। বড় ছেলে হেরম্যান, তার স্ত্রী ইডা, ছোট ছেলে ইয়ান, তার বাগদত্তা এলি—এরাও প্রায়ই রাত্রের খাওয়ায় যোগ দিত। আর এরা এলে খাওয়ার পর রোজই একটি ছোটখাটো উৎসব হত। তার নাম ছিল আফওয়াস-সাঙ্গেন বা বাসন ধোওয়ার গান। বাসন ধোওয়া এবং মোছার সঙ্গে সঙ্গে এইসব অনবদ্য সঙ্গীত নৃত্যসহ পরিবেশিত হত। কয়েকটি গান বেশ মনে আছে। যথা—

উই হেইফত্ সাইকর ইন দা এরতে সুফ খদান
দ হেইলঅ কম্পানি হেইফত এত এতেন লাতেন স্তান।

সঙ্গীতটি করুণরসের। মানে মটরশুঁটির সুপে কে চিনি ঢেলেছে? ফৌজি দলের কেউই আর ওটা মুখে তোলেনি। আর একটি গান আরও ভয়াবহ।

দার খাত ইয়নচ্যা নার দ ব্লিকসাম তু
নার সেইন আল-অ লাতস্ত-অ রান্দে ভু

অনুবাদ : ওই যায় ইয়ানচ্যা রসাতলে (আক্ষরিক অনুবাদ : ইয়ানচ্যা চলেছে যেথায় বজ্রপাত হবে) এই তার অন্তিম সাক্ষাৎকার বা রাঁদেভু।

ওলন্দাজ সাহিত্য যেটুকু নাড়াচাড়া করেছি খুব রস কিছু পাইনি। ওদের এক মিলটন আছেন, নাম ভন্দেল। চেষ্টা করেছিলাম। এগুতে পারিনি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু এক ব্যাপারে পাঠকের চিত্ত জয় করার ক্ষমতা ওদের আছে। ওদের উদ্ভট কবিতা অসাধারণ। কেন যে ও বস্তু দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তা আমার জানা নেই। দু-একটি উদাহরণ দিই। প্রথমটি আজকের দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক।

জেকের আখমাদ ভান বাখদাত
লাখ মেৎ জেইন খাত অপ জেইন বাদমাৎ।

এন সো হেই লাস সেইন দাখব্লাদ।
ইদেরএইন সাখ দাৎ
এত ইস রার
মার ইন বাখদাত, দার মাখ দাত।

এই অনবদ্য কাব্যের ভাবার্থ শুধু দিতে পারি, অনুবাদ আমার সাধ্যাতীত। বাগদাদ শহরে আহমেদ নামে কোনও ব্যক্তি, পশ্চাদ্দেশ স্নানের জন্য ব্যবহার্য আসনটিতে রেখে তার দৈনিক কাগজটি পড়ত। সকলেরই মত, ব্যাপারটা রোজ যা ঘটে তার মধ্যে পড়ে না ঠিকই। তবে বাগদাদ বলে কথা সেখানে এ ঘটতেই পারে।

আর পরের কবিতাটি আমার অতি প্রিয়। মানুষের অন্তহীন নিঃসঙ্গতা বা হিউম্যান কন্ডিশনের এমন মর্মন্তুদ ছবি আমি আর কোথাও পাইনি।

ইক সিত বেই দ ভেনস্তারগ্লাস-অ অননুমলেইক ত ভেরভেইলে
ইক ঔ দাত ইক টোএই হঙ্ঘাস্ ওয়াস
সো দাত ইক কন সামেন স্পেলে।

জানলার ধারে বসে আছি, বিরক্তির (কথাটার ইংরেজি অনুবাদ হবে 'বোরডম') শেষ সীমায় পৌঁছেছি। ইচ্ছে করে, যদি এক জোড়া কুকুরছানা হতাম, তবু না হয় দুটিতে এক সঙ্গে খেলা যেত।

এইসব কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ইডো এবং ইডোর বাবা। বৃহত্তর হল্যান্ডের সঙ্গে পরিচয়ও প্রথমে ওদের মারফত। খালের পাড় ধরে অ্যামস্টার্ডামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান, ওখানকার সরকারি চিত্রশালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান, রটেরডাম-এর (যে শহর নাৎসিরা আত্মসমর্পণ না করার অপরাধে তিন ঘণ্টার অবিরত বোমাবর্ষণে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল) হোমাপক্ষীর মতো ভস্ম থেকে উঠে আসা শহরে অতি আধুনিক চিত্রশালা দর্শন আর সবার উপরে ছুটির বিকেলে এবং সুযোগ পেলেই প্রতি সন্ধ্যায় শ্খেভেনিঙ্গেনের সমুদ্রতীর—জীবনের বহু সুন্দরতম মুহূর্ত ইডোর সঙ্গে কেটেছে। আর বছরে কয়েকটি সপ্তাহ মাঠ জুড়ে রঙের খেলা—টিউলিপের মরসুম। ইউরোপে কর্মোপলক্ষে ফেরার পরেও বারবার ওই দৃশ্য দেখতে ফিরে যাই। ইডো চলে গেছে। লেলিদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রও ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অল্প কথার মানুষ ডাচদের মানবিক উষ্ণতায় সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবনে কিছুদিনের জন্য অঙ্গীভূত হওয়ার সেই স্মৃতি আমার সারা জীবনের সম্পদ হয়ে রয়েছে।

আমার প্রায় সব ছুটিগুলি এবং তার উপরেও দুটি টার্ম ডেন হাগে কেটেছিল। সব মিলিয়ে প্রায় দু বছরের মতো। ওরই মধ্যে কয়েক সপ্তাহ প্যারিস আর কোপেনহেগেনের অভিলেখাগারে কাটিয়েছি। প্যারিসের কাজেও শ্রীমতী ইয়াপিকস-এর সাহায্য পেয়েছি। ওঁর স্বামী তখন ওখানে ডাচ অভিলেখাগারের হয়ে কাজ করছেন। আর ডেন হাগে রেইখসআর্কিফে কাজ করতে গিয়ে পেশা এবং ব্যক্তিগত জীবন দুদিক থেকেই বিশেষ মূল্যবান কিছু বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্রবীণ মার্কিন ঐতিহাসিক হোলডেন ফার্বার তখন প্রতি বছরই কিছুটা সময় ডেন হাগে কাটাতেন। ভারতবর্ষের প্রতি ওঁদের বিশেষ প্রীতি ছিল।

হল্যান্ডে ওই প্রবীণ দম্পতির সঙ্গে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, ওঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন তা অটুট ছিল। আর ছিলেন ডেনমার্কের গ্লামান-দম্পতি। বাণিজ্যের ইতিহাসে ক্রিস্টফ গ্লামান এক স্মরণীয় নাম। ডেনমার্কের নামকরা দুটি বিয়ার কোম্পানি—কার্লসবার্গ আর ট্যুবার্গ—ওখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কারণ ওদের মুনাফার বড় অংশই ডেনমার্কের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাপ্য। ক্রিস্টফ ওই বিয়ার কোম্পানিগুলির ইতিহাস লেখেন এবং কালে তাদের বড়কর্তা হন। তার মানে এই তরুণ ঐতিহাসিক সাধারণ শিক্ষাব্রতীদের কাছে প্রায় অকল্পনীয় ক্ষমতা এবং সম্পদের অধিকারী হন। কিন্তু মানুষটির কোনও পরিবর্তন হয়নি। আর ছিলেন সিংহলের অরসরত্নম। নামটা ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদ করে ও বলত ইয়ুয়েলচ্যা বা ক্ষুদ্র রত্ন। খুদে রত্নই বটে। অনেক সুকাজ ও অকাজের সঙ্গী এই মানুষটি দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়ায় পড়িয়েছেন। অর্থনৈতিক ইতিহাসে মূল্যবান কাজ করে ক'বছর আগে অরসরত্নম লোকান্তরিত হয়েছেন। দিনের পর দিন গ্লামান আর অরসরত্নমের সঙ্গে আর্কাইভসের কাছাকাছি কোনও সস্তা কাফেতে বা তাপমান একটু বেশি হলে খালের পাড়ে বসে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বটেরহাম ভক্ষণ করতাম। হল্যান্ডে হিসেবি তথা দরিদ্র খদ্দেরদের জন্য সস্তা কাফেতে এক সুব্যবস্থা ছিল, যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও দেখিনি। বাড়ি থেকে স্যান্ডউইচ নিয়ে এসে কাফেতে বসে খাওয়া যেত। একটা স্যুপ বা বিয়ার অর্ডার দিলেই যথেষ্ট। নেট খরচা তখনকার দেশি হিসাবে আনা আষ্টেকের মতো।

১৯৫৬ সনের মাঝামাঝি শেষবারের মতো আর্কাইভসের কাজ শেষ করে অক্সফোর্ড ফিরে এলাম। পরিকল্পনা—মাস ছয়েকে থিসিসটা লিখে ফেলব। এর আগে কিছু কিছু খসড়া করে ডেভিস সাহেবকে দেখিয়েছি। কিন্তু লেখার কাজটা বেশির ভাগই বাকি। আসলে থিসিসের খসড়া ডেভিস যত্ন করে দেখতেন ঠিকই, কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওঁর পরিচয় না থাকায় সত্যিতে সুপারভিশন যাকে বলে তা আমি পাইনি। তখন অক্সফোর্ডে গবেষণা করতে এসে অনেকেরই এই অভিজ্ঞতা হত। নিজের রাস্তা নিজে করে নিতে গিয়ে থিসিসের পক্ষে অতিরিক্ত লম্বা একটা সময়কাল—প্রায় নব্বই বছর—বেছে নিয়েছিলাম। এটা অনুচিত উৎসাহের পরিণাম। ফলে প্রায় তিনশো ভল্যুম নথিপত্র দেখতে হয়। আর যতটা সময় মালমশলা সংগ্রহের জন্য দিয়েছি, বিষয়টা চিন্তা করার জন্য তুলনীয় সময় বাজেট করিনি। তাই নোটস নিয়ে যখন লিখতে বসলাম তখন দেখি তারা পরিমাণে হিমালয় না হলেও বিন্ধ্য পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মহাভারতে গল্প আছে যে, দ্বারকায় পৌঁছে সমুদ্র দেখে সুভদ্রার হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়েছিল। নোটসের পরিমাণ উপলব্ধি করে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। স্কলারশিপের আর ছ' মাস বাকি। তার মধ্যে লেখা শেষ হবে এমন কোনও সম্ভাবনা দেখলাম না। দরিয়ায় এই যে ঘোর তুফান, কোন নাইয়া এখন পার করবে? মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বাড়িতে চিঠি দিলাম—বেশি কিছু আশা কোরো না। ডিগ্রি না নিয়েই ফিরতে হবে। জানতাম না যে দেশে এর মধ্যে বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। আমার চিঠিটা বাবাকে দেওয়া হয়নি।

লেখা কষ্টেসৃষ্টে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোয়। দু-এক পৃষ্ঠা লিখি আর ডেভিসকে নিয়ে দেখাই। ক্রিস্টমাসের দিনটাও ভদ্রলোককে রেহাই দিই না। বিনা আপত্তিতে ভদ্রলোক সব

সহ্য করেন। কিন্তু বুঝতে পারি যে উনিও বেশ চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর স্ত্রীও। ছেলেটা পারবে তো? এত দূর থেকে এসেছে। অনেক সময়ই দিনেরবেলা কিছু লেখা হয় না। বেনজিড্রিন খেয়ে রাত জাগি। এইভাবে শেষ অবধি থিসিসটা প্রায় তৈরি হয়ে এল। আমার অবস্থা তখন রেসের ঘোড়ার দৌড় শেষ করার সময় দিয়ে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। তবে বেনজিড্রিন খেলে একটা সাময়িক উত্তেজনা হয়। পৃথিবীর রঙে একটু গোলাপি ছোপ লাগে। সে রং যে কত মারাত্মক হতে পারে তা পরে বুঝি। উপসংহার লিখছি—এমন সময় আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। আমার সংগৃহীত আমদানি-রপ্তানির হিসাবগুলি দেখে খেয়াল হল যে, এতদিন এশিয়া আর ইউরোপের আমদানি সম্বন্ধে যা-কিছু বলা হয়েছে সবই ভুল। ফলে উপসংহারটা আগাগোড়া ফিরে লিখলাম। বরুণের সঙ্গে পাব-এ দেখা। আমার আবিষ্কারের কথাটা ওকে বললাম। আর দুদিন পরে থিসিস জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বরুণ আমার নতুন সিদ্ধান্তের খসড়াটা দেখতে চাইল। সন্ধেবেলা খাওয়ার পর আমার ডিগসে এসে লেখাটা দেখল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আপনি আমদানি আর রপ্তানির স্ট্যাটিস্টিকস গুলিয়ে ফেলেছেন।" পড়ে দেখি—ঠিকই ধরেছে। বেনজিড্রিনের প্রভাবে রপ্তানির স্ট্যাটিস্টিকস আমদানির আর আমদানিরটা রপ্তানির ধরে নিয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। বুঝলাম বেনজিড্রিন গঞ্জিকারই ছোট ভাই। তাই খেয়ে অত আনন্দ হত। আরও বুঝলাম—যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে চট করে পৌঁছনো ঠিক না—একটু রয়েসয়ে এগুতে হয়। এখন কী করা? বরুণ বলল, "আপনি এখন সারারাত বসে লিখুন। বেনজিড্রিন খেয়েছেন। ঘুম পাবে না। তবে আলসেমি লাগতে পারে।" বলে আমার বিছানায় ও শুয়ে পড়ল, যাতে আমার শোওয়ার কোনও উপায় না থাকে। এতে কাজ হল। সকাল নাগাদ থিসিস লেখা শেষ। পরদিন যথা সময়ে জমা দিলাম।

যথাকালে মৌখিক পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষকরা মৃদু পিঠ চাপড়ালেন। সেদিন রাত্রে বরুণ, মার্কিনি বন্ধু ওয়েড ম্যাক আর শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে শহরের সব চেয়ে দামি রেস্তোরাঁ এলিজাবেথ-এ খেতে গেলাম। এমন অবিমৃশ্যকারিতা আগে কখনও করিনি। কথাটা তুললাম এই জন্য যে, কত খরচ হয়েছিল মনে আছে। মাথাপিছু এক পাউন্ড। এখন ওখানে খেতে মাথাপিছু সত্তর পাউন্ডের মতো লাগে।

তার কদিন পরে মালপত্র জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা করে একটা হোল্ড-অলে কিছু জামাকাপড় ভরে নিয়ে স্থলপথে দেশে ফেরার জন্য অক্সফোর্ডকে বিদায় জানিয়ে লন্ডনের প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। বিদায় অক্সফোর্ড। তবে চিরদিনের জন্য নয়।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কথাটা অতি প্রাচীন বাংলা প্রবাদবাক্য। আমাদের সংস্কৃতির বহু যুগের সঞ্চিত জ্ঞান এই সব প্রবাদবাক্যে বিধৃত, ফলে তারা গভীর সত্যের আকর। কথাটা বহু দিনের অভিজ্ঞতার থেকেই বলছি। আবাল্য বেশ কিছু ভূত আমাকে কিলিয়ে বেড়াচ্ছে। যখনই একটু সুখের মুখ দেখি, তখনই পিঠে দমাদ্দম ভূতের কিল পড়ে। মনে হয়, ভূতের জগতে আমি বেশ সম্মানিত ব্যক্তি। ওঁদের রাজা তাঁর কিছু পেয়াদাকে শুধু আমাকে কিলোবার কাজেই নিযুক্ত রেখেছেন। মানে এ দেশে ফ্যাক্স বা ই-মেলের জন্য যেমন ডেডিকেটেড লাইন থাকে, কতকটা সেইরকম আর কী! আমাকে কিলোবার কাজে নিযুক্ত ভূতেদের আর অন্য কোনও কাজ নেই।

অক্সফোর্ড বাস যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ভারতীয় হাই কমিশন থেকে চিঠি এল—কবে নাগাদ দেশে ফিরতে চাও জানাও, আমরা তোমার জাহাজে বার্থের ব্যবস্থা করব। চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই এক দফা ভূতের কিল শুরু হল। ভূতেরা আদেশ করল—জাহাজে যাওয়া তোমার চলবে না। তুমি যদি আর পাঁচ জন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের মতো জাহাজেই যাবে, তবে আমরা আছি কী করতে? হাই কমিশনকে জানালাম—প্রভুদের আপত্তি না থাকলে, যদি ভাড়া বাবদ বরাদ্দ টাকাটা আমাকে দেন, তবে অধম স্থলপথে দেশে ফেরার চেষ্টা করতে পারে। উত্তর যেটা পেলাম, সেটা নেতিবাচক না হলেও, বেশ বিরক্তিপূর্ণ। বক্তব্য—যেতে চাও তো যেতে পার। তবে পথে যদি মারা পড়ো অথবা ঠ্যাং ভাঙে, তবে হাসপাতাল বা দাহ খরচা আমরা দিতে পারব না, কারণ পাগল-ছাগল পোষা হাই কমিশনের কাজ না। আর একটি কথা ভুলো না। ভুলিলে বিপদ হবে (বিপদটা যে কতটা সাংঘাতিক, তা যথাকালে বুঝেছিলাম)। মনে রেখো, রঘুনাথ রাও-এর মতো তুমিও বাঁধা আছ ন্যায়ের বিধানসূত্রে। মানে, তুমি সরকারের পয়সায় এসেছ। তার শর্ত, জুন-জুলাইয়ের মধ্যে দেশে ফিরবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-চাকরি দেবেন তাই নিতে হবে। মধ্য প্রাচ্যে কোনও বোম্বেটে তোমাকে ধরে দাস ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেছিল, এই অজুহাতে ছ' মাস পর দেশে ফিরলে সে সব আমরা মানব না। সবিনয়ে উত্তর দিলাম, হুজুরান, চিন্তা করবেন না। সব দায়িত্ব আমি নিলাম। পথে বেঘোরে মরলে দাহ খরচা নিজেই দেব, আর তেমন দরকার হলে ভূত হয়ে খেটে সরকারের ঋণ পরিশোধ করব। সরকারের জন্য যাঁরা খাটেন বা খাটেন না তাঁদের অনেকেরই জায়গায় ভূতেদের নিযুক্ত করলে জনসাধারণের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা না। অবশ্যই এ সব কথা মনে এলেও কাগজে-কলমে লিখিনি। যা হোক, শেষ অবধি ছোটখাটো একটি চেক হাতে এল। আর একটি স্বীকারপত্রে সই করে পাঠাতে হল, যার মূল কথা, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বুঝলাম, এই ধর্মহীন সরকার ভবিতব্যে বিশ্বাস করে না। সঙ্ঘ পরিবার কি সাধে সেকুলার সেকুলার বলে ক্ষেপে উঠেছিল? বিশ্বাসী হেঁদুর গায়ে এ সব অধর্মের কথা আর কত সহ্য হয়?

অক্সফোর্ড আসার সময় দেশ থেকে বেশ মোটা একটি কম্বল কাটিয়ে একটি ওভারকোট বানিয়ে এনেছিলাম। আর তা ছাড়া পাঁচটা ভদ্র বাঙালি শীত পড়লে লেকে বেড়াবার সময়

যে-মাঙ্কি ক্যাপ পরেন, তাও একটা এনেছিলাম, যাতে ঠান্ডায় অপমৃত্যু না ঘটে। বন্ধুবর ভ্লাদিমির একবার ওই দুটি জিনিস পরিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করিয়েছিল। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় তার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'মিট মাই ফ্রেন্ড, দা এবমিনেবল স্নোম্যান' বলে। অক্সফোর্ড ছাড়বার আগে বন্ধুদের পরামর্শে ও দুটি অক্সফ্যামকে দান করতে গিয়েছিলাম। ওরা নিতে রাজি হল না। সবাই বলল, ওই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। যাক, শেষাশেষি জিনিস দুটির মায়া ত্যাগ করে পাঁশগাদায় ফেলে দিলাম। পাঁশগাদা মানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা কাউন্সিলের সযত্নে রক্ষিত ধাপার মাঠ। তারপর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্যাডিংটন, সেখান থেকে ওয়াটার্লু স্টেশন, তারপর চ্যানেল পার হওয়ার জন্য ডোভার। ডোভার থেকে ফেরি জাহাজে বেলজিয়মের অন্তর্গত জেইব্রুখ।

ফেরি জাহাজে বিরহিণী যক্ষিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তবে তখন আর সে যক্ষযোনিতে নেই, নিতান্তই মানবী। বয়স গোটা পঞ্চাশেক হবে। জাতে ফ্লেমিশ, মানে রুবেনসের স্বজাতি। আকারও উক্ত মহাত্মার আঁকা ছবির নায়িকাদের ছাঁচে। তবে গায়ে জামাকাপড় থাকায় ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। ইংরেজরা সচরাচর অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে না। কিন্তু ইউরোপের আর পাঁচটা জাতের ও বালাই নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলায় দোষের কিছু নেই, এ কথাটা তারা সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি। তাই বিনা দ্বিধায় মানবী প্রশ্ন করলেন, অস্তের্স? অর্থাৎ, প্রাচ্য দেশের লোক? এই জাতীয় মানুষ আমি খুব পছন্দ করি। যাকে প্রশ্ন করছ সে তোমার ভাষা জানে কি না, পরোয়া না করে নিজের ভাষায় আলাপ শুরু করে। লাগলে লাগল, না লাগলে পরোয়া নেই। এ ক্ষেত্রে লেগে গেল। কারণ ফ্লেমিশ আর ডাচ জেঠতুত-খুড়তুত ভাই, একটা জানলে অন্যটা বোঝা যায়। বললাম, অবশ্যই, আমি আধ্যাত্মিক চিন্তা তথা বিচিত্র পেজোমির জন্মভূমি ভারতবর্ষের সন্তান। শুনে আবেগে মহিলার চোখ বুজে এল। বললেন, "টাগোরে? গানডি?" শুনে বড় আহ্লাদ হল। শ্বেতদ্বীপে দু-চারজন গাঁধীজির নাম যদি-বা শুনে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কথা জানে এমন প্রাণী রীতিমতো দুর্লভ। সলজ্জে জানালাম ওই দুই মহামানবকেই স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এর পর মহিলা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যেন স্বয়ং যিশুর শিষ্য কোনও প্রেরিত পুরুষ বা এপোসলকে প্রত্যক্ষ দর্শন করছেন। তারপর কিছু অন্তরঙ্গ কাহিনি শোনালেন। আর এক প্রাচ্যদেশীয় মানব ওঁর জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল। সে ইরাকের মুসলমান। বহুকাল পরে হাসপাতালে রোগশয্যা থেকে সে তার পুরাতন বান্ধবীকে স্মরণ করেছে। "হেই দেনকত আন মেই, দেনকত আন মেই।" সে খালি আমার কথা ভাবে, খালিই আমার কথা ভাবে। কেন? কে জানে? মানব চরিত্রের রহস্য কে বুঝতে পারে? কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় ভালবাসা! অস্তের্স লিফদ-অ! সে এক অপূর্ব জিনিস। জো দিইপ, জো-ও জাকত। এত গভীর, এত নরম! সেই প্রেম স্মরণ করে ফ্লেমিশ রমণী দেখি বেপথুমতী। ততক্ষণে জাহাজ জেইব্রুখ পৌঁছে গেছে। প্রাচ্যদেশীয় প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন নারীর ধ্যান ভঙ্গ না করে নীরবে বিদায় নিলাম।

জেইব্রুখ থেকে এন্টোয়ার্প। বহুবার দেখা এই শহর। সেখানে পুরাতন বান্ধবী রিকা ওরফে ফ্রেডারিকা অপেক্ষা করছিল। হেগ অভিলেখাগারে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে

তখন এন্টোয়ার্প বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারতা ছাত্রী। ডাচ ভাষায় যাকে বলে ব্লন্ডচ্যা, স্বর্ণকেশী বালিকা, চোখের মণিতে সবুজের আভা। তারপর ক'বার এন্টোয়ার্পের কাছে ওদের বাড়ি হোবোকেন গ্রামে গিয়েছি। একসঙ্গে ব্রুখ খেন্ট বেড়িয়েছি। এবারও গেলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ব্রাউনিংয়ের লাস্ট রাইড টুগেদার ওকে শোনাই। কিন্তু কেমন যেন হাসি পেল। ব্রাউনিংয়ের বদলে অলডাস হাক্সলি থেকে দুটি লাইন ওর অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিলাম: "ট্র্যাজেডি ইজ দা ফার্স হুইচ ইনভলভস আওয়ার সিমপ্যাথি। ফার্স ইজ দা ট্র্যাজিডি হুইচ হ্যাপেনস টু আদার্স।" এন্টোয়ার্প স্টেশনে ডেন হাগের ট্রেনে উঠলাম। অনেক দূর অবধি দেখতে পেলাম—রিকা রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি। চিঠিপত্র মারফত যোগাযোগ রাখার চেষ্টাও কখনও করিনি। সত্যিই কি রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে? লাইনটা লিখে কবি নিজেই সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন : "সত্যি বললাম তো?"

ডেন হাগের স্টেশনে ইডো অপেক্ষা করছিল। সেখান থেকে আমালিয়া স্ট্রিটের সেই পুরনো অভিজাত ভবন। সেখানে আমাকে বিদায় জানাবার জন্য ছোটখাট এক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। ওই সেই আফওয়াশ-সাঙ্গেন, বাসন ধোয়ার গান। ইমপ্রেসারিও ইয়ানের বাগদত্তা এলি। তার কিঞ্চিৎ স্থূল দেহে সত্যিই লঘু মন। সে গান ধরল—দাআর খাত ইয়ানচ্যা নার দা ব্লিকসাম তু। সঙ্গে সবার উদ্দাম নৃত্য। ইয়ানচ্যা এলির ভবিষ্যৎ পতিদেবতা। সে অধঃপাতে গেলে এত উল্লাসের হেতু কী তা বোঝা কঠিন। যা হোক, উৎসব রীতিমতো জমে উঠল। ঘরের ভিতর আলো-আঁধারির খেলা। প্লেটে প্লেটে নানা টুকিটাকি খাবার সাজান রয়েছে। একটি বস্তু মুখে দিয়ে বেশ সুস্বাদু মনে হল। কিন্তু স্বাদটা অচেনা। পর মুহূর্তেই বুঝলাম বস্তুটি কী! অন্ধকারে না দেখে স্যান্ডউইচ টারটার—অর্থাৎ কাঁচা গোমাংসের স্যান্ডউইচ গলাধঃকরণ করেছি। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম। জানলাম সংস্কারমুক্ত হওয়া সোজা কাজ নয়।

ইতিমধ্যে ইডোর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ফ্রেড আর তস্য পত্নী লেনার আবির্ভাব। ফ্রেড ছিল যাকে বলে রগুড়ে মানুষ। নেচে-কুঁদে হোহো-হিহি করে সবাইকে, বিশেষত নিজের বউকে, খুঁচিয়ে নরক গুলজার করার আর্ট তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। ইউরোপের উচ্চ কোটির সংস্কৃতি তার চোখের বিষ। লেনা পেতিত্ অর্থাৎ ছোট সাইজের সুন্দরী মেয়ে। একটু বেশি সংস্কৃতিবান। সে এসেই প্রস্তাব করল—এই রান্নাঘর ছেড়ে ওপরের প্রশস্ত হল ঘরে চলো। এটা কোনও নাচগানের জায়গা? ও ভাল অর্কেস্ট্রার বাজানো ভিয়েনিজ্ ওয়াল্‌জ-এর রেকর্ড নিয়ে এসেছে। স্তিমিত আলোয় সেই রেকর্ডের সঙ্গে ধীরোদাত্ত ছন্দে ওয়াল্‌জ নৃত্য হবে—'তুর্ন, ও তুর্ন মে পের্সনাজ'। ফ্রেড এক কথায় সে প্রস্তাব বাতিল করল—"রোমান্টিশ!" এর চেয়ে বেশি নিন্দনীয় কোনও শব্দ ওর ভাষায় ছিল না। লেনা মুখ ব্যাজার করে বসে রইল। মুখে বলল, "ফ্রেডটা একটা জন্তুবিশেষ।" কিন্তু ওই জন্তুর প্রেমে সে পাগল। কী করা যাবে। ফ্রেড শুধু এক রকম গানই ভালবাসে। তার উৎপত্তি বহু দূরদেশে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির বাইরে। তার নাম ক্যালিপসো। এবং তার মধ্যে একটি গানই ফ্রেডের প্রিয়। সেই ভয়াবহ অপসাংস্কৃতিক সংগীত হাজার বার শুনেও ওর তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ফ্রেড আর ওই

মহাসংগীত পার্বতী-পরমেশ্বরের মতই পরস্পরসম্পৃক্ত। ও যেখানে উপস্থিত সেখানে ওই গান না শুনে নিষ্কৃতি নেই। ফলে রেকর্ড বাজতে শুরু করল, 'কাম মিসতার তালিমান, তালি মি বানানা'। আর সেই কলা বেচার গানের সঙ্গে উন্মত্ত রক অ্যান্ড রোল। অহো, কী যন্ত্রণা।

আওয়াজ আর নাচানাচি যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে, তখন আমি এক মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করলাম। নাচানাচির একটু বিরতি হতেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলাম, "এসো আমি তোমাদের হাত দেখব।" ব্যস, ম্যাজিকের মতো কাজ হল। কে না জানে, ভারতীয় মাত্রেই সামুদ্রিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তার উপর অক্সফোর্ডের পাশ দেওয়া ভারতীয় বলে কথা। দশখানা হাত যুগপৎ এগিয়ে এল, "আমি আগে, আমি আগে।" লেনা বেচারা এতক্ষণ মুখ ভার করে এক কোণে বসে ছিল। এখন সে রীতিমতো উদ্দীপিতা। ওর হাতটাই আগে নিলাম। তখন আমার পেটেও তিন চার বোতল আমস্টেল বিয়ার। কী মনে হল জানি না। বললাম, "লেনা, তুমি ভবিষ্যতে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে।" সবাই হো হো করে হেসে উঠল "আমরা অনেকদিন ধরেই জানি ফ্রেড কালে ব্যাঙ্ক ডাকাত হবে।" ফ্রেড তখনও পর্যন্ত ওই পেশাটা ধরেনি। আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডাকাতির মতো অত রোজগার হয় না। ফ্রেড ঘুষি উঁচিয়ে বলল, "দেখ, আমি যখন হেনরি ফোর্ড হব, তখন তোমাদের সব দারোয়ান রাখব।" তারপর কী হঠাৎ মাথায় এল জানি না। বললাম, "লেনা, তোমার হাতে সবই ভাল, শুধু দেখছি আয়ুষ্কাল নিয়ে কিছু একটা গোলমাল আছে। তবে এটা তোমার আয়ু না নিকটস্থ আর কারও, বুঝতে পারছি না।"

চিঠিপত্র লেখার আমার কোনও দিনই অভ্যেস নেই। ফলে দেশে ফেরার পর ইডোদের খোঁজখবর অনেকদিন নেওয়া হয়নি। ১৯৬০-এ আবার এক বছরের জন্য ইংল্যান্ড যাই। লন্ডন থেকে যখন ডেন হাগ গেলাম, তখন ইডোর কাছে এক মর্মান্তিক খবর পেলাম। ও বলল, আমার লেনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। লেনা এখন দশ লক্ষ ডলারের মালিক। কিন্তু এই সৌভাগ্য বিনামূল্যে হয়নি। সরকারের জন্য ফ্রেড একটা ব্রিজ তৈরি করছিল। সেই সময়ে জিপ অ্যাকসিডেন্টে ও মারা যায়। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ডাচ সরকার লেনাকে এক মিলিয়ন ডলার খেসারত দিয়েছে। আমি আর কখনও কারও হাত দেখার প্রাণঘাতী খেলা খেলবার চেষ্টা করিনি।

আবার কখনও ইউরোপ ফিরব, তখন এমন ভরসা ছিল না। তাই বহু পরিচিত প্রিয় জায়গাগুলিতে একটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটালাম। মাউরিটসহাউস, স্খেভেনিঙ্খেনের সমুদ্রতীর, অফিসপাড়ার সেই কাফে, লেলিভেল্টের মাঠ, মোলেনস্ট্রাটের সেই কাফেতে ডাচ চিতে পিঠা পফেরচা ভক্ষণ—সব চেনা অভিজ্ঞতাগুলিই আর একবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলাম। ভেরমিয়ারের আঁকা ডেলফ্‌টের দৃশ্যের একটি প্রতিলিপি আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে কিনলাম। সেটি এখনও আমার বসার ঘরে দেওয়ালে ঝুলছে। তার সঙ্গে যৌবনের বহু আনন্দের স্মৃতি জড়িত।

হল্যান্ড থেকে কোপেনহেগেন, সেখান থেকে জার্মানির ডুসেলডর্ফ। শেষোক্ত জায়গায় অনন্তরমণ তখন গবেষণায় ব্যস্ত। দেখলাম, যে-'ফেসিলিটি'র অভাবে বঞ্চিত নরনারী দুঃখভোগ করে বলে ওর দুশ্চিন্তা ছিল, সেই ফেসিলিটির সমস্যার ওর ব্যক্তিগত জীবনে

একটা সমাধান হয়েছে। রমণ তার বাগদত্তা জার্মান মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ডুসেলডর্ফ থেকে কোলোন। সেখানকার জগদ্বিখ্যাত ক্যাথিড্রালে এক বিচিত্র নির্দেশনামা দেখে মুগ্ধ হলাম। গির্জার ভিতরে কী কী করা চলবে না তার একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু দ্ব্যর্থতাহীন ফর্দ। প্রথম কথা, প্রেম অবশ্যই করা চলবে না। দ্বিতীয় কথা হাফ প্যান্ট নিষিদ্ধ। কিন্তু যে-নিষেধবাণী আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল সেটি নিম্নরূপ : "গির্জার ভিতরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলা নিষিদ্ধ।" কিন্তু কেন? এর কোনও জবাব নেই। দেশটা জার্মানি। এখানে জনগণ সরকারের আদেশ মেনে চলতে অভ্যস্ত। এটা পেঁয়াজি করার জায়গা একেবারেই না। মানে মানে পকেট থেকে হাত বের করে নিলাম।

পয়সার অভাবে অনেক ট্যুরিস্টকৃত্যই এর আগে সম্ভব হয়নি। সেই সব সাধ এই যাত্রায় কিছুটা মেটাবার চেষ্টা করলাম। কোলোন থেকে ডুসেলডর্ফ হয়ে রাইন-ডুসেলডর্ফার জাহাজ ফ্রাঙ্কফুর্ট যায়। বেড়ান বা ট্যুরিজম ছাড়া এই নদীবিহারের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। ওখানে আহারবিহার সব কিছুই ট্যুরিজমের সুদৃশ্য মোড়কে প্যাক করা। দু-পাশে সবুজ পাহাড় আর সাজান সব শহর-গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে আঙুরের লতা। মাঝে মাঝেই পাহাড়ের চূড়া ঘেঁষে মধ্যযুগীয় কেল্লা। বহু শত বৎসরের রক্তাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়ান। কিন্তু নয়নমুগ্ধকর সন্দেহ নেই। লোরেলেই পয়েন্ট পৌঁছতেই জার্মান রোমান্টিক ঐতিহ্যের অন্যতর ফল বহু জনপ্রিয় গানটি বেজে উঠল। নানা বয়সের এবং, বলাই বাহুল্য, নানা সাইজের জার্মান স্ত্রী-পুরুষ নাচতে শুরু করলেন। তাঁদের কেউ কেউ না নাচলেই ভাল ছিল। সেই অনন্তরমণের সাবধানবাণী মনে পড়ল। যা দেখলে অন্য মানুষের যন্ত্রণা বোধ হয় সেই আনন্দ কি সর্বজনসমক্ষে করা উচিত?

ট্যুরিজম মানুষ আর বাড়িঘরের ভিড় বাড়িয়ে পৃথিবীর সুন্দরতম জায়গাগুলিকে অসুন্দর করে তোলে ঠিকই। কিন্তু নদী-হ্রদ-পাহাড়-সমুদ্রের এক অজেয় রূপ আছে। তা ধ্বংস করা লোভী নির্বোধ মানুষের পক্ষেও সহজ নয়। তবে অনেক বছর পরে ওই রাইন-ডুসেলডর্ফারে আর একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। এবার দেখলাম সুন্দরকে কুৎসিত করার স্থূল প্রচেষ্টা শতকরা নব্বই ভাগ সফল হয়েছে। কারণ ট্যুরিজম না, শিল্পায়ন। ফ্যাক্টরির চিমনির কাছে মা ধরিত্রী শেষ অবধি মাথা নত করেছেন। ১৯৫৭ সালেও দেখেছিলাম—ডুসেলডর্ফ বা কোলোনেও বহু বাড়ি বোমায় বিধ্বস্ত। ভাঙা বাড়ির দু-একটি ঘরে আলো জ্বেলে বসে কেউ কাজ করছেন। কিন্তু প্রতিটি মানুষ দৈনিক কাজের সময় এক থেকে দু' ঘণ্টা বাড়িয়ে নিয়ে জার্মানির আগের চেহারা শুধু ফিরিয়ে আনেনি, সম্পদ আগের তুলনায় বহু গুণ বাড়িয়েছে। একটি তথ্য জেনে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। বার্লিনবাসীরা বিধ্বস্ত শহরটি আবার গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে, জার্মানি যেদিন আত্মসমর্পণ করে তার পরদিন থেকে। কিন্তু সমৃদ্ধি ফিরে পাওয়ার জন্য যে দাম দিতে হয়েছে, রাইনতীরবর্তী অঞ্চলের কুৎসিত চেহারা তারই অংশ।

জার্মানির অক্সফোর্ড হাইডেলবার্গ। তার বহির্দৃশ্য আমার চোখে অক্সফোর্ডের থেকেও ভাল লাগল, কারণ জায়গাটা পাহাড়ে আর শহরটির ভিতর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কিছু নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টি বয়সে অক্সফোর্ডের চেয়ে খুব ছোট নয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় তফাত আছে। অক্সফোর্ড একদিকে মধ্যযুগের, অন্যদিকে বিশেষভাবে বিংশ শতকীয়— মরিস মোটর কোম্পানির কারখানা এই শহরের সমৃদ্ধির পেছনে। হাইডেলবার্গ সম্পূর্ণই মধ্যযুগের, তার উপরে আঠারো-উনিশ শতকের জার্মান রোমান্টিসিজমের প্রলেপ পড়ে মধ্যযুগীয় বীভৎসতা শিভালরি আর ট্রুবাডুরদের গানের মোড়কে অদৃশ্য হয়েছে। ছাত্ররা তলোয়ার খেলা বা ফেন্সিং শেখে, আর মধ্যযুগীয় বীরত্বের আদর্শে ফিরে গিয়ে পরস্পরের গালে তলোয়ারের চিহ্ন এঁকে দেয়। না, সে-প্রথা বেশ কিছুকাল আগেই উঠে গেছে, কিন্তু কেন যেন মনে হয়েছিল, উনিশশো সাতান্ন সালেও তার প্রতি মোহময় ভক্তি তরুণ জার্মান হৃদয়ে সজীব রয়েছে। বসুন্ধরা, বিশেষত নারীর প্রেম, বীরভোগ্যা—এ বিশ্বাস বহু সংস্কৃতিরই অঙ্গ। তবে আধুনিককালে সে বীরত্ব আর তলোয়ার খেলায় সীমাবদ্ধ নেই। জার্মান সংস্কৃতি কি এই নতুন আদর্শের ব্যতিক্রম? মাচিসমো বা আগ্রাসী পুরুষালির পূজা বোধ হয় এখন তুলনায় ল্যাতিন আমেরিকা আর ইতালিতেই বেশি চালু।

সংস্কৃতির কথা যখন তুললাম, তখন হাইডেলবার্গে ভারতীয় অপসংস্কৃতির সঙ্গে এক বেদনাদায়ক মোলাকাত হয়েছিল তার কথাটাও লিখি। একটা ছোট রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছি। দেখি আর একটা টেবিলে এক দল ভারতীয় ছেলে বেশ হই চই করছে। তখন বহু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে হাতেকলমে কারিগরি শিক্ষার জন্য জার্মানি যেত। পশ্চিম জার্মান সরকার এ জন্য বেশ উদার হস্তে অনুদান করেছিলেন। ধরনধারণে বুঝলাম—ওই হইচইকারীরা সেই দলের লোক। এরা বেশির ভাগই ম্যাট্রিক বা তুলনীয় কোনও পরীক্ষা পাশ করে বিদেশ যেত। কিন্তু শুনেছি কারিগরি কাজে দক্ষতার ব্যাপারে এরা কারও তুলনায়ই পিছিয়ে থাকত না। কিন্তু আচার-ব্যবহারে অনেক সময়ই এরা একটু বেশি উগ্র, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্র্যাশ। তার প্রমাণ হাতেনাতেই পেলাম। ওয়েটার যখন এসে জিগ্যেস করল, "তোমরা কী খাবে?" এক অতি স্মার্ট যুবক বলল, "অন্য কোনও ভাল রেস্তোরাঁর ঠিকানা দিতে পার? এখানকার খাবার শুনেছি মানুষে খেতে পারে না!" ওয়েটারটি ওদের একজনকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই রেস্তোরাঁটায় যেতে পারেন। শুনেছি রান্না ভাল। এই জায়গাটার আমিই মালিক, আমিই রাঁধুনি। আমি জানি আমার রান্না বিশেষ ভাল না।" এই উত্তর শুনে দলসুদ্ধ হেসে উঠল। তার সঙ্গে মন্তব্য, "তুমি যে রাঁধতে জানো না সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে!" লোকটি চুপ করে শুনে গেল। এই জাতীয় স্মার্ট কথা দেশে, বিশেষত দিল্লি শহরে, বহুবার শুনেছি। ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলে দেশের কোনও বিশেষ শহরকে চিহ্নিত করা যায় কি না জানি না, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থ যে ভারতীয় অসভ্যতার রাজধানী, সে বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নেই।

এই প্রসঙ্গে কিছুটা অবান্তর একটা কথা বলি। ভারতীয় সংস্কৃতি জিনিসটা কাল্পনিক ব্যাপার নয়, সাধারণ মানুষের চেতনা এবং ব্যবহারে তার শিকড় গভীরে চলে গেছে, আমার পরম সৌভাগ্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমি অনেকবার পেয়েছি। এইখানে দুটি ঘটনার কথা বলব, যদিও তাদের সঙ্গে আমার স্থলপথে দেশে ফেরার কাহিনির কোনও যোগ নেই।

ভারতীয় অসভ্যতার কথা বলেছি, তাই বিবৃতির ভারসাম্য রাখার জন্য ভারতীয় সভ্যতার কথা বলা প্রয়োজন মনে হল।

১৯৫৮ সালে কুলু-মানালি বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাঠানকোট থেকে বাস ধরেছিলাম। পথে একটি জায়গা, এখন নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত নূরপুর—তার কুলফি মালাইয়ের জন্য বিখ্যাত। ওখানে জিনিসটার নাম কুলফি না, বরফখোয়ে—কুলফির টিনের ছাঁচে না, মাটির হাঁড়িতে জমানো, হাতা দিয়ে কেটে কেটে শুকনো পাতায় করে পরিবেশন করে। এমন অপূর্ব স্বাদ আইসক্রিমের লাইনে আর কিছুতে পাইনি। ফেরার পথে আবার ওখানে বাস থামল। বরফখোয়ে আর একবার খেলাম। কিন্তু এবার ঠিক আগের মতো ভাল লাগল না। কুলফিওয়ালাকে বললাম, তোমার মাল খুবই ভাল। কিন্তু ক'দিন আগে যে খেয়েছিলাম, সে যেন আরও ভাল ছিল। লোকটি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিল, "তুমি নিশ্চয়ই রাম সিংহ-র বরফখোয়ে খেয়েছিলে। ওই সব চেয়ে ভাল কারিগর। ডেকে দেব রাম সিংহকে?" লজ্জায় কোন দিকে তাকাব ঠিক পেলাম না। বললাম, "না, না তোমারটাও খুব ভাল।" দ্বিতীয় ঘটনাটি কলকাতা [সুনীলরা যা-ই বলুন, আমি কোলকাতা লিখতে রাজি না। সাত পুরুষের কাঠ বাঙাল। কইলকাতা লিখছি না এই জন্যই সকলের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মোরগো ভাষা কি কারও চাইয়া খাড়ো? তয়?] শহরেই ঘটে। লেক মার্কেটের পাশের গলিতে যেখানে কিছু গ্রামের লোক বাড়ির বাগান থেকে ফল-তরকারি নিয়ে বসে, সেখানে একদিন একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক দেখি কিছু কচুর শাক আর একটা মোচা নিয়ে বসে আছে। দাম জিগ্যেস করায় চোখ বড় বড় করে বলল, "দুটো মিলিয়ে পনেরো টাকা।" সে এক পয়সাও কমাতে পারবে না। হ্যাঁ! সেই দামে রাজি হয়ে যখন ওকে একটা বিশ টাকার নোট দিলাম, ও এক মুঠো টাকাপয়সা হাত মেলে আমার সামনে ধরল। বলল, "গুনে নেও।" "তুমি গুনে দেও না।" "আমি কি গুনতে জানি যে গুনব?" "বলো কী? তরকারি বেচতে এসেছ, গুনতে জানো না! তোমাকে যে ঠকিয়ে নেবে সবাই।" "যে ঠকাবে তারই অধম্মো হবে। আমার কী এল গেল?" এই কথোপকথন ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও হওয়া সম্ভব বলে মনে করি না। ঐতিহাসিক ব্যাশাম সাহেব বলতেন, যে-হিন্দি সিনেমা দেখে ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালরা নাক সিঁটকোয়, তার মূল কাঠামোও ধর্ম আর অধর্মের লড়াই। রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে যে বিশ্বাস চলে আসছে, তা আজও জীবিত। বিশ্বায়নও তাকে ধ্বংস করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।

আমার ভ্রমণকাহিনিতে ফিরে যাই। জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়া। প্রথমে সালজবুর্গ, তারপর ভিয়েনা। এর আগে এক কনফারেন্স উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলাম। ওখানে দুটি পরিবারের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। সেবারকার কনফারেন্সটা ছিল শরৎকালে, তখন সেই বছরের নতুন মদ সবে বাজারে উঠেছে। এই শিশু-মদ্যের জার্মান-অস্ট্রীয় নাম হয়রিখেন, আর তার আস্বাদন হল হয়রিখেন-বেজুখ, মানে সেই নবাগতর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ওই সাক্ষাৎকার দলবদ্ধভাবে একটা দীর্ঘ সময় ধরেই হয়। ফলে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের দেওয়াল সহজেই ভেঙে যায়। এই ভাবেই যথাক্রমে মার্কিন এবং অস্ট্রিয়ান দম্পতি দুটির সঙ্গে অল্প সময়েই বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। এবার আমি অস্ট্রিয়

দম্পতিকে বাইরে বেশ দামি রেস্তোরাঁয় খেতে নিয়ে গেলাম। এই অসম্ভব ঘটনার কারণ দুটি। প্রথম, সে সময়ে ইউরোপে দু-তিনটে সস্তাগণ্ডার জায়গা ছিল। অস্ট্রিয়া এবং স্পেন সেই সস্তা জায়গার তালিকায় প্রথম সারিতে। তার উপর পাউন্ড তখন বেশ জোরদার। বিশেষ করে অস্ট্রিয়ান শিলিং-এর সঙ্গে বিনিময়ের হারে। সুতরাং অন্দরে ছুঁচোরা যতই কীর্তন গাক না কেন, ভিয়েনায় এক সন্ধ্যায় কোঁচার পত্তন দেখান আমার সাধ্যাতীত ছিল না। সেই সন্ধ্যাটা ভালই কাটল। কিন্তু পরদিন মার্কিন দম্পতির সঙ্গে পানভোজনের নেমন্তন্নটা ঠিক জমল না—সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। অস্ট্রিয়া অক্ষশক্তির একটি। তার জন্য দেশটার যে খেসারত দিতে হয়েছিল তার অন্যতম শর্ত হিসেবে ভিয়েনাকে বেশ কিছুকাল ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স আর সোভিয়েত রাশিয়ার তাঁবে থাকতে হয়। শহরটাকে চারটি জোন বা অংশে ভাগ করা হয় এবং এক একটি ভাগ এক একটি বিজয়ী রাষ্ট্রের তাঁবে থাকে। এই ব্যবস্থা ঠান্ডা লড়াই শুরু হওয়ার পর খুব ভাল চলছিল না। দখলকারী চার সংস্থার মধ্যে খটাখটি লেগেই থাকত। মার্কিন দম্পতির বাড়িতে খাওয়ার সময় কপালদোষে সেই প্রসঙ্গ উঠল। আমার বন্ধুটি রাজনীতির দিক থেকে রক্ষণশীল। তিনি সোভিয়েত রাষ্ট্রের নানা নিন্দাবান্দা করছিলেন। আমি নিজে স্টালিনের স্থাপিত রাষ্ট্রব্যবহার গুণমুগ্ধ স্তাবক কোনও দিনই ছিলাম না। কেসলারের 'ডার্কনেস অ্যাট নুন'-এ বর্ণিত মস্কোর বিচারের প্রহসনের কথা যে অনেকাংশে সত্যি, তা আমি বিশ্বাস করতাম। কিন্তু যুদ্ধ থামার পর পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত শক্তির অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন, সেটাও আমার যুক্তিযুক্ত মনে হত না। বন্ধুভবনে আপসে আলোচনা প্রসঙ্গে সে-কথা আমি বললাম। ব্যস! বন্ধুটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। "তোমাদের—তৃতীয় জগতের বুদ্ধিজীবীদের—এই নির্বোধ দুর্বলতা কিছুতেই যাবে না। তোমাদের আমরা সব দিচ্ছি, তবুও তোমরা রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকো। আমরা যদি সরে আসি আর রাশিয়ার তাঁবেদাররা তোমাদের কব্জা করে তবে তোমাদের শিক্ষা হয়।" আলোচনা এই পর্যায়ে পৌঁছলে তর্কে হারা-জেতার কোনও প্রশ্ন আর ওঠে না। তাই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে বিদায় নিলাম। বুশ জুনিয়ারের রাজত্বে নিও-কনদের যে দম্ভ আর আগ্রাসন সকলকে স্তম্ভিত করছে, তার বীজ অনেকদিন আগেই পোতা হয়েছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রথম পর্বেই তার ভয়াবহ সব সম্ভাবনা হঠাৎ হঠাৎ নজরে পড়ত। বিদায় নেওয়ার সময় বন্ধুপত্নী বললেন—"ইউরোপে এলে আবার এসো কিন্তু।" সে কথার অসত্য জবাব না দিয়ে বের হয়ে এলাম।

ভিয়েনা আমার অন্যতম প্রিয় শহর। অস্ট্রিয় হাবসবুর্গ রাজবংশের ইউরোপ-জোড়া সাম্রাজ্যের রাজধানী এই শহরের ঐতিহ্যের এক করুণ দিক আছে। উনিশ শতকেই হাবসবুর্গদের ক্ষমতা ক্ষীয়মাণ। কিন্তু আড়ম্বরের কিছু ত্রুটি তখনও হয়নি। শহরজোড়া বারোক স্থাপত্য সেই অন্তঃসারশূন্য আস্ফালনের স্মৃতি বহন করছে। বিরাট বিরাট গেট, যেখানে সেখানে ক্লাসিকাল আদর্শে তৈরি সব মূর্তি, কৃষ্টি, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের গৌরব ঘোষণা করছে। সে গৌরব প্রথম মহাযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ অস্তমিত। ১৯৫৭ সালে ওইসব বারোক মূর্তি, গেট, বিরাট চওড়া রাস্তাঘাট ঠিক ভাবে দেখাশুনা করার মতো পয়সারও

অভাব। অভিজাত ভবনগুলির বাইরে নেম-প্লেটে অমুক ফন তমুক ইত্যাদি পিলে চমকান নামের ছড়াছড়ি। কিন্তু অভিজাত পুঙ্গবদের মাসখরচা চলে ঘর ভাড়া দিয়ে কিংবা পেয়িং গেস্ট নিয়ে। আমি সামান্য পয়সা দিয়ে যে-বাড়িতে উঠেছিলাম, সেখানে সকালের কফি নিয়ে আসতেন বাড়ির মালিক কাউন্টেস স্বয়ং। ঝি-চাকর রাখার রেস্ত অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ওখানে থাকার সময় বরিশালবাসের এক স্মৃতি খুব মনে পড়ত। চন্দ্রদ্বীপের ভুঁইয়া রাজার বংশধর মাধবপাশার রাজাদের বাড়ি গিয়েছিলাম একবার—প্রাচীন নথিপত্রের সন্ধানে। কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে সামনের দোকানে খবর নিলাম। উত্তর পেলাম, "থাকনের মধ্যে এখন তো আছে ক্যাবল গোপাল রাজা। সে গ্যাছে বাজারে।" ভিয়েনায় গোপাল রাজা ডজন ডজন। তারা শুধু বাজারে যায় না, ঘরও ঝাড় দেয়।

দেশভ্রমণ ব্যাপারটা অনেক সময়ই নৈরাশ্যজনক ব্যাপার। যে-দেশে যাচ্ছি তার সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে উপরি উপরি কিছু বাড়িঘর, পুরাকীর্তি তথা শিল্পকীর্তি দেখে খুব কিছু আনন্দ হয় না, যা দেখলাম তা বিশেষ মনেও থাকে না। প্রাকৃতিক দৃশ্যর কথা অবশ্যি আলাদা। খুব রসকষহীন মানুষও পাহাড় বা সমুদ্র দেখে দৈনন্দিনতা থেকে কিছুটা মুক্তির স্বাদ পায়। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। আজকাল শিক্ষাজগতে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ফলে এবং ভারত সরকারের দাক্ষিণ্যে বহু লোক বিদেশে, বিশেষত ব্রিটেনে আসে, যারা না এলে তাদের বা অন্য কোনও মানুষের কোনও ক্ষতি হত না। এরকম দু-একজন বন্ধুবান্ধবের চিঠি নিয়ে এসেছেন, যাঁদের কোনও কিছুতেই কোনও উৎসাহ নেই। এক ব্যক্তির অর্ধসুপ্ত মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম এখানকার মিউজিয়ামে যাবে? বিরস মুখে প্রতিপ্রশ্ন, "উহাঁ কেয়া হ্যায়?" বললাম— ছবি আছে, মূর্তি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনে আগন্তুক বললেন, "ছোড়িয়ে। ওহ ভি এক দেখ লিয়া।" মরিয়া হয়ে গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ভাবলাম শেষ চেষ্টা করি। কটসোলডের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়নি এমন মানুষের সাক্ষাৎ আমি পাইনি। কিন্তু এই বীতরাগ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্বিকার। হঠাৎ দেখি তাঁর চোখেমুখে উত্তেজনা তথা আনন্দের আভাস। প্রীত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, "ইহাঁকা গায়েঁ কাফি তনদুরস্ত হ্যায়।" বুঝলাম স্বজাতি সন্দর্শনে এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখে প্রাণীটি প্রীত। তিনি নিজেও বেশ তনদুরস্ত, তাই ঈর্ষা বোধ না করে সহমর্মিতায়ই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদরা বারবারই রিয়াল রিডার বা সত্যিকার পাঠকের কথা বলেন। কথাটা মূল্যবান কারণ, একই শিল্পবস্তু বা সাহিত্যকীর্তি বিভিন্ন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেদন বা অর্থ নিয়ে আসে। ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ অর্থবহ। মানুষ যা দেখে অথবা তার যা অভিজ্ঞতা হয় তা সে নিজের রুচি বা বিশিষ্ট কৃষ্টির আলোতেই ব্যাখ্যা বা গ্রহণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখলে তার যে নির্যাসটুকু মনে থেকে যায়, তাও ব্যক্তিবিশেষের আগের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাসংস্কৃতি এবং রুচির উপর নির্ভর করে। আমি যেভাবে বোঁচকা কাঁধে ইউরোপে ঘুরেছিলাম তা কষ্টসাধ্য এবং সেই শারীরিক কষ্ট ভ্রমণের আনন্দ কিছুটা নষ্ট করেনি বললে মিথ্যা বলা হবে। যে জায়গায়

একরাত বা দু'রাত থাকতাম, হোল্ড-অলটি হাতে নিয়ে সেখানে, বাসস্থানে গিয়ে উঠতাম। অনেক ক্ষেত্রেই জায়গাটা হত ইউথ হোস্টেল। একটা টানা, লম্বা ঘরে পাশাপাশি সব খাট ফেলা। সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র হতে রাজি না থাকলে স্নান করার সুবিধে নেই। খাওয়া চলে যাওয়ার মতো, তবে বৈচিত্র্যহীন। তবে তারই মধ্যে মাঝে মাঝে অত্যন্ত সাধারণ জায়গায় অমৃতবৎ খাদ্যও জুটেছে। আর যদি রাত্রিবাসের ইচ্ছে না থাকে তো স্টেশনে মালটি রেখে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে ম্যাপ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বের হয়ে পড়া। সারাদিন ঘুরে পরবর্তী গন্তব্যস্থানের ট্রেন ধরা। বয়স কম হলেও আমি তখন ঠিক আর নবযুবক নই। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়েছে। সুতরাং কদিন পরপর রাতটা ট্রেনে কাটলে একটি পরিচ্ছন্ন নরম বিছানার জন্য চিত্ত কিছুটা আকুল হতই। মনে রাখবেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁর উত্তর তিরিশ প্রবন্ধে যৌবনকে বিদায়ই জানিয়েছেন। আমি ঠিক অতটা যেতে রাজি না থাকলেও স্থলপথে দেশে ফেরার চেষ্টাটা মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর হয়ে উঠত সন্দেহ নেই। কিন্তু তারই মধ্যে বহু উজ্জ্বল মুহূর্ত, অবিস্মরণীয় কিছু ছবি স্মৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে গিয়েছে।

অস্ট্রিয়া থেকে সুইৎজারল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড থেকে ইতালি, ইতালির ব্রিন্দিসি বন্দর থেকে জাহাজে এথেন্স হয়ে ক্রিট, আবার ওই জাহাজেই এথেন্স ফিরে এসে ট্রেনে এথেন্স থেকে ইস্তাম্বুল, সেখান থেকে টরাস এক্সপ্রেসে বাগদাদ, বাগদাদ থেকে শাত-ইল-আরবের মুখে বসরা আর বসরায় গালফ বোটে ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে ওমান-মস্কট-দুবাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ন'দিন পর মুম্বই। এই ছিল আমার যাত্রাপথ।

জলের দেশের মানুষ, শৈশব কেটেছে খরস্রোতা নদীর পাড়ে। তাই জল আমাকে সব সময়ই আকর্ষণ করে। জল বর্ণহীন, এক বিশিষ্ট অর্থে আকারহীনও বলা চলে। কিন্তু স্থানভেদে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন হলে তার যে কত রূপ, কত বর্ণবৈচিত্র্য হয় ভাবলে অবাক লাগে। সুইৎজারল্যান্ডে তার এক অপরিচিত চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ইউরোপের সংস্কৃতিবান মানুষরা অনেকেই সুইৎজারল্যান্ডের নামে নাক সিঁটকান। হয় বলেন কুক্কু ক্লক আর চকোলেট ছাড়া ওদের আছেটা কী? নয় বলেন—স্যানাটোরিয়াম যদি তোমার ভাল লাগে তবে নিশ্চয়ই সুইৎজারল্যান্ড যেও। কিন্তু পার দেখা যায় না এমন সুবিস্তৃত জলরাশি, তার রঙও কখনও কালো, কখনও হালকা আকাশি, কখনও তাতে বরফে ঢাকা পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, কখনও পাড়ঘেঁষা বনভূমির। রূপকথা থেকে উঠে আসা ছোট ছোট গ্রাম, ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, যা থেকে তুলে খাবার মুখে দিতেও দ্বিধা হয় না—মহৎ শিল্পসাহিত্য বা বিশ্বজয়ী দর্শনের জন্মভূমি নয় বলে সে-দেশ সভ্য মানুষের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয়—সভ্যতা নিয়ে এমন গৌরব বা শ্লাঘা আমার নেই। ইনটারলাকেন, টুন এমনকী আকারে কিছু বড় লুসার্ন শহর আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পাহাড়ে বাসের উপযোগী সুইস শালে সভ্য জীবনযাত্রার সুষ্ঠু পরিবেশ মনে হয়েছিল। আর জ্যুরিখ হ্রদের পাড়ে ছোট্ট একটি গ্রাম—ভিৎসনাউ, আমার মন হরণ করে। সেখান থেকে ফিউনিকুলার ট্রেন স্কি-বিলাসী খেলুড়েদের প্রিয় পাহাড়ের চূড়া রিগি নিয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে সুযোগ পেলেই সেখানে ফিরে গেছি।

কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের দেখা ভিৎসনাউ হোটেল আজ অগুন্তি বাড়ির চাপে

হারিয়ে গেছে। ওই সময়ে যেসব জায়গা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তার সবগুলিরই প্রায় এক অবস্থা। বাউলরা গান করেন, "সাঁই, তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।" পৃথিবীর যত রম্য স্থান তারা আজ চাপা পড়েছে হোটেল আর ট্যুরিস্ট লজে। যারা রাজনৈতিক শুদ্ধতায় বিশ্বাসী, তাঁরা এ জাতীয় কথা শুনলে ভুরু কুঁচকে বলেন, "এলিটিজম। সাধারণ মানুষ বেড়াবার আনন্দের স্বাদ পাচ্ছে, সম্পন্ন লোকেদের তা সহ্য হচ্ছে না।" অবশ্যি মুনাফাবাজরা এই নয়া হুজুগের সুযোগ নিয়ে পয়সা লুটছে, তার নিন্দা করলে প্রগতিশীলরা আপত্তি করেন না। এই তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। শুধু বলি, ইউরোপের এক নয়নাভিরাম রূপ দেখেছিলাম। সে রূপ শুধু আমাদের মতো মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে আছে। আমরা ধনী নই, শুধু এই ধরিত্রীর সেই সব সন্তান, যারা শ্যামল মাটির হারিয়ে যাওয়া দক্ষিণ মুখটি খুঁজে ফেরে আর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসে।

পৃথিবীতে কিছু অনিন্দ্যসুন্দর বস্তু আছে, তার কিছু মানুষের হাতে তৈরি, কিছু প্রকৃতির দান। শত শত বছর ধরে দেখে দেখে, বহু কোটি মানুষের অন্তহীন স্তব শুনে শুনে তাদের পুনর্বিচার করা আমরা প্রয়োজন মনে করি না। অতিবোদ্ধারা মাঝে মাঝে এই সব রম্য বস্তুর দিকে ক্ষণিক দৃকপাত করে বলেন ক্লিশে বা কিৎস। তাজমহল-পিরামিড—'কিৎস', অভিভূত হওয়ার মতো কিছু না। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলি বা দেবতাত্মা হিমালয়ের মহীয়ান রূপ 'ক্লিশে'। পাঁচ-শ' হাজার বছর শুনে শুনে সবাই সকলের সুরে সুর মেলায়, বলে "আহা কী অপূর্ব!" এ ধরনের আঁতলামিতে সামিল হতে আমি নারাজ। বহু শত বছর ধরে যা মানুষের অঞ্জলি পেয়ে আসছে তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই, সত্যিই রমণীয় বলে আমার বিশ্বাস। ব্যতিক্রম যদি থাকে তা আমার নজরে পড়েনি। সুইৎজারল্যান্ড থেকে আল্পসের ভিতর দিয়ে ইতালি প্রবেশ করার সময় আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম, কারও কথা শুনে নয়, প্রকৃতির এমন গরিমা এত কাছ থেকে দেখার এর আগে কখনও সৌভাগ্য হয়নি বলে। শুধু সিমপ্লন পাসের লম্বা লম্বা টানেল মাঝে মাঝেই রসভঙ্গ করছিল।

ইউরোপের মধ্যে দেখবার জন্য যদি একটি কোনও দেশ বেছে নিতে হয়, তো সে দেশ নিঃসন্দেহে ইতালি। এখানে ইউরোপীয় সভ্যতা আর কৃষ্টির সব কিছুই আছে। রোমানদের আবির্ভাবের অনেক আগে এর দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রিকরা এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। উত্তরে এট্রুসকানদের রহস্যময় সভ্যতা, সেও রোমের অভ্যুত্থানের আগে। রোমের সাম্রাজ্য, পরে খ্রিস্টধর্মকে ভিত্তি করে মধ্যযুগের সভ্যতা, তার চেয়েও স্মরণীয় ইউরোপের রেনেসাঁস, এমনকী অত্যাধুনিক যুগের সিনেমা থেকে শুরু করে পোশাক-আশাকের ফ্যাশন—ইতালিতে সবই পাওয়া যাবে। আর রন্ধনশিল্প? এত সামান্য জিনিস দিয়ে যে এত অপূর্ব স্বাদ সৃষ্টি করা যায় এক বাঙালি আর ইতালিয়ানরা ছাড়া এই আশ্চর্য আবিষ্কার আর কেউ করতে পারেনি। আমাদের ভাতের মতো ওদেরও খাদ্যের প্রথম ভিত স্টার্চ—ময়দায় তৈরি পাস্তা আর চালেরই নানা রকমফের করে রিসোত্তো। সামান্য পয়সায় রাস্তার পাশের ত্রাত্তোরিয়া পিৎসেরিয়ায় খেয়ে যে তৃপ্তি পেয়েছি তা লিখে বোঝান কঠিন। আহারের ব্যাপারে মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশ পাথর ফরাসিদের হাতেও আছে, কিন্তু ওদের নজরটা আসলে একটু উঁচুর দিকে। ওয়াইন, ক্রিম, ট্রাফল, কাভিয়ার ইত্যাদি মহার্ঘ সব

উপাদান, দামি মাংসের কাট—এ সব ছাড়া তেনাদের মন ভরে না। একটুকরো রুটি, একটু অলিভের তেল, আধখানা বিলিতি বেগুন আর এক মুঠো তুলসীর পাতা দিয়ে যে অমৃত সৃষ্টি করা যায়—এ হুনুরি ফরাসিদেরও নেই। ইতালির সর্বত্রই সভ্যতার স্মরণীয় সব সৃষ্টি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। সেই বিপুল ঐশ্বর্য অল্প কয়েক দিনে কিছুই দেখা হয় না। তিন সপ্তাহের মতো সৌন্দর্যের সেই বাঁশবনে আমি বাংলা প্রবাদবাক্যের দৃষ্টিহীন ডোমের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হয়েছিল—নেশার ঘোরে ঘুরছি। এত রূপ, এত রূপ—এর কি শেষ নেই?

ইতালি ভ্রমণকারীদের জন্য গাইড বুক লেখার উৎসাহ বা ক্ষমতা আমার নেই। বর্তমান রচনাটি নেহাতই একটা ব্যক্তিগত বিবৃতি। তাই অল্প ক'টি জিনিস, যা এখনও চোখ বন্ধ করলে মানসচোখে ভেসে ওঠে তার কথাই বলব। ইতালিতে সৌন্দর্যে আসাধারণ শহরের ছড়াছড়ি। যে-শহরটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, সে হল ভেনিস। খালের পাড় ধরে মানুষের আবাসন তো আগেও দেখেছি। সুন্দর শহর হিসাবে ডেলফটের খ্যাতি কম নয়। কিন্তু ভেনিসের সঙ্গে তুলনীয় শহর পৃথিবীতে আর নেই বলেই আমার বিশ্বাস। আমস্টার্ডাম ধনী বুর্জোয়ার আবাসস্থল। ভেনিসে সেই বুর্জোয়া শ্রেণি মধ্যবিত্ততার সীমানা ছাড়িয়ে আভিজাত্য অর্জন করেছিল। ওই জীর্ণ প্রাসাদের সমারোহ আর কি কোথাও আছে? তারা যেন কালের আক্রমণ উপেক্ষা করে ঐশ্বর্য, সুরুচি আর আভিজাত্যের গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সান মার্কোর পিয়াৎসা? দোজের প্রাসাদ আর সন্ত মার্কের নামে তৈরি বাইজেন্টাইন শৈলীর ক্যাথিড্রাল ঐশ্বর্য আর শিল্পদক্ষতার চরম নিদর্শন হয়ে বেঁচে আছে। মধ্যযুগের শেষ ভাগে ভেনিসের বন্দরে পূর্ব দেশের মহামূল্য বাণিজ্য সামগ্রী এসে জমা হত। রাষ্ট্রপ্রধান দোজে প্রতি বছর সমুদ্রে সোনার আংটি ফেলে দিয়ে ভেনিসের সঙ্গে সমুদ্রের বিবাহবন্ধন দৃঢ়তর করতেন। আর খালের উপরকার ছোট ছোট পুলগুলি? তারাও সামান্য কারুকার্যে মনোরম। শুধু ভেনিসের সবচেয়ে খ্যাতনামা শিল্পী টিশিয়ানের ছবি দেখে খুব আনন্দ পাইনি। বড় বিরাট, ছবির চরিত্রগুলি বড় বেশি পেশীবহুল। তবে এটা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এ-কথার শিল্পবিচার হিসাবে কোনও দাম নেই।

ভেনিস থেকে ট্রেনে ফ্লোরেন্স। ট্রেন লেক গার্দার পাশ দিয়ে যায়। লোকে বলে এই অঞ্চলটা সুইৎজারল্যান্ডের মতো। আমার তা মনে হয়নি। এক কারণ এখানে সোজাসুজি উঁচু পাহাড় চোখে পড়ে না। প্রকৃতি যেন এখানে কিছুটা মৃদুভাষী। "অয়ম অহম ভো" বলে মানব সন্তানকে ধমক দিচ্ছে না।

যদি বলা হয় ইতালির সাংস্কৃতিক রাজধানী রোম নয়, ফ্লোরেন্স—তা হলে সম্ভবত ভুল হয় না। প্রাসাদে, গির্জায়, পিয়াৎসায়, ছবিতে, মূর্তিতে—মানুষের সৃষ্ট অন্তহীন সৌন্দর্যে রমণীয় এই শহর। স্মৃতির ভাণ্ডারে তার অল্প কিছুই অবিনশ্বর হয়ে আছে। নিখুঁত যৌবনের ছবি মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড, ওঁরই অন্য সৃষ্টি দিন আর রাত্রির প্রতিমূর্তি, উফিৎসি সংগ্রহালয়ে বত্তিচেলির প্রিমাভেরা আর আর্নোর উপরে সেই বিখ্যাত ব্রিজ। যদি কেউ বলেন—এ আর তুমি নতুন কথা কী বললে? এ তো সবারই ভাল লাগে! তা হলে আমার উত্তর, "ঠিকই বলছেন। আমি সাধারণ মানুষ। যুগান্তকারী আবিষ্কার আমার সাধ্যের বাইরে।

মানুষ আর প্রকৃতির সৃষ্ট কিছু বস্তু অপূর্ব সুন্দর। এ-কথা শৈশব থেকে শুনে আসছি। তার কিছু দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। শুধু আমার সেই সৌভাগ্যের কথা পাঠককে জানাচ্ছি।" কিছু জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। আর সকারণ খ্যাতি সত্ত্বেও মানুষের অনেক কীর্তি মনকে নাড়া দেয়নি। সেই সব স্মৃতিরই কিছু কিছু এখানে লিখলাম। ভাল-মন্দ বিচার পাঠকের হাতে।

উত্তর ইতালির ছোট ছোট শহরগুলির পথে পথে অনেক ঘুরলাম—পিসা, ভেরোনা, সিয়েনা। এরা সবই এখন ট্যুরিজম-বলয়ের অন্তর্গত। তার ফল কী হয়েছে বলি। কয়েক বছর আগে একবার ফ্লোরেন্স গিয়েছিলাম। উফিৎসি গ্যালারি দেখতে গিয়েছি। দেখি লম্বা কিউ। অন্তত এক মাইল হবে। ঘণ্টাখানেক কিউভে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে চলে এলাম। এই সব উৎসাহের নিদর্শন কি সত্যি সংস্কৃতি-তৃষ্ণার প্রকাশ, না নিতান্তই গণহুজুগের ফল? এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। হয়তো শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে এই উৎসাহের সত্যিতেই কিছু সম্পর্ক আছে। আশাবাদী মানুষ হিসাবে সে কথা ভাবতেই আমার ভাল লাগে।

ইতালিতে সামান্য দামে যত্রতত্র ঘোরার একটি ট্রেন টিকিট পেয়েছিলাম। যেখানে ইচ্ছে হত নেমে পড়তাম। তারপর আবার রেলগাড়ি চড়ে চরৈবেতি চরৈবেতি। এইভাবে একদিন রোম পৌঁছলাম। বিরাট শহর, দ্রষ্টব্যর পরিমাণ বড় বেশি। ভ্যাটিকানের সংগ্রহালয়ে যেন শ্বাসরোধ হয়ে এল। বিখ্যাত সিসটিন চ্যাপেল দেখলাম। কিন্তু ততক্ষণে এত ক্লান্ত যে মাইকেল এঞ্জেলোর অসাধারণ কীর্তি চেতনায় কোনও দাগ রাখল না।

চরৈবেতি চরৈবেতি। ভূস্বর্গ যে নিছক কল্পনা নয়, নেপলস উপসাগরের তীরে সোরেনটো শহরে এসে সেই সত্য আবার উপলব্ধি হল। সমুদ্রের ওই নীল রঙের তুলনা আর কোথাও দেখিনি। মনে হয়, ওই জলে হাত দিলে হাতের রঙ নীল হয়ে যাবে। শুধু কি নীল? দিনের আলোর রঙ যত বদলাতে থাকে জলের রঙও তার সঙ্গে তাল রেখে বদলায়। কোথাও সবুজ, কখনও আসমানি রং, কখনও প্রায় গাঢ় বেগুনি। সোরেনটো থেকে বাসে চেপে সমুদ্রের পাড় ধরে আমালফি, পোসিটানো। পৃথিবীটা সত্যি এত সুন্দর? ঈশ্বরবিশ্বাসীরা কেন জগৎস্রষ্টা কল্পনা করেন, কিছুটা যেন বুঝতে পারলাম। ইতালির চলতি প্রবাদ, "ভেদি নাপোলি এ পোই মোরি।" নেপলস দেখে তবেই মৃত্যুকে বরণ করো। অর্থাৎ নেপলস না দেখে মৃত্যু যেন না হয়। সে বক্তব্যর লক্ষ্য শুধু নেপলস শহর না, এই বহুবিস্তৃত অনিন্দ্যসুন্দর বেলাভূমি। আমালফির লোকেরা বলে—স্বর্গে গিয়ে খুব কিছু তফাৎ বুঝবে না। দেখবে এখানকারই মতন। যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে তা কি সত্যিই আমালফির সঙ্গে তুলনীয় হবে? সেই আমালফি সম্প্রতি আবার গিয়েছিলাম। হোটেলে আর ধনীভবনে সেই অপূর্ব সুন্দর সমুদ্রতীর প্রায় চাপা পড়েছে। কার্লো পন্টি কোন বাড়িটা সোফিয়া লোরেনকে যৌতুক দিয়েছিলেন, কোন বাড়িতে রজার মুর বাস করেন—ট্যুরিস্ট গাইড সে সব আঙুল দিয়ে দেখালেন। কিন্তু যে-আমালফি থেকে নন্দনভূমিতে গিয়ে কোনও তফাত চোখে পড়ত না, সেই আমালফি আর খুঁজে পেলাম না। তবু সমুদ্র সমুদ্রই আছে। এক সন্ধ্যায় দিগন্তে যে-রঙের খেলা দেখলাম তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। গভীর নীল আর গাঢ় গোলাপি মিলিয়ে দিগ্‌বধূরা রং খেলছেন। সে খেলায় আকাশ আর সমুদ্র দুজনেই যোগ দিয়েছে। কোথায়

আকাশ শেষ হয়ে সমুদ্র শুরু হয়েছে, তা আর বোঝার উপায় নেই। জীবন সার্থক হল। হে অদৃষ্টপুরুষ, আমার নেপলস দেখা হয়েছে। এখন যদি তুমি আমার প্রাণহরণ করো, আমার কোনও ক্ষোভ নেই।

নেপলস থেকে আবার ট্রেন ধরে ব্রিন্দিসি। সেখানে এথেন্স তথা ক্রিটের জাহাজ ধরলাম। এ জাহাজের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এথেন্স পর্যন্ত এটি শখের যাত্রীদের জাহাজ। তার মধ্যে ট্যুরিস্ট ছিল, স্থানীয় মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত লোকও ছিল। টিকিটের দামের মধ্যে আহার্যের দামও ধরা। ডাইনিং রুমে তিনবেলা চর্ব্যচূষ্য খাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু এথেন্সের পর এ জাহাজ আর ট্যুরিস্ট জাহাজ থাকে না। লোকাল ট্রেনের মতো লোকাল জাহাজে পরিণত হয়। পথে ছোট-বড় নানা দ্বীপে থামতে থামতে ঢিমে তেতালা চালে এগোতে থাকে। দেখলাম ব্রিন্দিসি থেকে যে সব যাত্রীরা উঠেছিল, এক আমি ছাড়া আর সবাই এথেন্সে নেমে পড়ল। ওখান থেকে যারা উঠল, তারা সব জোরবা দা গ্রিক নামক ছবির চরিত্র। পোশাক-আশাক বেশ ধূলিধূসর, দাড়ি বোধ হয় মাসে এক দিন কামায়, অনেকেরই সঙ্গে ছাগল-মুর্গি আর সবাই আহার্য সঙ্গে করে এনেছে। বোঁচকা খুলে যথা সময়ে মোটামোটা রুটি আর কিছু শুকনো শুকনো মাংস বের করে গলাধঃকরণ করে। শুধু একজন যাত্রীর জন্য ডাইনিং রুম খোলা রাখার কোনও মানে হয় না। তাই কর্তৃপক্ষ বললেন—আমার আপত্তি না থাকলে যেখানে সিট পেয়েছি খাবারটা সেখানেই এনে দেবেন। এতে আর আপত্তির কী থাকতে পারে?

গোলমালটা কোথায় একটু দেরিতে বুঝলাম। ওয়েটার লাঞ্চের সময় যথারীতি তিন পদ খাবার নিয়ে এল। অবশ্যই এক সঙ্গে না, যথাক্রমে। মুর্গি-ছাগলের মালিক সহযাত্রীরা বেশ দ্বিধাবর্জিত কৌতূহল নিয়েই ব্যাপারটা দেখতে লাগল। প্রথম পদ, দ্বিতীয় পদ পর্যন্ত এক রকম চলছিল। কিন্তু ওয়েটার তৃতীয় পদ নিয়ে ঢুকতেই যৌথ অট্টহাস্য। সে হাসি আর থামে না। একটা মানুষ পর পর তিন পদ খায়। এবং সে খাবার একাদিক্রমে ওয়েটার নিয়ে আসে, এইসব গ্রামবাসী মানুষ বোধ হয় এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি। লজ্জায় সত্যিই কুঁকড়ে গেলাম। ভাবলাম—পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে আমরা যারা শতকরা সত্তর-আশি জনের তুলনায় সৌভাগ্যবান, তাদের জীবনযাত্রা যে কত হাস্যকর, এ কথা আমাদের খেয়াল থাকে না। মনে মনে আমি আমার সহযাত্রীদের ধন্যবাদ জানালাম।

ক্রিটও এখন ট্যুরিস্টদের বিলাসভূমি হয়েছে। ১৯৫৭ সালে দ্বীপটির বন্য চেহারা যায়নি। মানে এখনকার মতো ওখানে গিয়ে ভিলা ভাড়া করে থাকবার সুব্যবস্থা তখন ছিল বলে জানি না। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা ওখানে ছিলাম, জাহাজেই থাকতে হয়েছিল। তার একটা কারণ অবশ্যি অর্থাভাব। আমার ক্রিট যাওয়ার উদ্দেশ্য একটাই। ক্নসস-এ মিনোয়ান যুগের প্রত্নকীর্তি দেখা। মিনোয়ান কথাটা অবশ্য একেবারেই রূপকথা থেকে নেওয়া। তার কোনওই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। গ্রিক উপকথায় এক কাহিনি আছে যে, মিনস নামে কোনও রাজা এক প্রাসাদ বানিয়েছিলেন যা অনেকটা গোলকধাঁধার মতো। সেই সুবাদে তার নাম ল্যাবিরিন্থ। আর সেই ল্যাবিরিন্থের অন্তস্থলে মিনোটর নামে এক প্রাণীর বাস। তার দেহটি ষাঁড়ের, কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গ মানুষের। এই দানবকে রোজ খাদ্য জোগাতে হত—একটি তরুণ বা তরুণী। গ্রিক বীর থিসিউস রাজকন্যা মিডিয়ার সাহায্যে ল্যাবিরিন্থের ভিতরে ঢুকে

মিনোটরকে সংহার করেন। ইংরাজ প্রত্নতাত্ত্বিক এভানস ক্লসসে খনন করে এক বিশাল প্রাসাদ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, প্রাসাদটির মালিক ছিলেন রাজা মিনস আর এই সেই উপকথার ল্যাবিরিন্থ। তাতেও তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু খোদার উপর খোদকারি করে খননের ফলে যে সব বাড়িঘর পাওয়া গিয়েছিল, তার কিছু কিছু সংস্কার করে মিনসের প্রাসাদ তিনি কিছুটা পুনর্নির্মাণ করেন। মিনোটরকে যে এভানস সাহেব পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করেননি, এ জন্য সকলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁর সত্যিকার কীর্তি সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরানো ওই প্রাসাদ পুনরাবিষ্কার। সমস্ত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এর তুলনীয় কিছু নেই। ক্রিটের এই প্রাচীন সভ্যতা এখনও রহস্যে ঢাকা। সেটা গ্রিস অঞ্চলের সভ্যতার পূর্বাভিযানের স্মারক, না মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার পশ্চিমি প্রত্যন্তদেশ সে সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। প্রত্নবস্তু যা পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ক্রিটের সভ্যতা স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। তার সঙ্গে হুবহু মেলে এমন অন্য কোনও সভ্যতা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ক্লসসের প্রাসাদ ক্রিটে পাওয়া প্রাসাদগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ওটি দেখতেই আমার বোঁচকা কাঁধে ক্রিট অভিযান।

এভানস সাহেবের সংস্কারকার্য আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে বর্বরতারই রকমফের। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ দর্শক তার জন্য কিছুটা কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। অনেক হিসাব করে দেওয়ালে আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ইনি প্রাসাদের কিছুটা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। এ রকম করা চলে না ঠিকই কিন্তু প্রাসাদের যে চেহারা উনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেটা ভ্রমাত্মক না। সেই বহুতল প্রাসাদ, অতি প্রশস্ত সিঁড়ি, দেওয়ালে আগাগোড়া নিপুণ হাতে আঁকা ছবি আর রঙের প্রলেপ, তার গায়ে সূক্ষ্ম কাজ করা সব সভ্যতার নানা উপাদান, অলিগলি চলিরাম করে ঘরের পর ঘর নিয়ে ল্যাবেরিন্থ—দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে, সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার জীবনযাত্রার চিহ্ন এখানে ধরা রয়েছে। মিশরের বাইরে এত প্রাচীন জীবনযাত্রার এত বিশদ স্মারক আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। আর মিশরেও সব কিছুই দেবতা বা মৃত মানুষের জন্য তৈরি। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তৈরি কোনও প্রাসাদ দাঁড়িয়ে নেই। ফারাওরা মাটির বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু এই আশ্চর্য সভ্যতার স্রষ্টা কারা? তিনটি বিভিন্ন ধরণের 'বর্ণমালা' ক্রিটের সিলে আঁকা আছে। তার একটিরই (লিনিয়ার বি) শুধু পাঠোদ্ধার হয়েছে। তার ভাষা গ্রিক। তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, মিনোয়ান সভ্যতা গ্রিক সভ্যতারই অন্যতম আদি পুরুষ। আর এভানস সাহেব যে রানির ঘর, রাজার দরবারখানা ইত্যাদি বলে এক একটা ঘরকে নির্দিষ্ট করেছেন, তার কোনও ভিত্তিই নেই। ওখানে রাজতন্ত্র ছিল, না পুরোহিততন্ত্র তাও জানা যায় না। দেখে দেখে শুধু একটা কথাই মনে হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী মানুষ নাচে-গানে-খেলায়-রূপসজ্জায় সুখাদ্যে নানা ভাবে জীবনকে উপভোগ করতে জানে। তাদের এই রহস্যময় দ্বীপবাসী পিতৃপুরুষরাও জীবনরসের রসিক ছিলেন। এই ইতিবাচক বিবরণে শুধু একটা নেতিবাচক পাদটীকা দেওয়া দরকার। মিনোয়ানরা নরবলি দিতেন, তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে ইউরোপীয় সভ্যতার জনক গ্রিকদের উপকথায় তো দেবতাদের তুষ্টির জন্য সন্তান বলিদানের উল্লেখ পাই।

ওরিস্টিয়ান ট্রাজেডির সূচনা এগামেমননের কন্যাবলি দানে। সভ্যতা আর বর্বরতার মাঝখানকার সীমারেখা অনেক সময়ই অস্পষ্ট। গ্যয়টে-বাখের দেশেই নাৎসিবাদের জন্ম। মহাত্মা গাঁধী আর নরাধম মোদী একই সংস্কৃতির আওতায় মানুষ। সভ্যতা নিয়ে বেশি বড়াই না করাই ভাল। কোথায় কখন আমাদের রক্তকণায় হিংস্র শ্বাপদ পিতৃপুরুষের জিন সজীব হয়ে উঠবে তার হিসাব তো কেউ রাখেনি।

ক্লসস দেখে জাহাজে ফিরে এলাম। শুনলাম ওই জাহাজে তখন একমাত্র যাত্রী আমি। এ বেশ নতুন অভিজ্ঞতা। পরদিন সকালে আবার যাত্রী নিয়ে অন্যান্য দ্বীপ আর এথেন্সের পথে জাহাজ রওনা হবে। মাঝরাতে প্রচণ্ড আলোড়ন আর তার চেয়েও প্রচণ্ড বিবমিষা নিয়ে ঘুম ভাঙল। বুঝলাম সমুদ্রে ঝড় উঠেছে। স্কুলপাঠ্য বাংলা সিলেকশনে 'শ্রীকান্ত' থেকে তোলা সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনা পড়েছিলাম। যে বয়সে বিমল-কুমার-রামহরির সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার উচ্চাভিলাষ ছিল, সে বয়সেই সমুদ্রে ঝড় দেখারও ইচ্ছে হয়েছিল। আহা! এতদিনে সেই সাধ মিটল। মানে নভোতলবাসী কোনও বজ্জাত দেবতা ক্রুর হাসি হেসে (মনে রাখবেন ওইসব লোকের হাসি সব সময়েই ক্রুর) বেশ ভাল করেই শখ মেটালেন। জাহাজ খোলা সমুদ্রে থাকলে হয়তো এতটা কষ্ট হত না। কিন্তু নোঙর ফেলা থাকায় সত্যিই মোচার খোলার মতো সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে অবিশ্বাস্য বেগে দুলতে লাগল। সে দুলুনির কোনও বর্ণনা সম্ভব না। মনে হল শুধু অন্নপ্রাশনের না, বেশ কয়েক পূর্বজন্মে যা কিছু খেয়েছি তা যেন স্মৃতির অতল থেকে উঠে এল। যখন পেটে কণামাত্র খাদ্যও অবশিষ্ট নেই, তখন পিত্ত এবং মনুষ্যশরীরে আর যা কিছু থাকে সবই যেন কণ্ঠনালী বেয়ে উঠতে লাগল। জীবনে নানারকম যন্ত্রণাদায়ক অসুখে ভুগেছি। কিন্তু ওই রাত্রির তুলনীয় শারীরিক যন্ত্রণা কখনও ভোগ করিনি। মাঝে এক সারেং এসে দেখে গেল—জাহাজের একমাত্র যাত্রীটি জীবিত, না মৃত। মৃত হলে তাকে জলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "জাহাজ কি ডুবছে?" উত্তর, "তা নোঙর ফেলা থাকলে ডোবার সম্ভাবনা আছে। আর কিছুক্ষণ দেখে কাপ্তান সাহেব নোঙর তুলে মাঝসমুদ্রে পাড়ি দেবেন।" বড় নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। এই প্রলয়ঙ্কর তুফানে মাঝসমুদ্র ছাড়া মানুষের আর আশ্রয়স্থল কোথায়? যন্ত্রণা তখন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে মরিয়া হয়ে ইসলামি মৃত্যুদূত মালেক-উল্-মওতকে স্মরণ করলাম। বললাম, "বাবা আর জ্বালিও না। যেখানে নেবার এবার নিয়ে যাও। বেঁচে থাকতে নরক যন্ত্রণা সওয়াবে, এ আবার কোন আহ্লাদ?" আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম এ যাত্রা যদি বাঁচি, আর কখনও কোনও জাহাজের ধারে কাছে যাব না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র শান্ত হল। শরীরের সব যন্ত্রণা যেন এক মুহূর্তে চলে গেল। হাসি মুখে ডেকে উঠে এসে কাপ্তান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "জাহাজ কখন ছাড়ছেন?" মনে ভাবলাম, আমি সত্যিই মিসেস দাস-বর্ণিত সেই 'নির্লজ্জ বেহায়া'।

ছোটবেলায় শোনা এক বরিশালি পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি মনে পড়ল। এক কাক গাব খেয়ে গাবের আঁঠায় বদ্ধচঞ্চু। মনে মনে বলছে, হে ঈশ্বর, এ যাত্রা রেহাই দাও। নাকে খত দিচ্ছি, এ যাত্রা রেহাই পেলে আর গাব খাব না, আর ওমুখী হব না। ঈশ্বর-কৃপায় ঠোঁট খুলে গেল। তখন কাকের সনৃত্য সংগীত, "গাব খামু না খামু কী? গাবের তুল্য আছে কী?" এই কাহিনি

ইতিহাস দর্শনের গোড়ার কথা। হেগেল লিখেছিলেন, "ইতিহাসের একমাত্র শিক্ষা একটাই। সে শিক্ষা এই : মানুষ তার অতীত থেকে কোনও শিক্ষাই লাভ করে না।"

দেড় দিন পর এথেন্স পৌঁছলাম। এই স্থলযাত্রা কাহিনির বাঁধা দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে একটি অবশ্যকর্তব্য উল্লেখ করা হয়নি। আমার যাবতীয় টিকিট ইত্যাদি কেনা হয়েছে টমাস কুকের মারফত। সুতরাং আইনত 'ঠাস কুক' এখন আমার গার্জিয়ান হ্যায়। সেই গার্জিয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে কোনও চিঠিপত্র এলে তা তারা পোস্ট রেস্তাঁতে রেখে দেবে। সুতরাং দিনের মধ্যে কখনও সুবিধেমতো গিয়ে চিঠিপত্রের খোঁজ করে আসতে হত। এর মধ্যে দেশের খবর টুকরো-টাকরা "আমরা ভাল আছি, তুমি কেমন আছ জানিও" গোছের চিঠিতে পেয়েছি। মা-বাবার চিঠিতে বুঝতে পারি তাঁরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। এখানেও সেই জীবনের চিরন্তন ট্র্যাজেডি। শাস্ত্রে বলে, স্নেহ নিম্নগামী। ওঁদের চিঠিতে যে ব্যগ্র উদ্বিগ্ন অপেক্ষার প্রকাশ, সাড়ে তিন বছর পর দেশে ফিরছি বলে আমি তো তার তুলনীয় কোনও উত্তেজনা অনুভব করছি না! পরিণত বয়সে নিজে যখন পিতৃত্বের আনন্দ এবং উদ্বেগে আকুল হয়েছি, তখন আমারও তো অনুরূপ অভিজ্ঞতাই হয়েছে। আবেগের বিনিময়ে প্রকৃতি কোনও ভারসাম্যর ব্যবস্থা রাখেনি। শুধু নরনারীর প্রেম সম্ভবত তার একমাত্র ব্যতিক্রম। তাও বোধহয় অল্প দিনের জন্য।

যখন দেশ ছেড়ে আসি তখন আমার চেয়ে বয়সে আঠারো বছরের ছোট ভাই অপু আকুল কান্না কাঁদছিল। সে দিন রাত্রে তাকে কিছুতেই কিছু খাওয়ানো যায়নি। এখন সে তেরো বছরের 'টিন এজার'। নানা জিনিসের ফর্দ পাঠিয়েছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভাইঝি বুবুর বয়স তখন ছিল কয়েক মাস। এখন সে সাড়ে তিন বছরের মেয়ে। চিঠিতে খবর পাই সে বেশ গিন্নিবান্নি হয়েছে। আমার ছোট বোনের বিয়ে হয়েছিল আমার বন্ধু শৈলেন সেনের সঙ্গে। আমি চলে আসার পর তার বড় মেয়ের জন্ম হয়েছে। তারও বয়স এখন প্রায় তিন। সাড়ে তিন বছর বিদেশবাস মানে দেশের চলমান জীবন থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়া। ফিরে গিয়ে সেই পুরনো পরিবেশ কেমন লাগবে জানি না।

এথেন্স পৌঁছে মনে হল, সেই পরিবেশের বেশ কাছে এসে গিয়েছি। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে যাই হোক, আমার চোখে ১৯৫৭ সালের এথেন্স তৃতীয় জগতের অংশ বলেই মনে হয়েছিল। মুদির দোকানের সামনের রাস্তায় পেঁয়াজ আর আলুর ছালা দেখে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। শহরের কিছু উপরে পাহাড়ের গায়ে পার্থেনন আর অ্যাক্রোপোলিস দাঁড়িয়ে আছে। ভাঙাচোরা হলেও শিল্পরুচির চরম বিকাশে মহিমান্বিত। কিন্তু সক্রেটিসও কি পেঁয়াজের বস্তার পাশ কাটিয়ে আগোরায় গিয়ে জ্ঞানবিতরণ করতেন? ওঁর সময়ে কি রাস্তায় ধুলোবালি কিছু কম ছিল? প্রাচীন জগতের যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, এখনকার তুলনায় শহরের রাস্তাঘাট অনেক পরিষ্কার ছিল। গ্রিস হোক বা ভারত হোক—প্রায় সব দেশ সম্বন্ধেই বোধ হয় এ-কথা সত্যি। তবে একটা কথা মনে রাখা ভাল। হেরোডোটাস অবজ্ঞার সঙ্গে লিখেছেন, মিশরের লোকেরা সত্যিই বর্বর। প্রকৃতির সঙ্গে

আলাপচারিতার জন্য তাদের বসতবাড়ির ভিতরেই একটা ঘর আছে। ছ্যা ছ্যা ছ্যা। কী করবে? বর্বর জাতি বলে কথা। সভ্য গ্রিকদের মতো কাজটা রাজপথের পাশে সেরে নিতে জানে না।

এথেন্স থেকে ইস্তাম্বুলের ট্রেনে উঠলাম। তখন দক্ষিণ সাইপ্রাস কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে গ্রিস এবং তুরস্কর মধ্যে জবর গোলমাল চলছে। এর আগে সাইপ্রাস ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে গিয়ে গ্রিসের অন্তর্গত হতে চাওয়ায় সাহেবরা বিশেষ ব্যাজার হয়েছিলেন। এমন কথাও কেউ কখনও শুনেছে? ইংরেজ রাজত্বে কী সুখে আছিস তা তোদের কোনও ধারণা নেই। সত্যি বলতে কি যারা এই সুখে ছিল, তারা কেউই নিজেদের সুখটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। সাইপ্রাসে কিছু ছেলে-ছোকরা ব্যাপারটা এতই কম বুঝেছিল যে তারা বোমাবাজি শুরু করে দেয়। অগত্যা তাদের কটাকে পটাপট গুলি করে মারতে হয়, কিছু লোককে ধরে জেলে ঢোকাতে হয়। ইংরেজরা স্বভাবত উদারপন্থী। এসব করতে কি তাদের ভাল লাগে? কী করবে? কঠোর কর্তব্যর খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়। ইংরেজদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যেখানে গেছে সেখানেই কিছু লোক মেরে ধরে জেলে পুরে লোকের উপকার করতে হয়েছে। যাকগে, সাইপ্রাসের সমস্যা যখন কিছুটা মিটে এসেছে তখন দক্ষিণ সাইপ্রাসের তুর্কি জাতীয় মানুষরা বললেন, আমরা কেরেশ্চানদের অধীনে থাকব না। আম্মো স্বাধীন হব। আবার বোমাবাজি রক্তারক্তি—সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড। এ সব যখন চলছে, তখন একদিন আমি এথেন্স থেকে ইস্তাম্বুলের ট্রেনে উঠলাম।

ও ট্রেনে ওঠার লোক তখন বেশি নেই। কম্পার্টমেন্টটা প্রায় খালি দেখে মহানন্দে বেঞ্চিতে ঠ্যাং তুলে বসলাম। এমন রাজকীয় সুখ এই যাত্রা এর আগে হয়নি। কিন্তু অহো! পাঠিকা! পাঠক! জাগতিক সুখ সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী। গ্রিক টিকিটবাবু একটু পরেই এসে রূঢ়ভাবে ইঙ্গিত করলেন, পা নামাও। তুমি কোন লাটের বাচ্চা হে! গাড়িতে অন্য লোক না থাকলে জুতো খুলে পা বেঞ্চিতে তুলে বসায় আন্তর্জাতিক আইনে কোনও নিষেধ আছে বলে আমার জানা ছিল না। কিন্তু রাস্তাঘাটে ঝামেলা করতে নেই। বিশেষ করে ভাষা না জানা থাকলে। তাই মানে মানে সুখশয্যা ছেড়ে খুদে নেপোলিয়নের আদেশমতো পা নামালাম। এরপর বুঝলাম, আসল গোলমালটা কোথায়। গ্রিক টিকিটবাবু ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে বললেন, 'তুর্কেইয়া?' আমি গ্রিক ভাষায় আমার জানা একটিমাত্র শব্দ সগর্বে নিক্ষেপ করলাম 'ইন্দস'। সেই পুরনো কথাটা যা সেকেন্দর শা'রও আগে থেকে চলে আসছে, আর যার অপব্যাখ্যা করে সাম্প্রতিককালে কিছু বাঁদর আমাদের বড়ই জ্বালাচ্ছে। এই প্রাচীন শব্দটি উচ্চারণ করায় মন্ত্রের মতো কাজ হল। 'ইন্দস? ই-ন্দ-স!' আহা, ভাবের আবেগে টিকিটবাবু তখন বেপথুমান। মূকাভিনয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, "এত দিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য।" তারপর আমাদের দুজনেরই সুবোধ্য একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষায় আলাপ শুরু করলেন। "রাজকাপুর, মধুবালা, অশোককুমার, সুচিত্রা সেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। আহা! সেই নাম-সংকীর্তন আর শেষ হয় না। মনেপ্রাণে আমাদের চিত্রতারকাদের ধন্যবাদ জানালাম। ওঁদের কৃপায় আমাদের মতো কত অজ্ঞাত-অপাত্র দেশওয়ালি লোক দুনিয়ার মানুষের আদর খেয়ে বেড়াচ্ছি। রাশিয়া থেকে তাহিতি, চিন থেকে দক্ষিণ

আমেরিকা—সর্বত্রই ওঁদের পরিচয়েই আমাদের পরিচয়। ওঁরা কি হেলাছেদ্দা করার মতো মানুষ! আমার এক পরিচিত বোম্বাইয়া (থুড়ি, মুম্বাইয়া হবে) চিত্রপরিচালকের ঘরে শুধু তিনটি ছবি ছিল—রাজেশ, গণেশ আর ধর্মেন্দ্র। মানে ওঁদের কৃপায়ই ওঁর যা কিছু সুখ-সমৃদ্ধি। গণেশের ছবিটা অবশ্য এলেবেলে। দেবতাদের একেবারে কোল্ড দেওয়া ঠিক না, তাই রাখা। আমি সম্প্রতি ছোট-বড় যাবতীয় চিত্রতারকাদের ছবির এক এক কপি করে অর্ডার দিয়েছি। তাড়কাদেরও বাদ দিইনি। কখন কী কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। দেখি, ওঁদের কৃপায় কপাল ফেরে কি না।

দিন দুই ট্রেনে সিটের উপর পা তুলে ঘুমিয়ে (টিকিটবাবু মাঝে মাঝেই এসে দেখে গ্যাছেন মধুবালার এই দেশবাসীর সুখ অব্যাহত আছে কি না) এক সকালে ইস্তাম্বুল পৌঁছলাম। নামে ইউরোপ হলে কী হবে ওটা আসলে প্রাচ্য দেশ। সেই জন্যই তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানে ঢোকার ব্যাপারে বাকি ইউরোপিয়ানরা এত গোলমাল করছে। কবে তোরা মধ্য এশিয়া থেকে মার-মার করে এসে আমাদের কিছু পবিত্রভূমি কেড়েকুড়ে নিলি—আর তাতেই তোরা ইউরোপিয়ান হয়ে গেলি? বললেই হল! আরে আমাদের গায়ে যে এশিয়ার বর্বর জাতিদের রক্ত, সে অনেক আগেকার কথা। ইউরোপের বর্বরদের রক্ত মিশে তা অনেকদিন আগেই শুদ্ধ হয়ে গেছে। ও সব কথা এখন তুলে কোনও সুবিধে হবে, ভেব না।

যাকগে ইস্তাম্বুলের রাস্তায় ঢিলেঢালা ধরনধারণ দেখে বড্ড আরাম পেলাম। আঃ! এ তো কলকাতা এসে গেছি মনে হচ্ছে। ইউথ হস্টেলে বোঁচকাটি রেখে বাজারের ভিতর এক চায়ের দোকানে গিয়ে জমিয়ে বসলাম। সে কী সুখ। কারও কোনও তাড়া নেই। গায়ের উপর দিয়ে লোক ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে। কারও কোনও তাপোত্তাপ নেই। আর সবাই গলা খুলে কথা বলছে। মানে মানুষের যেমন ভাবে বাঁচা উচিত, সেই ভাবে সবাই চলে-বলে বেড়াচ্ছে। উহ্, সাড়ে তিন বছর ইংরাজি সভ্যতার চাপে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। ওই চাপাচাপা কথা, মৃদুমৃদু হাসি—কাঁহাতক সহ্য হয় মশাই! অনেকদিন পর হাত পা ছেড়ে বেশ গলা খাঁকারি দিয়ে চেয়ারে পা তুলে বাবু হয়ে বসলাম। কেউ ফিরেও তাকাল না। তামার থালায় করে ঘটির মতো চেহারার কাচের গ্লাসে দোকানির ছোকরা সাকরেদ চা নিয়ে আসছে। ভারতের বাইরে এত সুখের ব্যবস্থা কোথাও আছে তা কে জানত? চায়ে দুধ, চিনি দেওয়ায় এদের বিশ্বাস নেই। চায়ের রঙ রীতিমতো টকটকে লাল। মনে হল যেন অমৃত পান করছি।

ইউথ হস্টেলে ফিরে এক জোড়া খ্রিস্টীয় ধ্রুব-প্রহ্লাদের সঙ্গে পরিচয় হল। এই দুই সন্ত পুরুষ কেরালার সিরিয় খ্রিস্টান। পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে, কিন্তু কোনও জাগতিক বাসনা এঁদের নেই। কেন বের হয়েছ? "টু ক্লাইম্ব দা হাইটস এন্ড প্লাম্ব দা ডেপথস অফ আওয়ার লর্ড, জিসাস ক্রাইস্ট।" ধ্রুব জানালেন। প্রহ্লাদ বললেন, "আলেলুইয়া!" তারপর ওঁরা আমার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েন। আমার খাটের দু-পাশেই ওঁদের খাট। রাত্রে ঘুম ভাঙলেই ওঁরা ঈশ্বরের মহিমা স্মরণ করেন এবং করে অভিভূত হন। কখনও প্রহ্লাদ বলেন, "দা গড হু মেড আস ইজ আ গ্রেশাস গড!" ধ্রুব উতোর দেন, "আলেলুইয়া!" আর যদি ধ্রুব চাপান দেন,

"গ্লোরি বি টু গড অ্যান্ড হিজ ওনলি বিগটেন সান।" তো প্রহ্লাদের উতোর "আলেলুইয়া।" এইভাবে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে রাতটা কেটে যায়। তাঁর কৃপায় ভক্তদের না ঘুমালে কোনও অসুবিধে হয় না। বুঝলাম, নাস্তিককে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দুই ভক্তর তার দু'পাশে শোওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ঈশ্বরের মহিমায় আমারও একটু একটু 'ফেত' হতে শুরু করল। ভক্তযুগল আমারও অনুরক্ত ভক্ত হয়ে সারা দিনটাই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সুতরাং, আলেলুইয়া ধ্বনিতে আমার চেতনা আপ্লুত। তবে বাজারে দোনের কাবাব উওগোর্টলু কাবাব খেয়ে কষ্ট কিছুটা প্রশমিত হয়। এই সব জিনিস এখন ইউরোপের রাস্তাঘাটে বিক্রি হয়। কিন্তু দোনের কাবাবের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে ইস্তাম্বুল যেতে হবে। প্রায় কোনও মশলা না দিয়ে মেষমাংস কী অপূর্ব সুখাদ্যে পরিণত করা যায় তুর্কিরা তা দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের মোগলাই কৃষ্টির অনেক কিছুই তুর্কি আর ইরানিদের কাছ থেকে নেওয়া। তবে ভারতীয়কৃষ্টির স্পর্শে তারা নব কলেবর ধারণ করেছে। মোগলাই খানা সম্পর্কে এ-কথাটা বিশেষ করে সত্যি।

প্রাচ্য দেশে যে পৌঁছেছি তার নানা প্রমাণ পেলাম। ধ্রুব-প্রহ্লাদসহ একদিন বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি। এক ভদ্রলোকের হাতে ইংরিজি বই দেখে তাঁকে সুলতানদের প্রাচীন প্রাসাদ তোপকাপির পথ জিজ্ঞেস করলাম। ভদ্রলোক একটুও দ্বিধা না করে বললেন, "সে হবে এখন। এখন চল, আমার সঙ্গে খাবে। আমার মা খুব ভাল রাঁধেন।" এ রকম ঘটনা ইংল্যান্ডে তো নয়ই, ইউরোপে কোথাও হওয়া সম্ভব বলে মনে করি না। আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা জিন্দাবাদ। ভদ্রলোকের বাড়ি পৌঁছে দেখি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। মানে ওঁর মা গজর গজর করতে লাগলেন। বুঝলাম অকৃতদার মানুষটির এ সব ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞান কম। কিন্তু উনি বললেন, "তোমরা যা ভাবছ তা না। মা চটেছেন, তোমরা এসেছ সে জন্য না। যথেষ্ট খাওয়ার ব্যবস্থা করিনি দেখে।" এরপর মা সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। পুত্রর ভূমিকা শুধু অনুবাদকের। বক্তব্যটা খুবই সহজ। "আমার ছেলে একটি গর্দভ। লেখাপড়া শিখে ওর কোনওই উপকার হয়নি। অথচ আমার স্বামী একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। লোককে খেতে বললে যে ভালমন্দ বাজার করতে হয় এ-কথা কোনও দিনই বুঝল না। মানুষ ডেকে যা তা খাইয়ে বিদেয় করে। আসলে কিপটের জাশু। এমন বাপের এমন ছেলে কোত্থেকে যে হল!" খাওয়ার সময় ছেলের কার্পণ্যের প্রমাণ পেয়ে আমরা চমৎকৃত। অন্তত ছ'পদ খেলাম। সত্যিই অনবদ্য রান্না। আর ভদ্রমহিলা আগাগোড়া ছেলের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে গেলেন।

খাওয়ার পর ভদ্রলোক আমাদের তোপকাপি পৌঁছে দিলেন। মণিমুক্তা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় এ অভিজ্ঞতা আমার এর আগে হয়নি। সত্যিই সেই আলিবাবার কাহিনির ডাকাতদের গুহার মতো থুপ থুপ করে হিরা-পান্না-চুনি সব রাখা। সুলতানরা দরবারে বসে হাতের কাছে কিছু দশাসই সাইজের চুনিপান্না রাখতেন। রাজকার্য করার সময় ক্লান্তি বোধ হলে ওগুলো হাতে নিয়ে মানসিক শান্তি পেতেন। পাবারই কথা। প্রাসাদটি আসলে সমুদ্রের উপরে। সুলতানদের হারেমে রমণীর সংখ্যা একটু বেশিই হত। মাঝে মাঝে সম্রাটের মুখ বদলাবার ইচ্ছে হলে পুরনো উপপত্নীদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে শোনা

যায়। মানে রাজকীয় বাসনা মেটাতে রাজপ্রাসাদেও স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা হত। এই কাহিনি সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু গাইড তোপকাপির মেঝেতে একটা বিশেষ জায়গা দেখিয়েছিলেন। মেঝের পাথর সরালেই নাকি নীচে সমুদ্র। আর বাতিল উপপত্নীদের শোনা যায় ওই পথেই সদ্গতি হত।

ইস্তাম্বুল শহর হিসাবে অদ্বিতীয়। এভাবে ইউরোপ আর এশিয়ার সন্নিবেশ আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য, তার পরেরকার বাইজেন্টাইন সভ্যতা, ওসমানলি তুর্কি রাজবংশের দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য, যা একসময় সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করতে গিয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে কামাল আতাতুর্কের তুর্কিদের পশ্চিমীকরণের প্রচেষ্টা— সব কিছুই অপূর্ব সুন্দর শহরের গায়ে চিহ্ন রেখে গেছে। বিখ্যাত বাইজেন্টাইন গির্জা সান্তা সোফিয়া আয়া সোফিয়া নাম নিয়ে মসজিদে পরিণত হয়েছে— পরে কামালের রাজত্বে মসজিদ থেকে জাদুঘর। তার জানালায় বিরাট অক্ষরে লেখা আল্লা মোহাম্মদ। শহরে স্ত্রী-পুরুষ সবার অঙ্গেই পশ্চিমি পোশাক। কিন্তু ওখানে বারবারেই সেই ফিল্মি গানটি মনে পড়েছে— "মেরা জুতা হ্যায় জাপানি, পাতলুন ইংলিশস্তানি। শরপে লাল টোপি রুশি। ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি"। আতাতুর্ক তুর্কিদের পোশাক বদলে দিয়েছেন, ইউরোপীয় ভাষা শিখিয়েছেন, কিন্তু ওদের প্রাচ্যদেশীয় দিলটি একই আছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম ইরানের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের পথে দেশে ফিরব। কিন্তু তখন তুর্কি-ইরান সীমান্তে কিছু গোলমাল চলছিল। তাই সে ইচ্ছে ত্যাগ করে বসরা থেকে জাহাজে ফেরা ঠিক করি। শুনলাম ধ্রুব-প্রহ্লাদও একই জাহাজে ফিরবেন। কিন্তু তাঁরা বাসে যাবেন বসরা অবধি। যিশুর উচ্চতা এবং গভীরতা মাপবার সুবিধে হবে বলেই নাকি ওঁরা ওই কষ্টকর পথ বেছে নিয়েছেন। এক বিরাট ট্রাঙ্ক টানতে টানতে ওঁরা একদিন বের হয়ে গেলেন। আর ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। আমার ধারণা, যিশু তাঁর ভক্তদ্বয়কে তুরস্ক সীমান্তে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। ওখানে তখন রীতিমতো গোলাগুলি চলছিল।

তুরস্কবাসীরা যে প্রাচ্যের লোক, তার আর এক প্রমাণ পেলাম যেদিন তুরস্ক ছাড়ছি সেই দিন। ফেরি জাহাজে বসফরাস পার হয়ে ও পাড়ের হায়দারপাশা স্টেশন থেকে টরাস এক্সপ্রেস ধরব। সেই ট্রেন আমাকে ইস্তাম্বুল থেকে সোজা বাগদাদ নিয়ে যাবে। কিন্তু সব জায়গায়ই ভাষাসমস্যা। জাহাজের টিকিট কিনতে ঠিক জানালায় দাঁড়িয়েছি কি না বোঝবার উপায় নেই। আবারও চোখে পড়ল এক যুবকের হাতে ইংরিজি বই। সে আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক জানালায় এসেছি তো, হায়দারপাশার টিকিট কাটার জন্য? সে বলল, "হ্যাঁ, কোথায় যাবে?" বললাম টরাস এক্সপ্রেস ধরব। দু মিনিট পর সে হায়দারপাশার টিকিট এনে আমাকে দিল। দাম দিতে গেছি। "আরে না না! ছি ছি!" অগত্যা অপরিচিতের সেই দান গ্রহণ করতে হল। জাহাজে সে এসে আমার কাছে বসল। বসফরাস পার হতে যতদূর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেকের মতো লাগে। তার মধ্যে ছেলেটির সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনি শোনা হয়ে গেল। তার কেন্দ্রীয় সমস্যা এক প্রেমের কাহিনি। ও বয়সে অন্য আর কী হতে পারে? সেই প্রাচীনতম আন্তঃপ্রজন্ম সংঘাত। যাকে ও ভালবাসে ওর মা-বাবা তাকে গ্রহণ করতে রাজি না। বুজরুগ আদমি দেখে সে আমার পরামর্শ চাইছে। বললাম,

ভুল জায়গায় এসেছ। আমি অকৃতদার মানুষ। তবে মনে হয় আপাতত চুপচাপ থেকে পাশ করে চাকরি-বাকরি নাও। আশা করি ততদিনে মা-বাবার মন নরম হবে। সেই অতি সনাতন বাঙালি সমাধান। চাকরি-বাকরি পেলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। এর বেশি কী আর বলব? ছেলেটি আমাকে টরাস এক্সপ্রেসের রিজার্ভ করা সিটে তুলে দিল। তারপর হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখি গোটা দশেক অত্যন্ত দামি তুর্কি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে হাজির। বললাম, আমি তো সিগারেট খাই না। এ দিয়ে আমি কী করব? কিন্তু সে এসব কথা শোনার পাত্র না। বলল, কাউকে দিয়ে দিও। ট্রেন ছাড়া অবধি সে আমার সঙ্গে ছিল। পরে খেয়াল হল, ওর সঙ্গে তো আমার পরিচয় বিনিময়ও হয়নি। ভাবলাম, বোধহয় মানুষ মানুষের কাছে আসবার জন্য পরিচয় খুব প্রয়োজনীয় নয়। একই সুখ-দুঃখের বন্ধনে এই প্রজাতির শত কোটি জীব বাঁধা রয়েছে। সেই সূত্রে সবাই সবার পরিচিত, নিতান্ত কাছের লোক।

টরাস এক্সপ্রেসে কোনও ভিড় ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কিছু যাত্রী উঠছে-নামছে। নাম এক্সপ্রেস হলেও দামাস্কাস পর্যন্ত প্রায় লোকাল ট্রেনের মতোই চলে। ছোট ছোট সব স্টেশনে থামছে। দেখলাম গ্রামাঞ্চলের চেহারার সঙ্গে ইস্তাম্বুলের কিছু মিল নেই। যে-বোরখা শহরে একটিও দেখিনি, এ অঞ্চলে তা বেশ কিছু চোখে পড়ল। কিন্তু যে মহীয়সী মহিলা বেশ কিছু বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে গাড়িতে উঠলেন, তাঁর অঙ্গে বোরখা ছিল না। চিত্তেও বোরখাসুলভ কোনও সঙ্কোচ বা লজ্জার চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে ভীমনির্ঘোষে বাচ্চাদের নানা আদেশ-উপদেশ দিচ্ছিলেন। তৎসহ দু-চারটে চড়চাপড়। সামান্য চ্যাঁ ভ্যাঁ ধ্বনি। আর এক হায়দারি হাঁক। ব্যস, সব কিছু চুপচাপ। নট নড়ন নট কিচ্ছু। তারপর এক বিশাল বোঁচকা খুলে এক বিরাট কোনও পাখির শূল্যপক্ক দেহ বের হল। তার জাতি নির্ধারণ করতে পারলাম না। সম্ভবত জটায়ুর কোনও বংশধর হবে। তার একটা বিশাল ঠ্যাং ছিঁড়ে নিয়ে মহিলা তাতে দাঁত বসালেন। আর হাতে ছিঁড়ে চাঁই চাঁই মাংস শিশুদের দিলেন। কোলের শিশুটিও বঞ্চিত হল না। ঊর্ধ্বাঙ্গের জামাটি খুলে মা জননী তাকে স্তন্যপান করাতে শুরু করলেন। কিন্তু চরম বিস্ময়ের ব্যাপারটি শেষের জন্য তোলা ছিল। বাচ্চা স্তন্যপান বন্ধ রেখে হঠাৎ জটায়ুবংশজর দিকে দৃষ্টিপাত করল। জননী এক গাল হেসে উটপাখিটির (?) একটি ঠ্যাং ভেঙে বাচ্চার হাতে ধরিয়ে দিলেন। দন্তহীন শিশু অজ্ঞাত উপায়ে সানন্দে সেই পক্ষীমাংস খেতে লাগল। বুঝলাম চেঙ্গিজ খাঁ এই ভাবেই মানুষ হয়েছিলেন (জানি না কেন সাহেবরা ওঁকে গেঙ্গিজ বলতে শুরু করেছে)।

সসন্তান মা জননী নেমে যাওয়ার পর কামরা প্রায় খালি। আর একটি মাত্র যাত্রী, আমি ছাড়া। তিনি আরব না তুর্কি বুঝতে পারলাম না। কেউই কারও ভাষা জানি না। সেই পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের অবস্থা। একটা ভাষা সবাই বোঝে। সে ভাষাটা খিদের। ভদ্রলোক একটি বড়সড় এটাচি কেস খুলে কিছু খাবার বের করলেন। কাবাব আর রুটি। কাবাবে এক কামড় দিয়ে বাকিটা আমাকে দিতে চাইলেন। বুঝলাম, ও দেশে ওটাই রীতি। বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করছেন না সে-কথাটা সপ্রমাণ বুঝিয়ে দেওয়া আর কি! ইঙ্গিতে জানালাম, ট্রেনে আমার খাবার অর্ডার দেওয়া আছে। কিন্তু এই অজুহাত বেশিক্ষণ চলল না।

ইস্তাম্বুল-বাগদাদ তিন দিনের রাস্তা। তার মধ্যে একটা বড় অংশে ট্রেনে ডাইনিং কার থাকে না। শুধু তাই নয়, পানীয় জলেরও কোনও ব্যবস্থা থাকে না। এ-কথা যাত্রীদের আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়। আমি ধরে নিয়েছি যে ইস্টিশানে নিশ্চয়ই রুটি কাবাব পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই মরুযাত্রা যখন শুরু হল তখন দেখলাম স্টেশনের পর স্টেশন চলে যায়—জল ছাড়া আর কিছু কেউ বিক্রি করতে আসে না। সেই জল বাধ্য হয়ে শেষ অবধি কিনতে হল। খোলা বালতিতে করে জল বিক্রি হচ্ছে। কিনে দেখলাম তার মধ্যে বেশ কয়েকটি পোকা সাঁতরে বেড়াচ্ছে। মরিয়া হয়ে পোকা বেছে জল খেলাম। কিন্তু পেটে যখন ছুঁচো ডন মারতে লাগল, তখন সত্যিই কাবু হলাম। আবারও ভদ্রলোক এক কামড় খেয়ে একটি শিক কাবাব জাতীয় বস্তু আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। এবার নিলাম। কিন্তু বাঙালি-হিন্দু ঘরের ছেলে। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ব্যাপারটা একেবারেই সংস্কারের বাইরে। ইদিক উদিক তাকিয়ে কাবাবটিকে উল্টে নিলাম। তারপর অনুচ্ছিষ্ট দিকটায় কামড় বসালাম। আর মুখে পলাশের হাসি ফুটিয়ে শেষের অংশটা বাথরুমে গিয়ে ফেলে দিলাম।

বাগদাদ পৌঁছে বড়ই নিরাশ হতে হল। হারুন-অল-রশিদের শহর বলে কথা। কিন্তু এ তো দেখে মনে হল উত্তর ভারতের কোনও মফস্বল শহর। তাও লখনউ-ইলাহাবাদের সঙ্গে তুলনা হয় না। শুধু বাজারে গিয়ে এক অনাস্বাদিত বিলাসের সন্ধান পেলাম। চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে, এক হুঁকোবরদার এসে হাতে এক গড়গড়া ধরিয়ে দিল। আর এক বালক এসে জুতো পালিশ করতে লাগল। ভাষা জানা নেই। সুতরাং তাদের বাধা দেওয়ারও উপায় নেই। ভাবলাম এরা আমাকে পথে বসিয়ে ছাড়বে। কিছুক্ষণ নবাবি করার পর ইঙ্গিত করলাম, এবার রেহাই দাও। বাড়ি ফিরব। বিল এল, ইংরেজিতেই লেখা। মনে মনে হিসাব করলাম, চা দু আনা, গড়গড়া এক আনা, জুতা পালিশ এক আনা—একুনে চার আনা। চার আনার নবাবির সুখ ভোগের সুযোগ আর কখনও পাইনি।

গাইড বই হাতে শহর প্রদক্ষিণে বের হলাম। দেখার মতো খুব কিছু নেই। বুঝলাম, হারুন-অল-রশিদের যুগ অনেক দিন গত। সত্যিতে আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ নবম শতাব্দীর কায়রোর বর্ণনা। তখনই বাগদাদের গৌরব সূর্য যাকে বলে অস্তমিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরাজদের বসানো এক রাজবংশ ইরাকে রাজত্ব করছে। তাঁদের হারুন-অল-রশিদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। কাজের মধ্যে তাঁরা একটা জমকালো রাজপথ বানিয়েছেন। এছাড়া কোনও কীর্তি নজরে এল না। আমি যখন যাই তার অল্প পরেই বিপ্লব হয়ে ইংরাজদের বসানো রাজবংশ খতম হয়। এখন টেলিভিশনে দেখি বাগদাদে বড় বড় রাস্তাঘাট, সাদ্দামের তৈরি বিরাট বিরাট সব প্রাসাদ। আমার দেখা বাগদাদের সঙ্গে এই শহরের কোনও মিল নেই। শুনেছিলাম ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপও কাছেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম সেখানে কিছু দেখার কোনও সুব্যবস্থা নেই। পরে সাদ্দাম সাহেব এভাঙ্গের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে নেবুকাডনেজারের আমলের অনেক কিছু পুনর্নির্মাণ করেছেন। গাইড বইয়ে দেখলাম, আব্বাসি খলিফাদের প্রাসাদ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ঠিকানা দেওয়া নেই। শেষটায় অনেক খুঁজে পেতে স্থানীয় জাদুঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দরজার কাছে এক ছোকরা সিগারেট ফুঁকছিল। হাতে সেই ইংরিজি বই। জিজ্ঞেস করলাম, "আব্বাসি

বংশীয়দের প্রাসাদটা কোথায় জানো কি?" সোজা উত্তর, না। মিউজিয়ামে ঢুকেই দেখলাম ছোট একটি প্লাকে লেখা আছে "এই ভবন এক সময়ে আব্বাসবংশীয় খলিফাদের প্রাসাদ ছিল!" কিন্তু ইঁট আর স্টাকোয় তৈরি ওই প্রাসাদ দেখে একটু নিরাশ হলাম। মনে হল হারুন-অল-রশিদের হয় পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না, নয় তো প্রাসাদ তৈরির ব্যাপারে ওঁর উৎসাহ কিছু কম ছিল। বড্ডই সাদামাটা।

হোটেলে ফিরে দেখি আমার ঘরে আর এক ব্যক্তি খালি গায়ে শুয়ে আছে। এইরকমই ব্যবস্থা ছিল। সস্তা করার জন্য শেয়ারের ঘর ভাড়া নিয়েছি। দু-রাত ওখানে থেকে ট্রেনে বসরা যাব। সেখানে এক রাত থেকে জাহাজ ধরতে হবে। যখন হোটেলে ফিরেছি তখন দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়। তারপর ওখানে সবাই ঘণ্টা দুই নিদ্রা দিয়ে আবার অফিস কাছারি করে। আমার সঙ্গে ঘরের ভাগীদারটির জন্য হোটেলের ছোকরা সেবক কিছু নান-এর মতো চেহারার রুটি নিয়ে এল। আবার সেই নাটক। এক কামড় খেয়ে আমাকে বাকিটা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি। এবার আমি শক্ত হলাম। 'শুক্রন' শব্দটি উচ্চারণ করে প্রবল বেগে শিরঃকম্পন। এ ভাষা পৃথিবীর সবাই বোঝে। এক এস্কিমোদের কথা জানি না। যারা নাকে নাক ঘষে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম ইত্যাদি সব আবেগ প্রকাশ করে তারা কীভাবে আপত্তি জানায় বলতে পারব না। যাক, ছোকরাকে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, আমারও ওই রুটি-কাবাব চাই। সেসব এল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খেলাম। বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে দেখি ওই রুটি-কাবাব ফুটপাথেই বিক্রি হচ্ছে। তবে আক্ষরিক অর্থেই ফুটপাথে। মানে একটা খবরের কাগজ বিছানোও কেউ প্রয়োজন মনে করেনি। পরদিন একটু খরচা করে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেলাম। ইঙ্গিতে বুঝলাম, সেদিন ওদের বিশেষ কোনও খাদ্য আছে। তাই আনতে বললাম। যা এল তা অখাদ্য, দুর্গন্ধ, অচর্ব্য, খালি প্রচুর চর্বিতে ভরা। বস্তুটা কী জানতে চাইলাম। রেস্টুরেন্টের মালিক এক গাল হেসে অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন— উটের মাংস। ও জিনিস কেউ বিনা পয়সায় দিলেও খাবেন না।

রাতের ট্রেন ধরে সকাল বেলা বসরা পৌঁছলাম। সমরকন্দ বোখারার মতো বাগদাদ, দামাস্কাস, বসরা ছোট বেলা থেকে শোনা সব নাম। ইতিহাস আর আরব্য উপন্যাসের রোমান্সে রঙিন তাদের কল্পরূপ। কিন্তু এ কোন বসরায় এলাম? নোংরা ধুলোয় ভরা সব রাস্তা। বাড়িঘরে কোথাও কোনও সৌকর্য বা ঔজ্জ্বল্যের ছাপ নেই। থাকার মধ্যে শুধু আছে গলিতে গলিতে নাইট ক্লাব। তার বাইরে দেশি সিনেমার পোস্টারের স্টাইলে আঁকা নৃত্যশীলা স্থূল সব রমণীদের ছবি। বসরাই গোলাপের কথা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। কোথায় সেই গোলাপের বাগান? বুঝলাম তার নামও আজ বিস্মৃত। দুপুরের দিকে নদীর পাড়ের এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে আছি। এখানকার বিশেষত্ব জীবন্ত মাছ নদীতে জালের ভিতর রাখা থাকে। অর্ডার করলে তুলে এনে রেঁধে দেয়। হঠাৎ পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে এক ব্যক্তি ভাঙা ইংরিজিতে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তিনিই মাছটা অর্ডার দিলেন এবং দামও তিনিই দিলেন। বুঝলাম, আপত্তি করে কোনও লাভ হবে না। তারপর চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন, বসরা দেখেছি কি না। দেখার কি আছে জিজ্ঞেস করলাম। ফলে এক ট্যাক্সি ডাকলেন। তাতে চড়ে দু'জনে ওঁর মতে অসাধারণ দ্রষ্টব্য বসরার নতুন

এয়ারপোর্ট দেখতে গেলাম। মানুষটার জন্য বড় করুণা বোধ হল। কিন্তু সেটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ওর জীবনে তো কোনও অভাববোধ নেই। জুতোর দোকানের মালিক এই মানুষটি বেশ তৃপ্ত হাসিখুশি। তাঁর জন্মস্থান বসরা সম্পর্কে বিশেষ গর্বিত। তাকে করুণা করার আমি কে?

বসরার পোস্ট রেস্তাঁতে দুটি চিঠি অপেক্ষা করছিল। একটি পুনে শহরে গবেষণারত সিরিল লুইসের। জানিয়েছে, সে বোম্বাই এসে আমার জাহাজের অপেক্ষা করবে। আর একটি চিঠি ছিল, বাবার কাছ থেকে। জানিয়েছেন, যেন পথে আর দেরি না করি। কারণ দিল্লি থেকে চিঠি এসেছে আমাকে জাতীয় অভিলেখাগারের ডেপুটি ডিরেক্টরের পদের জন্য ইন্টারভিউতে উপস্থিত থাকার জন্য। এই চিঠিতে যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের উত্থানপতনের বীজ নিহিত রয়েছে তা তখন জানা ছিল না।

বসরা থেকে আই. জি. এন, আর. এস. এন-এর জাহাজে বোম্বাই যাব। চেনা কোম্পানি কারণ কলকাতা-বরিশালের স্টিমার এঁরাই চালাতেন। জাহাজে ওঠার পথে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। কাস্টমস শেডে সরকারি কর্মচারি আর যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড হাতাহাতি চলছে। হাতাহাতি না, আসলে মারামারিই। জাহাজে কী তোলা যাবে, বা যাবে না তাই নিয়ে বিতণ্ডা। শুনলাম কিছু যাত্রীরা যা তুলতে চাইছেন, তা আইনত তোলা নিষিদ্ধ। কিন্তু যাত্রীদের বক্তব্য, এটা ওঁদের বংশগত অধিকার। এই বিতর্ক মুষ্টিযুদ্ধ ছাড়া মেটাবার উপায় নেই। কে জয়ী হল তা দেখার অপেক্ষায় না থেকে মানে মানে জাহাজে উঠে পড়লাম। কুরুক্ষেত্রে দর্শকের কোনও ভূমিকা নেই। কাছাকাছি থাকলে ধর্মাধর্মের লড়াইয়ে সামিল হতে হয়। অধঃপতিত বাঙালি দেহে ওটা পোষাত না।

জাহাজে উঠে ন'দিনের বাসস্থান খুঁজতে লাগলাম। নামে আমরা ডেক প্যাসেঞ্জার। কিন্তু আসলে ডেকে কারও জন্যে নির্দিষ্ট কোনও জায়গা থাকে না। যতদূর বুঝলাম, ডেকে থাকা নিয়মসঙ্গতও নয়। কারণ, সমুদ্র উত্তাল হলে ডেক থেকে সমুদ্রে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। আমাদের নির্দিষ্ট 'বার্থ' জাহাজের গর্ভে—হোল্ডে, যার একদিকে মালপত্র থাকে। আমাদের ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেমন একটার উপর আরেকটা তিন প্রস্থ সাজিয়ে যাত্রীদের শোওয়ার ব্যবস্থা থাকে, কতকটা সেই রকম। তফাত শুধু এই যে, মার্চ মাসের ভ্যাপসা দম আটকানো গরমে সেখানে শয়ন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হাওয়া চলাচলের কোনও ব্যবস্থা নেই, কারণ জাহাজের হোল্ডে ও ব্যবস্থা থাকলে হাওয়ার সঙ্গে জলও ঢুকত। এই সব কারণে যাত্রীরা সবাই ডেকে উঠে নিজের নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। হোল্ডঅলের ভিতর আমার একটি দলা পাকানো স্লিপিং ব্যাগ ছিল। এবার সেটি কাজে লাগল। এক দল আফগানের পাশে আমি আমার জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করলাম। শুধু খাওয়ার সময় নিজের বার্থে ফিরতে হত। কারণ এনামেলের থালায় কারি-ভাত পরিবেশনের জন্য কোনও ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা ছিল না।

এমন শান্ত সমুদ্র আমি আগে কখনও দেখিনি। বোম্বাই-এর কাছাকাছি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সমুদ্রে আছি, না কোনও শান্ত নদীপথে তা বুঝতে পারিনি। সত্যি পদ্মা আড়িয়াল খাঁয়ে এর চেয়ে অনেক বেশি ঢেউ উঠতে দেখেছি। কিন্তু এই সমুদ্রযাত্রায় ফাউ হিসেবে পেলাম

উড়ুক্কু মাছ। ওরা ঝাঁক বেঁধে ওড়ে আর কিছু মাছ পথভ্রষ্ট হয়ে জাহাজের নীচের তলার ডেকে এসে পড়ে। স্টিমারের অফিসার এবং সারেংরা তাদের সদ্ব্যবহার করেন। জাহাজের ডাক্তার এক বাঙালি ভদ্রলোক। তাঁর সুবাদে উড়ুক্কু মাছ বেশ কিছু পেটে গেল। রীতিমতো সুস্বাদু।

ডাক্তারবাবু দেশওয়ালি ভাই পেয়ে অনেক দুঃখের কথা শোনালেন। প্রথমত, বছরে বেশির ভাগ সময় পুত্র-কন্যা থেকে দূরে থাকতে হয়। কোন ঘরমুখো বাঙালির এ ভাল লাগে? তবে এত মাইনে আর কোথায় পাবেন? অগত্যা! কিন্তু সত্যিকার সমস্যা জাহাজের যাত্রীদের নিয়ে। তাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, ডাক্তারের উপর তাদের দাবির কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। এবং ডাক্তারের কর্তব্য তাদের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা। বেশির ভাগ মধ্য প্রাচ্যের যাত্রী একটি সমস্যা নিয়েই আসেন। তাঁদের সীমাহীন পৌরুষ আর একটু বাড়ানো যায় কিনা তার সন্ধানে। সাহেবরা এত কিছু করেছে আর এর জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি? এ কি বিশ্বাস করার মতো কথা। ওষুধ না বাতলালে তারা কাপ্তান সাহেবের কাছে নালিশ জানাবে। হ্যাঁ, কে তাদের বোঝায় যে তাদের পৌরুষ সম্ভাব্যতার চরম সীমায় পৌঁছেছে। আর বাড়ানো সম্ভব নয়, মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলজনকও না। আর এক শ্রেণির 'রোগী' আসেন, যাঁদের ধারণা ডাক্তারবাবু তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টার ক্রীতদাস। এক বিশালকায় কাবুলি ওঁকে রাত দুটোর সময় ঘুম থেকে তোলে। কী এমন সাঙ্ঘাতিক প্রাণঘাতী ব্যাপার ঘটেছে? না, মুহ মে থু আতা। থু ত মুহমেই আসে, অন্যত্র এলেই চিন্তার কারণ হত। ডাক্তারবাবুর জন্য সত্যই সহানুভূতিবোধ করলাম।

ডেকে থাকতে ভালই লাগত। অসুবিধার কারণ ঘটল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত কারণে। সন্ধ্যে হলেই আফগানরা গান ধরতেন। সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি সঙ্গীতের বিষয়বস্তু কী? জানলাম ইশ্‌ক। তা হবে। আমি ভেবেছিলাম, রণসঙ্গীত, মানে যা যুদ্ধ জয়ের পরে গাওয়া হয়।

গাল্‌ফের ধারে ধারে শেখদের রাজত্ব। এখন সে সব জায়গা ঐশ্বর্যে ফেটে পড়ছে। তখন তারা হতদরিদ্র। জাহাজ থামলেই ডিঙি নৌকা নিয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিড়। সমুদ্রে আনি-দোআনি ফেলে দিলে তারা ডুব দিয়ে তুলে নিত। ওই খেলা দেখানোই তাদের জীবিকা উপার্জনের উপায়। আর কিছু মানুষ নৌকা করে শঙ্খ ইত্যাদি নানা সমুদ্রজ জিনিস বেচতে আসত। ওই অঞ্চলের যাত্রীরা অনেকেই কোথাও না কোথাও কুলির কাজে বহাল ছিল। নিজের দেশের কাছে এলে তারা প্রচণ্ড উৎসাহ আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠত। যখন দুবাই দেখা গেল তখন দুবাইবাসীরা হাততালি দিয়ে সমস্বরে গান ধরলেন "ওয়াহ্ ওয়াহ্ দুবাই"। এখন দুবাই দেখে আমারই ওই গান করার ইচ্ছে হয়।

পারস্য উপসাগর ছেড়ে আরব সমুদ্রে পড়তেই জাহাজ একটু একটু দুলতে শুরু করেছিল। বোম্বাই-এর কাছাকাছি এসে সে দুলুনি রীতিমতো ভয়াবহ হয়ে উঠল। আমি আমার ক্রিটের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে শয্যা নিলাম। উঠলাম বোম্বে পৌঁছবার পর।

জেটিতে কাস্টমস শেডে দেখি নরকের দৃশ্য। যাত্রীদের মালপত্র তছনছ করা হচ্ছে। কারণ শুনলাম এই জাহাজের খ্যাতি সোনা পাচার করার জন্য। আমার মাল সার্চ করার পালা

যখন এল, অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন "কে হে তুমি বট? কী করা হয়?" বললাম, ছিলাম ছাত্র, আপাতত বেকার। পিঠ চাপড়ে লোকটি বলল, "আই শ্যাল ট্রিট ইউ লাইক এ ব্রাদার।" তারপর ঝোলাটি ঝেড়ে সব মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলল। আর একটি ছুরি দিয়ে স্লিপিং ব্যাগটি দক্ষ হাতে ছিঁড়ে ফেলল। এই সব ভ্রাতৃজনোচিত কাজ শেষ হলে বলল, "সব ঠিক হ্যায়।" কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য এই ভুল ধারণা নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি, পেছন থেকে কে যেন শার্টের কলার টেনে ধরল। কী ব্যাপার? "সোনা চাঁদি যো কুছ হ্যায় নিকালো।" বললাম এই মাত্র আমার মাল সার্চ করা হয়েছে। সোনা চাঁদি কিছু পাওয়া যায়নি। লোকটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আরে ও সব বহত শুনা। নিকালো তো।" বুঝিয়ে বললাম আমি নিতান্তই সম্বলহীন ছাত্র। ইংল্যান্ড থেকে ফিরছি। আমাদের মত মানুষের কাছে সোনা চাঁদি সাধারণত থাকে না। ইংল্যান্ড শুনে লোকটি একটু নরম হল। বলল, "আচ্ছা! মায়নে সোচা তুম বোরা মার্চেন্ট হ্যায়। গলত না মানো।" বুঝলাম মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছি। আমাকে দেখে কেউ অর্থবান বোরা ভাবতে পারে এ-কথা জেনে পুলকিত হলাম। একটু এগিয়ে আর একটি বিয়োগান্তক নাটক দেখলাম। এক ব্যক্তিকে জাহাজে একটি ট্যাক্সিডার্মি করা সিংহের মাথা কোলবালিশ করে ঘুমাতে দেখেছিলাম। সে দেখি মাথায় হাত দিয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। কী ব্যাপার? সে আসছে উগান্ডা থেকে, সিংহমুণ্ডটিতে সোনা ভরা ছিল। কাস্টমসে কোনও অসুবিধে হয়নি। কর্তাদের অল্প কিছু দিতে হয়েছিল শুধু। কিন্তু মুণ্ডুটি বেজায় ভারি। বয়েস হয়ে গেছে। ওটা বইবার সামর্থ্য নেই। তাই কুলির মাথায় চাপিয়েছিল। এখন সেই সেয়ানা কুলি লা-পাত্তা। পুলিশে যাবে সে উপায়ও নেই। কারণ তাহলে নিজেই বিপদে পড়বে। আবার বুঝলাম, দেশে ফিরেছি।

রাস্তায় বের হতেই সিরিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আলিঙ্গন বিনিময়ের পর ও বলল, আজ আমার জন্য ও দারুণ এক ট্রিটের ব্যবস্থা করেছে। কী সেই অত্যাশ্চর্য আনন্দ? পকেট থেকে একটা সিনেমার টিকিট বের করে দেখাল। বিজয়ীর হাসি হেসে মুখে বলল, 'ঝ্যানক ঝ্যানক পায়েলি বাজে!" ছবিটা ও পাঁচবার দেখেছে।

হ্যাঁ, একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি। অক্সফোর্ড থেকে বোম্বাই এই পথ পার হতে লেগেছিল ঠিক নব্বই দিন। আর নিট খরচা হয়েছিল টিকিটের দাম ছাড়া একশো পাউন্ড। তখনকার টাকার হিসাবে তেরো শো টাকা।

সকার বেকার

উনিশো সাতান্ন সনে দেশে প্লেনে চলাফেরা এখনকার মতো জলভাত হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই দু'দিন বোম্বাই বাস করে সিরিল লুইসের উৎসাহে দু'বার (ওর ভাষায়) 'ঝ্যানক ঝ্যানক প্যায়েলি ব্যাজে' দেখে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে কলকাতা রওনা হলাম। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর ট্রেনে যেতে যেতে রেলপথের দু'পাশে মাইলের পর মাইল রুক্ষ জমি দেখতে ভালই লাগছিল। শুনি আমাদের দেশ শস্যশ্যামলা। কবি বারবারই লিখেছেন 'শ্যামল মাটি'।

কিন্তু ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, স্থলপথে ভ্রমণের সময় যে নিরবচ্ছিন্ন শ্যামলিমা চোখে পড়ে ভারতবর্ষে রেলযাত্রায় তার সঙ্গে তুলনীয় দৃশ্য ক্বচিৎ কখনওই দেখা যায়। আমাদের দারিদ্রর মতোই ওই রুক্ষ জমি আমার চোখে কখনওই বিসদৃশ ঠেকেনি। ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে গরিবের ঘরে ফিরে আসার মতো একটা অনুভূতি হয়েছিল। ঠিক বোঝাতে পারব না, একটা ভাষাতীত স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব শরীর-মন স্নিগ্ধ করে দিল।

ওই ট্রেনযাত্রায় একটি ছোটখাটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ট্রেনের সঙ্গে ডাইনিং কার ছিল। সেখানে দুপুরের খাওয়া সেরে বসে আছি। হঠাৎ মাঠের মধ্যে ট্রেন থামল। দেখলাম বেশ কিছু লোক দুদ্দাড় নেমে পড়ল। ভাবলাম—এরা বোধ হয় স্থানীয় লোক। ট্রেনের মতিগতি জানে। বোধ হয় এই চিহ্নবিহীন মাঠের মাঝখানে রোজই ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তাই তারা খানা-কামরা ছেড়ে নিজস্ব কামরার অভিমুখে রওনা দিয়েছে। 'মহাজন যেন গত...' ভেবে আমিও নেমে পড়লাম। তারপর দেখলাম নড়েচড়ে উঠে মন্দগতিতে ট্রেনও চলতে শুরু করল। বাষ্পযানের গতিবেগ ক্রমেই বাড়ছে দেখে এক সহযাত্রীকে প্রশ্ন করলাম, 'ট্রেন যে চলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে?'

'তা যাবেই তো।'

'আর তোমরা?'

'আমরা? আমরা ওই শহরটায় থাকি। ট্রেন এখানে থামলে কাছে পড়ে, তাই চেন টানা হয়েছিল।'

আর কিছু চিন্তা না করে দৌড়তে শুরু করলাম। ট্রেনের সঙ্গে রেসে এর আগে কেউ জিতেছে বলে শুনিনি। মাইল দেড়েক দৌড়ে সাতানা স্টেশন পৌঁছলাম। দেখলাম—ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে। গার্ড সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার দৌড়ের শুরুটা আমরা দেখেছি। ট্রেন এখানে বিশ মিনিট দাঁড়াবার কথা। তোমার জন্য আরও দশ মিনিট বেশি দাঁড়াতাম। রোজই কিছু হাবা ওই মাঠের মাঝখানে নেমে পড়ে।'—গার্ডের ব্যাখ্যা শুনে আত্মজ্ঞান অনেকটা বেড়ে গেল।

কলকাতা পৌঁছে দু' সপ্তাহের মধ্যে এক বিচিত্র অবস্থায় পড়লাম। সেই অবস্থার কথা স্মরণ করে এই পরিচ্ছেদের নামটা ভেবে-চিন্তেই দিয়েছি। 'বেকার' কথাটা ফারসি থেকে ধার করা। 'কার' মানে কাজ। যার ও বস্তুর অভাব সে 'বে-কার', কর্মহীন। সুতরাং বাংলা ভাষাতত্ত্বর নিয়ম মানলে যে-ভাগ্যবানের কাজ অর্থাৎ চাকরি আছে, সে 'স-কার'। আপত্তি করলে মানব না। কলকাতা পৌঁছবার পর আমি এক অক্সিমরন্-এর শিকার হলাম। দু-দুটি চাকরি আমার করতলগত হল। কিন্তু কোনওটিই নেওয়ার পথ সহজ না। তাই ছ' মাস আমি 'স-কার বে-কার'। অর্থাৎ চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও বেকার। এর চেয়ে যদি কেউ 'শ-কার ব-কার' করত, তুলনায় হাল খারাপ হত না।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। ওই যে ইস্তাম্বুলের 'পোস্ত রেস্তঁাত'-এ ইন্দ্রপ্রস্থে চাকরির ইন্টারভিউর খবর পেয়েছিলাম, তার আড়ালে যে ভাগ্যদেবীর ক্রূর হাসি এবং হাতের বংশরূপী আয়ুধ প্রচ্ছন্ন তা তখন কে জানত? কলকাতা পৌঁছবার দিন দুই পরে দিল্লি রওনা হলাম। শাহজাহান রোডে ইউপিএসসি-র দফতরে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে লজ্জায়

অধোবদন হলাম। চাকরিটা জাতীয় অভিলেখগারের ডেপুটি ডিরেক্টরের। দেখি বিখ্যাত পণ্ডিত এবং অভিলেখবিশারদ শৌরীন রায় বসে আছেন। অভিলেখ (archives) বিষয়ে আমি নবজাত শিশুর মতো অজ্ঞ। শৌরীনবাবুর পাণ্ডিত্যের কথা বহুদিন ধরে শুনেছি। পরে পরিচয় হয়ে দেখেছি—সে-পাণ্ডিত্যের গভীরতা তুলনায় নীরদ চৌধুরীর চেয়েও বেশি ছাড়া কম নয়। এই মহাপণ্ডিতের সঙ্গে টেক্কা লড়ার জন্য আমার মতো অর্বাচীনকে কেন ডাকা হয়েছিল বুঝলাম না। কেন হয়েছিল—পরে শুনলাম।

অভিলেখ সম্পর্কে শৌরীনবাবুর চেয়ে বেশি জানে এরকম লোক ভারতে কেন সারা পৃথিবীতেও বিশেষ কেউ ছিল না বলেই আমার ধারণা। সুতরাং অভিলেখাগারে যখন ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি হল (উদ্দেশ্য—ওই পদে তালিম নিয়ে পদাধিকারী ভবিষ্যতে ডিরেক্টর হবে), তখন ওয়াকিবহাল মহলে সবাই একবাক্যে বলল—ওই পদের যোগ্য একমাত্র লোক শৌরীন রায়। তখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। কিন্তু ওয়াকিবহল মহল আরও এক ব্যাপারে সচেতন হলেন। ভারত সরকার কস্মিনকালে ওই পদে শৌরীনবাবুকে বসাবে না। তার আসল কারণ দুটি। এক, শৌরীনবাবু ক্ষমতাশালী লোকদের ন্যায্য কারণেই নাজেহাল করে বিশেষ আনন্দ পেতেন। দুই, এই ব্যাপারের সুযোগ নিয়ে জনৈক ক্ষমতাশালী জয়েন্ট সেক্রেটারি তাঁর ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব অভিলেখাগারের অন্য এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের জন্য পদটি লালনের চেষ্টায় ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য—ভারত রাষ্ট্রের প্রতি নিতান্ত অনুগত এই যুগ্মসচিব অবসর নেওয়ার পরের দিনই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে তশরিফ স্থানান্তরিত করেন। আর তাঁর যে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বটির কথা বলেছি, সেই জনাব যুগ্মসচিবের পর পর তিনটি ভগিনীর ভার বৈধমতে গ্রহণ করেন, তবে যুগপৎ নয়। ভদ্রমহিলারা হয় ক্ষীণজীবী ছিলেন অথবা উক্ত পতিদেবতার সঙ্গ ওঁদের বেশি দিন সহ্য হয়নি। যা হোক, যুগ্মসচিব সাহেব অনেক বিবেচনা করে জাল পাতলেন। শৌরীনবাবুর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এক কুৎসা বাজারে চালু ছিল। যথাকালে বেশ গুছিয়ে কুৎসাটা কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চাকরিটি শেষ অবধি কে পাবে সে সিদ্ধান্ত নির্ভর করছিল ইউপিএসসি-র আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদের উপর। তাঁদের শীর্ষস্থানীয় তিন প্রবীণ ঐতিহাসিক আলোচনা করে ঠিক করেন যে, শৌরীনবাবুকে চাকরি দেওয়া অসম্ভব হলে, তরুণ ঐতিহাসিক তপনকে দিয়ে দামাদ সাহেবকে ঠেকাতে হবে। কাজটা কঠিন নয়। কারণ ইসলামে যে ফেরেশতা লেখাপড়ার দিকটা দেখে দামাদ সুদুর অতীতেই তার সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কারণ অশেষ গুণবান ও প্রভূত ক্ষমতাশালী শালা সাহেব ফেরেশ্‌তার কুর্সি অধিকার করে বসেন। কার্যাভাবে ফেরেশ্‌তো বরখাস্ত হন। শালা সাহেবকে সরকারি মহলে সম্ভবত তাঁর প্রতি গভীর প্রীতিবশত অনেকেই 'সাহেব' বাদ দিয়ে শুধু 'শালা' বলেই বর্ণনা করতেন।

এইসব কথা বহু দিন পরে 'ভিতরের লোক'দের মুখে শুনি। যে-বিরাট পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে চাকরিটি আমার হয়, বহু বছর পর তাঁকে জিজ্ঞেস করি—শৌরীনবাবু থাকতে চাকরিটি কী করে আমার হল? উনি বললেন, ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার আগেই নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি প্রত্যেকের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দেন। কাগজটিতে শালা সাহেবের সই। সেটির

বক্তব্য—অনুল্লেখযোগ্য চরিত্রদোষের (moral turpitude) জন্য সরকার বাহাদুর শৌরীন রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে তদন্ত করছেন। অভিযোগ সঠিক প্রমাণ হলে তাঁর চাকরি যাবে। ওই কাগজটি হাতে নিয়ে শৌরীনবাবুকে চাকরি দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমার সদ্যলব্ধ অক্সফোর্ডের ডিগ্রি ব্যবহার করে দামাদ সাহেবকে ঠেকানো হল। সালটা ছিল ১৯৫৭। ইংরাজ—তথা অক্সব্রিজ-মহিমা তখনও ভারতীয় চিত্তে সমুজ্জ্বল।

এই জুগুপ্সাজনক ঘটনা—এবং তার পরিণতিতে আরও অনেক কিছু যা ঘটে—বর্তমান স্মৃতিকথায় তার স্থান হওয়ার একটিই কারণ। দিল্লিতে আমার চাকরি হওয়ার সম্ভাবনায় স্যার যদুনাথ খুব খুশি ছিলেন। কারণ পুরনো জমানার লোক হিসাবে বড় সরকারি চাকরির প্রতি ওঁর সমীহ ছিল। এবং ওঁর চোখে চাকরিটি বড় মাপের, যদিও স্বাধীন ভারতের মাপকাঠিতে ওটি নেহাতই মেজ জাতের। সে কথা থাক। দিল্লি রওনা হওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি দুটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। দিল্লি যেতে উৎসাহ দিলেও বললেন যে-জায়গাটা বড্ড গরম, ওখানে বাস করলে আয়ুষ্কাল পাঁচ থেকে দশ বছর কমে যাবে। সেজন্য যেন প্রস্তুত থাকি। প্রস্তুতিটা কীভাবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস হয়নি। দ্বিতীয় কথা, স্বাধীনতা-উত্তর ইন্দ্রপ্রস্থ রাজনৈতিক এবং সামাজিক আবহাওয়ার দিক থেকে আঠারো শতকের মোগল দরবারের সঙ্গে তুলনীয়। ওই শ্বাপদসঙ্কুল জনপদে কীভাবে চলতে হবে—তুলসীদাস থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে উনি তা বুঝিয়ে দেন : 'হাঁ জী হাঁ জী করকে সব কাম করকে লো।' (উদ্ধৃতিটি বোধ হয় নির্ভুল হল না।) এই উপদেশ অনুসরণ করার মতো দক্ষতা আমার ছিল না। কিন্তু দিল্লি যাওয়ার আগে এবং পরে শাসন-ঘটিত এবং তার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে বিচিত্র ছ্যাঁচড়ামির পরিচয় পাই, 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' হিসেবে তার কিছু বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। আমাদের দেশের শাসনযন্ত্র অন্য পাঁচটা দেশের তুলনায় বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আমি মনে করি না। কিন্তু চাকরি, প্রভাব এবং সরকারি আওতাধীন সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে কী ধরনের দলাদলি এবং ইতরামি চলত তা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। যত দূর বুঝি—সেই ইতরামির ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত আছে। ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন উনিশ শতকের সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে লিখেছিলেন, 'না হয় স্বাধীন হউক ভারতবর্ষ লুটে পুটে খাই।' এই লুটেপুটে খাওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণে বা বামে কেউই যাঁরা অকারণ চক্ষুলজ্জায় ভোগেন, তাঁরা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের দলবাজির ইতিহাস যথাস্থানে লিখব।

যা হোক, চাকরিটা আমার হয়েছে জানিয়ে শিক্ষা বিভাগ থেকে যথা সময়ে চিঠি পেলাম। কাঁচুমাচু হয়ে শৌরীনবাবুকে একটা চিঠি দিলাম। পত্রপাঠ ওঁর উত্তর পাই : 'এ চাকরি আমার কখনওই হত না। আপনি নির্দ্বিধায় চলে আসুন। আমরা সত্যিই খুশি হব।'

কিন্তু নির্দ্বিধায় চলে আসার পথ খোলা ছিল না। ইংল্যান্ড ছাড়ার আগেই ভারতীয় হাই কমিশন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, জলপানি-বাবদ আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁরা যে- চাকরি দেবেন তা নিতে হবে। কথাটা সত্যিতে আমি কখনও ভুলিনি। ভুলবার ইচ্ছাও ছিল না। আশা ছিল দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াব এবং হয়তো কোনওদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে অধ্যাপকের পদ পাব।

জীবন ওই ঈপ্সিত পথেই যাবে, তার প্রায় সব ব্যবস্থাই হয়ে এসেছিল। কিন্তু এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে সব কিছু ভেস্তে গেল। সরকারি কলেজে চাকরির উমেদার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সামনে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তার নির্দেশ পেলাম। যথা সময়ে গিয়ে দেখলাম—পরীক্ষকদের মুখগুলি পরিচিত। নির্বাচকদের মধ্যে সুশোভনবাবু আছেন, যে ক্ষমতাশালী মানুষটির বিরাগভাজন হয়েছিলাম, তিনি আছেন, আর আছেন যে বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথায় আমার দিল্লির চাকরিটি হয়েছিল তিনি। এই তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ওই দিনকার সিদ্ধান্তের রহস্য—যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল—তা জানতে পারি, প্রায় বিশ বছর পরে। তথ্য গোপন রাখার দায়িত্ব ততদিনে ঘুচে গেছে।

রাজ্য সরকার বাহাদুর ইতিহাস বিভাগে দুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন—সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে। পদ দুটি পেলাম যথাক্রমে অমলেশদা এবং আমি। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে সমাধান হল না। বিষয় বিশেষজ্ঞ নির্বাচক দু'জন খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে অমলেশদাকে প্রথম এবং আমাকে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছিলেন। ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে খুব খুশি হয়েই অধ্যাপনা করতে যেতাম। অধ্যাপক জ্যাকারায়া এবং সুশোভনবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তারক সেন, অমলেশদা এবং অমল ভট্টাচার্যর সহকর্মী হওয়ার চেয়ে শিক্ষাজগতে বড় কোনও সৌভাগ্যর কথা তখন ভাবতে পারতাম না। দিল্লিতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম নিতান্তই নিমরাজি হয়ে—বাবা-মা এবং পুরনো শিক্ষক-সহকর্মীদের উৎসাহে। সরকারি চাকরি করার ইচ্ছে থাকলে তো অনেক আগেই ও পথে যেতাম। সুতরাং মহা উৎসাহে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলাম।

সেই সিদ্ধান্ত যখন হাতে পৌঁছল তখন যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সরকার জানালেন—আমি অধ্যাপকের পদের জন্য মনোনীত হয়েছি এবং যত শীঘ্র সম্ভব যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে ওই পদে যোগ দিই—ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে। অর্থাৎ আমার অগ্রজপ্রতিম অমলেশ ত্রিপাঠীকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আমার অধস্তন হিসাবে কাজে যোগ দিতে হবে। অনেক পরে জানতে প্যারি যে, বিশেষজ্ঞরা নিতান্ত যুক্তিযুক্তভাবেই অমলেশদাকে প্রথম এবং আমাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে হিসাবে চাকরিতে অমলেশদা আমার সিনিয়র এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বিভাগীয় প্রধান হওয়ার কথা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত সরকারের প্রতিনিধিরা উলটে দেন এবং আরও শুনি যে এই সিদ্ধান্তের পিছনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি অনেক দিন ধরে নানা ব্যাপারে আমার বিরোধিতা করেছেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল তা আমার জানা নেই। ফারসিতে একটি আপ্তবাক্য চালু আছে—'হব্ব-এ আলি ইয়া ফিতনাহ-এ মুয়াবিয়া'। মুয়াবিয়া ছিলেন হজরত আলির প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন—ব্যক্তিবিশেষের যে হজরত আলির প্রতি প্রেম দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যিতে আলির প্রতি প্রেম না মুয়াবিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা? মানে যে বিচিত্র সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিলেন তা কি আমার প্রতি অহেতুকি করুণার ফল না অমলেশদাকে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা? অমলেশদা নির্বিরোধী ভালমানুষ ছিলেন, উপরিওয়ালাদের ওঁর উপর চটার কখনও কোনও কারণ

ঘটেছে বলে শুনিনি। সুতরাং এই রহস্যের কোনও সমাধান কখনও হয়নি। এই নাটের যিনি গুরু তাঁর শত্রুরা বলতে লাগল, যে ভদ্রলোক ইয়াগো শ্রেণির মানুষ। সম্পূর্ণ অকারণে লোকের অনিষ্ট করেই ওঁর আনন্দ, এবং ভব্যজনদের অপমান করেই উনি সব চেয়ে বেশি তৃপ্তি পান। আরও যাঁরা কল্পনাপ্রবণ তাঁরা গূঢ়তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দিতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন— কংগ্রেসের উঁচুমহলে আমার শক্ত খুঁটি আছে। তাদের ধরে আমিই এই ব্যাপারটা ঘটিয়েছি। সত্যিতে সিদ্ধান্তটা বদলানোর চেষ্টায় আমি খুঁটির শরণাপন্ন হয়েছিলাম। কিছু লাভ হয়নি।

শুনলাম অমলেশদা পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দৌড়ে ওঁর বাড়ি গেলাম। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন। সরকার এই সিদ্ধান্ত না বদলালে আমি দিল্লি চলে যাব। দীপ্তি বউদি—যাঁর আমি বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম, একবার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। কোনও কথা বললেন না। বুঝলাম কলকাতা থাকা আমার চলবে না। এই সিদ্ধান্তের আরও কারণ ছিল। অমলেশদা কলকাতার ঐতিহাসিকদের মধ্যে অতি সম্মানিত মানুষ। তাঁর এই ভাগ্যবিপর্যয়ে আমার শিক্ষক এবং এক সময়কার সহকর্মীরা অনেকেই বিচলিত। আমি যাঁদের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলাম তাঁরাও বলতে শুরু করলেন, 'দেখ, তুমি দিল্লিই চলে যাও। কাজটা বড় মাপের। ওখানে তুমি থাকলে আমরা যারা নথিপত্র নিয়ে কাজ করি তাদের সকলেরই সুবিধা হবে। আর আজকাল বাঙালির ভাগ্যে বড় চাকরি তো প্রায় জোটেই না। সে কথাটাও ভেবে দেখো।' আমার ভূয়োদর্শন তখনও নিতান্ত কাঁচা। তাই এইসব শুনে বড় অভিমান হল। মনে করলাম কলকাতায় আমাকে কেউ চাইছে না। ঠিক আছে, দিল্লি গিয়ে আমি বড় চাকরিই করব। এবং সেই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন করলাম। আমি ওঁদের দেওয়া চাকরি নিতে শর্তবদ্ধ। সেই শর্ত থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রার্থনা জানালাম। আমার যুক্তি নিতান্তই অকেজো। মহাফেজখানার কাজও জাতীয় সরকারের কাজ, দেশসেবা। সুতরাং...। এটা সত্যিতে কোনও যুক্তি ছিল না। কারণ স্টেট স্কলারশিপ পুনরুজ্জীবনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল—সরকারি কলেজগুলিতে ভাল শিক্ষকের ক্যাডার তৈরি করা, ঢালাওভাবে দেশসেবা নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার দরখাস্ত নাকচ করলেন। এর পর প্রচণ্ড টানাপড়েন শুরু হল। দিল্লি যাওয়ার আমার আদৌ উৎসাহ ছিল না, কিন্তু আমি গোঁয়ার বাঙাল। কিছুতে বাধা পেলে গোঁ ধরে বসা স্বভাব। অতএব দিল্লি যাব বলে বেঁকে বসলাম। খুঁটি দড়ি যা-কিছু আমার সহায়সম্বল ছিল সব কিছুরই শরণ নিলাম। স্বয়ং বিধান রায়ের কাছেও গেলাম। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে যে-ক্ষমতাশালী মানুষটি আমার প্রতিপক্ষ তিনি বিধানবাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাঁকে উনি বেইজ্জত করতে পারেন না। শুনেছি তাঁকে ডেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আরে ছোকরাকে যেতে দেও হে।' 'দেখছি স্যার' বলে ভদ্রলোক নতুন কৌশল চিন্তা করতে লাগলেন।

এই টানাপড়েনের ফলেই পাঁচ-ছ' মাস ধরে আমার সকার বেকারত্ব। হাতে দু'দুটি বেশ লোভনীয় চাকরি, অথচ একটি আমি অনিবার্য কারণে চাইছি না আর অন্যটি আমার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পেলাম সে কথায় পরে আসছি।

সকার বেকার হয়ে এই সময়টা আমার পিতার হোটেলেই কাটে। মাথার উপর ছাদ আছে (লিনটন স্ট্রিটের প্রাচীন নবাববাড়ির ছাদ রীতিমতো মজবুত), অন্নাভাবও নেই, শুধু ট্যাঁকের অবস্থার একমাত্র তুলনা গড়ের মাঠ। বাবার কাছে বখামি করার জন্য পয়সা চাইতে লজ্জা করে। অক্সফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে এসে লেজও কিঞ্চিৎ স্ফীত। তাই প্রাইভেট টিউশনি করতেও অসম্মান বোধ হয়। ফলে বন্ধু-বান্ধবের কাছে ধারধোর করতে শুরু করি। সেইসব ধার বোধ হয় কখনও পুরোপুরি শোধও দেওয়া হয়নি । কেউ চায়ওনি। কিন্তু এই সময়টা আমার পুরোপুরি খারাপ কেটেছে বললে ভুল হবে। ওই ক'মাস লেখাপড়া কিছুই করিনি। কিন্তু ওরকম চুটিয়ে আড্ডা দেওয়ার সৌভাগ্য এর আগে বা পরে কখনও হয়নি। আর সে কি আড্ডা!

আড্ডাটা জমত প্রধানত একটি মানুষের বাড়িতে। তাঁর নাম রণজিৎ গুহ, বর্তমানে যিনি সাবলটার্ন গোষ্ঠীর স্রষ্টা এবং নেতা হিসাবে জগদ্বিখ্যাত। আমরা বলতাম রঞ্জিতদা। এই সম্বোধনে উনি খুব খুশি হতেন না বলেই আমার ধারণা। উনি নিজেকে রণজিৎ বলেই পরিচয় দিতেন। রণজিৎ এবং রঞ্জিত শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ফোন করলে উনি বলতেন 'রণজিৎ গুহ কথা বলছি', রণজিৎ শব্দটা রীতিমতো আন্ডারলাইন করে। তবে ব্যাপারটা আমরা খুব ভ্রূক্ষেপ করতাম না। উনিও কখনও স্পষ্টত কোনও আপত্তি জানাননি। রণজিৎদার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪৩ সাল থেকে। তখন উনি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এবং স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের প্রথম সারির নেতা। তুখড় বুদ্ধিমান এবং ইন্টেলেকচুয়াল হিসাবে খ্যাতিমান। দলে নতুন কর্মী জোটানোর ব্যাপারে ওঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। এই দক্ষতা পরে ওঁর প্রধান কীর্তি সাবলটার্ন আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারও কাজে লেগেছিল। ওঁর জীবনী কখনও কেউ নিশ্চয়ই লিখবে। তাঁর এবং কৌতূহলী পাঠিকা-পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে কিছু তথ্য নিবেদন করি। কারণ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া কারও কাছে ওঁকে নিজের সম্বন্ধে কথা বলতে শুনিনি।

যুদ্ধ থামবার অল্পদিন পরেই রণজিৎদা বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সঙ্ঘের (ওয়ার্লড ফেডারেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ইউথ) সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র বা ফ্রন্ট ছিল। শত্রুরা বলত কোমিন্টার্নের তাঁবেদার। এ ব্যাপারে সত্যাসত্য যাই হোক, কলকাতার প্রগতিবাদী ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ সম্মানের চোখেই দেখত। রণজিৎদা ওই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ায় আমাদের কাছে ওঁর মানসম্মান দশগুণ বেড়ে গেল। ছাত্র ফেডারেশনের নেতা হিসাবেই ওঁর এই পদপ্রাপ্তি। যুব সঙ্ঘের হেড অফিস তখন প্যারিসে। রণজিৎদার প্যারিস যাওয়ার রাহাখরচা বাবদ ছাত্র ফেডারেশন চাঁদা তুলতে লাগল। আমরা ওই খাতে যে যা পারি সাধ্যমতো দিয়েছিলাম। প্যারিসে সাম্যবাদীরা যুদ্ধের শেষে একটি 'শাতো' অর্থাৎ কেল্লা দখল করে বসেছিল। সেই কেল্লাতে যুব সঙ্ঘের হেড অফিস এবং তৎসহ রণজিৎদার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। এর পর ওঁর কার্যকলাপের খুঁটিনাটি উনি কখনও আলোচনা করেননি। কিন্তু কথায় কথায় জানতে পারি যে ওই সময়ে ওঁর কর্মক্ষেত্র প্রায় সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিল এবং কমিউনিস্ট জগতের সব প্রধান নেতাদের সঙ্গেই উনি সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনার

সুযোগ পান। স্তালিন, মাও-জে-দঙ, চৌ-এন-লাই, হো চি মিন্—এঁদের সকলের সঙ্গেই ওঁর পরিচয় হয়েছিল।

কয়েক বছর পর যখন যুব সঙ্ঘের সেক্রেটারি হিসাবে রণজিৎদার কাজের মেয়াদ শেষ হল, তখন উনি দেশে ফিরে আসেন। যত দূর মনে পড়ে সনটা ছিল ১৯৫২। আমি তখন সরকারি কলেজের চাকরি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগ দিয়েছি বা শিগগিরই দেব। আমি চলে যাওয়ায় যে পদটি খালি হল, সেটি রণজিৎদা পেলেন। নিতান্তই আশ্চর্যজনকভাবে সরকার তখনকার মতো খেয়াল করলেন না যে মানুষটি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। উনি যে প্যারিসে কয়েক বছর বাস করেছেন এবং ফরাসি ভাষাটা ভালভাবে জানেন এই সংবাদে নিয়োগকর্তারা বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের রিপোর্ট আসবার আগেই উনি চাকরিতে যোগ দেন। অবশ্য রিপোর্টটি কর্তাদের হাতে পৌঁছনো মাত্রই ওঁর চাকরি খতম হয়। কর্তারা কি তখন জানতেন যে-দলের সভ্য হওয়ার অপরাধে রণজিৎদার চাকরি গেল, সেই দলই একদিন আড়াই দশক ধরে রীতিমতো নির্বাচন জিতে পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ রাজত্ব করবে? জানলে বেচারিদের হাত কচলে কচলে হাতের অর্ধেক চামড়া যে উঠে যেত! যা হোক ওঁকে বেশিদিন বেকার থাকতে হয়নি। তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সবে গুছিয়ে বসছে। ওঁর মতো লোক পেয়ে তাঁরা লুফে নিলেন। আমি যখন সকার বেকার তখনও রণজিৎদা যাদবপুরে পড়াচ্ছেন।

ওঁর বাসস্থান তখন ফার্ন রোডের একটি ফ্ল্যাটে। ওঁর প্রথমা পত্নী পোল্যান্ডের কন্যা মার্থা তখন দেশে এসে গেছেন। ফার্ন রোডের আড্ডায় ওঁরও একটি বিশেষ স্থান ছিল। আড্ডার অন্যতর আকর্ষণ ছিল একটি আলবোলা। (আশা করি আমার স্মৃতি আমাকে বিভ্রান্ত করছে না। পরে দিল্লিবাসের সময় আমি নিয়মিত গুড়ুক খেতাম। আশা করি তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছি না।) আলবোলা তৈরির ব্যাপারে যত দূর মনে পড়ে মার্থাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন।

কিন্তু তামাকই ওই আড্ডার একমাত্র আকর্ষণ ছিল না। সপত্নীক রণজিৎদা ছাড়াও ওই আড্ডার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল সদ্য কেমব্রিজ-প্রত্যাগত অমর্ত্য সেন, অক্সফোর্ডে আমার সহপাঠী প্রয়াত পরমেশ রায় এবং অনুজপ্রতিম শ্যামলেন্দু ব্যানার্জি, এবং মাঝে মাঝে মৃণাল দত্তচৌধুরী। আরও অনেকে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করতেন। তাঁদের সকলের নাম এখন মনে পড়ে না।

আগেই লিখেছি, ইংল্যান্ড বাসের সময় অমর্ত্যর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। ১৯৫৩ সালের ইস্টারের সময় আমরা বাসে চড়ে সাত-আট জন মিলে লেক ডিস্ট্রিক্ট বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে দলে অমর্ত্যও ছিলেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে নানা জায়গায় দেখা হত। অমর্ত্যও মাঝে মাঝে অক্সফোর্ড আসতেন। আমিও কেমব্রিজে বেড়াতে যেতাম। আর নানা সূত্রে কেমব্রিজে ওঁর রীতিমতো কীর্তিস্তম্ভ গড়ে উঠছে, সে খবর আমাদের কানে আসত।

সকার বেকার হয়ে আমি যখন রণজিৎদার বাড়ির আড্ডার অন্যতম প্রধান আড্ডাধারী, তখন সেই আড্ডার উজ্জ্বল রত্ন অমর্ত্য। কেমব্রিজে প্রথম শ্রেণিতে ট্রাইপস নিয়ে এবং অ্যাডাম স্মিথ প্রাইজ জিতে অমর্ত্য তখনই ভারতবিখ্যাত, দুনিয়ার ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ

অর্থনীতিবিদ মহলেও উদীয়মান প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছেন। কলকাতায় বসে তখন তিনি ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ থিসিস লিখছেন। আর সব কিছু ছাড়াও একটি ব্যাপারে ওঁর অসাধারণত্বর পরিচয় পেলাম। রণজিৎদার বাড়িতে বেশ প্রত্যুষেই আড্ডা বসে যেত। দশটা-এগারোটা নাগাদ অমর্ত্যও এসে যেতেন। জানতাম ঘণ্টা দুয়েক কাজ করে উনি আড্ডায় এসেছেন। ঠিক একটায় বাড়ি চলে গিয়ে খাওয়ার পর ঘণ্টা দুয়েক কাজ করে আবার সাড়ে চারটে-পাঁচটায় আড্ডায় হাজিরা দিতেন। অমর্ত্য বলতেন— সত্যিকার মাথার কাজ দিনে তিন-চার ঘণ্টার বেশি করা যায় না। যে ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগত তা এই যে মানুষটি মুহূর্তের মধ্যে আড্ডা ছেড়ে গভীর চিন্তাভিত্তিক গবেষণার কাজে ফিরে যেতে পারতেন। মনের এই সহজাত ডিসিপ্লিন আমি আর কারও ভিতর দেখতে পাইনি। পরে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে এক সঙ্গে কাজ করার সময় দেখেছি—আড্ডা দেওয়ার সময় ওঁর আর নেই। বহু এবং বিচিত্র কর্মে তখন তিনি ব্যস্ত। একই সঙ্গে বহু বিষয়ে গবেষণা করছেন, সরকারি-বেসরকারি বহু কাজে তিনি জড়িত, দেশে-বিদেশে অগণ্য সেমিনার-কনফারেন্সে বক্তৃতা করছেন। কলকাতায় কর্মজীবনের শুরুতে যে সহজাত ডিসিপ্লিন ওঁর চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছিল, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ওঁর বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য এনেছে। অনেক মানুষকে দেখেছি কারণে-অকারণে সর্বদাই এত ব্যস্ত যে নিশ্বাস ফেলা কেন, তাঁদের মরবারও সময় নেই। এই রকম শ্বাসরোধকারী অতিব্যস্ততা অমর্ত্যর জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। সঙ্কটের মুহূর্তেও দেখেছি তিনি কখনও হিমসিম খাচ্ছেন না, স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজ এবং তার সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক কর্তব্য করে চলেছেন। প্রসঙ্গত বলি, কলকাতায় প্রচণ্ড আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে যে ফেলোশিপ থিসিস অমর্ত্য লেখেন তার ভিত্তিতে প্রকাশিত 'চয়েস অফ টেকনিক' পঞ্চাশ বছর পরে এখনও বিক্রি হয়, লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে। তার প্রাসঙ্গিকতা এখনও নিঃশেষ হয়নি।

আড্ডাধারীদের মধ্যে প্রধানস্থানীয় ছিলেন আর একজন—পরমেশ রায়, অক্সফোর্ডে আমাদের সমসাময়িক, অর্থনীতির ছাত্র। এই মানুষটি বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় বিশ্বাসী এবং সর্বদাই তত্ত্বচিন্তার এক তূরীয় জগতে বিরাজ করতেন। অর্থনীতিবিদ হলেও তাঁর আসল ভালবাসা ছিল অঙ্কশাস্ত্রর সঙ্গে। এবং সবসময়ই হাতে তাঁর উচ্চতম অঙ্কশাস্ত্রবিষয়ক কোনও বই থাকত। মুখে একটি পাইপ গুঁজে মাঝেমধ্যে পরমেশ দু-একটি মন্তব্য করতেন। বাকি সময়টা পাইপটি প্রজ্জ্বলিত রাখার চেষ্টায়ই ব্যয়িত হত। কেন জানি না, ক্বচিৎ কখনও সে চেষ্টা সফল হত। সাধারণ সংসারী লোকের সঙ্গে ওঁর মিল সামান্যই ছিল। একটি কিছুটা 'ইয়ে ইয়ে' কাহিনি বলে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করি। অক্সফোর্ড থাকাকালীন এক খ্যাতনামা সুন্দরী পরমেশকে কিঞ্চিৎ নেকনজরে দেখতেন। অন্য কেউ হলে বর্তে যেত, কিন্তু স্বভাব-উদাসীন পরমেশের এ ব্যাপারে কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না। একদিন বিশেষ বিভ্রান্ত হয়ে পরমেশ তাঁর এক সমস্যার কথা নিবেদন করলেন। আগের দিন ডিনারের পর মেয়েটি পরমেশের ঘরে এসেছিল। তার পরের কাহিনি পরমেশের জবানিতেই বলি। "বুঝলে তপন, ওই জিন মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম। কাল আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ফিগার তোমার কেমন লাগে?' আমি বললাম, 'ঠিকই তো আছে।' ও বলল, 'ভাল

করে দেখে তো বলবে।' বলে জামাকাপড় খুলে ফেলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন দেখছ?' বললাম, 'সত্যি বলতে একটু পুরুষালী। কতকটা মাইকেল এঞ্জেলোর দিবা আর নিশার মতো।' মনে হল কথাটা শুনে ও খুব খুশি হল না। জামাকাপড় পরে নিয়ে বের হয়ে চলে গেল। আচ্ছা, আমি তো অকারণে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। আমি কি কিছু ভুল করেছি মনে হয় তোমার?' ভাবলাম বলি, নাঃ, তোমার কিছুমাত্র ভুল হয়নি। তুমি সত্যকাম, তুমি সত্যকুলজাত।

দেখতে দেখতে মাস তিনেক কেটে গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তে অচল-অনড়। উল্টে চিঠি দিলেন—অমুক তারিখের মধ্যে কাজে যোগ দাও, নয়তো সুদ সহ জলপানির টাকা ফেরত দাও। দিল্লি থেকেও চিঠি এল—সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে চাকরিটি অন্য লোককে দেওয়া হবে। শুনলাম কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে লিখেছিলেন, আমাকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। কোনও কাজ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উক্তিতে এক মারাত্মক সমাধানের ইঙ্গিত পেলাম। খোঁজ নিতে শুরু করলাম খেসারত দিতে যদি রাজি হই তবে তার পরিমাণ কী হবে। তাঁর পুত্র পার্থসারথি মারফত শৈবাল গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওঁর স্মরণাপন্ন হলে তিনি বললেন, 'দাঁড়াও দেখছি।' তিনি আমার আর এক শুভার্থী করুণা হাজরার পরামর্শ চাইলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন বিষয়ে উপদেষ্টা। এই ধরনের একটি কেস বছর দুয়েক আগে ওঁর কাছে এসেছিল। করুণাবাবু বললেন, 'স্টেট স্কলারশিপের দায়বদ্ধতার চুক্তিটি বহু বছরের পুরনো। তাতে খেসারতের একটা পরিমাণ উল্লিখিত আছে—পনেরো হাজার টাকা। আমি যেন ওই পরিমাণ টাকা কয়েক কিস্তিতে ফেরত দেব বলে দিল্লির চাকরি নেওয়ার অনুমতি চাই।' ওই উপদেশ অনুযায়ী দশ বছরে আমি টাকাটা ফেরত দেব বলে দিল্লি চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। শুনলাম শিক্ষামন্ত্রী বিনা খেসারতে আমাকে ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু প্রশাসন থেকে প্রবল আপত্তি হওয়ায় সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। দশ বছরে বার্ষিক ১৫০০ টাকা কিস্তিতে টাকাটা শোধ করব এই শর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে চুক্তি থেকে মুক্তি দিলেন। তখন খুবই রাগ হয়েছিল, কিন্তু পরে সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে দেখেছি— পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও অন্যায় করেননি। বরং আমিই আইনের সুযোগ নিয়ে যে-জলপানিতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, তার সামান্য অংশ ফেরত দিয়ে দিল্লি চলে যাই। এভাবে সবাইকে ছেড়ে দিলে স্কলারশিপের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যেত।

১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ট্রেনে দিল্লি রওনা হলাম। সেখানে বিচিত্র ভবিতব্য আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

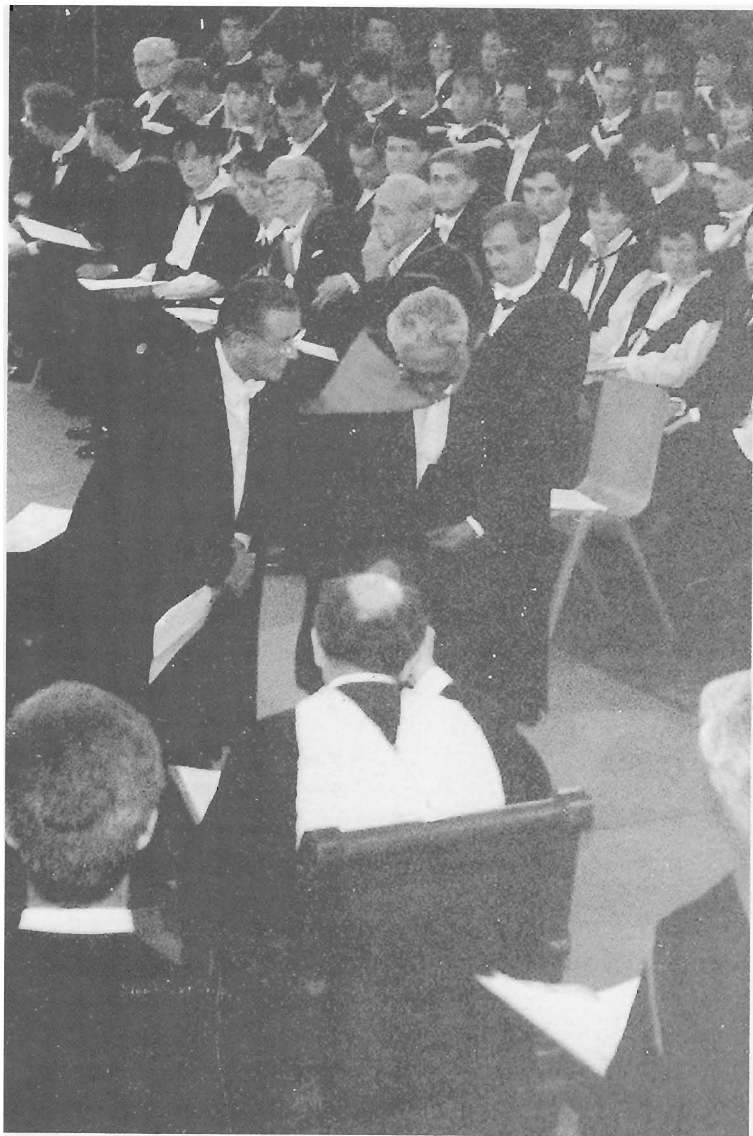
পুরনো দিল্লি স্টেশন থেকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধু ডক্টর সুকুমার দত্তর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। উনি তখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিন গণতান্ত্রিক চিনের দূতাবাসে কাজ করে সম্পূর্ণ অবসর নিয়েছেন। ওঁর স্ত্রী সাবিত্রী দত্ত বিদেশি সব দূতাবাসে ইংরেজি ভাষা শিখিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। জ্যাঠামশায় শৈশব অবধি বই পড়েই কাটিয়েছেন। ওঁর জ্ঞানচর্চায় যাতে কোনও বাধা না ঘটে, দেখলাম জেঠিমার প্রধান চিন্তা তাই নিয়ে। সংসারের হাল তিনি শক্ত হাতে ধরে আছেন। কোথাও কোনও অসচ্ছলতা বা অস্বাচ্ছন্দ্যর চিহ্ন নেই। যখন কলকাতায় পড়াচ্ছিলাম তখন বার দুই রোডস স্কলারশিপের ইন্টারভিউ দিতে দিল্লি গিয়ে ওঁদের বাড়িতে উঠেছি। শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি জীবনচর্যা—সব দিক থেকেই ওঁরা অন্য পাঁচটা বাঙালি পরিবার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন। ফলে মাঝে মাঝেই নানা জায়গায় ওঁদের সম্পর্কে কিছু কাটা কাটা মন্তব্য শুনতাম। যে-পারস্পরিক ঈর্ষা বাঙালি জীবনের অন্ধকার দিকটির কেন্দ্রস্থলে, মার্জিত রুচিবান এই পরিবারটি তার শিকার হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু ছিল না। জীবনে কয়েকটি অসাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। জেঠিমা অর্থাৎ সাবিত্রী দত্ত সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অন্যতমা। ওঁর মধ্যে যে-বিপুল সম্ভাবনা ছিল বাস্তব জীবনে তা ফলবতী হয়নি। কিন্তু সংসার চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নানা জনসেবার কাজের ভিতর দিয়ে উনি তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি কঠিন কাজ ছিল দেশবিভাগের সময় দুই দেশের বহু অপহৃতা নারীকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। এই কাজে উনি কয়েকবার পাকিস্তান যান। এই প্রসঙ্গে ওঁর কাছে যেসব মর্মন্তুদ কাহিনি শুনেছি, দেশবিভাগ বিষয়ে রচিত কোনও গল্প উপন্যাস বা সিনেমায় তার তুলনীয় কিছু আমার নজরে আসেনি।

দত্তভবনে কয়েকদিন থেকে আমার জন্য নির্ধারিত সরকারি বাসস্থান কনস্টিটিউশন হাউসের ৯৩ নম্বর ঘরে গিয়ে উঠলাম। এই বিচিত্র শাল্মলী তরুর কথা লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের অস্থায়ী বাসস্থান হিসাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে এই ব্যারাক গোছের একতলা বাড়িটি তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধের পর যখন স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হল, তখন এই ফৌজি ব্যারাক ভেঙে না ফেলে সাংসদদের বাসস্থানের কাজে লাগানো হল। পরে লোকসভার কিছু সভ্য এবং সরকারি কর্মচারীদের সাময়িকভাবে ওইখানে থাকার ব্যবস্থা হয়। তারও পরে ব্যারাকটি ভেঙে পাকা বাড়ি উঠেছে। কনস্টিটিউশন হাউসের আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটা বিশেষ জায়গা আছে। ইতিহাস-সচেতন কোনও দেশে যদি এরকম একটি বাসভবন থাকত তা হলে বাড়িটি ভেঙে ফেলার প্রয়োজন হলেও জায়গাটির ঐতিহাসিক মূল্য মনে রেখে একটি স্মৃতিফলক ওখানে রাখা হত। আমাদের এক দিকে ঘুষ-গুন্ডামি অন্য দিকে মোক্ষমুখিন সংস্কৃতিতে এইসব তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপারের দিকে নজর কিছু কম। মাত্র দশ বছর আগে স্বাধীন হওয়া দেশের মেজ সিঁড়ির নেতৃবৃন্দ এবং কর্মচারীদের বাসস্থান এই ব্যারাক ভবনে বাস করে প্রচুর শিক্ষা এবং আনন্দ পেয়েছিলাম। সে কথায় পরে আসছি।

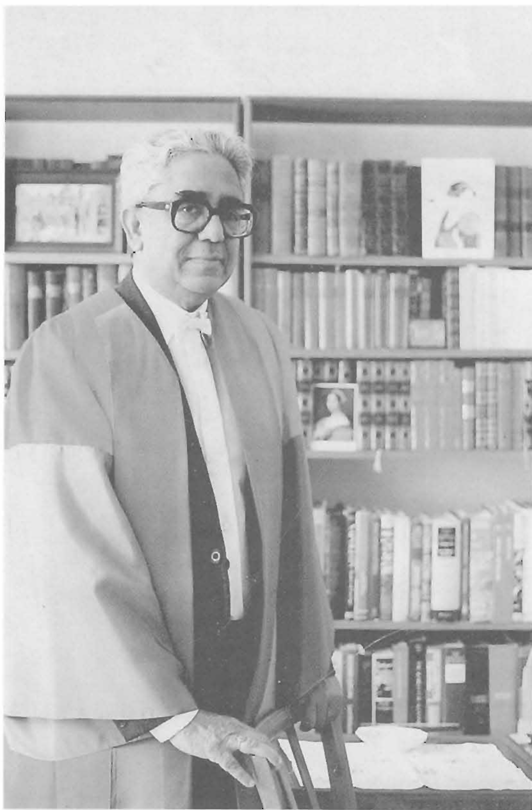
কনস্টিটিউশন হাউসে উঠে আসার আগেই কর্মস্থল ন্যাশনাল আর্কাইভসের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় সেরে নিয়েছি। জনপথের উপর ব্রিটিশ আমলের এই বিরাট দফতর-ভবন সত্যিই সুদৃশ্য। আমার জন্য নির্দিষ্ট অফিস ঘরটি দেখে আমার চোখ ছানাবড়া। আর্কাইভসের ডিরেক্টরের পদ তখন খালি। সুতরাং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আনাড়ি আমি ডিরেক্টরের পদে অ্যাকটিনি করতে নিযুক্ত। সেই সুবাদে ডিরেক্টরের জন্য নির্দিষ্ট অফিসটিই আমার অস্থায়ী অফিস—যতদিন না আসল ডিরেক্টরের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজদের তৈরি সেই মেজকর্তার অফিসে টেনিস না হোক ব্যাডমিন্টন খেলতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা না। এর আগে ইংরেজ আমলে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন আর্কাইভসের ডিরেক্টরের পদ কিছুদিন অলঙ্কৃত করায় পদটি বাঙালিদের এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিকদের চোখে বিশেষ সম্মানিত। লোকের ভুল ধারণা হয়েছিল যে, আমি সুরেনবাবুর পদটিই পেয়েছি। ফলে সব অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করে। কলকাতার উচ্চকোটির স্তবমণ্ডলীও আমাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করতে শুরু করেন। সেই 'পুতুল নিয়ে খেলা'র দু-একটি কাহিনি সামাজিক দলিল হিসাবে যথাস্থানে নিবেদন করব। আপাতত দফতর কাহিনিতে ফিরে যাই।

আর্কাইভসে কাজ করতে গিয়ে একটা কথা বারে বারেই মনে হয়েছে। আমাদের শাসনযন্ত্রের যেসব অভাবনীয় কার্যকলাপ দেখেছি, তাতে দেশে সব সরকারি কাজকর্ম কী করে মোটামুটি ঠিকভাবেই চলছে সে কথা আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঠেকেছে। মানে অন্তত তখন পর্যন্ত ট্রেন, পোস্ট অফিস এসব তো ঠিকভাবেই চলছিল। এখনও নেংচিয়ে নেংচিয়ে হলেও মোটামুটি ঠিকভাবেই চলে। আমি দেড় বছর সরকারি চাকরি করতে গিয়ে যেসব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি তাতে ভগবদকৃপা ছাড়া এই 'মোটামুটি চলা'র ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা চলে না। যেহেতু ওই কৃপায় আমার বিশ্বাস নেই, তাই ওই রহস্য আমার কাছে রহস্যই থেকে গেছে।

একটা উদাহরণ দিই। যখন কাজে যোগ দিই তখন আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর প্রায় শেষ হতে চলেছে। পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগেই প্রতিটি সরকারি দফতর বা ডিপার্টমেন্টকেই তাদের উন্নয়নমূলক প্রস্তাব পেশ করতে বলা হয়। জাতীয় অভিলেখাগারও যথারীতি এবং যথাসময়ে তাদের উন্নয়ন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। এই সাধু উদ্যোগ এবং সময়ানুবর্তিতার পেছনে একটি স্বার্থঘটিত কারণ ছিল। নানাবিধ আমলাতন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করে 'পিটার প্রিন্সিপল' বলে একটি বই আছে। তার অন্যতম বক্তব্য—সর্ব শ্রেণির আমলারই অন্যতর চেষ্টা মইয়ের যে-সিঁড়িতে সে-দাঁড়িয়ে, সেই সিঁড়িতে কাজের চাপ খুব বেশি, এই অজুহাতে পদের সংখ্যা বাড়ানো। উদ্দেশ্য পরোপকার না, আত্মোন্নতি। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের জায়গায় যদি চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়, তবে তাদের পরিদর্শন করার জন্য একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের জায়গায় অন্তত দুই জন ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তা ঘটলে যে-ব্যক্তি প্রথমে পদসংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাঁর পদোন্নতির সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। 'পিটার প্রিন্সিপল'-এর সত্যতা আর্কাইভসের উন্নয়ন প্রস্তাবে স্পষ্টই



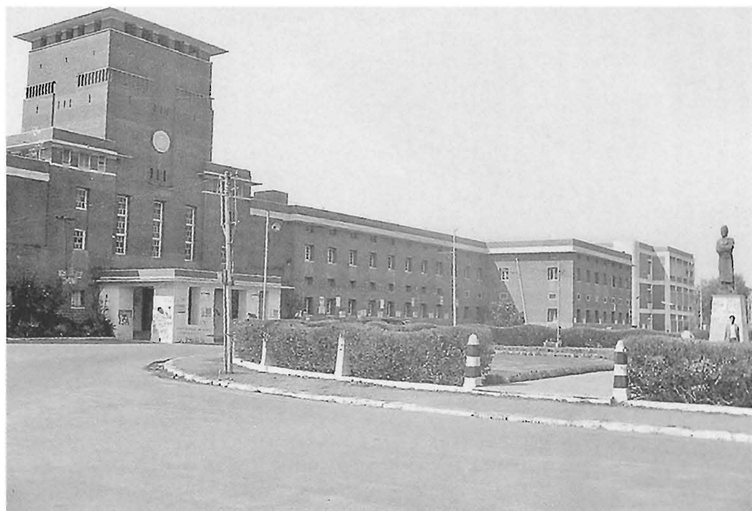
ডি. লিট ডিগ্রী গ্রহণের সময়



ডি. লিট গাউন পরিহিত আমি



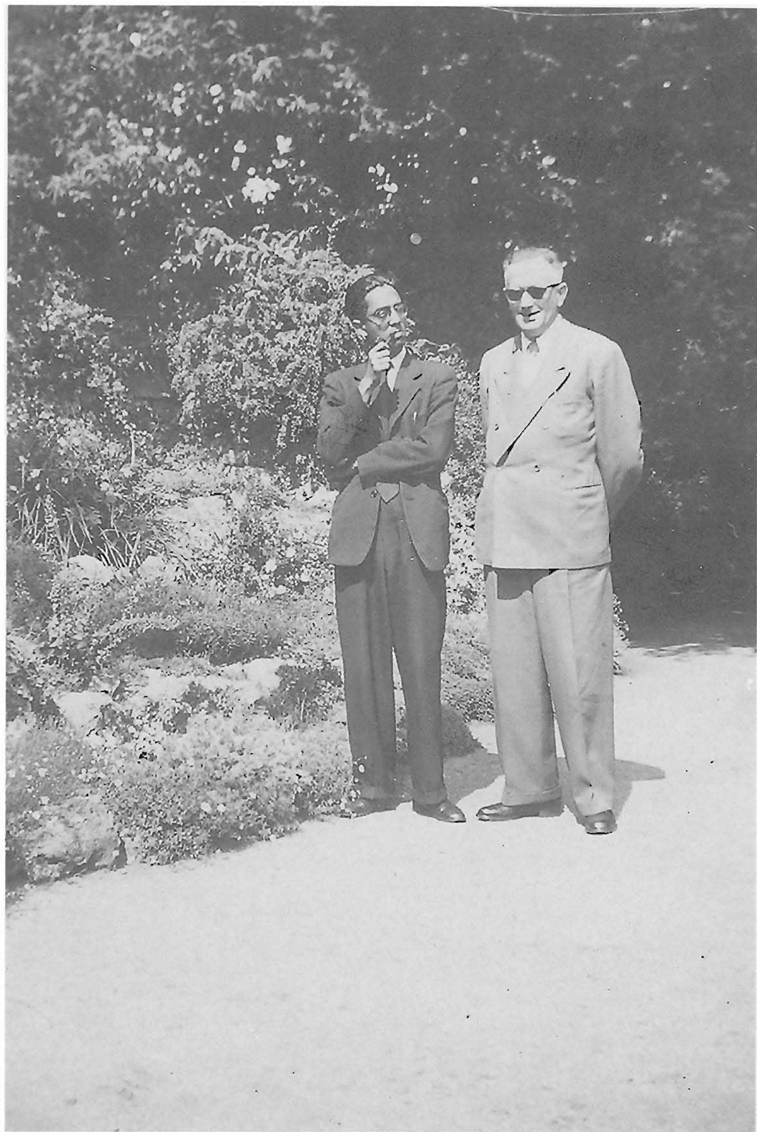
মাদাম সিমকি



দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়



দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের তখন রীতিমতো চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের দিন



হেগ-এ হের ইয়াপিকস-এর সঙ্গে আমি



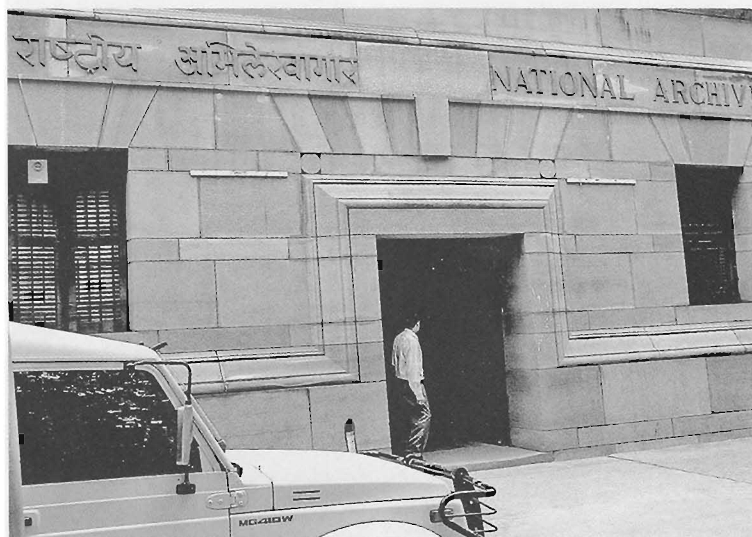
ডাচ চিত্রশালা মাউরিটসহাউস



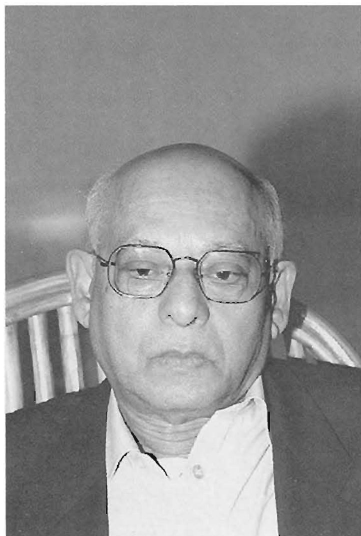
লেলি পরিবারের মেজো ছেলে ইডার সঙ্গে নৌকাবিহার। লগি ধরে আমি



হল্যান্ডের বন্ধুরা: ডানদিক থেকে প্রথম অরসরত্নম, চতুর্থ ড. ইয়াপিকস, পঞ্চম ক্রিস্তফ ব্রামন ও শেষে আমি



জাতীয় অভিলেখাগারে কাজ করতে গিয়ে বারে বারে মনে হয়েছে, ভগবদ্ কৃপা ছাড়া এ দেশের শাসনযন্ত্রের 'মোটামুটি চলা' ব্যাখ্যা করা যায় না।


রণজিৎ গুহ


মৌলানা আবুল কালাম আজাদ


সুরেন্দ্রনাথ সেন


ডক্টর ভি কে আর ভি রাও

প্রতিভাত ছিল। কর্ম অনুযায়ী ওই দফতরে চারটি বিভাগ ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ওই দফতর থেকে যেসব প্রস্তাব যায় তার মূল বক্তব্য ছিল এই যে কাজের চাপে কর্মীদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে হয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে প্রতি বিভাগেই পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানটিকে সহস্রপদী কীটে পরিণত করা অত্যাবশ্যক। না হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

যেদিন কাজে যোগ দিই, সেই দিন আমার টেবিলে 'অত্যন্ত জরুরি' মার্কা দেওয়া দুটি ফাইল ছিল। তার প্রথমটি শিক্ষামন্ত্রক থেকে ফেরত আসা আমাদের দফতরের উন্নয়ন প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটি প্রায় দেড় বছর আগে পাঠানো হয়েছিল। এখন মহামান্য শিক্ষামন্ত্রক জানাচ্ছেন যে জাতীয় স্বার্থে (অল্পদিন সরকারি চাকরি করে বুঝেছি যে জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও কারণে সরকারি চাকুরেরা কখনও কিছু করেন না। স্বজনপোষণ, উৎকোচগ্রহণ সবই ওই একই মহৎ উদ্দেশ্যে)। প্রস্তাবটা শতকরা বিশ ভাগ ছাঁটাই করতে হবে এবং ছাঁটাইকৃত প্রস্তাব যেন এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রকে ফেরত পাঠানো হয়। এ বিষয়ে কী কর্তব্য শৌরীনবাবুকে জিগ্যেস করলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন— আমলাতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী মূল প্রস্তাব যাঁরা খসড়া করেছিলেন, সেই অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টরদের কাছে কুড়ি শতাংশ ছাঁটাইয়ের কথা জানিয়ে নতুন প্রস্তাব তিন দিনের মধ্যে ফেরত চাওয়া। তিন না, দু' দিনের মধ্যে এই নোটের উত্তর পেলাম। মন্ত্রক-প্রস্তাবিত ছাঁটাই কার্যকরী হলে দেশের কী সর্বনাশ হবে সবাই সে কথা ওজস্বনী ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। আমি আরও এক মাত্রা চড়িয়ে নোট দিলাম যেন দেশের এই সমূহ সর্বনাশ থেকে বাঁচবার কথা ভেবে মন্ত্রক কোনও রকম ছাঁটাই না করেন। প্রায় দেড় বছর পরে আর্কাইভস যেদিন ছেড়ে যাই সেই দিন এই নোটের উত্তর আসে। শিক্ষামন্ত্রক আমাদের সুযুক্তি মেনে নিয়ে ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল করেছেন। ব্যাপারটায় সামান্য একটু অসুবিধে ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তখন আর দু বছর বাকি। প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই ছিল নতুন পদ সৃষ্টি করার। নতুন পদ সৃষ্টি এবং লোক নিয়োগ করতে অন্তত ছ' মাস লাগে। এবং অনেক সময়েই এক বছরের কমে কাজটা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং চরম উদ্যোগ নিয়ে কাজ করলেও পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের প্রস্তাবের কুড়ি শতাংশের বেশি পরিপূরণ করা সম্ভব না। অথচ সরকার উদারহস্তে আমাদের মূল প্রস্তাবের শতকরা একশো ভাগই মঞ্জুর করেছেন।

দ্বিতীয় যে-ফাইলটি সম্পর্কে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার হুকুম ছিল তার বিষয়বস্তু শৌরীনবাবুর ব্যক্তিগত জীবন—যা নাকি নিতান্তই কলুষিত। এ বিষয় অবিলম্বে অনুসন্ধান করে এবং কিংকর্তব্য সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানিয়ে আমি যেন অনতিবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রককে অবহিত করি। সাত দিন ফাইলটি ধরে রাখার পর মন্ত্রক থেকে শালা সাহেবের সই সংবলিত চিঠি পাই। বক্তব্য— ব্যাপারটা সরকারের চোখে অত্যন্ত জরুরি (মানে দামাদ সাহেবের পদোন্নতির জন্য শৌরীনবাবুকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা প্রয়োজন)। সুতরাং আমি যেন পত্রপাঠ আমার মতামত জানাই। উত্তরে আমি লিখি—কারও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা আমার নেই। এ বিষয়ে কী করতে হবে তা জানালে আমি অবশ্যই আদেশ পালন করব। এর কোনও উত্তর আমি পাইনি। নতুন

ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পর, তিনি নাকি শৌরীনবাবুকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দেন। শুনেছি ব্যাপারটা নেহরুর টেবিল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। উদারনীতিতে বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী জনস্বার্থের কোনও হানি না হলে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগে কারও চাকরি খাওয়ার বিপক্ষে মত দেন। ফলে দামাদ সাহেবের কর্মোন্নতিটা আটকে যায়। শৌরীনবাবুও যথা সময়ে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন।

আমলাতন্ত্রের অবিশ্বাস্য কর্মপটুতার আর একটি উদাহরণ দিই। নতুন কাজের প্রথম সপ্তাহেই আরও এক বিচিত্র ব্যাপারের মোকাবিলা করতে হয়। অভিলেখাগারের লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে একটি বেনামি চিঠি আসে। পরের ক'বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারি বেনামি চিঠি স্থানীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ কথা বলে রাজনৈতিক অশুদ্ধতার অপরাধে অপরাধী হলাম, সন্দেহ নেই। সে কথা যাক। উক্ত চিঠিটির মূল বক্তব্য লাইব্রেরিয়ানের এলটিটি ডিপ্লোমাটি গ্রন্থাগার-ঘটিত কোনও ব্যাপার নয়, প্রাইমারি স্কুলে পড়ানোর যোগ্যতার সার্টিফিকেট। সরকারি চাকরির নিয়ম—এরকম চিঠি এলে তা দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে না দিয়ে সযত্নে তার সত্যতা বিষয়ে অনুসন্ধান করা। এটা নাকি 'জাতীয় স্বার্থে' নিতান্তই আবশ্যিক। প্রতি সপ্তাহেই জাতীয় স্বার্থে এই রকম তিন-চারটি চিঠির মোকাবিলা করতে হত। ফলে জাতীয় স্বার্থে আমার পালনীয় অন্যান্য যেসব কর্তব্য সেগুলি কিছুটা ব্যাহত হত সন্দেহ নেই। যা হোক, লাইব্রেরিয়ান সাহেবের সার্টিফিকেটটি আনিয়ে দেখলাম, অভিযোগ সত্যি। এক্ষেত্রে কী কর্তব্য জানতে চেয়ে 'জেসি'কে 'ডিও' লিখলাম। [বি. দ্র. : এই বিচিত্র ভাষার ব্যাখ্যা একটু পরেই পাবেন।] ক'দিন পরে উত্তর এল—ভদ্রলোক দশ বছরের উপর ওই চাকরিতে বহাল আছেন। এখন কিছু করতে গেলে উনিই উল্টে মামলা করতে পারেন। এক্ষেত্রে তূষ্ণীভাব অবলম্বনই বিধেয়। অন্ধ্রপ্রদেশজ এই গ্রন্থাগারিক কর্তব্যপরায়ণ মানুষ ছিলেন। পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হলেও উনি গ্রন্থাগারের ভার পেয়ে লাইব্রেরিয়ানশিপ সংক্রান্ত অনেক পুস্তক পড়ে ফেলেছিলেন। ফলে মাঝে মাঝেই আমাকে মরাল অ্যান্ড মেটিরিয়াল ডিফেন্স অফ বুক্‌স বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন৷ বারে বারেই সাবধান করতেন—যেন এই দুই স্বতন্ত্র কর্তব্য আমি কখনও না গুলিয়ে ফেলি। ওঁর উন্নয়ন প্রস্তাবে দুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানের পদ সৃষ্টি করার অনুরোধ ছিল। একটি মরাল, অন্যটি মেটিরিয়াল ডিফেন্স অফ বুক্‌সের জন্য। এই দুই পরস্পরবিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে পুস্তক রক্ষার লড়াইয়ে উনি জীবনদান করেছিলেন। মরাল ডিফেন্স অর্থ বইয়ের যথাযথ শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি আর মেটিরিয়াল ডিফেন্স মানে বইয়ের শরীরটি যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু রণক্লান্ত যোদ্ধা কখনও কোনও বই চেয়ে পাঠালে তা উপস্থিত করতে পেরেছেন এমন কোনও ঘটনা আমার স্মৃতিতে নেই।

আগেই লিখেছি—জীবনে যে ক'জন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে শৌরীনবাবু তাঁদের অন্যতম। তিরিশের দশকে বহু প্রতিভাবান বাঙালি হিন্দু প্রথমে দীর্ঘদিন বেকারত্ব এবং পরে সামান্য মাইনেয় কেরানিগিরি জাতীয় চাকরি (খুব ভাগ্যবান হলে সাব-

ডেপুটিগিরি) করার অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। শৌরীনবাবু এই ভাগ্যহতদের একজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ এবং এম.এ পাস করার পর উনি অক্সফোর্ডের এক্সেটার কলেজে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আকস্মিক পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে ওঁকে সেইসব উচ্চাশা ছেড়ে চাকরির খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়াতে হয়। অনেক চেষ্টায় এবং সুরেন্দ্রনাথ সেনের অনুগ্রহে অভিলেখাগারে (তখন তার জমকালো নাম ইম্পিরিয়াল রেকর্ডস) একটি কেরানিগিরি জোটে। সৌভাগ্যক্রমে চাকরিটি সাধারণ বিভাগ থেকে টেকনিকাল বিভাগে স্থানান্তরিত হয় এবং বিশ-পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে উনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অভিলেখ-বিশারদ বলে স্বীকৃতি পান। চাকরিক্ষেত্রে ক্রমে উন্নতি হয়ে উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হন। নতুন সৃষ্ট ডেপুটি ডিরেক্টরের পদ এবং কালে ডিরেক্টরের পদের জন্য ওঁর চেয়ে যোগ্য লোক কেউ ছিল না। কিন্তু পূর্বোক্ত শালা-দামাদ কাহিনি সেই সম্ভাবনা ভেস্তে দেয়। সবাই আমাকে ভয় দেখিয়েছিল, 'ওখানে যাচ্ছ, সাবধান থেকো। শৌরীন রায় অতি সাংঘাতিক লোক। তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।' কার্যত এই সাংঘাতিক লোকটি আমাকে আন্তরিক সৌহার্দ্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং হাতে ধরে আর্কাইভসের কাজ আমাকে শিখিয়েছিলেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে কয়েকটি যোগ্য শিক্ষকের সন্ধান পেয়েছি—এ আমার পরম সৌভাগ্য। শৌরীনবাবু তাঁদের অন্যতম। নানা চতুর্থ শ্রেণির মানুষের অধীনে কাজ করেও উনি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের আত্মসম্মান এবং চরিত্রমাহাত্ম্য একটুও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। যন্ত্রণাদায়ক দারিদ্র্য আর অসম্মানের মধ্যে বাস করেও ওঁর জ্ঞানচর্চা কখনও বন্ধ হয়নি। ইতিহাস আর ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত এবং ফরাসি সাহিত্যে ওঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। মাতৃভাষার মতো সংস্কৃত বলতে পারতেন। সরকারি আমলারা ওঁকে যে চোখেই দেখুক, দিল্লির পণ্ডিতমহলে ওঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ওঁর বসবার ঘরে দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে।

চাকরিতে যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ার একটি কারণ ওঁর স্পষ্টবাদিতা এবং মূর্খজনোচিত আদেশ অগ্রাহ্য করার প্রবণতা। সরকারি বা যে-কোনও চাকরি করতে গেলেই দ্বিতীয় প্রবণতাটিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বড় জোর দু-একবার বিনীতভাবে নিজের আপত্তি জানিয়ে শেষ অবধি কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করতে হয়। শৌরীনবাবু এই নিয়ম মানতে রাজি ছিলেন না। দিল্লির সেক্রেটারিয়েট, বিশেষত শিক্ষামন্ত্রক, বহু এবং বিচিত্র সব মূর্খের আবাসস্থল ছিল। কিন্তু তাদের আদেশ অমান্য করলে শাসনযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। (আদেশ মানা সত্ত্বেও শাসনযন্ত্র কীভাবে চলছিল তাও অবশ্য এক চিরন্তন বিস্ময়ের ব্যাপার) সুতরাং অবাধ্যতার শাস্তি দিয়ে সরকার ভদ্রলোকের প্রতি অবিচার করেছিল এমন কথা বলতে পারব না। ওঁর আর একটি দোষ ছিল ক্ষমতাশালী লোকদের কারণে-অকারণে খোঁচানো। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অবধি গ্রীষ্মকালে সাহেবদের লেজ ধরে কিছু বড়-মেজ দেশি কর্তারা সিমলা পাহাড়ে উঠে যেতেন। এই ওঠা এবং গ্রীষ্মশেষে আবার সমতলভূমিতে নেমে আসা সরকারি মহলে বিশেষ শ্লাঘার ব্যাপার ছিল। বড়-মেজ আমলাদের বাড়িতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে 'কবে উঠছেন' এবং গ্রীষ্মশেষে 'কবে নামছেন' চলতি বাক্যালাপের অনিবার্য

অঙ্গ ছিল। এই জাতীয় বাক্যালাপের সময় শৌরীনবাবু উপস্থিত থাকলে নিষ্পাপ শিশুর মতো অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করতেন, 'কোন গাছে' বা 'কোন গাছ থেকে'। ওঁর এই জ্ঞানপিপাসা ওঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল—এমন কথা বলা চলে না।

শৌরীনবাবুর কাছ থেকে আমলাজীবনের সত্যি বা কল্পিত নানা কাহিনি শুনতাম। পাঠিকা-পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য তার দু-একটি নিবেদন করছি। বিদেশি শাসনের যুগে ক্ষমতার দিক থেকে প্রায় সব দেশি আমলাই নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ। তাই তাঁদের বিশ্রম্ভালাপের অন্যতর প্রধান উপজীব্য ছিল কোথায় কবে তাঁরা অসামান্য সাহস দেখিয়ে সাহেবকে নোট পাঠিয়েছিলেন এবং তার ফলে হতভাগ্য সাহেব কীভাবে কুঁকড়ে গিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন। এই আলোচনার ভাষা সরকারি নথিপত্রের বিশেষ এবং অতি বিচিত্র সংক্ষিপ্তকরণের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এবং পতিগর্বে গর্বিতা আমলাদের সহধর্মিণীদের বাক্যালাপও সরকারি জারগন-এ রত্নখচিত ছিল। ডি.ও (ডেমি-অফিসিয়াল), এফ.ও (ফাইনান্স অফিসার), ডি. এস (ডেপুটি সেক্রেটারি), জে. এস (জয়েন্ট সেক্রেটারি) ইত্যাদি নানা বিচিত্র আপাত-অর্থহীন আওয়াজে আমলাদের বৈঠকখানা মুখরিত হত। শৌরীনবাবুর কাছে শোনা একটি কাহিনি বড় উপভোগ্য ঠেকেছিল। এক মনোরম সন্ধ্যায় মোতিবাগবাসী কোনও ডেপুটি সেক্রেটারির ভবনে সরকারের অপদার্থতা বিষয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছিল। ডি.এস-এর পতিগর্বে গর্বিতা ধর্মপত্নী হঠাৎ আদুরে গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁগা, তুমি যে জে.এস-কে এফ.ও-র বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে ডি.ও লিখেছিলে সেই ফাইলের গল্পটা বলো না।'

একটি নিঃসন্দেহে কাল্পনিক কাহিনি পঞ্চাশের দশকে দিল্লির বাজারে চালু ছিল। আমলা এবং তাঁদের চারপাশের লোকের বোলচালের অন্যতর অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল—তাঁরা প্রভুদের কত ঘনিষ্ঠ এবং পেয়ারের লোক। তার চরম উদাহরণ নিম্নোক্ত কাহিনিটি। জনৈক সরকারি চাকুরের পদগর্বিতা পত্নী নাকি সব সময়েই বলতেন, 'ওঁকে না হলে লিথু ঠাকুরপোর এক মুহূর্তও চলে না।' পাঠিকা-পাঠক, চিনলেন লিথু ঠাকুরপো আর 'ওঁকে'? লিথু হচ্ছেন লর্ড লিনলিথগো আর 'উনি' তাঁর চাপরাশি।

জনৈক ফরাসি পণ্ডিত হেঁদুদের জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করে বিশেষ যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর মূল বক্তব্য—হেঁদুরা সমাজে আপসহীনভাবে স্তরবিন্যাসে বিশ্বাসী—হোমো হিয়েরার্কিকুস। অন্তর্নিহিত অন্যতর বক্তব্য, এই দোষ থেকে 'হোমো স্যাপিয়ান্স' নামক জীবশ্রেণির অন্য পাঁচটা প্রজাতি—যেমন সাহেবরা—প্রায় মুক্ত। সাহেবদের হিয়েরার্কিকুসতা বিষয়ে অন্যত্র কিছু বলব। কিন্তু বিদেশি শাসনমুক্ত দিল্লিতে কিছুকাল বাস করে আমার দুমঁ সাহেবের কথায় ফেত্ হয়েছিল সন্দেহ নেই। তবে হেঁদুদের কুসংসর্গের ফলে দিল্লিবাসী অন্যান্য সব জাতির মানুষও হিয়েরার্কিকুসতায় ভুগছে বলে আমার ধারণা। এই ব্যাধির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি জাতিভেদ উদারনীতিকরা বিশেষ নিন্দা করেন। দিল্লি শহরে ইংরেজ আমলে এই প্রথা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেয়। নতুন প্রথাটির নাম চাকরিভেদ প্রথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্ম অনুযায়ী বিভাগ করে জাতিভেদ সৃষ্টি তাঁর অন্যতম কীর্তি

বলে ভগবদ্গীতায় ঘোষণা করেছেন। ওঁর আইডিয়াটা নিয়েই ইংরেজরা চাকুরিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেন। তবে জয়েন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারির ছোঁওয়া চা খাবে না, সেক্যুলারপন্থী আধুনিকতার স্রষ্টা সাহেবরা এমন নিয়ম করেননি। কিন্তু ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে বিভিন্ন স্তরের চাকুরিজীবীদের মধ্যে বেশি মেলামেশা ঘটে সমাজ চাকুরিসঙ্করতায় আক্রান্ত না হয়। হঠাৎ ডেপুটি সেক্রেটারির ছেলে আপার ডিভিসন ক্লার্কের মেয়ে বিয়ে করলে সমাজের ভারসাম্য বিপন্ন হবে এ সত্য ওঁরা অবগত ছিলেন। কালে ডেপুটি সেক্রেটারি-সাহেব শ্বশুর সেকশন-অফিসারের পদধূলি নিচ্ছেন— এ চলে না। তাই চাকরিসঙ্করতা নিবারণার্থে নবগৌরাঙ্গপ্রভু ইন্দ্রপ্রস্থে বিভিন্ন স্তরের চাকুরেদের বাসস্থান বিভিন্ন পাড়ায় নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু কে না জানে ভারতীয়রা আতিশয্যপ্রবণ? বিশেষ করে আধুনিক পণ্ডিতদের মতে যে-লোকটি আমাদের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের মূল কারণ, সেই জওহরলাল নেহরুর এ ব্যাপারে বিশেষ দুর্বলতা ছিল। 'উন্নয়ন উন্নয়ন' বলে খেপে গিয়ে উনি সব পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনা বানালেন এবং সেইসব কাজ চালু রাখতে হাজার হাজার চাকরি সৃষ্টি করলেন। ফলে ইংরেজরা যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল। অবশ্যি জাতিভেদে অভ্যস্ত ভারতীয়রা ব্যাপারটা বেশি দূর এগুতে দেননি। কেরানিপুত্রের সঙ্গে ডেপুটি সেক্রেটারির কন্যার বিবাহ স্বয়ং মদনদেবও বিশেষ ঘটাতে পারেননি। কিন্তু এক ক্ষেত্রে সমূহ সর্বনাশ ঘটল। এর আগে দিল্লির আমলাতন্ত্রে কারও বাসস্থান কোথায় জানলেই সে কী স্তরের চাকরি করে তা বোঝা যেত, এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপ করা চলবে কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। নেহরুর নতুন চাকরি সৃষ্টির বাতিকের ফলে এই সুব্যবস্থা কিছুটা বানচাল হল। যত চাকরি তত বাসস্থান নেই। যে জয়েন্ট সেক্রেটারির বি টাইপ বাংলোয় থাকার কথা তাকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে মাসের পর মাস সি এমনকী ডি টাইপ বাসস্থানে থাকতে হত। চাকুরি-সচেতন বড় চাকুরিয়ারা এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হলে মরমে মরে থাকতেন।

এমনই এক দুর্ভাগার সঙ্গে আমার নিতান্তই আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমাদের এক পরিচিত ব্যক্তি ক'জনকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি শহরের উপান্তে ডি টাইপ ফ্ল্যাট পেয়েছেন। গিয়ে দেখি সেই শাল্মলী তরুতে শত শত লোকের বাস। ওঁর ফ্ল্যাটের নম্বর অনেক খুঁজেও না পেয়ে ভাবলাম কাউকে জিগ্যেস করি। একটি ফ্ল্যাটের বাইরে বাঙালি নাম লেখা নেমপ্লেট দেখে ঘণ্টা বাজালাম। দরজা খুলে উগ্রমূর্তি এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। বিগত জমানার রাজভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' বললাম মিস্টার ভট্টাচার্যের ফ্ল্যাটটা খুঁজছি। বেগুন তেলে ফেললে যে আওয়াজ হয় (মানে চিড়বিড় চিড়বিড়) ওঁর কণ্ঠস্বরে তার প্রতিধ্বনি শুনলাম। 'আমি কী করে জানব এইসব ডি টাইপ ফ্ল্যাটে কারা থাকে? আমার বি টাইপ বাংলোয় থাকার কথা আর ব্যাটারা নানা ছুতো করে এইসব বাজে লোকের মধ্যে আমাকে মাসের পর মাস ফেলে রেখেছে।' বলে ধড়াম করে দরজাটা আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দিলেন। হৃতমান এই উঁচু চাকুরের জন্য সত্যি বড় মায়া হল। পদমর্যাদা বলে কথা!

বাজে কথা ছেড়ে সরকারি চাকুরিজীবনের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। একটি স্মরণীয় দিনের কথা বলি। শৌরীনবাবু একদিন বললেন—সরকারি আদব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণির গেজেটেড

অফিসারদের চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি আছে। শিক্ষামন্ত্রী তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। এমন লোককে শ্রদ্ধা নিবেদন করা চাটুকারিতার পর্যায়ে পড়ে না, বরং অসামান্য সৌভাগ্য বলেই বর্ণনা করা চলে। আমি কংগ্রেসি পরিবারের ছেলে। বাল্যকাল থেকে জাতীয় নেতাদেরই দেশের সত্যিকার এবং ন্যায্য শাসক বলে জেনেছি। প্রতিবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের পর কাগজে তাঁর এবং তাঁর নিয়োজিত ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের ছবি বের হত। সভাপতিকে বলা হত রাষ্ট্রপতি। আমাদের চোখে তিনিই সত্যিকার রাষ্ট্রপ্রধান, তাঁর নিযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের প্রকৃত মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতি এবং বহুবার ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হিসেবে মৌলানার ছবি কাগজে দেখেছি। আর ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন যখন এল, তখন তো আলোচনায় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে উনিই প্রধান প্রবক্তা। সুতরাং শৌরীনবাবুর উপদেশ অনুযায়ী নির্দ্বিধায় মৌলানার সেক্রেটারিকে টেলিফোন করে সাক্ষাতের দিন চেয়ে নিলাম।

নর্থ ব্লকে শিক্ষামন্ত্রকের দফতরে গিয়ে মন্ত্রীমশায়ের সেক্রেটারির ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। সেক্রেটারি ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে উনি ভারতবর্ষের অলিম্পিক হকি টিমের নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন। আর মনে আছে—ভদ্রলোক অসাধারণ সুপুরুষ। ওঁর ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু উনি তখন মন্ত্রীর ঘরে। এক সময় শাহজাদা-মার্কা অভিজাত চেহারা এবং উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহজাত এবং সহবতলব্ধ অমায়িকতা সহ ভদ্রলোক এসে আমাকে আদাব জানালেন এবং সংক্ষেপে বললেন, 'তশরিফ লাইয়ে।' মন্ত্রীমশায়ের ঘরটি বিরাট। তার এক প্রান্তে মোগল সম্রাটের মতো রাজকীয় চেহারা নিয়ে মৌলানা আজাদ বসে আছেন। ওঁর সামনের টেবিলটিতে কাগজপত্র কিছু নেই। শুনতাম—ওঁকে ফাইলের বক্তব্য মুখে মুখে সংক্ষেপে বলা হত। উনি সব শুনে নিয়ে উর্দুতে ওঁর আদেশ বা মন্তব্য লিখে দিতেন। কখনও-বা ওঁর মৌখিক আদেশ অন্য কেউ লিখে নিত, উনি শুধু উর্দুতে সই করে দিতেন।

ওঁর সামনে এসে মনে হল যেন সত্যিই রাজসমীপে উপস্থিত হয়েছি। নর্থ ব্লকের বিশাল অফিসঘরটি হঠাৎ যেন লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাস-এ পরিণত হয়েছে। চারদিকে তাকালেই দেখতে পাব আশাসোটা-ঢাল-তলোয়ার-বল্লম হাতে সব আহাদি আর দেহরক্ষকরা দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবেলা থেকে যাঁর নাম শুনে এসেছি এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্বর মুখোমুখি হয়ে সত্যিতে কেমন যেন বিহ্বল লাগছিল। মন্ত্রী বোধ হয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। দেখলাম ওঁর মুখে মৃদু হাসি—বরং বোধ হয় বললে ঠিক হবে, মনে হল উনি হাসি চাপবার চেষ্টা করছেন। নিজেকে সামলে নিয়ে সেক্রেটারি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জনাবকে বলুন আমি উর্দু বুঝি, কিন্তু বলতে পারি না, সেজন্য লজ্জিত।' এ কথা বলার কারণ মৌলানা সাহেব ইংরিজি ভাল জানলেও উর্দু ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় কথা বলতেন না। হাত তুলে উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

আমার জীবনের এই স্মরণীয় দিনটিতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। নিয়মমাফিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সেক্রেটারি ওঁর নির্দেশমতো আমাকে দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। ব্যস, এর বেশি কিছু ঘটেনি। কিন্তু ওই দিনটির স্মৃতি

আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে স্মৃতি রাজদর্শনের, যে-রাজা মহামানবও বটে।

শিক্ষামন্ত্রকের সামান্য চাকুরে হিসেবে মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আর একবার পরোক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। সে ঘটনাটি বেশ অস্বস্তিজনক। জাতীয় অভিলেখাগারের মুখপত্র একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল। তার নাম 'ইন্ডিয়ান আর্কাইভস'। প্রতিষ্ঠানটির 'অ্যাকটিনি ডিরেক্টর' হিসেবে আমি তার সম্পাদক। ১৮৫৭-র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ওই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের একটি প্রামাণ্য বিবরণী লেখেন। একই সময়ে ডক্টর তারাচাঁদ ভারত সরকারের কাছ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিস্তৃত ইতিহাস লিখবার দায়িত্ব পান। এই দায়িত্ব প্রথমে ডক্টর রমেশ মজুমদারকে দেওয়া হয়। এবং এইসব নিয়ে অনেক দলাদলি রেষারেষির ঘটনা ঘটে। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি—এই দলাদলিতে আমিও জড়িয়ে পড়ি এবং 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি'তে ডক্টর তারাচাঁদের বইয়ের বেনামিতে এক সমালোচনা লিখি। কাজটা পরে নিজের চোখেই জঘন্য বলে মনে হয়েছিল। যদি স্বনামে লিখতাম তা হলেও ব্যাপারটা গৌরবের হত না, কারণ সমালোচনার ভাষায় প্রবীণ পণ্ডিতের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধা রেখে লেখা প্রয়োজন তার চিহ্নও ছিল না। যাঁদের পাল্লায় পড়ে কাজটা করি, তাঁদের আমি দোষ দিচ্ছি না, কারণ আমি তখন নাবালক নই। কিন্তু এই কুকার্যটি করে একটি সুশিক্ষা হয়। দিল্লি এবং ভারতবর্ষব্যাপী শিক্ষাজগতে যখন দলাদলির বান ডাকল—এবং যে দলাদলিতে যোগ দিলে বিশেষ লাভবান হতাম, অন্তত কিছু প্রভাবশালী লোক এবং তথাকথিত বন্ধুর নিরঙ্কুশ শত্রুতার ফল ভুগতে হত না, তখন ওই একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে নিজেকে দূরে রাখতে পারি। এত গ্লানিবোধ জীবনে আর কখনও হয়নি। পরে দেখেছি বাস্তবিকই আমার পরিচিত দলবাজদের ভালমন্দ বোধ লোপ পেয়েছিল। বিচিত্র কুকর্মকে মানুষগুলি প্রকৃত আদর্শভিত্তিক সৎকাজ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। ঈশ্বরবিশ্বাসী হলে বলতাম ওই চরম দুর্গতি থেকে স্রষ্টাপুরুষ আমাকে রক্ষা করেন।

যাক, যে-ঘটনা প্রসঙ্গে এইসব কথা বললাম, সেই কথায় ফিরে যাই। আমি কাজে যোগ দেওয়ার আগেই সুরেনবাবুর লেখা বইটি আমাদের পত্রিকায় সমালোচনার জন্য পেন্ডেরেল মুনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। পেন্ডেরেল মুন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় কংগ্রেসি বন্দিদের প্রতি যে-ব্যবহার করা হচ্ছিল তার সমালোচনা করে এই ইংরেজ আইসিএস অফিসার তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু গাঁধীশিষ্যা অমৃত কউরের ভাইকে একটি চিঠি লেখেন। যত দূর মনে পড়ে সেই চিঠিতে অথবা ওঁর লেখা আর কোনও ব্যক্তিগত চিঠিতে '৪২-এর আন্দোলন নীতির দিক থেকে নিন্দনীয় নয়, এই রকম কিছু উক্তি ছিল। তখন সরকারের সেন্সর বিভাগ থেকে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও নিয়মিত খোলা হত। মুন সাহেবের ওই চিঠি পড়ে ওঁর কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। এবং এই নিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকা সাম্রাজ্যবিরোধিতার অভিযোগ তুলে ওঁর পদত্যাগ দাবি করে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে ভদ্রলোক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যান। বাকি জীবন উনি অক্সফোর্ডে গবেষণা করে কাটান। '৭৩ সালে অক্সফোর্ডে পড়াতে এসে এই বিচিত্র মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের সুফলে বিশ্বাসী এই বনেদি ঘরের ইংরেজ

সন্তান কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের নানা অনাচার, বিশেষত জাতিবৈর সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় লিখেছেনও বটে। ইংরেজ সংস্কৃতিতে একটা ন্যায়বিচারের ঐতিহ্য আছে। মুন সেই ঐতিহ্যে আপসহীনভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে উনি হোয়াইট হলের বড়কর্তাদের কাছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে ওঁর যেসব ধারণা তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। কর্তারা দু-চার কথা শুনে যা মন্তব্য করেন তার মর্ম এই : 'দেখো বাপু, ভারতবাসীদের গণতন্ত্র শেখাবার জন্য আমরা ওখানে বসে নেই। ওদেশে ইংরেজদের বহু কোটি পাউন্ড আমানত আছে। আমরা রয়েছি তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে।' যখন ইস্কুলে আইসিএস পরীক্ষায় বসবার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ দিতে ওই হোয়াইট হল থেকেই লোক এসেছিল, তখন কিন্তু আবেদনটা ছিল 'সাদা মানুষের বোঝা'র নামে। যাক গে, নেহরুজি প্রধানমন্ত্রী হয়ে মুনকে আমন্ত্রণ জানান—ওঁর পরিকল্পিত যোজনার কাজে এসে সাহায্য করতে। এই আমন্ত্রণের অন্যতর কারণ—মুন যোজনায় বিশ্বাসী ছিলেন। এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনাগুলি ভারতের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এ কথা উনি বারবারই লিখেছেন। ফলকথা মুন নেহরুজির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং যোজনার কাজে পরামর্শদাতা হিসেবে ভারত সরকারের চাকরিতে যোগ দেন।

আমি কাজে যোগ দেওয়ার দু-চারদিন আগে মুনের লেখা সুরেনবাবুর '১৮৫৭'-এর সমালোচনা দফতরে পৌঁছে গেছে। সাহেব দেখলাম বইটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে অন্যত্র। বইটির ভূমিকা লেখেন মৌলানা আজাদ। জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সেই ভূমিকা ঐতিহাসিকের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। মুন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সোজা কথা বলার আদর্শে অবিচল থেকে মৌলানার ভূমিকা অনৈতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত পত্রিকায় স্বয়ং মন্ত্রীর লেখার সমালোচনা হবে? সবাই হাহাকার করে উঠল। সবুজ শৃঙ্গবিশিষ্ট আমি এতে চিন্তার কোনও কারণ দেখিনি। কিন্তু দপ্তরব্যাপী হাহাকার উপেক্ষা করা চলে না। তাই আমি মন্ত্রীর মতামত প্রার্থনা করে সমালোচনাটি ওঁকে পাঠিয়ে দিলাম। আর সেই সঙ্গে মুন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম। দেখা হলে বললাম, 'একটু মুশকিলে পড়েছি। মানে সরকারি দপ্তরের মুখপত্র ওই পত্রিকা। আর মন্ত্রীর রচনার সমালোচনা। যদি সুরটা একটু নরম করা সম্ভব মনে করেন। হেঁ হেঁ।' মুনের স্পষ্ট উত্তর, 'না ছাপালেই হয়। নরম-টরম আমি করতে পারব না।' আমি বললাম, 'সে হয় না। বদলাতে না চান তো যেমন আছে তেমনিই ছাপাব।' এবার সাহেব একটু নরম হলেন। বললেন, 'আচ্ছা, রেখে যাও। দেখি কী করা যায়।' ক'দিন পর মৌলানার নোট পেলাম, 'নির্দ্বিধায় মুনের সমালোচনা ছাপাও। আমার কোনও আপত্তি নেই।' একই সময় দিয়ে সাহেবের কাছ থেকে নব কলেবরে সমালোচনাটি ফেরত এল। সেটিই ছাপা হল। আসলে মন্ত্রী বলে না, মানুষটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি বলে কঠিন ভাষায় ওঁর লেখার সমালোচনা ছাপাতে আমার মন সরছিল না।

আর্কাইভসে কাজ করবার সময় অন্যতর স্মরণীয় অভিজ্ঞতা কনস্টিটিউশন হাউসে বাস। স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকজন ছোট-মেজ সরকারি কর্মচারী ওখানে বাস করতেন বটে। কিন্তু অধিকাংশ বাসিন্দা হয় রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য—যাঁরা দিল্লিতে সংসার

পাতবার ঝামেলা পোয়াতে চাননি, অথবা আমাদের মতো অকৃতদার তরুণ-তরুণী। ওখানকার বন্ধনমুক্ত জীবনে ওই দ্বিতীয় শ্রেণির বাসিন্দারা মাঝে মাঝে একটু উচ্ছল হতেন ঠিকই, তবে বড় ধরনের কেলেঙ্কারি কখনও কিছু ঘটেনি। বয়স্ক দু-একজন বাসিন্দা অবশ্য আমাদের কার্যকলাপ বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন। এতগুলি অল্পবয়সি মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে ঘুরছে, অনেক রাত অবধি হো-হো হা-হা করে আড্ডা দিচ্ছে, হোলির দিনে মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে রং খেলছে। এ কি বৃন্দাবন ধাম পেয়েছে? কেষ্ট ঠাকুরের যা মানায় সরকারি চাকুরেরা সেই চালে চলবে? এগুলি মরাল টার্পিচ্যুডের ফর্দে পড়ে না? এঁদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক অকৃতদার এক ব্যক্তি নিজেকে সেন্সরের পদে নিযুক্ত করেন। উনি রাত ন'টা-দশটা নাগাদ রুদ্ধদ্বার ঘরগুলির ভিতর উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে একবার সমস্ত হস্টেলটা টহল দিতেন। টহলরত অবস্থায় একদিন আমার মুখোমুখি পড়ে যান। কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করায় ভদ্রলোক সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন, 'এই তিরানব্বই আর চুরানব্বই নম্বর ঘর দুটো একটু দেখে যাব।' আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ শয়তানের চেলা ছিল অমর সান্যাল। এমআইটি থেকে পাস করে অধ্যাপক মহলানবিশের উৎসাহে অমর যোজনা ভবনে চাকরি নিয়েছিল। লঘু-গুরু ভেদ করতে সে নিতান্তই নারাজ। একদিন ও ওই সেন্সর ভদ্রলোককে সরল মুখ করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনার কী করে চলে?' 'মানে?' 'মানে বিয়ে-থা করেননি তো, তাই ভাবলাম জিজ্ঞেস করি।' বলে ব্যাপারটা আরও সরল এবং প্রাকৃত ভাষায় বুঝিয়ে দিল।

কনস্টিটিউশন হাউসে প্রেম-ভালবাসা অল্পবিস্তর হত না এমন না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গর্হিত কাজও ঘটত। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জায়গাটাকে হারেম হিসেবে ব্যবহারের তালে থাকতেন। একজন বিখ্যাত ব্যক্তির 'বান্ধবী' আমাদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। দেখতাম রাত একটু গভীর হলে তাঁকে নিতে গাড়ি আসত। একদিন এক ডাকসাইটে মন্ত্রীর বাড়িতে চাকরির ইন্টারভিউর জন্য মহিলাটির তলব হয়। ইন্টারভিউর সময়টা একটু অসাধারণ। রাত এগারোটা। উনি যাবার সময় অমরকে বলে গেলেন, 'অত রাতে একা ফিরতে চাই না। তোকে ফোন করব। তুই গিয়ে আমাকে নিয়ে আসিস।' সেই ফোন এল রাত দুটোয়। মহিলা উচ্ছ্বসিত। চাকরি হয়েছে। পরের দিন আমরা ভোজ খেলাম। ইন্টারভিউটা একটু বেশিক্ষণ চলেছিল। হবেই তো। বেশ মোটা মাইনের চাকরি।

কনস্টিটিউশন হাউসে থাকবার ঘর এবং সংলগ্ন বাথরুমের বিলিব্যবস্থায় একটু বৈচিত্র্য ছিল। পাশাপাশি দুটি ঘরের জন্য একটি করে বাথরুম। দুই ঘর থেকেই বাথরুমে ঢোকা যায়। যিনি ব্যবহার করছেন তিনি প্রতিবেশীর দিকের দরজাটি ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ করে দিতেন। আর বাথরুম ছেড়ে বের হবার আগে ওটি খুলে দিয়ে যেতে হত। কারণ না খুললে প্রতিবেশীর বাথরুমে ঢুকবার পথ বন্ধ। এই যৌথ বাথরুম ব্যবস্থায় আরও অসুবিধে ছিল। ব্যবহার করার সময় প্রতিবেশীর দিকের দরজাটি বন্ধ করতে ভুলে গেলে বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারত। বিশেষত যদি পাশের ঘরের বাসিন্দা অন্য লিঙ্গের মানুষ হতেন। সরকারের সুব্যবস্থায় ঘর বিলি করার সময় লিঙ্গভেদের দিকে কোনও দৃষ্টিপাত করা হত না।

উঠতি গণতন্ত্রে এরকম হওয়ারই কথা। যেখানে সবাই সমান সেখানে আবার ভেদাভেদ কেন? ফরাসিরা নাকি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে-সামান্য পার্থক্যটুকু আছে সেটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশেষ যত্নবান। ভোগবিরোধী ভারত সরকারের সেসব বালাই ছিল না। ফলে আমি যাঁর সঙ্গে বাথরুম ভাগে ভোগদখল করতাম তিনি ছিলেন এককালের বিখ্যাত নর্তকী উদয়শঙ্করের দলের মাদাম সিমকি। তখন তিনি সরকারি চাকরি করে জীবিকানির্বাহ করছেন। আমি কিছুটা ভুলো স্বভাবের মানুষ। বাথরুম ব্যবহার করার সময় মাদাম সিমকির দিকের দরজাটা বন্ধ করতে কখনও ভুলিনি ঠিকই, কিন্তু স্নানাগার ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে দরজাটি ছিটকিনিমুক্ত করতে প্রায়ই ভুলে যেতাম। ফলে ধুন্ধুমার কাণ্ড। অফিস পৌঁছেই শ্রীমতী সিমকির ক্রুদ্ধ টেলিফোন পেতাম। চাপরাশি আমার ঘরের চাবি নিয়ে দৌড়াত। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে শ্রীমতীর দরজায় শুধু নাকে খত দেওয়া বাকি থাকত। বলতাম 'আপনি আমার ঘরের একটা চাবি রেখে দিন।' কিন্তু এই সহজ সমাধানে উনি কিছুতেই রাজি না। অন্য লোকের ঘরে উনি কিছুতেই ঢুকবেন না। কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম ঘর বদলে দিতে। তাঁরা স্বাধীন ভারতের আমলাতন্ত্রের মূলমন্ত্র আবৃত্তি করলেন, 'দেখেঙ্গে।' আসলে ওই দেখার ব্যাপারে ওঁদের কোনও উৎসাহ ছিল না। ওঁরা যা দেখছিলেন তা হচ্ছে মজা। এই নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে ওঁরা নিতান্তই নারাজ।

একবার অমর্ত্য কদিনের জন্য অতিথি হয়ে আমার ঘরে বাস করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে তাঁর বিস্মিত প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হল। 'কী ব্যাপার বলুন তো। স্নান করে বাথরুম থেকে বের হয়ে আসছি। আচম্বিতে ওদিককার দরজা খুলে একটি মহিলা এসে বললেন—ইউ মাস্ট নট শাট মি আউট লাইক ইওর ফ্রেন্ড।' ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। ওটা কোনও আমন্ত্রণ না। চেতাবনি।

তখন দেশ সবে দশ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে। পুরনো আদর্শবাদ এবং তদনুসারী জীবনযাত্রা, বিশেষ করে তীব্র জাত্যভিমান তখনও সকলের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়নি। কনস্টিটিউশন হাউসে যেসব ছোট-মেজ নেতা বা সাংসদরা এসে সাময়িকভাবে বাসা বাঁধতেন, তাঁদের অনেকের আচরণে সেই জাত্যভিমান বা জীবনাদর্শের বিচিত্র প্রকাশ নজরে পড়ত। এঁদের কারও কারও চোখে স্বাধীন ভারতের সরকারি আমলা আর সাংসদদের জন্য বিলাতি কেতায় টেবিল-চেয়ারে এবং কাঁটা-চামচে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিতান্তই বিজাতীয় ঠেকত। এঁদের মধ্যে এক চরমপন্থী সাংসদ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর দাবি তাঁকে মাটিতে আসন পেতে খেতে দিতে হবে এবং ভূম্যাসনে বসে তিনি কবজি ডুবিয়ে খাদ্যবস্তু মুখে তুলবেন। খাওয়ার ঘরে টেবিলে বিলাতি কেতায় ছুরি-কাঁটা সাজানো থাকলেও বেশ কয়েকজন আবাসিক ঈশ্বরদত্ত অঙ্গুলির সাহায্যেই ভোজনকার্য সমাধা করতেন। বাদামি বর্ণ সাহেবকুলকে এই কলা দেখানোর দৃশ্য আমার ভালই লাগত, যদিও নিজে কখনও সাহস করে নতুন ভব্যতার আদর্শ লঙ্ঘন করিনি। কিন্তু চারিদিকে টেবিল-চেয়ারের মাঝখানে আসন পেতে বসে খাওয়ার দাবি কেটারার ভ্রাতৃদ্বয় মানতে পারলেন না। ফলে দাবিদার টেবিলের উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে হস্তদ্বারা ভোজন শুরু করলেন। কনস্টিটিউশন হাউস জাতীয়তাবাদের এই অসামান্য প্রকাশে স্তম্ভিত। অনেক কোশিশ করে

ভদ্রলোককে নিজের ঘরে ভূম্যাসনে বসে খেতে রাজি করানো হল।

ওড়িশা রাজ্য থেকে আগত লোকসভার দুই সভ্য তাঁদের গাঁধীবাদী জীবনাদর্শ অন্যভাবে প্রকাশ করতেন। গ্রামবাসী এই দুই দেশপ্রেমিকের কাছে জুতো জিনিসটা বোধ হয় বিশেষ মূল্যবান ছিল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় বস্তুটি ব্যবহার করে অকালে তার তলা খসানো কোনও কাজের কথা না। তাই এঁরা যখন পথে বার হতেন এঁদের সঙ্গে একটি করে গামছা থাকত। বারান্দা থেকে রাস্তায় নামবার আগে ওঁরা জুতোজোড়া সযত্নে খুলে গামছায় জড়িয়ে বগলস্থ করতেন এবং ফিরে এসে ওই গামছায়ই পা মুছে জুতো পরতেন। কনস্টিটিউশন হাউসের ভিতরে এঁদের পাদুকাহীন অবস্থায় কখনও দেখা যেত না।

ছোটা সিং আর বড়া সিং বলে বর্ণিত দুই ভাই আমাদের কেটারার ছিলেন। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবেই তাঁদের চোট্টা সিং আর ডাকু সিং উপাধি দেওয়া হয়েছিল। মাত্র দুশো আড়াইশো টাকায় ওঁরা চারবেলা যা-খেতে দিতেন তা একঘেয়ে হলেও কোনও অর্থেই খারাপ ছিল না। শুধু নেহরু পরিবারের দু-একজন আর ক্ষমতাশালী লোকদের কৃপাভাজন কিছু বেচারা লোক ওখানে থাকতেন। তাঁরা অন্যদের তুলনায় একটু খাতিরযত্ন বেশি পেতেন। এটা অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। কতকটা সেই কারণেও কেটারারদের চৌর্যখ্যাতি বেড়ে গিয়েছিল। এক দিক দিয়ে ছোটা সিং বিশেষ প্রতিভাবান ছিলেন। লোকটি অসম্ভব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মিথ্যা কথা বলতে পারত। ওখানে কেটারারদের সঙ্গে কথা বলে নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বিশেষ খানার ব্যবস্থা করা যেত। এক মহিলা আবাসিক একবার নীহারবাবুকে (নীহাররঞ্জন রায়) রাত্রে খেতে বলেন। সেদিন খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখি মহিলা বাক্যে এবং দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করছেন। ছোটা সিং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা নিম্নরূপ। মহিলা অতিথির জন্য হাঁস রান্নার ফরমাস দিয়েছিলেন। খেতে বসে দেখেন যা পরিবেশন করা হয়েছে তা দ্বিপদ না চতুষ্পদ—পাঁঠা। ছোটা সিং বলছেন, 'জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না। তবু সত্যিটা কী ঘটেছে শুনুন। আপনাদের জন্য হাঁসই কেনা হয়েছিল। বাবুর্চি তাকে বধ করতে যাবে। তখন সে সকলের মায়া কাটিয়ে উড়ে গেল।' ছোটা সিংয়ের কল্পনায় প্রয়োজন হলে হাঁস কেন হাতিও উড়ে যেতে পারত।

ইতিমধ্যে চাকরিজীবনে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছিল। শালা সাহেবের উদ্যম শৌরীনবাবুকে ঘায়েল করেই শেষ হয়নি। আমিও তো দুলাভাইয়ের পথের কাঁটা। সুতরাং তাঁর পদোন্নতির পথ মুক্ত করার জন্য আমাকেও সরানো প্রয়োজন। আমার সঙ্গে মানুষটির কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। অতি অমায়িক ব্যবহার। সজনী দাস-ব্যবহৃত অমায়িক খচ্চর কথাটার অর্থ কী, এই দ্বিপদকে দেখে সে বিষয়ে কিছু ধারণা হল। ঐতিহাসিক পি এম জোশী আমাকে বলেন, 'লোকটা বড় মার্জিত। ধরো তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আরে কেমন আছেন বলে পেটে ছুরিটা বসিয়ে দেবে। তারপর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলবে, আরে আরে, লাগল নাকি! যাক গে, ভাববেন না। বেশিক্ষণ কষ্ট হবে না। বলে ছুরিটায় একটু মোচড় দেবে। ফলে তোমার তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি। ভারি অমায়িক লোক।' শুনলাম শালা সাহেব আমাকে সরাবার জন্য সক্রিয় হয়েছেন।

এবার মারণাস্ত্র আমার ব্যক্তিগত চরিত্র না, রাজনৈতিক মতামত। একদিন শিক্ষাবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখা হলে বললেন, 'শোনো হে, একটু গোলমাল হয়েছে। তোমার নামে পুলিশের কিছু রিপোর্ট আছে। আমরা ওসব বিশ্বাস করি না। কিন্তু তুমি কিছুদিনের জন্য সেক্রেটারিয়েটে চলে এসো। এ ব্যাপারটার একটা সুরাহা করে আবার তোমাকে আর্কাইভসে ফেরত পাঠাব।' সেক্রেটারিয়েটে কলম ঠেলার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। ফলে কিছু সময় চাইলাম। মন্ত্রীমশায় সত্যিই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। বিনা আপত্তিতে আমাকে তিন মাস সময় দিলেন। আমি চাকরি খোঁজা শুরু করলাম।

পুলিশের আমার বিরুদ্ধে কী নালিশ জানতে কৌতূহল হল। ভারতবর্ষে খুব কম জিনিসই বেশিদিন গোপন থাকে। ফলে গোলমালের সূত্র শিগগিরই জানা গেল। অনেক বছর পর এই ব্যাপার সংক্রান্ত ফাইলটিও দেখার সুযোগ হয়েছিল। যা জানলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির। ভারত সরকার বিলাতে তাঁদের হাই কমিশন থেকে খবর পেয়েছেন যে, আমি নাকি অক্সফোর্ডে পড়ার সময় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম। শুধু তাই নয়। উক্ত দলের উচ্চতম সংস্থা পোলিটব্যুরোয় আমার বেসরকারিভাবে আসন ছিল। আমার এই কৃতিত্বের কথা জেনে আমি চমৎকৃত। কোন সূত্রে আমাদের হাই কমিশন এই মূল্যবান তথ্য পেয়েছিলেন তা সঠিক জানার উপায় নেই। আমার ধারণা বিলাতের যে-গোয়েন্দা সংস্থা ইরাকে বহুজনঘাতী অস্ত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন এই অপূর্ব আবিষ্কার তাঁদেরই কীর্তি। এদেশে যখন থেকে নয়া সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয়েছে তদবধি আমি অত্যন্ত আতঙ্কে বাস করছি। কারণ যে-সংস্থা আমার মতো লোককে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে, তারা আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারবে, এমন আশা করার কোনও কারণ নেই। বুঝলাম ক্রিস্টোফার হিলের ঘরে হবস্‌বম আদি কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা নিকৃষ্ট বিয়ার খাওয়ার পরিণাম এই। এমন আশঙ্কা কখনও করিনি। নিতান্ত চারপেয়ে না হলে কেউ আমার মতো লোককে রক্তাক্ত বিপ্লবের ধারক ও বাহক বলে সন্দেহ করতে পারে, এ-কথা কখনও মনে হয়নি। ভাবলাম ওই অপেয় বিয়ার না গিললেই হত। কিন্তু ভবিষ্যতে চাকরি খোয়াবার ভয়ে কি হিল বা হবস্‌বমের সঙ্গ বর্জন করতে পারতাম? বোধ হয় না।

বেশ বুঝতে পারলাম টিকটিকিরা আমার উপর নজর রাখছে। টেলিফোন তুললেই নানা বিচিত্র আওয়াজ পেতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে ফিসফাস কথাও শুনি। কুলু-মানালি বেড়াতে গিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত নেহরু ঠিক তখনই মানালিতে। ফলে কোনও রকম ঢাকাচাপা না করেই এক টিকটিকি আমাদের সঙ্গ নিল। বেচারাকে বুঝলাম রাহাখরচা বিশেষ দেয়নি। বেশ কষ্টে আছে। ওকে ডেকে দু-একদিন খাওয়ালাম। আশা করি এর জন্য ওর চাকরি যায়নি। কারণ ওর পিছনেও কোনও টিকটিকি ছিল বলে মনে হয়নি।

ইতিমধ্যে আমার পিসতুতো ভাই কল্যাণশংকর, যে আমাকে এক বছর বয়স থেকে জ্বালাচ্ছে, সিরাক্যুস থেকে কমিউনিস্ট হয়ে ফিরে এসে কনস্টিটিউশন হাউসে আমার স্কন্ধারূঢ় হল। সে প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেই উঠেছিল। লোকসভায় সরকার

বিবৃতি দিলেন যে, কমিউনিস্টরা তাদের অফিসে রাশিয়ার এক গুপ্তচরকে আশ্রয় দিয়েছে। ফলে কল্যাণ পার্টি দফতর ছেড়ে আমার আতিথ্য গ্রহণ করল। এবং সকাল সন্ধ্যা আমার ঘর থেকে পার্টি অফিস এবং দিল্লিবাসী যাবতীয় কমিউনিস্ট নেতাদের অনর্গল ফোন করতে লাগল। আমার চাকরির তখন পৌনে বারোটা। কল্যাণের সৎ প্রচেষ্টায় অচিরেই বারোটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে হো চি মিন দিল্লি সফরে এসেছেন। কনস্টিটিউশন ক্লাবে নেতাকে অভিনন্দিত করার জন্য যে-চায়ের পার্টি হল, শৌরীনবাবুর উৎসাহে এবং শ্রীযুত হীরেন মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাতে আমি নিমন্ত্রণ পেলাম। চাকরি তো ছাড়তেই হবে। তাই এই নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করলাম না। হীরেনবাবু এসে আমাকে হো চি মিনের সঙ্গে একই টেবিলে বসালেন। মানুষটি দেখলাম নিতান্তই সাদাসিধে। পরনে ভিয়েতনামের চাষাদের মতো একটি ফতুয়া আর নিভাঁজ পাতলুন। পায়ের চটিজোড়া সাইকেলের টায়ার কেটে তৈরি। ওঁর ইংরেজি জ্ঞান দেখলাম কিছু কম। কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে তারপর উনি উঠে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। এই মহাশক্তিশালী মানুষটি সম্বন্ধে যে-জিনিসটি সবচেয়ে বেশি মনে আছে, তা ওঁর মুখের সরল হাসি। এই ব্যক্তিই যে কঠোর আপসহীন বিপ্লবী যোদ্ধা, ওঁকে দেখে সে কথা একবারও মনে হয়নি। যা হোক, নানাভাবেই সরকারি টিকটিকিবৃন্দ অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেল যে আমি অত্যন্ত বিপজ্জনক কমিউনিস্ট। শালা সাহেব উৎফুল্ল হয়ে চিঠি দিতে লাগল আমি সেক্রেটারিয়েটের চাকরি নেব কি না তা সত্বর জানাতে।

ইতিমধ্যে নবনিযুক্ত ডিরেক্টর কাজে যোগ দিলেন। তাঁর চরিত্রবর্ণন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত রাজনৈতিক অশুদ্ধ কয়েকটি কথা বলতে চাই। জাতীয় চরিত্র বলতে অনাদিকাল থেকে কোনও জাতির অব্যয় অনন্ত কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে, এমন কথা এখন আর কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ইতিহাসের কোনও নির্দিষ্ট মুহূর্তে সংস্কৃতিগোষ্ঠীবিশেষের যে কিছু বিশিষ্ট প্রবণতা থাকে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। মার্কিন সংস্কৃতির উদাহরণ ধরা যাক। সম্প্রতি পড়লাম ওদেশে শতকরা পঞ্চাশ জনেরও বেশি মানুষ বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিকাহিনিতে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তাদের ধারণা যে, সত্যিই ঈশ্বর ছ' দিনে বিশ্বসৃষ্টির কাজটা সেরে সপ্তম দিনে একটু গড়িয়ে নেন। একবিংশ শতাব্দীতে এত সংখ্যায় এরকম আকাট মুখ্যু পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও পাওয়া কঠিন বলেই আমার ধারণা। আর একটা উদাহরণ দিই। বাঙালিদের সংস্কৃতিপ্রিয়তা কাল্পনিক ব্যাপার নয়। তেমনই তারা যে পঞ্জাবি বা গুজরাতিদের তুলনায় উদ্যমহীন একথাও বোধ হয় অনস্বীকার্য। বাংলায় একটি অত্যন্ত অর্থবহ শব্দজোট আছে—বোকা-বজ্জাত। এই বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় এরকম মানুষ হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে যত দেখেছি তত আর কোথাও না। আকাট মুখ্যু সব মানুষ কী পরিমাণ ত্যাঁদড়ামি করতে সক্ষম দেখে বারবারই বিস্মিত হতে হয়েছে। একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাজনৈতিক অশুদ্ধতা-দোষ কিঞ্চিৎ লাঘব করতে চাই। হিন্দি-ভাষাভাষীদের ৫% বা ১০% বোকা-বজ্জাত এ আমার বক্তব্য নয়। আমার সীমিত অভিজ্ঞতায় ওই বর্ণনার সঙ্গে মেলে এরকম প্রাণী উক্ত সংস্কৃতি তথা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখেছি—এটুকুই শুধু বলতে চাই। কথাটা

প্রগতিবাদীদের অপছন্দ হলে দু-গ্রাস ভাত বা দু-খানা চাপাটি বেশি খাবেন। ওঁদের মধ্যে অবশ্যি বোকা বেশি দেখিনি। কিন্তু বজ্জাত! সীমাসংখ্যা নেই।

নতুন ডিরেক্টর মিস্টার ভার্গব এলেন। তাঁর মুখ সরল হাসিতে উজ্জ্বল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। দু-চারটে কথা বললেই বোঝা যায়, লোকটির বহুদিন ধরে মা সরস্বতীর সঙ্গে ফৌজদারি মামলা চলছে এবং দেবীর জিতবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সঙ্গে সব সময়ই একটি পানের ডিব্বা। সদাশয় মানুষটি সর্বদাই উদার হস্তে সেই পান বিলোচ্ছেন। আমিও প্রথম দিকে দু-চারদিন পান খেলাম। সকাল দশটা-সাড়ে দশটায় দফতরে এসে সকলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গালগপ্পো করে বারোটা নাগাদ টিফিনের ডিব্বাটি খুলতেন। এ সময়ও মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত। ডিব্বাস্থিত আহার্য কখনও খুব মুখরোচক হত না। পুরি-কচৌরিবিলাসী ভার্গব তাতে কিছুটা বিরক্তই ছিলেন। একদিন বলেই ফেললেন—ওঁর স্ত্রী একেবারেই রাঁধতে পারেন না। তিরিশ বছর উনি সব সহ্য করে আছেন। এবার ভাবছেন আর একটা বিয়ে করবেন। ব্যাপারটা উনি বুঝিয়েই বললেন। না, খারাপ রান্নার জন্য উনি স্ত্রীকে তালাক দেবেন, এমন হৃদয়হীন মানুষ ভার্গব না। তবে কথা কী জানো, আজীবন শুদ্ধ ঘি খেয়েছেন, কুস্তি লড়েছেন, তাই পঞ্চান্ন বছরেও ওঁর পূর্ণ যৌবন। আর ওঁর স্ত্রী, বলতে নেই, বহু সন্তান প্রসব করে বিগতযৌবনা। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রানুমোদিত। উনি নীতিবিরুদ্ধ কিছু করবেন না। সামলে-সুমলে বললাম, নীতিবিরুদ্ধ না হলেও আইনবিরুদ্ধ হবে যে। এক গাল সরল হাসি হেসে ভার্গব বললেন, ওঁকে কে কী করবে! পাঁচটা মিনিস্টার, সাতটা সেক্রেটারি ওঁর হাতধরা। আইনের তোয়াক্কা উনি থোড়াই রাখেন! রাখেন যে না তার প্রমাণ পরে পেয়েছিলাম। যা হোক, মধ্যাহ্নভোজন শেষ হলে ডিরেক্টর ভার্গব সেক্রেটারিয়েটে চলে যেতেন। সেখানে বাকি দিনটা ওঁর হাতধরা সেক্রেটারি আর মন্ত্রীদের সঙ্গে গল্পগুজবে কেটে যেত। ওঁর এক ব্যাপারে বিশেষ খ্যাতি ছিল। উনি নাকি ডাকসাইটে হস্তরেখাবিদ। সেক্রেটারিয়েটে বহু লোকের হাত দেখে উনি ওঁর প্রতিষ্ঠার ভিত আরও দৃঢ় করেন। একদিন আমারও হাত দেখলেন। সামনে অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। ওঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসবার পরেই শুনলাম—কাকে যেন বলছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বর কেউ আমাকে চাকরি যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই সংবাদ জানার ওঁর বিশেষ লিয়াকত ছিল। কারণ ভার্গব ছিলেন যোগসিদ্ধ। দরকার হলে উনি তাঁহা-তাঁহা দেবতাদের সঙ্গেও পাঞ্জা লড়তে পারতেন। ওঁর মুখেই শোনা একটি ঘটনার বিবরণ দিই। সিদ্ধপুরুষের স্ত্রী তখন অসুস্থ। মুদ্রিত নেত্রে ভার্গব আরাধনা করছিলেন। হঠাৎ যোগবলে বুঝতে পারলেন 'দি জেন্টেলম্যান হ্যাড অ্যারাইভড।' বলাই বাহুল্য, জেন্টেলম্যানটি হচ্ছেন যমদেব। ভার্গব চোখ উন্মীলন করে দেবতাকে প্রণাম জানালেন। 'ওহ তো বয়েল পে বৈঠা থা।' একটু শোধরাবার চেষ্টা করলাম—বয়েল না, ভঁয়েস হওয়ার কথা। ভার্গব আমল দিলেন না। 'ওহ একই হ্যায়।' ওঁর চোখে তো তা হবেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সব ভেদাভেদ লুপ্ত হয়, বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদবুদ্ধি থাকে না, বয়েল আর ভঁয়েস তো পিঠোপিঠি ভাই। যম ইঙ্গিত করলেন—চলে এসো, বউকেও তৈরি হয়ে নিতে বলো। কিন্তু যোগসিদ্ধ ভার্গবকে সামান্য যম কী করবে? বিনীতভাবে সিদ্ধপুরুষ বললেন—আজ্ঞে

এ যাত্রায় নয়। আপনি ফিরে যান। যম এবার পাশ নিক্ষেপ করলেন। ভার্গব শ্রীহস্ত তুলে পাশ হটিয়ে দিলেন। হতমান যমদেব ম্লানমুখে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তবে দেবতার আয়ুধ বলে কথা। পাশটা যেখানে লেগেছিল সে জায়গাটা কেটে গেল। ভার্গব দেখালেন ডান হাতের তালুতে তখনও গভীর দাগ রয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যখন সিদ্ধপুরুষটির পরিচয় হয় তখন তাঁর সিদ্ধাই আরও উচ্চকোটিতে পৌঁছে গেছে। অধ্যাপক ব্যাশাম দিল্লি এসেছিলেন। একদিন বললেন, 'দিস চ্যাপ ভার্গব হ্যাজ বিকাম রাদার ইমপসিবল। হি টোল্ড মি দা আদার ডে দ্যাট ইফ হি পিকস আপ এনি স্টোন, ইট কুইভারস অ্যান্ড টার্নস ইনটু এ লিঙ্গম। সাউন্ডেড সর্ট অফ রুড টু মি।' ভার্গব যা-ই ধরছেন তাই ওঁর হাতে নড়েচড়ে লিঙ্গে পরিণত হচ্ছে, এই ব্যাপারটা ব্যাশামের খুব শ্লীল মনে হয়নি।

চাকরির শেষ প্রান্তে পৌঁছে ভার্গব তাঁর শেষ খেল দেখালেন। এর পরে যা লিখছি তার সব কথারই আগে ইংরেজি 'অ্যালেজড্' শব্দটা বসিয়ে নেবেন। কারণ যদিও সম্ভবত এ সম্পর্কে যাবতীয় কাগজপত্র শিক্ষামন্ত্রকের মহাফেজখানায় এখনও আছে, কিন্তু ওই মন্ত্রক কখনও ব্যাপারটা আদালতে তোলেননি, সুতরাং যা-লিখছি তা সবই প্রমাণসাপেক্ষ।

ঘটনাটা এই। আর্কাইভসে নথিপত্র রাখার জন্য প্রতি বছরই লাখ দুয়েক টাকার পিচবোর্ডের কার্টন প্রয়োজন হয়। রীতিমতো টেন্ডার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে জিনিসটি সরবরাহের ভার কোনও কোম্পানিকে দেওয়া হত। কাজটা জটিল এবং মুনাফা সামান্য। অনেক বছর ধরে একটি ছোট কোম্পানিই জিনিসটা সরবরাহ করে আসছিল। ভার্গব শুধু যোগী নন, কর্মকুশলও বটে। ফলে ওঁর রাজত্বে যখন কার্টনের প্রয়োজন হল, তখন উনি অফিসেরই একটি দফতরিকে ডেকে একটি পুরনো কার্টন নতুন করে মুড়িয়ে সাহজাহানপুরের এক অস্তিত্ববিহীন কোম্পানির নামে টেন্ডারের জবাব দিলেন। যথাকালে টেকনিকাল অফিসারদের উপদেশ বাতিল করে ওই অস্তিত্ববিহীন কোম্পানিকেই ভার্গব কার্টনের ফরমায়েস দিলেন। আর্কাইভসেরই চারটি দফতরি ভার্গবের বাড়ির উঠানে বসে কার্টন তৈরি শুরু করল। যথাকালে ভিজিলেন্স বিভাগ তদন্ত করে ভার্গবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিল।

কিন্তু যার হাতে পাঁচ মন্ত্রী, সাত সেক্রেটারি তার বিরুদ্ধে কে ব্যবস্থা নেবে! কিছুই করা হল না। ইতিমধ্যে মহাপুরুষের অবসর নেওয়ার সময় এল। উনি আসলে হোম মিনিস্ট্রির লোক। তাঁরা ওঁর চাকরির মেয়াদ দু' বছর বাড়িয়ে দিল। নতুন শিক্ষামন্ত্রী ত্রিগুণা সেন চটে-মটে ওঁকে ডিরেক্টরের পদে বহাল রাখতে নারাজ হলেন। ওদিকে হোম মিনিস্ট্রিতে তখন কোনও উপযুক্ত পদ নেই। সরকারের নামে মামলা ঠুকে দিয়ে ভার্গব বাড়ি বসে আরাম করতে লাগলেন। দু' বছর পর যখন তিনি সত্যিতে অবসর নিলেন তখনও মামলার সুরাহা হয়নি। আর বৃথা অপব্যয় না করে ভার্গব মামলা তুলে নিলেন। শুনেছিলাম ভারত সরকারের চাকরিতে লিয়েন রেখে জেলে যাওয়া যায়। এই অপূর্ব ঘটনাপঞ্জী দেখে সে কথা বিশ্বাস করলাম।

এদিকে আমার চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল। শৌরীনবাবুর উপদেশ মতো তখন শিক্ষাবিভাগের উপমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা

করবেন বলে ভরসা দিলেন। শুনলাম উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখেওছিলেন। ওঁর এই আস্পর্ধায় বিশেষ বিরক্ত হয়ে তিনি ওঁকে নাকি রীতিমতো ধমকে দেন। আমার চাকুরি-সংকটের কথা তখন সকলেই শুনেছে। একদিন ডক্টর অশোক মিত্র এসে আমাকে দিল্লি স্কুলের ডিরেক্টর কে এন রাজের কাছে নিয়ে যান। সব শুনে রাজ খুবই সহানুভূতি দেখালেন, কিন্তু বললেন, কোনও উপযুক্ত পদ তো নেই। তাই তিনি কিছু করতে অপারগ। হঠাৎ একদিন পি এম জোশী আমার আপিসে এসে হাজির। বললেন, 'চলো তোমাকে ভি কে আর ভি রাওর কাছে নিয়ে যাই।' রাও তখন দিল্লির ভাইস চ্যান্সেলর, জোশীর ছেলেবেলার বন্ধু। উনি আমাকে অর্থনৈতিক ইতিহাসে রিডার হয়ে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। একটা ইন্টারভিউ হল। সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে অর্থনৈতিক ইতিহাসে রিডার হয়ে নতুন কাজে যোগ দিলাম। উক্ত স্কুলের ইতিহাসে তখন স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল ঊষাকাল।

উচ্চ বৃক্ষচূড়ে

ফেব্রুয়ারি মাসের এক মধুর রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে কনস্টিটিউশন হাউসের ৯৩ নম্বর ঘর ছেড়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের দিকে রওনা হলাম। ভারতবর্ষীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেওয়া মাত্রই প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব কোনও বাসভবনে জায়গা হবে এমন দুরাশা আমার ছিল না। ভেবেছিলাম ক'টা দিন গেস্ট হাউসে জায়গা হবে। তার মধ্যে সুবিধেমতো বাড়ি খুঁজে নেব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দেখি স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের হস্টেল জুবিলি হলে থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। আমার সঙ্গে একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছেন আলিগড়ের খালেক নাকভি। ক্লাসিক অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসের রিডার। তাঁরও ওই জায়গায়ই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। উত্তর ভারতের যুবকদের বাঙালির তুলনায় স্বাস্থ্য ভাল, তেজবীর্যও কিছু বেশি। ফলে তাঁরা কিঞ্চিৎ গোলমালপরায়ণ। স্লোগান এবং বিতর্কে সিদ্ধকণ্ঠ হলেও বাঙালি ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর অত ডেসিবেল অবধি ওঠে না। ডালভাত রোটিগোশ্‌তের তুলনায় কম পুষ্টিকর। ফলে রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হত। দিনের বেলায়ও ঘরে বসে কাজ করা অসম্ভব না হলেও রীতিমতো কষ্টসাধ্য। এ সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন মনে হল। নতুন সহকর্মী নাকভি সাহেবও দেখলাম একই মত পোষণ করেন। তবে তিনি জাতে পাঠান। তেজবীর্য ধমনীতে টগবগ করে ফুটছে। পূর্বপুরুষ হেলায় ভারত জয় করেছিলেন। আর আমাদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মণবাবু কী করেছিলেন তা নিয়ে পুনরালোচনায় কোনও ফায়দা নেই। ফলকথা, নাকভি সাহেবের যাহাঁ চিন্তা তাঁহাই কর্ম। বাড়ি খোঁজার জন্য বজ্রমুষ্টিতে আমার কবজি চেপে ধরে রাস্তায় নামালেন। পড়েছি মোগল না হলেও পাঠানের হাতে। পালাইতে পথ নাই।

নাকভি সাহেবের বক্তব্য সরল এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। আমি অকৃতদার এবং তিনি যাকে ইংরেজিতে বলে 'তৃণবিপত্নীক'। অর্থাৎ ওঁর স্ত্রী জুবায়দা আলিগড়ে উদ্ভিদবিদ্যা পড়ান।

যতদিন তাঁর দিল্লিতে একটা চাকরি না জুটছে ততদিন তিনি আলিগড়েই থাকবেন। এদিকে আমাদের মাসিক আটশো টাকা মাইনেয় ভদ্রজনের বাসযোগ্য বাসস্থান ভাড়া পাওয়া কঠিন। অতএব নাকভির প্রস্তাব—এসো আমরা দু'জনে খরচা ভাগাভাগি করে সংসার পাতি। পরস্পরের একুনে তিন দিনের পরিচয়ে এই রকম প্রস্তাবে আর কেউ বোধ হয় রাজি হত না। কিন্তু খালেক নাকভি নামক অত্যন্ত স্পষ্টভাষী প্রবলচরিত্র মানুষটিকে প্রথম পরিচয়েই ভাল লেগেছিল এবং তাঁর সঙ্গে ভাগে সংসার পাতলে কোনও অসুবিধে হতে পারে এ কথা একবারও মনে হয়নি। আমাদের এই প্রস্তাবিত যৌথ সংসার দু' বছরেরও বেশি চালু ছিল। ইতিমধ্যে জুবায়দা দিল্লিতে চাকরি পেয়ে এসে গেছেন। উনিশশো ষাটের জুলাই মাসে আমিও উদ্বাহ সংস্কার সম্পন্ন করে সাগ্নিক হয়েছি। আমার মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ি একাধিকবার আমাদের কাছে এসে থেকে গেছেন। কিন্তু আমাদের যৌথ সংসার ব্যবস্থায় কখনও কোনও খিটিমিটি হয়নি, এক মুহূর্তের জন্যও মনোমালিন্যের ছায়া পড়েনি। খালেক এবং আমি প্রায় বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তবু এই প্রায়-অসম্ভব ঘটনা কী করে সম্ভব হয়েছিল আমি তার আজও সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। মনে হয় মানুষের মূল্যবোধে মৌলিক সামঞ্জস্য থাকলে একত্র বাস কিছু কঠিন কাজ না। আর আমাদের ফ্যাক্টোটাম ইসমাইলের অসাধারণ রন্ধনপ্রতিভা জীবনযাত্রার যাবতীয় বন্ধুরতা সরলীকৃত করার মোক্ষম দাওয়াই হিসাবে কাজ করত।

বাড়ি খোঁজার ব্যাপারে আমার ভাগ্যদেবতা আর একবার খেল দেখালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরে মডেল টাউন নামে এক পঞ্জাবি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত পাড়ায় স্বল্পবিত্ত কিছু শিক্ষক-অধ্যাপকও আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্য অঞ্চলের তুলনায় এ জায়গায় ভাড়া কিছু কম। প্রসঙ্গত বলি—আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যখন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে পড়াতে এলেন তখন তিনিও ওই মডেল টাউনেই প্রথম বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পাড়ার শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। আমরা ও-পাড়ায় বাসা বাঁধার বছর দেড়েক পরে একদিন শুনি নাকভি আমাদের একজন সহকর্মীকে মডেল টাউনে বাড়ি ভাড়া নিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। আমি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'খালেক, পুরো অবস্থাটা বলো।' খালেক একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, 'কেন, তুমি অসুবিধেটা কোথায় দেখলে?' উত্তরে বললাম, 'না, তেমন কিছু না। শুধু গতকালই তলাওর পাড়ে একটি মেয়ে খুন হয়েছে।' অত্যন্ত অচ্ছিল্যের সুরে খালেক বললেন, 'আরে সে তো একজন গণিকা।' মানে খালেকের বক্তব্য, গণিকাদের দুঃসহ জীবনে আততায়ীর হাতে খুন হওয়া একটা নিত্যকার ব্যাপার, তাতে কোনও জায়গার বাসযোগ্যতা হ্রাস হবে কেন? মানে যে পাড়ায় ভদ্র বসতির মাঝখানে মাঝে মাঝে গণিকা খুন হয়, সেখানে থাকায় নাকভি সাহেব বিন্দুমাত্র অসুবিধার কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না।

সে কথা যাক। ভাগ্যদেবতার লীলাখেলার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। মডেল টাউনে কিছু দূর ঢুকেই একটি ছোট তলাও অর্থাৎ মানুষের তৈরি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী দেখতে পেলাম। তার পাড়েই একটি সুন্দর দোতলা বাড়ি। নিতান্তই কথাচ্ছলে বললাম, 'এখানে থাকতে পারলে বেশ হত।' ও বাড়ি যে আমাদের আয়ত্তের বাইরে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু

খালেক একটুও না ঘাবড়িয়ে এক পথচারীর কাছে বাড়িওয়ালার খোঁজ নিলেন। শুনলাম ভদ্রলোক ওই বাড়িতেই থাকেন। শ্রীযুক্ত নাগপাল বললেন, উনি ওপরতলাটা ভাড়া দেবেন ভাবছেন। নাগপালের একটু পরিচয় দেওয়া ভাল। জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ার সাহেব যখন বীরত্ব প্রদর্শন করেন তখন কংগ্রেসি পরিবারের ছেলে নাগপালের বয়স দশ। ওঁরা সপরিবার মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মৃত বা আহতের তালিকায় ওঁদের কেউ ছিল না। কিন্তু ডায়ার সাহেব ভারতীয় জনতাকে সুশিক্ষা দিয়ে বিদায় নেওয়ার পর যারা স্ট্রেচার বেয়ারারের কাজ করে বালক নাগপাল তাঁদের অন্যতম।

মাসিক আড়াইশো টাকা ভাড়ায় রফা হল। দুদিন পরে আমাদের নিতান্ত অকিঞ্চন মালপত্র নিয়ে তলাওর পাড়ের বাড়িতে এসে উঠলাম। পরের বছর ওই বাড়িতেই আমার নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে এসে উঠি এবং আমার একমাত্র সন্তান—যার জন্ম হয় লন্ডনে—তাকে নিয়ে দেশে ফিরেও ওই বাড়িতেই ছিলাম। তলাওপাড়ের বাড়ির ব্যাপারে আমার ভাগ্যদেবতা কোনও প্রবঞ্চনা করেননি। জলের কিনারায় থাকতে পেয়ে আমি শৈশবের সুখের দিনে ফিরে গিয়েছিলাম।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসের তখন রীতিমতো চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের দিন। তখন শিক্ষকমণ্ডলীতে অষ্টবজ্রসম্মেলন ঘটেছে। আমি এবং খালেক কাজে যোগ দেওয়ার কিছু দিন পরে অর্থনীতির তিন অধিরথ মাত্র সাতাশ বছর বয়সে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অমর্ত্য সেন, জগদীশ ভগবতী, সুখময় চক্রবর্তী ওই বয়সেই জগদ্বিখ্যাত। অর্থনীতির ব্যাপারে সরকারি সব বড়-মেজ কর্তারা পরামর্শ চেয়ে সর্বদা ওঁদের দ্বারস্থ। প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীও মাঝে মাঝেই ওঁদের শরণাপন্ন। বেশ কয়েকবার তাঁদের দফতরে ওঁদের ডাক পড়ে। সমাজতত্ত্ব বিভাগে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাস অধ্যাপক এবং বিভাগপ্রধান। ওই বিষয়ে উদীয়মান প্রতিভা তরুণ পণ্ডিত আঁদ্রে বেতেই প্রথমে লেকচারার এবং পরে রিডারের পদ অলংকৃত করছেন। এই নামগুলি এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা নিজের নিজের বিষয়ে অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন। আমাদের এক বন্ধু একবার দিল্লি স্কুলে এসে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে যেন একটা ইনটেলেকচুয়াল পাওয়ার হাউসে ঢুকেছি। এর উত্তাপ সহ্য করা কঠিন।' ডক্টর অশোক মিত্র একবার আমাকে বলেন যে, তিনজন অল্পবয়সি বাঘা বাঘা পণ্ডিতকে একই সময়ে অধ্যাপক নিযুক্ত করে ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও এক বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন। টেনশন হতে বাধ্য। টেনশন হয়তো সত্যিতে কিছুটা হয়েছিল, কিন্তু তা কখনও ভদ্রতার সীমা ছাড়ায়নি এবং প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব কখনও বিপন্ন হয়নি।

সেই অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এ কথা বলেছিলেন প্রয়াত পুণ্যশ্লোক রায়—অন্নদাশঙ্কর রায়ের অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং ভাগ্যহীন বড় ছেলে। সিমলার ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডির উনি তখন ফেলো। আমি কোনও কনফারেন্স উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সেই ভূতপূর্ব বড়লাটের গ্রীষ্মাবাসের লনে বসে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার হালচাল নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমার মতে দেশে কয়েকটি এলিট প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে (এলিট কথাটা তখনও গালাগালি বলে ধরা হত না।) কোথাও আর উচ্চশিক্ষার

কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-শিক্ষা বিতরণ হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠানগুলির কোনাকান্‌চিতে কোথাও কোথাও উচ্চাঙ্গের হতেও পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিচুস্তরের হলেও কারও কোনও মাথাব্যথা নেই—যদিও মাথাব্যথার ভড়ং সর্বত্র। পুণ্যশ্লোক বললেন, 'আমাদের সামাজিক পরিবেশে উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকা শক্ত। মিডিওক্রিটির সমুদ্রে একসেলেন্সের ছোট ছোট দ্বীপগুলি বেশি দিন ভেসে থাকতে পারে না।' বলে তিনি এইচ. জি. ওয়েলসের 'কান্ট্রি অফ দা ব্লাইন্ড' গল্পটি উল্লেখ করলেন। অন্ধের দেশে এক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কীভাবে যেন উপস্থিত হয়েছিলেন। আগকে তাদের থেকে পৃথক একথা বুঝতে পেরে অন্ধরা পাথর ছুঁড়ে তাকে তাড়ায়। মানে, অন্ধের দেশে যার একটি মাত্র চোখ আছে সেই রাজা—কথাটা ঠিক না। অন্ধেরা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি চায় না।

মিডিওক্রিটির প্লাবনে দিল্লি স্কুল ভেসে যায়নি। তার প্রাথমিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কিন্তু ভাসানোর চেষ্টা যে হয়েছিল তার দুটি মোক্ষম প্রমাণ আমি দিচ্ছি। দিল্লি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও। মানুষটি আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ওঁর দেশপ্রেমে কোনও খাদ ছিল না বলেই আমার বিশ্বাস। সেই ভালবাসার প্রকাশ দুনিয়ার বাজারে টেক্কা দিতে পারে এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায়। দিল্লি স্কুল ওঁর স্থায়ী কীর্তি। উনি যখন দিল্লির ভাইস চ্যান্সেলর তখন ডক্টর বীরেন গাঙ্গুলি স্কুলের ডিরেক্টর। কিন্তু ডক্টর রাও আর ইকনমিকস বিভাগের প্রধান কে. এন. রাজ এঁরা দু'জনে মিলেই তরুণ পণ্ডিতদের বয়সের তুলনায় একটু বেশি উঁচু পদে নিয়োগের নীতি অবলম্বন করেন। ব্যাপারটা সকলের সহ্য হয়নি। অমর্ত্য যখন অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন, তখন দিল্লির কোনও কলেজের এক অধ্যাপক নিয়োগটা বে-আইনি হয়েছে এই অজুহাতে এক মামলা রুজু করেন। ব্যাপারটা নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট থেকে বিচারপতি গজেন্দ্রগড়কে 'ওয়ান ম্যান কমিশন' নিযুক্ত করেন এবং তিনি নির্দ্বিধায় অমর্ত্যকে অধ্যাপক নিয়োগের সপক্ষে রায় দেন। একই ব্যক্তি জগদীশ ভগবতীর নিয়োগের বিরুদ্ধেও মামলা করেছিলেন। টেঁকেনি। এই ধর্মধ্বজ কেন সুখময়কেও আক্রমণ করেননি তা আমার জানা নেই। বোধ হয় দম ফুরিয়ে গিয়েছিল। জগদীশের বিরুদ্ধে মামলার অজুহাত ছিল—সে শুধু কেমব্রিজের বি.এ পাশ। প্রসঙ্গত বলি—যখন এই মাত্র বি.এ পাস ছেলেটিকে তিন-চার বছর পরে এম.আই.টি অধ্যাপক পদে বরণ করল তখন তারা ওর প্রকাশিত পেপারগুলি একত্র করে তার মূল্য হিসাবে ওকে ডক্টরেট দিয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করে। ওদেরও নিয়ম আছে বিনা ডক্টরেটে অধ্যাপক করা যায় না। তবে যোগ্য লোক পেলে বিনা মামলায় এ সমস্যা সমাধানের পথ তাদের জানা ছিল।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা ভোলা ঠিক হবে না। শিক্ষিত (তথাকথিত?) ভারতীয়রা যখন বজ্জাতি করেন তখন জনস্বার্থ ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য তাঁদের থাকে না। সম্ভবত এই মারাত্মক মিথ্যে কথাটা তাঁরা নিজেরাও বিশ্বাস করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি শিক্ষিত দলবাজমণ্ডলী স্বজনপোষণ, নিজ ক্রোড়ে ঝোল টানায়ন ইত্যাদি বিবিধ কুকার্যে যখন রত ছিলেন তখন দেখেছি যে ওঁদের স্থির বিশ্বাস—যাবতীয় নীতিবোধের ডিম ভেঙে ওঁরা যে ওমলেট বানাচ্ছিলেন তা নিতান্তই জনগণের স্বার্থে। দই মারার ব্যাপারে ওই নেপোমণ্ডলীর

যে স্বার্থ ছিল, এমন কথা সত্যিই বোধ হয় ওঁদের চিন্তায়ও আসত না। ভূদেব লেখেন যে, স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে ইংরেজরা শিশুর মতো সরল। ওরা সত্যিই ভাবে যে ওদের যাতে স্বার্থসিদ্ধি, তামাম দুনিয়ার তাতেই মঙ্গল। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ সরলতা ভারতীয় এলিট চরিত্রেও প্রবেশ করেছে। যে কলেজ শিক্ষকটি অমর্ত্য আর জগদীশের নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, অমর্ত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি অম্লানবদনে বলেন যে, ওঁর বিরুদ্ধে মহাশয়ের কোনও অভিযোগ ছিল না। দুর্নীতিপরায়ণ কর্তাব্যক্তিরা নিয়োগের ব্যাপারে একবার নিয়ম ভাঙতে শুরু করলে আর তাদের রোখা যাবে না শুধু এই কথা চিন্তা করেই তাঁর জেহাদ। খুরানা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন তখন তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব হলেও দিল্লির কয়েকজন অধ্যাপক আপত্তি করেন কারণ মার্কিন নাগরিক বনে গিয়ে উনি নাকি মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যের অভাব প্রকাশ করেছেন। দেশদ্রোহী লোকটি কিন্তু আমেরিকা চলে যাবার আগে দিল্লিতেই লেকচারারের পদপ্রার্থী হয়ে বিফলমনোরথ হয়েছিলেন। যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের তুলনায় আমি সামান্য মানুষ। কিন্তু বিদেশে কাজ করতে গিয়ে যে আমি দেশদ্রোহিতা করেছি এবং ফলে যে-কোনও ব্যাপারে আমাকে ডাকবার কথা হলেই 'উনি তো চলে গেছেন' সুতরাং অস্পৃশ্য, এরকম কথা এখনও মাঝে মাঝেই শুনতে হয়। এই শ্রেণির দেশপ্রেমিকদের অনেকেই কিন্তু বিদেশে চাকরি পাওয়ার জন্য পিতামহীর কণ্ঠচ্ছেদ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। একটু আগে পুণ্যশ্লোক রায়ের যে উক্তিটি উল্লেখ করেছি তার বাস্তব ভিত্তি বোঝানোর জন্য এতগুলি কথা বললাম। মিডিওক্রিটির সমুদ্রে একসেলেন্স-এর ছোট ছোট দ্বীপগুলি অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করে। তাদের বাঁচবার চেষ্টা সব সময়ে সফল হয় না। উচ্চকোটির সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ ভারতের সর্বত্র ছড়ানো।

আমি যখন দিল্লি স্কুলে যোগ দিই তখন স্কুলের ডিরেক্টর ছিলেন ডক্টর বি. এন. গাঙ্গুলি। নিতান্ত ভদ্রলোক এই মানুষটি ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার পর রাজ ডিরেক্টর হন। ডক্টর গাঙ্গুলি যখন ভাইস চ্যান্সেলর তখন শুধু দিল্লি না, সর্বভারতীয় শিক্ষাজগতে কিছু অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। সাংবাদিকদের তোলা এক কুখ্যাত ফোটোগ্রাফে সেই কুলক্ষণের এক বাস্তব ছবি আছে। পরীক্ষা পেছানো বা ওই জাতীয় কোনও দাবি নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে কিছু নতুনত্ব দেখা দেয়। আন্দোলনকারীরা ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে অকথ্য গালিগালাজ করে। ডক্টর গাঙ্গুলি বের হয়ে এসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনীত ভঙ্গিতে অনুরোধ করছিলেন যে, ছাত্রদের কয়েকজন তাঁর অফিসে এসে তাদের বক্তব্য জানাক। এতে আন্দোলনকারীদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ধ্বনি উঠল, 'হাম সে যো টকরায়েগা চুরচুর হো যায়েগা'। ফোটোতে দেখি ভাইস চ্যান্সেলরকে ঘিরে নর্তনকুর্দনশীল কিছু ইয়াহু। আর জোড়হস্ত ভাইস চ্যান্সেলরের মুখে চুরচুর হয়ে যাওয়া একটি মানুষের অভিব্যক্তি। পরে রাজ যখন ভাইস চ্যান্সেলর, তখন ছাত্র আন্দোলনের সুর আরও উন্নত হয়েছে। সম্মানিত মানুষটিকে লক্ষ্য করে ধ্বনি উঠল 'কালা কুত্তা হায় হায়'। যে-বর্বররা উক্ত ধ্বনি তুলেছিল পরে তাদের কেউ কেউ দিল্লির বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছে। এবং আমার বিশ্বাস ওইসব

অশালীন আন্দোলনের পিছনে কিছু কিছু শিক্ষকের মদত বা উস্কানি ছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭২ অবধি মাঝে কয়েক বছর বাদ দিয়ে প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। নানা স্তরে শিক্ষক, পরীক্ষক, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, ইউজিসি-র বিভিন্ন কমিটির সভ্য হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ আমি পেয়েছি। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কয়েকটি নেতিবাচক কথা এখানে বলতে চাই।

সত্তরের দশকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর অনুরোধে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করি। বক্তৃতাটির শিরোনাম ছিল 'হায়ার এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ এ ফর্ম অফ অ্যান্টিসোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি'। আমার মূল বক্তব্য ছিল যে, উচ্চশিক্ষার খাতে সরকার যে টাকা ঢালেন তার বিরাট একটা অংশ নিছক অপচয় ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ বিএ পাসকোর্সে পঠন-পাঠনের কথা উল্লেখ করি। একথা সুবিদিত যে, ওই কোর্স যাঁরা পড়েন তাঁদের অধিকাংশই কোনও পাঠ্যপুস্তক চোখেও দেখেন না। কোনও নোট বই, মাস্টারমশাইদের দেওয়া নোট বা পরীক্ষার অল্পদিন আগে প্রকাশিত 'শিওর গেস'-ই তাঁদের জ্ঞানের সীমানা নির্দেশ করে। সাধারণত পেপার-প্রতি পনেরো-কুড়িটা প্রশ্নের উত্তর (সংখ্যাটা সম্ভবত একটু বাড়িয়েই বলছি) মুখস্থ করেই তাঁদের দু' বছর কলেজে অধ্যয়ন-বিদ্যার্জনের সমাপ্তি ঘটে। আমি হিসেব করে দেখিয়েছিলাম যে, পেপার প্রতি কুড়ি পাতা নোট মুখস্থ করে অর্থাৎ পাঁচটা বিষয়ে একুনে দশ পেপারে দু'শো পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ এবং তার ভুক্তাবশেষ পরীক্ষার খাতায় বমন করে দিব্যি বিএ পাস ডিগ্রি পাওয়া যায় এবং যাঁরা এই স্তরের বিদ্যা অর্জন করে জীবিকা অর্জনের জন্য দরকারি ন্যূনতম ছাপ সংগ্রহ করেন তাঁদের অধিকাংশ মাতৃভাষা বা ইংরেজি কোনওটাই শুদ্ধভাবে লিখতে শেখেন না। বিষয়বস্তু একটু কঠিন হলে এঁদের কাছে বইয়ের অর্থবোধ হয় না এমন প্রমাণ বহুবার পেয়েছি। অথচ উচ্চশিক্ষার খাতে মোট খরচের বড় একটা অংশ, সম্ভবত সিংহভাগ, এই স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়।

ষাটের দশকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাস কলেজের গভর্নিং বডিতে আমি ছিলাম। দেখলাম ইউজিসি সুশিক্ষার জন্য নানা রকম সুব্যবস্থা করেছেন। কলেজ বিল্ডিংয়ের জন্য বরাদ্দ সাতাশ লক্ষ টাকা। ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী ঘরের মাপ কী হবে তাও নির্দিষ্ট আছে। ওই ব্যয়ে সে সময়ে ছোটখাটো একটি হাসপাতাল তৈরি হয়ে যেত। সাতাশটা গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারত। ছাত্ররা যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় পাস করে সে বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিছু শিখল কি না অথবা যা শিখল তার মান কী সে বিষয়ে পর্বতের নীরবতা। ধরে নেওয়া হয়েছে পাস করা মানেই লেখাপড়া শেখা। এটা যে কত বড় মিথ্যা কথা তা সম্ভবত কারও অজানা নেই। এই জাতীয় কথা বলা এখন রাজনৈতিক বিশুদ্ধতার বিরোধী বলে ধরা হয়। দরিদ্র মানুষের সামান্য পুঁজি তছনছ করে যাঁরা ওই বিশুদ্ধতা রক্ষায় যত্নবান তাঁদের খুরে আমি নিশ্চিন্ত দূরত্ব থেকে নমস্কার জানাতে চাই।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বেশ কিছু চোখধাঁধানো কীর্তি আছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিশিয়ানরা সংখ্যায় এবং বিদ্যাবত্তায় দুনিয়ার প্রায় যে-কোনও

দেশের সঙ্গেই টেক্কা দিতে পারে। দেশে-বিদেশে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা খুললেই ভারতীয় নাম চোখে পড়ে। আজকের ইংরেজি সাহিত্যে ভারতীয় লেখকরা এক বিরাট এবং সম্মানিত অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল প্রদীপের নীচেই ঘন অন্ধকার।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ছাদ খুব উঁচু কিন্তু মেঝে প্রায় নেই বললেই চলে। এই অসম প্রগতির কারণ যা বুঝেছি এখানেই সে বিষয়ে কিছু বলি। আমার বক্তব্যর সঙ্গে সম্ভবত অধিকাংশ শিক্ষাজীবীর মত মিলবে না। দেশ যখন স্বাধীনতা পেল তখন কয়েকটি শ্রেণির মানুষের রাজনৈতিক শক্তি অন্যদের তুলনায় বেশি। শহরে এবং গ্রামে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কিছু মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উচ্চাশা তখন তুঙ্গে। উচ্চশিক্ষা বা বরং বললে ঠিক হবে ডিগ্রি তাদের আশা পূরণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রসার বা ডিগ্রি বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি ক্ষমতাশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির (আমি শব্দজোটটা নিতান্তই আর্থিক ক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করছি, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিশেষ অর্থে নয়) অন্যতম প্রধান দাবি হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজরা যখন বিদায় নেয় তখন উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সতেরো, কলেজের সংখ্যা দুশোর মতো। কয়েক দশকের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে দেড়শো এবং দু' হাজারের উপরে। শুনলাম এই সংখ্যা বর্তমান ভারতবর্ষে আরও দুগুণ ও তিনগুণের ওপর বেড়েছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধি কোনও পরিকল্পনামাফিক হয়নি। যাদের দাবি মেটাতে এই সংখ্যাবৃদ্ধি তাদের অধিকাংশের শিক্ষার মান নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তারা চাইছিল অনায়াসে তাদের ছেলেমেয়েরা ডিগ্রি এবং তার জোরে ভাল চাকরি পাক অথবা/এবং বিয়ের বাজারে দর বাড়ুক। ভিলওয়ারার ডুঙ্গারপুর কলেজে সেখানকার শাণিতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জিগ্যেস করেছিলাম, 'কলেজে পড়তে এসে তোমরা কী শিখলে?' দ্বিধাহীন উত্তর পেলাম, 'কুছ ভি নেহি।' 'তবে আসো কেন?' উত্তর, 'মা-বাপ পাঠায় ইজ্জত বাড়বে বলে। আমাদেরও স্বার্থ আছে। দহেজটা কিছু বেশি পাওয়া যায়।'

ফলে ভারতীয় শিক্ষায় দুই মেরুর উৎপত্তি হয়েছে। উত্তর মেরুর বাসিন্দারা ফরফর করে ইংরেজি বলে, ইংল্যান্ড-আমেরিকায় পড়তে এসে হয় বিদেশেই থেকে যায় নয়তো দেশে ফিরে মোটা মাইনের চাকরি পায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রচণ্ড প্রভাব সত্ত্বেও এঁদের সামাজিক মতামত অনেকটাই ধর্মমতনিরপেক্ষ। কারণ সংখ্যাগুরুত্ব ভাঙিয়ে চাকরি জোটানোর তাদের প্রয়োজন নেই। মণ্ডল কমিশনের অনুমোদিত নীতি তাদের মাথাব্যথার কারণ হয় না। উচ্চশিক্ষা আর দেশ-বিদেশের হালচালের সঙ্গে পরিচয় থাকায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু উদারতাও থাকার সম্ভাবনা। (তবে মনে রাখা ভাল যে, এই শ্রেণির ভারতীয়রাও এখন বিপুল সংখ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুগামী হয়েছে যার কারণ পরে আলোচনা করব।) আর ইংরেজি ভাষাভাষী উচ্চশিক্ষিত চটপটে বড় চাকরিওয়ালাদের স্বর্গের পথের পাশেই অর্ধশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ডিগ্রিধারীদের বিষাদলোক। অবহেলিত হেরে যাওয়া এইসব মানুষ উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দল পুষ্ট করে। এদের কীর্তিকলাপ সত্তরের দশকে দিল্লি ক্যাম্পাসে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

যে-শিক্ষা ডিগ্রি বিতরণ করে, কিন্তু কিছু জানতে বা বুঝতে শেখায় না তার দাম আমাদের

নানাভাবে দিতে হয়। আমরা অমিত সম্পদের অধিকারী নই। তথাকথিত উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের খাতে অর্থের অসঙ্কুলান হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ষাট বছর পরেও তাই আজ শতকরা চল্লিশজন ভারতীয় নিরক্ষর। এটা সরকারি হিসেব। সত্যিকার হিসেব আরও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু খরচা কমালে মধ্যবিত্ত প্রগতিশীলরা 'শিক্ষাসঙ্কোচ'-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। 'নেহি চলেগা' 'নেহি চলেগা' ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হয়। ব্যাপক নিরক্ষরতা অথবা ডিগ্রিধারীর অশিক্ষার বিরুদ্ধে অনুরূপ কোনও আন্দোলন আমার জীবদ্দশায় নজরে পড়েনি।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষাবিস্তারের কুফল সর্বত্র চোখে পড়ে। আমাদের দেশে ডিগ্রিধারী প্রায়-অশিক্ষিত লোক সংখ্যায় খুব বেশি। এর এক কারণ—এক দিকে যেমন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের কৃপায় মাতৃভাষা প্রায় ভুলে যাওয়া, ফরফর করে 'আরে ইয়ার'-মার্কা চিঁচিঁ ইংরেজি বলা স্নাতকের সংখ্যা খুব বেড়েছে, অন্য দিকে স্নাতকদের একটা বিরাট অংশ ইংরেজি বই পড়ে বুঝতে পারে না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে মাতৃভাষায় ক্লাসে পড়ানো হয়। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু সন্তাপের বিষয় এই যে, কোনও ভারতীয় ভাষায়ই পাঠ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য বই যথেষ্ট সংখ্যায় লেখা হয়নি। কোনও প্রধানস্থানীয় ইউরোপীয় ভাষা না জানা থাকলে পৃথিবীর জ্ঞানের জগতের দরজা বন্ধ থাকে। ফলে আমাদের বিএ, এমএ ডিগ্রিধারী অনেকেরই বিদ্যার দৌড় ক্লাসে শোনা শিক্ষকের বক্তৃতা বা তাঁদের দেওয়া নোট ছাড়িয়ে আর এগোয় না।

প্রধানত দিল্লি স্কুলে কিঞ্চিদধিক বারো বছর এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাস বিভাগে দু' বছর পড়ানোর সময়কার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপরে লিখিত কথাগুলি বললাম। আমার ধারণা আমার এই বিশ্লেষণ ভুল না। কিন্তু আমার বক্তব্য বা তার ভিত্তিতে অন্য পথের নির্দেশ মাঝে মাঝে দেওয়ার চেষ্টা করে প্রবন্ধাদি যখন যা লিখেছি, কর্তাব্যক্তিদের তা পড়াবার চেষ্টা করেছি। কখনও তাঁদের মধ্যে দু-একজন পিঠ চাপড়ে বলেছেন, 'বেশ লিখেছ হে।' আমার মতামত আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উপর এর বেশি কোনও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। যুগবিশেষে ইতিহাসের ধারা আমাদের যে-দিকে নিয়ে যায় তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্ষেত্রবিশেষে মোড় ঘোরানোর চেষ্টা সাধারণত সফল হয় না। যাঁরা এ কাজে সফল হন তাঁরা নানা অর্থেই অনন্যসাধারণ।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিকসে আমার জগদ্বিখ্যাত সহকর্মীদের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত এবং আমার যোগ্যতার তুলনায় অনেক বেশি সম্মান এবং সহযোগিতা পেয়েছি। এঁদের মধ্যে এক অমর্ত্যকেই আগে থেকে চিনতাম। দিল্লি স্কুলে আসবার পর তিনি সাফল্যের যে-স্তরে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর সময়ের উপর এত বিচিত্র এবং অসংখ্য দাবি শুরু হল যে তার আবর্তে আমার চেনা পুরনো মানুষটির আর নাগাল পেলাম না। যদিও তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে সামাজিক বা বন্ধুত্বের সম্পর্কে কখনওই ছেদ পড়েনি এবং প্রয়োজনে বা সঙ্কটের মুহূর্তে বারে বারেই তাঁর সাহায্য পেয়েছি, কিন্তু একদা অতি পরিচিত সেই তরুণ যেন অনেক দূরের লোক হয়ে গেলেন।

নতুন পরিচিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল জগদীশ ভগবতী এবং পরবর্তীকালে তাঁর পত্নী পদ্মা দেশাইয়ের সঙ্গে। আরও পরে যোগ দিলেন অর্জুন সেনগুপ্ত, পরবর্তীকালে ইন্দিরা গাঁধীর অর্থনীতি বিষয়ে উপদেষ্টা এবং ইউরোপের অর্থনৈতিক জোটে আমাদের রাষ্ট্রদূত। বয়সে অনেক ছোট আঁদ্রে বেতেই-র সঙ্গে আড্ডার সম্পর্ক জমল। তার অন্যতর অনুষঙ্গ ছিল রাত ন'টার শোয়ে অখাদ্য বলিউডি ফিল্ম দেখা এবং রাস্তার ধারের দোকান থেকে দোক্তা বা কিমাম দিয়ে পান খেয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরা। আঁদ্রে এর আগে কখনও কিমাম খাননি। কিমামের প্রথম অভিজ্ঞতার পর তিনি নাকি বলেন, 'তপনদা, আর খাবেন না, আপনি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছেন।' এ রকম একটা গল্প স্কুলে চালু ছিল। দুঃখের কথা, এই মুখরোচক গল্পটা সত্যি না। অত্যন্ত সংযতবাক অথচ রসিক মানুষ এম. এন. শ্রীনিবাস ওরফে চামুর সঙ্গেও বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। আর এই দুই ডাকসাইটে সমাজতাত্ত্বিকের কাছে ওই বিষয়ে পাঠ নিয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলাম।

একটি মানুষকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম, শুধু আমি না অনেকেই। আমি প্রয়াত সুখময় চক্রবর্তীর কথা বলছি। এত বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান আমি আর কোনও মানুষের মধ্যে দেখিনি—দেশে বা বিদেশে। দিল্লি স্কুলের লঘু আড্ডায়ও অর্থনীতিচর্চার ছায়া পড়ত। এমনকী রসিকতাগুলিও যেন অর্থনীতি ঘেঁষা, ফলে আমার কাছে দুর্বোধ্য। সেখানে সুখময়ের সর্বব্যাপী বিদ্যা কথাবার্তা আদানপ্রদানে অন্য এক সুর নিয়ে আসত। তাঁর বিদ্যার সঙ্গে আমার সামান্য পড়াশোনার কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু বহু বিষয় নিয়ে ওঁর আলোচনা আমার শুনতে ভাল লাগত। বেশ কয়েক বছর আমরা নিকট প্রতিবেশী ছিলাম। জ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত এই মানুষটির কাছ থেকে পরোক্ষভাবে অনেক কিছু শিখেছি। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের এই সুযোগ্য বংশধরটি সম্পর্কে আমার বারে বারেই একটি কথা মনে হত। মনে হত ইনি আদর্শ ব্রাহ্মণ। সত্যিকার ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সম্পূর্ণ আধুনিকমনা লোকটির জীবনে রূপায়িত হয়েছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে সভাপণ্ডিত হওয়া স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু সুখময় যখন প্ল্যানিং কমিশনে গেলেন, তখন ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে মঙ্গলকর হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। ওঁর নীতিবোধ ওঁকে শ্রীমতী গাঁধীকে সমর্থনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। এবং তার ফলে শুদ্ধচরিত্র মানুষটি অনেক নিন্দা গালিগালাজ মুখ বুজে সহ্য করেছেন।

দিল্লি স্কুলের সভ্য মার্জিত আবহাওয়ায় আমার সব দিক থেকেই তৃপ্ত থাকা উচিত ছিল। ওই দশ-বারো বছরেই আমার যা-কিছু প্রতিষ্ঠা এবং অল্পবিস্তর খ্যাতি হয়েছিল। সহকর্মীদের ব্যবহারে নালিশ করা যায় এমন কিছু ছিল না। বরং তাঁরা আমার কর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন যথাসাধ্য সহজ করার জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব কিছুই করেছেন। এত সত্ত্বেও ওই প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন আমি কোনও অর্থেই সুখী ছিলাম না। পশ্চাদ্দৃষ্টির আলোয় কারণটা এখন বুঝতে পারি। ওই প্রতিষ্ঠানে পড়াতে যাওয়া আমার মারাত্মক ভুল হয়েছিল।

দিল্লি স্কুলের কেন্দ্রে ছিল অতি উচ্চাঙ্গের অর্থনীতিচর্চা। ওইখানে প্রথম থেকেই নিজেকে মনে হত হংস মধ্যে বকো যথা। প্রতি শীতে সারা দুনিয়ার জগদ্বিখ্যাত সব অর্থনীতিবিদ দিল্লি আসতেন—ভারতের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অথবা স্বচক্ষে কী ঘটছে

দেখতে। মিসেস জোন রবিনসন এই নিয়মিত অতিথিদের অন্যতম। তিনি কে. এন. রাজের অতিথি হতেন এবং তাঁকে ঘিরে একটি গোষ্ঠী তথা আলোচনাচক্র গড়ে উঠেছিল। এই গোষ্ঠীটিকে আমি দূর থেকে দেখতাম। আমি যে ওই গোষ্ঠীর কেউ নই এই সত্যটা আমার সহকর্মীদের সঙ্গে দূরত্ব নিজের চোখে প্রকট করে তুলত।

মিসেস রবিনসনের দিল্লিবাস সম্পর্কে দু'-একটি কাহিনি উল্লেখযোগ্য। উনি প্রগতিবাদী পণ্ডিত হিসাবে বিপ্লবী চিনের শতকরা একশো ভাগ সমর্থক ছিলেন। দিল্লি যাওয়া বা আসার পথে প্রতি বছর উনি চিনেও যেতেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভয়াবহতাও ওঁর এই চিনপ্রীতি কমাতে পারেনি। শোনা গেল কেমব্রিজ থেকে পাস করা ওঁর কিছু ছাত্র, যাঁরা চিনের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, তাঁরা সংস্কৃতি বিপ্লবের ফলে পদচ্যুত হয়ে ভূমিহীন কৃষকের কাজ করছেন। এঁদের কথা উল্লেখ করে মিসেস রবিনসন বলেন, 'জানি তোমরা কথাটা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু টেক ইট ফ্রম মি, তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি সুখী, মাচ মাচ হ্যাপিয়ার।' দক্ষিণ ভারতে প্রথা আছে—পিতার নামের আদ্যাক্ষরগুলি পুত্রের নামের আগে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাই ওই অঞ্চলের এক অর্থনীতিবিদ মিসেস রবিনসনকে এক বিচিত্র পত্রাঘাত করেন। 'আপনি কি জে. আর. হিকসের পিতা?' কারণ মিসেস রবিনসনের নাম ও পদবির আদ্যাক্ষর জে এবং আর। ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, 'জীবনে অনেক পাপ করেছি। কিন্তু ওটি আমার উপর চাপিয়ো না।'

দিল্লি স্কুলে আমার বিষয়গত একাকিত্বের কারণ আমার স্বাভাবিক পেশা। আমি ছিলাম ঐতিহাসিক, যদিও অর্থনৈতিক ইতিহাস আমার গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র এবং আমি ওই বিষয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার এবং পরে অধ্যাপক। তখন অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পূর্ণ দু' ভাগ হয়ে গেছে। তার এক দিক ইতিহাসমুখীন। অন্যটির ভিত্তি কঠিন তাত্ত্বিক অর্থনীতি আর সংখ্যাতত্ত্বে। আমি আশৈশব সংখ্যাবিমুখ। আমার অর্থনীতির জ্ঞান খুব সামান্য। এসব বাধা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব না। সে চেষ্টা আমি অল্পবিস্তর করিনি এমন নয়। কিন্তু সত্যিতে আমার বুদ্ধিগত এবং বিষয়গত উৎসাহ ছিল ভিন্নমুখী। আমি জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে বুঝেছি যে, ইতিহাসে আবাল্য আমাকে যা আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে বিষয়টির সাহিত্যরস—অচেনা যুগে অজানা দেশে অপরিচিত মানুষের অর্ধশ্রুত হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা। তাই দিল্লি স্কুলের প্রচণ্ড বুদ্ধি ও বিদ্যাগত ডায়নামোর অংশীদার হতে আমি পারিনি। শুনতাম আমার শিক্ষক হিসাবে খ্যাতি হয়েছে। ছাত্ররা আমার পড়ানো শুনতে ভালবাসে। কিন্তু অঙ্কভিত্তিক অর্থনীতির প্রচণ্ড দাবি মিটিয়ে আমার ক্লাস করা ওদের কাছে একটু বিশ্রামের চেহারা নিত। এক অর্থে অর্থনীতি বিভাগে আমার অবস্থা ছিল স্কুলে ফারসির মৌলভির মতো। থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি নেই।

আমি যে নিজেকে অবান্তর মনে করছি, আমার সহকর্মীরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং প্রধানত খালেক এবং অমর্ত্যর উৎসাহে ওঁরা নানাভাবে আমার নিজের চোখে আমার জীবন ও কর্ম অর্থবহ করার চেষ্টা করতেন। আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব রিডার থেকে অধ্যাপকের পদে উন্নীত করা হয়। রাজ ডিরেক্টরের পদ ছেড়ে দিলে আমাকে স্কুলের ডিরেক্টর করা হল। অর্থনীতি বিভাগ যখন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স বলে স্বীকৃতি পেল, তখন

বিভাগটির নতুন নাম হল সেন্টার ফর দা স্টাডি অফ ইকনমিক হিস্ট্রি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। ইচ্ছামতো নতুন পদ সৃষ্টি করার স্বাধীনতা পেলাম। অর্থনৈতিক ইতিহাসের রিডার হয়ে ধর্মা কুমার এলেন। তাঁর সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশ করলাম 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল অ্যান্ড ইকনমিক হিস্ট্রি রিভিউ'। আন্তর্জাতিক অধ্যাপক-গবেষক বিনিময় ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সব ডাকসাইটে পণ্ডিতদের দিল্লি নিয়ে এলাম। এ ব্যাপারে আমার সহকর্মীরা নিঃসন্দেহে আমাকে প্যাম্পার করতেন অর্থাৎ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতেন সন্দেহ নেই। ১৯৬২ সনে আমার অক্সফোর্ডের থিসিসটি হল্যান্ডের এক নামি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হল, 'ইয়ান কম্পানি ইন করমণ্ডল, ১৬০৫-১৬৯০'। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তিনবার বিদেশে পড়াতে গেলাম। মার্কিন মুলুকে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি হার্ভার্ড, ক্যালিফোর্নিয়া (বার্কলে), পেনসিলভেনিয়া তাদের অন্যতর।

'তবু কেন প্রাণ কাঁদে রে!' আমার গভীর শূন্যতাবোধ কিছুতেই কাটল না। মানসিক কষ্ট শারীরিক ব্যাধির রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। প্রচণ্ড মাথাধরা আর প্যালপিটিশনে ভুগতে শুরু করলাম। সবাই ভাবত হাইপোকন্ড্রিয়া এবং এ নিয়ে হাসাহাসিও হত। কিন্তু সত্যিতে আমার যা হয়েছিল তা গভীর ব্যর্থতাবোধ এবং তজ্জনিত ডিপ্রেশনের ফলে সাইকোসোম্যাটিক সিম্পটম। ফলে আমার দৈনন্দিন রুটিনের বাইরে অন্য কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পনেরো বছর পড়াবার সময় আমার হাত দিয়ে নতুন কাজ বের হয় খুবই সামান্য। কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া ওই সময়ে আমার উল্লেখযোগ্য কাজ 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর অ্যান্ড জাহাঙ্গির'-এর নৃতত্ত্বভিত্তিক নতুন ভূমিকা সহ নয়া সংস্করণ। ওই ৪০ পৃষ্ঠার নতুন ভূমিকা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ইতিহাসে নৃতত্ত্বের প্রভাব আনার যাঁরা পথিকৃৎ, তাঁদের নেতৃস্থানীয় কিথ টমাস (বর্তমানে প্রফেসর স্যার কিথ টমাস) 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' পত্রিকায় লেখাটির দিকে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই লেখাটির প্রস্তুতি হিসাবে আঁদ্রে এবং অধ্যাপক শ্রীনিবাসের কাছে সমাজতত্ত্বের পাঠ নিই।

এ ছাড়া উনিশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ে একটি বিতর্কে আমার লেখাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লন্ডনে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ এক বছর রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ছিলাম ১৯৬১-৬২ সনে। ওই সময় ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ মার্কিন পণ্ডিত মরিস ডি. মরিসের সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়। তিন বছর পর বার্কলেতে পড়াবার সময় মরিসের লেখা জার্নাল অফ ইকনমিক হিস্ট্রিতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে এক সেমিনার হয়। মরিসের মূল বক্তব্য ছিল—ইংরেজ আমলে বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় এবং সেই যোগাযোগ সহজ করার জন্য ইংরেজরা যানবাহন আর সংবাদ চলাচল ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি করায় ভারতবর্ষে সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। তবুও যে শিল্পবিপ্লব ঘটেনি তার কারণ প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় অর্থনীতির নেহাতই অনুন্নত অবস্থা। এই মতের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে আমি বক্তৃতা করি। মরিস সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক নন। অর্থনীতির তত্ত্বগত চিন্তার আলোকে ওঁর যা সত্যি মনে হয়েছিল তাই লিখেছিলেন। সুতরাং আমাদের মতের মিল না হলেও বন্ধুত্বে

চিড় ধরেনি। পরে যখন মরিস দিল্লি এলেন, আমি তখন স্কুলের ডিরেক্টর এবং আমাদের নবপ্রকাশিত পত্রিকাটির কার্যকরী সম্পাদক। মরিস প্রস্তাব করলেন—ওঁর প্রবন্ধটি নিয়ে আমাদের পত্রিকায় আলোচনা হোক। সেই অনুযায়ী আমাকে নিয়ে তিনজন ওঁর বক্তব্যর সমালোচনা করি এবং মরিস তার উত্তর দেন। পরে সমস্ত আলোচনাটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এই বিতর্ক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামতের এক উল্লেখযোগ্য সংলাপ হিসেবে বেশ কিছুদিন ঐতিহাসিকদের আলোচ্য ছিল। দুঃখের বিষয়, যদিও এই আলোচনা মরিসের উৎসাহেই হয়েছিল তবুও তার ফলে আমার আর মরিসের সম্পর্কে চিড় ধরে। এই ঘটনা আজও আমার দুঃখের কারণ হয়ে আছে। ওই বিতর্কের বছর দশক পরে এক ইংরেজতনয় এক কলেজপাঠ্য পুস্তকে বিতর্কটি উল্লেখ করে লেখেন যে, ইংরেজ শাসনের সপক্ষে কিছু বলায় এক না, তিন তিনজন লোক মরিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—'জাম্পড অন হিম'। বেচারা ইংরেজ শাসন, বেচারা মরিস। আমার এই লম্ফঝম্পে পটুত্ব সাধারণ্যে প্রকাশ পাওয়ায় বড় আনন্দ হয়েছিল। আর এক ইংরেজ সহকর্মী এক আলোচনাচক্রে বলেন যে, আমার ওই প্রবন্ধ স্মরণ করে এখনও নাকি তিনি ভয়ে কম্পমান—'কোয়েক ইন মাই শুজ'। ভারতে ইংরেজদের বিবিধ বজ্জাতির কৈফিয়তপটু ঐতিহাসিকদের এক-আধজনকে যদি সত্যিই ভয়ে কাঁপাতে পেরে থাকি তবে তো আমার ঐতিহাসিক জন্ম সার্থক হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, ছ্যাঁচড়ামি ভারতীয় সংস্কৃতির একচেটিয়া সম্পত্তি না। সাহেবি ছ্যাঁচড়ামি বহুবর্ণ এবং বিচিত্র।

সে কথা যাক। আমার মূল বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি—দিল্লিতে দীর্ঘ পনেরো বছর পঠন-পাঠনের সময়টায় গবেষণার ক্ষেত্রে আমার অবদান প্রায় শূন্যের কোঠায়। জ্ঞানার্জন কিছু হয়েছিল, তার কিছুটা পড়াতে গিয়ে, কিছুটা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধানে হাতড়ে বেড়ানোর চেষ্টায়। ইতিমধ্যে এক বছর লন্ডনে এবং হল্যান্ডে কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। ওলন্দাজ কোম্পানির দলিলপত্র আর একবার ঘাঁটাঘাঁটির সুযোগ পেলাম। সেই গবেষণার ফল অল্পবিস্তর পরে কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ায় ব্যবহার করি।

ওই প্রকল্পটির জন্ম হয় কেমব্রিজ এবং কিছুকাল অক্সফোর্ডের অধ্যাপক জন গ্যালাঘারের চেষ্টায়। ধর্মা কুমার ওঁর ছাত্রী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জ্যাক তাঁর কাছে প্রস্তাবটা দেন। ধর্মাই একা কাজটা পেরে উঠবেন না ভেবে আমাকে সহ-সম্পাদক হতে বলেন। আমি প্রথম খণ্ডের জন্য সহ-সম্পাদক হতে ইরফান হাবিবকে অনুরোধ করি। উনি রাজি হন। সবই ভাল। শুধু এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয় যত দূর মনে পড়ে ১৯৬৭ সনে। কিন্তু দুই খণ্ডের বিষয়তালিকা তৈরি এবং এক আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক গোষ্ঠীকে লিখতে রাজি করানো ছাড়া ১৯৭৩ সনে যখন আমি অক্সফোর্ড গেলাম তখন অবধি বই লেখার কাজ এক পা-ও এগোয়নি। ধর্মা ছিলেন চটপটে ছটফটে মানুষ। কোনও একটা কাজ হাতে নিলে সেটাকে যেনতেনপ্রকারেণ শেষ করা ওঁর স্বভাবগত ছিল। এর জন্য কাজের গুণগত ক্ষতি হলে উনি খুব মাথা ঘামাতেন না। আমার প্রকৃতি ঠিক উলটো। তার অন্যতম কারণ স্বভাবজাত আলস্য। কিন্তু শেষ অবধি আমাদের যৌথ প্রচেষ্টাগুলি মোটামুটি সফল হয়। এটা সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

গোলাকার গর্তে বসানো চতুষ্কোণ খুঁটির অবস্থা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি এক দ্বিমুখী চেষ্টা শুরু করি। দেশে-বিদেশে কিছু কিছু চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে আরম্ভ করি। এবং ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে আমার সত্যিকার যাতে উৎসাহ, সেই বিষয় নিয়ে চিন্তা এবং পড়াশোনা আরম্ভ করি। বাহ্য ঘটনা বা বিগত যুগের জীবনযাত্রার পিছনে রয়েছে মানুষের মনোজগৎ—যা কিনা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন। ইংরেজ ঐতিহাসিক ইয়াং বলেছিলেন—অতীত কখনওই বর্তমানের সঙ্গে মেলে না আর ইতিহাসের এক মূল প্রশ্ন হচ্ছে ভিন্ন যুগে বাস করার অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরূপ কী? চল্লিশের দশকে ফরাসি ঐতিহাসিক লুসিয়াঁ ফেব্‌র মানুষের আবেগ, অনুভূতি, মনোভঙ্গির ইতিহাস নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। তারও আগে ডাচ ঐতিহাসিকদের গুরুস্থানীয় হুইসিংগা তাঁর 'মধ্যযুগের হেমন্তকাল' শীর্ষক বইয়ে যুগে যুগে মানুষের অনুভূতির জগৎ কীভাবে আদ্যোপান্ত বদলে যায় তার আলেখ্য এঁকেছেন। তাঁর একটি উদাহরণ বিশেষ করে আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। চতুর্দশ শতকে নেদারল্যান্ডসের কোনও শহরের বাইরে তিনটি ডাকাতকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দৃশ্যটি দেখে সবাই খুব হেসেছিল, 'কারণ লোক তিনটে ছিল নিতান্তই গরিব।' পড়ে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, আজও প্রকাশ্যে ফাঁসি হলে ব্যাপারটা দেখতে ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা খুবই, কিন্তু দৃশ্যটা দেখে কারও কি হাসি পাবে? আর দারিদ্র কি এখনও কারও কাছে কৌতুকের বস্তু? ফরাসি আনাল স্কুলের ঐতিহাসিকরা মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিয়েও গবেষণা শুরু করলেন। হোমার লিখেছেন 'মদিরাবর্ণ সমুদ্র'—তার কারণ এই নয় যে, সমুদ্র তখন সত্যিতেই মদিরাবর্ণ ছিল। গ্রিকদের চেতনায় এবং অভিধানে মাত্র তিনটি রঙেরই উপস্থিতি চোখে পড়ে। মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও কোন গন্ধ কীভাবে পাবে তাও নির্ধারিত হয় সামাজিক সংস্কৃতির আলোকে। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বে অভিজাতরা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করতেন কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন এবং সেই অনুযায়ী লক্ষ্যব্যক্তিকে লিখিত প্রস্তাব পাঠাতেন। (বিংশ শতাব্দীর দিল্লিতে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে অনুরূপ প্রবণতা চোখে পড়েছে, যদিও কথাটা লিখিতভাবে কেউ স্বীকার করবে না।)

আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিতেও কি তুলনীয় পরিবর্তন ঘটেছে? ষোড়শ বা উনিশ শতকের বাঙালির জীবনানুভূতি কি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল? ইতিহাসের নজির থেকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব ঠিক করলাম। মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পরিবারের ইতিহাস, নারীবাদী তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সভ্যতার বিকাশ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরগুলি নানা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নানা দিক থেকে আলোচনা হয়েছে। সেই বহুব্যাপী গবেষণার ফলগুলি নিয়ে আমি সত্তরের দশকে পড়াশোনা শুরু করি। বাঙালি জীবনের ইতিহাসে তার প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সত্যিকার কাজ শুরু করি আরও প্রায় দশ বছর পরে। শুধু ১৯৭২ সনে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এক আলোচনাচক্রে ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক অবধি বাঙালির পারিবারিক জীবনাদর্শ এবং নীতিবোধ নিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। লেখাটি র‍্যাচেল ফান বাউমার সম্পাদিত একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়। ওই অকিঞ্চিৎকর লেখাটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়নি। এটা আমার কৃতিত্ব নয়, সৌভাগ্য।

ষাটের দশকে শিক্ষক/গবেষক হিসেবে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যাতায়াত শুরু হয়। তার সূচনা রকফেলার ফাউন্ডেশনের একটি অনুদানের ফলে। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি চ্যাডবোর্ন গিলপ্যাট্রিক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিনের জন্য এসে ঘাঁটি গাড়েন। তখন ভারতীয় প্রগতিবাদীরা মার্কিন প্রভাব সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যে-কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই মাঝে মাঝে সি.আই.এ-সি.আই.এ রব উঠত। চ্যাড সত্যিতেই এক সময় সি.আই.এ-র হয়ে কাজ করেছেন। তিনি দিল্লিতে প্রথম বক্তৃতায়ই আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কথাটা বলেন। যুদ্ধের সময় নিজের দেশের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করা কিছু দোষের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ওই পরিচয়টি ওঁর নামের সঙ্গে লেগে রইল। প্রগতিবাদীরা রকফেলারের টাকা নিতে কুণ্ঠা করতেন না। কিন্তু নেওয়ার আগে বেশ ভাল করে শুঁকে দেখতেন—অনুদানে সি.আই.এ-র গন্ধ আছে কি না। আঁশটে গন্ধটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল রকফেলার ফাউন্ডেশনে না, এশিয়া ফাউন্ডেশনে, যার টাকা বিভিন্ন সময়ে আমরা সবাই নিয়েছি। দেখা গেল কমিউনিস্ট বিরোধী বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলি এই পাপে ভীষণভাবে পাপী, কখনও সজ্ঞানে কখনও অজ্ঞানে। ভারত সরকার ফতোয়া দিলেন—যেসব প্রতিষ্ঠান এই দূষিত অর্থ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ওই টাকা আর নেওয়া চলবে না। তবে ঘাটতিটা ভারত সরকার পূরণ করবেন। কলকাতার একটি ঐতিহাসিক গবেষণাকেন্দ্র বিশেষ মার খেল। প্রগতিশীল ঐতিহাসিকরা হইহই করতে লাগলেন কারণ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক প্রগতিশীল ছিলেন না, শুধুমাত্র ঐতিহাসিকই ছিলেন। ছোটখাটো নির্বিরোধী মানুষটি যে সি.আই.এ-এর লোক এ বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ রইল না।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কমনরুমে বসে সুনীতিবাবু একটি গল্প বলেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য। এক ব্রাহ্মণপত্নী পাড়ার ছকু খানসামার সঙ্গে পলাতকা। সন্ধ্যাবেলা ছকু প্রেয়সীকে চুম্বন করতে উদ্যত। শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণী আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'গেরন নেগেচে। খেতে নেই।' আমেরিকার আলিঙ্গন-চুম্বনে দীর্ঘদিন অভ্যস্ত ভারতীয় প্রগতিপন্থী বুদ্ধিজীবীরা হঠাৎ শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ায় এই কাহিনির উত্থাপন। মিসেস রবিনসন আমাদের উপদেশ দিলেন, 'পয়সার কোনও জাত নেই। যেখান থেকে পাবে সেখান থেকে নেবে। আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তো করছ না।' ছিঃ, এ কী কথা। আমরা আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব? শত্রুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে আমরা যেসব মহান প্রগতিবাদী ঐতিহাসিক আদর্শ আছে তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হব। আর দিশি সরকার যদি অনুদান দেন, যেখানে প্রতিদানের কোনও প্রশ্ন নেই? আরে প্রতিক্রিয়াশীল হলেও ওরা তো আমাদের ঘরের লোক। সুযোগ পেলেই পুত্র-কলত্র-আত্মীয়বন্ধু তুফায়লি-গুফায়লি সব নিয়ে পাত পেতে বসে যাব। পাতাটি পরিষ্কার করে চেটেপুটে খেয়ে বড় বড় ছাঁদা বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরব। এ ব্যাপারে বারেন্দ্র রাঢ়ী বৈদ্য কায়স্থ কারও কোনও দ্বিমত নেই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ যুগ জিও। ওই যে দাদু তুমি লিখেছিলে, 'না হয় ভারত স্বাধীন হোক, লুটে পুটে খাই।' সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমরা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করছি। তুমি বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতে।

ভারত-মার্কিন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথায় ফিরে যাই। যেসব মার্কিন অনুদান সংস্থা

আমাদের অনুদান দিত তারা সম্ভবত সবাই সি.আই.এ-এর হাতধরা ছিল না। তবে ভারতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কিনবিরোধী মনোভাব তখন বেশ প্রবল—বিশেষত ভিয়েতনামে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। মার্কিন সংস্থাগুলি যে এই মনোভাবের প্রাবল্য কমাতে উৎসুক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নীতি অনুসরণ করে রকফেলার ফাউন্ডেশন কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিককে বেছে নেয় এবং লন্ডনে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ আর কতগুলি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দিয়ে গবেষণা আর পড়ানোর ব্যবস্থা করে। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চ্যাড গিলপ্যাট্রিক। এই অনুগৃহীত ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমি একজন। কয়েকজন অতি সোচ্চার বামপন্থীও ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি ১৯৬১ সনে এক বছরের জন্য লন্ডন যাই—স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (সোয়াস)-এ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে। ওই বছরটি আমার জীবনে নানা কারণে স্মরণীয়। লন্ডনে ১৯৬১-র জুন মাসে আমার একমাত্র সন্তান সুকন্যা জন্মগ্রহণ করে। হল্যান্ড গিয়ে ওখানকার রাজকীয় নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং ভৌগোলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আমার অক্সফোর্ড থিসিসটি বই হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করি। ছাপান ওদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা মার্টিনুস নেইহফ। 'সোয়াস'-এ তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সি. এইচ. ফিলিপসের রাজত্ব। ওইখানে পরিচয় হল পরবর্তী কালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। কীর্তি নীরদ সি.-র দ্বিতীয় পুত্র। আর কলকাতার পূর্বপরিচিত রণজিৎদা তখন ম্যাঞ্চেস্টারে একটি নামি ফেলোশিপ নিয়ে এসেছেন। লন্ডনে গবেষণা করতে এসে উনি আমার সঙ্গে একত্র ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন। যে রাত্রে মিডলসেক্স হাসপাতালে আমার কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, সেই রাতটা আমরা দু'জনে হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথে পায়চারি করে কাটাই। স্কুলে ব্যাশাম সাহেবের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। উনি তখন বেশ বাংলা পড়তে ও বলতে শিখে গেছেন। বহু ভাষাভিজ্ঞ এই পণ্ডিত মানুষটির আকাশচুম্বী পাণ্ডিত্য এবং ভারতীয় ইতিহাসে গভীর সাহিত্যধর্মী অবদানের যে-সমাদর হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। যদি ভারতবর্ষ সম্পর্কে দশটি শ্রেষ্ঠ রচনার তালিকা করা হয় তবে সেই তালিকায় ব্যাশাম সাহেবের 'দা ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া' উঁচুর দিকেই থাকবে। অন্তত আমার তাই ধারণা। মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনেও সুখী ছিলেন না। ওঁর জীবনের একটি ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। কলকাতায় ওঁর মৃত্যু হয় এবং ওঁর ইচ্ছানুযায়ী উইলিয়াম জোনসের সমাধির পাশেই ওঁর দেহ কবরস্থ করা হয়।

সোয়াসে কাজ করার সময় একটি ঘটনা মনে পড়ে। এক সেমিনারে কীর্তি ভারত মহাসাগরে ইউরো-এশীয় বাণিজ্য নিয়ে তাঁর বিশাল গবেষণার পরিকল্পনা উন্মোচন করেন। কীর্তির তখনও ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা হয়নি। ফিলিপস সাহেব মন্তব্য করলেন—এর থেকে ছোটখাটো সময়ের দিক থেকে সীমিত কোনও বিষয় ধরো। রণজিৎদা প্রতিবাদ করে বললেন—যে-ব্যক্তি এত বড় পরিকল্পনা করার সাহস দেখিয়েছে তাকে উৎসাহ না দেওয়া অকর্তব্য হবে। শেষে রণজিৎদার মতটাই ঠিক প্রমাণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা একদা গোপনীয় কথা বলি। অনেক বছর পরে কীর্তি ভারত মহাসাগরে নয় শতাব্দীব্যাপী ব্যবসার ইতিহাস লেখার এক প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটা সম্পর্কে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস আমার

মতামত জানতে চায়। আমি উত্তরে লিখি—যদি অন্য কেউ এই প্রস্তাব করত আমি বলতাম এটা মেগালোম্যানিয়াকের অলীক কল্পনা। কিন্তু প্রস্তাবক যেহেতু কীর্তি চৌধুরী, আমার মতে আপনারা চোখ বুজে ওটি মঞ্জুর করতে পারেন।

১৯৬১-৬২ সনে লন্ডনবাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব। কয়েকদিন এক বন্ধুর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থেকে বাকি সময়টার জন্য ফ্ল্যাট খুঁজতে থাকি। লন্ডনের সবচেয়ে বড় হাউসিং এজেন্সির দ্বারস্থ হয়ে আমাদের সাধ্যে কুলায় এ রকম ফ্ল্যাটের একটি তালিকা পেলাম। সেই লিস্টে আটশো ফ্ল্যাটের বর্ণনা এবং ঠিকানা ছিল। খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম আটশোর মধ্যে মাত্র দুটি ফ্ল্যাটে সন্তানসন্ততি সহ অশ্বেত মানুষদের বাড়িওয়ালা ভাড়াটে হিসাবে নিতে প্রস্তুত। তার একটিতে গিয়ে দেখলাম ফ্ল্যাটটি কষ্টেসৃষ্টে ভূমিপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে। কড়ি আগে পড়ে কিংবা দড়ি আগে ছেঁড়ে অবস্থা। দ্বিতীয়টির মালিক জনৈক ভারতীয়। সেটি আরও সরেস। দিনের বেলায়ই বোঝা যায় ওটি গণিকালয়। তখনও রেস রিলেশনস আইন বিধিবদ্ধ হয়নি। তাই বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে জাতিবৈর বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করা যেত। শেষ অবধি লিস্টি দেখে বাড়ি জোগাড় করার চেষ্টা ছেড়ে দিই এবং বন্ধুদের সাহায্যে উত্তর ইলিংয়ে একটি বাড়ি জোটে। মালিক যুগোস্লাভ। তাঁর স্ত্রী ইংরেজ। বোধহয় বিদেশি বিয়ে করে ভদ্রমহিলার বিশ্বাস হয় যে ইংরেজ ছাড়া অন্য লোমহীন দ্বিপদরাও মনুষ্য নামক প্রজাতির অংশ। আজ যাঁরা বিলাতে জাতিবৈর নিয়ে চিন্তিত তাঁরা সম্ভবত ষাটের দশক অবধি মা কী ছিলেন সে কথা হয় জানেন না, নয়তো স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়েছেন।

রকফেলারেরই কৃপায় ১৯৬৪ সনে আবার বিদেশমুখী হলাম। এবার গন্তব্য আমেরিকা। প্রথমে উত্তর ক্যারোলাইনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারপর বার্কলে। ডিউকের ইতিহাস বেশ বিচিত্র। স্থানীয় এক গরিব ছেলে তামাকু, বিশেষত সিগারেটের ব্যবসায় অনেক পয়সা করে নিজের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা মনস্থ করে। অবশ্যি বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুনই হতে হবে এমন না। শোনা যায় ভদ্রলোক প্রথম হার্ভার্ড এবং ইয়েলকে টাকাটা দিতে চান। শুধু সামান্য একটি শর্ত ছিল। গ্রহীতার নিজের নাম বদলে ডিউক নাম নিতে হবে। এই সামান্য শর্তটি কেউ মানতে রাজি না হওয়ায় ভদ্রলোক শেষটায় নিজের জন্মস্থান ডারহাম শহরেই নিজনামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন নানা কারণে রীতিমতো রমরমা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলি প্রতিষ্ঠাতার খ্রিস্ট ধর্মপ্রীতি বোঝানোর জন্য একটি বৃহৎ ক্রুশের আকারে সাজানো। আর তিনি যে সংস্কৃতিবান তার প্রমাণ বাড়িগুলি অক্সব্রিজের সব কলেজ যে-জাতীয় পাথরে তৈরি সেই ধরনের পাথরেই নির্মিত। কুলোকে বলত—পাথরগুলি এমনভাবে বাছা হয়েছে যে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবে, যাতে প্রতিষ্ঠানটি রীতিমতো ভব্যিযুক্ত এবং বনেদি বলে লোকের ধারণা জন্মায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠাতার মূর্তি। তাঁর এক হাতে বাইবেল, অন্য হাতে সিগারেট—যথাক্রমে মহাপুরুষের আত্মিক ও বৈষয়িক মহিমার প্রতীক। যুদ্ধোত্তর যুগে আমেরিকায় ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে গবেষণার যাঁরা পথিকৃৎ, তাঁদের অন্যতম রবার্ট ক্রেন তখন ডিউকে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের পরিচালক। উনি ভারতীয়

বিপ্লবীদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু সেই নিবন্ধ কখনও ছাপাননি। ওঁকে ঘিরে ভারতের ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, ভাষা ইত্যাদি নানা বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিছু পণ্ডিত জড়ো হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে উনি সদলে সিরাক্যুস বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান।

ডিউকে পড়াতে ভাল লেগেছিল। তার প্রধান কারণ দেখলাম মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ব্যাপারে স্নাতক হওয়ার আগেই তালিম শুরু হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা যেসব টার্ম পেপার লিখত অনেক সময়ই তা প্রকাশযোগ্য হত। এদের লেখা বেশ কয়েকটি টার্ম পেপার আমাদের পত্রিকায় ছাপিয়েছিলাম। বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার শিক্ষা হয়তো ওদেশে দুর্লভ। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণাযোগ্য একটি বিষয় খুঁজে নেওয়া, তার জন্য গ্রন্থপঞ্জি তৈরি করা এবং বিষয় সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে মার্কিনি শিক্ষার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন।

মার্কিন সমাজ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ইউরোপে অনেক সময়েই শুনি যে মার্কিনদের বন্ধুত্বে কোনও গভীরতা নেই, চোখের আড়াল হলেই সৌহার্দ্যের সমাপ্তি। বিদেশে গিয়ে কেউ অন্তহীন গভীর বন্ধুত্বের খোঁজ করে কি না জানি না, কিন্তু মানুষে মানুষে যে সহজ সম্পর্ক শুধু ইংল্যান্ড না, ইউরোপের সংস্কৃতিগর্বী অনেক দেশেই দুর্লভ, আমেরিকায় তা বারেবারেই অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছি। ডিউকে এক অধ্যাপকের বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ওই সময়টা ছুটিতে। বিকেলবেলা পাইনবনের ভিতর ওঁর সুন্দর বাড়িটিতে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ল—টেবিলের উপর আমার তিন বছর বয়স্কা মেয়ের জন্য একটি খেলনা আর গৃহকর্ত্রীর তৈরি একটি কেক রাখা। এই মার্কিন দম্পতির সঙ্গে আমাদের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। হলে ওদেঁর সঙ্গে আমরা অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতাম এমন মনে হয় না। কিন্তু অচেনা এক বিদেশি পরিবারের জন্য ওঁরা সামান্য যে-অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তার সুখস্মৃতি এখনও আমাদের মনে সজীব আছে। প্রায় চার দশক ইংল্যান্ডে বাস করে এর সঙ্গে তুলনীয় শুভেচ্ছার দ্যোতক ব্যবহার আমাদের অভিজ্ঞতায় অল্পই পেয়েছি।

ডিউকে আমার ব্যবহারের জন্য যে-ঘরটি দেওয়া হয়েছিল তার এক দিকে বিরাট এক আয়না। পরে বুঝতে পারি ওই আয়নার ভিতর দিয়ে অন্য দিক থেকে ঘরের ভিতরকার সব কিছুই দেখা যায়। এই ঘরটি ফলিত মনস্তত্ত্ব বিভাগের গবেষণার জন্য ব্যবহার হত। যত দূর জানি আমি ওই গবেষণায় গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত হইনি। হলেও চিন্তার কারণ ছিল না। কারণ ওখানে বসবাসের সময় লজ্জাজনক কিছু করিনি।

ডিউকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল প্রেততত্ত্ব এবং মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত সব অনুভূতি নিয়ে গবেষণার জন্য। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেতচর্চা বিভাগ খুলেছিলেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি ভারতীয় ভূতের পরিসংখ্যান : 'আ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়ান ভূতস'। সে চার দশক আগের কথা। আমার ধারণা এত দিনে ভারতীয় ভূতের সংখ্যা বেশ কিছু বেড়েছে। দিনেদুপুরেও তাদের উৎপাতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ডিউকে যখন পড়াচ্ছি তখন কাছাকাছি ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে


সুখময় চক্রবর্তী


এ এল ব্যাশম


আঁদ্রে বেতেই


নবনীতা দেবসেন



হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস: এলোপাথাড়ি ঢিল ছুঁড়লে যে-কোনও সময়ে দশটা নোবেল লরিয়েট মারা পড়ার সম্ভাবনা।



অক্সফোর্ড



আমার স্ত্রী হাসি



ক্যাপ্টেন কাননবিহারী সেন রায় এবং শ্রীমতী বিভা সেন রায়



শান্তিনিকেতনে গাঁধীজি—প্রথম সারির মাঝখানে বসে হাসি



তাঁর জীবন ও কর্মবিষয়ক স্মারকগ্রন্থ নন্দলাল বসুর হাতে হাসি তুলে দিচ্ছেন


অতুলচন্দ্র গুপ্ত

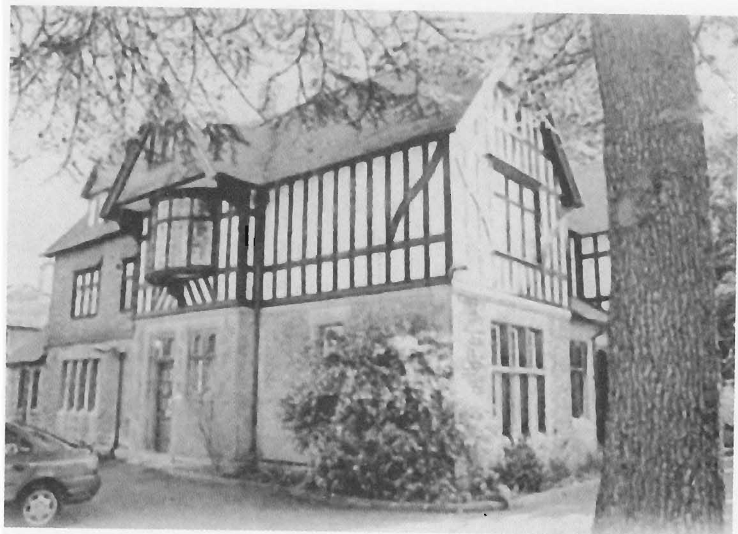

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত


রাধারাণী দেবী


সর্বেপল্লী গোপাল


সুমিত সরকার


রমেশচন্দ্র মজুমদার

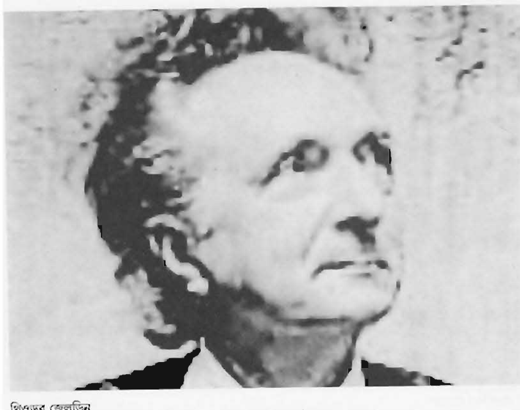

সেন্ট অ্যান্টনিজ কলেজ



কলিন ডেভিস



ক্রিস্টফার হিল



থিওডর জেলডিন

পরিচয় হয়। বললেন, তিনি ওখানকার 'প্রাঁফেসর আঁফ হার্স জাজিং।' কী পড়ান এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হার্স জাজিং ইয়ান্ড ইয়্যাডভান্সড হার্স জাজিং।' অতি যুক্তিসম্মত উত্তর। শুনলাম ভদ্রলোক সে যুগেই বছরে আশি হাজার ডলার রোজগার করেন। অন্য অধ্যাপকদের তখনও মাইনে ত্রিশ হাজার সাধারণত ছাড়ায় না। শুনলাম ওঁর ছাত্রদের বাজারে বেজায় চাহিদা। হবেই তো। ঘোড়াতত্ত্ব বলে কথা।

ডিউকে এক সেমেস্টার পড়ানো শেষ হলে বার্কলেতে পড়াতে গেলাম। আমি দরিদ্র মানুষ। দেশে গাড়ি কেনার মতো রেস্ত ছিল না। কিন্তু আমেরিকার ছোট শহরে গাড়ি ছাড়া বাস করা কঠিন। তাই গাড়ি চালানো শিখতে এবং অল্প দামে দশ মালিকের হাত পার হওয়া এক ঢাউস গাড়ি কিনতে বাধ্য হলাম। আমার শকটচালনা-শিক্ষয়িত্রী সম্ভবত পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন। মোড় ঘুরবার আগে সব সময়ই সাবধানবাণী উচ্চারণ করতেন, 'থিংক অফ হোয়াট ইজ বিয়ন্ড।' ফলে আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু গাড়ি চালানোর ব্যাপারটা কিছুটা কাঁচা থেকে যায়। আমার ধারণা ভদ্রমহিলার পুলিশের সঙ্গে কিছু যোগসাজস ছিল। তাঁরা এক চক্কর ঘুরিয়ে আমাকে লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। যখন লাইসেন্স পেলাম তখন আমি গাড়ি চালাতে শিখেছি বললে খুবই অতিরঞ্জন হবে। ওই বিদ্যে নিয়ে আমেরিকায় গাড়ি চালিয়ে যে সপরিবারে বেঁচে ফিরেছি তা নিতান্তই গুরুকৃপায়।

শোনা যায় মায়ার বন্ধন এড়াবার জন্য শুকদেব মায়াধিষ্ঠিতে জগতি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছিলেন না। অনেক বাবা-বাছা করে তাঁকে নামাতে হয়। তবে উনি পড়ুয়া ছেলে। মাতৃগর্ভে সময়টা নষ্ট করেননি। ক'বছরে বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি ভারতীয় সংস্কৃতির থান থান কেতাবগুলি পিতার পাঠ শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। আমেরিকানদের দেখে আমার ওই কাহিনিটি সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন হয়। কারণ দেখলাম ওরা গাড়ি চালানো শিখে তারপর ভূমিষ্ঠ হয়। এবং তাদের ধারণা মনুষ্যমাত্রই জন্মসূত্রে ওই জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, পাখির উড়তে জানার মতো। তাই যখন আমার মার্কিন বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম— আমার স্তরের পটুত্ব নিয়ে আমেরিকার পুব কূল থেকে পশ্চিম কূল পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা হঠকারিতা হবে কি না, তাঁরা সবাই এক বাক্যে বললেন, 'আরে তুমি তো দিব্বি চালাচ্ছ। এতে ঘাবড়াবার কী আছে?' বলে ম্যাপট্যাপ সব জোগাড় করে তার উপর সব লাল-নীল দাগ কেটে পথটা যে সোজা আর সওয়া ঘণ্টার চেয়ে সামান্যই বেশি সময়সাপেক্ষ তা বেশ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। আর অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমি সে কথা বেশ সোনামুখ করে মেনে নিলাম।

ডারহাম থেকে নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক থেকে বাফেলো, তারপর দক্ষিণমুখি গোঁত্তা মেরে পেনসিলভেনিয়ার একটি ছোট শহর ইন্ডিয়ানা (ইয়ার-সওগাতের উদ্দেশে), তারপর আরও দক্ষিণমুখি হয়ে আরিজোনার মরুভূমি, মনুমেন্ট ভ্যালি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ইত্যাদি দেখে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে বার্কলে শহরে পৌঁছলাম। পথে বার তিনেক মৃত্যু কান ঘেঁষে বের হয়ে গেছে। একবার সত্তর মাইল স্পিডে চলতে চলতে উলটো দিক থেকে একই স্পিডে চলা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা এড়াতে কষে ব্রেক দিই। গাড়ি এক লাফে পাশের খানায় পড়ল। কিন্তু খানাটি কাদা আর আগাছায় ভর্তি থাকায় গাড়ি ওলটাল না। আমার কন্যা ভাবলেন আমি

স্বেচ্ছায় ভেলকি দেখিয়েছি। বলতে শুরু করল, 'বাবা, আবার করো।' আর একবার ঠিক দুপুরবেলা মরুভূমির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এক মোটেল থেকে আর এক মোটেল পর্যন্ত যাওয়া স্থির করি। পথটা পার হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু ততক্ষণে ফ্লাস্কের জল টগবগ করে ফুটছে দেখলাম। আর আমার কন্যা গরমে প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। আমারও নাভিশ্বাস উঠেছে। বাইরে তাপমান কী জানবার আর চেষ্টা করিনি।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন পৌঁছে এক অপ্রত্যাশিত মানবিক অভিজ্ঞতা হল। ক্যানিয়নে ট্যুরিস্টদের সুবিধের জন্য রীতিমতো এক গ্রাম বানিয়ে ফেলেছে। ছোট ছোট সব কাঠের তৈরি কুটির বা লগ কেবিন। আর খাওয়ার জন্য বিরাট ক্যান্টিন। আমাদের পাশের কুটিরে একটি মার্কিন পরিবার ঘাঁটি গেড়েছেন। আমেরিকার গভীর দক্ষিণ বা ডিপ সাউথের লোক এঁরা। মা আর দুটি দশ-বারো বছর বয়সের মেয়ে। মেয়েদের মাতৃভূমির স্বরূপ দেখাতে একটি বিশাল গাড়ি নিয়ে মা এক মাস ধরে ঘুরছেন। সঙ্গে পোষা ল্যাব্রাডরটিও আছে। সরল প্রকৃতির মহিলাটির সঙ্গে সহজেই খুব ভাব হয়ে গেল। মা-মেয়েরা আমার স্ত্রীর শাড়ি গায়ে জড়িয়ে মহা ফুর্তিতে ছবি তোলালেন। সারা সময়টাই প্রায় এক সঙ্গে কাটল। যাবার দিন মহিলার চোখে জল। বললেন, এই এক মাস পর তোমাদের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলাম। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে এবার বেড়াতে বের হয়ে একটিও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কথা বলার লোক খালি এই দুটো বাচ্চা, কুকুরটা আর যত সব নিগার।—'দা ওনলি পিপল আই কুড টক টু ওয়্যার দা কিড্‌স, দা ডগি অ্যান্ড নিগারস। নট ওয়ান অ্যাডালট হিউম্যান বিয়িং।' শুনে বড় আহ্লাদ হল— আমরা মনুষ্য প্রজাতির অংশ, দেহবর্ণ কালো না, বাদামি, তাই নিগার বা অ-মানুষ না।

ওই তিন সপ্তাহের ভ্রমণের সময় আমার আর একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হয়। মনুমেন্ট ভ্যালিতে যখন পৌঁছলাম, মনে হল চন্দ্রলোক বা অন্য কোনও গ্রহান্তরে এসেছি। এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতিতে আমাদের অকিঞ্চনতা হঠাৎ যেন বুদ্ধি দিয়ে বোঝার স্তর ছাড়িয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম। চেতনায় আরও একটি ছোট বিপ্লব ঘটল। আমরা যে নভোস্থিত কোনও করুণাময় ঈশ্বরের আশ্রয়ে নেই, মানুষ এবং জীবলোকের অন্তহীন জ্বালা-যন্ত্রণা দেখে এই বিশ্বাস অনেকদিন আগেই জন্মেছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্মের পিছনে কি কোনও বুদ্ধিপ্রণোদিত পরিকল্পনা আছে? যে-পরিকল্পনায় এই ক্ষুদ্র গ্রহটির মুষ্টিমেয় স্বল্পপ্রাণ জীবের ভালমন্দ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি? মনুমেন্ট ভ্যালিতে দেখলাম লক্ষ লক্ষ বছরের অবক্ষয়ের ফলে এক-একটি পাহাড় মানুষের হাতে তৈরি মূর্তি বা সৌধের রূপ নিয়েছে। কোনওটার চেহারা হিন্দু মন্দিরের, কোনওটা ঠিক হাতির মতো দেখতে। মনে হল—এই অবিশ্বাস্য ঘটনা যদি নেহাতই প্রকৃতির খামখেয়ালে হতে পারে, কোনও ইন্টেলিজেন্ট প্ল্যানিংয়ের অপেক্ষা না করে, তবে বিশ্বপ্রকৃতিও একই ভাবে জন্ম এবং পরিবর্তনের পথে গিয়ে ধ্বংসের দিকে অনিবার্য বেগে চলতে পারে। কোনও স্রষ্টা কল্পনার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি না, উপলব্ধির স্তরে যেন একটা সমস্যার সমাধান পেলাম। চেতনার গভীরে স্রষ্টাহীন ব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছনোয় এক গভীর ভাষাতীত শান্তি অনুভব করলাম। সহায়হীন সান্ত্বনাহীন জীবজীবনের আমি অংশীদার, অসীম বিশ্বপ্রকৃতির একটি বালুকণা, জন্মমুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে

দুঃখসুখ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিজ্ঞতায় চেতনার পাত্র পূর্ণ করে অনিবার্যবেগে সেই চেতনারই বিনষ্টির দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু বহু রত্নখচিত সেই চেতনা। স্বল্পায়ু এই মূল্যাতীত উত্তরাধিকারের পূর্ণতায়ই মানবজীবনের সার্থকতা। তার বাইরে অর্থ খুঁজে বেড়ানো নিতান্তই অর্থহীন। কীসে ভয় আমার, কাকে ভয়? প্রকৃতি আমার ললাটে ভয়হীনতার জয়মালা, গলায় প্রসূন হার পরিয়ে দিয়েছে। আমি মনুর সন্তান। সেই অসামান্য সৌভাগ্যের উদ্ধত গর্বে জীবন উত্তরণ করে চেতনাহীনতার রাজ্যে চলে যাব। এই নিষ্করুণ মরুপ্রকৃতি আমাকে সাহসের মন্ত্রে দীক্ষা দিল। 'কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি? আঁধার তোমার সবই মিছে।'

বার্কলে পৌঁছনোর পর আমেরিকায় আর গাড়ি চালাইনি। দু-তিনবার প্রাণঘাতী অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে নেহাতই গুরুকৃপায় বেঁচে যাই। তারপর আর স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিতে উৎসাহ পাইনি।

১৯৬৪ সন আমেরিকার জনজীবনে গৌরবের বছর। সিভিল রাইটস আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণ। আমরা যখন ডারহামে তখন ওই শহরেরই এক বর্ণবৈষম্যবাদী ব্যবসায়ী এক তরুণ অহিংস সত্যাগ্রহীকে গলায় ব্লিচিং পাউডার ঢেলে দেওয়ায় ছেলেটির মৃত্যু হয়। অপরাধীর কোনও শাস্তি হয়েছে বলে শুনিনি। বার্কলে তো প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের রাজধানী বললেই চলে। জোন বায়েজ তখন ওখানকার ছাত্রী। একদিন দেখলাম ক্যাম্পাসের চত্বরে গিটার বাজিয়ে গাইছেন, 'উই শ্যাল ওভারকাম—সাম ডে।' মনে হল যেন সুর, ভাষা আর আবেগের স্রোতে মেয়েটি আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভাবলাম—তোমার কথা সত্যি হোক। সারা দুনিয়ার অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির পথ তোমরা যেন খুলে দিতে পার।

স্বাধীনতার লড়াই সব দেশেই মাঝে মাঝে বিচিত্র রূপ নেয়। শুনেছি ভারতবর্ষে কিছু দেশপ্রেমিক ত্রিশের দশকে রাস্তায় সার দিয়ে বসে পাঁচ আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন। এই বিদ্রোহে আইনের সুদীর্ঘ হস্তও নাকি মাঝপথে থমকে থেমে গিয়েছিল। পঞ্চাশজন প্রস্রাব-সত্যাগ্রহীকে গ্রেফতার করে সরকার সকলের হাস্যাস্পদ হতে চাননি। সম্ভবত কাহিনিটি কল্পিত। বার্কলে ক্যাম্পাসে তখন রাখ-ঢাক না রেখে কথা বলার আন্দোলন প্রবলভাবে চলছে। এক দিন ক্লাস থেকে বের হচ্ছি, একটি মেয়ে মুখের সামনে একটা প্ল্যাকার্ড তুলে ধরল। তাতে প্রজননঘটিত ইংরেজি চার অক্ষরের কথাটি লেখা আছে। মেয়েটিকে বললাম, 'দ্যাখো বাছা, কথাটা আমার অজানা না। কর্মটিও সম্পূর্ণ অপরিচিত বললে মিথ্যাচার হবে। একটা কথা বলি শোনো। ডি এইচ লরেন্স পড়ে দ্যাখো। ব্যাপারটা পবিত্র, জীবজীবনের মূল্যাতীত আনন্দের আধার। খিস্তিখেউড়ের বিষয় নয়। ওতে—মন নোংরা না হলে, ডার্টি কিছু নেই। ওটাকে নর্দমায় নামিয়ে অকারণে নোংরা কোরো না।' মেয়েটি কিছু না বলে চলে গেল। কী বুঝল সেই জানে!

তখন গ্রীষ্মকাল। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে স্নানের পোশাক পরে সার্ফ বোর্ড হাতে ক্লাসে আসত। মানে বক্তৃতা শেষ হলেই সমুদ্রস্নানে যাবে। যদি বলি বিকিনি পরিহিতা সুন্দরীদের উপস্থিতি হৃদয়ে কখনও কোনও চাঞ্চল্য ঘটায়নি তা হলে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু যে-দৃশ্যে সত্যিতে পড়ানোর ব্যাঘাত ঘটে সে অন্য স্তরের জিনিস। এক দিন ক্লাসে ঢুকে দেখি

বেঞ্চিগুলির সামনে চিত হয়ে শুয়ে দুই বালক কটা গ্যাসের বেলুন নিয়ে খেলছে। বেলুনগুলি এক একবার সিলিং অবধি উঠে যাচ্ছে, আবার সুতো টেনে তাদের আমার নাকের সামনে নামানো হচ্ছে। মাস্টার খ্যাপানোর নানা ফিকির কলকাতার ছেলেদের জানা আছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ও বস্তুর সাক্ষাৎ পাব ভাবিনি। সাহস করে প্রশ্ন করলাম, 'হচ্ছেটা কী?' সহজ সরল উত্তর, 'উই আর ডুয়িং আওয়ার ওন থিং।' মানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্ন আর কি। বললাম, দ্যাখো বাছারা, আমারও যে এখানে একটা 'ওন থিং' করার আছে। তোমাদের ওন থিং আর আমার ওন থিং তো একসঙ্গে চলা মুশকিল। বিস্মিত প্রশ্ন, 'ও! তোমার বুঝি অসুবিধে হচ্ছে?' ঘাড় চুলকে বললাম, 'তা অল্পবিস্তর...।' দেখলাম ছোঁড়ারা পরশুরামের বাটলোর মতোই বিনয়ী। সেই যে বন্ধুর বাবাকে বলেছিল, 'আমরা কী করি না করি তাহাতে আপনার পিতার কী?' না, এরা শুধু নিজের না, সকলের ব্যক্তিস্বাধীনতাই শ্রদ্ধার চোখে দ্যাখে। বেলুন গুটিয়ে নিয়ে 'সরি' বলে তারা নিষ্ক্রান্ত হল। বোধ হয় অন্যত্র কোথাও গিয়ে ওদের ওন থিংয়ের অকুস্থল বসাল।

আর একদিন একটি স্নাতকোত্তর ছাত্রর সঙ্গে কফি হাউসে সাক্ষাতের কথা ছিল। ছেলেটি যথা সময়েই এল। মুখ একটু বিবর্ণ। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি শরীর খারাপ?' একটু মুখ ভেটকে বলল, 'না, তা ঠিক না। দশ ডলার বাজি ধরে একটা জ্যান্ত টিকটিকি গিলে খেয়েছি। ওটা পেটের ভিতর লাফালাফি করছে।' শৈশবে শুনেছি—কাশীধাম ভূমণ্ডলের অন্তর্গত নয়। শিবের ত্রিশূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বার্কলেতে তিন মাস পড়িয়ে আমার ধারণা হল যে ক্যালিফোর্নিয়াও ভূমণ্ডলের বাইরে, তবে কার কোন আয়ুধের উপর কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে, বলতে পারব না। যত দূর জানি, পৃথিবীর আর কোনও অঞ্চলের মানুষ বাজি ধরে টিকটিকি গেলে না। আর একদিন এক বন্ধুর খোঁজে এক অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে গিয়েছি। ফ্ল্যাটটা খুঁজে না পেয়ে এক অচেনা লোকের দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুললেন এক সম্পূর্ণ উদোম নাঙ্গাবাবা। কোনওমতে তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে দরজায় আঁটা নেমপ্লেটটা পড়লাম—'জিম স্মিথ, ওয়ারলক'। মানে বাবাজি জাতে ডান, এবং ডান বা ডাকিনীরা দিগম্বর থাকেন। এ তথ্যও ক্যালিফোর্নিয়ার বাইরে কোথায় আমার চেতনাগোচর হত?

বার্কলেতে ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে গবেষণারত আরও কিছু মার্কিন সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। টম মেটকাফ এবং তখন তাঁর ছাত্রী, পরে পত্নী, বারবারা তখন বার্কলেতে যথাক্রমে মাস্টার ও ছাত্রী। পরে বারবারার খ্যাতি উর্দু সাহিত্য এবং দেওবন্দ আন্দোলন নিয়ে গবেষণায়। ওঁরা বিয়ে করেন দিল্লি এসে। আমাকে কন্যা সম্প্রদান করতে অনুরোধ করায় সানন্দে রাজি হয়েছিলাম। টমকে আমার কন্যা ডাকতেন আঙ্কল টমেস। তখন লীলা রায়ের একটি গল্প ওর খুব মনে ধরেছিল। তার অন্যতম বক্তব্য মোটাদের বলা হয় বিশকম্বল আর রোগাদের কানাই। কন্যা বলতেন, 'আঙ্কল টমেস কানাই আর অর্জুনকাকা বিশকম্বল।' অর্জুন অত কিছু বিশকম্বল ছিলেন না, তবে টমেস নিতান্তই কানাই।

দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক বার্ট স্টাইন, গুন্টুর জেলার বিখ্যাত ইতিহাসের রচয়িতা ফ্রিকেনবার্গ—এঁদের সকলের সঙ্গে এক সেমিনার উপলক্ষে পরিচয় হয়। বিষয় 'ল্যান্ড

কন্ট্রোল ইন ইন্ডিয়া'। আমি জমিদারিপ্রথা সম্বন্ধে বাল্যস্মৃতির ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ পড়ি। রণজিৎদা প্রবন্ধটি পড়ে খুব ঠাট্টা করেছিলেন। আমার লেখাটা ঠিক অতটা হাস্যকর লাগেনি। স্মৃতিভিত্তিক অনুরূপ লেখা ইংরেজি ভাষায় আর চোখে পড়েনি। তখন ভারতীয় ইতিহাসে জমিদারিপ্রথা নিয়ে আলোচনা খুব সরগরম। ফলে লেখাটি অকিঞ্চিৎকর বলে অবহেলিত হয়নি।

আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াবার নেমন্তন্ন পেয়ে আবার আমেরিকা যাই ১৯৬৯-৭০ সনে। এবার গন্তব্য পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ভার্ড। ফলে আমি বেশ উত্তেজিত। পেনসিলভেনিয়ায় আমাকে যে ঘরটি দেওয়া হল সে ঘরটি আদতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হোল্ডেন ফার্বারের। তখন ঘোর শীত। ফলে জুতার উপর অধিজুতা মানে ওভার শু পরতে হত। কথাটা মনে পড়ল এই জন্য যে ওই ঢাউস জুতাজোড়া গাফিলতি করে ফার্বারের ঘরের এক কোনায় ফেলে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম ওটা কারও আর নজরে পড়বে না। কিন্তু ফার্বার ছিলেন সেকেলে মানুষ, সর্ব ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠ। আমি যখন হার্ভার্ডে পড়াচ্ছি, তখন একদিন কৌশলী হাতে সুন্দরভাবে প্যাক করা সেই জীর্ণ জুতাজোড়া আমার দফতরে পৌঁছল। বেয়াদবির জন্য ফার্বারকে ফোন করে অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। সদাশিব মানুষটি ব্যাপারটায় আমার দোষের কিছু পেয়েছেন এমন মনে হল না।

পেনসিলভেনিয়ায় ফিলাডেলফিয়া শহরের বাইরে একটি সুন্দর সাবার্ব অর্থাৎ শহরতলি না, মফস্বল শহরে থাকতাম। নাম সোয়ার্থমোর। ট্রেনে আসাযাওয়া করতে হত। এ যাত্রা আর গাড়ি কিনিনি। বাড়ি থেকে স্টেশন পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতাম। আমেরিকায় এমন কাজ হতদরিদ্র লোকেও করে না। আসলে ওই জাতীয় সমৃদ্ধ ছোট শহরে হতদরিদ্র লোক অল্পই থাকে। আমাদের বাড়ির ঝাড়পোঁছ করতে যে কালো মেয়েটি আসত, তারও একখানা গাড়ি ছিল। প্রায় প্রতি পরিবারেই এক বা একাধিক গাড়ি থাকায় রাস্তাঘাটে পদচারীর জন্য সুযোগ-সুবিধে প্রায় নেই বললেই চলে। রাস্তার পাশে ফুটপাত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ওই সমৃদ্ধ দেশের মফস্বল শহরে যে-বিদেশি পায়ে হেঁটে যায়, তার প্রতি সকলের অন্তহীন করুণা। ফলে রাস্তায় পা দিলেই কেউ-না-কেউ গাড়িতে তুলে নিত।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি ফিলাডেলফিয়া শহরের মাঝখানে অর্থাৎ দারিদ্রপীড়িত কালো মানুষ-অধ্যুষিত সিটি সেন্টারে। পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশে দারিদ্রর চেহারা যে কী ভয়াবহ হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় যেতে-আসতে তার কিছু আঁচ পেতাম। দারিদ্র আর অপরাধপ্রবণতার সহজ সমীকরণ করা চলে না। কিন্তু পেনসিলভেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে নৃশংস অপরাধ প্রায়ই ঘটত। আমরা ওখানে থাকাকালীনই ক্যাম্পাস অঞ্চলে একটি খুন এবং একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। আমার নিজের একটি মারাত্মক অভিজ্ঞতার মর্মার্থ ঘটনাটি ঘটার সময় আমি বুঝতে পারিনি। ট্রেনে চেপে শহরে আসছি, মাঝপথে দশ-বারো বছর বয়সের একটি কালো ছেলে ট্রেনে উঠল। তার সর্বশরীর থেকে তীব্র মদের গন্ধ আসছে। আর তার কোমরের বেল্টে ধারালো একটি ছুরি গোঁজা। ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে লাগল। দেখলাম যাত্রীরা সবাই তটস্থ। এবং অনেকেই মাঝে মাঝে আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে ছেলেটা

নেমে গেল। আমার পাশের যাত্রীটি আমাকে বললেন, 'খুব বেঁচে গেছ। কেন জানি না, তুমি ছেলেটার বিরক্তির কারণ হয়েছিলে। ও দাঁত কিড়মিড় করছিল আর খালিই বলছিল যে তোমাকে খুন করবে। আমরা সবাই আশঙ্কা করছিলাম, যে-কোনও মুহূর্তে ও তোমাকে ছুরি মারবে। খুবই বেঁচে গেছ। এরকম কিছু ঘটলে আজকাল কেউ আর কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করে না।' নির্বাক বিস্ময়ে শুনে গেলাম।

পেনসিলভেনিয়ায় আমাকে ডাকার পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। হোল্ডেন ফার্বার তার দু-এক বছরের মধ্যেই অবসর নেবেন। তাঁর শূন্য আসনে কে বসবে তার জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভাল লোক না বসাতে পারলে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগটি তুলে দেওয়ার আশঙ্কা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে খরচার চাপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অত্যাবশ্যক বিষয় ছাড়া সব বিভাগেই কাটছাঁট শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি, পেনসিলভেনিয়ায় পড়াতে গিয়ে বেশ কটি ভিয়েতনাম ভেটেরান মানে যেসব যুবক ওখানে লড়াই করে এসেছে তাদের সঙ্গে পরিচয় হয়। একটি আমার ছাত্র ছিল। ওদের বড় ভাল লাগত। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এদের দৃষ্টি স্বচ্ছ, প্রায় আবেগমুক্ত। যেটুকু আবেগ অবশিষ্ট আছে, তা কিন্তু গভীর করুণায় সমৃদ্ধ। মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখে এরা মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে। যে গভীর ভণ্ডামির ভিত্তিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি মুক্তিকামীর ভূমিকায় যুদ্ধে নামে, তার প্রতি এদের অবজ্ঞার শেষ নেই। এরাই গণ-আন্দোলন করে মার্কিন সরকারকে শেষ অবধি ভিয়েতনাম থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। আমার ভিয়েতনাম ভেটেরান ছাত্রটি দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে পড়াশোনা করে বেশ উঁচুমানের ডিগ্রি নিয়েই পাস করে বের হয়। কিন্তু ভারতবিদ্যার বাজারদর তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। শুনলাম ছেলেটি ট্যাক্সি চালিয়ে পয়সা রোজগার করছে।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সরকারি-বেসরকারি অনুদান অন্তত সেই সময়ে রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক স্বার্থের অনুগামী ছিল। সেই কারণেই যুদ্ধের পর বেশ কিছু বছর ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ নিয়ে পঠন-পাঠনে বেশ খোলা হাতে টাকা ঢালা হয়। কিন্তু নেহরুর নিরপেক্ষতা এবং উন্নয়ন নীতি মার্কিন কর্তাদের মন-পসন্দ ছিল না। ফলে ওদের দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বৈদেশিক নীতির এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই বিষয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনুদানের মোড়ও ঘুরতে থাকে। পঁচিশ-ছাব্বিশটা বড়-মেজ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা হত। তারা সবাই বেশ সন্ত্রস্ত। পেনসিলভেনিয়ায় আমার আমন্ত্রণ কতকটা এইসব কারণে। যাবার দিন কাছে এলে ওদেশে ভারতচর্চার অন্যতর পথিকৃৎ, এক সময়ে এশিয়া ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা, রিচার্ড পার্কস আমার জন্য এক পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে চায়ের কাপ হাতে উনি এক সময় আমাকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'বছর দুই পরে হোল্ডেনের জায়গায় আমরা লোক নেব। ইন্টারেস্টেড?' আমি উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ, খুবই।' পার্কস বললেন, 'তোমার বক্তব্য শুনলাম। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। মনে রাখব। এখনই এটাকে চাকরির অফার বলে ধরে নিয়ো না। সার্চ কমিটি বসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যদিও দশ ঘাঁও জল, তুমি রাজি থাকলে তোমাকে আনতে আমাদের অসুবিধে হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।' বছর দুই পরে সত্যিই পেনসিলভেনিয়া থেকে চিঠি পাই। কিন্তু তার অল্প আগেই আমি অক্সফোর্ডের চাকরিটি পেয়েছি। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর লোভ ছিল। তাই

ওদের লিখি—তোমরা যদি বছরের কিছুটা সময় পেনসিলভেনিয়ায় পড়াই আর বাকি সময়টা অক্সফোর্ডে— এরকম ব্যবস্থায় রাজি থাকো, তাহলে অক্সফোর্ডকে বলে দেখতে পারি। এ প্রস্তাবে ওঁরা রাজি হলেন না। জানলাম— বিভাগটিকে বাঁচাতে হলে সারা বছরের লোক ওদের একান্ত প্রয়োজন। আমার ধারণা—অক্সফোর্ডে রিডারশিপকে ওদের চেয়ারের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়ায়, ওঁরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দোষের হয়ে থাকলে, এ দোষে অনেকেই দোষী, সে কথা কারও অজানা না।

১৯৭০ সনের গোড়ায় এক সেমেস্টারের জন্য হার্ভার্ডে পড়াতে যাই। ওদের বিখ্যাত ওয়াইডনার লাইব্রেরি ভবনে একটি ঘর অফিস হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়। এই বাড়িতে ঘর পাওয়ার সুবিধে হল, লাইব্রেরির স্ট্যাকে সর্বত্র ইচ্ছেমতো চরে বেড়ানো যায়। এটা কোনও গবেষকের পক্ষে যে কী অবিশ্বাস্য সুযোগ তা যার অভিজ্ঞতা হয়নি তাকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। হার্ভার্ডে আরও একটি ব্যাপারে কপাল খুলল। গিয়ে শুনলাম ঘরটা আমার আর একজন ভিজিটিং স্কলারের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করতে হবে। শুনে বিরক্তই লেগেছিল। যখন ভাগীদার ভদ্রলোকের নাম শুনলাম, তখন আমার প্রায় উলটে যাবার অবস্থা। কারণ তিনি আর কেউ নন—অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যান্টনি কলেজের ফেলো উনিশ এবং বিশ শতকে ফ্রান্সের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে জগজ্জয়ী পণ্ডিত থিওডর জেলডিন। শুনেছি পাণিনি-বিশারদ মহাপণ্ডিত সকলনারায়ণ শাস্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার আগে স্যার আশুতোষ তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ জানতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রীমশায় সরল ভাষায় জানান, 'মুদ্রিত্ সকলই পড়িয়াছি। অমুদ্রিত্ যাহা পাইয়াছি তাহা পড়িয়াছি।' থিওডরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মনে হল—এই ব্যক্তিও মুদ্রিত্ সকলই পড়িয়াছেন।

ইতিহাসচর্চার ব্যাপারে জেলডিন কোনও বাঁধা পথের পথিক নন। ওঁর বিখ্যাত ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের সাব-টাইটেল—'লাভ, পলিটিক্স, অ্যামবিশন'। অর্থাৎ ওঁর ধারণা—ফ্রান্সের সমাজজীবনে ওই তিনটি কাম্য বস্তুতেই মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং সেই সূত্র ধরেই উনি ওঁর বিশ্লেষণ এবং ধারাবিবরণী বিস্তার করেছেন। ওঁর পরবর্তী কাজ আরও বিস্ময়কর। একটি কাল্পনিক চরিত্রকে ঘিরে উনি মানুষের সুখের সন্ধানের ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর পরবর্তী বই 'ইন্টিমেট হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড'। নানা দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের ইতিহাস, মানুষে মানুষে সম্পর্কের তথা আদানপ্রদানের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন এই বইয়ে। এক ঘরে দু'জনের দফতর হওয়ায় মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। ১৯৭৩ সনে যখন অক্সফোর্ডে পড়াতে গেলাম, তখন আমার ফেলোশিপটা হয় সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজে। জেলডিনও ওখানকার ফেলো। অক্সফোর্ডে যে-অল্পসংখ্যক সহকর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়, জেলডিন তাঁদের অন্যতম। ওঁর কাজের প্রভাব আমার চিন্তায় পড়েছে। তবে খুব প্রত্যক্ষভাবে না। ওঁর কাজ এতই বাঁধা রাস্তার বাইরে যে ওঁকে অনুকরণ করার প্রশ্ন ওঠে না।

হার্ভার্ডে তিন মাস পড়িয়ে একটা কথাই মনে হয়েছিল। আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও স্নাতকোত্তর স্তরে পৌঁছবার আগের অর্থাৎ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার যে ব্যবস্থা তার নির্দিষ্ট মান কিছু আছে কি না বোঝা মুশকিল। এমনকী ডক্টরেট করার আগে

যে কতকগুলি বিষয় পড়ে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা দিতে হয়, তারও খুব বাঁধাধরা মান নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন এমন এক ছাত্রীর মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছিলাম—পরীক্ষক বোর্ডের অন্যতর সভ্য হিসেবে। প্রশ্নের উত্তর শুনে মনে হল—মেয়েটি বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু পড়াশোনা কিছুই করেনি। কি(ওখানকার পরীক্ষকদের নির্বন্ধাতিশয্যে তাকে উঁচু নম্বরই দিতে হল। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই শেখা যায়। এমনকী অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও। কিন্তু কিছু না শিখলেও ডিগ্রি পেতে খুব অসুবিধে হয় না। তবে বেশ কিছু পড়াশোনা না শিখে ডক্টরেট পাওয়ার উপায় নেই। সাধারণভাবে বলা চলে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ওখানে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতা অনেক বেশি।

হার্ভার্ডের সঙ্গে অন্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ব্যাপারেই বেশ তফাত দেখলাম। এর আগে যেসব জায়গায় পড়িয়েছি, সেখানে দেখেছি সামাজিক আবহাওয়া বেশ সহজ, খোলামেলা। এখানে বিখ্যাত অধ্যাপকরা সব আমির-ওমরাহ স্থানীয়। অর্ধেক সময় সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওয়াশিংটনে তাঁদের অহরহ ডাক পড়ে। তাঁরা কোনও বিষয়ে একটা উক্তি করলে পরের দিন তা কাগজে হেডলাইন হয়ে ছাপা হয়। মনে হয় সব সময়ই যেন একটা হইহই-রইরই ব্যাপার। মহা-অধ্যাপকরা কেউ কেউ এতই ব্যস্ত যে ছাত্র পড়ানোর মতো সামান্য কাজে নষ্ট করার সময় তাঁদের নেই। বিশ্বের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত মহাপণ্ডিতরা টিচিং অ্যাসিস্টেন্ট দিয়ে পড়ানোর কাজটা চালিয়ে নেন। ১৯৬৮ সনের পশ্চিম দুনিয়াব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ফলে শেষোক্ত অনাচারটি বন্ধ হয়। মহামহোপাধ্যায়দের বাণীও মাঝে মাঝে ছাত্রদের কর্ণগোচর হতে লাগল। সত্যিতেই সাঙ্ঘাতিক জায়গা। মানে ক্যাম্পাসে এলোপাথাড়ি ঢিল ছুঁড়লে যে-কোনও সময় দশটা নোবেল লরিয়েট মারা পড়ার সম্ভাবনা। অন্য সব জায়গায় দেখেছি—লাঞ্চের সময় সবাই সহকর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ চুটিয়ে আড্ডা দেয়। এখানে সবাই যেন ঘোড়ায় চড়ে আসে, খাওয়া শেষ হতে না-হতে অশ্বপৃষ্ঠে বিদায় নেয়। আর সর্বত্রই অধ্যাপকরা সহকর্মীদের পরস্পর ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানেই নবাগতদের সঙ্গে স্থায়ী শিক্ষকদের আলাপ-পরিচয় হয়। এখানে দেখলাম—সেসব বালাই নেই। আমিই আগুয়ান হয়ে বিখ্যাত সহকর্মীদের বাড়িতে খেতে বলতাম। প্রায়ই দেখতাম তাঁরা কেউ কখনও পরস্পরের বাড়িতে যাননি। অনেক সময় তাঁদের পরস্পরের ব্যক্তিগত পরিচয় নেই বললেই চলে। আর একটা ব্যাপারে ইংল্যান্ডের সঙ্গে এ জায়গার বিরাট তফাত। বিলাতে দেখেছি খাওয়াদাওয়া জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে কেউ বড় একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুরু করে দেয় না। আর শিক্ষা বা বিদ্যাজীবী নন, এমন কোনও মহিলা উপস্থিত থাকলে তিনি যাতে কোণঠাসা হয়ে না পড়েন সেদিকে সকলের নজর থাকে। হার্ভার্ডের পণ্ডিতগোষ্ঠীর দেখলাম এসব বালাই নেই। এক ডিনার পার্টিতে আমার স্ত্রী দুই তরুণ পণ্ডিতের মাঝখানে বসেছিলেন। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা তাঁরা আমার স্ত্রীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাস্ত্রচর্চা করে গেলেন। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। একমাত্র বয়স্ক অধ্যাপকরা দেখেছি এ ব্যাপারে শিষ্টাচার মেনে চলেন।

মার্কিন সমাজে শ্রেণিসচেতনতা অন্য পাঁচটা দেশের তুলনায় সত্যিই কম। হার্ভার্ডে এই

সামাজিক প্রবণতার এক সুন্দর অভিব্যক্তি দেখেছি। যে-কোনও অধ্যাপককে, তা তিনি যতই খ্যাতিমান হোন না কেন— নির্দ্বিধায় টেলিফোন করে দেখা করা চলে। তুলনীয় মাপের বিলেতি পণ্ডিতদের ফোন করার আগে দশবার ভাবতে হয় আর ফোন করা মাত্রই বিলেতি পণ্ডিত বলবেন—চলে এসো, আজ আমরা এক সঙ্গে লাঞ্চ খাই, এমন সম্ভাবনা কম। তবে হার্ভার্ডে মহাপণ্ডিতের সঙ্গে ওই যে লাঞ্চ খেলে, সেইখানে সম্পর্কের ইতি। আর যে কখনও দেখা হবে এমন সম্ভাবনা কম। অন্যান্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আর একটু সহজ, সাবলীল। অন্তত আমার তাই ধারণা হয়েছে।

পেনসিলভেনিয়া এবং হার্ভার্ডে পড়াতে গিয়েছিলাম একটু ঘোরা পথে—অস্ট্রেলিয়ার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক মাস পড়িয়ে। পশ্চিমে পার্থ্ আর পুবে সিডনি শহরে। পার্থ্ বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কোণে যেন ঝুলে আছে। কিন্তু বড় সুন্দর শহর। দুটি সুন্দর নদী আর এক দিকে সমুদ্র। সোয়ান নদীর পাড়ে ক্যাম্পাস। নদীর জল প্রকৃতই ঘন নীল। ওই দেশের বাসিন্দাদের খোলামেলা সহজ ভাবটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। মনে হত ওদের সংস্কৃতিতে বিলেতের শ্রমিকশ্রেণির আচার-ব্যবহারের ছাপ পড়েছে, অথচ সবাই বেশ সম্পন্ন, এক আদিবাসীরা ছাড়া। তবে এক সময় তাদের পশুর মতো শিকার করা হত। এখন উদারপন্থীদের চাপে তাদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের ধর্মকর্ম আচার-ব্যবহার সভ্য মানুষের অধ্যয়ন-বিশ্লেষণের বিষয় হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াবাসীদের একটি অভ্যাস কিছুটা শ্রুতিকটু লেগেছে। ওরা সব কথাই সংক্ষিপ্তকরণের তালে থাকে। ইউনিভার্সিটি হয়ে যায় ইউনি, বিউটিফুল বিউট এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক—ডার্লিং ডার্ল-এ পর্যবসিত হয়। এমন প্রিয় সম্ভাষণের পরও কি অনুরাগ বেঁচে থাকে? পার্থে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন পরে বিশেষ খ্যাতিমান ব্যক্তি—শ্রমিক দলের নেতা কিম বিসলি।

পার্থের পরে সিডনি। পৃথিবীর সুন্দরতম শহরগুলির একটি। নানা দিক থেকে সানফ্রানসিসকোর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু মহাসাগরের পাঁচ আঙুল শহরের ভিতরে অনুপ্রবেশ করে সিডনিকে যেন আরও মনোরম করে তুলেছে। আর ১৯৬৯ সনে সিডনি অসহ্য রকমের জনাকীর্ণ ছিল না। এখন গাড়ির ভিড়ে দিনের অনেকটা সময়ই ওখানে নাকি যাতায়াত অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা যাওয়ার পথে জীবনের এক অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। তিন-চারটে দিন তাহিতিতে কাটাবার সুযোগ পেলাম। গগ্যাঁর আবিষ্কৃত তাহিতি আর নেই। তবে তেমনিই কুষ্ঠ রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাহিতি দ্বীপটি জনাকীর্ণ হয়ে তৃতীয় জগতের একটি ভাঙাচোরা শহরের রূপ নিয়েছে। আমরা ওখানে না থেকে মোরিয়া বলে অন্য একটি দ্বীপে চলে যাই। এও এখন গগ্যাঁর রোমান্টিক দক্ষিণ সাগরের দ্বীপ আর নেই। কিন্তু ফরাসি সরকার জনবসতি এবং বহুতল বাড়ি তৈরি করা নিয়ন্ত্রিত করে দ্বীপটির আদিম রূপ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। হোটেলগুলি ছোট ছোট কুটিরের সমষ্টি। ভিতরে অবশ্যি আধুনিক কালের যাবতীয় আরামের ব্যবস্থাই আছে। আগাগোড়াই ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপার। কিন্তু শত চেষ্টাতেও বেনে সভ্যতা প্রকৃতির মহামূল্য রত্নগুলিকে ধ্বংস করতে

পারে না। তাহিতির ছোট ছোট দ্বীপগুলিও মুনাফালোভীর খপ্পরে পড়ে ধ্বংস হয়নি। সমুদ্র এখনও ঘন নীল, মনে হয় জলে হাত দিলে হাতে রং লাগবে। পাড়ে দাঁড়িয়েই বহুবর্ণ মাছ চোখে পড়ে। ট্যুরিস্টদের তৃপ্তিসাধনের জন্যই নৌকোর মাঝিরা গান ধরে। কিন্তু সে গানের সুরে বহু প্রাচীন সুখদুঃখের অনুরণন। সব সত্ত্বেও তাহিতি রোমান্টিক। বেনে সভ্যতা তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। শুধু একশো বছর আগে যে আনন্দ পাওয়ার জন্য অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় নিতে হত আজ তা কিছু ডলারের বিনিময়ে সহজলভ্য। তাতে যদি কেউ বা কিছু খেলো হয়ে থাকে তবে তা আমরা ট্যুরিস্টরা, তূরীয় আনন্দের হাটে ড্যাঞ্চিবাবুর দল। তাহিতির বর্ণনাতীত সৌন্দর্য ম্লান হয়নি।

১৯৭০ সনের মাঝামাঝি দিল্লি ফিরে আসার পর অল্পদিনই দিল্লি স্কুলে ছিলাম। কিন্তু তার আগের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। যখন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে নির্বাচনে হারিয়ে বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে অকংগ্রেসি সরকার গঠন করা হয় তখন আমি দিল্লি স্কুলের ডিরেক্টর। বোধহয় কয়েক মাসের মধ্যেই এই জোটে ভাঙন ধরতে শুরু করে এবং গণতন্ত্রের সব নিয়ম ভেঙে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীর নির্দেশে গভর্নর ধরমবীর বামপন্থী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। দিল্লি স্কুলের সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন প্রমুখ ডাকসাইটে অধ্যাপকরা প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ব্যাপারে আমারও সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তাদেরই অর্থে পরিপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে সভা করা চলে কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু সুখময় এবং অমর্ত্য নানা যুক্তি দিয়ে দেখালেন যে, স্কুলের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে এ অধিকার আমার আছে এবং তার জোরে সভা ডাকার জন্য ওঁরা আমার উপর চাপ দিলেন। ফলে উপাচার্য বীরেন গাঙ্গুলির অনুমতি না চেয়ে আমরা সভা করলাম। এবং ওই সভায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং শ্রীমতী গাঁধীর কঠোর সমালোচনা করা হয়। আমরা ভেবেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে এই গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলবে। কিন্তু দেখলাম লাঠির জোরে আন্দোলন বন্ধ করতে বেশি সময় লাগল না। ডিরেক্টরের পদে দু' বছর থাকার পর হঠাৎ উপাচার্যের চিঠি পেলাম—আমার জায়গায় দু' বছরের জন্য অধ্যাপক শ্রীনিবাসকে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং এখন থেকে ডিরেক্টরের পদে দু' বছর অন্তর নতুন লোক বসানো হবে—এই নিয়মই চালু হল। খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। শ্রীনিবাস ডিরেক্টর হতে অস্বীকার করায় অরুণ দাশগুপ্তকে গদিয়ান করা হল। কিন্তু সবাই বুঝল যে, কাজগুলি নেহাত রুটিনমাফিক করা হয়নি। পরে শুনি দিল্লির ভাজপা নেতারা আমাদের বামঘেঁষা কার্যকলাপে বিরূপ হয়ে উপাধ্যক্ষর উপর চাপ দেন। আমাকে ডিরেক্টরের পদ থেকে সরানোর আসল কারণ তাই।

আমাদের বামঘেঁষা ভাবমূর্তি অন্য কারণেও প্রচার হয়েছিল। ষাটের দশকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মার্কিন প্রভাব গ্রহণযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই ঢেউ যখন শীর্ষে পৌঁছেছে তখন ইঙ্গ-মার্কিন সাংস্কৃতিক চুক্তির প্রস্তাব এল। আমরা ভয় পেলাম যে, এই চুক্তি বহাল হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমেরিকানদের কুক্ষিগত হবে। ফলে আমরা যৌথভাবে ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করি। এর অল্পদিন পরেই ওই চুক্তিরই অনুরূপ চুক্তি

সোভিয়েট রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে হওয়ার প্রস্তাব এল। এ বিষয়ে আমরা চুপ করে থাকায় দক্ষিণপন্থী কিছু খবরের কাগজ আমাদের কুৎসা গাইতে শুরু করেন। স্টেটসম্যানের এক রিপোর্টার আমার সঙ্গে তাঁর ইন্টারভিউয়ের অত্যন্ত বিকৃত বয়ান ওঁদের কাগজে ছাপালেন। তার প্রতিবাদে আমি যে চিঠি দিই তা ছাপা হয় প্রায় এক সপ্তাহ পরে। এরপর থেকে খবরের কাগজে কোনও বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আমি সাবধান হয়ে যাই। সত্যিতে ষাটের দশকে ক্রুশ্চেভ সাহেবের বিখ্যাত বিবৃতির পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের গণতন্ত্রবিহীনতা সম্পর্কে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের স্টালিনপন্থী অতীতে যাই থাক, ভবিষ্যতের মানুষের পক্ষে আধিপত্যর বিপদ রাশিয়ার চেয়ে আমেরিকার দিক থেকে আসবারই সম্ভাবনা বেশি এটা আমাদের অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের সেই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করেছে। তাছাড়া মার্কিন অনুদান ভারতবর্ষের নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ শিকড় গেড়ে বসেছিল। ওদের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদান যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তা বলে আমরা বিক্রি হতে বসিনি। অনুদাতা হঠাৎ কর্তা হয়ে না বসে, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সচেতন ছিলাম। এবং মাঝে মাঝে ওই কর্তালির প্রচেষ্টা বেশ প্রকট হয়েই পড়ত—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রাশিয়ার সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তিতে এই রকম আশঙ্কার কোনও কারণ আমরা দেখিনি। তার অন্যতম কারণ ওদের অত রেস্ত ছিল না। ফলে ওই চুক্তিপ্রস্তাবে আমরা ভয়ের কিছু দেখিনি। এত সব কথা তখন খুলে বলার সুযোগ ছিল না। ফলে গোলাপি বর্ণের পাতি কমিউনিস্ট হওয়ার কলঙ্ক আমাদের গায়ে লেগেই রইল।

আগেই বলেছি—দিল্লি স্কুলের কাজ আমার পক্ষে সুখশয্যা হয়নি। আমি নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিলাম। হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে একটি অধ্যাপকের পদ খালি হল। আমি এই পদের জন্য প্রার্থী হয়ে যথারীতি দরখাস্ত দিলাম। ১৯৭০ সনে আমি দিল্লি স্কুলের ছত্রচ্ছায়া ছেড়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিংয়ের ছোট একটি ঘরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়লাম। জানতাম না যে ভাগ্যবিধাতা কত ধানে কত চাল সে কথা আমাকে শেখাবার ব্যবস্থা করছেন।

বিবাহ—তদ্ঘটিত বিভ্রাট—সংসারযাত্রার শুরু

আগের পরিচ্ছেদে আমার স্মৃতিকথা ১৯৭০ সন অবধি পৌঁছেছে। সেই কাহিনিতে ১৯৬০ সনের ২২ জুলাই থেকে অন্যতমা কুশীলব আমার পত্নী হাসি, ওরফে প্রতিমা। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব এবং আমার নড়বড়ে সংসারের হাল ধরার বিষয় এ যাবৎ কিছু বলা হয়নি। ও বিষয়টা আর ফেলে রাখলে সংসারে অশান্তি হবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অবিলম্বে পেশ করা প্রয়োজন।

আমাদের বিয়ে নিয়ে কলকাতা শহরে এবং বাঙালি সমাজে বেশ হইচই হয়েছিল। আমি এমন কিছু কীর্তিমান পুরুষ না। এবং বিবাহসংস্কার বাঙালি সমাজচেতনায় বিশেষ অপকর্মের

ফর্দে পড়ে না। এবং জ্ঞানত আমি বিয়ে করে কোনও অবৈধ কাজ করিনি। ঘটনাটা বিধবাবিবাহর ছিল ঠিকই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় পরাশর-সংহিতার নজির দেখিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, ব্যাপারটা শাস্ত্রসঙ্গত এবং ১৮৫৬ সনে কোম্পানি বাহাদুর ওঁর যুক্তি মেনে নিয়ে হিন্দুর বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে গেছেন। মানে আমাদের বিয়ের ঠিক ১০৪ বছর আগে। সুতরাং আমার ধারণা হয়েছিল যে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শতখানেক বছর আগে পূর্বপুরুষরা মিটিয়ে দিয়ে গেছেন। ও নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এটা যে কত বড় ভুল তা বাঙালি সমাজ আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

বিধবাবিবাহ ঘটলেই যে এখনও বাঙালিরা 'গেল গেল' বলে আওয়াজ তোলে এ কথা সম্ভবত ঠিক না। কিন্তু খুব যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে এমনও নয়। মোট কথা বাঙালি ভদ্রসমাজে ব্যাপারটা কখনওই ঠিক স্বীকৃতি পায়নি। উনিশ শতকে এ নিয়ে যে-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তার রেশ অনেক দিন হল মিলিয়ে গিয়েছে। পরবর্তী একশো বছর বিধবাবিবাহ সংখ্যায় কমই ঘটেছে এবং কোনও পরিবারে ব্যাপারটা ঘটলে মানুষ রে-রে করে তেড়ে আসে না ঠিকই, কিন্তু একটা দেখিনি-দেখিনি ভাব করে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বিশেষ সৎ কাজ। বিদ্যাসাগর মশায়কে ঘিরে উনিশ শতকীয় সংস্কার আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এমন চিন্তা বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে এসেছে এই ধরনের নজির নেই। ব্যতিক্রম যা দেখা যায় তা ব্যতিক্রমই। সুতরাং বিধবাবিবাহ করছি দেখে পরিচিত-অপরিচিত সবাই আমাকে মাথায় তুলে নাচবে, এমন চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু বস্তুত যা ঘটল, তাও আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

কাহিনিটা তবে আদ্যোপান্তই বলি। আমার স্ত্রী হাসি (এই নামেই ওঁকে সবাই চেনে, তাই এই নামটাই ব্যবহার করছি।) কাশীর এক প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে। ওঁর জ্যাঠামশায় এবং তার আগে তাঁর পিতাঠাকুর কাশী নরেশের দেওয়ান ছিলেন। হাসির বাবা ক্যাপ্টেন কাননবিহারী সেন রায় ডাক্তার। প্রথম মহাযুদ্ধে মেসোপটেমিয়া এবং ইউরোপে পশ্চিম রণাঙ্গনে ডাক্তারি করে ক্যাপ্টেন উপাধি অর্জন করেছিলেন। বাকি জীবন উত্তর প্রদেশের নানা শহরে, বিশেষত লখনউয়ে, ইন্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসের কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন।

কাননবিহারীবাবুর তিন কন্যার রূপের খ্যাতি ছিল। হাসি যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী (রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে ১৯৩৬ সনে পাঠভবনে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সনে শান্তিনিকেতন থেকেই স্নাতক হয়ে বের হন।) এবং পরে বিখ্যাত আইনজীবী প্রয়াত অতুল গুপ্ত মশায়ের দ্বিতীয় পুত্র অমল গুপ্তর পত্নী, তখন বাঙালি এলিট সমাজে উনি অসাধারণ সুন্দরী বলে পরিচিতা ছিলেন। আমার বয়স আশি হতে চলল। আমার স্ত্রী আমার চেয়ে বয়সে অল্প বড়। সুতরাং পরশুরামের উদোর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি ওঁর রূপের খ্যাতিটা অমূলক ছিল না। এত বয়সেও শুধু আমার না অন্য অনেকের চোখেও উনি রূপসী। শুনেছি বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। আমি বীর না, চামচিকে-টিকটিকিদেরও সমীহ করে চলি। সুতরাং আমার মতো বেড়ালের কপালে এত বড় শিকে ছেঁড়ায় আমি ভাগ্যের প্রতি এই অহেতুকী করুণার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু সেই করুণার গ্রহীতা হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সে কথায় আসা যাক। অতুলবাবুদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতা ছিল। আমার পিসেমশায় কিরণশঙ্কর রায়ের ভগ্নিকে উনি বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু ও-বাড়িতে আমার যাওয়াআসা ছিল অন্য সূত্রে। অতুলবাবুর বড় ছেলে ডক্টর প্রতুল গুপ্ত স্নাতকোত্তর বিভাগে আমার শিক্ষক, এবং তার চেয়েও বড় কথা, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জাগতিক ব্যাপারে বেশ আনাড়ি এই মানুষটির আমি একান্ত সচিব এবং উপদেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—বিশেষ করে যখন আমি ওঁর সহকর্মী হলাম তখন থেকে। আমার ভাবী পত্নীকে ওই বাড়িতে আমি অনেকবার দেখেছি। দু-একবার কথাও বলেছি কিন্তু কেন জানি না আমার মতো অকিঞ্চন ব্যক্তির সঙ্গে এই সামান্য আলাপ-পরিচয়ের ওঁর কোনও স্মৃতি নেই। এটা আমার বিশেষ দুঃখের কারণ।

অমলবাবু তেরো বছর বিবাহিত জীবন যাপন করে নিতান্ত অল্প বয়সে হৃদরোগে মারা যান। হাসির বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়। সাদার্ন এভিনিউর একটি একতলার ফ্ল্যাটে উনি থাকতেন। ওঁর সঙ্গে থাকতেন বিপত্নীক প্রতুলবাবুর ন-দশ বছরের মেয়ে ঈশানী এবং হাসির মামাতো বোন মাধবী। হাসি সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিশু বিভাগে পড়াত। তবে ওদের খরচের সিংহভাগ—মানে মাসে দু' হাজার টাকা আসত অতুলবাবুর কাছ থেকে। ওই সংখ্যাটার এই কাহিনিতে প্রাসঙ্গিকতা আছে। সে কথা যথাস্থানে বলব।

মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা আমি প্রতুলবাবুর সঙ্গে লেকে হাঁটতে যেতাম। একদিন উনি বললেন, 'চল, ঈশানীকে দেখে যাই।' এইভাবেই হাসির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। অন্তত ওঁর স্মৃতিতে তাই। এর পর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ মাস দেড়েক পরে। প্রতুলবাবু দিল্লিতে কোনও একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবেন—আমাকে বললেন, 'তুমিও চলো হাওড়া স্টেশন অবধি।' যাওয়ার পথে উনি হাসিকে তুলে নেন। স্টেশন থেকে ফেরার পথে হাসি তাঁর ফ্ল্যাটে নেমে গেলেন। আমিও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে নামলাম। এবং আধ ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর আমি আমার বিবাহপ্রস্তাব পেশ করলাম। ও এতই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারেনি। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কিছুদিন ভেবে দেখতে চাই।' এই ভেবে দেখার ব্যাপারটা আমি ওকে নিশ্চিন্তে করতে দিইনি। রোজই বিকেলে গিয়ে হাজিরা দিতাম। দিন পনেরো পরে ও আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাল। আমাদের রোমান্সের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এই। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। দিল্লি থেকে দিন সাতেক পরে প্রতুলবাবু ফিরলেন। আমি যে হাসির কাছে বিবাহপ্রস্তাব করেছি সে কথা ওঁকে জানালাম। উনি বললেন, 'এ তো স্বাভাবিক। এ নিয়ে আমার বলার কিছু নেই।' ওঁর এই পাশ্চাত্যায়িত ভদ্রলোকসুলভ উক্তিতে আমি নিতান্তই নির্বোধের মতো নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ভাবলাম ওঁদের দিক থেকে কোনও বাধা আসবে না। এই সিদ্ধান্তের অন্যতর কারণ ওঁদের পরিবারের আধুনিক উদারচেতা ভাবমূর্তি। বহুদিন ধরে বাঙালির যাবতীয় প্রগতিমুখিন সামাজিক চিন্তার পথিকৃৎদের একজন অতুলবাবু। আর প্রতুলবাবুর মতো নিপাট ভদ্রলোক আমি অন্তত বেশি দেখিনি। ওঁর কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনি।

আমার এই আকস্মিক বিয়ের প্রস্তাব এবং আমাকে প্রায় না চিনে হাসির সেই প্রস্তাব

মেনে নেওয়ার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম দর্শনে প্রেমের নিদর্শন ইতিহাস এবং সাহিত্যে অনেক আছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেনি। আমাকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা আমার এই আকস্মিক প্রস্তাবে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছু দেখেন না। অনেক ভেবেচিন্তেই এই বইয়ের নাম দিয়েছি বাঙালনামা। বাঙাল-চরিত্রে একটি বিশেষ প্রবণতা হট করে কিছু করে বসার। এটা ঠিক অবিমৃশ্যকারিতা নয়, পৌরুষেরই এক বিচিত্র প্রকাশ। আর বরিশালের বহুশ্রুত একটি উক্তি—'যেয়া ধরুম হেয়া করুম'। অর্থাৎ যা ধরব, তা করব। কিছু একটা ইচ্ছে হলে বরিশালবাসী বিনা দ্বিধায় সে ব্যাপারে ওই অঞ্চলের ভাষায় 'হুম্মাত করিয়া লাফাইয়া পড়ে'। আমিও জাতীয় চরিত্রের সম্মান বজায় রেখে নির্দ্বিধায় হুম্মাত করে লাফিয়ে পড়েছিলাম। এরকম কাজ বরিশালবাসী মাত্রেই অনুমোদন করবেন। না হইলে আর পুরুষ হইয়া জন্মাইছ ক্যান? সাত হাত ঘোমটা টান্নিয়া থাকলেই পারো? (নারীবাদীরা মার্জনা করবেন। আমরা বরিশালবাসীরা রাজনৈতিক কেন, কোনওরকম শুদ্ধতার জন্যই বিখ্যাত নই)। তবে বরিশালে যাঁরা ঘোমটা টেনে থাকতেন অন্য অঞ্চলের পুরুষের তুলনায় হেনাগোও বিক্রম কিছু কম আছেলে না। বাবার পিসিমারা একটা হাঁক দিলে বহু বীরপুরুষের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। হ্যাঁ, বরিশাল বলে কথা। এ কি কোলকাতার এলেম গেলেম মলেম মলেম করা পুরুষালি! হালুম-হুলুমটা এ অঞ্চলে, সুন্দরবনের উত্তরে বড় শোনা যায় না। আর আমরা তো কথা শুরুই করি ওই আওয়াজ দিয়ে।

এ গেল আমার ব্যবহারের সরল ব্যাখ্যা। হাসি কেন আমার প্রস্তাব মেনে নিল তার পিছনে বাঙালি জীবনের এক করুণ ইতিহাসের পটভূমি আছে। হাসির প্রথম বিবাহে বিবাহিত জীবন খুবই সুখের ছিল এবং অকালবৈধব্য ওর জীবনের সুখ-শান্তির উপর সত্যিতেই যবনিকা টেনে দিয়েছিল। ওকে দেখতাম সর্বদাই ম্লানমুখ—যেন সব আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়ে এক দুঃখময় ছায়ালোকে বাকি জীবন কাটাবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছে। আর সেই দুঃখময় ছায়ালোকেও যে বাকি জীবন মানসম্মান বজায় রেখে কাটাতে পারবে তার সম্ভাবনাও যেন ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বিবাহবিচ্ছেদের শিকার আমার এক বান্ধবী আমাকে বলেছিলেন—ওঁর মনে হয়েছিল—মাথার উপর থেকে ছাদ যেন খসে পড়ল। রোদ বৃষ্টি ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে ওঁর স্বামী যেন ওঁকে খোলা মাঠে ঠেলে ফেলে দিলেন। স্বামীহীন নারী বাঙালি সমাজে যেন সকলেরই ভোগ্যবস্তু। বারো বছর বয়স্ক বন্ধুপুত্র থেকে শুরু করে বাহাত্তর বছর বয়সের পিতৃবন্ধু অনেকেই ওঁকে শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

হাসি খোলামেলা মুক্ত সামাজিক পরিবেশের মানুষ ছিল না। স্কুলে পড়ালেও তার জীবন ছিল অন্তঃপুরবাসিনীর। ফলে ওকে পুরোপুরি বে-আব্রু হতে হয়নি। কিন্তু ওর রূপ ওর পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বহুদিনের পারিবারিক ডাক্তার থেকে শুরু করে মাতুল-স্থানীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পর্যন্ত অনেকেই ওর দিকে নেকনজর দিতে শুরু করে। আর উর্বরমস্তিষ্ক কিছু শিক্ষিত আড্ডাবাজরা নানা গল্প বাজারে ছাড়তে লাগলেন। ওই ধরনের রসালো মিথ্যা গল্প রটানোর প্রবণতা বাঙালি সমাজের বাইরে বেশি দেখিনি মনে হয়—এটা এক দিকে চণ্ডীমণ্ডপি কুৎসাপরায়ণতারই উত্তরসাধক। অন্য দিকে এই প্রবণতায় রিরংসাসিক্ত যৌন

ব্যর্থতাবোধের কুৎসিত প্রকাশ। একজন ক্যালকাটা ক্লাবে বসে হলফ করে বললেন—কাল তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন গ্র্যান্ড হোটেলে এক ব্যারিস্টারের সঙ্গে হাসি গালে গাল লাগিয়ে নাচছে। বেচারা উক্ত হোটেলে একবারই গিয়েছিল। স্বামীর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে। ওর মনে হতে শুরু করে যে, ওর সামনে বোধ হয় মাত্র দুটো পথই খোলা। পণ্ডিচেরি চলে যাওয়া অথবা অ্যাসিড দিয়ে নিজের মুখ পুড়িয়ে দেওয়া। এই সময় ওর পরিবারের পরিচিত কিন্তু ওর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা একটি মানুষ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের মধ্যে দু-একজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে ও আলোচনা করেছিল। ওর অগ্রজপ্রতিম কঙ্কর সেন (ক্ষিতিমোহন সেনের পুত্র), আরতি শ্রীমল, পারমিতা বিশ্বনাথন, তাঁর দুই বোন এবং রাধামোহন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে প্রধান-স্থানীয়। বাঙালি সমাজে ভাল ছাত্রর কদর কিছু বেশি। বন্ধুরা ওকে আমার প্রস্তাব মেনে নিতেই উৎসাহ দেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি যে ওকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে ওর বাকি জীবনের অভিজ্ঞতার তুলনায় নিতান্ত দারিদ্রের মধ্যে ফেলব—এ কথা বলে ওকে নিবৃত্ত করতেও পারতেন। অতুলবাবুরা বিশেষ ধনী ছিলেন আর আমি তখন আটশো টাকা মাইনেয় মাস্টারি করি। হাসির কোনও দিনই কোনও বৈষয়িক জ্ঞান ছিল না। আমি কত মাইনে পাই বলায় ওর কোনও ভাবান্তর দেখিনি। সম্পন্ন পিতার ঘর আর রীতিমতো ধনী শ্বশুরবাড়ি থেকে এই গরিবের ঘরে এসে ও কখনও কোনও অভিযোগ করেনি। শুধু মাসের পনেরো-বিশ তারিখ নাগাদ যখন মাসখরচার টাকা ফুরিয়ে যেত, হঠাৎ এসে বলত বাড়িতে আর টাকা নেই। ব্যাঙ্কেও যে নেই, সে কথা আর ওকে বলতাম না। বাকি মাসটা ধারধোর করে চালাতাম। নতুন মাস শুরু হত সেই ধার শোধ দিয়ে। আমার সৌভাগ্য—বিয়ের এক বছর পর লন্ডন যাওয়ার সুযোগ পাই। না হলে কতদিন এই দেনা-ধারশোধ-আবার দেনা করার বিষচক্র চালু থাকত জানি না।

আগের কথায় ফিরে যাই। প্রতুলবাবুকে যখন আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি জানাই, তখন ওঁর নিজের জীবনেও একটা তোলপাড় চলছিল। লাজুক, একটু ভীরু প্রকৃতির মানুষটি কখনওই নিজের ইচ্ছেগুলি সজোরে প্রকাশ করতে পারতেন না। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই ওঁর জীবন বহু বন্ধু সত্ত্বেও গভীর নিঃসঙ্গতায় ভরা ছিল। আর ওঁর মনে ওঁর সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে সমস্তরের কোনও নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য একটা তীব্র বাসনা ছিল। উনি শেষবার যখন লন্ডন যান, তখন একজন বাঙালি মহিলার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। এ ব্যাপারে ওঁর চেয়েও মহিলাটির দিক থেকেই উৎসাহটা বেশি ছিল। দেশে ফেরার পর ওঁর পরিবারের দিক থেকেও ওঁদের দু'জনের বিয়ে হলে ভালই হয়, এই রকমের ইঙ্গিত স্পষ্টই পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে আমি তখন ওঁর বন্ধু এবং উপদেষ্টা। আমি দেখতাম—উনি বয়সে বড় হলেও ওঁর চেয়ে আমার ভূয়োজ্ঞান অনেক বেশি। আমার কাছে বিষয়টা উত্থাপন করায় আমিও ওঁকে উৎসাহই দিলাম। আমারও মনে হয়েছিল ওঁর জীবনের সমস্যার এ ছাড়া কোনও সমাধান নেই। প্রচণ্ড প্রতিভাশালী পিতার সামনে উনি নিজেকে নিতান্তই হেয় জ্ঞান করতেন। আর ওঁদের বিলাসবহুল জীবন যে নিতান্তই ওঁর বাবার অর্থের উপর নির্ভরশীল, এ চিন্তাও ওঁকে বিশেষ পীড়া দিত।

মহিলাটির চাপে প্রতুলবাবু তাঁর পুনর্বিবাহের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

ওঁদের এনগেজমেন্ট পাকা করার জন্য ১২৫ রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িতে একটি পার্টির ব্যবস্থা হয়। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, স্ত্রী তো অল্প ক'বছর আগেই মারা গেছেন, তাই বন্ধু এবং পরিচিত জনের কাছে ওঁর ভাবমূর্তি কী দাঁড়াবে—এসব ভেবে কিছুটা উদ্বিগ্নচিত্তেই উনি এই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবং নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে ওখানে উনি এক মারাত্মক কাজ করে বসলেন। উনি বললেন, নিজের সুখের জন্য উনি এই বিয়ে করতে যাচ্ছেন না। হাসি বিয়ে করবে ঠিক করেছে। তার পর ওঁর ন-দশ বছরের মেয়ে ঈশানী কার কাছে থাকবে, কে তার দেখাশোনা করবে এই ভেবেই উনি বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন।

ব্যস, যেন আগুনে ঘি পড়ল। ওঁর মা প্রায় উন্মাদের মতো ব্যবহার শুরু করলেন। সেকেলে মানুষ। এটা ওঁর কাছে অপ্রত্যাশিত না। কিন্তু আমি যাতে অবাক হয়েছিলাম তা এই যে, ওঁরা তাঁকে কোনও সামলাবার চেষ্টা না করে বরং কিছুটা উস্কানিই দিলেন। পরিবারের একজন, যাঁর সাধারণ্যে ভাবমূর্তি অত্যন্ত উদার এবং প্রগতিশীল, বললেন, লোকটা নিশ্চয়ই টাকার জন্যই এ কাজ করতে যাচ্ছে। হাসির টাকাটা নিয়ে নিতে পারলে ও নিশ্চয়ই পিছিয়ে যাবে। অর্থ ছাড়াও যে মানুষের আর দু-একটা কাম্য থাকে লোকটি বোধ হয় সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এই নাটকের কুশীলবরা প্রায় সবাই প্রয়াত। তাই এসব কথা লিখতে খুব যে উৎসাহ পাচ্ছি তা নয়। বিশেষত প্রতুলবাবু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এত গোলমাল সত্ত্বেও সেই বন্ধুত্বে ভাঙন ধরেনি। কিন্তু আমার এই লেখার প্রধান উপজীব্য একটি যুগের ছবি। আমাদের শিক্ষিত সমাজে কী পরিমাণ ভণ্ডামি এবং কুরুচি ভদ্রতার মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াত বর্তমান কাহিনিটি পুরোপুরি না বললে সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমাদের বিয়ের সম্ভাবনা ঘোষিত হবার পর হাসির উপর নানা রকম চাপ শুরু হয়। প্রতুলবাবুও নাকি বলতে শুরু করেন যে, আমাকে না-জেনে না-শুনে হঠাৎ এই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়াটা সুবুদ্ধির কাজ হচ্ছে না। আর ওঁর মা রোজ টেলিফোনে মা-বাপ তুলে অকথ্য গালিগালাজ শুরু করেন। এক আত্মীয় মামলা করে ওর সামান্য পুঁজিটুকু নিয়ে নেওয়া যায় কি না তার অন্ধিসন্ধি খুঁজতে লাগলেন। প্রতুলবাবুর বৈঠকখানা ঘরে সহানুভূতিতে ভরা দীর্ঘশ্বাসের ঝড় উঠতে লাগল। অতুলবাবুর কানে যখন কথাটা উঠল উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ জিনিস সহ্য করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।' যে মানুষটা দুই পুত্র, এক কন্যা এবং এক পুত্রবধূর মৃত্যু চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন এবং সব শোক সহ্য করে নিজের দৈনন্দিন কর্তব্যে অবিচলিত থেকেছেন, সেই আদর্শ পুরুষের বিচার করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার অপরিণত বুদ্ধিতে একটা ধারণা বা আশা ছিল যে ওঁর মতো মানুষ মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে যা ঘটতে চলেছে তার মধ্যে শুভ কিছু দেখবেন, তাঁর কন্যাসমা ভাগ্যহতা পুত্রবধূকে কল্যাণকামনা করে আশীর্বাদ করবেন, যেমন বেশ কয়েক দশক আগে রাধারাণী দেবীর প্রাচীনপন্থী শ্বশুর-শাশুড়ি ওঁদের করেছিলেন। পরে আমার এক অতি শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে এই কথা বলায় তিনি মন্তব্য করেন, 'সব পরীক্ষা সবাই পাস হয় না।'

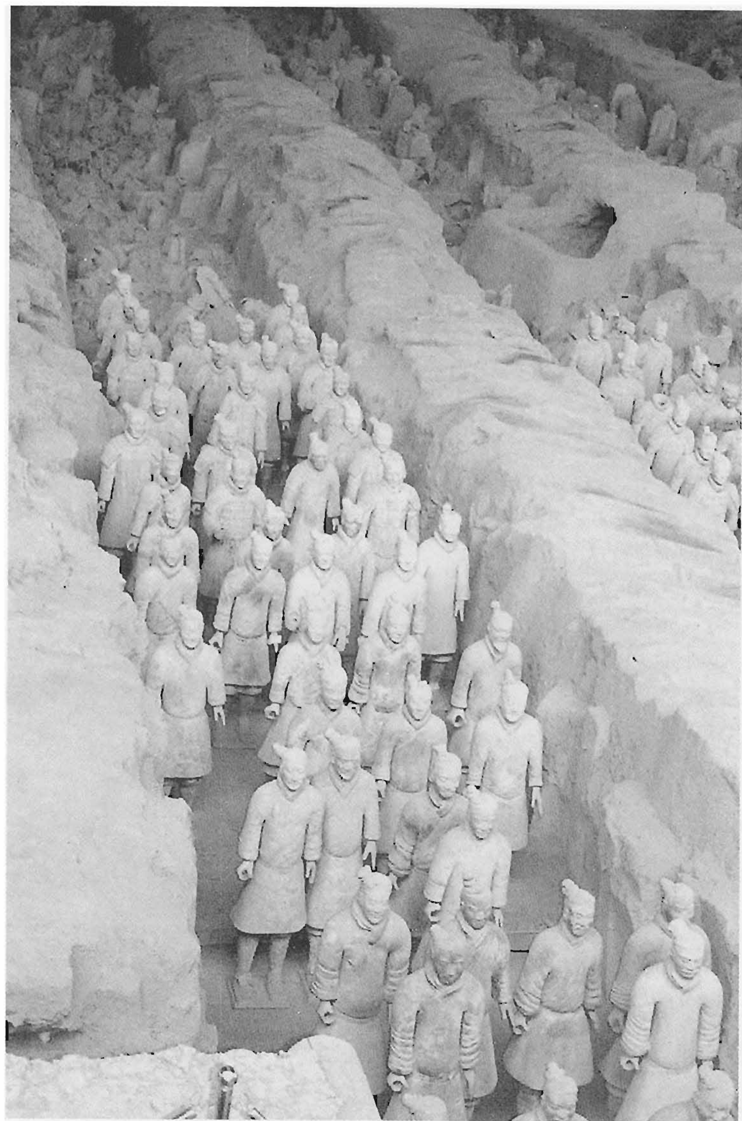
ওঁদের সম্মানে এবং হৃদয়ে আঘাত লাগায় ওঁরা কিছুটা অসংযত যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যবহার


টাকলামাকান মরুভূমি

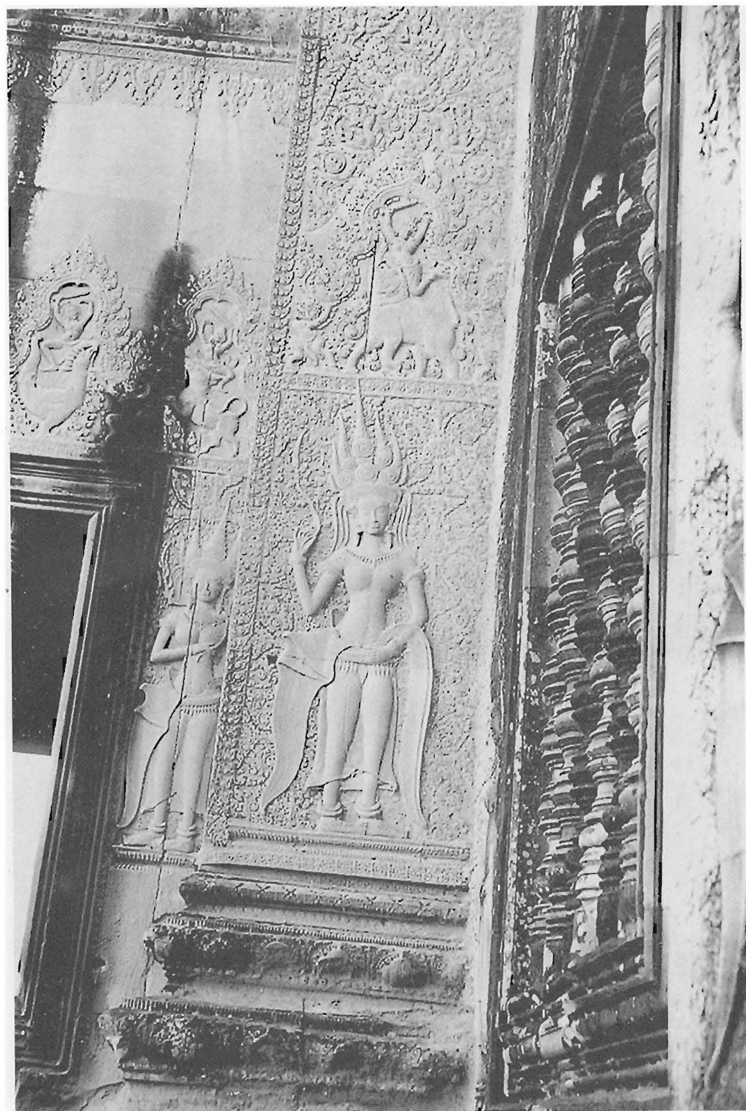

তুংহুয়ার গুহা

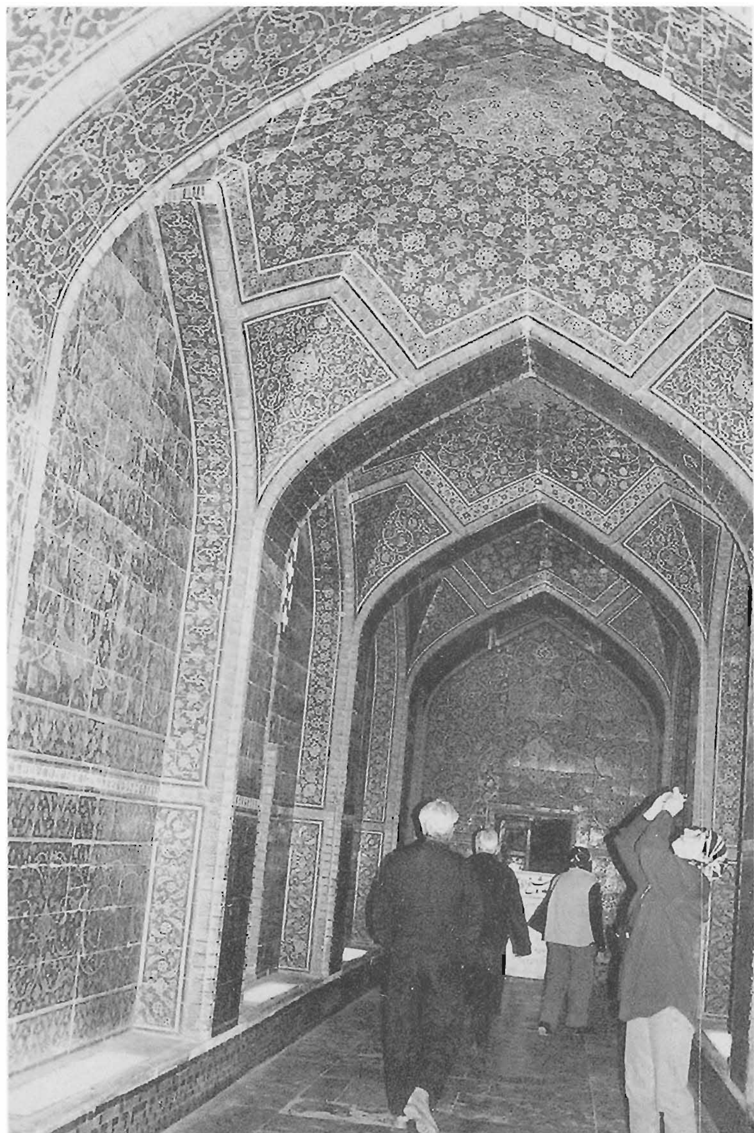


লিট্‌ল ডাক মনাস্ট্রি—হিউয়েন সাঙের স্মৃতিবিজড়িত

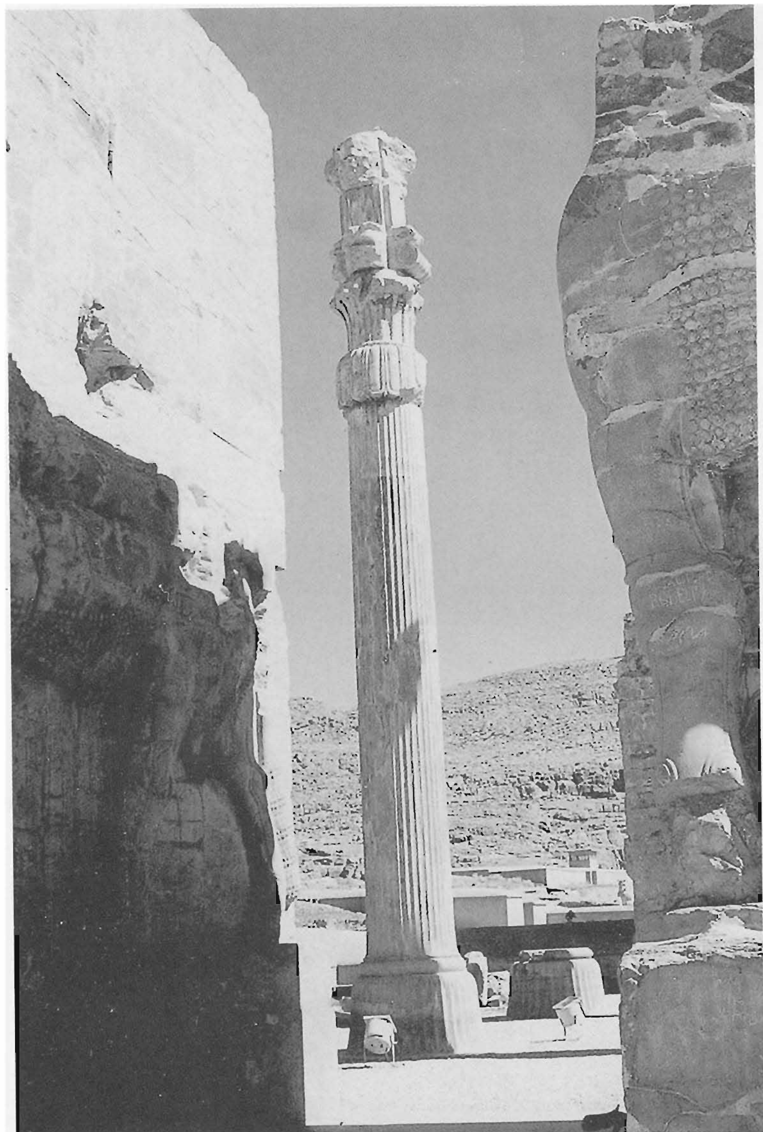


দগ্ধমৃত্তিকার সেনাবাহিনী—সিয়ান


আঙ্কোর ওয়াট



ইরান—মসজিদের অভ্যন্তর



পার্সিপোলিস

শিরাজ—হাফিজের কবর

পার্সিপোলিস—প্রাসাদগাত্রে রিলিফ



নাতনির সঙ্গে



আমার পরমপ্রিয় নাতনি লীলা লক্ষ্মী বিঘ্নরাজা

করছিলেন, সে ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারি। এবং সেসব শুধুই দোষের হয়েছে এরকম ভাবার মতো উগ্র যুক্তিবাদী আমি না। কিন্তু চারপাশের মানুষ (এদের সবগুলিকে মানুষ বলে স্বীকার করতে আমার এখনও দ্বিধা আছে।) এবং বৃহত্তর বাঙালি সমাজে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে সত্যিতেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। একদল বলতে লাগলেন, এই যদি হাসির মনে ছিল, তবে ও শোকের ভেক ধরে ঘুরছিল কেন? মানুষ সত্যিতেই শোকে মুহ্যমান হতে পারে এবং তা সত্ত্বেও অন্তহীন দুঃখ আর অপমানের জীবন থেকে মুক্তির কোনও উপায় দেখলে ভাগ্যের সেই দান উপেক্ষা করতে পারে না, এ জাতীয় অমানুষদের মাথায় এমন চিন্তা আসবার কথা না। কেউ কেউ বলতে লাগলেন—'আহা, এমন দেবতুল্য দয়ার সাগর শ্বশুরের প্রাণে ও এত বড় আঘাত দিতে পারল!' একজন প্রগতিপন্থী অধ্যাপক মন্তব্য করলেন, 'তেরো বছরের স্মৃতি হাসি দু' বছর যেতে না যেতে ভুলে গেল!' এই ব্যক্তি পরে আমার কাছে হাত কচলাতে এলে উনি কী বলেছিলেন সে কথাটা আমি উদ্ধৃত করি। ভদ্রলোক তাঁর অদৃশ্য লেজটি গুটিয়ে নিষ্ক্রান্ত হন। এই দ্বিতীয় শ্রেণির ধর্মধ্বজরা শোকপ্রকাশ করে ক্ষান্ত না হয়ে শ্বশুরের দয়ার একটা সংখ্যাগত হিসেবও স্থির করলেন। তাঁদের রটনা অনুযায়ী অতুলবাবু হাসিকে তার স্বামীর মৃত্যুর পর দু' লাখ টাকা হাতে ধরে দিয়েছিলেন। প্রগতিশীল লেখক অচিন্ত্য সেন স্পষ্ট চেনা যায় এমন ভাষায় আমাদের বিয়ে নিয়ে একটি গল্প লেখেন। তাতেও শ্বশুর অকৃতজ্ঞ পুত্রবধূকে দু' লাখ টাকা ধরে দিচ্ছেন, এই গল্পকথাটিরই উল্লেখ আছে। তেরো বছর পর অক্সফোর্ডে এসেও আমরা যে অতুলবাবুর দেওয়া দু' লাখ টাকা নিয়ে 'লম্বা দিয়েছিলাম' তা নিয়ে কানাঘুষো শুনি। বাঙালির সামাজিক স্মৃতি এবং কৌতূহল সত্যিই প্রশংসনীয়। আমার বন্ধু ও সহকর্মী অর্জুন তাঁর কাকা অচিন্ত্যবাবুকে ওই কুরুচিপূর্ণ কাহিনিটি কেন লেখেন তা জিজ্ঞেস করেছিলেন। লেখক নাকি উত্তর দেন যে ওঁদের অনেক সময় পাঠকদের চাহিদা মেটাতে তাদের রুচি অনুযায়ী লিখতে হয়। গল্পটি এক পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর আর কিছু বলার থাকে না।

সেই দু' লাখ টাকার ভূত এখনও মাঝে মাঝে আমাদের ধাওয়া করে, তাই এ বিষয়ে সত্যি কথাটা পাঠিকা/পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।

গুপ্তবাড়ির যৌথ পরিবারব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে অমলবাবু সস্ত্রীক সাদার্ন অ্যাভিনিউতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। পুত্রের মৃত্যুর পর অতুলবাবু হাসি এবং প্রতুলবাবুর মেয়ে ঈশানীর ভরণপোষণের জন্য মাসে দু' হাজার টাকা করে দিতেন। তখনকার দিনের হিসাবে টাকাটা অনেকই বটে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও টাকা উনি হাসিকে দেননি। স্ত্রী হিসেবে না, 'নমিনি' হিসাবে ও অমলের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ইনসিওরেন্স থেকে আশি হাজার টাকা পেয়েছিল। এই টাকাটাই গ্রাস করা চলে কি না তাই নিয়ে পরিবারের কেউ কেউ জল্পনাকল্পনা করছিলেন। তবে আইনত তার কোনও উপায় ছিল না। কারণ ও-টাকাটা একান্তই হাসির নিজস্ব সম্পত্তি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাষায় বলতে গেলে 'নহি কিসিকা বাপকা'। ঘটনার পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এ ব্যাপারে কৌতূহলী এখনও কেউ যদি বেঁচে থাকেন, তাঁদের আমার বিবৃতি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে কি না জানি না। হাসির গয়নাপত্র অধিকাংশ গুপ্তবাড়িতে রয়ে গিয়েছিল। শুনেছি ওর শাশুড়ি তার অধিকাংশই

একে-তাকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ওর বাবার দেওয়া গয়নাগাটিও ছিল। অচিন্ত্যবাবুর জনপ্রিয় কাহিনিটিতে এই ব্যাপারের কোনও উল্লেখ নেই।

বাঙালি নিন্দুকের উর্বর মস্তিষ্কে আরও অনেক কাহিনির জন্ম হয়েছিল। আবার বলি—অবশ্যই বাঙালি মাত্রেই নিন্দুক না। কিন্তু বোধ হয় অন্য পাঁচটা সংস্কৃতির তুলনায় আমাদের সংস্কৃতিতে 'গসিপ-প্রবণতা' অনেকটা বেশি। সেই প্রবণতা কত বিষাক্ত হতে পারে তার প্রমাণ আমরা যথেষ্টই পেয়েছিলাম। একদল রটাতে শুরু করলেন যে অনেক দিন ধরেই আমাদের গুপ্ত এবং অবৈধ প্রণয় চলছিল। আমার কন্যা আবির্ভূতা হওয়ার পর অনেক পরিচিত মানুষই ওর জন্মের তারিখ জেনে নিয়ে মনে মনে হিসেব করতেন ওর মাতৃগর্ভে আবির্ভাব আমাদের বিবাহের আগে না পরে। সুকন্যাকে প্রথম দেখে অবশ্যি নবনীতা আমাদের এক ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন, 'তপনদা, ও যে আপনার মেয়ে এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না।' (অর্থাৎ এরকম সন্দেহও প্রকাশিত হচ্ছিল।) শুনে বেশ নিরাশ হয়েছিলাম। কন্যা যদি আমার পেঁচামুখই উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, তবে আর সুন্দরী স্ত্রী বিয়ে করে কী সুবিধে হল? সৌভাগ্যক্রমে নবনীতার বক্তব্যটা শতকরা একশো ভাগ সত্যি প্রমাণিত হয়নি। কন্যার মুখে মায়ের মুখের আদল যথেষ্টই আছে।

যখন এইসব বিচিত্র গোলমাল চলছে, তখন একদিন বাসস্টপে প্রতুলবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি নিজে থেকেই এগিয়ে এসে বললেন, 'শুনেছ তো, কীসব হচ্ছে?' আমি বললাম, 'আপনারা একটু আপনাদের মাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন না যে যা ঘটছে তা আপনাদের পরিবারের উপযুক্ত না?' উনি সংক্ষেপে এবং ঠিকই বললেন, 'কারও সাধ্য নেই।'

জানতাম ওঁরা সেদিন বিবাহ রেজিস্ট্রি করার নোটিস দিতে যাচ্ছেন। আমি আমার শুভেচ্ছা জানালাম। উনি ওঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি এর মধ্যে শুভ সম্ভাবনা কিছু দেখছি না।' রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়ার পথে উনি নাকি ওঁর বাগদত্তাকে বলেন যে, অল্পদিন পরেই উনি যে এক বছরের জন্য আমেরিকা যাবেন তখন মহিলাটি ওঁর সঙ্গে যেতে পারবেন না। কলকাতায় থেকে শ্বশুর-শাশুড়ির দেখভাল করতে হবে। ভদ্রমহিলা ভীষণ চটে উত্তর দেন যে, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা তিনি অবশ্যই করবেন কিন্তু গুপ্তবাড়ির নার্স হওয়ার জন্য উনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন না। প্রতুলবাবু এবার একটু ভারসাম্য হারালেন। বললেন, 'তুমি আমাকে না, অতুল গুপ্তর টাকাকে বিয়ে করতে চাইছ।' বিবাহ-সম্ভাবনার সেইখানেই ইতি। ভদ্রমহিলা মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে নেমে গেলেন। আমার ধারণা প্রতুলবাবু চরিত্রের এক মৌলিক দুর্বলতার ফলে জীবনে স্থায়ী সুখের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হলেন। এর পর ওঁর জীবনে নানা দিক থেকে সাফল্য এসেছিল। কিন্তু উনি কখনও সুখের মুখ দেখেছেন, এমন আমার মনে হয়নি।

কলেজ খুলে যাচ্ছিল। আমি হাসিকে বললাম—অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠলে ওর ছোটমামার বাড়ি গিয়ে থাকতে। যাঁরা এই দুর্যোগে আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধানস্থানীয়/স্থানীয়া ওর ছোটমামা পরিমল রায় এবং তাঁর স্ত্রী আভা, হাসির জ্যাঠতুতো দিদি দেবলীনা এবং তাঁর স্বামী নীতীশ মজুমদার আর অনাত্মীয়দের মধ্যে অমিতা সেন, তাঁর ভাই কঙ্করদা, রাধারাণী দেবী আর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তার অল্পদিন আগে

অমর্ত্য-নবনীতার বিয়ে হয়েছে। ওরা দিল্লি চলে গিয়ে আশুবাবুর অশোক রোডের কোয়ার্টার্সে বাস করছে। আমাদেরও পরে কয়েক দিনের জন্য ওই বাসায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর একটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সমর্থন এসেছিল। আমাদের বিয়ের খবর পেয়ে হাসির ছোটবোন সোনালীর প্রথম স্বামী হরিসাধন দাশগুপ্তর বিধবা মা ওঁর গলার সোনার হারটি খুলে তাঁর আশীর্বাদ সহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওই অত্যন্ত পুরনোপন্থী মানুষটির মনে কোথায় যেন গভীর মানবিকতাবোধ জাগ্রত ছিল। ভাগ্যহীনা সুন্দরী মেয়েটার কপালে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এই চিন্তা ওঁকে আনন্দ দিয়েছিল। হাসিদের ফ্ল্যাটটি ছিল ওদের বিশাল বাড়ির উলটোদিকে। সকাল-সন্ধ্যা যেতে-আসতে ম্লানমুখী মেয়েটিকে উনি দেখতে পেতেন।

আমি দিল্লি রওনা হওয়ার আগে আমার পুরনো বন্ধু হরিসাধনকে বলে গেলাম বিয়ে রেজিস্ট্রির নোটিস দিয়ে রাখতে। আমি এক মাস পর ফিরে এসে বিয়ে করব। কিন্তু দিল্লি পৌঁছবার কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা অমর্ত্য আর নবনীতা আমাদের মডেল টাউনের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত। ওরা বলল—খারাপ খবর আছে। কঙ্করদা মারফত হাসি খবর পাঠিয়েছে—এ বিয়ে ও করতে পারবে না। ও পণ্ডিচেরি চলে যাবে ঠিক করেছে। ওর উপর চাপটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি হরিসাধনকে ফোন করে বললাম—আমি আসছি। এবং হাসিকে নিয়ে দিল্লি ফিরে আসব। অমর্ত্যদের কাছ থেকেই টাকা ধার করে প্লেনের টিকিট কিনে কলকাতা রওনা হলাম।

এয়ারপোর্টে হরিসাধন আর হাসি দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি পণ্ডিচেরি চলে যায়নি দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। ওদিকে অবস্থা দেখলাম সহ্যের সীমা সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে গেছে। হাসিকে ছেড়ে তার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে ডেকে গালিগালাজ শুরু হয়েছে। এবার আর দেরি না করে ট্রেনের টিকিট করে ফেললাম। ইতিমধ্যে আমার মা-বাবার সম্মতি পেয়ে গিয়েছি। তাঁরা খুব খুশি হয়েই সুন্দরী পুত্রবধূকে গ্রহণ করেছেন। শুধু অতুলবাবুর পরিবারের সঙ্গে বিরোধে ওঁরা বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন। দু'দিন পর দিল্লি রওনা দেব। অবস্থা অসহ্য হওয়ায় হাসি তার মামার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এমন সময় বন্ধুবর কুমার মুখার্জি বললেন, 'বিয়ে না করে যেয়ো না। বিপদে পড়বে।' ওঁরাই রেজিস্ট্রার ডেকে ব্যবস্থা করলেন। ১৯৬০ সনের ২২ জুলাই এক বিব্রত বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কুমারের শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে অল্পকটি শুভার্থী আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের উপস্থিতিতে আমরা মালাবদল করে রেজিস্ট্রারের অনুমোদন সহ বিয়ে করলাম। বাবা তখন অসুস্থ। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলা উঠতে পারলেন না। আমার মা, বোন, বউদি এবং ছোটভাই এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। কী করে যেন গুপ্তভবনে আমরা কোথায় বিয়ে করছি সে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা যখন রেজিস্টারে সই করছি তখনও ফোন আসতে লাগল যে এখনই পুলিশ আসবে। আমরা ওঁদের সম্পত্তি হরণ করেছি, সেই লুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য। বিয়ের পর আমার ছোট ভাই অপুর ব্যবস্থামতো স্কাইরুমে গিয়ে অল্প কয়েকজন কিছু খাওয়াদাওয়া করলাম। অধ্যাপক রবি দাশগুপ্ত এবং রাধামোহনবাবু, তাছাড়া আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। বিয়ের পরদিনই আমরা দিল্লি রওনা হয়ে গেলাম।

আমাদের ফ্ল্যাটে খাট-পালং কিছুই ছিল না। দড়ির চারপাইয়ে ঘুমোতাম। তাই বাধ্য হয়েই অমিতাদির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দু-তিনদিনের জন্য ওঁদের অশোক রোডের ফ্ল্যাটে উঠতে হল। সেখানে অমর্ত্য-নবনীতার বিয়ে উপলক্ষে পার্টি হচ্ছিল। এ পার্টি আমাদের বিয়েরও সামাজিক স্বীকৃতি উপলক্ষে বলে ঘোষিত হল। এ নিয়ে অমিতাদির পরে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। ওঁর অপরাধ—উনি অতুলবাবুর মতো দেবতুল্য মানুষের ঘর ভাঙতে সাহায্য করেছিলেন। দেবতুল্য মানুষের সুখ-শান্তির জন্য প্রয়োজন হলে সাধারণ জীবদের বলি দেওয়া নীতিসঙ্গত কাজ—এই বিশ্বাস দেখলাম শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অনেকেরই ছিল।

আশুবাবুর বাড়িতে পার্টিতে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। দিল্লি কলেজের এক অধ্যাপক তাঁর কৌতূহলপ্রবণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এঁকে নিয়ে পরিমল রায়ের লেখা একটি বিখ্যাত রম্যরচনা আছে। মাস খানেক আগে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন উনি আমি বিয়ে কেন করিনি, শিগগিরি করার ইচ্ছে আছে কি না ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। না, ওঁর বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল না। প্রশ্নগুলির উৎস নিতান্তই মানবিক কৌতূহল। ওঁর শেষোক্ত প্রশ্নটির আমি নেতিবাচক উত্তরই দিয়েছিলাম। আশুবাবুর বাড়ির পার্টিতে আবার ওঁর সম্মুখীন হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এবার প্রশ্ন, 'গত মাসে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে আছে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'তখন বলেছিলেন আপনার শিগগিরই বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা নেই?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'তবে মত বদলালেন কেন?' এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। মনে মনে বললাম, আমার স্ত্রীকে দেখে তোমার প্রশ্নের যদি জবাব না পেয়ে থাকো, তবে কোনও উত্তরই তোমার তুষ্টিসাধন করবে না।

মডেল টাউনের ফ্ল্যাটে আমরা দড়ির খাটিয়ায় শুতাম। ভাবলাম বিবাহের পর ওই ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রয়োজন। অল্প কিছু আসবাবপত্র কেনার পর অমিতাদির আতিথ্য ছেড়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে এলাম। কিন্তু দিল্লি এসেই কুৎসা আর গুজব থেকে নিষ্কৃতি পেলাম, এমন নয়। হাসির নিতান্ত নিরীহ বাবা সব শুভার্থীদের কাছ থেকে চিঠি পেতে লাগলেন—লোকে আমাদের নামে কী বলছে তার বিশদ বর্ণনা দিয়ে। নিয়মনিষ্ঠ মানুষটি সেইসব চিঠি সযত্নে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। চিঠিগুলি পড়ে আমার স্ত্রী বিপর্যস্ত বোধ করত। আমি এবার ওকে আমি পড়বার আগে কোনও চিঠি পড়তে মানা করলাম। স্মরণীয় ব্যাপার এইসব পত্রলেখকরা কেউ কেউ এর আগে আমার সঙ্গে তাঁদের কন্যার বিবাহ প্রস্তাব এনেছিলেন। তার অন্যতম কারণ—কলকাতার মহলগুলে ভুল ধারণা ছিল যে আর্কাইভসে ডেপুটি ডিরেক্টরের কাজটা খুব বড় চাকরি। আর তখনও আমাদের সদ্য ঔপনিবেশিকতামুক্ত দেশে অক্সব্রিজের কদর খুব বেশি।

আমার এই পুতুল নিয়ে খেলার সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার দু-একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমার এক অগ্রজস্থানীয় বন্ধু আমাকে সম্ভাব্য পাত্র হিসাবে এক বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়ির কর্তা কলকাতার শিক্ষাজগতে পরিচিত নাম, তাঁর পত্নী অতি বিখ্যাত ব্যক্তির কন্যা। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সুতরাং নিজের উৎসাহেই দ্বিতীয়বার গেলাম। এবার কন্যার পিতা সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—দেশ থেকে টাকাপয়সা আমরা কী আনতে পেরেছি? বুঝলাম ওঁদের ধারণা আমরা বিরাট জমিদার এবং দেশ থেকে বহু অর্থ নিয়ে এসেছি। শুধু আমার মাইনের ভরসায়

ওঁরা বিয়ের সম্বন্ধের কথা ভাবছিলেন না। আমি জানালাম—আমরা কপর্দকহীন হয়ে হিন্দুস্তানে এসেছি। আর কোনও দিনই আমরা ধনী ছিলাম না। তৃতীয় দিন যখন গেলাম—দরজা খুলে বসালেন ওঁর স্ত্রী। তিনি বললেন, 'দ্যাখো বাবা, মেয়েকে একভাবে মানুষ করেছি। শুধু সরকারি চাকরির মাইনের উপর নির্ভর করে ও সংসার চালাতে পারবে না। সুতরাং এ ব্যাপারটা আর না এগোনোই ভাল।' সেলাম ঠুকে বিদায় নিলাম। একবার ভাবলাম জিগ্যেস করি—আপনার স্বামীও তো মাস্টারি করতেন। আপনাদের কি তা হলে ওঁর শ্বশুরের টাকায় চলত?

আর একবার আমার এক বন্ধু হঠাৎ মডেল টাউনে তাঁর এক পিসেমশায়কে নিয়ে উপস্থিত। তখন খালেক আর আমি ছাদের উপর ইসমাইলের ভাজা মুরগির ঠ্যাং সহ বিয়ার খেতে ব্যস্ত। বিব্রত হয়ে কিংকর্তব্য স্থির করার জন্য গুরু শ্রীবারট্রান্ড রাসেলকে স্মরণ করলাম। নাঃ, সত্য গোপন করা চলবে না। বিয়ার পান যতই পাপকাজ হোক, মিথ্যাচার করব না। ফলে পিসেমশায়কে জিগ্যেস করলাম, 'একটু খাবেন?' ভদ্রলোকের বোধ হয় আর একটু হলেই পক্ষাঘাত হত। কোনও মতে নিজেকে সামলে এই দুর্জনসঙ্গ ত্যাগ করে শ্যালকপুত্র সহ বিদায় নিলেন। পথে যেতে যেতে বলেন, 'বেশ ভালই অভ্যর্থনা হল।' আর এক ভদ্রমহিলা যিনি আমাদের বিয়ের কথা শুনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিন্দা করেছিলেন, তিনিও এক সময় তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এনেছিলেন। ভদ্রমহিলা বিখ্যাত লেখিকা, চলন-বলন দেখতে-শুনতে রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। সম্বন্ধটা যদি ওঁর সঙ্গে হত, তবে নিশ্চয়ই বেশ আগ্রহী হতাম। কিন্তু মেয়েটা তখন একেবারেই বাচ্চা। ক্র্যাডল স্ন্যাচিংয়ে আমার উৎসাহ ছিল না। কলকাতার নিন্দা-তথা-গুজবযন্ত্র বেশ কিছুদিন চালু ছিল। আগেই লিখেছি, ঘটনার এক যুগ পরেও অক্সফোর্ড এসে তার প্রতিধ্বনি শুনেছি। বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার একশো বছর পরে আমাদের বিয়ে নিয়ে এত গণ্ডগোল কেন হয়েছিল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারিনি। কয়েকটি নেতিবাচক সম্ভাবনা বিচার করে আমি এর ব্যাখ্যা খুঁজেছি। হাসি যদি কোনও সাধারণ ঘরের বধূ হত তাহলে এ নিয়ে ঝড় উঠত না। সমৃদ্ধ উদারপন্থী মহানুভব পরিবারের বধূ হয়ে তাঁদের দাক্ষিণ্যের সুযোগ পুরোপুরি নিয়ে সে তাঁদের সম্মানহানি করেছে, ঘর ভেঙেছে এইটাই ছিল নিন্দাবান্দার মূল কথা। ওই পরিবারকে ঘিরে একটি স্তাবকমণ্ডলী ছিল। তাঁরাই এই অপপ্রচার শুরু করেন। আশ্চর্যের বিষয়—ওর সামনে বিকল্প কী ছিল এ প্রশ্ন ওঁদের কারও মাথায় আসেনি। দ্বিতীয় কথা—গুপ্ত পরিবার যদি ব্যাপারটা অন্যভাবে নিতেন, মানে আমাদের কল্যাণকামনা করে আশীর্বাদ জানাতেন, তা হলেও ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াত। স্তাবকমণ্ডলী ওঁদের মাহাত্ম্যের নতুন এই উদাহরণ বাড়ি বাড়ি প্রচার করতেন এবং সোৎসাহে আমাদের বাসর সাজাতেন। অতুলবাবুর পত্নীর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচীনপন্থী মনোভাব এই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নাশ করেছিল। আর ওঁদের কারও কারও মনে পরিবার নিয়ে মর্যাদাবোধ কিছুটা বেশি তীব্র ছিল। অতুল গুপ্তর পুত্রবধূর পক্ষে পুনর্বিবাহের চেয়ে চিরবৈধব্য শ্রেয় এই ধরনের একটা প্রচ্ছন্ন মনোভঙ্গি ওঁদের স্বাভাবিক মানবিকতাবোধ ব্যাহত করেছিল। একই সময় ওঁরা বাড়ির প্রৌঢ় বড়ছেলের বিয়ের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল আর তরুণী ভ্রাতৃবধূর পুনর্বিবাহ নিয়ে তোলপাড়

করছেন, এ ব্যাপারটাতেও ওঁরা কিছুটা বিব্রত ছিলেন। স্তাবকমণ্ডলী হাসির সামান্য পুঁজি নিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টাকে দু' লাখ টাকা দানের গল্পকথা দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। অচিন্ত্যবাবু ওই অসত্য কাহিনিকে অমরত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মজার ব্যাপার এই যে, কখনও কারও মুখে গুপ্ত পরিবার বা তাঁদের স্তাবকমণ্ডলীর কোনও সমালোচনা শুনিনি। আমার ধারণা বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বাঙালির মনে যে দ্বিধা রয়ে গেছে, এই ব্যবহারের প্রধান কারণ তাই। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এই মনোভাব প্রকাশ করার সাহস শিক্ষিত সমাজে বিশেষ কারও ছিল না। শুধু আমার সহকর্মী এক পণ্ডিত ব্যক্তি ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, 'তপন একটা বিধবারে বিয়ে করে দিল্লি চলে গেছে।' 'টা'-টা লক্ষণীয়। এত সৎসাহস বেশি লোকের ছিল না। তাই দু' লাখ টাকার কাহিনিটি সৃষ্টি করতে হল। আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। কথাটা বিশেষ করে নারীবাদীদের লক্ষ করেই লিখছি। নিন্দাটা হয়েছিল প্রধানত হাসির। আমাদের সমাজে পুরুষ কখনও বিশেষ দোষী হয় না।

নরকে এক ঋতু

এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত অভিজ্ঞতা এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রায় চার দশক আগের কথা লিখছি। নাটকের কুশীলবরা কেউ কেউ এখন প্রয়াত। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের পরিচয়ও যাতে পাঠকসাধারণের কাছে স্পষ্ট না হয় সেইভাবেই লেখার চেষ্টা করছি। এইসব ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল জনৈক সুধী ব্যক্তিকে (যাঁর বিচারবুদ্ধির উপর আমার বিশ্বাস আছে) আমি জিগ্যেস করি, এই বিচিত্র দলবাজি এবং সর্বত অশালীন ব্যবহারের ইতিহাস লেখা ঠিক হবে কি না। তিনি আমাকে লিখতেই উৎসাহ দেন। এ ব্যাপারে তাঁর এবং আমার মত একই। বর্তমান লেখাটি ব্যক্তিগত কাহিনির চেয়ে সামাজিক ইতিহাসের অন্যতর দলিল হিসেবেই পাঠকদের কাছে আমি উপস্থিত করছি। সে-ইতিহাসের কৃষ্ণবর্ণ দিক সর্বব্যাপী দুর্নীতি এবং ক্ষমতাশালী মানুষদের নিরঙ্কুশ দলবাজি। এই বিষ শিক্ষাজগতেও প্রবেশ করেছিল। তার স্বরূপ বর্তমান পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাগুলি থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

যুগধর্ম বলে একটা সত্য বস্তু আছে। তাকে এড়ানো সহজ নয়। খুব কম মানুষই তা এড়ানোর চেষ্টা করেন, করলেও সাধারণত সফল হন না। স্বাধীনতা লাভের পর প্রচুর ক্ষমতা এবং সম্পদ আমাদের এলিট শ্রেণির অধিকারগ্রস্ত হয়। এই নবলব্ধ ক্ষমতা সর্বদা সুব্যবহার করার মতো সংযম বা সুবুদ্ধি অল্প লোকেরই ছিল। আমি যাঁদের কথা লিখব—তাঁরা উচ্চশিক্ষিত এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। নানা দিক থেকেই এঁরা গুণবান মানুষও বটে। এঁদের মধ্যে এক-আধজন ছাড়া কেউ সাধারণ অর্থে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না। অর্থাৎ এঁদের কেউ যাকে সোজা বাংলায় বাঁকা পথে পয়সা করার চেষ্টা বলে, তা করেননি। শুধু দু-একজন গোষ্ঠীসংযোগ বা কানেকশনের অসদ্ব্যবহার করে অযোগ্য নিকট আত্মীয়দের জন্য অন্যায়ভাবে সুযোগ-সুবিধা (যথা পরীক্ষার ফল বদলানো, তদ্বির করে বিদেশে স্কলারশিপ

জোটানো) চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়েছেন। আজকের হিসেবে ওগুলি দুর্নীতির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু শিক্ষাজগতে উচ্চস্তরে দুর্নীতি প্রধানত ক্ষমতাচক্র গড়ার রূপ নেয়। নতুন মাতব্বরগোষ্ঠীর দলভুক্ত বা প্রীতিভাজন না হলে কয়েকটি বিষয়ে ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কোথাও কোথাও কোনও কলেজেই চাকরি পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। গবেষণার জন্য অনুদানের বেলায়ও একই নিয়ম চালু হয়। রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে এঁরা যখন ক্ষমতাচ্যুত হলেন, তখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নতুন গোষ্ঠী একই খেলা খেলতে শুরু করেন। তাঁদের দলে বিদ্বান-বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যাল্পতাবশত কিছু তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির মানুষ গদিয়ান হলেন। তাঁদের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আগের যুগের কর্তাব্যক্তিরা অনেকে রাজ্যপাট ফিরে পেয়েছেন। তার নানা সুফল এখনই বেশ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু দু' বছর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে পড়ানোর অভিজ্ঞতা ভেবেচিন্তেই নারকীয় বলে বর্ণনা করেছি—প্রধানত এই দলবাজির পরিপ্রেক্ষিতে না। কারণ দলের নেতারা বাহ্যত আমার বন্ধুই ছিলেন। যতদিন দেশে ছিলাম ততদিন আমার প্রতি তাঁদের বিরূপ মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকট হয়নি। ইতিহাস বিভাগে পড়াবার সময় স্থানীয় শিক্ষিত সমাজের ব্যবহারে যে অশ্লীলতার পরিচয় পাই সেটাই আমার অসহ্য লেগেছিল। তার পরিচয় যথাস্থানে দেব। উল্লেখ্য, যত দূর জানি—বিশ্ববিদ্যালয়টির সব বিভাগে সকলেরই আমার মতো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি।

দিল্লি স্কুল ছেড়ে ইতিহাস বিভাগে যাওয়ার প্রধান কারণ অর্থনীতি বিভাগে পড়ানোর অভিজ্ঞতায় আমার ব্যক্তিগত অতৃপ্তি—একথা আগেই বলেছি। কারণ ওখানকার সভ্য শালীন আবহাওয়ার তুলনা দেশে বা বিদেশে কোথাও বেশি দেখিনি। কিন্তু পুণ্যশ্লোক রায় ঠিকই বলেছিলেন—ভারতীয় শিক্ষাজগতে দিল্লি স্কুল একটি দ্বীপ। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে এক ঘনকৃষ্ণ দিক আছে ওখানে পড়িয়ে তার সাক্ষাৎ পরিচয় আমি পাইনি। এখানে বলা উচিত—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময়েও আমার সেই নেতিবাচক দিকটির শিকার হতে হয়নি। তার কারণ আমি আমার প্রিয় শিক্ষকদের পক্ষপুটে আশ্রিত ছিলাম। আমাদের সহকর্মীদের অনেকে যে সঙ্গত কারণেই তীব্র অসন্তোষ নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন সেকথা আমার অজানা ছিল না। একটি পরিবারের প্রভাব যে সুনীতির সীমা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেছিল সে কথাও সবাই জানতেন। কিন্তু দিল্লির ইতিহাস বিভাগে পড়াবার সময় যে ধরনের আচরণ সহ্য করতে হয়েছে, আশা করি তার তুলনা অন্যত্র কোথাও নেই।

ব্যক্তিগত অতৃপ্তি ছাড়াও ইতিহাস বিভাগে যাওয়ার আমার একটি ইতিবাচক উদ্দেশ্য ছিল। দিল্লি স্কুলে কে. এন. রাজ এবং ডক্টর রাও একটি অর্থনীতি বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন যেটি পৃথিবীর যে-কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। আমার আশা ছিল যে ওইরকম একটি উচ্চকোটির ইতিহাস বিভাগও গড়ে তোলা সম্ভব। দেশের নানা জায়গার নানা মতের ঐতিহাসিকদের একত্র করে এ কাজ করা সাধ্যায়ত্ত বলেই মনে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের ব্যাপারে তখন বিভাগীয় প্রধানের ক্ষমতা অসাধারণ এবং কয়েক বছরের জন্য বিভাগীয় প্রধান হিসাবেই আমি ইতিহাস বিভাগে যোগ দিই। কিন্তু আমার

একটি কথা জানা ছিল না। বাবারও বাবা থাকে। ইতিহাস বিভাগে আমার 'বন্ধুগোষ্ঠী' রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়ালে থেকে শরবর্ষণ করে আমার প্রচেষ্টা বানচাল করছিলেন। না, সব ব্যাপারে না। যাঁদের প্রতি ওঁদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না, তাঁদের নিয়োগের ব্যাপারে ওঁরা আপত্তি করেননি।

সব জায়গায়ই আমার সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত ছিল, এমন দাবি আমার নেই। তবে স্বজন বা তাঁবেদার-পোষণের জন্য কিছু করিনি, এটুকু বলতে পারি। আমি চলে যাওয়ার পর নয়া কর্তামণ্ডলীর চোখে গ্রহণযোগ্য নতুন বিভাগীয় প্রধান সত্যিতেই একটি শক্তিশালী বিভাগ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। আমার মতে তার সঙ্গে যোগ্যতায় তুলনীয় কোনও ইতিহাস বিভাগ ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও হয়নি। আমার পরবর্তী বিভাগপ্রধানের কূটনৈতিক পারদর্শিতা এই সাফল্যের অন্যতর কারণ। যে-ব্যক্তিকে ছ' মাস আগে কিছুতেই উচ্চতর পদে নিয়োগ করার ব্যাপারে দলবাজচক্রের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞর সম্মতি পাওয়া যায়নি, ছ' মাস পরে সেই একই বিশেষজ্ঞ একই ব্যক্তির পদোন্নতিতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। নতুন বিভাগ-প্রধান পাকা কূটনৈতিক না হলে এটা সম্ভব হত না।

অবশ্যি আগে যে সম্মতি পাওয়া যায়নি, তার পিছনে আমাকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্যটাও কাজ করছিল। বিশেষজ্ঞটির প্রকৃতিতে একটিই বড় দোষ ছিল—প্রতিহিংসাপরায়ণতা। এটি বাদ দিলে তিনি নানা গুণের রীতিমতো বড় মাপের মানুষ ছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁর একটি দুষ্ট মন্ত্রী ছিলেন। এঁর চেয়ে কপটতর ব্যক্তি আমি আমার দীর্ঘ জীবনে কখনও দেখিনি। হাড়ে হাড়ে অসৎ সেই মানুষটি কেন জানি না নানা মিথ্যে কথা বলে তাঁর বন্ধুর কান ভাঙিয়েছিলেন। ফলে তিনি আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন এবং তিন দশক ধরে নানাভাবে আমার বিরোধিতা এবং অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা আমি বিদেশ যাওয়ার পরও বন্ধ হয়নি।

সর্বভারতীয় নতুন কর্তাগোষ্ঠী একটি নয়া নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে চালু করেছিলেন। দিল্লি থেকে তা ক্রমে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ওই গোষ্ঠীর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। নয়া নীতির সংক্ষিপ্ত নাম 'লাইকমাইন্ডেডনেস'। অর্থাৎ চাকরি পেতে হলে উমেদারদের ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে মতের দিক থেকে এক গোয়ালের গোরু হতে হবে। অবশ্যই সেই মত পবিত্র বামপন্থা। পরে এই নীতির উন্নততর নাম হল 'আইডিওলজিকাল কনসিসটেন্সি' অর্থাৎ আদর্শগত সমঝোতা। ওই সমঝোতা হলে যখন চাকরি হয় তখন উমেদারদের মধ্যে বামপন্থা দাবাগ্নির মতো ছড়াতে লাগল—এ আর বিচিত্র কী? শব্দ যেটা ব্যবহার হত সেটা অবশ্যি 'বামপন্থা' নয় 'প্রগতিবাদ'। কিন্তু প্রগতিবাদের রূপ এক নয়, বহু। তাই মাঝে মাঝে মুশকিল হত, বিশেষ করে যখন ক্ষমতায় আসীন প্রগতিবাদীদের মধ্যে স্বার্থ বা ক্ষমতাঘটিত কারণে ঝগড়া বাধত। কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের মেজাজ বুঝে চললে চাকরির ক্ষেত্রে চুনোপুঁটিদের অসুবিধে হত না। এবং 'লয়্যালটি টেস্ট' পাস করলে যথা বা অযথা সময়ে পদোন্নতিও হত।

আমি যোগ দেওয়ার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে স্থানীয় ক্ষমতাপন্নদের মধ্যে এক বিচিত্র দলাদলির ইতিহাস ছিল। তার কাহিনি দলের নেতাদের কাছেই শুনেছি। তাঁরা সময় এবং অবস্থা বুঝে সন্ধিবিগ্রহ করতেন। আজ যাঁরা 'আদর্শগত শত্রু' কাল তাঁরা বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষণকালের জন্য স্যাঙাত হতেন (কতকটা স্তালিন এবং হিটলারের চুক্তির মতো) এবং এসব ব্যাপারে খুব ঢাকা-চাপা কিছু ছিল না। বর্তমানে বিখ্যাত এক ব্যক্তি তাঁর প্রথম শ্রেণিতে ডিগ্রি পাওয়া এক ছাত্রীকে লেকচারারের পদে একটি চাকরির জন্য ইন্টারভিউতে আসতে নিষেধ করেন। কারণ কূটনৈতিক কারণে পদটি অন্য এক অধ্যাপকের কন্যার জন্য সংরক্ষিত ছিল। বশংবদ ছাত্রীটিকে অবশ্যি তার বাধ্যতার জন্য ভালভাবেই পুরস্কৃত করা হয়েছিল। আমাকে বলা হয়—ইতিহাস বিভাগে গেলে আদর্শ এবং জনস্বার্থের খাতিরে (পাঠক/পাঠিকা স্মরণ রাখবেন জনস্বার্থ ছাড়া আমাদের এলিট শ্রেণির অন্য কোনও চিন্তা নেই; যাবতীয় কুকর্ম তাঁরা জনস্বার্থেই করেন।) আমারও অনুরূপ সন্ধিবিগ্রহ করতে হবে। আমার সীমিত সৌভাগ্য—এ জাতীয় সন্ধিবিগ্রহ আমার করার প্রয়োজন হয়নি। আমার কোনও কোনও সহকর্মীর যে দানবীয় ছবি আঁকা হয়েছিল, বাস্তবে তারও সাক্ষাৎ আমি পাইনি।

এক সময়ে এই আইডিয়োলজিকাল কনসিসটেন্সি নামক ব্যাধি ভারতব্যাপী হয়ে শিক্ষাজগতে এক সর্বগ্রাসী শনিগ্রহ হয়ে দেখা দেয়। আমি যে ধরনের ইতিহাস বিভাগ গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছিলাম তা সব দিক থেকেই আদর্শগত ঐক্যের বিরোধী। আমার বা আমাদের সঙ্গে মতে মেলে না এমন লোকই আমি সহকর্মী হিসাবে পেতে চাইছিলাম। নানা মতের সহাবস্থান এবং সঙ্ঘর্ষে ঐতিহাসিক চিন্তা বহু স্রোতে বইবে, আমাদের বুদ্ধিগত জীবনকে সমৃদ্ধ করবে, এইটাই আমার আশা ছিল। কিন্তু যা ঘটছিল তা ঠিক এর উলটো। এবং যা ঘটছিল তার মধ্যে আমি এক সমূহ বিপদের সঙ্কেত পাচ্ছিলাম।

এতক্ষণ যে বিবরণী বেনামিতে চালাচ্ছিলাম, এবার তার মধ্যে দু-একটি সুপরিচিত নাম আমদানি করতে চাই। ইতিহাস শিক্ষা এবং শিক্ষাগত প্রশাসনের ক্ষেত্রে তথাকথিত বামায়ন যখন প্রবল বেগে চলছে, তখন একবার আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুশোভন সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আমি বলি—উত্তর ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব যেমন দুর্নীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দুই-ই নিম্নগামী, এখন যা ঘটছে তার ফলে বামপন্থী ভাবধারারও অনুরূপ দুর্গতির সম্ভাবনা। উনি সর্বজনের শ্রদ্ধেয়। উনি যদি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের এই বিষয়ে সাবধান করেন, তবে হয়তো এই অধোগতি বন্ধ হতে পারে। আমার এই ধারণা অবশ্য নিতান্তই ভুল ছিল। কারণ খেলা যেটা চলছিল সেটা আগাগোড়াই স্বার্থ এবং ক্ষমতাঘটিত। কারও সুপরামর্শ শুনে তার রদবদল হবার সম্ভাবনা ছিল না।

সুশোভনবাবু আমার কথা শুনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। ওঁর বক্তব্য— যাঁদের নানা উচ্চপদে বসানো হচ্ছে তাঁরা কেউ অযোগ্য লোক না। আর দীর্ঘদিন ধরে যে চাকরিবাকরি ক্ষমতা বিতরণের ব্যাপারে বামপন্থী আদর্শের ছোঁয়াচ থাকলে কোনও রকম সুযোগ পাওয়া অসম্ভব ছিল, তাতে আমরা কেউ আপত্তি করিনি। এখন স্রোত সামান্য উলটোমুখি হওয়ায়

আমরা 'গেল গেল' রব তুলছি। বলা বাহুল্য— উনি ঠিক এই ভাষা ব্যবহার করেননি। কিন্তু আমার বয়ান এবং ওঁর মূল বক্তব্যে খুব তফাত ছিল না। উত্তরে আমি বলি, 'স্যার, আমরাও নিজেদের প্রগতিবাদী বলেই মনে করি। কিন্তু যা ঘটছে তাতে প্রগতিবাদীদের বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের ঘরে নামবে বলে আশঙ্কা করি। আরও কথা আছে। রাজনৈতিক চাকা যদি কখনও উলটো দিকে ঘোরে, তখন নতুন রাজারা আজকের ব্যাপারগুলো ভুলবে না। অবাঞ্ছিত মানুষের হাতে পড়ে শিক্ষার অবস্থা সঙ্গীন হবে বলে আশঙ্কা করি।' অবশ্যি এ কথা যখন বলি তখন গৈরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসীন হবে—এমন কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণ হয়েছিল— যাতে আমার আনন্দের কোনও হেতু নেই। বিবিধ কুকার্য করার সময় গৈরিক পরিবার সর্বদাই পূর্ববর্তীদের 'সদাচার'-এর নজির দেখাতেন। সর্বত্র নিজের দলের লোক বসাচ্ছেন এমন অভিযোগ করলে বলতেন, 'তবে কি আমরা আমাদের শত্রুদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসাব?' পাঠিক/পাঠক 'আইডিওলজিকাল কনসিসটেনসির' কথা স্মরণ করুন। গৈরিক বাহিনীর এক 'পণ্ডিত' প্রগতিবাদীদের কীর্তিকলাপ নিয়ে একটি কুরুচিপূর্ণ বই প্রকাশ করেন। এই অশ্লীল গ্রন্থটি সর্বৈব মিথ্যা বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বলার পথ প্রগতিপন্থীরা রাখেননি। উপর্যুক্ত আলোচনায় সুশোভনবাবুর সুযোগ্য পুত্র বর্তমানে বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকারও যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পিতার মতই সমর্থন করেন। (বলা বাহুল্য, এঁদের সঙ্গে বর্তমান পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিচিত্র কুকর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।) এর অল্পদিন পরে উনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন। তখন আমি বিদেশে চলে গিয়েছি। বছর দুই বাদে সুমিত আমাকে একটি চিঠি লেখেন। তার মূল বক্তব্য ছিল— নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উনি আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারছেন। আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওঁর অভিজ্ঞতার খুব তফাত ছিল না। শুধু বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আমার একটি দুঃস্বপ্ন থেকে উনি রেহাই পেয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

ইতিহাস বিভাগে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটাও সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশভাবে ঘটেনি—সে কথা অনেক পরে জানতে পারি। আমাকে ইতিহাস বিভাগে নেওয়ার ব্যাপারে যে সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার প্রধান স্থানীয় ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু নিজেকে প্রচার করার ব্যাপারে তাঁর পটুত্ব কিছু কম। তাই তাঁর নাম শিক্ষিত সাধারণের কাছে পরিচিত নয়। যে-বিখ্যাত ব্যক্তিটির নানা সুকীর্তি এর আগে বর্ণনা করেছি, তিনি এই পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়ে অনুরোধ করেন যেন আমাকে ইতিহাস বিভাগে নেওয়া না হয়। এই অনুরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর হয়—'লোকটা বিভাগীয় প্রধান হয়ে এলে সব কমিটিতে ঢুকবে।' অর্থাৎ তাঁরা যে নিরঙ্কুশ রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টায় আছেন, তার ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা। সত্যিতে তার আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। কারণ কমিটি আমার কাছে বিভীষিকার বস্তু, একেবারেই কামনীয় নয়। ইনি এবং ওঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী চাকরিতে নিয়োগ-বিনিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দু কান কাটা ছিলেন। সবাই জানতে পারবে জেনেও চাকরির ব্যাপারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক তদ্বির তথা ঘোঁট করতে এঁরা কোনও দ্বিধা করতেন না। আমাদের দেশে এ জাতীয় অসৎ লোকের

অভাব নেই। সুতরাং ওই দুই ব্যক্তি ব্যতিক্রম না, নিয়মের মধ্যেই পড়েন। আমার শুধু দুঃখ যে এই জুটির একটি আজ উদার নিরপেক্ষতার আদর্শ বলে পরিচিত। প্রয়াত পণ্ডিত পার্থসারথি গুপ্ত যাতে অধ্যাপকের পদ না পান, সে জন্য এই দুষ্ট জুটিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা বিফল হয় আমি বিদেশ চলে যাওয়ার পরে। এঁদের বজ্জাতির সঙ্গে আমি পরে উঠিনি। পার্থসারথির মতো নিপাট ভালমানুষ এবং বিদ্যাচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত ব্যক্তি যে-কোনও দেশেই দুর্লভ। তিনি কীভাবে এই দুষ্টচক্রের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তা এখনও আমার বুদ্ধির অগোচর রয়ে গেছে। বোধহয় তিনি এঁদের নিরঙ্কুশ দলবাজিতে শামিল হতে নারাজ ছিলেন বলেই তাঁকে তাঁর প্রাপ্য পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সব সমাজেই কিছু অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ থাকে। তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। কিন্তু দুর্জন মানুষের ধর্মধ্বজ বলে খ্যাতি হলে কিছুটা গাত্রদাহ হয় ঠিকই।

ইতিহাস বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের পদ গ্রহণ করে কয়েকটা ব্যাপারে অস্বস্তিজনক অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। প্রথমেই নজরে আসে স্নাতকোত্তর বিভাগের অল্প সংখ্যক এবং কলেজগুলির বহু সংখ্যক শিক্ষকদের মধ্যে একটা রেষারেষির সম্পর্ক। এর কারণ কলেজের এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের শিক্ষকদের মাইনে এক হলেও শেষোক্তদের মানমর্যদা কিছু বেশি, যদিও তাঁরা যে বিদ্যাবুদ্ধিতে তুলনায় শ্রেষ্ঠ এমন কথা হলফ করে বলা চলত না। এই রেষারেষির প্রকাশ হত কখনও বিরোধিতায়, কখনও বিরোধ-ভক্তিতে। স্নাতকোত্তর বিভাগের দল-অনুদলকে ঘিরে বৃহত্তর গোষ্ঠী গড়ে উঠত। কোনও কোনও প্রফেসর-সাব বা ডক্টর-সাবের বৈঠকে সন্ধ্যায় বা সপ্তাহান্তে রীতিমতো আসর জমত। সেসব আসরের প্রধান আলোচ্য থাকত প্রতিপক্ষের নিন্দা বা ডক্টর/প্রফেসর সাহেবের মাহাত্ম্য। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো দাবিদাওয়াও পেশ করা হত।

এইসব দাবিদাওয়ার কেন্দ্রে ছিল স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ানোর জন্য তদ্বির। আমার পূর্ববর্তী শিক্ষকদের একজন এই সমস্যার এক অভিনব গণতান্ত্রিক সমাধান আবিষ্কার করেন। তিনি সব কলেজ শিক্ষকদের এক ইস্তাহার পাঠান— যেন তাঁরা তাঁদের যে বিষয়ে পারদর্শিতা আছে সেই বিষয়ের একটি পাঠক্রম তৈরি করে পাঠান। উদ্দেশ্য— তাঁদের এই পাঠক্রম অনুযায়ী সাধ্যমতো সব বিশেষ বিষয় বা স্পেশাল পেপার তৈরি করা হবে এবং পাঠক্রম-স্রষ্টারা তাঁদের বিশিষ্ট জ্ঞান ওই বিষয় মারফত পরিবেশন করবেন। এই গণতান্ত্রিক হরির লুঠের ফলে পঁচিশ বা তিরিশটি নতুন বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কলেজ শিক্ষকরা হরিবোল দিতে লাগলেন। এই নীতির প্রবক্তার নামে ধন্য ধন্য পড়ল। তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা আরও বাড়ল এবং সেই অনুপাতে দলও ভারী হল।

এ ব্যাপারে সামান্য একটু অসুবিধে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিংয়ে স্থানাভাববশত প্রতি বিভাগে ক্লাস হত মাত্র সপ্তাহে তিন দিন এবং অনেক ক্ষেত্রেই দু'বেলার মাত্র একবেলা। সপ্তাহের বাকি সময়টা শিক্ষক ও ছাত্ররা গভীর অধ্যয়ন-তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। ওই তিন দিনে এতগুলি বিষয়ের স্থান সংকুলান করা সংখ্যাতত্ত্বের কোনও আইনস্টাইনেরও ক্ষমতায় কুলাত না। ফলে ইতিহাস বিভাগের নতুন বিস্তৃত পাঠক্রম 'মৃত

পত্র' বা ডেড লেটার হিসাবে শোভা পেতে লাগল। এই 'সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না' নীতি ভালই চলছিল। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কিছু দুর্বৃত্ত ছিলেন, তাঁরা এই বিস্তৃত পাঠক্রমের মধ্যে গোলমাল বাধাবার সুবর্ণ সুযোগ খুঁজে পেলেন। মাঝে মাঝেই তাঁরা ধুয়া ধরতে লাগলেন, কেন অমুক বিষয় পড়ানো হচ্ছে না 'জবাব দাও, জবাব দাও'। আমার ক্লাসে একটি ছাত্র ছিলেন, যাকে রুচি অনুযায়ী গুন্ডা বা ছাত্রনেতা যে-কোনও অভিধায় অভিহিত করা চলত। মানুষটি মাঝে মাঝেই আমার ইউনিভার্সিটির দেওয়া বাড়ির লনে এসে চা-সামোসা খেয়ে যেত। লোকটিকে আমার বেশ লাগত। তার কোনও রকম নীতিবোধ বা স্কুপ্‌লসের বালাই ছিল না। বুঝতাম সে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু যে দলে সে যোগ দিয়েছিল তাদের কখনও ক্ষমতায় আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। এর হেতু জিগ্যেস করায় এই অত্যন্ত স্পষ্টভাষী মানুষটি মোক্ষম যুক্তি দেখিয়েছিল। বড় দলে উপরে উঠতে সময় লাগে। ছোট দলে নেতৃস্থানীয় হতে পারলে দল বদলাতে আর কতটুকু সময় প্রয়োজন?

হঠাৎ টার্মের মাঝামাঝি সে আমার দফতরে এসে দাবি জানাল, গাঁধী বিষয়ে যে স্পেশাল পেপার আছে তা পড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। এক একটা পেপার পড়াতে এক টার্ম সময় নেওয়া হত। সুতরাং টার্মের মাঝামাঝি কী করে হঠাৎ নতুন পেপার পড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে? আমি আরও বললাম, 'দ্যাখো বাপু, পড়ানোর ব্যবস্থা হলে তোমার ব্যক্তিগত কী সুবিধা হবে? তোমাকে তো কখনও ক্লাসে আসতে দেখা যায় না।' পাকা কূটনৈতিকের মতো মহাশয় উত্তর দিলেন, সে কথা অবান্তর। ছাত্রসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে সে এসেছে। জাতির পিতার জীবন ও কর্ম বিষয়ে পড়াবার কথা পাঠক্রমে আছে, অথচ ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তিবিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কিছু গা করছেন না। এর কোনও সুরাহা না হলে তাঁরা সক্রিয় ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবেন। জাতির পিতা মাথায় থাকুন, এ ব্যক্তি যে নিজের পিতা বিষয়েও কৌতূহলী এ কথা মনে করার কোনও কারণ ছিল না। আমি বললাম— এত অল্প সময়ে নতুন বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। নেতা তৎক্ষণাৎ উপাচার্যের ঘরে গিয়ে হামলা করলেন। মহম্মদের পর্বতের কাছে যেতে হল না। উপাচার্যরূপী পর্বত স্বয়ং আমার দফতরে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন— এই জাতীয় জটিল বিষয়ে বিনা আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না। বুঝলাম উনি ওই বজ্জাতচূড়ামণিকে ভয় পান। যে-ব্যক্তি গাঁধী বিষয়ক পাঠক্রম তৈরি করেছিলেন তাঁকে ডাকা হল। তিনি সানন্দে চার সপ্তাহে গাঁধীবিষয়ক যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্যকভাবে পড়িয়ে দিতে রাজি হলেন। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহান ছাত্রনেতা আমার বাড়ির লনে নির্দ্বিধায় আবির্ভূত হলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। এইসব আমাদের মাঝে মাঝে করতে হয়। এখন আর কোনও ইস্যু হাতের কাছে ছিল না। তা না হলে আপনাকে বিব্রত করার আমার ইচ্ছা ছিল না।' চা-সিঙাড়া এল। আহারান্তে আমার পদধূলি নিয়ে নেতা বিদায় নিলেন। পরের দিন কাগজে বের হল— ইতিহাস বিভাগের কমিউনিস্ট প্রধান রায়চৌধুরী গাঁধী বিষয়ক পেপারটি পড়াতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। ছাত্রনেতা অমুকের চাপে পড়ে অবশেষে বাধ্য হয়েছেন। আলেলুইয়া! বোল হরিবোল!

এই জাতীয় সন্দেহাতীত এবং নির্লজ্জভাবে বজ্জাত লোকদের আমার সত্যিই ভাল লাগে। এরা অনেক আনন্দ ও শিক্ষার খোরাক জোগায়। আমার সমস্যা হয় আপাতভদ্র মানুষগুলিকে নিয়ে, যারা সামনে বন্ধুত্বের মুখোশ পরে পিছন থেকে ছুরি মারে; উদারনীতি, বামপন্থা আর জনস্বার্থের নামাবলী গায়ে নিরঙ্কুশ দলবাজির রাজত্ব কায়েম করার তালে থাকে। সজনী দাস বর্ণিত অমায়িক খচ্চরদের দূর থেকে দেখতে মজাই লাগে, তাদের অমায়িকতার আবরণ বেশি পুরু না হওয়ায় অন্তরস্থিত খচরামি মাঝে মাঝেই প্রকট হয়ে কৌতুকের খোরাক জোগায়। কিন্তু এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে কৌতুকবোধটা বেশি দিন সজাগ রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

সত্তরের দশকে দিল্লির ছাত্র-রাজনীতিতে দুই দলের শক্তির লড়াই চলছিল। একটি কংগ্রেসপন্থী, অন্যটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তথা ভারতীয় জনসঙ্ঘর ছাত্র সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদ। শোনা যেত এই দুই দলের পিছনে দুই বৃহত্তর শক্তির মদত ছিল। তারা হচ্ছে যথাক্রমে কোকাকোলা এবং পেপসি কোম্পানি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাফেটেরিয়াটি ছাত্র ইউনিয়নের কর্তৃত্বাধীন ছিল। সুতরাং সেখানে মুখ্য পানীয় হিসেবে কোকাকোলা বিক্রি হবে, না পেপসি, তা ক্ষমতাসীন দলের মর্জির উপর নির্ভর করত। দিল্লির স্থানীয় রাজনীতিতে তখন জনসঙ্ঘ ক্ষমতালাভের চেষ্টায় সাফল্যের মুখে। বিদ্যার্থী পরিষদ তাদের হাতে অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার। শিক্ষকদের এক বড় অংশ প্রকাশ্যে বা গোপনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমর্থক। এক কলেজ পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখি অধ্যক্ষের চেয়ারের পিছনে অতি সুদৃশ্য এক ভারতবর্ষের ম্যাপ ঝুলছে। ম্যাপের আড়ালে কী ছিল সে বিষয়ে আমি অবহিত ছিলাম। তাই ম্যাপটি সরাতে বললাম। পিছনে আর একটি ভারতবর্ষের ম্যাপ উদ্‌ঘাটিত হল। সেটির বিষয়বস্তু সারা ভারতবর্ষে আর. এস. এস-এর শাখাগুলির স্থাননির্দেশ। অধ্যক্ষ মহাশয়কে বিনীত অনুরোধ জানালাম ও বস্তুটি ওখান থেকে স্থানান্তরিত করে সঙ্ঘের শাখা দফতরে নিয়ে টাঙাতে। মহাশয় স্থানীয় শাখার সর-সঙ্ঘচালক, সে কথা যে আমাদের জানা আছে এ তথ্যও নিবেদন করলাম।

যে ব্যাপারে আমার চরম দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল তার সঙ্গে উপরে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনীতির সম্পর্ক কম। তবে আমার ক্ষমতাপন্ন 'বন্ধুগোষ্ঠী' অন্তত আংশিকভাবে তার পিছনে ছিলেন কি না জানি না। এঁদের কর্মপদ্ধতি ক্রম-প্রকাশ্য উপন্যাসের মতো ধাপে ধাপে আমার চেতনাগোচর হয়েছে। এখন আমার বিশ্বাস কোনও কুকর্মই এঁদের সাধ্যাতীত নয়। তবে ওই বিশেষ ঘটনাগুলির পিছনে এঁদের হাত ছিল কি না সে বিষয়ে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমি পাইনি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে নিয়োগের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা চালু ছিল, তাকে আমি কুপ্রথা ছাড়া অন্য কোনও কিছু বলে বর্ণনা করতে পারি না। আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। বিভাগীয় প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি সিলেকশন কমিটির অন্যতর সভ্য। তা ছাড়া গভর্নিং বডিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এ রকম কয়েকজন থাকত। সাধারণত বিভাগীয় প্রধান এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সমঝোতার উপর নির্বাচন নির্ভর করত। যেখানে দু'পক্ষের মতান্তর ঘটত, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করে সাধারণত বিভাগীয় প্রধানের পক্ষে মত দিতেন। ইতিহাস বিভাগের পূর্ববর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অধ্যাপকরা রোটা সিসটেমে সিলেকশন কমিটিতে যাবেন। তবে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের মত অনুযায়ীই নিয়োগ হত।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের সংখ্যা ছিল যত দূর মনে পড়ে কমবেশি চল্লিশের মতো। প্রতি বিষয়েই প্রত্যেক বছরই কিছু লেকচারারের পদ খালি হত। এবং নিয়োগকর্তা শেষাশেষি বিভাগীয় প্রধান। ফলে কর্মপ্রার্থীদের অনেকেই সারা বছরই তাঁকে অল্পবিস্তর তৈলপ্রদান করতেন। বহু চেষ্টায় আমি এই জাতীয় সহকর্মীদের বোঝাতে সক্ষম হই যে এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে কলাটা-মুলোটা নিয়ে আমার বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা বিফল হলে বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কটা অন্য পথে গেল।

চাকরির জন্য যাঁরা দরখাস্ত করতেন বা ইন্টারভিউর জন্য যাঁদের ডাকা হত, তাঁরা অধিকাংশই মোটামুটি এক দরের মানুষ। এঁদের মধ্যে থেকে যাঁকে বা যাঁদের বাছা হত, তিনি বা তাঁরা সব হিসেবে আর সবাইয়ের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এ কথা অবশ্যই বলা যেত না। ফলে যাঁরা বিফলমনোরথ হতেন তাঁদের মনে ক্ষোভ হওয়া বিচিত্র নয়। যাঁরা বারবার দরখাস্ত করেও চাকরি পেতেন না তাঁদের কারও কারও ধারণা জন্মাত যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি কোনও অসঙ্গত কারণে বিরূপ। এরকম ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। সত্যিতে একবার হাত বাছাইয়ের পর যাঁদের ইন্টারভিউতে ডাকা হত তাঁদের মধ্যে লটারি করে একজন কাউকে বাছা হলে নির্বাচনটা খুব ভ্রমাত্মক হত বলে মনে হয় না।

যা হোক, ব্যর্থমনোরথ হয়ে ক্ষুব্ধ হওয়াটা এক ব্যাপার আর সেই ক্ষোভ প্রকাশের ভঙ্গিটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। কিছু কিছু আশাহত উমেদার যা শুরু করলেন, আশা করি তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও নেই। তাঁরা আমার বাড়ির ঠিকানায় অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। প্রায়ই আমার স্ত্রী এই চিঠিগুলি খুলে এবং পড়ে অত্যন্ত বিচলিত হতেন। শিক্ষিত ভদ্রলোক ওই রকম ভাষা ব্যবহার করতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত ছিল। চিঠি না খুলে ফেলে দেওয়ার উপায় ছিল না। কারণ তা করলে প্রয়োজনীয় তথ্যও না পড়ে ফেলে দেওয়ার আশঙ্কা। আমি খুব বিচলিত হতাম না। কারণ মানুষগুলি (?) শিক্ষিত কি না জানি না, ভদ্রলোক যে না তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাদের চিঠির ভাষায়ই পাওয়া যায়। চতুষ্পদ এবং দ্বিপদের চালচলন এক রকম হবে এটা আশা করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু রোজ সকালবেলা এক বছর ধরে এই রকম চিঠি আসা কারও পক্ষেই খুব আনন্দদায়ক না, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এর পর যা শুরু হল, তা আরও বিচিত্র। আমি চিঠিগুলির ব্যাপারে কোনও 'গা' বা 'রা' না করায় পত্রলেখকরা এক কেন্দ্রীয় দফতর বসালেন। সেখান থেকে সাইক্লোস্টাইল করে স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং কলেজ মিলিয়ে ইতিহাস বিষয়ে ন্যূনধিক দু'শো শিক্ষককে নিয়মিত চিঠির কপি পাঠানো শুরু হল। চিঠির বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে পত্রলেখকদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের নজর স্নাতকোত্তর বিভাগের পদগুলির উপর। তাঁদের প্রধান

অভিযোগ—তাঁদের মতো যোগ্য লোক থাকতে আমি বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছি। এঁরা ব্যাপারগুলি এতই প্রকাশ্যে করতেন যে কারা করছেন তা আমি সহজেই জানতে পারি।

একটি দক্ষিণ ভারতীয় মানুষ (চিঠিতে যেখানেই ত-এর জায়গায় থ থাকত, অবশ্যই ইংরেজি বর্ণান্তরে, বুঝতাম ওটি তাঁর অবদান), এই গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মানুষটি সব দিক থেকেই সজনী দাস-বর্ণিত অমায়িক খচ্চর। বাহ্যিক ব্যবহারে এঁর চেয়ে মার্জিত রুচির মানুষ আমি বেশি দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে ওঁর তুলনীয় বজ্জাত শুধু শিক্ষাজগৎ কেন যে-কোনও জগতেই বিরল। ইনি সর্বভারতীয় কর্তাগোষ্ঠীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁদের নেকনজরের ফলে যথা না, অযথা কালেই মেওয়া ফলেছিল। লোকটি প্রথমে অধ্যাপক পরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং এখনও মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে আমার উদ্দেশে আকার-ইঙ্গিতে গালিগালাজ ছোঁড়েন। তৎকালীন দলবাজ গোষ্ঠীর বিশেষ প্রিয়পাত্র এই মানুষটি বিদেশের ডিগ্রিধারী ছিলেন। কিন্তু তা ছাড়া তাঁর বিদ্যা বা সুবুদ্ধির কোনও পরিচয় আমি পাইনি, যদিও দলবাজ নেতৃবৃন্দ এঁকে হেরোডোটাস-থ্যুকিডিডিসের সঙ্গে তুলনীয় বলে ঘোষণা করেন।

দলবাজ কোম্পানির দলবৃদ্ধি এবং দলপালনের অন্যতর প্রধান টেকনিক ছিল হঠাৎ তাঁদের কোনও চেলাকে মহাপুরুষ ঘোষণা করা। আমার ধারণা এই জাতীয় তথ্য ওঁরা স্বপ্নাদেশ মারফত পেতেন। আর যদি মাফিয়ার কোনও সভ্য স্বপ্ন মারফত জ্ঞাত হতেন যে অমুক ব্যক্তি জিনিয়াস, তা হলে দলস্থ সবাই 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি তুলে ভাগ্যবান লোকটিকে মাথায় তুলে নাচানাচি শুরু করতেন। এবং অচিরেই যোগ্য লোকদের ডিঙিয়ে তাঁকে উচ্চপদে বহাল করা হত। সে যদি থার্ড ক্লাস ডিগ্রিধারী হত, তো বলতেন 'আরে রবীন্দ্রনাথের তো কোনও ডিগ্রিই ছিল না।' এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার জগৎ জিনিয়াসে জিনিয়াসে জনাকীর্ণ হয়ে গেল। আর বহু বিমর্ষ বানর বীরদর্প হনুমানে পরিণত হল।

এরকম একটি জিনিয়াস একবার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখলাম জিনিয়াসটি এক লাইন শুদ্ধ ইংরেজি লিখতে অপারগ। সেই মহাপণ্ডিত হিন্দি বা উর্দু ভাষায় তাঁর অসামান্য প্রতিভা প্রকাশ করলে কিছু বলার থাকত না। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য,—উনি ঘৃণিত বিদেশি ভাষায়ই বক্তব্য রাখতেন। শুনেছি দলবাজ কোম্পানির অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উক্ত মহাপুরুষের ইংরেজি শুদ্ধ করে দিতেন। কিন্তু নেতাটি বিশ্বভ্রমণে ব্যস্ত থাকায় সব ভুল শোধরাবার সময় পেতেন না। ফলে জিনিয়াসের সব উক্তি বোঝা যেত না। অবশ্যি তা আমাদের পূর্বজন্মকৃত পাপেরই ফল। ওঁর কোনও দোষ নেই।

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে দলবাজমণ্ডলী সব চেলাদেরই জিনিয়াস বলে ঘোষণা করতেন না। অনেক ক্ষেত্রেই 'আদর্শগত সমঝোতা'ই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে যথেষ্ট বলে ধরে নেওয়া হত। আর যাঁদের হাতে চাকরির কলকাঠি তাঁদের সঙ্গে আদর্শগত সমঝোতাসম্পন্ন মানুষ কখনওই দুর্লভ হওয়ার কথা নয়। আমার দুর্ভাগ্যবশত এই রকম এক আদর্শগত সমঝদার ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে নিমিত্তের ভাগী হতে হয়েছিল। ঘটনাটি এতই চমকপ্রদ যে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল।

হঠাৎ একদিন প্রগতিবাদীদের নেতৃস্থানীয় এক সহকর্মী, উপর্যুক্ত দুষ্ট জুটিটির একজন, আমার বাংলোয় পদধূলি দিলেন। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থতাবিহীন। তিনি জানালেন—সম্প্রতি যে একটি কলেজে লেকচারারের পদ খালি হয়েছে সেটি অমুক ব্যক্তিকে দিতে হবে। আমি বললাম—আগেভাগে এরকম ব্যবস্থা করা কীভাবে সম্ভব? আর যত দূর জানি—বি.এ এবং এম.এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে যে-ছেলেটি প্রথম হয়েছে, সেও ওই চাকরিটির উমেদার। তাকে ডিঙিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির মাঝামাঝি ডিগ্রি পাওয়া একটি মেয়েকে কী করে চাকরি দেওয়া যাবে? সহকর্মী তখন সমস্যাটা আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। মেয়েটির যোগ্যতা প্রধানত তার প্রগতিবাদ এবং প্রগতিবাদী নেতাদের প্রতি আনুগত্যে। এসব ব্যাপারে সে একেবারে খাঁটি সোনা। সুতরাং তার সুবিধে-অসুবিধে তো দেখতে হবে। সে তার বাগদত্ত ভাবী স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করে। মেয়েটির ভাবী স্বামী এবং সে দিল্লির দুটি কলেজে কাজ করে। ছেলেটি যে কলেজে কাজ করে সেই কলেজেই নতুন চাকরিটি খালি হয়েছে। এখন চাকরিটা মেয়েটি পেলে দু'জনে এক সঙ্গে আসা-যাওয়া করতে পারবে—ওদের নতুন কেনা মোটর সাইকেলে চেপে। ওদের এতে বিশেষ সুবিধে হবে। সামান্য ব্যাপার। আর প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ওই ছোকরা? ওকে ডেকে বলো ওকে অন্য চাকরি দেওয়া যাবে। এই অভূতপূর্ব প্রস্তাবে আমি হতবাক। আমার আমরণ লজ্জায় বিষয়—এই অনাচার আমি বন্ধ করতে পারিনি। যে অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে ওই নির্বাচক কমিটিতে গিয়েছিলেন, তিনি নির্দ্বিধায় প্রগতিবাদী নেতার প্রস্তাব অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি পাওয়া মেয়েটিকে চাকরিটি দিলেন। আমি সাক্ষীগোপাল হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে দেখলাম।

এই চরম দুর্নীতিপূর্ণ ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমার কিছুই বলার নেই। চেষ্টা করলেও এই অপকর্ম হয়তো থামাতে পারতাম না। কিন্তু চেষ্টা না করার সপক্ষে কোনও যুক্তিই ছিল না। আমার কর্তব্য ছিল সমস্ত ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে লিখে জানানো। কেন পারিনি? কারণ এই দুর্বৃত্তদের তখনও আমি বন্ধু বলে জ্ঞান করতাম এবং ওদের মুখোশ খুলে দেওয়ার মতো জোর ভিতর থেকে পেলাম না। ফলে এই বিশেষ ব্যাপারটাতে আমিও দলবাজদের হাতিয়ার হলাম। এ লজ্জা থেকে আমার আমরণ রেহাই নেই। আমার সৌভাগ্য—যার প্রতি অবিচার করা হয়েছিল তার শেষ অবধি খুব অনিষ্ট হয়নি। বর্তমানে সে জগদ্বিখ্যাত ঐতিহাসিক। কিন্তু মাফিয়াগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হওয়ার মাশুল তাকে এখনও দিতে হচ্ছে। যেখানেই 'রুটি-মাছ' বিলির ব্যাপারে ওই দুষ্টচক্রের হাত আছে, সেখানেই সব সুযোগ-সুবিধে থেকে সে আজও বঞ্চিত। আমার যে ক'টি ছাত্র সম্পর্কে আমি বিশেষ গর্বিত, এই মানুষটি তাদের একজন।

আগেই বলেছি ইতিহাস বিভাগে পড়াবার সময় যে পূতিগন্ধময় পরিবেশের মধ্যে আমাকে বাস করতে হয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে বিভাগীয় প্রধানদের সম্ভবত সেই ধরনের আবহাওয়া সহ্য করতে হয়নি। সুমিত সরকার যখন ওই কুর্সিতে বসলেন তখন তাঁকে নানা দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রোজ সকালবেলা এক গোছা অশ্লীল চিঠি পড়তে হয়নি। আমার এই দুর্ভোগ কেন ভুগতে হয়েছিল তা আমি বোঝার চেষ্টা করেছি।

আমি ওই বিভাগে যোগ দেওয়ার আগে আদর্শগত ঐক্যের নামে ইতিহাসের স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে এক দলবাজির ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বোধ হয় আশা করেছিলেন যে আমি স্বাভাবিক নিয়মে তাঁদের দলেই যোগ দেব। সেটা যখন ঘটল না, তখন যাঁদের কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ ছিল তাঁরা সবাই একত্র হলেন এবং ক্ষোভ প্রকাশের নিত্যনতুন উপায় বের করতে লাগলেন। তাঁরা যে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করতে কোনও দ্বিধা করতেন না, তার ব্যাখ্যা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদের সামাজিক সংস্কৃতির স্বরূপ। আর ক্ষমতাপন্ন মাফিয়া যা ঘটছিল তা সবই জানতেন। যদি এইসব অপকর্মে তাঁরা উৎসাহ নাও দিয়ে থাকেন, এই অনাচার বন্ধ করার জন্য যে অঙ্গুলিহেলনও করেননি, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। একটা তুলনা মনে পড়ল। বিদেশি শাসনের যুগে ইংরেজরা সম্ভবত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দেয়নি। কিন্তু দাঙ্গা বাধলে এক শ্রেণির ইংরেজ কর্মচারী যে বিশেষ প্রীত হতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

যত দূর মনে পড়ে ১৯৭১ সনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হাঙ্গামা চরমে ওঠে। যা ঘটছিল তাকে আন্দোলন বলে সম্মানিত করার কোনও কারণ নেই। তার একমাত্র পরিচয় সুপরিশীলিত গুন্ডামি। কে. এন. রাজ তখন উপাচার্য। তিনি শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে পদত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা অনেক শিক্ষকের সই সংগ্রহ করে ওঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করি। সে অনুরোধ রাখা উনি সম্ভব মনে করলেন না। সহ-উপাচার্য স্বরূপ সিং ওঁর পদে অভিষিক্ত হলেন।

এই জাঠ ভদ্রলোকটি আমার পাশের বাড়িতে থাকতেন এবং সব ব্যাপারেই উনি আমাকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাতে আমার খুব সুবিধে হয়নি। নিয়োগের ব্যাপারে মাফিয়াগোষ্ঠী যে চক্রব্যূহ রচনা করেছিল তা ভেদ করার ক্ষমতা ওঁরও ছিল না।

স্বরূপ সিং উপাচার্য হওয়ার পরদিন আমাদের জাঠ জমাদারনি চামেলি লম্বা এক ঘোমটা টেনে কাজে এল। কী ব্যাপার প্রশ্ন করায় সে জিভ কেটে উপাচার্যর বাংলোর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে জানাল, 'জেঠ লাগতা।' অর্থাৎ উপাচার্যও জাঠ এবং সেই সুবাদে তার সম্পর্কে ভাশুর। উল্লেখযোগ্য এই যে ভদ্রলোক বরাবরই আমাদের পাশের বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু তিনি উপাচার্য হওয়ার আগে পর্যন্ত চামেলি ভ্রাতৃবধূসুলভ শালীনতা প্রকাশের কোনও প্রয়োজন অনুভব করেনি।

'সাব-অলটার্ন' গোষ্ঠীভুক্ত গবেষকরা বলেন, বিদেশি শাসকদের ধামাধরা মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রভুদের কাছে শেখা তথাকথিত যুক্তিবাদের মোহে নিষ্কলুষ প্রাক-ঔপনিবেশিক চেতনা হারিয়ে ফেলে। চামেলি মারফত সেই প্রাক-ঔপনিবেশিক চেতনার রূপরেখা এবং ঘৃণ্য যুক্তিবাদের তুলনায় তার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হই। সে চেতনা ঔপনিবেশিক যুগের দাসভাবাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির তথাকথিত যুক্তিবাদের তুলনায় কত উন্নত তা বুঝে শ্রদ্ধায় নতমস্তক হই। আমাদের এক সহকর্মীর পত্নী পরিবার পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করতেন। চামেলি যখন তার দশম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করল, তিনি শঙ্কিত হয়ে ওকে ডেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিলেন। চামেলি পদদলিতা সর্পিণীর

মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আমাদের বাড়ি এসে তীব্র ভাষায় তার বিষোদ্গার করল।

সংক্ষেপে ওর বক্তব্য এইরকম। ওই চুড়াইল অর্থাৎ ডাইনি সত্যিকার পুরুষ মানুষের সাক্ষাৎ কখনও পায়নি। তার অপদার্থ স্বামী দুটির বেশি সন্তান প্রজননে অক্ষম। তাই ঈর্ষাতুরা ডাইনি স্বামীসৌভাগ্যবতী এবং বহু সন্তানগর্বে গর্বিতা চামেলিকে নজর লাগিয়ে অনিষ্ট করার তালে আছে। ও বাড়ি ফিরেই এর প্রতিকার করবে। জবরদস্ত ওঝা ডেকে চুড়াইলের বিষ ঝাড়বে। তিন দিনের মধ্যে চুড়াইল রক্তবমি করে মারা যাবে। ভদ্রমহিলা ওঝার অপরিসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও বেঁচেই ছিলেন। এবং চামেলির সন্তান সংখ্যাও ক্রমবর্ধমানই থাকে।

ইতিহাস বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেন্ট অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভ্য হই। সেখানকার কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ সত্যিই বিস্ময়কর। কয়েকজন কলেজ-শিক্ষক প্রতিষ্ঠানটিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কুস্তি লড়ার আখড়া মনে করতেন বলে মনে হয়। তাঁরা নানা বিষয়ে তাঁদের মতামত তারস্বরে ঘোষণা করতেন এবং সভাপতি বারবার অনুরোধ করলেও আসনে বসে পড়তে রাজি হতেন না। তখন সভাপতিও তারস্বরে 'সিট ডাউন' 'সিট ডাউন' বলে চিৎকার করতে থাকতেন। এই প্রতিযোগিতায় রেফারি না থাকায় কারও সুস্পষ্ট জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিরোধিতার বিষদন্ত উৎপাটনের এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। যারা সবচেয়ে বেশি গোলমাল করত, তারা সম্পূর্ণ উন্মাদ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আনকোরা প্রশাসনিক পদে তাদের বসিয়ে দেওয়া শুরু হল। নীতিটা সুচিন্তিত বলে আমার মনে হয়নি। কারণ নতুন নীতির আওতায় বিরোধ-ভক্তির বান ডাকল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আয়ের বেশ একটা দশাসই অংশ এই অভিনব উপায়ে অপদেবতা শান্তির জন্য ব্যয় হতে লাগল।

ইতিহাস বিভাগের যে আবহাওয়া এখন অবধি বর্ণনা করেছি তাকে কোনও অর্থেই স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ অবিচলিত থেকে কয়েকটি মানুষ সযত্নে এবং সানন্দে কাজ করে যান। অনেক বছরের ব্যবধানে তাঁদের প্রতি এই লেখার মাধ্যমে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই বিদ্যাচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের কেন্দ্রে ছিলেন পার্থসারথি গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী নারায়ণী। পার্থ আত্মপ্রচারের বিদ্যা রপ্ত করেননি। আমাদের প্রচারপ্রিয় এলিট সংস্কৃতিতে তাঁর যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পাননি। কিন্তু কোনও ব্যর্থতাই তাঁকে দেবী সরস্বতীর অঞ্চলাশ্রয় থেকে উদ্বাস্তু করতে পারেনি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েও তিনি তাঁর বিদ্যাচর্চায় কখনও ত্রুটি করেননি। শেষ জীবনে ওঁর অতি সযত্নে সম্পাদিত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক দু'খণ্ড আকরগ্রন্থ গৈরিক বাহিনী চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। মনে হয় তার প্রধান কারণ ওই দলিল সংগ্রহে বিদেশি সরকারের সঙ্গে আর.এস.এস-এর দহরম-মহরম বিষয়ে প্রচুর তথ্য ছিল। রাজা বদল হওয়ায় এই অপচেষ্টা সফল হয়নি। পার্থ এবং নারায়ণী বহু বাধা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইতিহাস বিষয়ক যাবতীয় নতুন বই এবং পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতেন—এবং তা একাধিক ভাষায়। পার্থ জার্মান আর ফরাসি ভাষা ভালভাবে শিখেছিলেন। মার্কসবাদী হিসাবে জীবন শুরু করেও পরিণত বয়সে তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাস হারান। পড়া এবং পড়ানোয় এত আনন্দ পেতে আমাদের প্রজন্মের

কোনও মানুষকে আমি দেখিনি। কোনও ব্যর্থতাই তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারত না। আর ওই দম্পতিটির দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্থায়ী অবদান ছিল। ওঁরা কিছু ছাত্রছাত্রী বেছে নিয়ে তাঁদের বিশেষ করে পড়াতেন যাতে তারা বিষয়ের গভীরে ঢুকতে পারে। এঁরা পরবর্তীকালে দিল্লির নানা কলেজে শিক্ষকতা করে ইতিহাস শিক্ষার মান সত্যিতেই উঁচুতে তুলেছিলেন।

আমি যে বছর অক্সফোর্ড চলে যাই, সেই বছর দেশে ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সরকার কিছু নতুন নীতি অবলম্বন করেন। ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও যখন শিক্ষামন্ত্রী তখন তিনি একটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ডক্টর আর. সি. মজুমদার-সম্পাদিত বারো খণ্ডে প্রকাশিত ভারতীয় ইতিহাস দেশের চোদ্দোটি ভাষায় অনুবাদের জন্য উনি তিন কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। এই বহু খণ্ডে প্রকাশিত ইতিহাস কোনও দিক থেকেই দোষমুক্ত ছিল না। আদর্শের দিক থেকে রমেশবাবু মুসলমানবিদ্বেষী, দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ওঁর সম্পাদিত বইটিতে আর একটি প্রবণতা ছিল বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা এবং বাঙালির প্রতি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের নানা অন্যায় নিয়ে আলোচনা। সম্ভবত এইসব কথা ভেবেই নতুন প্রগতিপন্থী শিক্ষামন্ত্রী ওই গ্রন্থাবলী অনুবাদের সিদ্ধান্ত এক রকম বাতিল করে সেই টাকা নিয়ে কী করা হবে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কমিটি বসান। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত প্রগতিপন্থী নেতারা সবাই এই কমিটিতে ছিলেন। সম্ভবত তখনও এঁরা সবাই আমাকে শত্রুজ্ঞান করতে শুরু না করায়, এবং নতুন মন্ত্রীমশায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম বলে আমিও এই কমিটির সভ্য মনোনীত হই।

এই কমিটির সভ্য হয়ে আমার ভুয়োজ্ঞান বেড়ে তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হল এবং 'মা কী হইতেছেন' সে বিষয়ে দিব্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলাম। প্রথম দিনের মিটিংয়ে আলোচ্য বিষয়— রমেশবাবুর সম্পাদিত বইগুলি অনুবাদ করা হবে কি না। যদিও বুঝলাম যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েই গিয়েছে, তবু আমি একটা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করি। আমার বক্তব্য যে ওই বইগুলি নানা দোষ সত্ত্বেও এক বিরাট কীর্তি। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল তথ্যগুলি এত সহজে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব না। সুতরাং অনুবাদ প্রচেষ্টাটি সম্পূর্ণ খারিজ না করে প্রতিটি খণ্ড এবং পরিচ্ছেদের প্রথমে নবলব্ধ জ্ঞান আর নতুন বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্তসার জুড়ে দিয়ে প্রস্তাবিত অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া। এই রকম উলটো কথা বলায় কমিটির অন্য সভ্যরা একটু অপ্রস্তুত হলেন। বিষয়টা আলোচনার জন্য আর একটি মিটিংয়ের দিন ধার্য করা হল। মিটিংয়ের দিন খবর পেলাম—সময় এবং মিটিংয়ের জায়গা বদল হয়েছে আমাকে না জানিয়ে। আমি যথা সময়ে সেই নয়া সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার আবির্ভাবে জনৈক সভ্য খিকখিক করে হাসতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হল, এবং সিদ্ধান্ত হল যে ওই তিন কোটি টাকা দিয়ে ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিসার্চ কাউন্সিল স্থাপিত হবে। কাউন্সিলের প্রথম কাজ হবে বাছা বাছা কিছু বই ওই চতুর্দশ ভাষায়ই অনুবাদ করা।

তারপর যা শুরু হল তাতে আমি সত্যিই হতবাক। কোনও প্রস্তুতি বা পূর্ববর্তী আলোচনা ছাড়াই কোন কোন বই ছাপা হবে তার তালিকা প্রস্তুত করা শুরু হল। কোনও বিদ্বৎসমিতি

যে এত বড় গুরুদায়িত্ব এত লঘুভাবে পালন করার চেষ্টা করতে পারেন তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। বলা বাহুল্য, টেবিলের চারপাশে যাঁরা বসে ছিলেন প্রথমে তাঁদের যাবতীয় লেখা অনুবাদের লিস্টে উঠল। আমিও এই লঙ্কাভাগ থেকে বাদ পড়লাম না। আমার একটি বই অনুবাদের প্রস্তাব হলে আমি আপত্তি করলাম, কারণ ওই বইটি সম্পর্কে আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই। তারপর নেতৃবৃন্দের চেলা-চামুণ্ডাদের নিতান্তই খাজা রচনাবলি লিস্টে উঠল। 'মা কী হইবেন' তার স্পষ্ট আঁচ পেলাম যখন আমি ধর্মা কুমারের 'ল্যান্ড অ্যান্ড কাস্ট ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া' নামে বইটি তালিকাভুক্তির প্রস্তাব দিলাম। কেমব্রিজে প্রাইজ পাওয়া এই বইটি ইংরেজ শাসনের কুফল বিষয়ে আমাদের প্রচলিত কিছু ধারণার বিরোধী। বইটির সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি আমিও নানা কারণে মানতে পারিনি। কিন্তু তা বলে বইটির একটি অসাধারণ গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি কোনও মতেই খারিজ করা চলে না। আমি প্রস্তাবটি করা মাত্র কিছু লোক 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন, যদিও তাঁদের আপত্তির কারণ কেউ ব্যাখ্যা করেননি। ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা কোন পথে যাবে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে আমি অক্সফোর্ড রওনা হই। উল্লেখযোগ্য এই যে, যত দূর জানি ওই তালিকার কোনও বই-ই চোদ্দো কেন, চার ভাষায়ও অনূদিত হয়নি। ইতিহাস কংগ্রেসে প্রস্তাবিত বহু খণ্ডে প্রকাশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও একই হাল হয়। লাভের মধ্যে রমেশবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থমালার অনুবাদ মারফত ইংরেজি না জানা পাঠক ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হলেন। ওই গ্রন্থমালার দোষগুলি শুধরে পাঠকসাধারণের কাছে উপস্থিত করা কোনও মতেই অসম্ভব ছিল না।

আমার শিক্ষক কলিন ডেভিস অক্সফোর্ড থেকে অবসর নেওয়ার পর অধ্যাপক ব্যাশাম আমাকে একটি চিঠি লেখেন। ওঁর বক্তব্য যে, পদটির জন্য দরখাস্ত করলে আমার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু কাজটি আমি পাইনি। যাঁর পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক ছিল, সেই কেনেথ বলহ্যাচেটেই পদটি পান। উনি লন্ডন চলে গেলে ডক্টর গোপাল অক্সফোর্ডে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের রিডার নিযুক্ত হন। যখন কমনওয়েলথের ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ খালি হয়, তখন গোপাল সাহেব ওই পদের জন্য দরখাস্ত করেন। পদটি পান রবিনসন। গোপাল পদত্যাগ করে দেশে ফিরে আসেন।

এবার যখন পদটি আবার বিজ্ঞাপিত হল, তখন অনেক ভারতীয় শিক্ষাবিদ দরখাস্ত করেন। এ যাত্রা আমি করিনি, কারণ আমার ধারণা হয়েছিল যে এই জাতীয় পদে নির্বাচকরা প্রথমেই মনস্থির করে নেন কাকে বা কী জাতীয় লোককে তাঁরা চান। কারণ ওইসব পদের জন্য যাঁদের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সুতরাং আগের থেকেই সফল কর্মপ্রার্থী বেছে নেওয়ার মধ্যে কোনও দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে না। আমার যে ধরনের কাজ তা তাঁদের পছন্দ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং শুধু শুধু দরখাস্ত করে লাভ নেই। বিশেষত তখন আমি দিল্লিতে সিনিয়র অধ্যাপক। এই সময় কেমব্রিজের অধ্যাপক প্রয়াত এরিক স্টোকস দিল্লি এসেছিলেন। সবাই জানত যে উনি এই পদটির জন্য যে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে তাঁর অন্যতম সভ্য। চাকরিটির জন্য উমেদার কারও বাড়িতে ওঁর নেমন্তন্ন হলেই তা নিয়ে খুব একটা হাসাহাসি হত। এরিকের সঙ্গে এর আগে

আমার পরিচয় হয়নি। ওঁকে একটা সেমিনার দিতে ডাকি। তখনই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়।

এরিক স্টোকস ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁর বক্তব্য ওই রিডারশিপের ব্যাপারে আমার আগ্রহ থাকলে উনি আমার নাম প্রস্তাব করতে চান। আমি পত্রপাঠ উত্তর দিই—হ্যাঁ, ওই কাজ পেলে আমি নিশ্চয়ই নেব। তবে কয়েকটি শর্ত আছে। তার মধ্যে প্রধান কথা—নিশ্চিত না হয়ে উনি যেন আমার নাম প্রস্তাব না করেন। কারণ আমি আমার বয়সে এবং দেশে যে পদে আছি তার গুরুত্ব চিন্তা করে অসফল উমেদারের পরিচয় গ্রহণ করতে গররাজি। মাস চারেক পরে হঠাৎ চিঠি পেলাম—আমি মনোনীত হয়েছি এবং বেতন ইত্যাদির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রস্তাবিত শর্তগুলি মেনে নিয়েছেন। আর আমি রিডারশিপ ছাড়া সেন্ট এন্টনিস কলেজের প্রফেসরিয়াল ফেলো নির্বাচিত হয়েছি। আমি চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য কিছু সময় চাইলাম। ১৯৭৩ সনের ২০ জানুয়ারি আমি দিল্লির পাট গুটিয়ে অক্সফোর্ড রওনা হলাম। কয়েকটি মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া ভারি সুন্দর বাড়িটা, সেখানে আমাদের তৈরি সুন্দর বাগান (যেখানে আমরা ষাট রকমের গোলাপের গাছ পুঁতেছিলাম) আর অল্প কয়েকটি বন্ধুকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওই শহরের অস্বাভাবিক সামাজিক আবহাওয়ায় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। প্লেনে উঠে আমি এক গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এই পরিচ্ছেদের একটি সংক্ষিপ্ত এপিলগ লেখা প্রয়োজন। আমার নিয়োগপত্র যখন আমার হাতে পৌঁছয় সেই সময় আমার এক তথাকথিত বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। খবরটি ওঁকে পড়ে শোনালাম। মানুষটির মুখ দৃশ্যতই কালো হয়ে গেল। তারপর তিনি উক্তি করলেন, 'আপনি চলেই যান। আপনার তো কোনও রুটস নেই।' কেন আমি শিকড়বিহীন হলাম এবং এই ব্যক্তি কীভাবে দেশের মাটিতে শিকড় গজালেন, সে কথা আজও আমার কাছে রহস্য রয়ে গেছে। নতুন ক্ষমতাচক্রের এই জ্যোতিষ্কটি অক্সফোর্ডের চাকরিটির জন্য উমেদার ছিলেন— একথা পরে জানতে পারি। পেলে কি তিনি শিকড়ের টানে দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতেন?

যাঁরা আমার বিরুদ্ধে পত্রাঘাতযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন তাঁরা শিকার হাতছাড়া হচ্ছে দেখে নতুন ধুয়া তুললেন। দেশের একজন সিনিয়র অধ্যাপক বিদেশে রিডার হয়ে চলে যাচ্ছে এতে দেশের ঘোর অপমান হচ্ছে। ওঁদের দলস্থ নেতা যখন অনুরূপ পাপকর্ম করেন তখন এঁরাই কিন্তু উদ্বাহু হয়ে নেচেছিলেন। যাঁরা কথাটা জানেন না তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই সারা পৃথিবী থেকে বহু শিক্ষাবিদ উচ্চতর পদ ছেড়ে অক্সফোর্ডে কাজ করতে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির খ্যাতি তার একমাত্র কারণ নয়। ওখানকার জীবনধারার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা যে-কোনও শিক্ষাব্রতীর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও তার তুলনীয় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া দুষ্কর। জীবনে যদি কখনও কোনও সুবুদ্ধির কাজ করে থাকি তো তার প্রথম সারিতে দিল্লি ছেড়ে অক্সফোর্ড যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ওই যে গোষ্ঠীবিশেষ ধরে নিলেন যে পঁচিশ বছর দেশে পড়াবার পর অক্সফোর্ড চলে গিয়ে আমি মহাপাপ করেছি সেই ধুয়া তাঁরা ছাড়লেন না। এ দেশে যে-কোনও প্রসঙ্গে আমার নাম প্রস্তাবিত হলেই এঁরা বলেন, 'উনি তো চলে গেছেন।' এই নারা যাঁরা জিকির

দেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হচ্ছেন সেই ব্যক্তিটি যিনি আমার শিকড়হীনতার কারণে আমাকে বিদেশ চলে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই মানুষগুলি তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার করবেন তাতে কিঞ্চিৎ বিরক্তি লাগলেও সত্যিতে ক্ষোভের কোনও কারণ নেই। সাপ ছোবল দেবে, খাটাস দুর্গন্ধ ছড়াবে, দুর্জন দুর্জনোচিত ব্যবহার করবে—এসব নিয়ে মনস্তাপ করা নেহাতই মূর্খামি। আমার শুধু দুঃখ একটি কারণে। ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে-মানুষটিকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি এখন শুনি তিনিও এই দুষ্টচক্রে যোগ দিয়েছেন। বিদ্যায় চরিত্রগুণে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় মানুষ আমি বেশি দেখিনি। তবে আশৈশব শুনছি—দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। তিনি যদি সত্যিই এই মানুষগুলির সঙ্গে পড়ে এদের নানা নোংরা কাজে শামিল হয়ে থাকেন তো দুর্ভাগ্য শুধু আমার না, সমস্ত দেশের। ওঁর বিষয়ে অভিযোগগুলি সত্যি হলে জানব আমাদের এই পবিত্র মাতৃভূমিতে সৎ লোক বেশি দিন সৎ থাকতে পারে না।

উৎক্ষতারণ, ১৯৭৩-১৯৯৩

হাড় কাঁপানো শীত আর স্যাঁতসেঁতে বৃষ্টির এক রাত্রে পালম হাওয়াই আড্ডা থেকে ইংল্যান্ড রওনা হলাম। দিল্লি আমাকে কোনওদিনই আকর্ষণ করেনি। সুতরাং ওই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি একথা ভেবে কোনও দুঃখবোধ হচ্ছিল না। বরং গত দু' বছরের কথা স্মরণ করে একটা নিষ্কৃতির অনুভূতি হওয়ারই কথা। নিষ্কৃতি, অতএব এক ধরনের শান্তি বা আনন্দবোধ হবে আশা করেছিলাম। কিন্তু শরীর-মন ক্লান্তি আর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল। আর কিছু প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কটা আলগা হয়ে যাবে ভেবেও একটু বিষণ্ণ লাগছিল। বাচ্চাদের সঙ্গে আমার সহজেই দোস্তি জমে। চামু শ্রীনিবাসের দুই কন্যা, বয়স যথাক্রমে এগারো এবং সাত, তারা আমার প্রতিবেশী এবং বিশেষ বন্ধু। আবার যতদিনে দেখা হবে ওরা বোধ হয় তখন দূরের মানুষ হয়ে যাবে। রওনা হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে ফোনে খবর পেলাম—আঁদ্রের প্রথম সন্তান একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। ভাবলাম—এই নবাগতা মানুষটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কোনও সম্ভাবনা রইল না। আরও মনে হল—ছেড়ে যাচ্ছি তো শুধু দিল্লি না, নিজের দেশ। তথাকথিত বন্ধুটি হিসেবে ভুল করেছিলেন। এই দেশের জীবনে আমার শিকড় বড় বেশি গভীরে চলে গেছে। তা উৎপাটন করে কাঙ্ক্ষিত জীবনে তাঁবু পাতা বেদনাহীন হবে, এমন কথা আমি কী করে ভেবেছিলাম!

হিথরো পৌঁছে ইমিগ্রেশনে যে অভ্যর্থনা পেলাম তাতে মনটা আরও দমে গেল। যে কর্মচারীটি আমাদের ইংল্যান্ড প্রবেশের দ্বার মুক্ত করবেন, বুঝলাম তিনি আমাদের কাগজপত্র দেখে রীতিমতো বিরক্ত। মনে হল—আরও একটা অশ্বেত পরিবার তাঁর পুণ্য জন্মভূমিতে বাস করতে আসছে এতে উনি মোটেই খুশি না। তিনি আমাদের হেনস্থা করবার অজুহাত খুঁজতে লাগলেন।

বিলেতে চাকরি নিয়ে দীর্ঘদিন বাস করার ব্যাপারে একটা পরস্পরবিরোধী নিয়ম ছিল।

হাইকমিশনের নিযুক্ত ডাক্তার কর্মপ্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট সিল করে তার সঙ্গে দিয়ে দেন। তারই কপি দেখে হাইকমিশন ইংল্যান্ডবাসের অনুমতি দেন। সিল করা রিপোর্টটি ইমিগ্রেশন অফিসারকে দিতে হয়। কিন্তু যিনি চাকরি করতে যাচ্ছেন তাঁর পরিবারস্থ লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না। তাঁদের ক্ষেত্রে কী বিধেয় তা ইমিগ্রেশন অফিসারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও বিদঘুটে দাঁড়িয়েছিল। আমার কন্যার জন্ম ইংল্যান্ডে। সুতরাং সে কার্যত ইংল্যান্ডের নাগরিক। তার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ইমিগ্রেশন অফিসারটি বেশ দাঁত কিড়মিড় করে স্বগতোক্তি করলেন, 'আই ক্যান ডু নাথিং অ্যাবাউট হার। বাট ইওর ওয়াইফ উইল হ্যাভ টু হ্যাভ এ হেলথ এক্সামিনেশন বিফোর আই অ্যাল্যাউ ইউ টু এনটার ব্রিটেন।' তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। আমার এগারো বছরের কন্যা ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন। ও কাঁদতে শুরু করল। অফিসার আরও দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'স্টপ হার।' প্লিজ-টিজের কোনও বালাই নেই। আমি বললাম, 'ইউ ট্রাই অ্যান্ড ডু দ্যাট।' আমাদের হাওয়াই আড্ডার ডাক্তারের কাছে পাঠানো হল। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিব্রত, কারণ ব্যাপারটা কী হচ্ছে তা তাঁর বুঝতে বাকি থাকেনি। তিনি নামমাত্র পরীক্ষা করে আমাদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে রাত বারোটা বেজে গেছে। পরমেশ রায় আমাদের নিতে এসেছিল। সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছে। একটা ট্যাক্সি ধরে অক্সফোর্ড পৌঁছলাম।

পৌঁছে যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হল তাতে সত্যিই দমে গেলাম। কলেজ আমার জন্য যে ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করেছে তাতে দুটি ছোট ছোট শোওয়ার ঘর আর একটি বসবার, খাওয়ার ঘর। জানুয়ারি মাসের শীত। ফ্ল্যাটটিতে হিটিং চালিয়ে রাখা হয়নি। ফলে সব কিছু বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আছে। ভাবলাম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ-সাতটি নিমগাছ আর মস্ত বড় বাগানওয়ালা দোতলা বাড়ি ছেড়ে এই ফ্ল্যাটে থাকবার জন্য আমি অক্সফোর্ডে চাকরি নিয়ে এসেছি! এর চেয়ে তো ছাত্রাবস্থায়ও এখানে ভাল থেকেছি! রাতে ভাল ঘুম হল না। পরদিন কলেজ গিয়েও যে অভ্যর্থনা পেলাম তাকে ঠিক উষ্ণ বলা চলে না। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে নতুন কাজ নিয়ে যারা আসে সবাইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ছোটখাটো একটা পার্টির ব্যবস্থা হয়। এমনকী স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজেও ফিলিপস সাহেব আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে ককটেল পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে দেখি নবাগতর অস্তিত্ব যথাসম্ভব ভুলে থাকাই স্থানীয় সামাজিকতার প্রধান লক্ষণ। আমি ধরে নিলাম—কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার সহকর্মীরা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। বোধ হয় আমার অজান্তে আমি অদৃশ্য মানুষ হয়ে গিয়েছি।

যা হোক, প্রথমে কলেজের যাবতীয় ঐহিক ব্যাপারের ব্যবস্থাপক বারসারের সঙ্গে দেখা করে বললাম, ওই ফ্ল্যাটে থাকা আমার চলবে না। অন্যতম কারণ, শিগগিরই আমার মা-বাবা আসবেন। অতএব অন্যতর ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কর্তা বললেন—চিন্তা করো না। ব্যবস্থা হবে। তারপর কলেজের অধিনায়ক অর্থাৎ ওয়ার্ডেন রেমন্ড কারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। স্পেনের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বিরাট পণ্ডিত এই মানুষটির উৎকেন্দ্রিক বলে খ্যাতি

ছিল। শোনা যায় একবার সুইডেনে বেড়াতে গিয়ে ওঁর টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক এক রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ নিয়েছিলেন। তখন উনি নিউ কলেজের ফেলো। হাতে তোয়ালে ঝুলিয়ে কার সাহেব খাদ্য পরিবেশনে ব্যস্ত। হঠাৎ দেখেন অক্সফোর্ডের এক সহকর্মী এক টেবিলে বসে খাচ্ছেন। তোয়ালেটি মুখে জড়িয়ে উনি রান্নাঘরে আশ্রয় নেন। তবে ক্ষতি যা হওয়ার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে। মানে ওঁর এই শ্রমিক জীবনের খবর অক্সফোর্ডে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কেউ যে তাতে খুব অবাক হল এমন না।

কার সাহেব প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'আমরা না এলে তোমাদের কী হত মনে হয়?' আমি গ্লাডস্টোনের এক বিখ্যাত উক্তির অনুকরণে বললাম, 'যদি এখনই এই প্রশ্নের উত্তর চাও তো গোটা পঞ্চাশেক সম্ভাবনার কথা বলতে হবে। একদিন সময় পেলে সংখ্যাটা গোটা দশেকে নামাতে পারি।' আলোচনা এর বেশি আর এগোয়নি।

সি. এস. লুইসের মার্কিন পত্নীকে অক্সফোর্ড কেমন লাগছে প্রশ্ন করায় ভদ্রমহিলা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বড্ড ঠান্ডা। আর কথাটা আবহাওয়া সম্পর্কেও সত্যি।' ওখানে পড়াতে এসে নৈসর্গিক আবহাওয়ার তুলনায় মানবিক পরিবেশ অনেক বেশি শীতল মনে হচ্ছিল। ভাবলাম—এ কোথায় আইয়া পড়লাম? দিন তিনেক রোজ কলেজে লাঞ্চ খাচ্ছি। কেউ কোনও কথাবার্তা বলে না। তারপর হঠাৎ একজন সহকর্মী আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলেন। 'ইউ আর রায়চৌধুরী? নো?' উত্তর দিলাম, 'ইনডিড ইয়েস।' মনে মনে বললাম—আমার আবির্ভাব যে তোমার নজরে পড়েছে এ জন্য আমার ঊর্ধ্বতন চোদ্দো পুরুষ তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ক্রমে অবস্থার কিছু উন্নতি হল। গভর্নিং বডির মিটিংয়ে ওয়ার্ডেন আলতোভাবে আমার আগমন ঘোষণা করলেন। দু-একজন আমার দিকে তাকিয়ে সম্ভাষণ বাবদ স্মিত হাস্য করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে কর্মসূত্রে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল।

ইতিমধ্যে বিপদ ঘনাল অন্য এক দিক থেকে। এক দিন ঘুম থেকে উঠে কন্যা বললেন, এখানকার ইস্কুলে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য একটি পাবলিক স্কুলে ডে স্কলার হিসেবে ওকে ভর্তি করেছি। ব্রিটেনে সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা বিনা মাইনেয় পড়ে। পাবলিক আর গ্রামার স্কুলগুলিতে মাইনে দিয়ে পড়তে হয়। আমার মেয়ে যে স্কুলে পড়ছিল সেখানে অনেক ছাত্রী স্কুলের বোর্ডিংয়েই থাকে। তবে আমার মেয়ের মতো বেশ কিছু ছাত্রী আবার বাড়িতে থেকেও স্কুলে যাওয়াআসা করে। আমার মেয়ের বিদেশে স্কুলে পড়তে গিয়ে কালচার শক হবে এটা আমি আশঙ্কা করিনি। কারণ এর আগে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় খুব খুশি হয়েই ও স্কুলে গিয়েছে। ওর বক্তব্য—এখানকার মেয়েরা যেন কেমন! তারা ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। একেবারেই ফ্রেন্ডলি না। একজন জিগ্যেস করেছে— ওর বাবা বাস চালায়, না কারি শপে রান্না করে। বালিকাটি এক রিজিয়াস প্রফেসরের কন্যা। আমি বললাম— ওর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওর ভাল না লাগলে অন্য স্কুলের খোঁজ করব। সেখানেও যদি না পোষায় তো কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরে যাব। সৌভাগ্যক্রমে এই রকম এসপার-ওসপার কিছু করার শেষ পর্যন্ত কোনও প্রয়োজন হয়নি। সপ্তাহখানেক পর মেয়ে জানাল— ঠিক আছে। কিন্তু সত্যিতে ওই স্কুলে ও খুশি ছিল না। পরে ষোলো বছর বয়সে অন্য আর একটি স্কুলে গিয়ে ও বাঞ্ছনীয় পরিবেশ খুঁজে পায়।

অক্সফোর্ডে পড়াতে গিয়ে আমি যা আশা করেছিলাম তা কি পেয়েছিলাম? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর, 'হ্যাঁ।' তার প্রথম কারণটা নেতিবাচক। দিল্লির ইতিহাস বিভাগের শ্বাসরোধকারী অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের কোনও মফস্বল কলেজেও পড়াতে যেতাম, তাহলেও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারার অভিজ্ঞতাটাই যথেষ্ট সুখের কারণ মনে হত। এখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে ছাড়া পাওয়াটা বিশেষ আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল। যেটা জানা ছিল না, তা হচ্ছে অক্সফোর্ডের কমিটি প্রথা। যে-কোনও দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সিদ্ধান্তগুলি কোনও না কোনও কমিটির হাতে। আমিও গিয়েই দেখি আমি গোটা দশেক কমিটির সভ্য। এতে কিছুটা সময় নষ্ট হত ঠিকই, কিন্তু ইংরেজরা কোনও ব্যাপারেই অকারণে বাক্যব্যয় করে না, সুতরাং কমিটির কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। আর আমি প্রথমেই ঠিক করে নিই যে প্রশাসনিক ব্যাপারে অকারণ উৎসাহ দেখাব না। ফলে অতিরিক্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপানো হয়নি। একটা ব্যাপার অত্যন্ত একঘেয়ে লাগত—কলেজে গভর্নিং বডির মিটিং। দু ঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এই পাক্ষিক মিটিংয়ে নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। ঘরের কাচের দেওয়ালের ওপারে বাগান দেখা যেত। মিটিংয়ের সময়টা আমি প্রকৃতির পূজায় কাটাতাম।

শুধু একটি দিন গভর্নিং বডির মিটিং সত্যিই উপভোগ করেছিলাম। যখন কলেজের সব শিক্ষক বা ফেলোরাই পুরুষ, তখন প্রতি টার্মে একটা সন্ধ্যা লেডিস নাইট হিসাবে উদ্‌যাপিত হত। সেই দিনকার সান্ধ্যভোজনে ফেলোরা তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে আসতেন— কলেজেরই খরচায়। একটি মহিলা কলেজের ফেলো নির্বাচিত হওয়ায় এ ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ল। আমন্ত্রণপত্রে কী লেখা হবে? 'লেডিস নাইট' তো আর লেখা যাবে না। প্রস্তাব হল সে জায়গায় 'ফেলোস অ্যান্ড দেয়ার স্পাউসেস' লেখা হোক। বারসার একটু গলা ঝেড়ে বললেন 'উঁহুঁ, ওটা চলবে না। স্পাউস অর্থ বিবাহিত/বিবাহিতা সঙ্গী/সঙ্গিনী। সব ফেলোরা বিবাহসংস্কারে বিশ্বাস করেন না। আর এ যুগে অবিবাহিত/অবিবাহিতা সঙ্গী/সঙ্গিনীদের বাদ দেওয়া চলবে না।' এক ফেলো প্রস্তাব করলেন, 'তা হলে ফেলোস অ্যান্ড বেড ফেলোস লেখা হোক। তাহলে আর আপত্তির কিছু থাকবে না।' আবার বারসারের গলাখাঁকারি। ওয়ার্ডেন বিরক্ত। আবার কী হল? বারসার বললেন, 'কোনও কোনও ফেলোর বেড ফেলো একাধিক। খরচে পোষাতে পারব না।' সিদ্ধান্ত হল 'ফেলো অ্যান্ড ওয়ান ফ্রেন্ড'-কে নেমন্তন্ন করা হবে। হ্যাঙ্গাম চুকে গেল। শুধু ওয়ার্ডেন অর্ধস্ফুট কণ্ঠে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করলেন। 'কেউ আবার রাস্তা থেকে ফ্রেন্ড তুলে নিয়ে না আসে।'

মানুষে মানুষে সম্পর্কে উষ্ণতার অভাব যদি ইংরেজদের সামাজিক জীবনের নেতিবাচক দিক হয়, তবে তার কষ্টটা পুষিয়ে দেয় ওদের সুসভ্য ভদ্রতা। গভর্নিং বডির মিটিংয়ে অন্তঃসলিলা বিরোধের আভাস প্রায়ই পেতাম, কিন্তু কখনও কাউকে কণ্ঠস্বর এক ডেসিবেলও উঁচুতে তুলতে শুনিনি। একটু উষ্মার স্বর শুনলেই ওয়ার্ডেন সাবধানবাণী শোনাতেন, 'নাউ নাউ, লেট আস কিপ অন অ্যান ইভ্‌ন্ কিল।' আমার দিল্লির অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রচণ্ড চেঁচামেচি স্মরণ হত। আর যেখানে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা নেই, সেখানে ইংরেজরা সহজভাবে মিশতে কোনও দ্বিধা করে না। আমার ধারণা হয়েছে ওরা অন্তরঙ্গতা,

নিজেকে অন্যর সামনে মেলে ধরা সম্বন্ধে একটা গভীর লজ্জা বা ভয় পোষণ করে। একটা গণ্ডির ভিতরে থেকে হাত বাড়িয়ে মনোমতো মানুষের সঙ্গে করমর্দন করতে ওদের দ্বিধা নেই। এবং ওই সীমিত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আদর্শ পরিবেশ জোগায় কলেজ যা সামাজিক সংস্কৃতির দিক থেকে ওদের ক্লাবেরই সমগোত্রীয়।

আমি পেটুক মানুষ। কলেজের হাই টেবিলের খানা আমার অনাবিল আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সারা পৃথিবীতে একটা ভুল ধারণা আছে যে ইংরেজদের খাওয়া নিতান্তই অখাদ্য। আসলে কিছুদিন আগে অবধি মধ্যবিত্ত ইংরেজ কী খাচ্ছে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে সংস্কৃতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। লন্ডনের যে পাড়ায় আমার মেয়ে থাকত সেই ইসলিংটনে ঊনচল্লিশটি দেশের খাবার রেস্টুরেন্ট এবং ডেলিকাটেসেনে পাওয়া যায়। আর তার প্রভাব ইংরেজদের রান্নায়ও পড়েছে। নানান সস আর বিজাতীয় সব তরিতরকারি পরিগ্রহণ করে মডার্ন ব্রিটিশ কুইজিন পৃথিবীর সেরা রন্ধনশৈলীগুলির একটি বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু আমি তার কথা বলছি না। ওই দেশে শ্রমিকশ্রেণি যে ব্যাঙ্গার আর ম্যাশ অর্থাৎ সসেজ এবং আলুভর্তা বা ফিশ অ্যান্ড চিপস খায়, দৈনন্দিন খাদ্যের ভিতরে স্বাদে তার সঙ্গে তুলনা হয় পৃথিবীর অন্যত্র এরকম খাওয়ার কমই খেয়েছি। পাঁচ মহাদেশে নানা খাদ্য-অখাদ্য নির্বিচারে খেয়ে ভেবেচিন্তেই একথা বলছি। আর অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে, ফার্ম হাউসে এবং গ্রামাঞ্চলের পাব বা শুঁড়িখানায় পুদিনার সস সহ কচি ভেড়ার রোস্ট বা নোনতা ইয়র্কশায়ার পুডিংয়ের সঙ্গে রোস্ট বিফ, নানা রকমের সুপ আর পুডিং রসনায় সত্যিই স্বর্গের স্বাদ বয়ে আনে। এগুলি খাঁটি ইংরেজি খানা। আসলে অস্তমিত সাম্রাজ্য ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়েই ইংরেজরা নিজেদের মাহাত্ম্য বিষয়ে ঢাক বাজাতে গররাজি। আত্মপ্রচার ওদের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। (নিজেরা নিজের ঢাক পেটায় না বলে ওরা আত্মপ্রচারের সংস্কৃতিটা একেবারেই বুঝতে পারে না। চোর-ধাঁউর না এরকম কোনও লোক যদি নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করে তো বেশির ভাগ ভদ্র ইংরেজ তার কথাগুলি আক্ষরিক অর্থে সত্যি বলেই গ্রহণ করেন। এক ব্যক্তি ঘোষণা করলেন— ভারতবর্ষের লোকসভায় রোজ তাঁকে গালিগালাজ করা হয়। সহানুভূতিতে বিগলিত রিচার্ড গমব্রিজ মন্তব্য করলেন, 'আহা, বেচারার কী কষ্ট!' আমি বললাম—দ্যাখো, ভারতবর্ষে একশো কোটির উপরে লোক। ওঁকে গাল দেওয়া ছাড়া লোকসভার আরও দু-একটা কাজ থাকে। আর এক ব্যক্তি আত্মপ্রচারটাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রধান আয়ুধ হিসাবে ব্যবহার করে প্রচুর ফায়দা উঠিয়েছিলেন। ব্রিটেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করে ট্যুরিজম বাড়াতে ওরা দ্বিধাগ্রস্ত। ভিড়ভাড়ে অরুচি তার একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ না। অনুরূপ কারণেই ইংরেজি রান্নার মাহাত্ম্য পৃথিবীর মানুষের চেতনাগোচর হয়নি। অন্য কারণও আছে। ব্রিটিশ রেল যে খাদ্য পরিবেশন করে তা খাওয়ার চেয়ে বর্ষাধিক কাল গুয়ান্টানামোর কারাগারে বাস করা বাঞ্ছনীয়। আর বেশির ভাগ ইস্কুল-কলেজের ক্যান্টিনে, সস্তা হোটেলে যে অযত্ন করে রাঁধা আহার্য পরিবেশন করা হয় সে বস্তুই ব্রিটিশ রন্ধনশৈলীর জগদ্ব্যাপী দুর্নামের কারণ। হলফ করে বলতে পারি ব্রিটিশ রেলে যে স্যান্ডউইচ পাওয়া যায় তার চেয়ে অখাদ্য রৌরব নরকেও পাওয়া দুষ্কর। অবশ্যি ও জায়গাটা ঘুরে এসে একথা বলছি না।

কিন্তু কলেজে হাই টেবিলে খাওয়া সত্যিই অন্য এক অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা যাঁদের অপরিচিত তাঁদের জ্ঞাতার্থে একটু ব্যাখ্যা করি। অক্সব্রিজের কলেজে মধ্যযুগ থেকে সে কালের মঠ বা মনাস্টারির মতো সব আবাসিক অর্থাৎ কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং ছাত্ররা এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে। পুরনো কলেজগুলিতে একটা উঁচু পাটাতনের উপর মাস্টারদের টেবিল পাতা থাকে। আক্ষরিক অর্থে উঁচু বলেই হাই টেবিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কলেজগুলিতে 'হাই টেবিল' পাটাতনের উপর থাকে না, খাওয়ার ঘরেরই এক দিকে শিক্ষকদের আলাদা বসার ব্যবস্থা। একটু বেশি গণতান্ত্রিক কলেজগুলিতে, যেমন সেন্ট অ্যান্টনিজ, সপ্তাহে পাঁচ দিন দু'বেলাই ছাত্র-শিক্ষক সবাই এক সঙ্গে বসে খায়। কিন্তু সপ্তাহে দু'দিন আনুষ্ঠানিকভাবে রাত্রে ঘরের এক দিকে মাস্টারদের টেবিল পাতা হয়। সেখানে বেশ এলাহিভাবেই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র ব্যবস্থা থাকে। এটাই আমাদের হাই টেবিল। চার পদ আহার্যের সঙ্গে লাল-সাদা দু'রকম মদ্য থাকে, এবং তা বেশ উঁচু জাতের। তাছাড়া খাওয়ার আগে কিঞ্চিৎ শেরি বা হুইস্কি, আহারান্তে নীচতলায় শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ঘরটিতে সুমিষ্ট মদ্য এবং তৎসহ নানা ফল এবং চিজ গলাধঃকরণ করা হয়। অতি সভ্য, অতি মার্জিত আনন্দসন্ধ্যা কাটাবার ব্যবস্থা। আনন্দটা অনাবিলই হয়। কারণ আমাদের পাচকটি অতি পাকা রাঁধুনি।

এতটা আনন্দ এবং মদ্যপান ইংরেজেরও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার সংস্কৃতিতে ফাটল ধরায়। কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ জড়িয়ে আসে। হৃদয়ের গভীর থেকে অন্তরঙ্গ কথা সব জিহ্বাগ্রে পৌঁছয়। কেউ কেউ নর্মজীবনের উত্তেজক সব কাহিনি বলতে শুরু করেন। এই মুক্ত খোলামেলা আবহাওয়ায় বন্ধুত্বের শিলান্যাস হয়। পেটে একটু কারণবারি না পড়লে ইংরেজ স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্যবহার করতে পারে না। সব মানুষের ধমনীতে যেমন একই লাল রক্ত, তেমনই দেব ডাইওনিসিয়াসের রাজত্বে মনুর সন্তান মাত্রেই দ্বিধামুক্ত, তাদের চিত্ত অবারিতদ্বার। তবে চিত্ত যখন ভয়শূন্য হয়, তখন মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় অল্পস্বল্প বেচাল দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। তাই কলেজগুলিতে গেস্ট নাইট যেদিন থাকে, বিশেষত শুক্রবারগুলিতে, পুলিশের গাড়ি তখন আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে পণ্ডিতবৃন্দ কোনও বেচাল করলে তখনই ক্যাঁক করে চেপে ধরে। আমাদের এক রীতিমতো বিখ্যাত সহকর্মী সেদিন সকালেই জেনেভা থেকে ফিরেছেন। আহারান্তে ব্রিটিশ আইন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে উনি রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পুলিশ ওঁকে সাদরে নিজেদের ব্ল্যাক মারিয়ায় তুলল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পণ্ডিতপ্রবর বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় বললেন, 'তোমাদের কি বুদ্ধিনাশ ঘটেছে? জেনেভা শহরে গাড়ি কি আমি রাস্তার বাঁদিক দিয়ে চালাব?' পুলিশ ফরাসি বুঝল না। কিন্তু মহাশয়ের রক্তস্রোতে যে কোহলের আধিক্য ঘটেছে সে কথা বুঝতে কোনও অভিধানের শরণাপন্ন হতে হল না। ভদ্রলোক তেরো বছরের জন্য তাঁর লাইসেন্স হারালেন। হাই টেবিলে আহারান্তে মিঠে মদ খেতে খেতে জাপানের ঐতিহাসিক রিচার্ড স্টোরির রক্ষণশীল জীবনদর্শন, আফ্রিকার ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রবিনসনের জীবনের বিচিত্র নর্মকাহিনি ইত্যাদি নানা চমকপ্রদ আখ্যান আমার চেতনাগোচর হয়।

রিচার্ড স্টোরি একদিন আমার কাছে তাঁর জীবনদর্শন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন। ‘হোয়েনেভার ইট ইস নট নেসেসারি টু চেঞ্জ, ইট ইস নেসেসারি নট টু চেঞ্জ।’ যেখানে পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে পরিবর্তন যাতে না হয় সেটা দেখাই প্রয়োজন। অক্সফোর্ডে এক দেওয়ালের গায়ে দীর্ঘদিন ধরে এক গ্রাফিটি অর্থাৎ দেওয়াললিপি আছে। তার কেন্দ্রে এক বৃহদাকার ডাইনোসরের রেখাচিত্র। নীচে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য : ‘রিমেম্বার দা ডাইনোসর’। ডাইনোসরকে স্মরণ রেখো। অর্থাৎ হে পরিবর্তনবিমুখ স্থাণু অক্সফোর্ড, ডাইনোসরের কী হাল হয়েছিল তা ভুলো না। আমি সে দিকে রিচার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। এবার রিচার্ড সত্যি চটে গেলেন। ডাইনোসর? ডাইনোসর!! তোমার কি ধারণা প্রজাতি হিসাবে তাদের কাছ থেকে শেখার কিছু নেই? সর্ববিধ পরিবর্তন বর্জন করে তারা ধরাপৃষ্ঠে ষোলো কোটি বছর দাপিয়ে রাজত্ব করেছে। আর তোমার তথাকথিত হোমো স্যাপিয়াঁ? বিশ লক্ষ বছরও হয়নি। নানা বাঁদরামি করে নিজের দোষেই এখন ধুঁকতে শুরু করেছে। আর এক শতাব্দী টেকে কি না সন্দেহ! একটা বাজি রাখবে? ষোলো কোটি বছর পরে আমার সঙ্গে এসে দেখা কোরো। দেখব তখনও তোমার অবক্ষয়প্রবণ প্রজাতি টিকে আছে কি না? শিম্পাঞ্জির মাসতুতো ভাই এই ক্ষীয়মাণ প্রজাতি যে বিচিত্র বাঁদরামির ফলে আর বেশি দিন টিকবে না সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই। তবে ষোলো কোটি বছর পরে এই বন্ধু-সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম। স্টোরি স্বর্গলাভ করেছেন। সাক্ষাৎটা কোথায় হবে দুর্ভাগ্যবশত তা বলে যাননি।

হাই টেবিলে নানা ধরনের বিশিষ্ট অতিথি আসেন। সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে সমকালীন রাজনীতি বিষয়ে পঠন-পাঠনের বিখ্যাত কেন্দ্র। তাই আফ্রিকা থেকে জাপান অবধি আর অন্য দিকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ, অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ওখানে সর্বদাই আসাযাওয়া করেন। গেস্ট নাইটের রাতগুলিতে প্রায়ই বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী বা রাজদূত জাতীয় সব লোকের গাড়ি কলেজ কার পার্কে দেখা যায়। পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিস্ট দেশগুলির রাজদূতদের রবরবা দেখতাম অন্য পাঁচটা দেশের তুলনায় একটু বেশি। পুঁজিবাদীদের সমাজতন্ত্রের মাহাত্ম্য বোঝানোর এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর কী হতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন চ্যান্সেলর ম্যাকমিলান কলেজে প্রায়ই আসতেন। ওঁর বয়স তখন নব্বইয়ের ওপরে। উনি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করতেন। কলেজের স্টুয়ার্ড ফ্রেডের উপর ওঁর দেখাশোনার ভার। বক্তৃতার সময় ফ্রেড ওঁর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত। উদ্দেশ্য— বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলে ও তাঁকে সামলাবে। বক্তৃতার সময় ওঁর হাতে একগোছা কাগজ থাকত। তা থেকে পড়ে পড়ে ম্যাকমিলান সাহেব বক্তৃতা করতেন। একদিন ফ্রেড জানাল— কাগজগুলি মসীদ্বারা অস্পর্শিত, মানে একেবারেই সাদা। শুধুমাত্র নাটকীয়তার খাতিরে ভদ্রলোক ওগুলো চোখের সামনে খুলে রাখতেন। ওঁর নাটকীয়তা নানা রূপ নিত। কলেজের সারা বছরের কাজের বৃত্তান্ত দিয়ে ওয়ার্ডেন বক্তৃতা করছেন। তাঁর বক্তৃতার এক বড় অংশ জুড়ে আছে কোন কোন রাজদূত কলেজে পদধূলি দিয়েছেন তার ফর্দ। চ্যান্সেলর সাহেব তাঁর বয়সের সুযোগ নিয়ে টেবিলে মাথা রেখে অকাতরে

ঘুমোচ্ছেন। বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র উনি চোখ রগড়ে ঘুম থেকে উঠলেন। তারপর চমকপ্রদ বক্তৃতা। বোঝা গেল উনি মোটেই ঘুমোননি। প্রসঙ্গত ম্যাকমিলান বললেন— উনি রাজদূতদের লিস্টি শুনে খুবই চমৎকৃত হয়েছেন। তবে ওয়ার্ডেন এ ব্যাপারে তাঁর পরিশ্রম ইচ্ছে হলে কিছুটা লাঘব করতে পারেন। ওঁদের পারিবারিক প্রকাশনী ম্যাকমিলান থেকে প্রতি বছর একটি বই প্রকাশিত হয়। তার বিষয়বস্তু লন্ডনস্থিত রাজদূত এবং তাদের সহকর্মীদের ফর্দ। অযথা পরিশ্রম না করে তার এক এক কপি শ্রোতাদের দিয়ে দিলে ওয়ার্ডেনেরও পরিশ্রম কমে, ম্যাকমিলান কোম্পানির বিক্রিও একটু বাড়ে।

আগেই বলেছি গেস্ট নাইটে কলেজে বিচিত্র চরিত্রের সব লোক আসতেন। এক সন্ধ্যায় দেখি এক ভুঁড়িষ্মান বিরাটবপু ব্যক্তি একা বসে বসে তার আয়তনের উপযোগী এক সিগার ফুঁকছেন। তাঁকে যে নেমন্তন্ন করেছে সেই সহকর্মীটিকে গিয়ে বললাম, —এটা কী হচ্ছে? বেচারাকে একা একা বসিয়ে রেখেছ? সহকর্মী বললেন, 'অসম্ভব বোরিং। লোকটা সিগার-বেচা টাইকুন। টাকার কুমির। ভেবেছিলাম আমাদের সেন্টারের জন্য যদি সিকিটা-আধলাটা দেয়। কিন্তু সে গুড়ে বালি। উপুড়হস্ত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। তাই বসিয়ে রেখেছি। একটু শিক্ষা হোক।' বেচারা বড়লোকটির জন্য কেমন যেন মায়া হল। পাশে গিয়ে বসলাম। ভাগ্যিস বসেছিলাম। এরকম আনন্দদায়ক একটি সন্ধ্যা আমার ভাগ্যে বেশি জোটেনি। সিগারের কথা তুলতেই তার ইতিহাস, ভূগোল, প্রস্তুতশৈলী, গুণবিচার ইত্যাদি চুরোটপুরাণের চব্বিশ তত্ত্ব উনি দেড় ঘণ্টা ধরে বলে গেলেন। মনে হল যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনি শুনছি। কারণ উনি যা বলছেন তার কিছুই আমার পরিচিত জগতের অংশ না। বলুন দেখি সিগারের ভালমন্দ বিচারের প্রধান মানদণ্ড কী? না, তামাকের পাতার আভিজাত্য না, কত টাইট করে সিগারটা মোড়ানো হয়েছে তার উপর সিগারমাহাত্ম্য নির্ভর করে। এই কারণেই সমঝদাররা প্রথমে কানের কাছে নিয়ে দুই আঙুলের মধ্যে সিগারটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার গুণ বিচার করেন। কোনও মচমচ খচখচ যে করে না সেই সিগারোত্তম।

আর একদিন আমার পাশেই বসেছেন ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজ সমাজে বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি— একদা জন এবং বর্তমানে জ্যান মরিস। ওর পুরুষের দেহে এক নারীসত্তা লুকিয়েছিল। শল্য চিকিৎসকের সাহায্যে উনি অসীম সাহস দেখিয়ে সেই সত্তাকে প্রকাশ করেছেন। ব্যাপারটা বোধ হয় শতকরা একশো ভাগ সফল হয়নি। সেদিন হাই টেবিলে আমার অতিথি ছিলেন নবনীতা। তিনি জ্যান সাক্ষাৎকারের কাহিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন। যদিও লেখাটা বাংলায় ছিল তবুও আমার ধারণা খবরটা শ্রীমতী জ্যানের কাছে পৌঁছেছিল এবং শুনে উনি খুব প্রীত হননি। ওঁর পরবর্তী বইটি সেন্ট অ্যান্টনির ফেলোদের হাতে উৎসর্গীকৃত, কিন্তু 'বাদে একজন'। আমার কেমন ধারণা সেই একজন আমি। জ্যান মানুষ হিসেবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। উনি দাবি করেন যে ওঁর লিঙ্গ পরিবর্তনে ওঁর পরিবারস্থ সবারই সানন্দ সম্মতি ছিল এবং আছে। ওঁর ভূতপূর্ব পত্নী ওঁকে ননদের মতো দেখেন। আর সন্তানদের উনি এখন পিসিমা। ওঁর এক ছেলে অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিল। সে যে খুব সুখী তা আমাদের মনে হয়নি।

স্টোরি ছাড়া সহকর্মীদের মধ্যে আর যে অল্প কয়েকটি মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল

তার মধ্যে ছিলেন কমনওয়েলথ ইতিহাসের অধ্যাপক রবিনসন (যিনি রবি নামে পরিচিত ছিলেন), সংস্কৃতের রিচার্ড গমব্রিচ, চিনের ইতিহাসবিদ মার্ক এলভিন আর ফ্রান্স তথা সারা দুনিয়ার মানুষের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের কারবারি থিওডর জেলডিন— যাঁর সঙ্গে হার্ভার্ডে এক অফিস ভাগে ভোগ করেছি। রবি শ্রমিকশ্রেণির লোক। উনিশশো বিশের দশকের শেষ দিকে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় ওঁর বাবা দীর্ঘকাল বেকার ছিলেন। ইংল্যান্ডে কে কোন শ্রেণির লোক তা চেনার অন্যতর প্রধান উপায় মানুষের মুখের ভাষা। যে ব্যক্তি এইচ-কে হেইচ উচ্চারণ করছে এবং উক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি কথা বলার সময় উহ্য রাখছে তার লর্ডের ছানা হওয়াটা নিতান্তই অসম্ভব। রবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মহা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে বহু মেডেল জিতে কেমব্রিজে পড়তে যান। যুদ্ধ যে পুরনো শ্রেণিভেদের ভিত অনেকটাই ধসিয়ে দিয়েছে সে কথাটা সকলের চেতনাগোচর হতে তখনও দেরি আছে। অক্সব্রিজে পুরনো স্নবারির ঐতিহ্য তখনও দেদীপ্যমান। রবি তাঁর শ্রেণিগত উৎপত্তি ঢাকতে সহজাত উচ্চারণ বদলাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ওঁর চেষ্টাটা খুব সফল হয়নি।

শ্রেণিভেদ যে কত বেদনাদায়ক হতে পারে ভারতীয় মধ্যবিত্তর কাছে তা চেতনাগোচর হওয়া কঠিন। আমরা যারা নিজেদের উদার প্রগতিপন্থী বলে মনে করি তারা কখনও কলেজে দিনমজুরের পাশে বসিনি। অথবা কোনও ঝাড়ুদারের ছেলে আমাদের ভগ্নি বা কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়নি। দিলে আমাদের উদারতা কতটা অবিচলিত থাকত তা আমার জানা নেই। এবার এর উলটো দিকটা চিন্তা করুন। যে ঝাড়ুদারপুত্র লর্ডের বাচ্চার পাশে বসে বক্তৃতা শুনছে, সে কি খুব মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে? পঞ্চাশের দশকেও দেখেছি অল্প কিছু শ্রমিকশ্রেণির ছেলেমেয়ে যারা অক্সফোর্ডে পড়তে আসত তারা কীরকম জড়সড় হয়ে থাকত। তার এক দশক আগে ভেদবুদ্ধিটা উচ্চশ্রেণির ব্যবহারে আরও প্রকট ছিল। রবি এক অর্থে তার শিকার ছিলেন। ওঁর বন্ধু এবং সহকর্মী জ্যাক গ্যালাঘারও শ্রমিকশ্রেণির লোক। প্রতিভার জোরে দু'জনেই অক্সব্রিজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। কিন্তু রবি তাঁর যৌবনের অভিজ্ঞতা কখনও ভোলেননি।

রবির কাছ থেকে জীবনদর্শনের এক মূল্যবান পাঠ পেয়েছিলাম। আফ্রিকা রণাঙ্গনে রোমেলের নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের লড়াইয়ে উনি বোমারু উড়োজাহাজের পাইলট হয়ে লড়েছিলেন। পরে এককালীন হাজার উড়োজাহাজ নিয়ে জার্মানির শহরগুলিতে বোমাবর্ষণেও উনি অংশগ্রহণ করেন। আমি রবিকে জিগ্যেস করেছিলাম— প্রতি মুহূর্তে যখন মৃত্যুর সম্ভাবনা তখন ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে যায় না? ওঁর উত্তর—জার্মানিতে বোমাবর্ষণের সময় যতগুলি উড়োজাহাজ যেত তার এক তৃতীয়াংশ ঘায়েল হত। প্লেন যখন প্রথম আকাশে উড়ত, তখন পেটের ভিতর ভয়ে প্রজাপতির ধড়ফড়ানি অনুভব করা যেত ঠিকই। কিন্তু একবার রণক্ষেত্রে পৌঁছলে ভয় করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। মাথা ঠিক রেখে প্রতিটি কাজ করতে হয়। সেই চরম ব্যস্ততার মুহূর্তে ভয়ের চেতনাও লোপ পায়।

উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্রে রবির চালানো উড়োজাহাজটি ঘায়েল হয়। ওঁর বয়স তখন আঠেরো। ওঁর সঙ্গী গোলন্দাজ মানুষটি গুলি লেগে মারা পড়ে। রবি প্যারাশুট নিয়ে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু কোনও কারণে ওঁর প্যারাশুটটি খোলেনি। ফলে প্রচণ্ড বেগে মাটিতে

পড়ার মুখে একটা গাছের ডালে প্যারাশুট জড়িয়ে গিয়ে উনি বেঁচে যান। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কয়েক সেকেন্ড উনি কি ভাবছিলেন সে কথা ওঁর মুখেই শুনি। রবি তখনও অক্ষতকৌমার্য কিশোর, নারীসঙ্গের সুযোগ ওঁর জীবনে আসেনি। ফলে আসন্ন মৃত্যুর মুখে ওঁর একটাই দুরন্ত ইচ্ছা হয়েছিল— স্ত্রীসঙ্গের। রবি বলতেন— অনেক সময়ই আমাদের নানা তুচ্ছ বিষয়ে বিফলমনোরথ হওয়াটা গভীর দুঃখের কারণ হয়। তখন যদি আমরা মৃত্যুর পটভূমিতে আমাদের জীবনের দিকে তাকাই তা হলে কোনটা আমাদের সত্যিকার কাম্য আর কোন জিনিসটা সমাজ কর্তৃক মগজধোলাইয়ের ফলে চাইছি সে কথাটা স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই সত্যদৃষ্টির আলোয় জীবনটা চালনা করলে কষ্ট অনেক কম পেতে হয়। এটা আধ্যাত্মিক উত্তরণের উপদেশ না, নিতান্তই ভুয়োদর্শনের কথা। রবি রবিনসনও পরলোকগত। ওঁর চলাফেরা ক্রিয়াকর্মে কিছুরই তোয়াক্কা না রেখে চলার একটা ভঙ্গি ছিল। কোনও অতীন্দ্রিয় সম্ভাবনায় বিশ্বাস না রেখেও জীবনের ছোট-বড় অভিজ্ঞতা থেকে প্রজ্ঞা অর্জন করা সম্ভব— ওঁকে দেখে এই বিশ্বাস আমার হয়েছে।

চৈনিক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ মার্ক এলভিন বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। একজন সহকর্মী ওঁর বাচনভঙ্গী বোমাবর্ষণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মিনিটে দুশো শব্দের সেই বক্তৃতার প্রতিটি কথা তত্ত্ব এবং তথ্যে ঠাসা। একটি বাজে কথা নেই। কিন্তু মস্তিষ্কে তা ধারণ করে রাখতে গোটা তিন-চার মাথা থাকলে সুবিধে হত। অক্সফোর্ডে চাকরি পাওয়ার সময় ইন্টারভিউতে ওঁর অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ এখনও প্রবাদকাহিনি হয়ে আছে। প্রথম প্রশ্নটি শোনামাত্র এলভিন সাহেব একটি ব্ল্যাকবোর্ড আনতে বলেন। তারপর সেই ব্ল্যাকবোর্ডে আঁক কষে, চিনা ভাষায় পৃষ্ঠাখানেক লিখে, অবিশ্বাস্য রকমের পাণ্ডিত্যের ফুলঝুরি বোমাপটকা সব কিছু ফুটিয়ে-ফাটিয়ে ঝাড়া প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। মুহ্যমান সিলেকশন কমিটি টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পাননি। বক্তৃতার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে পদটি ওঁকেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া আর কী-ই বা উপায় ছিল!

মার্ক এলভিনের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রিতে আমার লেখা পরিচ্ছেদগুলি ওঁর লেখা এবং চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। চিনের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার জন্য বেশ কিছুদিন আমরা একটা যৌথ সেমিনার চালিয়েছিলাম। শেষে সেই সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি আরও বাড়িয়ে সমগ্র এশিয়া তার বিষয়বস্তু ভেবে নেওয়া হয়। এই আলোচনাচক্র বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় দেখেছি ভারতীয় ইতিহাসচর্চা আর সব দেশের ইতিহাস পঠন-পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে শূন্যে ঝুলে থাকত। প্রধানত কিছু ভারতীয় ছাত্র কলিন ডেভিসের তত্ত্বাবধানে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করত। আর ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষার পাঠক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকাল বিষয়ে একটি স্পেশাল পেপার ছিল— যার মুখ্য আলোচ্য ভারতে ইংরেজ শাসন, ভারতীয়দের ইতিহাস নয়। তখন এমনিতেই স্নাতকোত্তর ছাত্রদের পঠন-পাঠন ব্যাপারটা অনেকটাই তাদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হত। আর ভারতীয় ইতিহাসের মতো প্রান্তিক বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাটা আরও প্রকট ছিল। পড়াতে এসে দেখলাম— সে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। গোপাল সাহেব অনেক কোশেশ

করে ওয়ারেন হেস্টিংস বিষয়ক স্পেশাল পেপারটি তুলে দিয়েছেন। তার জায়গায় অন্য কোনও বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং আমি দেখলাম দু-তিনটি গবেষণারত ভারতীয় ছাত্রর গবেষণা পরিদর্শন করা ছাড়া কার্যত আমার কোনও কাজ নেই। ওদিকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমাফিক কর্তব্য বছরে ছত্রিশ ঘণ্টা বক্তৃতা করা। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের নিয়ে একটা সেমিনার চালিয়ে বছরে তিন আষ্টে (প্রতি টার্মে আট সপ্তাহ এবং বছরে টার্ম তিনটি) চব্বিশ ঘণ্টা কাটানো অবশ্যই যায়। তাতেও চুক্তি অনুযায়ী বারো ঘণ্টা বাকি থাকে। আমি জাত মাস্টার। একুশ বছর বয়স থেকে পড়াচ্ছি। পড়াতে আমার ভাল লাগে। পড়ানোর ক্ষেত্রে তানানা করে চালিয়ে দিয়ে শুধু গবেষণা করে আমার আত্মিক পেট ভরবে না। অতএব অন্য পথ দেখতে হবে, এ কথা ক'দিনেই বুঝলাম।

যখন দেখলাম যে আমার নিজের কর্মসূচি নিজেরই তৈরি করে নিতে হবে, তখন এক দু'মুখি প্রচেষ্টা শুরু করি। প্রথম, ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে একটি নতুন পাঠক্রম তৈরি করা। দ্বিতীয়, ভারতীয় ইতিহাসের প্রান্তিকতা দূর করার চেষ্টা। নতুন পাঠক্রম চালু হতে পুরো এক বছর লাগবে। সেই সময়টা আমি ভারতচর্চার নানা দিক নিয়ে কিছু বক্তৃতা করি। অক্সফোর্ডে শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রথম বছরটা আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় অন্যান্য দেশের ইতিহাস পঠন-পাঠনের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসচর্চার যোগসূত্র গড়ে তোলা। তুলনামূলক এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে সেমিনার ছাড়াও, আরও দুটি সেমিনারে আমি সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করি। সে দুটি হচ্ছে যথাক্রমে কমনওয়েলথের ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ইতিহাস। ভারতবর্ষ যে কমনওয়েলথের সব চেয়ে বড় দেশ এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বহু শতাব্দী ধরে শামিল—এই দুই সুপরিচিত তত্ত্ব অক্সফোর্ডের ইতিহাস পঠন-পাঠনে যাতে হাত-কলমে স্বীকৃতি পায় সেই চেষ্টাই আমার স্বেচ্ছাবৃত কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। চেষ্টাটা কত দূর সফল হয়েছিল জানি না। তবে ব্যক্তিগত উপস্থিতি মারফত বিষয়টির উপস্থিতি অন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের চেতনাগোচর করতে পেরেছিলাম মনে হয়।

এক সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গাঁধীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অর্জুন সেনগুপ্ত দু' বছরের জন্য অক্সফোর্ডে একটা ফেলোশিপ নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সাহায্যে কিছুদিন পরে ভারত সরকার থেকে একটি অনুদান পাওয়া যায়। সেই অনুদানের ভিত্তিতে সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজে একটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজ স্থাপন করা হয়। এই সেন্টারটি প্রায় পনেরো বছর চালু ছিল। তারপর সরকারি অনুদানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেন্টারটিও তুলে দিতে হয়। যতদিন সেন্টারটি চালু ছিল ততদিন তার আওতায় ভারতবর্ষ বিষয়ক বহু আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র এবং সঙ্গীত, নৃত্য, সিনেমা থেকে শুরু করে বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতদের এনে বক্তৃতামালা ইত্যাদি নানা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত গোষ্ঠীচক্র এই সেন্টারের ব্যাপারে বিশেষ বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ ছিল। দেশের টাকা কেন বিদেশে যাবে? আমি উত্তর দিয়েছিলাম—ভারতীয় দূতাবাসে একটি কালচারাল অ্যাটাশে রাখতে যা খরচ হয় তার দশমাংশ ব্যয় করে আমরা দশগুণ ফল ফলাতে পারব। আমার বিশ্বাস— এই আস্ফালন

মিথ্যা প্রমাণ হয়নি। সেন্টারের কর্মসূচি মারফত অক্সফোর্ডের ছাত্র ও শিক্ষকরা ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে অবহিত হন।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করা ভাল। আমরা ভারতীয়রা মোটেই ঘরকুনো না। আমরা বেড়াতে খুবই ভালবাসি, তবে যথাসম্ভব পরের, বিশেষত সরকারি পয়সায়। আমাদের দেশপ্রেমিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের (বিশেষ করে যাঁদের শিকড় গভীরে চলে গেছে, তাঁদের) প্রায়ই বিদেশে দেখা যেত, এবং প্রায়শ নানা ডেলিগেশনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের গৌরী সেন অর্থাৎ ভারত সরকারের পয়সায়। ভারতবর্ষ যে একশো কোটি লোকের দেশ যে-কোনও কনফারেন্সে ভারতীয় ডেলিগেশনের আকার দেখে তা বোঝা যেত। ক্ষমতাপন্ন গোষ্ঠীর আবিষ্কৃত জিনিয়াসরা অবশ্যই এইসব ডেলিগেশন আলো করে থাকতেন। আর এ বাবদ অর্থব্যয় তো নিতান্তই দেশের স্বার্থে। সুতরাং এতে যে আপত্তি করবে সে নির্ভেজাল মিরজাফর।

কমনওয়েলথ সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে প্রথম প্রথম একটা ব্যাপারে বেশ অস্বস্তি বোধ হত। এই সেমিনারে শিক্ষক এবং ছাত্র যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন, দেখলাম তাঁরা প্রায় সবাই সাম্রাজ্যপূজারী। বাল্যকাল থেকে ওই সাম্রাজ্যের বীভৎস দিকটা আমার চেতনার অঙ্গ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'ডায়ার ও পাঞ্জাবকাহিনি'-তে লাহোর-অমৃতসরের রাস্তায় টিকটিকিতে বান্ধা স্কুলের ছেলেদের বেত মারার ফোটো দেখে অনেক রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি। আর এখানে এসে শুনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো সর্বজনহিতায় প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এক সহকর্মীর ঘরের বাইরে মস্ত এক পোস্টার। বক্তব্য 'ইট টেকস এ গ্রেট মাইন্ড টু অ্যাপ্রিসিয়েট এ গ্রেট এম্পায়ার'। সে রকমের গ্রেট মাইন্ড ভদ্রলোকের অবশ্যই ছিল। তাঁর পূজ্য বস্তুটি যে অন্য লোকের বিবমিষার কারণ হতে পারে এ চিন্তা তাঁর অন্তরে কী করে জায়গা পাবে? এক মার্কিন ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিই সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ তাদের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন। এবং যেহেতু দেশের যাবতীয় সংবাদ-মাধ্যম থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ পর্যন্ত সর্বত্র এই শ্রেণির লোকের প্রচণ্ড প্রভাব, দেশের আমজনতাকেও সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য এরা বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে। শুধু তাই না, পৃথিবীর সর্বত্র—এমনকী আমাদের এই হতভাগ্য দেশেও, এখনও বহু লোকের বিশ্বাস যে ইংরেজরা আমাদের জাতীয় মঙ্গল যেভাবে দেখভাল করেছে, তার কোনও তুলনা নেই। বাছারা বিদেয় নেওয়ায় নাকি দেশের অবস্থা নেহাতই বেহাল হয়েছে। অন্ধত্ব যাদের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে তাদের নিয়ে কিছু করার নেই। এই প্রসঙ্গে বলি— ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে ইংরেজ ঐতিহাসিকের খ্যাতি সবচেয়ে বেশি— সেই ক্রিস বেইলি সম্প্রতি তথ্যপ্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্ত না ঘটলে ভারতবর্ষের আর্থিক কোনও উন্নতি সম্ভব হত না। প্রমাণ—একশো বছর ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি আর শিল্পের পারস্পারিক অনুপাতে সত্যিতে কোনও পরিবর্তনই হয়নি। সেই পরিবর্তনের ভিত গাড়েন বহুনিন্দিত নেহরু সরকার!

কমনওয়েলথ সেমিনারের মুখ্য দায়িত্ব রবি রবিনসনের। তিনি শ্রমিক দলের সমর্থক।

বিলেতের শ্রেণিভিত্তিক সমাজ তাঁর চোখে নিতান্তই ঘৃণিত। গ্যালাঘারের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় লেখা তাঁদের 'ইম্পিরিয়ালিজম অফ ফ্রি ট্রেড' নামের বিখ্যাত প্রবন্ধ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিল। কিন্তু এই মানুষও দেখলাম সেমিনারে সাম্রাজ্যের যাঁরা সমালোচক সেইসব লোকদের বিশেষ ডাকেন না। হবসবমকে ওই সেমিনারে দেখব আশা করেছিলাম। তা কখনও ঘটেনি। যখন হবসবমের বামপন্থী সহযোগী টেরেন্স রেঞ্জার অক্সফোর্ডে অধ্যাপক হয়ে এলেন, তখন একদিন মাত্র তিনি কমনওয়েলথ ইতিহাসের সেমিনারে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে এক ব্যক্তি বেশ শোনা যায় এই রকম স্বরেই বললেন, 'এইসব লোককে অক্সফোর্ডের মতো জায়গায় কারা আমদানি করছে?'

সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ঘন অন্ধকার দিক সম্পর্কে দেখলাম প্রায় কোনও ইংরেজই অবহিত নন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ঠিক চার বছর আগে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে যুক্ত বঙ্গে যে ত্রিশ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মারা গেছে, সে কথা অক্সফোর্ডের ছাত্র বা অধ্যাপক কেউই শুনেছেন বলে মনে হল না। অ্যাটেনবরার তৈরি মহাত্মার জীবনী বিষয়ক ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর নানা রকম অদ্ভুত মন্তব্য শুনেছি। কেউ কেউ বললেন—জালিয়ানওয়ালাবাগের দৃশ্যটি কাল্পনিক। এক চরম দক্ষিণপন্থী শিক্ষক মন্তব্য করলেন, ডায়ার গুলি চালিয়ে ঠিক কাজই করেছিল, কারণ সভায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বহু শিখ এসেছিল। তারা ছত্রভঙ্গ না হলে সভার পর শহরে সশস্ত্র বিদ্রোহ হত। যাঁদের রাজনীতি উগ্র দক্ষিণপন্থী নয়, তাঁরা ছবিটি দেখার পর নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের স্বজাতির মানুষ যে অমন সব নৃশংস কাজ করতে পারে—এটা তাঁদের কল্পনারও অতীত ছিল। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্যের লজ্জাকর ইতিহাস জনসাধারণের কাছ থেকে সযত্নে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে। অ্যাটেনবরার ছবিটি প্রকাশ হওয়ার পর বুঝলাম নিজেদের লজ্জাকর ইতিহাস মানুষের চেতনাগোচর হলেও লোকে ওদিকে চোখ বুজে থাকতেই ভালবাসে। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের দাঙ্গায় আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলেই যে পশ্বাচার করেছি তা নিয়ে কি আমাদের কোনও লজ্জার লক্ষণ আছে? অ্যাটেনবরার ছবি মুক্তি পাওয়ার পর কমনওয়েলথ সেমিনারে ইংরেজ জনসাধারণের সাম্রাজ্যর ইতিহাস বিষয়ে অন্ধত্ব নিয়ে একটি বক্তৃতা করি। আমার বক্তব্য জনপ্রিয় অবশ্যই হয়নি, কিন্তু আলোচনায় কেউ ইংরেজের সহজাত ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেননি।

প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজের মতামত অনেক সময় রীতিমতো কৌতুকজনক হয়। আমার এক সহকর্মী বিদ্বান ব্যক্তি হলেও সাধারণ বুদ্ধির দিক থেকে ইংরেজিতে যাকে 'নাইভ' বলে তার এক চরম নিদর্শন। তিনি আমাকে একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করেন—আগে তো ছাত্র হিসেবে অক্সফোর্ডের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এখন পড়াতে এসে কেমন লাগছে? উত্তরে আমি বলি, খুবই ভাল লাগছে, তবে দু-একটা জিনিস রুচিতে বাধে। যেমন? যেমন ছাত্রদের সঙ্গে এক ঘরে বসে তারা যখন সাদামাটা কিছু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে তখন হাই টেবিলে চর্ব্য-চোষ্য খাওয়া। সহকর্মীটি বললেন—তুমি যদি ইংরেজ হতে তা হলে এ কথা তোমার মনে হত না। তবে কী মনে হত? মনে হত যে যোগ্যতা অর্জন করলে ওরাও এক দিন হাই টেবিলে খাবে। —বটে। বটে! আমি বললাম, এ ব্যাপারে কিন্তু আমরা হিন্দুরা আরও এগিয়ে গিয়েছি।

কীরকম? আমরা আমাদের অচ্ছুৎদের বলি— সদাচার পালন করে থাকলে আর দশ-বিশ জন্ম পর তোমরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের পা ছোঁয়ার অধিকার পাবে। ও কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো।

রীতিমতো পড়ানো শুরু করতে প্রায় এক বছর বাকি। সে সময়টা নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য কিছু বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আরও একটি কাজ করি। আমি স্বেচ্ছায় বাংলা শেখাতে আরম্ভ করলাম, যদিও আমার ছাপানো কর্মসূচিতে কথাটা ছিল না। শিখতে এলেন সংস্কৃতের শিক্ষক গমব্রিজ এবং তাঁর কয়েকটি ছাত্র। ওঁদের অক্ষর পরিচয় হতে মাত্র অল্প ক'দিন লাগল। তারপর সোজা কিছু গল্প কবিতা পড়াব ঠিক করলাম। সংস্কৃত শব্দবহুল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বেছে নিলাম— 'ব্রাহ্মণ'। সেই যে 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে...'। সংস্কৃতজ্ঞানের কল্যাণে শব্দগুলি ওদের প্রায় সবই জানা। সুতরাং গমব্রিজ গড়গড় করে অনুবাদ করে গেলেন। শুধু শেষ দুটো লাইনে 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত'র জায়গাটায় এসে উনি 'তাত' অনুবাদ করলেন 'সানসাইন'। একটু বোধ হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর পড়ালাম 'আবোলতাবোল'। হিজিবিজবিজ তথা তকাইয়ের আত্ম তথা বংশপরিচয় জেনে সবাই খুব খুশি।

গমব্রিজের বাবা জগদ্বিখ্যাত স্যার আর্নেস্ট। বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আর্ট ক্রিটিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক। একদিন রিচার্ড গমব্রিজের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। সঙ্গে আমাদের অতিথি নবনীতা। স্যার আর্নেস্ট সেদিন ছেলের বাড়িতে উপস্থিত। ওঁকে দেখে নবনীতা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে একটা খাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অটোগ্রাফ দাবি করলেন। দুই টানে একটি গাছের পাতা এঁকে তার নীচে সই করে স্যার আর্নেস্ট সত্যিকার বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি আমাকে কী করে চিনলে! আমি তো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' নবনীতা উত্তর দিলেন, 'স্যার আর্নেস্ট, হাওয়ায় ভেসে আপনার নাম দু-চারজন মানুষের কানে পৌঁছেছে।'

পড়ানোর ব্যাপারে নানা উঞ্ছবৃত্তি করতে করতে একটা বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমার পেশ করা নতুন স্পেশাল পেপারের পাঠক্রম, যা ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিবর্তে পড়ানো হবে তা মঞ্জুর হয়েছে। আমি প্রথমেই ঠিক করেছিলাম আমার যেসব বিষয়ে ব্যক্তিগত উৎসাহ কিছু বেশি তা নিয়ে নতুন পাঠক্রম তৈরি করব না। যে বিষয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে তা নিয়েই পাঠক্রম হবে। এই কথা মাথায় রেখে গাঁধীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের কয়েকটি বছরকে (১৯১৯-১৯৩৪) কেন্দ্র করে নতুন পাঠক্রম পেশ করেছিলাম। অক্সফোর্ডে ইতিহাসে স্পেশাল পেপারে পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকে তথ্যের উৎস যেসব দলিলপত্র তার এক নির্বাচিত লিস্ট। পরীক্ষায় তার থেকে উদ্ধৃতি তুলে ছাত্রদের মন্তব্য করতে বলা হয়। এই উদ্ধৃতিগুলিকে বলা হয় 'গবেট'। কথাটা বাংলা গবেটের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মোট কথা পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ছাত্রদের মূল উপাদান থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য নিষ্কাশন করার শিক্ষা। যেসব ঐতিহাসিক দলিল ওই পেপারের জন্য পাঠ্য

নির্দিষ্ট হয় ১৯১৮-১৯ সনে পঞ্জাবের ঘটনাবলি বিষয়ে রিপোর্টগুলি তাদের কেন্দ্রস্থলে। একই ঘটনা নিয়ে একই তথ্যের ভিত্তিতে বিচারক যে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, এই রিপোর্টগুলি তার চরম নিদর্শন। তাই ওগুলি তথ্য বিচার শেখার জন্য বিশেষ উপযোগী।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে যে তথ্যের মূল্যায়নে আকাশপাতাল তফাত হয়ে যায় আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে একত্রে ক্লাস নিতে গিয়ে সে কথাটা বারবারই নজরে আসত। একটা উদাহরণ দিই। ক্লাসটা ছিল গবেট নিয়ে আলোচনার। ছেলেমেয়েরা নির্দিষ্ট গবেট সম্বন্ধে তাদের মন্তব্য লিখত। ক্লাসে তা নিয়ে আলোচনা হত। একটা গবেট ছিল চম্পারন সত্যাগ্রহের সময় ওখানকার তরুণ ইংরেজ ডেপুটি কমিশনারের একটা মন্তব্য থেকে উদ্ধৃতি। ভদ্রলোক বলছেন— ওখানকার কৃষকরা আগে মহাজনের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও ভয় পেত আর আন্দোলনের পরে তারা বড়লাটের সামনেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে। গবেট আলোচনায় প্রথম কাজ বক্তার অবস্থান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ধারণ। এ প্রসঙ্গে আমি বললাম— তরুণ ডেপুটি কমিশনার তখনও ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভঙ্গি সম্পূর্ণ রপ্ত করেননি। তাই তাঁর দৃষ্টি তখনও স্বচ্ছ। সুতরাং তার উক্তি নির্ভরযোগ্য। আমার সহকর্মী বললেন, 'লোকটি সবে এসেছে। ভারতবর্ষ তার কাছে অপরিচিত। কাঁচা বয়সের কাঁচা কথা। ওর উক্তিটা সেইভাবে দেখলেই ভাল হয়।' ওঁর লেখা ইতিহাস আর আমি যা লিখি তাতে কোথায় ফারাক হবে এর থেকে আন্দাজ করতে পারেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন বিষয়ে ক্লাসে পড়াতে গিয়ে বেশ অসুবিধেই হত। শুনেছিলাম ইংল্যান্ডে তরুণ সম্প্রদায় প্রগতিপন্থী। সাম্রাজ্যের মহিমায় তারা বিশ্বাস হারিয়েছে। শিক্ষক হিসেবে ওখানে প্রায় তেত্রিশ বছর কাটিয়েছি। তার মধ্যে বিশ বছর গেছে বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, সেমিনার মারফত প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাদানে। এতগুলি বছরে সাম্রাজ্যের মহিমা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে এরকম যে ক'টি ছাত্রছাত্রী পেয়েছি, সংখ্যায় তারা পাঁচ-ছটির বেশি হবে না। বোধ হয় অক্সব্রিজ বাদ দিলে অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিবাদী তথা সাম্রাজ্যবিরোধী ছাত্রছাত্রী সংখ্যায় এর চেয়ে অনেক বেশি। সাম্রাজ্যের ব্যাপারে প্রগতিবাদী শ্রমিক দলের সমর্থক সহকর্মীদের মনেও নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে মনে হত। একজন বললেন—ইংরেজদের বদলে ফরাসিদের রাজত্ব হলে স্বাধীন হওয়ার জন্য তোমাদের অনেক রক্তক্ষয় করতে হত। আলজেরিয়া আর ভিয়েতনামের ইতিহাস দেখ। আমি ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের আর্থিক দুর্দশার কথা উল্লেখ করলাম। তাঁর উত্তর— দ্যাখো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোথাওই শিল্পায়ন বা সক্রিয়ভাবে আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা হয়নি। এ ব্যাপারে ইংরেজদের বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। রবি রবিনসন একদিন জিগ্যেস করলেন— তোমার কি মনে হয় আমরা ইচ্ছে করলে আরও কিছুদিন ভারতবর্ষ ধরে রাখতে পারতাম না? আমি বললাম— নিশ্চয়ই পারতে। তবে আলজেরিয়ায় ফরাসিদের যে হাল হয়েছিল আমাদের দেশে তোমাদেরও তাই হত। এক জেলডিন (যাঁর রাজনৈতিক মতামত রক্ষণশীল বলেই আমার ধারণা) একবার ভারতবর্ষ ঘুরে এসে

বললেন— ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন যে অর্থনৈতিক শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা নিয়ে মানুষের মনে এখনও সঞ্চিত ক্ষোভ আছে, এ কথা আমি এর আগে কখনও ঘুণাক্ষরেও শুনিনি। অথচ এই অক্সফোর্ডেই আমি তিন বছর ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়েছি।

যেসব ছাত্রছাত্রী ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে আসত তাদের অধিকাংশের চেতনায় এই সাম্রাজ্যপ্রীতির শিকড় বহু দূর চলে গিয়েছিল। বাড়িতে, ইস্কুলে, খবরের কাগজে, গির্জায় এরা জ্ঞান হওয়া অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণগান শুনে আসছে। এদের কাছে সাম্রাজ্যমহিমায় আস্থা প্রায় খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়। সে বিশ্বাসে ঘুণ ধরানো আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমি পসিটিভিস্ট ঐতিহাসিক। তার মানে ইতিহাসচর্চায় তথ্য থেকে আপেক্ষিক সত্যে পৌঁছনো সম্ভব মনে করি। কিন্তু সে সত্য আপেক্ষিক, ধ্রুব নয়। শিক্ষক হিসেবে আমার কাজ ছাত্রদের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বিচার এবং একই তথ্যের পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে শেখানো। ইতিহাসে পরম্পরালব্ধ ধ্রুবজ্ঞানে আমার বিশ্বাস নেই। সুতরাং সেরকম কোনও অবিসংবাদিত সত্য আমি পরিবেশন করতাম না। শুধু আমার বক্তৃতায় আমার বিচার অনুযায়ী সাম্রাজ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে কখনও দ্বিধা করিনি। এ কাজে আমি কতটা সফল হয়েছিলাম জানি না। ছাত্রছাত্রীরা মন দিয়ে শুনেছে, কখনও নানাভাবে তাদের যে আমার ব্যাখ্যা শুনতে ভাল লেগেছে সে কথা জানিয়েছে। কিন্তু টিউটোরিয়ালে এবং পরীক্ষার খাতায় তাদের প্রশ্নোত্তর দেখে বুঝতাম— আমার ব্যাখ্যা তারা গ্রহণ করেনি।

প্রথম ডিগ্রির জন্য ইতিহাস পড়তে এসে যাঁরা ভারতীয় ইতিহাসে স্পেশাল পেপারটি নিত তারা প্রায় সবাই ব্রিটিশ। ভারতীয় ছাত্রদের আমি ওই স্পেশাল পেপারটি নিতে উৎসাহ দিতাম না। কারণ ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই থাকত না। আমরা যেসব কথা প্রায় মাতৃদুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মস্থ করি, তারা তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। জাতিভেদ প্রথা বোঝাতে আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করলে ভারতীয় ছাত্রদের তা শুনে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তাই তাদের বলতাম— বাছারা অন্য কিছু পড়ো। পশ্চিমে এসেছ, এদের ইতিহাস আর সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান একটু বাড়িয়ে নিয়ে যাও।

স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মধ্যে ছবিটা এর উলটো। খুব অল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকেই আমি ডক্টরেটের দুয়ার পার হতে সাহায্য করেছি। তার একটা কারণ— ভারতীয় ইতিহাসে ডক্টরেট নিয়ে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এখন অবস্থাটা কিছুটা বদলেছে। একটা ঘটনা উল্লেখ করি। তা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রিটা (অক্সফোর্ডে যার নাম ডি.ফিল) কী চোখে দেখা হত সে বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। আমার এক ইংরেজ ছাত্র ডি.ফিলের জন্য গবেষণা শুরু করেছিল। মাঝপথে সে ফোর্ড কোম্পানিতে একটা মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে গেল। চাকরিটা নেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সে আরও এক বিষয়ে মনস্থির করে। ওর গবেষণার কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সে কাজটা যাতে বিফলে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে ও একটি ছোট থিসিস লিখে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করে। ফোর্ড কোম্পানিতে চাকরির ব্যাপারে ও আমার কাছে একটি প্রশংসাপত্র বা 'ক্যারেক্টার' চায়। ও যে সৎ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথাটাই আমাকে লিখতে হবে। কিন্তু ও

যে একটা গবেষণালব্ধ ডিগ্রি পেয়েছে— সে কথাটা আমাকে চেপে যেতে বলল। কারণ ব্যবসাজগতে শাস্ত্রচর্চা জাগতিক বুদ্ধির পরিপন্থী বলেই ধরা হয়। অক্সফোর্ডে দু-তিন বছর থেকে সহবৎ শিক্ষা করেছ, কেতাদুরস্ত হয়েছ— ভাল কথা। কিন্তু রিসার্চ ডিগ্রি নিয়েছ তো গেছ। অন্য পথ দ্যাখো। ব্যবসার জগৎ কঠিন ঠাঁই। যারা মুখ গুঁজে বই পড়ে সময় কাটায় এ জগৎ তাদের জন্য নয়।

আমার কাছে যেসব কৃতী ছাত্র গবেষণা করে ডিগ্রি নিয়েছে তাঁদের অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়ার লোক— ভারতীয়, পাকিস্তানি, সিংহলবাসী বা বাংলাদেশি। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ খুবই খ্যাতিমান। এবং এঁদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ গর্বিত। এই কলকাতা শহরেই আমার সাতজন ছাত্রছাত্রী আছেন। তাঁরা সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত। যতদিন আমার স্ত্রীর শারীরিক ক্ষমতায় কুলাত, প্রতি বছর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে উনি নিজে রেঁধে পঞ্চাশ-ষাট জন ছাত্র এবং বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতেন। বাড়ির বাগানে প্রচণ্ড হইচই করে পার্টি হত। লোকে বলত—এই খাওয়ার লোভেই আমার কাছে ছাত্ররা গবেষণা করতে আসে। একবার দিল্লি থেকে সদ্য আগত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আমার স্ত্রীর পরিচয় পেয়ে বললেন— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি খুব ভাল রাঁধেন শুনেছি। দিল্লিতে সবাই বলেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।' তারপর কিয়ৎকাল মৌন থেকে মহাশয় বললেন, 'আপনার কথা কিন্তু কেউ কিছু বলেনি।' কেনই বা বলবে?

আমি যখন অক্সফোর্ডে পড়াচ্ছি তার অনেকগুলি বছরই ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই সময়েই শ্রীমতী থ্যাচারের অভ্যুদয় এবং টানা আঠেরো বছর টোরি রাজত্বের কাল। কোনও দেশে বাস করলে সেখানকার রাজনীতির ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। বিশেষত একই সময়ে থ্যাচার এবং রেগানের আবির্ভাব বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল আদর্শের জয়যাত্রা ঘোষণা করে। এই দুটি মানুষ এবং তাঁদের রাজনীতি আমার জুগুপ্সার উদ্রেক করেছিল। উদারপন্থী সংবাদপত্র 'গার্জিয়ান'-এর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ব্রিটেনের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ আমার এই জুগুপ্সায় শামিল। একাধিক পত্রপত্রিকায় থ্যাচারকে 'দা মোস্ট হেটেড পার্সন ইন ব্রিটেন' বলে বর্ণনা করে। একটা মানুষের ছবি টেলিভিশনে দেখলে যে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করা যায় থ্যাচার রাজত্বে ইংল্যান্ডে বাস করে আমার এ কথা চেতনাগোচর হল। শেষে আমি টেলিভিশনে মানুষটির ছবি দেখা গেলেই চ্যানেল বদলাতাম। অকারণে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা সহ্য করার কোনও হেতু নেই। গার্ডিয়ানের সমীক্ষা থেকে জানলাম যে মহিলা শুধু আমার না, বহু মানুষেরই বিবমিষা উদ্রেক করতেন। রক্ষণশীলরাও অনেকেই ওঁর ধরনধারণ বিশেষ অপছন্দ করতেন। এক শ্রেণির লোকের ধারণা—অচল কোম্পানিগুলিকে তাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে, অযোগ্য মানুষদের রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ করে, ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঠ্যাং ভেঙে এবং অবাঞ্ছিত মানুষের ব্রিটেনে প্রবেশ বন্ধ করে উনি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটান। আর বাম এবং উদারনীতির সমর্থকরা ভাবেন— ইংল্যান্ডের শিল্প এবং শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ, অর্থনৈতিক বৈষম্য চরমে ওঠা, জাতিবৈরের ব্যাপারে উস্কানি দেওয়া— এই হল মহিলার বাস্তবিক

অবদান। উনি নিজের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি—যা ঠিক অভিজাতসুলভ ছিল না— ঢাকবার জন্য মাস্টার রেখে এক অদ্ভুত আওয়াজ গলা থেকে বের করার শিক্ষা নেন। উটের এবং উদ্‌বেড়ালের ডাক ছাড়া ওরকম বিশ্রি আওয়াজ আমি আর কোথাও শুনিনি। ওঁর অল্পবুদ্ধি স্বামীটি সাধারণ্যে নানা বেচাল কথাবার্তা বলে দম্পতিটির ভাবমূর্তি আরও নষ্ট করতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে— আমার চোখে থ্যাচার রাজত্বের বীভৎসতা ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্ধকার দিকটির সঙ্গে তুলনীয় মনে হত।

ওঁর জনপ্রিয়তা যখন প্রায় মাটিতে ঠেকেছে, তখন আর্জেন্টিনা ব্রিটিশ উপনিবেশ ফকল্যান্ড আক্রমণ করে ওঁকে বাঁচিয়ে দেয়। পার্লামেন্টের সভ্য টম ডিইলের মতে— এ যুদ্ধ এড়ানো যেত। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আর্জেন্টিনার জাহাজ বেলগ্রানো ডুবিয়ে দিয়ে থ্যাচার শান্তির পথ বন্ধ করে দেন। এবং তার সঙ্গে আর একবার ভোটে জেতার ব্যবস্থাও পাকা হয়ে যায়। কোনও দেশ 'ন্যায়যুদ্ধে' জিতলে জনগণের বড় উল্লাস হয়। আর কোথাকার কোন আর্জেন্টিনা, সে মহান ব্রিটেনের সাম্রাজ্যের উদ্বৃত্ত লেজটুকু দখলের চেষ্টা করেছে! সেই লেজরক্ষার লড়াইয়ের চেয়ে মহৎ প্রচেষ্টা আর কী হতে পারে? শ্রীমতী থ্যাচার আর একবার ভোটে জিতে আরও কিছুদিন দেশের সর্বনাশ করার মওকা পেলেন। লোকে সর্বধ্বংসী হুনরাজ এট্টিলার সঙ্গে তুলনা করে ওঁকে 'এট্টিলা দি হেন' আখ্যা দিল। শেষে যখন ওঁর প্রতি মানুষের বিদ্বেষ ওঁর দলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন টোরি নেতৃবৃন্দই ওঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। সাশ্রুনয়নে থ্যাচারের ডাউনিং স্ট্রিট ত্যাগ করার দৃশ্য দেখে সহানুভূতিতে অভিভূত হয়েছিলাম— এমন কথা বললে মিথ্যা ভাষণ হবে। জীবনে আর একবার ব্যক্তিবিশেষের দুর্গতি দেখে বিমল আনন্দ পেয়েছিলাম। অযোধ্যা কাণ্ডের পর দিল্লির রাস্তায় জলুসে শামিল হয়ে মুরলীমনোহর জোশী ওয়াটার ক্যাননের তোড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বিদেশে বসে টেলিভিশনের পর্দায় এই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল— আহা, এমন কেন রোজ হয় না! এ লোকগুলির তো প্রাপ্য শাস্তি কোনও দিনই হবে না। তিহার জেলে এদের ঘানি টানার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। জলের তোড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেটুকুই হোক। জোশীর পাশে যদি আডবাণী, নরাধম মোদী, তোগাড়িয়াকেও ধরাশায়ী দেখা যেত, তা হলে সুখের অবধি থাকত না। ধর্মের কল বাতাসে অন্তত একটু নড়ুক। প্রসঙ্গত বলি— ঐতিহাসিক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। উনি খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন— মসজিদ ধ্বংস হওয়ার মুহূর্তে ওই লোকটা (মুরলীমনোহর জোশী) দু আঙুল তুলে চার্চিলীয় ভঙ্গিতে বিজয় ঘোষণা করেছিল।

সত্তরের দশকের অক্সফোর্ডের ইতিহাসে দুটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। প্রথম, বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের অল্পদিন পরে অক্সফোর্ডের কিছু রক্ষণশীল পণ্ডিত ব্যক্তি জুলফিকার আলি ভুট্টোকে সাম্মানিক এল.এল.ডি (ডক্টর অফ ল) ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশে খানসেনার অত্যাচারের পিছনে ভুট্টোর অবদান কারও অজানা ছিল না। তার উপর অল্পদিন আগেই বাংলাদেশের কসাই নামে পরিচিত টিক্কা খানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো প্রধান সেনাপতির পদ দিয়েছেন। রিচার্ড গমব্রিজের নেতৃত্বে প্রস্তাব বাতিল করার

জন্য আন্দোলন শুরু হল। এ ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ অবদান ছিল। কিন্তু আন্দোলনটা যাতে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান বিরোধ বলে ব্যাখ্যা করা না হয়, সেই জন্য আমার যা কাজ তা আড়ালে থেকেই করি।

ভুট্টো বলেছিলেন— যখন কিছু লোকের আপত্তি হচ্ছে তখন ব্যাপারটা ওখানেই থেমে যাক। ওঁর সাম্মানিক ডিগ্রির দরকার নেই। কিন্তু অক্সফোর্ডে প্রধান-স্থানীয় যাঁরা প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন, তাঁরা ওঁকে আশ্বাস দেন— কুছ পরোয়া নেই, সব ঠিক হো জায়গা। এই মহাশয়রা নিজেদের ক্ষমতা এবং প্রভাবে একটু বেশি আস্থা পোষণ করতেন। অক্সফোর্ডের পার্লামেন্ট কনগ্রিগেশনে প্রথমবার ভোটের ফল সম্পর্কে কিছু সন্দেহের কারণ ছিল। তাই আবার ভোট হল। এবার বিপুল ভোটে ভুট্টোকে ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ হয়। এই বিষয়ে কনগ্রিগেশনে বিতর্কের সময় ডিগ্রি দেওয়ার সপক্ষে মহারথীরা যেসব উক্তি করেন তা শুনে তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়েনি। অনেক বক্তৃতাই ইংরেজদের কুখ্যাত কপটতার চরম নিদর্শন বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ চরিত্রের অসাধারণ মহত্ত্বের দিকটা সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। ভুট্টোঘটিত ব্যাপার যখন ঘটে তখন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার জন হ্যাবাক্কক। আমাদের ইংল্যান্ডের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে উনি তিন মাসের জন্য দিল্লি স্কুলে এসেছিলেন। সেই সূত্রে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। ওঁর প্রশাসনের সময় ভুট্টোকে ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় উনি বেশ অপদস্থ হয়েছিলেন। এই নাটকে নাটের গুরু ছিলেন রিচার্ড গমব্রিচ। ফলে ওঁর রিচার্ডের প্রতি ব্যক্তিগত বিরাগ থাকার কথা। তা যে ছিল না— এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু বিরাগ বা অনুরাগ ওঁকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এইসব ঘটনার অল্পদিন পরে এশিয়ার ধর্ম ও নীতি বিষয়ে অধ্যাপকের পদটি— যে পদে এক সময় রাধাকৃষ্ণন ছিলেন— খালি হয়। ওই পদের জন্য অন্যতম প্রার্থী গমব্রিচ। আর সিলেকশন কমিটির অন্যতম সভ্য আমি। একদিন হ্যাবাক্কক আমাকে তলব করলেন। উনি প্রশ্ন করলেন যে, পদটির জন্য গমব্রিচের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার কী মত। আমি বললাম— আমি তো ওঁকে খুবই যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করি। হ্যাবাক্কক বললেন যে ভুট্টোঘটিত ব্যাপারে অনেকেই গমব্রিচের উপর খুব বিরক্ত। ওঁর আশঙ্কা— সেই কারণে তাঁর উপর অবিচার হতে পারে। যদি সত্যিই রিচার্ড যোগ্য প্রার্থী হয় তবে তাঁর প্রতি অবান্তর কারণে অবিচার যাতে না ঘটে তা দেখা ওঁর কর্তব্য। আমাদের দেশে অনুরূপ ক্ষেত্রে এই ন্যায়নিষ্ঠা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।

অক্সফোর্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রিসভা হেবডোমেডাল (অর্থাৎ সাপ্তাহিক) কাউন্সিল-এর প্রস্তাব বাতিল হয় যখন কর্তারা থ্যাচার শ্রীমতীকে সাম্মানিক এল.এল.ডি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তখন ওঁর রাজত্বের ছ বছর পার হয়ে গেছে। এর আগে অক্সফোর্ডের ছাত্র যে-ই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁকেই সাম্মানিক এল.এল.ডি উপাধি দেওয়া হয়েছে। শুনেছি ম্যাগি থ্যাচার অক্সফোর্ডে কর্তাব্যক্তি স্থানীয় বন্ধুদের প্রশ্ন করেন যে তাঁর ক্ষেত্রে এ প্রথার ব্যতিক্রম হচ্ছে কেন? বন্ধুরা আসল কারণটা তাঁকে বলতে বোধ হয় সাহস পাননি। তাঁর নাম শুনলে অধিকাংশ নরনারীর পিত্তি জ্বলে যায় এ কথাটা কী করে

বলা যায়? সুতরাং কর্তারা নাকি বলেন— রাজ্য শাসনের সপ্তম বছর নাগাদ সব প্রধানমন্ত্রীই কিছুটা জনপ্রিয়তা হারান। সুতরাং ঠিক এই সময়ে প্রস্তাবটা তোলা বোধ হয় ঠিক হবে না। সম্ভবত কর্তারা অল্পদিন আগেই কনগ্রিগেশনের হাতে যে প্যাঁদানি খেয়েছেন স্মৃতির কোটরে সে কথাটা তখনও সঞ্চিত ছিল। জনপ্রবাদ— থ্যাচার একথা মানতে চাননি। আর কিছু লোক আছে, যাদের কিছুতেই শিক্ষা হয় না। সেই রকম এক অতি উদ্ধত অধ্যাপকের পরামর্শেই নাকি শেষ পর্যন্ত হেবডোমেডাল কাউন্সিলে প্রস্তাবটি পাস হয়।

ব্যস, অনেকেই এই প্রস্তাবে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। প্রতিপ্রস্তাব তখনই জারি হল। ভদ্রমহিলা কতভাবে ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করেছেন, সে কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হল। এই মুদিনন্দিনী যে জাতির ভবিষ্যতের হিসাব আর মুদিখানার দৈনন্দিন লাভ-লোকসানের খতিয়ানে মৌলিক পার্থক্য আছে সেকথা বোঝেন না, আকারে প্রকারে সেটা ব্যাখ্যা করা হল। বৈজ্ঞানিকরা বলতে লাগলেন— ব্যয়সঙ্কোচ করে থ্যাচার ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানচর্চা দশ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে সে প্রধান প্রধান দেশগুলির সঙ্গে আর কখনও সমান তালে চলতে পারবে তার সম্ভাবনা নেই। ভোটের দিন দেখি হল একেবারে ভর্তি। যে বৈজ্ঞানিকদের কখনও দেখতে পাওয়া যায় না, কারণ তাঁদের কেউ কেউ চব্বিশ ঘণ্টাই ল্যাবরেটরিতে কাটান, তাঁরাও দেখি অ্যাপ্রন পরেই ভোট দিতে চলে এসেছেন। বিপুল ভোটে প্রস্তাবটি পরাজিত হল। শুনেছি এই অপমানের খবর পেয়ে মহিলা অশ্রুবর্ষণ করেছিলেন। আশা করি কথাটা সত্যি। থ্যাচারকে ডিগ্রি দেওয়া নিয়ে বিতর্কে এক বিখ্যাত রক্ষণশীল ঐতিহাসিক শিক্ষার ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচ নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবেগে কম্পমান গলায় বললেন, 'আওয়ার গ্লো-ও-ও-রিয়াস এম্পায়ার ইস নো মোর।' আহা কী শোকের কথা! আর বলছ কী? "এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?" তোমাদের গ্লো-ও-ও-রিয়াস এম্পায়ার থেকে ফায়দা ওঠাতে বলে তোমাদের এত রবরবা ছিল! এ কথা তো সাধারণ্যে তোমাদের মুখে কখনও শুনিনি। তোমরা তো জানি নেহাৎ বহু জনহিতায় খেটেখুটে অনেক রক্তপাত করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলে। এখন এসব কী অশোভন কথা! ছিঃ!

এখানে একটি মানবিক সত্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজ ঠান্ডা লড়াইয়ের অন্যতম বৌদ্ধিক ঘাঁটি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সুতরাং ওখানকার শিক্ষককুলের মধ্যে যে বড় একটি অংশ রাজনৈতিক তথা সামাজিক মতামতে রক্ষণশীল হবে একথা ধরেই নিয়েছিলাম। সত্যিতে শ্রমিক দলের সমর্থক এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রগতিবাদী সহকর্মীদের অনেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে ওই অগণতান্ত্রিক অত্যাচারী রাষ্ট্রের সপক্ষে বলার কিছুই নেই। পরবর্তী কালে স্টালিনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে এই মত ভ্রমাত্মক বলা কঠিন। কিন্তু এইসব পণ্ডিত ব্যক্তি যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্র তথা স্টালিনের অবদান সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেন, তখন তাঁদের মতামত ঠিক প্রাড়্‌বিবাকোপম নিরপেক্ষতায় ভাস্বর বলে মনে হত না। আমার ধারণা সোভিয়েত রাশিয়া হিটলারের অগ্রগতি না ঠেকালে ইউরোপে জার্মানির অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত। যদি স্টালিনের একনায়কত্ব নানা দোষের আকর

হয় তবে সেই একনায়কত্বই যে যুদ্ধে সোভিয়েত সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ এবং সেই কারণে যুক্তশক্তির শেষাশেষি জয়লাভের অন্যতর স্রষ্টা— একথা অস্বীকার করা যায় কী করে? কিন্তু আমার কোনও সহকর্মীই একথা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না।

যে মানবিক সত্যের কথা বলব বলে এইসব কথা উত্থাপন করেছি সেটি এই। যাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁরা প্রায় সবাই রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে রক্ষণশীল। মত ও পথের বিভিন্নতা মানুষে মানুষে সম্পর্কে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আশৈশব যাঁরা নানা সুবিধাভোগী শ্রেণির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার আওতায় রক্ষণশীল পরিবারের সামাজিক আদর্শ এবং বিশ্বাসের ছত্রচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছেন হঠাৎ তাঁদের বামপন্থী চিন্তাধারায় শামিল হওয়া অথবা পূর্বপুরুষের অর্জিত সাম্রাজ্যকে নেহাতই দুর্নীতির আকর মনে করা প্রায় অসম্ভব। ব্রিটেনে অনেক ক্ষেত্রে যে এই অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে তা ওদের সমাজের উৎকর্ষেরই নজির। আমার রক্ষণশীল বন্ধুদের সঙ্গে আমি রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে চলতাম। আমার মতামত কী তা তাঁরা ভালই জানতেন। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের মানবিক সম্পর্ক কখনও ব্যাহত হয়নি। একটি ছোট ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এক দিন হাই টেবিলে নতুন এক ছোকরা টোরি এম.পি ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করেন। আমার সহকর্মীরা দেখলাম বিশেষ বিব্রত বোধ করছেন। ডিনারের পর বেশ কয়েকজন এসে আমার কাছে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে গেলেন। এবং এঁরা সবাই ছিলেন টোরি দলের সমর্থক।

অক্সফোর্ডে কাজ করতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় উপকার হল আমার কাজের ব্যাপারে। যে কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল সেই কলম আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ষোলো বছরের মৌনতা ভেঙে আবার আমি লিখতে শুরু করলাম। ওখানে যাওয়ার অল্পদিন পরেই কেমব্রিজের 'হিস্টোরিকাল ম্যাগাজিন' থেকে আমন্ত্রণ পেলাম ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস, বিশেষত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বইগুলির একটি বিশ্লেষণী আলোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার। এই আমন্ত্রণের উত্তরে আমি 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম অ্যাস অ্যানিম্যাল পলিটিকস' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটি ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখাটির মূল বিষয় ছিল কেমব্রিজের ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে গবেষকদের যে থিসিস তার সমালোচনা। ওঁদের মতে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা বা অসহযোগিতার পথে গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের সন্ধান। জাতীয়তাবাদও এই স্বার্থসন্ধানের অন্যতর প্রকাশ। এই তত্ত্ব কেন গ্রহণযোগ্য নয় তা আমি নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করি। আমি শুনলাম আমার কেমব্রিজের সহকর্মীরা লেখাটা পড়ে দুঃখিত হয়েছিলেন। আমি যে তাঁদের বিশ্লেষণী অবদানের প্রশংসা করেছি, সে কথা ওঁরা খেয়াল করেননি, এতে আমি একটু আশ্চর্যই হয়েছিলাম। সমালোচনা মানেই আক্রমণ না—দেখলাম ব্রিটিশ পণ্ডিতরা এ কথা অনেক সময়েই বোঝেন না।

আগেই লিখেছি ষাটের দশকে ধর্মা কুমার এবং আমি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ

ইন্ডিয়া সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে চুক্তিতে সই করেছি। অথচ ছ'-সাত বছরে বলতে গেলে কাজ কিছুই এগোয়নি। ১৯৭৪ সনে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস চরমপত্র দিলেন— আর দু বছরের মধ্যে বইটির পাণ্ডুলিপি ওঁদের হাতে না পৌঁছলে ওঁরা চুক্তিটা বরবাদ হয়ে গেছে বলে ধরে নেবেন। এবার সত্যিতে উঠেপড়ে লাগতে হল। কাজটা সোজা না। নিজেদের লেখাটা না হয় লেখা গেল, কিন্তু মার্কিন মুলুক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র তথা জাপান পর্যন্ত ছড়িয়ে যে সহকর্মীদের লেখা দেওয়ার কথা, তাঁদের নিয়ে কী করা যাবে? আর সর্বোপরি আছেন আমার বন্ধু এবং প্রথম খণ্ডর সহ-সম্পাদক ইরফান হাবিব! তিনি চিঠির উত্তর দেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন। তবে কী করে সম্পাদনার কাজ এগোবে? শরিয়ত বা মার্কসবাদ—কোথাওই যে চিঠি লেখার বিরুদ্ধে কোনও ফতোয়া নেই একথা ওঁকে কে বোঝাবে? এক বন্ধু বললেন—চিঠিটা ইরফানপত্নী সায়েরাকে লেখো, তাতে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো একটু উজ্জ্বল হবে। সে চেষ্টা করলাম। কিছু কাজ হল। তারপর আবার যথা পূর্বম তথা পরম। এবার চরমপন্থা অবলম্বন করলাম। এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ইরফানের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত সমুদ্রের বৃদ্ধের মতো তাঁর স্কন্ধারূঢ় হলাম দেখে এবার ইরফান তৎপর হলেন। ইরফান অভিজাত মুসলমান ঘরের ছেলে। তা ছাড়া যখনই আলিগড় গিয়েছি মনে হয়েছে আঠারো শতকের মোগল দরবারে পৌঁছেছি। ঘরে কেউ ঢুকলেই সবাই উঠে দাঁড়াচ্ছেন। কোমর পর্যন্ত নুয়ে সেলাম বিনিময় হচ্ছে। ভাষায় লখনভি বিনয়। আচার-ব্যবহারে সকলেই বিনয়চন্দ্র পাপোশ। ইরফানও বামপন্থী হওয়া সত্ত্বেও একই সংস্কৃতির লোক। চিঠি লেখার বালাই নেই, কিন্তু দেখা হলে সেজন্য শত কোটি ক্ষমাভিক্ষার ব্যাপারে কোনও ত্রুটি দেখতে পাবেন না। যা হোক, সর-এ-জমিন উপস্থিত হওয়ায় এবার কাজ হল। এক ধাক্কায় সম্পাদনার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি লেখার ব্যাপারে দ্বিতীয় সমস্যা ছিল সাইমন ডিগবিকে নিয়ে। সুলতানি আমল সম্বন্ধে এই অভিজাত ইংরেজ বটুর (ওঁর পূর্বপুরুষ সত্যিই গোলাপের যুদ্ধে তলোয়ার ঘুরিয়েছেন) তুলনীয় পাণ্ডিত্য সম্ভবত আর কারও নেই। বিদ্যোন্মাদ এই ব্যক্তি কোনও নতুন তথ্য আবিষ্কার করলে সত্যিই নাচতে থাকতেন। উনি একবার দিল্লিতে জামে মসজিদের পাশের চাঁদ হোটেলে কিছুদিন ছিলেন। সেখানে দেখা করতে গেলে উনি আমাকে কফি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। দেখলাম একটি বদনা থেকে কফির জন্য জল ঢালা হচ্ছে। আরও দেখলাম বদনাটি সর্বজনের ভোগার্থে নিবেদিত পায়খানায়ও যাতায়াত করছে। সাইমন নির্বিকার। উনি আমাদের সম্পাদিত বইয়ে একটি পরিচ্ছেদ লিখতে রাজি। এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তিটির লেখার ব্যাপারে বড়ই গড়িমসি। তাই শর্ত হল উনি রোজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন এবং সেই সময় অন্তত একটি পৃষ্ঠা আমার করতলগত করবেন। শর্তানুসারে ডিগবি দিনে এক পাতা রেটে লেখা দিয়ে যাচ্ছেন। বেশ নিশ্চিন্ত আছি। কোথাও কোনও উদ্বেগের ছায়া নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি—পণ্ডিতবর গত রাত্রে পাকিস্তান চলে গেছেন। একটা চিঠি আর আমাদের ব্যবহারের জন্য দিস্তা দশেক নোট রেখে গেছেন। লুপ্ত ধন উদ্ধারের মতো সেই নোট থেকে ইরফান ওঁর বক্তব্য পুনর্নির্মাণ করেন।

যা হোক, দু' বছরের মাথায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কেমব্রিজ ইউভার্সিটি প্রেসের করকমলস্থ

করি। বইটি বের হয় তার প্রায় ছ' বছর পরে। বই ফেলে রাখা প্রকাশকদের 'বেল্লাস' (ঢাকাই কুট্টিদের ভাষায়; সাধারণ বাংলায় বিলাস) বলে আমার ধারণা।

ওই কাজটা ঘাড় থেকে নামলে বাঙালি মানস বিষয়ে আমার পরিকল্পিত বইটির কাজে হাত দিই। সে কাজ এখনও শেষ হয়নি। অনেক অধ্যয়ন, অনেক গবেষণার ফলে পর্বতপ্রমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু বইটির জন্য নানা বিকল্প কাঠামোর কথা ভেবেছি। কোনওটাই মনোমতো হয় না। জেলডিনকে সমস্যাটার কথা বলায় তিনি বললেন—চোখ বুজে লিখতে শুরু করো। ব্রেল কখনও অভ্যাস করিনি। হঠাৎ চোখ বুজে লিখি কী করে? ফলে এই চরম সমাধান আমার কাছে দুরধিগম্য মনে হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে, এই বই শেষ হওয়ার আগেই আমার আয়ুষ্কাল শেষ হবে, আমি এন্তেকাল ফরমাব। তা হলে অবশ্যি আর কিছু করার থাকবে না। তবে যতদিন সেটা না ঘটছে, আমি আশা ছাড়িনি। বিশ্বকর্মার নন্দন কীভাবে ছুছুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেন সে কথা স্মরণ রেখে কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছি।

তা ছাড়া ওই বই লেখার জন্য যে ছুতোরখানা বসিয়েছি তার থেকে ছিটকে যাওয়া কিছু কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে খান দুয়েক বই লিখেছি। তার একটি—ইউরোপ রিকনসিডার্ড—আমি পড়ানো থেকে অবসর নেওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়। বিষয়—তিন বাঙালি মনীষী পশ্চিমি সভ্যতা সম্বন্ধে কী ভেবেছিলেন তার বিশ্লেষণ।

এইখানে আমার ব্যক্তিগত জীবনের দু-একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। যে বছর ইংল্যান্ড চলে আসি তার পরের বছর বাবা মারা যান। ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল একবার ইউরোপ আসেন। যৌবনে বিলেতে এসে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য জন্য জাহাজের টিকিটও কাটা হয়েছিল। বিলেত যাত্রার জন্য কেনা ওঁর নাম-ঠিকানা লেখা ট্রাঙ্ক আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। উনি বিলেত রওনা হলেই ওঁর পুত্র-অন্ত-প্রাণ পিতা হার্ট ফেল করবেন—সাহেব ডাক্তার একথা বলায় বাবা বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। আমি অক্সফোর্ড পৌঁছে ওঁর ইংল্যান্ডে আসার সব ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু ঠিক এই সময় ওঁর ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে। ওঁর বিলেতে আসা এবারও হল না। অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে ১৯৭৪-এর জানুয়ারি মাসে বাবা মারা গেলেন। আমি মৃত্যুর সময় ওঁর কাছে ছিলাম। মৃত্যুতে ওঁর শান্ত অভিজাত মুখাবয়ব বড় মহৎ দেখাচ্ছিল। জীবনভর নানা ব্যর্থতার ছাপ সেখানে ছিল না। একটা জান্তব দুঃখ মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করল। কিন্তু প্রায় সব শোকই বোধহয় অল্পস্থায়ী। শৈশবে মাকে কাছে পেতাম না, তাই সমস্ত আবেগ এই পরম সুপুরুষ মানুষটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কৈশোরে পৌঁছতেই একটা দূরত্ব এসে যায়। বুঝতাম এতে উনি কষ্ট পেতেন। কষ্ট আমারও কম হত না। কিন্তু দ্বিধা ভেঙে পরস্পরের কাছে আসার চেষ্টা দু'জনের কারওই করা হয়ে ওঠেনি।

উনিশ শো আশির দশকে মৃত্যু যেন মহাসমারোহে আমার জীবনে আসন পাতল। ১৯৮৩ সনের ১ জানুয়ারি কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরের দিন আমার বন্ধু এবং ভগ্নিপতি শৈলেন সেন হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। লেখাপড়াপ্রিয় মানুষটি আয়কর বিভাগে চাকরি করে খুশি ছিলেন না। যদিও আমলাতন্ত্রের সিঁড়ির খুব উঁচু ধাপে উঠেই শৈলেন অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই দশটা-পাঁচটা একঘেয়ে কাজ ওঁর কাছে নিতান্তই

অপ্রীতিকর ছিল। বহু বই সংগ্রহ করে, গল্ফগ্রিনের সদ্য-পাওয়া বাড়িতে বড় একটা পাঠকক্ষ বানাবেন মনস্থ করে, মহা উৎসাহে তিনি অধ্যয়ন আর গবেষণাকেন্দ্রিক অবসর উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর ঈপ্সিত জীবন একটি দিনও ভোগ করার সুযোগ উনি পাননি। আয়কর বিভাগের অনেকেই অবসর নেওয়ার পরে ব্যবসা-বাণিজ্যঘটিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়। একদিন শৈলেনের দফতরে ওঁর এক সহকর্মী এক গণককে নিয়ে উপস্থিত। সে হাত দেখে বলে, 'স্যার, আপনি জীবনের শেষ দিন অবধি কাজ করে যাবেন।' শৈলেন হেসে বলেন, 'গণকঠাকুর, এ যাত্রা আপনার হিসেব ভুল হল। অবসর নেওয়ার পর আমি একটি দিনও আর চাকরি করব না।' শেষ অবধি গণকের হিসেবই ঠিক প্রমাণ হল।

১৯৮৯ সনে মা মারা গেলেন। আমি তখন দিল্লি পৌঁছেছি। কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই দুটো দিন বেশি দিল্লি থেকে যাওয়া মনস্থ করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা দাদার ফোন এল—মা স্ট্রোক হয়ে সেদিন সকালে মারা গেছেন। আমি কলকাতা পৌঁছবার আগেই ওঁকে দাহ করা হয়। তেষট্টি বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঠিক ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু খবরটা পেয়ে বারবারই মনে হয়েছে—চেষ্টা করলে ওঁকে আর একটু বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারতাম। বোধহয় কলকাতা এলে ওঁর সঙ্গে আর একটু বেশি সময় কাটানো কর্তব্য ছিল। কিন্তু এইসব কাজ মানুষ কর্তব্যজ্ঞানে করে না।

মা'র মৃত্যুর বছরখানেক পরে দাদাও হৃদরোগে মারা গেলেন। বহু গুণসম্পন্ন মানুষটি জীবনের নানা ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জন্মেছিলেন। যে কাজেই হাত দিতেন প্রথমে উজ্জ্বল সাফল্য নিয়ে তা শুরু হত। কিন্তু কখনওই শেষরক্ষা হত না। ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করবেন বলে উনি একটা খনি কিনেছিলেন—বেশ বিশ্বাসযোগ্য বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে। কিন্তু এক ইঞ্চির নীচে আর কোনও খনিজ দ্রব্যের খোঁজ সেখানে পাওয়া গেল না। এই ধাক্কা আর উনি সামলে উঠতে পারেননি। ওঁর বহুমুখী ক্ষমতা সাফল্যের ভিত তৈরি করতে পারেনি। শেষ বয়সে উনি দু'খণ্ড গল্পের বই লিখেছিলেন। আমার ধারণা লেখাটা উচ্চশ্রেণিরই হয়েছিল। প্রথম রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। কিন্তু ওই শেষ। দ্বিতীয় বইটির আর কোথাও সমালোচনাই হল না। এক বিখ্যাত লেখককে অকারণে চটানোয় ওঁর সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

বাবা আর দাদার জীবনের দিকে তাকিয়ে সীমিত সাফল্য থেকে আমার সুখানুভূতি কখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ যুক্তিহীনভাবে বারবারই মনে হয়—অন্য কারও প্রাপ্য আমার ভাগ্যে এসে জুটেছে। আমার অতি নিকটের দুটি মানুষ জীবন থেকে তাঁদের যা পাওয়ার তা পাননি। আর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বারবারই বহু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁরা আমার তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞানীগুণী। কিন্তু ভাগ্যের হাতে তাঁদের কোনও পুরস্কার, কোনও স্বীকৃতিই মেলেনি। দ্য রেস ইস নট অলওয়েস উইদ দা ফাস্টেস্ট।

আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অমল দত্তও ১৯৮৬ সনে চলে গেলেন। চিরতরুণ এই মানুষটি সরকারি চাকরির উচ্চতম সোপানে উঠে অবসর নেওয়ার পর ঢাকায় ইউনাইটেড নেশনস-এর অধীনস্থ জুট কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। রবি চক্রবর্তী আর আমি ঢাকার গুলশন

নামে সম্ভ্রান্ত পাড়ায় ওঁর বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে ওঁর প্রথম স্ত্রী অরুণা মারা যান। তার দু বছর পর অমল একটি মারোয়াড়ি মহিলাকে বিয়ে করেন। রোমান্টিক মানুষটি জীবনে দ্বিতীয়বার গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু ওঁর এই দ্বিতীয় বিবাহও সুখের হয়নি বলেই আমার ধারণা। সম্ভবত সেই অ-সুখ ওঁর অকালমৃত্যুর অন্যতর কারণ। ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে একটা দিনের কথা মনে পড়ছিল। ওঁর সেদিন আই.এ.এস. পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। অরুণার সঙ্গে বিয়ের দিনও ঠিক হয়েছে। আনন্দে আপ্লুত মানুষটি বারবারই বলছিলেন, 'আই হ্যাভ নো রাইট টু বি সো হ্যাপি।' ওঁর এই সুখ অল্পদিনই স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু নানা দুঃখে জর্জর ওঁর জীবনে জীবনরস কখনও শুকিয়ে যায়নি।

আরও একটা দুঃখ আমার জন্য জমা ছিল। ব্যাপারটা এত ব্যক্তিগত যে তা নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম না। শেকসপিয়ারের নাটকে মূর্খের মতো দুঃখের মুহূর্তে আমার সমস্ত মানবজাতি তথা নিজেকেই পরিহাসের বস্তু বলে মনে হয়েছিল। এই বিচিত্র আবেগের ফল— 'রোমন্থন', যা পড়ে অনেকে হেসেছেন, আমিও সে হাসিতে যোগ দিয়েছি।

অক্সফোর্ডে বিশ বছর পড়ানোর উপান্তে যখন পৌঁছেছি তখন ইউনিভার্সিটি আমাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সপ্তাহে এক নয়, দু-দুটি মূল্যবান পুরস্কারের খবর আমার কাছে পৌঁছয়। আমার সারা জীবনের ইতিহাসচর্চার পুরস্কার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ডি.লিট আমাকে দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় পুরস্কার, অ্যাড হোমিনেম চেয়ার। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার করে হাতে গোনা কিছু শিক্ষককে অধ্যাপকের পদে তোলা হয়, প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের মধ্যে থেকে এক বছরে মাত্র অল্প কয়েকজন এই সম্মানে সম্মানিত হন। একদিন হাই টেবিলে ডিনারের পর আমাদের নতুন ওয়ার্ডেন লর্ড ড্যারেনডর্ফ আমাকে আড়ালে নিয়ে খবরটা দিলেন। এই ব্যাপারে কমনওয়েলথ ইতিহাসের অধ্যাপক প্রিয় বন্ধু জুডিথ ব্রাউনের কিছু হাত ছিল। আমি তাঁকে সংবাদটি জানালাম। জুডিথ বললেন, 'চলো, হাসিকে বলবে। শুনে ওর মুখের অভিব্যক্তি কী হয় আমার তা দেখতে ইচ্ছে করছে।' সত্যিতে এই খবর দুটি পেয়ে আমার ছেলেমানুষের মতো আনন্দ হয়েছিল। ম্যাট্রিকের ফল বের হবার পর যে রকম উল্লসিত হয়েছিলাম এই আনন্দ তারই সমতুল্য। পরদিন পথে যেতে যেতে মনে হয়েছিল—আমার যারা সত্যিতেই সার্থকসাধন সব সহকর্মী,—যেমন কিথ টমাস বা থিওডর জেলডিন, তাঁদের কি সাফল্যের আনন্দে মনটা সব সময়েই এই রকম উৎফুল্ল হয়ে থাকে? আমার বীণা তো নিতান্তই ছিন্নতন্ত্রী। তার সুর ক'জনের কানেই বা পৌঁছেছে! অ্যাড হোমিনেম চেয়ার যাঁরা পান তাঁদের নিজের উপাধি নিজে বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। আমি 'প্রফেসর অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেসন' এই উপাধি গ্রহণ করি। করে একটু লজ্জাবোধই হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার আমি কী-ই বা জানি!

অক্সফোর্ডে পড়াবার সময় বহুবার অন্য দেশে গিয়েছি। কখনও স্যাবাটিকাল ছুটির সময় পড়াবার আমন্ত্রণে, কখনও ছুটকো বক্তৃতা দিতে, কখনও বা কনফারেন্স বা সেমিনারে। তিন মাস কাটে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবারায়, ওখানকার জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে। অস্ট্রেলিয়ার অসাধারণ সব জন্তুজানোয়ার, বিচিত্রদর্শন বহুবর্ণ সব পাখি (যাদের বাজারে দাম হাজার হাজার পাউন্ড) দেখতাম নির্দ্বিধায় ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে লাচিয়েনস নয়া দিল্লির স্থপতি তিনিই ক্যানবারারও স্রষ্টা। শহর দুটি একই ধাঁচে গড়া। এক ক্যানবারার মাঝখানে একটি মনুষ্যনির্মিত বিরাট হ্রদ আছে। দিল্লিতেও যমুনার জল টেনে এনে এখন যেখানে ইন্ডিয়া গেট সেখানে একটি হ্রদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা ছিল। অর্থাভাবে হয়ে ওঠেনি। ক্যানবারায় সবই আছে। শুধু মানুষ কিছু সংখ্যায় কম। ওখানে বিবাহবিচ্ছেদের হার শুনলাম পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। বোধ হয় সংখ্যায় অত কম মানুষ দেখতে দেখতে ব্যক্তিমানুষের কাছে প্রজাতিটাই অসহ্য হয়ে ওঠে। শেষাশেষি ঘরে প্রজাতির যে নমুনাটি আছে সেটিকেও রাস্তায় বের করে দেবার ইচ্ছা জন্মায়। এমন হবারই কথা।

ওই বিশ বছরের মধ্যে নানা দেশে ঘুরেছি। তার মধ্যে দুটি ভ্রমণের স্মৃতি বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার প্রথমটির অকুস্থল মেক্সিকো বা ওই দেশবাসীর উচ্চারণে মেহিকো। এক মাসের জন্য পড়াতে গেলাম কলেখিও দে মেহিকোয়। সেখানে কেউই ইংরেজি বোঝে না। ফলে বিচিত্র উপায়ে পড়াতে হল। একটি বা দুটি বাক্য বলার পর দোভাষী তা অনুবাদ করতেন। এক ঘণ্টার ক্লাস দু ঘণ্টা সময় নিত। কিন্তু মেক্সিকো আমার মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল অন্য কারণে। মনুমেন্ট ভ্যালিতে গিয়ে মনে হয়েছিল— পৃথিবীর বাইরে কোনও গ্রহে এসে পড়েছি। মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার পুরাকীর্তি সব দেখে আমার ধারণা হল যে এদের অনুভূতির জগৎ বাকি মনুষ্য প্রজাতির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আমাদের চোখে চরম নিষ্ঠুরতায় চিহ্নিত। একটা উদাহরণ দিই। দেবতার উদ্দেশে নরবলি ওদের ধর্মীয় প্রথার অন্তর্গত। সাধারণত রাজসভায় কেউ স্বপ্নাদেশ পেতেন— অমুক ব্যক্তিকে দেবতারা অধিগ্রহণ করতে চান। ব্যস, মাসখানেক তাকে খাইয়ে দাইয়ে দেবতার মতো সম্মানে লালন করা হত। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বলিটি মহা বীরত্ব দেখিয়ে ওদের পিরামিডের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতেন। উপরে নরবলির পাটাতনে তাঁকে শুইয়ে পাথরের ছুরি দিয়ে বক্ষচ্ছেদ করে হৃৎপিণ্ডটি বের করে নেওয়া হত। এই নিবেদন দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক ভয়ানকদর্শন দেবদূতের হাতে একটি বিরাট ভাণ্ড। মানুষের হৃৎপিণ্ড আর রক্তে সেই ভাণ্ড পূর্ণ করা হত। শুধু এই দেবদূত না, আজটেকদের যাবতীয় দেবদেবীর মুখে এবং দৃষ্টিতে যে মনোভঙ্গির প্রকাশ দেখেছি, মনে হয়েছে আমাদের প্রজাতির মানসিকতার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। এরা অন্য কোনও গ্রহের অন্য কোনও প্রজাতির প্রাণী। পরম দক্ষতার সঙ্গে মেক্সিকোর শিল্পী সেই মনুষ্যেতর প্রজাতির ছবি এঁকেছেন। আমাদের নন্দনবোধ তাতে উদ্দীপিত হয় না। একটা নাম-না-জানা ভয়ে প্রাণ যেন শুকিয়ে ওঠে। হাজার বছর পরে কোনও একদিন মানুষ যখন গ্রহান্তরের প্রাণীর সাক্ষাৎ পাবে, তখন কি সেই অজানা প্রজাতি মেক্সিকোর দেবতাদের রূপ নিয়ে দেখা দেবে?

মেক্সিকো বাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ওদের আহার্য। লঙ্কা খাওয়ার ব্যাপারে চাটগাঁ-নোয়াখালির লোক ওদের তুলনায় নিতান্তই শিশু। আর লঙ্কা খাওয়াটা ওরা উচ্চাঙ্গের

শিল্পের স্তরে উন্নীত করেছে। এ ব্যাপারে ওরা প্রচণ্ড শ্রেণিভেদে বিশ্বাসী। নয় রকম লঙ্কা আছে। কোন রান্নায় কোনটা ব্যবহার হবে সে ব্যাপারে নিয়মগুলি রঘুনন্দন স্মৃতির মতোই অলঙ্ঘনীয়।

১৯৮৬ সনে পাকিস্তান সরকার পৃথিবীর নানা জায়গায় কায়েদ-এ-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার নামে কিছু অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। তার একটি সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব এ নিয়ে আলোচনার জন্য অক্সফোর্ড আসেন। কলেজের পক্ষ থেকে আমাকে ভার দেওয়া হয় ব্যাপারটা সুরাহা করার। প্রথমে আমি আপত্তি করি। কারণ আমি ভারতবর্ষের নাগরিক। এই আলোচনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আমার উপস্থিতি পছন্দ নাও করতে পারেন। কিন্তু ওয়ার্ডেন বললেন, 'তুমি এই কলেজের ফেলো। এ ব্যাপারে তোমার অন্য কোনও পরিচয় নেই। গো অ্যান্ড স্লাগ ইট আউট।' আলোচনাটি ভালভাবেই উতরে গেল। যাওয়ার আগে শিক্ষাসচিব বললেন, 'একবার পাকিস্তান এসো না।' আমি বললাম, 'সত্যি? আমি কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিক।' উত্তর পেলাম— কুছ পরোয়া নেই। আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিচ্ছি। তুমি এসো।

আমন্ত্রণপত্র যখন এল, পাকিস্তান দূতাবাসে গিয়ে বুঝলাম যে ব্যাপারটা আমলাদের মোটেই মনপসন্দ হয়নি। সবাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ব্যবহার ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে 'কার্ট'। তবে ভিসা পেয়ে গেলাম— ন্যূনতম বাক্যবিনিময়ের ভিত্তিতে।

অল্প ক'দিনের মধ্যে যে যে জায়গা দেখতে চেয়েছিলাম, পাকিস্তানের ফৌজি সরকার সুষ্ঠুভাবে তা সব দেখার ব্যবস্থা করে দেন। সব কিছুতেই মিলিটারি ডিসিপ্লিনের ছাপ। কোনও অসুবিধে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বেশ ধীরেসুস্থে রসেবশে লাহোর, ইসলামাবাদ, করাচি, তক্ষশিলা, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা সবই দেখলাম। একটা জিনিস দেখা বাকি ছিল— পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের কী চোখে দেখে। ফেরার দিন দুই আগে লাহোরে নতুন পরিচিত বন্ধুদের বললাম—যদি কর্তাদের আপত্তি না থাকে তো একদিন আনারকলি বাজারে একা ঘুরতে চাই। যে সরকারি কর্মচারীটি আমার দেখভাল করছিলেন তিনি বললেন— ওঁদের উপর নির্দেশ আছে, আমাকে যেন কোনও কাজে বাধা দেওয়া না হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম— বিপদের আশঙ্কা আছে কোনও? স্পষ্ট উত্তর পেলাম— একদম না। তবে আমি যদি চাই তো ওরা কাছেপিঠেই থাকবে— যাতে নিশ্চিন্ত বোধ করি। সে রকমই ব্যবস্থা হল।

ওদেরই কাছে খোঁজ নিয়ে এক বিখ্যাত কাবাবের দোকানে গিয়ে বসলাম। আমি মুখ খুলতেই বোঝা গেল আমি স্থানীয় লোক নই। ছ-সাত ফুট লম্বা কিছু পাঠান আর পঞ্জাবি আমাকে ঘিরে ধরল। কোত্থেকে আসছ? 'হিন্দুস্তান।' 'মুসলমান না হিন্দু?' 'হিন্দু।' 'কোন অঞ্চলের?' 'বাঙালি।' এবার প্রশ্ন—ভারতবর্ষে মুসলমানদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে

কেন? বললাম— কোথাও কোথাও দাঙ্গা এখনও হচ্ছে ঠিকই, তবে অত্যাচার কথাটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। (অযোধ্যা আর গুজরাত কাণ্ডের পরে হলে আর একথা বলার মুখ থাকত না।) প্রমাণ— এখনও কি তোমাদের দেশে হাজার হাজার মুহাজির আসছে? নিয়মিত অত্যাচার হলে তো আসত। আরও একটা কথা বলি। তোমাদের চেয়ে আমাদের দেশে বেশি মুসলমান আছে, জানো? চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। তারপর প্রশ্ন—'তোমরা নাকি সব মসজিদ ভেঙে ফেলছ?' এবার আমি আপত্তি জানালাম। বললাম— আমি খরচা দেব। ইদের সময় তোমরা একজন কাউকে পাঠিয়ে দাও। ইদের নমাজের দিন তাকে আমি দিল্লির জামে মসজিদে নিয়ে যাব। এত সংখ্যক মুসলমান একসঙ্গে নমাজ পড়ছে এ তুমি হজের সময় মক্কার বাইরে কোথাও দেখবে না। বাবরি মসজিদ তথা গুজরাট-কাণ্ডর পর ওই প্রশ্ন হলে এত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দিতে পারতাম না।

আমার যা বুঝবার তা বোঝা হয়ে গেছে দেখে বিল চাইলাম। এক মুহূর্তে হাওয়া বদলে গেল। দীর্ঘাকার লোকগুলি আমাকে শুধু মারতে বাকি রাখল। তুমি ভেবেছ কী, অ্যাঁ! এ দেশে মেহমানরা কাবাবখানায় খেয়ে পকেট থেকে পয়সা দেয় না। আর খাও-ও তো নি তুমি কিছুই। জানি, বংগালিরা কমজোর হয়। তাই বলে লাহোরের মশহুর কাবাবখানায় এসে কিছু না খেয়ে চলে যাবে? এর পর সত্যিকার অত্যাচার শুরু হল। কাবাব যে পরিমাণ এল তা আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না। আরও কঠিন পরীক্ষা আমার ভাগ্যে ছিল। সমঝদার খদ্দেররা বললেন, 'আরে, আসল জিনিসই তো খাওয়া বাকি আছে। এখানকার মশহুর চা-ই তো খাওনি। এক ফোঁটা পানি না দিয়ে সেই চায়ে তৈয়ার হয়।' বিরাট গুম্ফবান সাত ফুট উঁচু মালিক গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হাঁ-আঁ-আঁ! এক বুন্দ ভি নেহি!' সেই পানিহীন প্রায় সলিড চা এল। আইসবার্গের সাইজের মোটা মোটা সর ভাসছে। দেখেই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার জোগাড়। পড়েছি মোগলের হাতে। অতএব ওই অপেয় পানীয় পান করতে হল। এর চেয়ে ওরা যদি আমাকে গলা টিপে মারত তো কষ্ট কম পেতাম। ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চাইলাম। এবার আর এক পরীক্ষা। বিরাট বিরাট সব মানুষ আমাকে ভল্লুক-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে লাগল। আমার ধারণা ভল্লুকের দেহবাস তুলনায় কম তীব্র। প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত। ওদের চোখ দেখলাম সত্যিই অশ্রুসজল। কানে শুনলাম, 'বুরা না মানিয়েগা। হাম তো সব একই হ্যায়।' আমরা সব এক? সমস্ত মনুষ্য জাতিও তো এক। এই জ্ঞান আমাদের গণ্ডমূর্খ প্রজাতির কোনও দিন কি হবে?

এই রচনার মুখবন্ধেই বলেছি সনাতন অক্সফোর্ডও আর ১৯৫০-এর দশকের অক্সফোর্ড নেই। এবং ১৯৮০-র দশক থেকে আরও দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। প্রথম বাহ্যিক চেহারার কথাই ধরি। একটি রাস্তা মোটরগাড়ি শূন্য করা হয়েছে। এ তো অতি সুসংবাদ। কর্নমার্কেট পঞ্চদশ শতকে ফিরে গেলে তার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! কিন্তু তা তো ঘটেনি। যে লায়ন্স কর্নারে সম্ভবত তাঁর জাসুসি কাহিনির খাঁটি আবহাওয়ার সন্ধানে পর্যবেক্ষণরতা আগাথা ক্রিস্টিকে দেখেছিলাম, সেই লায়ন্স কর্নার

অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। ফুলার্সের চা-ঘর তার ভুবনবিজয়ী শশার স্যান্ডুইচ সহ অদৃশ্য হয়েছে। সে যুগে অতি আধুনিক এসপ্রেসো কফির আড্ডা— যেখানে এক রথসচাইল্ড কন্যা শখের ওয়েট্রেস হয়ে কাজ করতেন, সেই লা রোমাও অন্তর্হিত। ১৯৯০-এর দশকে কর্নমার্কেট জুড়ে এক অতি আধুনিক এবং অতি কুৎসিত শপিং আর্কেড তৈরি হয়েছে। অক্সফোর্ডের পুরনো ছোটখাটো স্টেশনটির জায়গায় এক বীভৎস বিরাট ইস্টিশন দাঁড়িয়ে আছে। কলেজগুলি তাদের সংখ্যায় বর্ধমান ছাত্রগোষ্ঠীর জন্য নতুন নতুন বাড়ি তুলেছেন। বলা হয় সেগুলি শহরটির মধ্যযুগীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই তৈরি। এ কথার অর্থ আমার বোধগম্য হয়নি। উত্তর অক্সফোর্ডে পুরনো ভিক্টোরীয় যুগের বাড়িগুলি ভেঙে সব ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে। তার ঘরগুলি বেড়ালের লেজ ধরে ঘোরানো চলে এত প্রশস্তও নয়। এরাও শুনি শহরের বাস্তুশিল্পের ঐতিহ্য মেনেই বানানো। তা হবে! বাজারগুলি থেকে ছোট ছোট ফল, তরকারি, মাছ-মাংসের দোকানগুলি উঠে গিয়ে তার জায়গায় সব সুপার মার্কেটের রাজত্ব। ব্যাঙের ছাতার মতো নানা ট্রেন্ডি রেস্তোরাঁ আজ গজাচ্ছে কাল উঠে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় খাদ্যের দাম জেয়াদা, সোয়াদ বুরা। ভালর মধ্যে তিন-তিনটি থাই রেস্টোরেন্ট রীতিমতো সুখাদ্য পরিবেশন করছে। লেবাননও তার সুখাদ্যের দুয়ার মেলে ধরেছে। কিন্তু নয়া ব্রিটিশ কুইসিনের নামে যেসব বিপণি স্থাপিত হয়েছে, কেন যে ওল্ড টেস্টামেন্টের সদাক্রুদ্ধ দেবতা আগুন আর জ্বলন্ত কয়লা বৃষ্টি করে তাদের ধ্বংস করেন না, এ কথা আমার বুদ্ধির অগম্য।

কিন্তু অক্সফোর্ড যতই বদলাক, একটু খোসা ছাড়ালেই সেই অক্সফোর্ডেই আছে। ব্রড স্ট্রিট, লং ওয়াল স্ট্রিট, হাই স্ট্রিটের চেহারা পরিবর্তনহীন। নিউ কলেজের অতি সুন্দর ক্লয়েস্টার আর ভোজনকক্ষে কোনও স্থূল হস্তাবলেপন হয়নি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের জানালা দিয়ে স্বপ্নমগ্ন মিনার-খচিত নভোমণ্ডলের যে ছবি দেখতে পাই, সেও তো অব্যয়। মার্টন স্ট্রিটের পঞ্চদশ শতকীয় চেহারা একই আছে। আর পার্কসের ভিতর দিয়ে চারওয়েল একই ভাবে বয়। সেখানকার গাছগুলির পাতা হেমন্ত সমাগমে এখনও তাম্রাভ হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মে নৌকোর আশ্রয়ে তরুণ-তরুণীরা আগের মতোই পরস্পরে মগ্ন হয়। না, অক্সফোর্ড যতই বদলাক, সেই অক্সফোর্ডই থাকে। লা প্লু সা শাঁজ...

কথাটা ঠিক, আবার ঠিকও না। পঞ্চাশের দশকে যত দূর জানি সরকারি ইস্কুল থেকে মুষ্টিমেয় ছাত্রই আসত। তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির ছেলেমেয়ে প্রায় হাতে গোনা যেত। এখন বোধ হয় সরকারি স্কুল থেকে যেসব ছাত্র আসে তারা মোট ছাত্রসংখ্যার প্রায় চল্লিশ দশমাংশ বা তারও বেশি। আর শ্রমিকশ্রেণির থেকে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশ বেড়েছে। অভিজাত স্কুলের ছেলেরা আগের মতো তাদের পরিচয় নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে না। যখন ছাত্র ছিলাম তখন গ্রীষ্মের মরসুমে প্রায়ই দেখতাম স্বর্ণমণ্ডিত তরুণরা সকালবেলা শ্যাম্পেন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। বহু দিনের মধ্যে তুলনীয় দৃশ্য চোখে পড়েনি। শ্রমিকশ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা আগের মতো কুঁকড়ে থাকে না। বড় ঘরের ছেলেরা অত বুক ফুলিয়ে চলে না। অক্সফোর্ড ইউনিয়ন নামে ছাত্রদের বিখ্যাত ডিবেটিং ক্লাব তার আগের

মর্যাদা হারিয়েছে। এখন আর ওখানকার সভ্য হওয়া কেউ আবশ্যিক মনে করে না। অন্য পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও ছাত্র ইউনিয়ন হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রীতিমতো পাঞ্জা লড়ে।

ছাত্রছাত্রীদের মনোভঙ্গিতেও একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। আগে দেখতাম পরীক্ষার ফল নিয়ে অনেকেই খুব মাথা ঘামাত না। পড়তে এসেছে, যা ভাল লাগত তাই পড়ত। অনেকেই একাধিক ভাষা জানত। ধনী ঘরের ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাতে হত না। মধ্যবিত্তরাও জানত অক্সফোর্ডের ডিগ্রি ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এখন সে যুগ বদলে গেছে। অনেকেই পরীক্ষার কথা ভেবে খুব খেটে পড়ে। পড়ানোর ব্যাপারেও পরীক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয়, যা কি না আগে একেবারেই রেওয়াজ-বহির্ভূত ছিল। আর একটা পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশের দশকে ধনী ছাত্ররাই বিদেশভ্রমণে যেত। মধ্যবিত্তরা ক্বচিৎ কখনও। এখন সবাই ছুটিতে বেড়াতে যায়। তার জন্য পয়সা রোজগারও করে। ফলে পড়ার জন্য বাকি সময়টা একটু কমের দিকেই থাকে।

আর এক ব্যাপারে মস্ত পরিবর্তন হয়েছে। কে কী পরবে— মাস্টার-ছাত্র কেউই তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। গাউন পরা তো পরীক্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে উঠেই গিয়েছে। সকালবেলা সাইকেলবাহন গাউন পরা ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে যাওয়ার দৃশ্য বড় ভাল লাগত। এখন শুধু পরীক্ষার সময়ে ওই দৃশ্য চোখে পড়ে। আর পরিধেয় সম্বন্ধে সবারই বড্ড বেশি বেপরোয়া ভাব। টাই পরা তো প্রায় উঠেই গিয়েছে। সন্ধেবেলা ইভনিং ড্রেস পরে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সান্ধ্যভোজ বা কনসার্টে চলেছে— এমন দৃশ্যও বর্তমান দশকে নিতান্তই বিরল। দৈনন্দিন জীবনে আর একটু রং আর একটু চাকচিক্য বজায় থাকলে বোধ হয় মন্দ হত না।

অ্যাট্টিলার নারী অবতার ম্যাগি থ্যাচারের রাজত্বে শিক্ষার মান নিচু করার জন্য যেসব বিচিত্র ব্যবস্থা হয়, তার অভিঘাত অক্সফোর্ডের জীবনেও অত্যন্ত স্থূলভাবে দেখা দেয়। এক নতুন শব্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে অন্ধকার ছায়া ফেলল। তার নাম অ্যাকাউন্টেবিলিটি। অর্থাৎ হিসাব দাও। সব কিছুরই হিসেব দিতে হবে। মহিলা রোজ সন্ধ্যায় পিতৃদেবকে হিসেব মেলাতে দেখেছেন। সুতরাং রাজ্যভার কাঁধে নিয়ে উনি যে সকলের কাছে হিসেব চাইবেন— এ আর বিচিত্র কী? মাস্টার পণ্ডিতদের কাছে কীসের হিসেব চাওয়া হবে? ভাল পড়ানোর হিসেব হয় না, মেধা বা পাণ্ডিত্য বাটখারায় মাপা যায় না, বিদ্যার জগতে মহান সৃষ্টির মাহাত্ম্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিক্তিতে ওজন করে বিচার হয় না। তবে? এসব সামান্য আপত্তিতে ভবি ভুলবার নয়। গুণ মাপা কঠিন হতে পারে, কিন্তু ওজন মাপার তো নানা উপায় আছে। বছরে ক'ঘণ্টা ক্লাস নিয়েছ, ক'টা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছ, ক'টা বই, ক'টা প্রবন্ধ লিখেছ, প্রবন্ধগুলি দৈর্ঘ্যে ক'পাতা— এসবের তো হিসেব সম্ভব। সেই হিসেবেই দাও। তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নির্ণয় করা হবে। আমার মনে হল এই স্ত্রীলোক বিশ্ববিদ্যালয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মার্কিন শিক্ষাজগতের পাবলিশ অর পেরিশ-এর আদর্শ ব্রিটিশ শিক্ষাজগতে ভিত গাড়ল। আশ্চর্য ব্যাপার এই— ম্যাগি যে সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করছেন তাতে কেউ বিশেষ

আপত্তি করলেন না। অনেক দিন ইংরেজদের দেখে আমার ধারণা জন্মেছে— এঁরা অতি নিয়মনিষ্ঠ জাতি। কর্তারা যে হুকুমই দিন, সেটা মেনে চলাই ওঁদের স্বভাব— যতদিন না সেটা সম্পূর্ণ অসহ্য হয়ে ওঠে। তখন এঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেন। ইতিহাসের নজির এই। যেসব বিচিত্র ব্যবস্থা চালু হতে লাগল, তাতে সবাই লাঠিসোটা দা-কুড়াল হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে ডাউনিং স্ট্রিটের দিকে ধাবিত হল না কেন— এটা আমার কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

নয়া জমানার একটা উদাহরণ দিই। সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট নামে এক বিচিত্র অনুষ্ঠান চালু হল। এটা নাকি ব্যবসার জগতে খুবই চালু। আর ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবসাজগৎ থেকে দক্ষতার ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং ম্যানেজমেন্ট পণ্ডিতরা কী করে পরস্পরকে সেল্ফ অ্যাসেসমেন্টে সাহায্য করতে হবে আমাদের তা শেখাতে এলেন। শিক্ষকরা পরস্পরকে ‘সেল্ফ অ্যাসেস’ করবেন। যেমন ধরুন সংস্কৃতের অধ্যাপক ইজিপ্টোলজির অধ্যাপককে। তাঁরা রোজই কমনরুমে এগারোটার সময় একসঙ্গে কফি খান। তা বললে চলবে না। যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তিনি ইন্টারভিউইর ঠিক মুখোমুখি না, একটু ট্যারচা হয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসবেন (বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বাড়াচ্ছি না)। তারপর ‘সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট’ শুরু হবে। এই দিব্যজ্ঞান আমরা ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্টদের পদতলে বসে লাভ করলাম।

অধ্যাপকরা অবসর নেওয়ার সময় ওখানে একটি সুন্দর প্রথা আছে। ফ্যাকাল্টি বোর্ডের সভাপতি অবসরমুখিন অধ্যাপকের কাছে তাঁর দীর্ঘদিন অক্সফোর্ডে পড়ানোর অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি লিখিত মন্তব্য চান। আমি লিখেছিলাম— এখানে পড়াতে এসে সত্যিই আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। যা আশা করেছিলাম সবই পেয়েছি। তার বেশিও অনেক কিছু ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্তে মা কী হইতেছেন এবং হইবেন দেখে বড় আহত বোধ করেছি। ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান ও খ্যাতি জগদ্ব্যাপী। বলতে বাধা নেই, প্রতিযোগিতার মুখে বিশ্ববাসীর চোখে ওদেশের শিল্পবাণিজ্য তুলনীয় সম্মানের যোগ্য নয়। তবে কেন আমাদের ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের ঘর সামলাবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে হবে? কেন আমরা সবাই এই নয়া নীতি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলাম? চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক উত্তর দেন— উনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়। সত্যিই কি অক্সফোর্ড অতটা নিরুপায় ছিল? শুধু একমুঠো টাকার জন্য আমরা আমাদের ঐতিহ্য বিপন্ন করলাম। সে টাকা সারা পৃথিবীতে ছড়ানো আমাদের ছাত্রছাত্রী সমর্থকরা তুলে দিতেন না?

ইতিহাস বিভাগে নতুন পাবলিশ অর পেরিশ নীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একজন বললেন, আমাদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কিথ টমাস তাঁর প্রথম বইটি লিখতে আঠেরো বছর সময় নিয়েছিলেন। এখনকার দিনে হলে তাঁর চাকরি চলে যেত— দীর্ঘদিন কিছু না লেখার অভিযোগে। প্রত্যুত্তরে এক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন ‘উই ক্যান নট অ্যাফোর্ড দ্যাট সর্ট অফ থিং এনি লংগার।’ কেন রে বাবা? এমন কী ঘটেছে যাতে কিথ টমাসের মতো অসামান্য প্রতিভাবান লোককে নিশ্চিন্তে দীর্ঘদিন বসে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টির কাজ করতে

দিতে পারি না? কেন তার মতো মানুষদের বছরে দু-তিনটে প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য করা হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো সময় কারও নেই।

১৯৫০-এর দশক থেকে আর এক ব্যাপারে অক্সফোর্ড অনেক দূরে চলে এসেছে। যত দূর জানি— সেই সময় মাত্র দু'জন বাঙালি স্থায়ীভাবে ওই শহরে বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন— প্রবাদপুরুষ দার্শনিক বসন্ত মল্লিক, একদা রবার্ট গ্রেভস-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনজন ইংরেজ মহিলা ওঁর ভরণপোষণের ভার নিয়েছিলেন। উনি তাঁদের রহস্য করে 'মাই গোপিস' বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু ১৯৭৩ সনে অক্সফোর্ড পৌঁছে দেখি—গোটা তিরিশ মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু পরিবার ওখানে বাস করছেন। বাংলাদেশি দোকানদার, সবজি বিক্রেতা, রেস্টোরেন্টের মালিক ইত্যাদি বেশ কিছু আছেন। তাঁরা এই হিসেবের মধ্যে পড়েন না। আমরা প্রথমেই ঠিক করেছিলাম আমরা কোনও বাঙালি গেটোর (ghetto) শামিল হব না। বিদেশে কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হলেই সাধারণত প্রথম প্রশ্ন 'কোথায় থাকেন'-এর পর অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় প্রশ্ন 'ওখানে ক'জন বাঙালি আছে।' এ প্রশ্নের উত্তরে আমি একবার বলেছিলাম, 'আমি লোকগণনা বিভাগে কাজ করি না।' উত্তরটা আমার জনপ্রিয়তা বাড়ায়নি। কোনও ব্যক্তি বাঙালি— সেই হেতু তার কণ্ঠলগ্ন হওয়া আমার পক্ষে আবশ্যিক, এ তত্ত্বে আমি বিশ্বাসবান নই। হলে আমাকে উনত্রিশ কোটি কণ্ঠ আঁকড়ে ধরতে হত। সহ্য হত না। আমার বাহু বড় দুর্বল। কলকাতা শহরেই কমবেশি বেশ কয়েক লক্ষ বাঙালির বাস। এখানে শুধুমাত্র বাঙালি এই কারণে কেউ বন্ধুত্ব পাতায় না, পাতালে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নানাভাবে গড়ে ওঠে। এক ভাষা বলি— শুধু এই কারণে বন্ধুত্ব স্থাপন নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার। অস্বাস্থ্যকরও বটে। বিদেশে শুধু এই ভাষার ভিত্তিতে সব বাঙালিগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাদের প্রধান আনন্দ হয়ে দাঁড়ায় যাকে এক বন্ধু 'কারি এক্সচেঞ্জ ক্লাব' বলে বর্ণনা করেছিলেন তাই। প্রতি সপ্তাহান্তে কারও না কারও বাড়িতে বহু পদসমৃদ্ধ ভোজনায়োজন তার প্রায় একমাত্র লক্ষ্য। মাঝে মাঝে মাছের ঝোলের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। কিন্তু এই মাছভাত আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুর্ভেদ্য দেওয়াল স্থানীয় বিদেশি সংস্কৃতিকে 'দূর হটো, দুনিয়াওয়ালে' বলে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে। স্থানীয় সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির সঙ্গে কারি ক্লাবের সভ্যদের সাধারণত কোনও পরিচয় ঘটে না। ওদেশে ত্রিশ বছর বাস করছেন এই রকম একজন উচ্চশিক্ষিত পেশাদার বাঙালি মহিলা ন্যাশনাল গ্যালারির প্রসঙ্গ উঠলে প্রশ্ন করেছিলেন— 'ওখানে বুঝি অনেক বই আছে?' পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে বহু প্রবাসী বাঙালি এক দ্বৈপায়ন জীবনযাপন করেন। আমি যা বলছি তা আমার সীমিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তার ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকতে পারে। এ জীবন থেকে শত হস্ত দূরে থাকা আমার বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। আর অক্সফোর্ড এসেই শুনি— অতুলবাবু হাসিকে কত লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন— তা নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে। তবে শেষাশেষি দু' লাখ টাকাটাই আসল অঙ্ক এরকম একটা সমঝোতা হয় বলে শুনতে পাই। অচিন্ত্য সেনের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য এ ব্যাপারে কাজে লেগেছিল— সন্দেহ নেই। আমাদের জীবন সম্বন্ধে এই উগ্র কৌতূহলও বাঙালি গেটো থেকে আমাদের দূরে থাকতেই উৎসাহিত করে। এই সিদ্ধান্ত আমাদের জনপ্রিয়তা বাড়ায়নি। যথাকালে কিছু

অক্সফোর্ডবাসী বাঙালির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তবে তার কারণ তাঁদের বাঙালিত্ব না, মনের মিল।

অক্সফোর্ডের বাঙালিদের কথা বলতে গিয়ে দুটি মানুষের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। তার একজন, অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, যিনি টরন্টো থেকে স্পল্ডিং প্রফেসর হয়ে অক্সফোর্ড আসেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, প্রবাদপুরুষ নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বিমল শান্ত, সংযত, লাজুক প্রকৃতির মানুষ। বিদ্যা, তার চেয়েও ধীশক্তিতে অসাধারণ ব্যক্তি। ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিন্তু ঠিক বন্ধুত্ব হয়নি। ওঁর চিন্তার ধরনটা ছিল সম্পূর্ণ অ্যাবস্ট্রাক্ট। তার সঙ্গে তাল রেখে চলার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার ছিল না। এই মানুষটিকে অক্সফোর্ডের সবচেয়ে সম্মানিত দার্শনিকরা— ডামেট এবং স্ট্রসনের মতো লোক— বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু উনি নিজেকে অবাঞ্ছিত মানুষ বলে মনে করতেন। কারণ ওঁর কথা ইংরেজি পাবলিক স্কুল বয়দের মতো ছিল না। ওঁকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি— ওঁর আত্মজ্ঞান সত্যভিত্তিক না। অতি বুদ্ধিমান মানুষটি ভাবতেন— ওঁকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছি। নেহাতই অল্প বয়সে ওঁর হাড়ের ভিতরকার মজ্জায় ক্যানসার ধরা পড়ে। সেদিন আমিই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষার পর ডাক্তার নির্দ্বিধায় বললেন— বিষয়-আশয় সংক্রান্ত যা ব্যবস্থা করার করে ফেলুন। আপনি আর বছর তিনেক বাঁচবেন। ঠিক তিন বছরের মাথায় উনি মারা যান। মৃত্যুর দু'দিন আগে ওঁর শেষ প্রবন্ধটি লিখে এক ছাত্রের হাতে দেন 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দেবার জন্য। বিমল মরতে চাননি। ওঁর আরও অনেক কাজ বাকি ছিল। কিন্তু অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে তিনি শান্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। মহাভারত থেকে দুর্যোধনের মৃত্যুর দৃশ্যটি উনি একদিন আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। অন্যায় যুদ্ধে বীরের মৃত্যুর বিবরণ সম্ভবত ওঁকে নিজের অকালে আসন্ন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

নীরদবাবুর মতো বিচিত্র চরিত্রের মানুষ আমি আর কাউকে দেখিনি। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ওঁকে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তেমন আর কেউ পায়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অনেকেই ওঁর পাণ্ডিত্য আর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা বলে। ওঁর চেয়ে বেশি পাণ্ডিত্য আমি বাঙালিদের মধ্যে সুখময় চক্রবর্তী, রবি দাশগুপ্ত এবং অমলেশ ত্রিপাঠীর মধ্যে দেখেছি। এবং সম্ভবত স্মৃতির ব্যাপারে ত্রিপুরারিবাবু ওঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এক ক্ষেত্রে ওঁর সঙ্গে তুলনীয় কাউকে আমি দেখিনি। জীবন ওঁর কাছে অন্তহীন আকর্ষণের বস্তু ছিল। ওঁর স্মৃতির ভিত্তি সেই আকর্ষণজাত কৌতূহলে। ওঁর প্রতিবেশী ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে শুনি কীভাবে তাঁর নীরদবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়। একদিন দরজায় ঘণ্টা শুনে বের হয়ে এসে ভদ্রলোক দেখেন— থ্রি পিস স্যুট, বোলার হ্যাট আর বো টাই পড়ে নীরদবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। উনি একটি অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর শোওয়ার ঘর থেকে ভদ্রলোকের বাগানের একটি ফুলগাছ চোখে পড়ে। উনি জানতেন যে ওই ফুলের পাপড়ির উপরের আর নীচের রং আলাদা। নীচের রংটি কী সেই কৌতূহল মেটাবার জন্য তিনি এসেছেন। নীরদবাবুর বয়স তখন পঁচানব্বই।

দেশভ্রমণ করার মতো সম্বল ওঁর ছিল না। কিন্তু পুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে ওঁর বিশ্বদর্শন

হয়েছিল। বিশেষ করে ইউরোপ সম্পর্কে এ কথাটা খাঁটি সত্য। ঈজিপ্ট থেকে ফিরে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি ভ্যালি অফ কিংস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি ট্যুরিস্ট হিসেবে গিয়েছি। যদিও আমরাও এম.এ ক্লাসে মিশরের ইতিহাস পড়েছি, কিন্তু অত খুঁটিয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি। ওঁর প্রশ্ন শুনে মনে হল— উনি যেন কালই ও-দেশ থেকে ঘুরে এসেছেন। ওঁর ঘরে আমি মিশর-বিষয়ক কোনও বই দেখিনি। তাই জিগ্যেস করলাম— আপনি শেষ কবে মিশর সম্বন্ধে পড়াশুনো করেছেন? হিসেব করে বললেন— সত্তর বছর আগে। ওঁর স্মৃতিশক্তি না, অন্তহীন জীবনরস মিশরের ইতিহাস ওঁর চেতনায় বাঁচিয়ে রেখেছে। আর একবার বার্লিন থেকে ফিরেছি। তারপর ওঁর ব্যগ্র সব প্রশ্ন। ওদের বিখ্যাত মিউজিয়াম পশ্চিম না পূর্ব বার্লিনে? প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদ কি এখনও ওখানে আছে? আর নেফরতিতির অসমাপ্ত মূর্তিটি? শেষোক্ত বস্তুটির একটা ছবি নিয়ে এসেছিলাম। দেখালাম। বললেন, 'আবার কখনও গেলে আমার জন্য একটি আনবেন।' এনেও দিয়েছিলাম। তারপরই ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ছেলেমানুষি শুরু। টেম্পেরা রং করে ছবিটিতে কিছু বস্তুসংযোগ করে দ্বিমাত্রিক ছবিটিকে ত্রিমাত্রিক করার ব্যর্থ প্রয়াস। বললেন, হাত দিয়ে দেখুন, একদম জীবন্ত মনে হবে। আবক্ষমূর্তির ছবি। কোথায় হাত দিয়ে তার ত্রিমাত্রিকতা পরীক্ষা করব? সাড়ে তিনি হাজার বছর আগেকার এই অসাধারণ সুন্দরীর শ্লীলতা অক্ষুণ্ণ রইল।

ওঁর মৌলিকতার দিকটা পাঠক বা সমালোচক কেউই যথেষ্ট খেয়াল করেনি। ওঁর অনেক ধ্যানধারণা উদ্ভট সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁর মৌলিকতার ইতিবাচক দিকটা ভুললে ক্ষতিটা আমাদেরই। একটা কথা উনি বারবারই বলতেন। রবীন্দ্রনাথের দশটি গল্প বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। সে গল্পগুলি বিশিষ্টভাবে বাঙালি হয়েও বিশ্বজনীন। কবি নিতান্তই বাঙালি কবি, বিশ্বকবি পরিচয়টা ওঁর অনিষ্ট করেছে। বাংলার জলপথ, ছায়াঘেরা গ্রাম ওঁর চেতনার কেন্দ্রস্থলে। মনে হত মানুষটির নিজের শৈশবচেতনা, ওই উদার জলপথ আর ছায়াঘেরা গ্রামের স্মৃতি, ওঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনা ওঁর জীবনে কতটা জায়গা জুড়ে ছিল, ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হলে তা জানতে পারতাম না। একদিন ওঁর প্রিয় ছোটগল্প 'দৃষ্টিদান' পড়ে শোনাচ্ছেন। শেষ অংশে পৌঁছে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'আমি এ আর পড়তে পারি না।' ওঁকে দিয়ে ওঁর প্রিয় দশটি গল্প অনুবাদ করাবার বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু বললেই উনি বিশ্বভারতীকে গাল পাড়তে শুরু করতেন। সেখানেই আমার প্রস্তাবের ইতি।

ওঁর সঙ্গে আলোচনায় অনেক সময়েই ওঁর প্রিয় নেতি ও ইতিবাচক কয়েকটি কথা বারবার ফিরে আসত। তার আলোচনায় লাভ নেই। ওঁর লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা এইসব কথা অনেকবারই পড়ে থাকবেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁর মাথায় যেসব চিন্তা আসত সেগুলি অসাধারণ স্বকীয়তায় ভাস্বর। এক সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি উনি কুমারসম্ভবম পড়ছেন। বললেন— একটা কথা মনে হচ্ছে। কালিদাস ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের রচনায় দুটি প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক জগতের ছবি আছে। ওঁরা যখন নরলোকের কথা লেখেন তখন তাতে সমসাময়িক জীবনের বর্ণনা। আর দেবলোকের বিবরণীতে প্রাচীন

ভারতের যে ছবি ওঁদের মনে জাগরূক ছিল তারই প্রতিফলন। আর একদিন কবি ভবভূতির বিখ্যাত আত্মঘোষণার এক অভিনব ব্যাখ্যা দিলেন। কবি লিখেছেন "কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী", সুতরাং কখনও কোথাও তাঁর 'সমানধর্মা' কেউ হবে। শ্লোকটিকে সাধারণত এক অসামান্য আত্মশ্লাঘার অভিব্যক্তি বলে ধরা হয়। নীরদবাবুর মতে সংস্কৃত সাহিত্যে সূক্ষ্ম অথচ বলিষ্ঠ আদিরসের প্রকাশ আছে, কিন্তু রোমান্টিক প্রেম বলতে যা বুঝি তার কোনও স্থান নেই। ব্যতিক্রম 'উত্তররামচরিত'। সমসাময়িকরা ওই অপরিচিত অনুভূতির বিবরণ বুঝতে পারেননি। উক্ত শ্লোকটি সেই না বোঝা নিয়ে আক্ষেপ, অহমিকার প্রকাশ না। অনেক বলেছিলাম—এই কথা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতে। কে কার কথা শোনে!

এই অসাধারণ মানুষটির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমি নানা দিক থেকে লাভবান হয়েছিলাম। কিন্তু প্রদীপের নীচেই যে ঘন অন্ধকার ছিল তার কথা না লিখলে অর্ধসত্য প্রচারের দোষে দোষী হব। বঙ্কিমের এক ভক্ত লিখেছিলেন— ওঁর দম্ভের কথা না বললে ওঁর চরিত্রচিত্রণ অসম্পূর্ণ থাকে, বিবরণীটা মিথ্যাভাষণ হয়ে দাঁড়ায়। নীরদবাবুর জীবনে ওঁর 'দোষের দিক' আলোচনা না করলেও মিথ্যাভাষণই হয়। শুধু ওঁর দোষগুলি ঠিক ব্যক্তিগত গুণাগুণের ফর্দে পড়ে না। বিদেশি শাসনে আমাদের জীবনভরা ব্যর্থতা আর অপমান আমাদের চেতনায় নানা বিকৃতির সৃষ্টি করেছিল। প্রচণ্ড জীবনীশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্রকায় মানুষটির ব্যবহারে সেই বিকৃতিগুলি বড় বেশি প্রকট ছিল। ওঁদের প্রজন্মে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাঙালি সংখ্যায় কিছু কম ছিল না। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের সীমিত সুযোগসুবিধে এডওয়ার্ডীয় যুগে শেষ হয়ে গেছে। প্রতিভাবান মানুষগুলি বিদেশি শাসনে তাঁদের প্রাপ্য সাফল্য, সম্মান বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকেই পাননি। তাঁদের এই ব্যর্থ সম্ভাবনার ইতিহাস নীরদবাবুর চোখে বাঙালির আত্মহননপ্রবণতার রূপ নিয়েছে। কী তীব্র দারিদ্র আর অপমানের মধ্যে ওঁর প্রথম জীবন কাটাতে হয়েছে, তা নীরদবাবু নিজেই লিখেছেন। ওঁদের প্রজন্মে অসংখ্য পরাজিত ব্যর্থকাম মানুষের ভিড়ে অল্প কিছু মানুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। নীরদবাবু সেই মুষ্টিমেয় লোকেদের একজন। কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রামের ক্ষতচিহ্ন ওঁর সর্বাঙ্গে। ওঁর দোষ বলতে সেই ক্ষতচিহ্নগুলিই বুঝি। তসলিমা নাসরিন ওঁর সঙ্গে দেখা করে চলে আসবার সময় গেটে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে 'দুঃখী মানুষটি' বলে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা লেখিকার সুপরিচিত সত্যদৃষ্টিরই প্রকাশ।

আমার সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয় ১৯৪৬-৪৭ সালে— কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির অধিবেশনের সময়, দিল্লিতে আমার পিসেমশায় কিরণশঙ্করবাবুর বাসায়। তারপর ওঁর মোরি গেটের বাড়িতে গিয়েছিলাম— উনি কোন পদ্ধতিতে ওঁর বিরাট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন সে কথা জানতে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে। কিন্তু খুব কিছু লাভ হয়নি। দিল্লিতে ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৭২ অবধি পনেরো বছর বাস করার সময় আমি আর ওঁর খোঁজ ক‌রিনি। আবার সাক্ষাৎ হল অক্সফোর্ডে। সেখানে ওঁর জীবনের শততম বছর অবধি কতবার যে ওঁর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়েছি, তার কোনও হিসেব রাখিনি।

নীরদবাবুর লেখা প্রধানত ইউরোপে যাকে বেল্ লেত্র্ বলে সেই শ্রেণির। সুন্দর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় নানা বিষয়ে ওঁর নিজস্ব মতামত উনি প্রকাশ করেছেন। বক্তব্য তথ্যপ্রমাণ বা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা উনি করতেন না। ওঁর ভাবটা ছিল— এই আমার মত। এটা আমার সত্যদৃষ্টিপ্রসূত। ইচ্ছে হলে গ্রহণ করো, না করো তো ক্ষতি তোমাদের, আমার না। ভারতবর্ষের বর্তমান এবং সনাতন সভ্যতা সম্পর্কে ওঁর মতামত অনেক সময় উদ্ভট মনে হত। কিন্তু বহু সময়ই বর্তমান ভারত বিষয়ে ওঁর অন্তর্দৃষ্টিগুলি অসাধারণতায় উজ্জ্বল। এবং আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে যেসব নির্মম কথা লিখেছেন, তার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না।

কিন্তু এইসব রচনা শুধু মাত্র সত্যসন্ধানী দৃষ্টির প্রতিফলন ভাবলে ভুল হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ওঁর লেখা পড়বে। তাই সেসবের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পটভূমি আমি যেটুকু বুঝেছি তা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করছি। এবং সেই প্রসঙ্গে আমি যা বলব তা কারও কারও কাছে নিন্দাসূচক মনে হতে পারে। এই কথাগুলিই একদিন ছোট একটি আড্ডায় কয়েকজন পরিচিত মানুষকে বলছিলাম, তাঁদেরই নানা প্রশ্নের উত্তরে। একজন প্রতিবাদ করে বললেন, 'মশায়, আপনি মৃত ব্যক্তির নিন্দা করছেন!' উত্তরে বলি, 'আমার পেশা ইতিহাস লেখা। আমি যদি মৃত ব্যক্তিদের কখনওই নিন্দা না করি, তাহলে তো আমার কলম তুলে রাখতে হয়।' নীরদবাবুর নিকটাত্মীয়রা আমার বন্ধু এবং প্রিয়জন। এখন যা লিখব তা তাঁদের কাছে অপ্রিয় মনে হতে পারে। কিন্তু কথাগুলি বিদ্বেষপ্রসূত না, আশা করি একথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন। নীরদবাবু বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রবাদপুরুষ। আবারও বলি—ওঁকে আমার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ আর কারও হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস, ওঁর পুত্রদেরও না। কারণ বয়স্যভাবে সন্তানদের পাওয়ার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়। ওঁর মতো কোপনস্বভাব মানুষের সে সৌভাগ্য নাগালের বাইরে ছিল। এসব কারণে যে কথাগুলি লিখতে যাচ্ছি তা লেখা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলেই মনে করি।

প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ মানুষটি সব ব্যাপারেই অসাধারণ ছিলেন। ওঁর জীবনজিজ্ঞাসা যেমন সাধারণ মানুষের তুলনায় বহু গুণ তীব্র, ওঁর ঘৃণা করার প্রবণতাও তেমনই অসামান্য ছিল। এই তীব্র ঘৃণার সামাজিক পটভূমি বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

একবার তাঁর লেখার এক বিশিষ্ট ভক্তকে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বের হয়ে এসেই সরল প্রকৃতির মানুষটি প্রশ্ন করলেন, 'এত বড় মানুষটির এত হীনম্মন্যতা কেন?' বিদেশি শাসনের অবহেলিত জীবনে শিক্ষিত বাঙালি নানাভাবে তাঁদের অপমানবোধ আর ব্যর্থতার প্রতিষেধক খুঁজতেন। তার অন্যতর প্রকাশ ছিল আত্মমহিমা প্রচার আর বংশগৌরবের দাবিতে। নীরদবাবু লিখেছেন—ওঁর সাফল্যের একটি কারণ, ওঁর আত্মপ্রচার। কথাটা ঠিক না। উনি যদি আত্মপ্রচার কিছুটা কম করতেন তাহলে সেই অনুপাতেই পাঠক/পাঠিকা ওঁর বক্তব্য আরও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করত।

ওঁর বংশগৌরবের দাবি আমাকে অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুর্দা' গল্পের নায়ক— প্রখ্যাত নয়নজোড়ের রায়চৌধুরী বংশের কৈলাসচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দিত। নীরদবাবুর

পিতাঠাকুর মফস্বল আদালতে মোক্তারি করতেন। কিছু অসম্মানের কাজ না। স্বয়ং মতিলাল নেহরুও বস্তুত মোক্তারই ছিলেন। কিন্তু নীরদবাবুর কাছে এ পরিচয় যথেষ্ট নয়। তাই ওঁর বর্ণনায় উনি ভূস্বামী বংশের সন্তান, ওঁর পত্নীর পদবি 'দেবী চৌধুরানী' (ময়মনসিংহের বিরাট জমিদার বা রাজপরিবারগুলিতেও অনুরূপ পদবির ব্যবহার বেশি ছিল না), উনি আর ওঁর মনিব শরৎ বসু সমশ্রেণির লোক ইত্যাদি ইত্যাদি। ওঁর আত্মপরিচয়েও বিচিত্র অতিরঞ্জনের ছাপ। সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি নিয়ে শেলডোনিয়ান হল থেকে বের হয়ে এসেই উনি এক ইংরেজকে বললেন— 'আই টেক দিস ডিগ্রি অ্যাস অ্যান ইংলিশম্যান।' আমি পালাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। উনি বাড়িতে ট্রাউজারের নীচে ধুতি পরতেন। ওই ধুতিই যে ওঁর প্রকৃত এবং একমাত্র পরিচয়, বিরাট প্রতিভাধর মানুষটির এই সচেতনতা ছিল না।

পারিবারিক গরিমা বিষয়ে অতিসচেতনতার বীজ ওঁদের পরিবারে ওঁর জন্মের আগেই উপ্ত হয়েছিল মনে হয়। নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাবোধই এই স্পর্শকাতরতার জনক বলে আমার ধারণা। ওঁদের গ্রামের বাড়িতে টিন বা অ্যাসবেস্টসের ছাদ। সেই ছাদ থেকে পিতাঠাকুর শ্যান্ডেলিয়ার বা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়েছিলেন। সম্পদশালী মানুষ ছাড়া অন্য লোকের বাড়িতে ও বস্তু দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তো নয়ই। আর টিনের ছাদ থেকে ঝোঝুল্যমান হলে জিনিসটা ঠিক সুদৃশ্য হয় না। ওঁর কোনও পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটি কাহিনি উনি অনেকবার বলেছেন। বাড়ির উঠোনে কেউ লাউগাছের চারা পুঁতেছে দেখে তিনি নাকি তৎক্ষণাৎ ওটি উৎপাটনের আদেশ দেন। ওঁর বক্তব্য, 'আমার বাড়িতে যদি লাউগাছ হয়, তবে কে লাউ কিনে খাবে?' নীরদবাবুর আত্মজীবনী থেকে এই ধরনের কিছু কিছু তথ্যের ভিত্তিতে আমার ধারণা জন্মেছে যে, ওঁদের পরিবারের অবস্থিতি ছিল গ্রামীণ ভদ্র সমাজের অনির্দিষ্ট অঞ্চলে (এ ধারণা অবশ্যই ভুল হতে পারে)। এবং তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ওঁদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। আমার এক ব্রাহ্মণবংশীয়া ছাত্রীকে উনি নানাভাবে অপমান করতেন। সে অক্সফোর্ডে ডক্টরেটের জন্য পড়াশোনা করছে, কেন জানি না এটা ওঁদের ভাল লাগত না। বারবারই বলতেন, 'ওকে বলো না এটা ছেড়ে দিতে।' একদিন উত্যক্ত হয়ে সে বলে, 'দাদু, আপনারা তো নন্দী। পূর্ববঙ্গে নন্দীরা সাধারণত তেলি হয়। আপনারা শুনি কায়স্থ। বলুন তো আপনারা কোন শাখার কায়স্থ?' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ওঁর প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। বিশ শতকের বাংলায় ওঁর মতো প্রতিভাশালী মানুষের সামাজিক অবস্থান আর জাতপাতের উপর নির্ভরশীল নয়, এই উপলব্ধি ওঁর হয়নি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী কায়স্থ না তেলি, কোনও শিক্ষিত বাঙালি কি এটা আলোচনার বিষয় মনে করবে?

আত্মগরিমা ঘোষণার অপর পিঠ নিজেদের তুলনায় আর সবাইকে ছোট করা। যে-কোনও ভারতীয়র সঙ্গে দেখা হলেই তাকে নানা জামাই ঠকানো প্রশ্ন করতেন। উদ্দেশ্য ওঁর এবং ওঁর পরিবারের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। বাঙালি জীবনে এই প্রবণতা ওঁদের একচেটিয়া নয়। কোন বাড়িতে কী খাওয়া হয়, পরা হয়, সে বিষয়ে আলোচনা আমাদের কৈশোর-যৌবনে প্রচুর শুনেছি। জীবনযাত্রার মান দিয়ে মানুষের রুচি এবং সংস্কৃতি বিচার

এবং তার ভিত্তিতে পরিবারবিশেষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় (যা সবসময়েই নিজেদের তুলনায় নিম্নস্তরে) মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের এক করুণ প্রহসন। সাম্প্রতিক কালে এই ব্যাধি থেকে আমরা কিছুটা মুক্ত হয়েছি বলে মনে হয়। নীরদবাবু বারবারই বলতেন—'আমার চেয়ে যারা চারগুণ রোজগার করে আমি তাদের থেকে ভাল থাকি।' আমার স্ত্রী একবার বহু যত্নে রান্নাঘরের জানালায় টবে লাল পুঁইয়ের একটি চারা লালন করেছিলেন। সেটি যেদিন চিংড়ি মাছ সহযোগে রান্না হয়, ওঁদের জিগ্যেস করি খাবেন কি না। মাসিমা খুবই উৎসাহিত। অক্সফোর্ডে বসে তাজা পুঁইশাক খাওয়া রীতিমতো সাধনার ফল। কিন্তু নীরদবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'ওসব ছোটলোকি জিনিস আমার বাড়িতে ঢুকবে না। আমরা মাঝে মাঝেই আলোচনা করি— আপনার হাড়ে একটা ছোটলোকামি আছে।' বিনীতভাবে নিবেদন করলাম, 'তা হবে। আমাদের কীর্তিপাশার জমিদারবাড়িতে কিন্তু বেশ বড় পুঁইমাচা ছিল।'

উনি মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের নতুন নতুন মাপকাঠি আবিষ্কার করতেন। একদিন স্থির করলেন— হুইস্কি খাওয়া ছোটলোকি, কারণ বস্তুটি ভারতীয়দের প্রিয় পানীয়। মোরি গেটের বাড়িতে উনি আমাকে ওল্ড স্মাগলার হুইস্কি খাইয়েছিলেন, একথা উল্লেখ করায় উনি ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। ওঁর পুত্রও একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে প্লেনে যখন 'সকলে হুইস্কি খাইতেছিল' তখন উনি একটি সাদা বোর্দো লইয়া খাইলেন। তিনশো লোক কী খাইতেছিল সে তথ্য উনি কীভাবে সংগ্রহ করলেন তা লেখেননি। আসল কথা ওই বোর্দো পান ওঁদের পারিবারিক রুচিজ্ঞান তথা শ্রেষ্ঠত্বর সূচক। ওঁরা যখন মেন্ডেলসন বা বাখের রচিত স্বর্গীয় সঙ্গীত শোনেন, অন্য ভারতীয়রা তখন সব উলওয়ার্থ জাতীয় ছেঁদো ডিপার্টমেন্ট স্টোরে সস্তায় খেলো জিনিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। পাশ্চাত্যায়নের অন্যতর মাপকাঠি নাকি চিজে রুচি। ওঁরা স্বাদে গন্ধে তীব্র গরগনজোলা অবধি সানন্দে ভোগ করেন। অন্য ভারতীয়দের দৌড় বড়জোর আমুল চিজ অবধি। ওঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নাসিম খান 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ওঁর এইসব উক্তি উদ্ধৃত করেন। নীরদবাবুর চল্লিশ বছর ভারতীয় খাদ্য স্পর্শ না করার কাহিনিও রূপকথা। মাসিমার রান্না দেশি আহার্য অনেকবার খেয়েছি। ওঁর বাংলা রান্না বিষয়ক বইটি মোটেই স্মৃতিভিত্তিক নয়। কোনও কারণে ওঁদের ধারণা ছিল যে ভারতীয় খাদ্য না ছোঁয়া সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বর নজির। এই প্রসঙ্গে আমার বালিগঞ্জ স্কুলের সহপাঠীর সেই প্রশ্ন 'তোরা পরিজ খাস?'— স্মরণ হত।

নীরদবাবুর এই ওয়ান আপম্যানশিপে বেচারি মাঝে মাঝে বিপদে পড়তেন। ওঁর তখন শিরে সংক্রান্তি। অর্থাভাবে দেশে ফিরে যেতে প্রস্তুত হচ্ছেন। রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচার থেকে ওঁকে সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। তা নিয়ে আলোচনা করতে একজন বংশানুক্রমিক লর্ড ওঁর বাড়িতে আসবেন। উনি যথারীতি তাঁকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছেন। দামি বাসনপত্র, কাঁটাচামচ সব বের হয়েছে। ওঁর কাছে রাখা পুরনো শ্যাম্পেনের বোতল যখন বের হল, তখন লর্ড সাহেবেরও চক্ষুস্থির। বাজারে তার দাম তখন হাজার পাউন্ডের মতো। বস্তুটির প্রশংসা করায় নীরদবাবু বললেন, 'এর চেয়ে নিচু স্তরের পানীয় আমি সাধারণত ছুঁই না।' লর্ড সাহেব বললেন, 'আমার এটা সাধ্যের বাইরে। পয়সায় কুলায়

না।' জ্যাকি কেনেডি ওঁকে রিট্‌স-এ লাঞ্চ খেতে ডেকেছেন। কথায় কথায় নীরদবাবু বললেন, 'আমেরিকা গেলে সোশ্যাল রেজিস্টারে নাম নেই, এমন লোকের সঙ্গে আমি দেখা করি না।' সোশ্যাল রেজিস্টার আমেরিকার উচ্চতম পরিবারগুলির ফর্দ। জ্যাকির উত্তর, 'এক সময় আমিও তাই করতাম। এখন আর সম্ভব হয় না।' জ্যাকি তখন ওনাসিস-এর উত্তরাধিকারিণী।

এ প্রসঙ্গে নবনীতার সঙ্গে নীরদবাবুর প্রথম আলাপের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। আমিই নবনীতাকে ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁর প্রথম প্রশ্ন, 'কী করা হয়?' 'কম্প্যারেটিভ লিটারেচার পড়াই।' 'ওটা একটা ধাপ্পা! কোথায়?' 'যাদবপুরে।' 'ওটা আর একটা ধাপ্পা।' এবার জোড় হস্তে নবনীতা বললেন, 'একটা কথা বলতে পারি? আপনার অপরিসীম পাণ্ডিত্য। তার সঙ্গে কোনওভাবেই আমাদের তুলনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ষোলো বছর বয়স থেকে এই কুড়ি বছর হল আমি তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি। এটাই আমার জীবিকা। যদি বলি এই একটা বিষয় আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি, খুব কি অন্যায় বলা হবে?' এর পর আলোচনা আর বেশি এগোয়নি। পরে দেখা হলে উনি বললেন, 'মেয়েটা দজ্জাল, না?' আমার উত্তর, 'সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।'

নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা থেকে অন্যকে অপমান করা বেশি দূরের পথ না। অনেক অসহায় বেচারা মানুষের ওঁর কাছে নেহাতই অকারণে অপমানের অভিজ্ঞতা বারবারই হয়েছে। একটা চরম উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাব। এক নিতান্ত ছা-পোষা গেরস্ত ভদ্রমহিলা বাঙালিদের এক জমায়েতে ওঁকে এসে বললেন, 'একদিন আপনার বাড়ি যাব।' ওঁর উত্তর, 'আসবেন। সকাল থেকে দরজা খোলার পর কুকুর-বেড়াল সবই তো ঢোকে। আমি কি আটকাতে পারি?'

এই কথাগুলি বলার একটা উদ্দেশ্য আছে। ওঁর লেখায় অনেক সময়ই বাঙালি তথা ভারতীয়দের সম্পর্কে কঠোর উক্তি পাই। আগেই লিখেছি— তার সবটা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ফল না। ওঁর তত্ত্বচিন্তার পিছনেও আছে ওঁর ইতি এবং নেতিবাচক গভীর আবেগ। ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর একদিন উনি অঝোরে কাঁদছেন। ওঁর একটি লেখা থেকে ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে দুটি লাইন পড়ে শোনালেন। তার বক্তব্য—ওঁদের জীবনে প্রেমের ফল ফললেও, অবকাশের অভাবে প্রেমের ফুল ফুটতে পারেনি। তার কারণ অপরিসীম দারিদ্র। বইটি বন্ধ করে বললেন— এর জন্য উনি বাঙালিদের কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না। ওঁর অনেক লেখাতেই এই অক্ষমতার প্রকাশ। ওঁর দুর্ভাগ্যের কারণ যে বাঙালি জাতি না, ওঁর বহু-প্রশংসিত ইংরেজ শাসন—এ কথাটা ওঁকে কখনও মানাতে পারিনি। কিন্তু উপর্যুক্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও ওঁর রচনা বহু দিন মানুষ গভীর অভিনিবেশ নিয়ে পড়বে। আর এই বিরাট মাপের মানুষটিকে কেউ সহজে ভুলবে না। ভুললে লোকসানটা মানবজাতির, বিশেষ করে আমাদের—বাঙালি তথা ভারতীয়দের।

অক্সফোর্ডে বাঙালিদের কথা লিখতে গিয়ে এক তৃতীয় বাঙালির কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। তিনি অমর্ত্য সেন। আমি দিল্লি ছাড়ার আগেই উনি লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে অধ্যাপক হয়ে চলে গেছেন। ওঁর অক্সফোর্ডে আগমন সম্পর্কে শুধু দুটি

ঘটনার উল্লেখ করব। উনি প্রথমে আসেন প্রফেসর অফ ডেভেলপমেন্ট ইকনমিকস হয়ে। নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতর সভ্য পিটার ম্যাথায়াসের কাছে শুনেছি— বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংক্ষিপ্ততম অধিবেশন ওই অমর্ত্যর নির্বাচন নিয়ে। মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচকদের তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম উল্লেখ করতে বলেন। প্রথম জন বললেন, 'সেন।' তারপর বাকি পাঁচজনও একই নাম উচ্চারণ করলেন। দু'-মিনিটে সভা সমাপ্ত। পরে যখন অমর্ত্য ড্রামন্ড প্রফেসর হলেন, তখন উনি নির্বাচক সমিতির অন্যতম সভ্য। বাকি সভ্যরা যৌথভাবে ওঁকে পদটি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত বলি— ড্রামন্ড চেয়ার ইংল্যান্ডে অর্থনীতি বিষয়ে সবচেয়ে সম্মানিত পদ। অক্সফোর্ডে অমর্ত্য সেন বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। অক্সফোর্ডে বাঙালি বিষয়ক অনুচ্ছেদও এখানেই শেষ।

১৯৯৩ সনের অক্টোবর মাসে আমি অক্সফোর্ডে অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নিই। তার আগে আমার শেষ কাজ জুন মাসে বিদায়ী অভিভাষণ— ভ্যালেডিক্টরি অ্যাড্রেস। আমার বক্তব্যর বিষয় ছিল 'শ্যাডোস অফ দা স্বস্তিকা'— ভারতবর্ষের জীবনে আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব, যা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নাৎসি আদর্শে অনুপ্রাণিত। কীভাবে অযোধ্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতি হিসাবে লোকসভায় গৈরিকপন্থীদের সংখ্যা দুই থেকে এক লাফে ১১৯-এ উঠেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলাম। তার সঙ্গে আমি দুটি ভবিষ্যদ্বাণী করি। এক, দেশে গৈরিক রাজত্ব আসন্ন। দ্বিতীয় কথা, ওই রাজত্বের আওতায় নাৎসিবাদের নগ্ন রূপ প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা। বক্তৃতাকক্ষে একটি আসনও খালি ছিল না। বক্তৃতার শেষে শ্রোতারা দাঁড়িয়ে উঠে সম্বর্ধনা জানালেন। এই সামান্য স্বীকৃতি আমাকে প্রচুর তৃপ্তি দিয়েছিল। তাই কথাটা লিখলাম। আমার বামপন্থী বন্ধুরা বলেছিলেন— আমি অকারণে বেশি ভয় পাচ্ছি। ভয়টা যে অকারণ ছিল না— ভাজপা-র সিংহাসন আরোহণ আর গুজরাতে পশুশক্তির আবির্ভাবে তা প্রমাণ হয়েছে। আমার এই দুঃস্বপ্ন সত্য প্রমাণ হওয়ায় আমার কোনও আনন্দ নেই। শুধু ক্ষীণ আশা রাখি আমাদের রাজনীতিতে এই পশুশক্তির বিনাশ মৃত্যুর আগে দেখে যাব। আশা করি, কিন্তু ভরসা করি না।

আমার বিচারে ভারত-রাষ্ট্র এবং হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির এত বড় শত্রুর আগে কখনও আবির্ভাব হয়নি। পৃথিবীর চোখে ধর্মান্ধতায় এরা আমাদের তালিবানের সঙ্গে তুলনীয় করে তুলেছে। এদের মূর্খ গুন্ডাবাহিনী দেবীর নগ্নিকা চিত্র ছিঁড়ে ফেলতে সযত্ন। যাঁরা তার প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের জনে জনে অশ্লীল চিঠি লিখে এরা অপমান করেছে। কালীমূর্তি কি এরা কখনও দেখেনি? অথবা আমাদের মন্দিরগাত্রে পরম সুন্দর কামবন্ধ? কাশীধামে বিধবাদের উপর সুপরিচিত অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে সংবেদনাময় ছবি তোলায় এদের আপত্তি। শুনেছি 'পথের পাঁচালী'তে দেশের দারিদ্র চিত্রিত বলে বিদেশে ছবিটা দেখানো নিয়ে আপত্তি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা গো-মাংস খেতেন এ কথা লেখায় সে বই পোড়ানো হয়েছে। আমাদের বিরাট উদার ঐতিহ্য নয়া 'হিন্দুত্ব'র নামে অন্ধ বর্বরতায় নামিয়ে আনা হচ্ছে। যেমন জার্মান সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় শত্রু নাৎসিরা, নাৎসি আদর্শে অনুপ্রাণিত এই বর্বরতা তেমনই হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির পরম শত্রু। যাঁরা হিন্দু পরিচয়ে গর্ব বোধ করেন, বিশেষ করে তাঁদের এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে

দাঁড়াবার সময় হয়েছে। "গৌরব সে কহ্ হাম হিন্দু হ্যায়"— এই নারা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য, যদি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় "ইয়ে লোগ হিন্দু নহিঁ, খতরনাক জানোয়ার হ্যায়।" এরা একবার সিংহাসনচ্যুত হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বানপ্রস্থ

১৯৯৩ সনের জুলাই মাসে আমার অবসরজীবন শুরু হল। অক্সফোর্ডের সঙ্গে যোগসূত্র রয়ে গেল সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজে এমেরিটাস ফেলোশিপ মারফত। আর অবসরটা অবশ্যি প্রথম দিকটা নামেই। কারণ আগের থেকেই ঠিক হয়ে ছিল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া আর সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক মাস করে কালক্ষেপ করতে হবে। তারপর ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে এক বছর। তবে আমন্ত্রণগুলি নিজের গবেষণা সংক্রান্ত কাজ করার। সুতরাং কর্তব্যটা গুরুভার নয়। ভাবলাম এবার চেপে কাজ করে দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত বাঙালি মানস বিষয়ে বইটি লিখে ফেলব। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের খরচায় আমার নিজের শ'তিনেক বই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওঁরা একজন সাহায্যকারীর খরচাও দিয়েছিলেন। ফলে অনেক আশা নিয়ে কাজটায় হাত দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই কাজ আজও শেষ হয়নি। আশা ছাড়িনি, তবে যতক্ষণ শ্বাস, আশাটা ততক্ষণই চালু থাকতে পারে। লেখাটা আগে শেষ হবে, না অন্তিম নিশ্বাস আগে নিষ্ক্রান্ত হবে সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে বসে আর একটি কাজ করি। আমার বন্ধু এবং সহকর্মী নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর জেরাল্ডিন ফর্বস-এর (উনি বাঙালি তথা ভারতীয় নারীর ইতিহাস লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন) কাছে একটি বাংলা হস্তলিপির ফোটো কপি দেখেছিলাম। লেখাটি উনিশ শতকে জাতা একটি মহিলার আত্মকথা, নাম— হৈমবতী সেন। নয় বছর বয়সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক এক লম্পটের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়। 'ভদ্রলোক' বালিকা বধূতে তৃপ্ত না হওয়ায় শয়নকক্ষেই গণিকা নিয়ে আসতেন। দশ বছর বয়সে মেয়েটি বিধবা হন। তারপর অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সয়ে বহু লম্পটের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করে পঁচিশ বছর বয়সে উনি পুনর্বিবাহ করেন। তারপর নিজের চেষ্টায় ডাক্তারি কিছুটা শিখে কালে উনি চুঁচুড়ায় লেডি ডাক্তার হয়ে বসেন এবং সত্যিকার প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আমার সীমিত অভিজ্ঞতায় ভারতীয় তথা বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর কোথাও নেই। এবং আমাদের তথাকথিত ভদ্র সমাজের সত্যিকার চেহারা কী তার এমন নগ্ন চিত্রও আর কোথাও পাইনি। আমি বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করব ঠিক করি। স্থির হয় যে আমি অনুবাদ করব আর জেরাল্ডিন সম্পাদনার বাকি কাজটা করবেন। পার্থে বসে আমি এই অনুবাদের প্রথম খসড়াটি তৈরি করি। বইটি ২০০০ সনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বাছার ব্যাপারে আমরা ভুল করেছিলাম। ফলে বইটির সত্যিতে কোনও প্রচার হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘরে বসে কমপিউটারে এই কাজটি করতাম। ক্লান্ত লাগলে পাশেই সোয়ান নদীর পারে গিয়ে বসতাম। নদীর জল সত্যিতে ঘন নীল দেখায় এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর একবারই হয়েছে— ওরছায় বেতোয়া নদী দেখে। আমার স্ত্রী স্যান্ডউইচ নিয়ে এসে যোগ দিতেন। আর কিছু সি-গাল আমাদের আহার্যর অংশ পাওয়ার তালে থাকত। একটি বিশিষ্ট রকমের বজ্জাত সি-গাল আর সবাইকে তাড়িয়ে নিজে সবটা খাওয়ার চেষ্টা করত। হাড় বজ্জাত শুধু মনুষ্য প্রজাতির মধ্যেই পাওয়া যায়— এটা আমাদের নিতান্তই ভুল ধারণা। তবে মানুষের তুলনায় পশুপাখিরা ভদ্রলোক— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কালোবাজার, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা ভাষণ এইসব ব্যাপারে সাধারণত কোনও শুয়োর বা ছাগলকে দেখতে পাবেন না। ওদের নীতিবোধ আমাদের থেকে উন্নত।

অস্ট্রেলিয়াতেই আমাদের নতুন ভ্রাম্যমাণ জীবন শুরু হল। আসলে অবসর নেওয়ার সময়ই আমার বাড়ি কেনার জন্য ঋণটা শোধ হয়ে যায়। আরও দু-একটা কারণে আমাদের হাতে খরচ করার মতো টাকা একটু বেশি আসতে শুরু করে। ফলে বিশ্বভ্রমণের পুরনো ইচ্ছেটা রীতিমতো চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা কয়েক বছরের মধ্যে কেনিয়া, দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, উজবেকিস্তান, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, কানাডা (পুবে টরন্টো থেকে শুরু করে ট্রেনে প্রশান্ত মহাসাগরের পারে ভ্যাঙ্কুভার অবধি), আলাস্কা, গ্রিনল্যান্ড (উদ্দেশ্য অরোরা বোরিয়েলিস দেখা) গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ, ইটালি আর পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, চিন (দুং হুয়ার গুহাচিত্র পর্যন্ত), ইরান, রাশিয়া (জলপথে মস্কো থেকে ভলগা নদী বেয়ে এবং দুটি বৃহৎ হ্রদ পার হয়ে সেন্ট পিটারসবার্গ পর্যন্ত) প্রভৃতি বহু দেশ ঘুরে বিপুলা এ পৃথিবীর বেশ খানিকটা দেখে নিই। তবে এই ভ্রমণ ট্যুরিস্টের ভ্রমণ। এতে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ কম। ধুলোবালি ঝেড়ে প্যাকেটে মুড়ে ট্র্যাভেল কোম্পানি আনন্দের খিলি হাতে তুলে দেন। এতে আরাম জেয়াদা, উত্তেজনা থোড়া কম। সাতষট্টি বছর বয়সে অবসর নিয়েছি। এখন আর পিঠে বোঁচকা বয়ে হট্টমন্দিরে শয়ন করে না জানা ভাষায় পথের সন্ধান নিয়ে বিশ্বভ্রমণের তাকত নেই। সুতরাং প্যাকেজ ট্যুর তো তাই সই। এই নিরাপদ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠক/পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। তবে এই ভ্রমণও সম্পূর্ণ বিপদশূন্য ছিল না। সেসব কথা যথাস্থানে বলব।

আমাদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই লম্বা ট্রেন যাত্রা খুব ভাল লাগে। পার্থে ইন্ডিয়া-প্যাসিফিক ট্রেনে তিন দিন তিন রাতের জন্য উঠে বসলাম। শয়ন ও আহারের ব্যবস্থা অনবদ্য। যাত্রার অপর প্রান্তে আছে সিডনি। আর মাঝখানে বেশির ভাগ পথটাই মরুভূমির ভিতর দিয়ে।

সওয়া ঘণ্টার জায়গায় সওয়া তিন দিনের পথ বটে, তবে রাস্তা নিতান্তই সোজা, সুকুমার রায়-বর্ণিত কলকাতা থেকে তিব্বতের রাস্তার মতো। এতই সোজা যে এক জায়গায় দুশো কিলোমিটার পথ এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক বাঁকেনি।

শরৎচন্দ্র-বর্ণিত নিশীথের রূপের মতো মরুভূমিরও এক অপূর্ব রূপ আছে, যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। ধূসরতাও বর্ণহীন নয়। মাঝে মাঝেই তার রূপ বদলায়। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশা ধরে। মাঝে মাঝে ঘাস চোখে পড়ে। তার রং সত্যিই নীলাভ। কচিৎ কখনও দেখি— একপাল ক্যাঙারু অবাক হয়ে চলমান ট্রেনটার দিকে

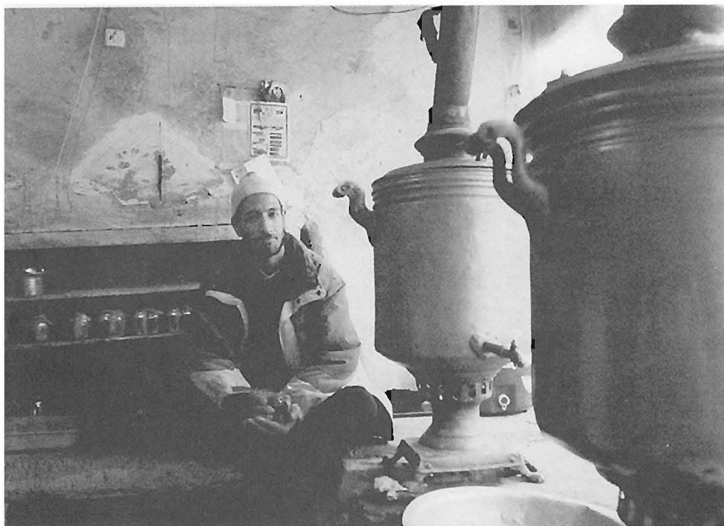
তাকিয়ে আছে। ট্রেন বা মানুষ— কিছুতেই তাদের ভয়ের চিহ্ন নেই।

এ যাত্রা এক মাস সিডনি বাসের পর অস্ট্রেলিয়ার আধা-ট্রপিকাল উত্তরাঞ্চল দেখতে গেলাম। আর সেখান থেকে জগদ্বিখ্যাত গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ। উত্তরের কেয়ার্নস শহরের গাছপালা-পুষ্পসম্ভারে বঙ্গ প্রকৃতির ছায়া পেলাম। সমুদ্রের পাড় ধরে পলাশের সমারোহ। শুধু তাই না, বিরাট বটগাছ ঘিরে দোলনচাঁপার উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ। সমুদ্রের হাওয়া তার মদির গন্ধে সুরভিত। এই উত্তরাঞ্চল এক ব্যাপারে কিন্তু নিতান্তই আপোসহীনভাবে অস্ট্রেলিয়া। এখানকার চতুষ্পদরাও সবাই প্রায় মার্সুপিয়াল, অর্থাৎ তারা মাতৃগর্ভ থেকে সোজা মাটিতে না নেমে কিছুকাল মা'র উদরসংলগ্ন থলিতে বাস করে। প্রায় ইঁদুরের সাইজের প্রাণীও আছে যাদের জন্ম-ইতিহাস এইরকম। আমার মনে হয়,— অস্ট্রেলিয়ায় খুঁজলে মার্সুপিয়াল মানুষও পাওয়া যেতে পারে। ওখানকার সবচেয়ে থপথপে আহ্লাদে প্রাণী কোয়ালা। লোকে বলে কোয়ালা বেয়ার কিন্তু ভালুকের সঙ্গে এদের কোনও আত্মীয়তা নেই। এরাও মার্সুপিয়াল। তবে দেখে যত আহ্লাদে মনে হয় আসলে তারা অত সুবিধের লোক না। এদের স্বাভাবিক প্রকৃতি শুনেছি হিংস্র, কিন্তু এদের একমাত্র খাদ্য ইউক্যালিপ্টাসের পাতায় নাকি মাদক রস আছে তাই এরা সব সময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। কোলে নিলেও অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। তবে ঘুমের সময় এঁদের নাসিকাগর্জন সিংহগর্জনের মতো শোনায়। তা ছাড়া বন্য অবস্থায় এদের ধরতে গেলে মাথায় পুরীষোৎসর্গ করে মনুষ্যজাতির প্রতি এদের গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করে। আর জীবজগতে প্রকৃতির সব চেয়ে অদ্ভুত পরীক্ষা বিবর্তনের মাঝপথে থেমে যাওয়া প্রাণী হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাসেরও এ যাত্রা সাক্ষাৎ পেলাম। নয় পাখি নয় পশু এই হাঁসজারুও প্রজাতি হিসেবে মার্সুপিয়াল। অমিতাভ সেনের অনবদ্য কাব্যে সে অমরত্ব পেয়েছে :

কিছু ঘাস, কিছু বাঁশ, কিছু প্ল্যাটিপাস

ভাবার্থ : কবি বলিতে চাহিতেছেন— প্রকৃতির কোলে বদ লোককে বাঁশের সাহায্যে তাড়িয়ে ক'টি প্ল্যাটিপাস নিয়ে বাস চতুর্বর্গ ফললাভের শামিল। কারণ ওই পোষ্য ডিম, দুধ, মাংস— তিনই জোগাবে।

এবার সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য দেখলাম— গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ। প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে ২৫০০ মাইল জুড়ে এই প্রবালদ্বীপপুঞ্জ ভূতলবাসী মানুষের চোখে অনন্ত বিস্ময়ের আকর। সমুদ্রের নীচে গিয়ে সেই বিস্ময়কর জগৎ দেখার সাহস বা শিক্ষা দুটোর একটাও নেই। কিন্তু চোখে ঠুলি লাগিয়ে উপুড় হয়ে ভেসে ভেসে অর্থাৎ স্নর্কেলিং করে যা দেখলাম তারও তুলনা নেই। প্রবালদ্বীপের বর্ণাঢ্যতার শেষ নেই। একটি ক্ল্যাম বা মহাঝিনুক দেখলাম, মুখব্যাদান করে আছে। বহু ক্ষুদ্রকায় অবোধ প্রাণী সেই বিবরে প্রবেশ করছে। কিন্তু যে পথে তারা যাচ্ছে, সে পথে তারা আর ফিরছে না। এই প্রাণীরই ক্ষুদ্র সংস্করণ অনেক খেয়েছি। অতি সুস্বাদু। কিন্তু এই এক টন ওজনের সুন্দর নীলবর্ণ ক্ল্যাম মনে হল আমাকে খেয়েও একই কথা বলবে। আরও শুনলাম রিফের ওই অঞ্চলে একটি সহৃদয় হাঙর মাঝে মাঝেই আসে। সে নাকি কাউকে কামড়ায় না। হয়তো তার দাঁতে ব্যথা। কিন্তু আর জলে থাকা সমীচীন মনে হল না।



এক ফোঁটা পানি না দিয়ে তৈরি মশহুর চা, যা না খেলে জীবনে অনেক কিছুই অপূর্ণ থাকে



ইরফান হাবিব



অক্সফোর্ডের বাড়িতে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল ও তাঁর স্ত্রী করবী (ডানদিকে), সঙ্গে হাসি



কীর্তিপাশায়



কীর্তিপাশায় নিজের গ্রামের মানুষদের আলিঙ্গনে



কন্যা ও নাতনি



বিসনশাফট কলেগ। বার্লিন ১৯৯৭



সপত্নীক নীরদবাবু



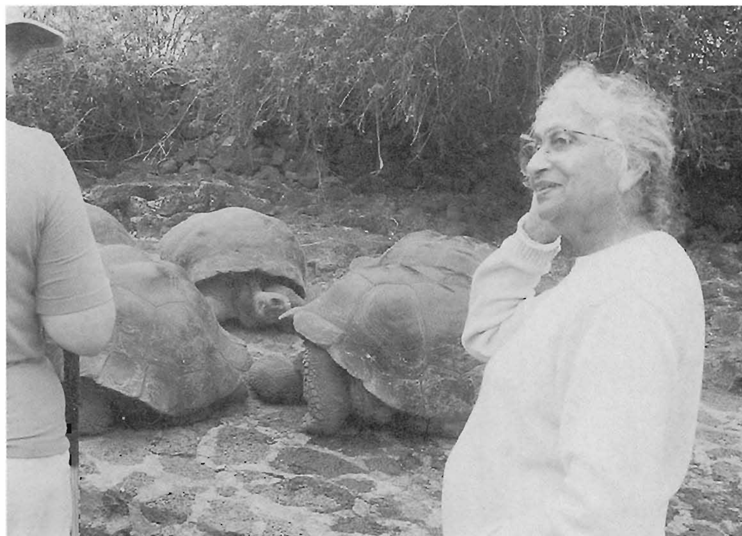
সীল-পরিবৃতা পত্নী—গালাপাগোস



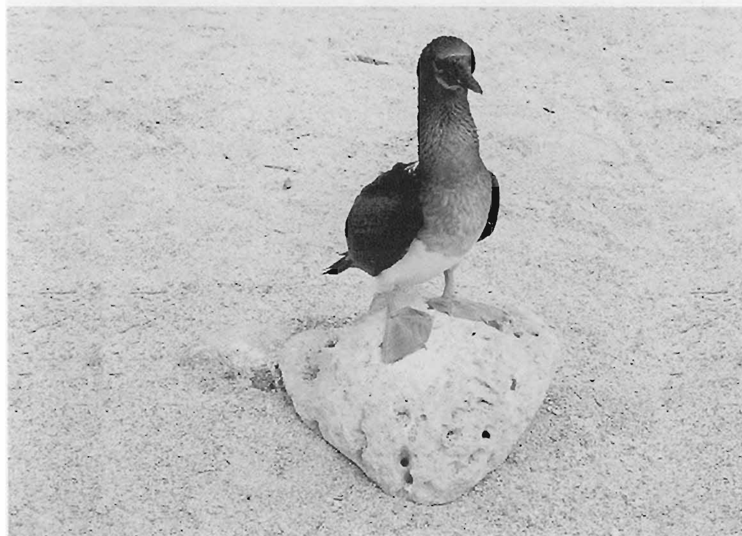
সামুদ্রিক গোসাপ—গালাপাগোস



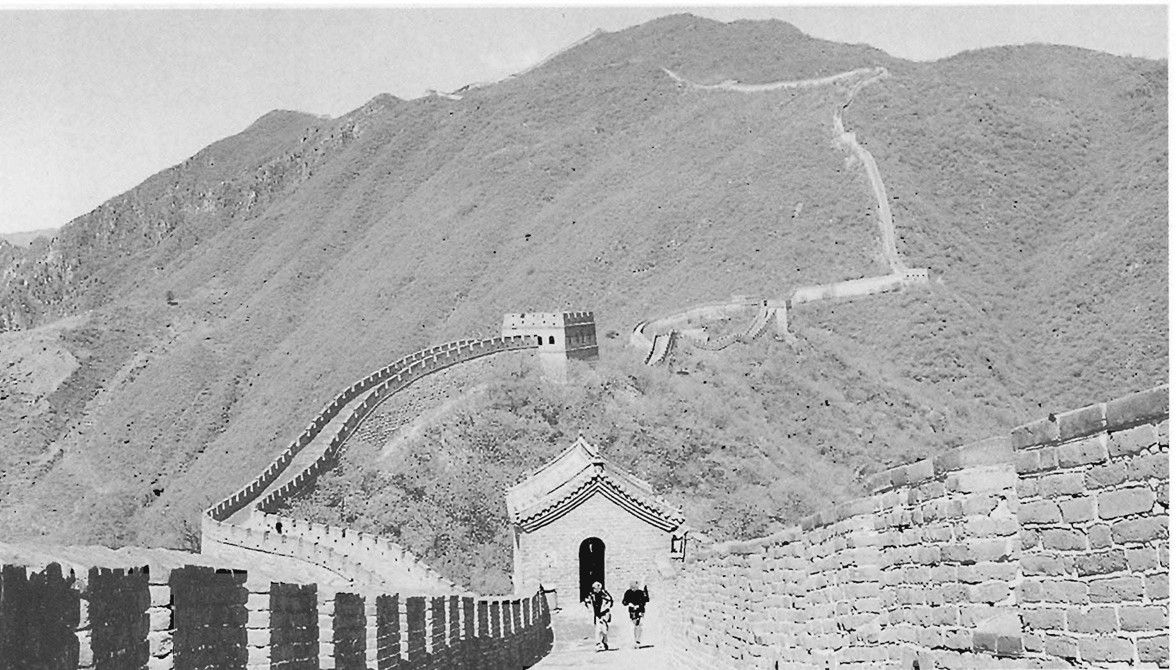
সহাবস্থান—সীল ও সামুদ্রিক গোসাপ—গালাপাগোস



সকচ্ছপ পত্নী—গালাপাগোস



ব্লু-ফুটেড বুবি—গালাপাগোস



মহাচীনের মহাপ্রাচীর

অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ওয়াশিংটন। সেখানে স্মিথসোনিয়ানের এক মিনারে একটি ঘর পেয়েছি। সামনে সযত্নরক্ষিত বাগান দেখা যায়। চারপাশে সব বিখ্যাত মিউজিয়াম। আমার আশঙ্কা ছিল— এই বিরাট শক্তিশালী দেশের রাজধানী 'দিল্লিরই আর এক চকচকে সমৃদ্ধ সংস্করণ হবে। অর্থাৎ আমলা, কূটনৈতিক আর নানা সুযোগসন্ধানীতে ভরা। সবাই কোনও না কোনও তালে আছে। কিন্তু ঠিক তা নয়। ওয়াশিংটন সংস্কৃতির আলোয় উজ্জ্বল। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মিউজিয়ামে সমৃদ্ধ এই শহর। কাজ করতে করতে কখনও একঘেয়ে লাগলে দু'পা হেঁটে গেলেই স্পেস মিউজিয়াম থেকে শুরু করে এশিয়ার শিল্পসম্পদের আকর স্যাকলার গ্যালারি অবধি বিভিন্ন জাদুঘর বিশ্বের বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির ঐতিহ্যের নানা উদাহরণ বক্ষে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর বিরাট বিরাট দুটি ঘরের ফ্ল্যাট পেয়েছি পোটোম্যাকের পারে। আর ওই নদীর পার ধরে হেঁটে সামান্য একটু চড়াই উৎরে স্মিথসোনিয়ানে যাওয়া-আসা করি। যে বই বা প্রবন্ধের প্রয়োজন হয়, আমার ইন্টার্ন বঙ্গকন্যা পূরবী চক্রবর্তী লাইব্রেরি অফ দ্য কংগ্রেস থেকে চটপট সংগ্রহ করে দেন। স্মিথসোনিয়ানের ফেলোরা নানা দেশের নানা বিষয়ের পণ্ডিত। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একজন ঔপন্যাসিকও আছেন। আমাদের কাজ— নিজের নিজের গবেষণা করে যাওয়া আর দুটি বক্তৃতা দেওয়া, একটি শিক্ষিত সাধারণের জন্য আর দ্বিতীয়টি সহকর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে। মানবিক আবহাওয়া খোলামেলা, মার্কিন সামাজিক সংস্কৃতির দক্ষিণ মুখ তাকে আলোকিত করছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে কাজ করছেন কয়েকজন দক্ষিণ এশিয়াবাসীর সঙ্গে পরিচয় হল। এঁদের কেউ কেউ আমার বা আমার স্ত্রীর পূর্বপরিচিত। এঁরা কেউই মামুলি অর্থে আমলা সংস্কৃতিতে শামিল না। মা সরস্বতীর আঁচল কেউই ছাড়েননি। বাঙালি গেটো থেকে ওয়াশিংটনও মুক্ত না। তবে এঁরা কেউ তার উৎসাহী সভ্য নন। শহরটির খাদ্যজগৎ পৃথিবীর সব দেশের রেস্তোরাঁয় সমৃদ্ধ। পোটোম্যাকের পারেই মাছের বাজার। সেখানে আর সব ছাড়াও ইলিশ মাছের পশ্চিমি সংস্করণ শ্যাড সুলভ্য। বেশি কাঁটা বলে সাদা সাহেবরা প্রায় ছোঁন না। ফলে আমাদের মতো ভেতো বাঙালির পোয়াবারো।

এই দুগ্ধ আর মধুতে প্লাবিত শহর কিন্তু নির্ভেজাল সুখের আকর না। ওয়াশিংটনে কালো মানুষের সংখ্যাধিক্য। আর তাঁদের অধিকাংশই হতদরিদ্র। দারিদ্র মানেই অপরাধপ্রবণতা না। কিন্তু কার্যকারণ হিসাবে ও দুটি জিনিস সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীনও না। ওয়াশিংটন শহরে অপরাধের ঘটনা সংখ্যায় খুব বেশি। পথে যেতে অনেক বারই দেখেছি কোনও রাস্তা সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে। দু-চারটে গুলির আওয়াজও শুনেছি। শুনতাম কোথাও 'হোল্ড আপ' হয়েছে। একবার বাড়ির কাছের সুপার মার্কেটে গিয়েছি। হঠাৎ শুনি পটাপট গুলির আওয়াজ। সবাই দেখলাম উপুড় হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ছে। কয়েকটি লোক একটা সিকিউরিটি ভ্যান পাকড়াও করেছে। বাইরে এসে দেখি আকাশে পুলিশের হেলিকপ্টার। শুনলাম এ জাতীয় ঘটনায় ওখানকার জীবনের ছন্দ-লয় বিঘ্নিত হয় না। এসব দৈনন্দিতারই অঙ্গ।

অপরাধপ্রবণতা ওদেশে কতটা বেড়েছে একটা ব্যাপার দেখে বুঝতে পারি। কোনও চেক সহ চিঠি পোস্ট করলে তা না পৌঁছবার সম্ভাবনা প্রবল। ভাড়া বাবদ আমার তিনটি

চেক সহ চিঠি এইভাবে হারায়। আর চেক বন্ধ করার খেসারত চেক প্রতি পঁচিশ ডলার। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম যখন আমার ইংল্যান্ডে পাঠানো একটি রেজিস্টার্ড চিঠি, যা নাকি আমি নিজের হাতে গিয়ে পোস্ট আফিসে দিয়ে এসেছিলাম, সেটা যখন ইংল্যান্ড পৌঁছয়, ভিতরকার মালমশলা তখন রহস্যজনকভাবে বদলে গিয়েছে। আমি একটা জরুরি ফর্ম ভর্তি করে পোস্ট করেছিলাম। তার জায়গায় ছিল ওয়াশিংটনের পাতাল রেলের একটি ম্যাপ। আর আমার বইপত্র ফেরত আসার সময় একটি বাক্সে ছিল আমার বইগুলির বদলে অন্য কিছু বই, একটি হাসপাতালে ব্যবহৃত ট্রে আর একটি মার্কিন-আফ্রিকান পরিবারের ফোটোগ্রাফ। এই রহস্যের অন্ত আমি আজ অবধি পাইনি। লিখতে বাধ্য হচ্ছি— দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে বাস করে সেখানে কখনও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়নি।

আরও একটি ব্যাপারে আমি বেশ নিরাশ হয়েছি। আমি খোঁজখাঁজ করে এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। কারণ আমি যেসব ওষুধ খাই তার জন্য প্রেসক্রিপশন দরকার। তিনি বললেন, কোনও প্রেসক্রিপশন লিখতে হলে ওঁকে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। সেগুলি করতে দু-তিন হাজার ডলার খরচা হল। ভাগ্যের কথা— খরচটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির। ইংল্যান্ড ফিরে যখন সেসব রিপোর্ট দেখালাম, আমাদের ডাক্তাররা হতবাক। তাঁরা জিগ্যেস করলেন, এসব কেন করেছিল? আমাদের কি কিছু হয়েছিল? উত্তরে বলি— কিছু হয়ে থাকলে আমরা তা জানতে পারিনি। একবার এক রেস্টুরেন্টে বাইরের ঠান্ডা থেকে হঠাৎ গরমের মধ্যে ঢোকায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাম্বুলেন্স ডাকায় এক মাইল পথ যেতে ১৬৮ ডলার খেসারত দিতে হয়েছিল। আমাদের এক পরিচিত মার্কিন যুবকের ব্যয়সংক্ষেপনীতির ফলে লাইব্রেরি অফ দ্য কংগ্রেস থেকে চাকরি যায়। চাকরি না থাকা মানে মেডিক্যাল ইন্সিওরেন্স না থাকা। তার মানে এই ডায়াবেটিক ছেলেটির ওষুধ কেনারও ক্ষমতা ছিল না। চিকিৎসা করাবার উপায়হীন লোকের সংখ্যা মার্কিন মুল্লুকে ৩৯ মিলিয়ন। চিকিৎসা ব্যাপারটা আমেরিকায় এক দিকে খুব উন্নত ঠিকই। কিন্তু আর এক দিক থেকে ওর ভিতর যে অকারণ অর্থশোষণের বিচিত্র সব ব্যবস্থা আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্লিনটনদের হেনস্থা করার জন্য ওখানকার মেডিক্যাল ইন্সিওরেন্স বিশেষ সক্রিয় ছিল। কারণ মিসেস ক্লিনটন ওদেশে দরিদ্র মানুষদের কথা ভেবে বিলেতে চালু ন্যাশনাল হেলথ জাতীয় কোনও ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যদি সফল হতেন, তা হলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলি কোথায় দাঁড়াত?

মার্কিন চিকিৎসায় আমি আস্থা হারাই আরও অন্য কারণে। আমার রক্তচাপের উচ্চতা ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু স্বাস্থ্যগত সমস্যা ছিল। সেজন্য আমি নিয়মিত ওষুধ খেতাম। নানা পরীক্ষা করে আমার মার্কিন ডাক্তার বললেন, আমার কোনও সমস্যা নেই। ওষুধ বন্ধ করে দিলাম। পরিণাম— ইংল্যান্ডে ফেরার পর ছ' মাসের মধ্যে তিন-তিনটি রক্তবাহী শিরা বাধামুক্ত করার জন্য ট্রিপল বাইপাস সার্জারি করাতে হয়।

ওয়াশিংটন বাসের সময়েই আমার জীবনে একটি বড় ঘটনা ঘটল। আমার কন্যা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন— শ্রীলঙ্কার তামিল ছেলে গণেশন বিঘ্নরাজাকে। গণেশন শ্রীলঙ্কার বনেদি ঘরের ছেলে। ওর দাদামশায় ভারতবর্ষে হাই-কমিশনার ছিলেন এবং যত

দূর জানি ব্রিটেনের ইতিহাসে একমাত্র অশ্বেতবর্ণ নাইট অফ দা গার্টার। বিয়ের সময় গণেশন অর্থনীতিতে অক্সফোর্ডে ডক্টরেট করছিল। বিয়েটা দিতে হল একটু অস্বস্তিকর অবস্থায়। আমার বাড়িটা তখন এক বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া। ফলে আমাদের বন্ধু সাইমন অল্টম্যানদের বাড়িতে থেকে মেয়ের বিয়ে দিলাম। তারপর ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্তন।

১৯৯৪ সনে ইংল্যান্ড ফিরে আসি। তার পরের বছর আবার আমেরিকা যাই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। বক্তৃতাপর্ব শেষ করে আবার ভ্রাম্যমাণ হই। এবার দীর্ঘ যাত্রা কানাডার পূর্ব থেকে পশ্চিমে। রকি পর্বতমালা পার হয়ে ভ্যাঙ্কুভার শহরে আমাদের যাত্রা শেষ। কানাডার প্রকৃতি অতি রূপবতী। সে রূপ বর্ণনা করে অন্ত পাওয়া ভার। মেঘমুক্ত নীল আকাশ, বিরাট বিরাট সব হ্রদ, তার পাড় ঘিরে মহীরুহের মহোৎসব। বনের ভিতর থেকে বিরাট শিংওয়ালা মুস বা এলক জাতীয় হরিণ কখনও উঁকি মারে। এক একবার মনে হয় ভালুকরাও ক্ষণিকের জন্য দেখা দিচ্ছে। অবশ্যি তাদের সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আলাস্কায় হয়েছিল। সে কথা পরে বলব।

১৯৯৭-৯৮ সনে বার্লিনের বিসেনশাফট কলেগ-এর আমন্ত্রণে এক বছর ওই শহরে কাটাই। অনেক দেশেই এক বা একাধিক উচ্চতর গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান থাকে যেখানে স্বদেশি এবং বিদেশি পণ্ডিতদের একত্র কাজ করার এবং আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। কলেগ কথাটি ইংরেজি কলেজেরই জার্মান প্রতিশব্দ। হিটলারি আমলে জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একটা বিরাট ক্ষতির দিক—অন্য উন্নত দেশগুলির সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতিগত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ছেদ ঘটা। সেই সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নানামুখি চেষ্টারই অন্যতর ফল বিসেনশাফট কলেগ। প্রতি বছর কতগুলি বিষয় বেছে সেইসব ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা হয়। উদ্দেশ্য এবং আশা এই যে পারস্পরিক আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁদের গবেষণা সমৃদ্ধ হবে আর জার্মান পণ্ডিতদের সঙ্গে আদানপ্রদান মারফত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ছিন্ন সূত্রগুলি আবার জোড়া লাগবে।

এই প্রতিষ্ঠানটির আতিথ্য নিয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল। বারোটি গ্রাম একত্র করে বার্লিন শহর গড়ে উঠেছিল। যেখানে কলেগটির অবস্থান সেই গ্রামটির নাম গ্রুনেওয়ালড। এক সময় এই অঞ্চলটিতে অবস্থাপন্ন ইহুদিরা বাস করতেন। স্থানীয় স্টেশনের গায়ে একটি রিলিফ ছবি আছে। তার পাশে লেখা— এই স্টেশন থেকে হিটলারি আমলে ৫০,০০০ ইহুদিকে আউসউইৎসের মৃত্যুশিবিরে পাঠানো হয়। সেই সময়কার কয়েকটি ভিলা নিয়ে কলেগের ক্যাম্পাস। আর আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই ওইসব ভিলায় বাস করেন। যে-ভিলাটিতে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল সেটি দুই হ্রদের মাঝখানে। প্রাতরাশ আর দ্বিপ্রাহরিক ভোজন কলেগের ক্যান্টিনে। মাঝে মাঝে নৈশভোজনও। আর তার উপরে এই যে স্বল্পস্থায়ী গোষ্ঠীজীবন, তার একটি প্রধান উপজীব্য ছিল খাওয়াদাওয়া আর পরস্পরকে খাওয়ানো। মনে হত যেন একটা চলমান উৎসবের মধ্যে বাস করছি। ভিন্ন বিষয়ের লোকের সঙ্গে আলোচনা থেকে যে নিজের বিষয় সম্বন্ধে নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়, বার্লিনবাস থেকে সেই জ্ঞান আমি অর্জন করি। এখানে আমার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় তাঁরা অধিকাংশই এভোলিউশনারি বায়োলজি অথবা দর্শনের পণ্ডিত। দুটি নতুন বন্ধুত্ব

দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে— ইস্রায়েলের এভা ইয়াবলঙ্কা আর সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক অস্ট্রেলিয়ার মানুষ এরিক ওয়ারেন্ট। দু'জনেরই বিষয় এভোলিউশনারি বায়োলজি।

এই প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করি। বার্লিনের বিখ্যাত দৈনিক 'বার্লিনের ৎসাইতুং' আমাদের কলেজটি নিয়ে কয়েকটি কলাম লিখছিলেন। তার প্রধান উপজীব্য ওখানে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জীবন ও কর্ম। আমাকে যে তরুণীটি সাক্ষাৎ করতে এলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সামান্য একটু অসুবিধে ছিল। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান আর আমার জার্মান জ্ঞান ঠিক এক স্তরের— অর্থাৎ অস্তিত্বহীন। এই অসুবিধে অতিক্রম করে সাক্ষাৎকার সম্ভব না। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা। সাক্ষাৎকারের ঠিক আগে ভদ্রমহিলা দেখেছেন আমি এক দল বায়োলজিস্টের সঙ্গে বসে লাঞ্চ খাচ্ছি। উনি ধরে নিয়েছেন আমিও বায়োলজিস্ট। কথাটা যে ঠিক না, পরস্পর আদানপ্রদানের ভাষার অভাবে সেকথা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। শেষাশেষি প্রায় আকার-ইঙ্গিতে আলোচনা চলছিল। কিন্তু কী যে আলোচনা হচ্ছিল তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কারও জানার কথা না। এক সময় বুঝলাম আমার গবেষণার বিষয় কী মহিলা তা জানতে চাইছেন। বললাম— বাঙালিদের সামাজিক ইতিহাস। মহিলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার প্রশ্ন, 'বাঙ্গালি? ভার্টিব্রেটস?' ওই যে আমাকে বায়োলজিস্টদের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন! তাই আমার গবেষণার বিষয় হয় মেরুদণ্ডবান নয়তো মেরুদণ্ডহীন হবেই! আকার-ইঙ্গিতে বোঝালাম— এ প্রশ্নের উত্তর আমার অজ্ঞাত।

আমার বই লেখার কাজ এখানেও এগোচ্ছিল না। তার অন্যতম কারণ— হঠাৎ প্রচণ্ড হাঁপানির আক্রমণ। রূপকথার রাজকন্যারা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যেতেন। ফুলের গন্ধেও যে মানুষ মূর্ছা যেতে পারে, তা নিজে ঠেকে শিখলাম। গ্রুনেওয়ালড গ্রাম সুগন্ধি ফুলের গাছ আর লতায় ভর্তি। গ্রীষ্মাগমে নানা সুগন্ধে প্রাণমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। কিন্তু শুধু প্রাণমন না, তৎসহ ফুসফুসও যে বিকল হয়ে আসছিল, তা ক্রমে টের পেলাম। নিদারুণ অ্যালার্জির প্রকোপে নিশ্বাস নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল, দু'পা হাঁটলেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে পুরনো লেখাগুলি ঘাঁটতে বসলাম। দেখলাম গত পাঁচ-ছ' বছরে গোটা পঁচিশেক প্রবন্ধদ্র বক্তৃতা কলম থেকে বের হয়েছে। আমার ছাত্রীস্থানীয়া একদা অক্সফোর্ডের রোডস স্কলার, তখন কলেগের ফেলো এবং বর্তমানে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপিকা শালিনী রনধেরিয়াকে ধরলাম— এর থেকে কিছু প্রকাশযোগ্য লেখা খুঁজে বের কর। উনি চোদ্দোটি লেখা অনুমোদন করলেন। সেই সংকলনটিই 'পারসেপশনস, ইমোশনস, সেন্সিবিলিটিস' নাম দিয়ে ক'বছর পর ছাপা হল।

আধুনিক জার্মানির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিতর্কিত চিন্তাধারা আমাদের রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। নাৎসি আমলের অমানবিক বীভৎসতার জন্য ওদেশের বর্তমান প্রজন্মের কোনও দায়িত্ব আছে কি না— এ নিয়ে বহুবার উত্তপ্ত আলোচনা শুনতে পেয়েছি। যাঁরা এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন তাঁদের বক্তব্য— হিটলারের অমানুষিকতার জন্য দায়ী শুধু নাৎসিরা না, সমস্ত জার্মান জাতি। অর্থাৎ বর্তমান

প্রজন্মের বাপ-পিতামহরা। তাদের দূষিত রক্ত এদের ধমনীতেও বহমান। সেই পাপের সর্বোপায়ে প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ এ বিষয়ে সকলের অবহিত হতে হবে। কোনও ছিদ্রপথে সেই নারকীয় মনোবৃত্তি যাতে আবার সমাজজীবনে বিষ না ছড়ায় তার জন্য অহোরাত্র সজাগ থাকা প্রয়োজন। তাই জার্মান ইতিহাস-বিষয়ক মিউজিয়ামের একটি অংশ হিটলার ফেল্ডে আউসউইৎসের কমান্ডান্টের ভয়াবহ উক্তি সর্বক্ষণ শোনানো হয়। অবিচলিত কণ্ঠে লোকটা ঘোষণা করে— গ্যাসে যে রোজ হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ হচ্ছে, সে কথা স্থানীয় লোক প্রথমে জানত না। কিন্তু পরে যখন দৈনিক নরহত্যা সংখ্যায় খুব বেড়ে গেল, তখন সারা সময় পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে আসায় সবাই বুঝতে পারে কী নারকীয় ব্যাপার তাদের ঘরের পাশেই ঘটে চলেছে। বার্লিন শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি পাথরের ফলক আছে। তাতে শুধু কয়েকটি জায়গার নাম খোদাই করা। নামগুলি নাৎসি ডেথ ক্যাম্পের— যেখানে ষাট লক্ষ নারী, শিশু, পুরুষকে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান-শিখ আমরা সবাই গত ষাট বছর ধরে যে পারস্পরিক হত্যার উৎসবে বারবার মেতে উঠেছি, তার বিস্তৃত বিবরণ শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে পাথরে খোদাই করে মানুষের চেতনার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। আমাদের কথায়, আচরণে মনে হয়— সমাজ হিসাবে আমরা শিশুর মতো নির্দোষ। কিছু খুনে রাজনৈতিক আর কালবাজারি আছে ঠিকই, তবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? ১৯৪৭-এ বহু লক্ষ মানুষ পরস্পর হানাহানিতে খুন হয়েছে। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় এই কলকাতা শহরে দশ হাজারেরও বেশি সংখ্যায় মানুষ নির্বিচারে কচুকাটা হয়েছে। শিশুদের দুই পা ধরে জরাসন্ধ বধের আঙ্গিকে টেনে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। জ্বলন্ত আগুনে তাদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাতে আমাদের কী? যদি হিন্দু হই তো দোষটা মুসলমানের। আর মুসলমান হলে হিন্দুর। আর দোষের প্রশ্নই বা ওঠে কেন? গুজরাটে যা ঘটেছে তার তো প্রয়োজন ছিল। (এই অশ্লীল উক্তি একটি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির। লোকটা কি মানুষ? কোন নিম্নস্তরের জীব তার তুলনায় অধম?) ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এক দিকে কংগ্রেস অন্য দিকে বামপন্থী সরকার মুসলমান তোষণ নীতি অবলম্বন করে ওদের বড় বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেশে বাস করে ওরা বিয়ে-শাদির ব্যাপারে শরিয়তি আইনের আওতায় থাকতে চায়। কী দুঃসাহস! ওদের মসজিদ আক্রান্ত হলে তেড়ে আসে! কোন দেশে বাস করিস তা ভুলে যাস? প্রত্যেকে এক একটি পাকিস্তানি চর। আর পাকিস্তানে? ওখানে যে সংখ্যালঘুরা নির্মূল হয়েছে— যত দূর জানি, এ নিয়ে উদারপন্থীরাও কোনও কথা বলেন না। ১৯৭১ সনে পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছিল তা নিয়ে কোনও পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী কি কখনও কিছু বলেছেন?

বাংলাদেশে হিন্দু বিতাড়ন প্রচেষ্টা বিষয়ে এক তসলিমা ছাড়া আর কেউ সোচ্চার বলে শুনিনি। আমাদের হয়েছে কি, কেউ একটু বুঝিয়ে দেবেন আমাকে? আমরা কি সত্যিই মানুষ? কোন চতুষ্পদ প্রাণী আমাদের তুলনায় অপকৃষ্ট? আমি তো ভেবে পাই না।

কিছুদিন হল বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিষয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। প্রথম প্রথম ভাবতাম কিছু লোকের মতিভ্রম হয়েছে। তারপর দেখি

ইয়োনেসকোর 'গণ্ডার' নামক নাটকটির অবস্থায় পৌঁছেছি আমরা। প্রথমে শহরের চকে মাঝে মাঝে একটি-দুটি গণ্ডারকে দেখা যেত। ক্রমে দেখা গেল সবাই গণ্ডার হয়ে গেছে। একজন বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার পা ঠুকে ঠুকে বললেন— 'আপনারা বিদেশে থাকেন তাই কোনও ধারণা নেই যে দেশে কী হচ্ছে! মুসলমানদের হয় এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, নয়তো তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিতে হবে।' যদি ভারতবর্ষ পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয় এটাই আমাদের কাম্য না হয়, তবে এ ছাড়া কোনও তৃতীয় পথ নেই। আর একজন পণ্ডিত ব্যক্তি নরাধম মোদীকে আমেরিকা ঢুকতে দেওয়া হয়নি দেখে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করলেন। ক্যালকাটা ক্লাব লোকটাকে ডেকে তার বচনামৃত পান করল, কারণ সকলের মতই তো শোনা উচিত। এই বিশালহৃদয় মানবধর্মী উদারতা থেকে নরপশুরাও বাদ পড়া অনুচিত। মনে হয় হিটলার বা নাথুরাম গডসে জীবিত থাকলে এঁরা তাদের ডেকেও তাদের বক্তব্য শুনতেন! এবং নিতান্তই তাদের বক্তৃতাভঙ্গির প্রশংসা করে হাততালিতে ছাদ ফাটাতেন, যেমন নরাধম মোদীর বক্তৃতা শুনে ফাটিয়েছিলেন। কপটতা আর কত দূর যেতে পারে!

এক আত্মীয় প্রশ্ন করলেন, 'তোমার মনে হয় না সারা পৃথিবীটাই ওরা কব্জা করে নেবে?' ওরা অর্থাৎ মুসলমানরা। এক পুরনো বন্ধু, যিনি এককালে বামপন্থী ছিলেন, মাঝে মাঝেই বলেন, 'সব মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদী না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী মাত্রেই মুসলমান।' আইরিশ স্বাধীনতাসংগ্রামী, তামিল টাইগার, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী, ইহুদি বিপ্লবীদের কথা উল্লেখ করলে বন্ধুবর বলেন—আরে সে তো আগের কথা! রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এক পরিবারের এক মহিলা কাজির অত্যাচারের কাহিনি শোনান। মনেরও অদৃশ্য দুটি কান আছে। তাতে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমার ওড়িশাবাসী পাচক পাকিস্তানি কাশ্মীরে ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজার মানুষ মারা গেছে শুনে বললেন, 'বেশ হয়েছে। আরও মরলে ভাল হত।' এক বাংলাদেশি কবি লিখেছেন, 'ফিরে এসো বাংলাদেশ। কোথায় চলেছ তুমি ধেই ধেই করে?' আমিও ভাবি—ধেই ধেই করে কোন নরকের পথে আমরা চলেছি? আমি কী করি? দুটো প্রবন্ধ লিখি। দুটো বক্তৃতা দিই। কেউ তা পড়ে বা শোনে বলে মনে হয় না। শুধু সৌভাগ্যের কথা— দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়নি। ভাগোয়া ঝান্ডা জাতীয় পতাকা হতে আরও কিছুদিন দেরি আছে।

২০০০ সনে আমার জীবনে আর একবার দুঃসহ দুঃখ নেমে এল। আমার চেয়ে বয়সে সতেরো বছরের ছোট ভাই অপু ওরফে ধূর্জটি অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেল। ১৯৪৩ সনে বাবা আর দাদা যখন জেলে, তখন ওর জন্ম হয়েছিল। দুর্যোগের মধ্যে এসেছিল, তাই বাবা ওর নাম রাখেন ধূর্জটি। পরে ওর নাম শুনে কুমার মন্তব্য করে, 'এত দেখেও লোকে শেখে না। দেখছ ওই নামের এক ভদ্রলোকের এমন ছেলে হল যে দুশ্চিন্তায় মাথার সব ক'টি চুল পড়ে গেল। তবু তোমরা...' বলে বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে দিল। অনেক শিশু থাকে যারা দর্শনমাত্র মানুষের মন কাড়ে। অপু সেই ধরনের শিশু ছিল। কিন্তু বড় হয়ে ওর স্বভাবে একটা অসংযমের প্রবণতা আসে। আমার একটা অযৌক্তিক বিশ্বাস আছে যে, অনেক জমিদার পরিবারেই একটা সময়ে অবক্ষয়ের সব লক্ষণ দেখা দেয়। লোকে বলে রক্তে ঘুণ

ধরা। বোধ হয় আমাদের রক্তে সেই প্রবাদোক্ত ঘুণ ধরেছিল। আমি যদি সত্যিই অকপটে আত্মকথা লিখতে পারতাম, তবে আপনাদের কাছে সেই ঘুণের নানা লক্ষণ প্রকট হত। কিন্তু অপুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসব কথা আমার মনে হয়নি। শুধু মনে হচ্ছিল— বরিশালে ওকে যখন কোলে করে নদীর পাড়ে নিয়ে যেতাম ও মাঝে মাঝেই বলত, 'ওরা যদি আমাকে বকে?' কারা, কেন বকবে তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু অনেক লোকের ন্যায্য-অন্যায্য তিরস্কার মাথায় নিয়ে অপু চলে গেল। আমি তখন ছ' হাজার মাইল দূরে। এই বছরেরই জানুয়ারি মাসে বম্বেতে ওর ছোট মেয়ে পিয়ার বিয়ে হল। আমি কন্যা সম্প্রদান করলাম। বোধ হয় অপু বেঁচে থাকলেও বলত, 'ছোড়দা, ও কাজটা তুমিই করো।'

অবসর নেওয়ার পর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু লিখব বলে আমি প্রতিশ্রুত—বিশেষত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুমার মুখার্জির কাছে। তিনি ওগুলি লিখে রাখা প্রয়োজন মনে করেই বারবার এই রচনাটি লিখতে আমাকে প্ররোচনা দিয়েছেন। কিছু পয়সা জোগাড় করে টিকিট কাটলেই তো প্যাকেজ ট্যুরে ঘোরা যায়। এর মধ্যে মাহাত্ম্য কী আছে? তবু পরের মুখে ঝাল খেয়েও যাঁরা ভ্রমণের স্বাদ কিছুটা পান, তাঁদের কিছু গল্প শোনাব। ধারাবাহিক বিবরণ নয়। যে ঘটনা বা দৃশ্যগুলি স্মৃতিতে গভীর দাগ কেটেছে, তারই কিছু কিছু বর্ণনা করব। আমার নাতনি শ্রীমতী লীলার গল্প শোনার খিদে অন্তহীন। প্রাণ কণ্ঠাগত হলে তবেই ছাড়া পাই। তখন তিনি সহৃদয় কণ্ঠে হুকুম দেন, 'দাদু, ইউ ক্যান স্টপ নাউ।' তাকে যেভাবে গল্প বলি প্রায় সেই আঙ্গিকেই পরবর্তী অংশটি লিখছি।

কেনিয়া গিয়েছিলাম অবসর নেওয়ার অল্প পরেই। উদ্দেশ্য মামুলি সাফারি। অর্থাৎ নিরাপদে গাড়ি চেপে সিংহ, হাতি, মোষ, জলহস্তী এসব দেখে বেড়ানো। প্রথম যে তরুণ সিংহত্রয় দেখলাম, তাদের ব্যবহারে তারা সিংহ, না বেড়াল, বলা কঠিন। বাস তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, একটু হর্নও বাজাল। একজন একটা চোখ মেলে দেখে পাশ ফিরে শুল। গাইড বললেন, 'যাঁরা কিছুটা নিরাশ বোধ করছেন, তাঁদের একটা কথা নিবেদন করি। ওই যে দেখছেন এরা গভীর বৈরাগ্যে মগ্ন, একটু নেমে দাঁড়ান, দেখবেন চেহারা বদলে যাবে। তবে সেটা আমি হতে দেব না। কারণ আমাকে বলা আছে, আপনাদের সব ক'জনকেই নিয়ে হোটেলে ফিরতে হবে। আমার ডিউটি স্লিপে সিংহদের খাওয়ানোর কথা লেখা নেই।'

ওই প্রজাতির সক্রিয় চেহারা দেখলাম অন্যত্র। কয়েকটি সিংহী মাতা। সঙ্গে পিলপিল করছে ছেলেপিলে। ঝোপ থেকে ঝোপান্তরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। গাইড বললেন, 'আজ ওদের পেরেন্ট-টিচার মিটিং।'

বিপদের মুখে পড়েছিলাম একদিনই। পাহাড়ের গায়ে একটি অনতিপ্রশস্ত রাস্তা। তার এক দিকে এক পাল বুনো মোষ। এঁদের সবাই একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। আর গাড়ির সামনেই একটি হাতির দল। দলটির নারীবাদী নেত্রী আমাদের দেখে খুব প্রসন্ন হননি মনে হল। তিনি শুঁড় উঁচু এবং বৃংহিত ধ্বনি করে আমাদের আক্রমণ করলেন। বুঝলাম— অন্তকাল সমাগত। কারণ আমাদের ভঙ্গুর জিপ ওঁর পদতলে অকালে ধুলো হয়ে যাবে— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর মহিষদের চোখের দৃষ্টিতেও সহৃদয়তার কোনও চিহ্ন ছিল না। কিন্তু যা ঘটল তাতে আমার সমস্ত সহানুভূতি হাতিটির দিকেই চলে গেল।

ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনটি 'রেভ' করে একটা বিশ্রী আওয়াজ করলেন। আর তা শুনে ওই বিরাট হস্তিনী লেজ গুটিয়ে পালাল। ওই বিরাট প্রাণীকে স্রেফ ধোঁকা দিয়ে তাড়ানো কেন যেন আমার চোখে বড় অপমানজনক বলে মনে হল। ভাবলাম— আমার ধূর্ত প্রজাতি এইভাবেই পৃথিবীকে জয় করেছে। মানীর মান রাখার তোয়াক্কা করেনি। আর পৃথিবীতে যেসব ধূর্ত মানুষ সকলের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, সেও তো একই উপায়ে!

কিন্তু সেই রাত্রে হাতিদের অন্য রূপ দেখে মোহিত হলাম। যে-'ট্রি টপ হোটেল'-এ থাকার সময় রানি এলিজাবেথ পিতৃবিয়োগ এবং নিজের রানি হওয়ার সংবাদ পান, ওই রাতটা আমরা সেখানে কাটাই। রাতে ফ্লাড লাইট দিয়ে নীচে হ্রদের পাড় আলোকিত। দলে দলে হাতি হ্রদের পাড়ের কাদায় নুনের সন্ধানে এসেছে। আর কী তাদের বপ্রক্রীড়া! মনে হল সহজাত ডিগনিটি ওদের বিশাল বিশাল দেহে মূর্তি গ্রহণ করেছে। বিশালতার রূপ আর একবার প্রত্যক্ষ করেছিলাম আলাস্কায়। সেখানেও টিকিট কেটেই নিশ্চিন্ত জলবিহারে গিয়েছিলাম— ও অঞ্চলের আইসবার্গ আর তিমি মাছ দেখতে। অন্যতর স্মরণীয় দৃশ্য 'কাভিং'। বিরাট বিরাট আইসবার্গ থেকে পর্বতপ্রমাণ সব বরফের চাঁই জলের মধ্যে ভেঙে পড়ে। আর টুকরো টুকরো ভাসমান বরফের উপর সিলরা নিশ্চিন্তে বসে থাকে। পাশে যে পর্বত ভেঙে পড়ছে, তাতে কুছ পরোয়া নেই। ভোর চারটেয় জাহাজে যে প্রকৃতি-বিশারদ ছিলেন তিনি আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। 'দেখবে এসো। তিমিরা খেলা করছে।' আঃ! সে কী খেলা! বিরাট দেহগুলি অ্যাক্রোব্যাটদের মতো জলের উপরে দশ-পনেরো ফুট ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটি জুটি দেখলাম বারবারই লাফিয়ে উঠছে আর ডুবছে। ন্যাচারালিস্ট বললেন— ওরা মা আর মেয়ে। এই খেলা কোনও প্রয়োজনে না। শুধুই প্রাণপ্রাচুর্য আর সব জীবজীবনের কেন্দ্রে যে আনন্দধারা তারই প্রকাশ। আরও বললেন— যারা তিমি শিকার করে, এই খেলার সময়টায়ই তাদের সুবর্ণ সুযোগ। নির্ভাবনায় খেলায় মত্ত বিরাট প্রাণীগুলির গায়ে হারপুন বিঁধে সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে যায়। শিকারিরা মনে মনে মুনাফার বহর হিসেব করে।

আলাস্কায় ভ্রমণের অন্যতর স্মরণীয় ঘটনা এক ভালুকের সঙ্গে মোলাকাত। শুনেছি 'হাতি মেরা সাথী' নামক ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর এক বোম্বাইয়া ডিরেক্টর এক ছবি করেছিলেন, যার নাম 'ভাল্লু মেরা লাল্লু'। এই নামকরণ সম্পূর্ণ ভুল ধারণার ফল। হাতি যদি-বা সাথী হয় ভাল্লুর লাল্লু হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সে অতি সাংঘাতিক প্রাণী, মোটেই হেলাফেলা করার জিনিস না। আলাস্কায় জলভ্রমণের সময় একদিন উপকূলে চড়ুইভাতি করা ঠিক হল। অ্যাডভেঞ্চার ফিল্মে দেখেছেন— পাথর ছড়ানো উপকূলে নায়ক-নায়িকা কেমন অক্লেশে দিব্যি নাচতে নাচতে চলে যায়। মশাই, ও সব ক্যামেরার কারসাজি। তেমন তেমন পাথর ছড়ানো উপকূল তো দেখেননি! দেখলে নাচানাচির কথা মনেও আসত না। আলাস্কা আর গালাপাগোস দুই জায়গায়ই দেখেছি— পথহীন পাথর ছড়ানো উপকূল মানুষের ঠ্যাং ভাঙার জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি। ভদ্রলোক স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন— এমুখো হোস না। তা সত্ত্বেও যদি চ্যাংড়ামি করো তো ঠ্যাং ভাঙবেই। আলাস্কার সমুদ্রতীরে নেমে বুঝলাম এখানে কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে এক পাও এগোনো সম্ভব না। আমাদের বস্তুত

কোলে করে নিয়ে যাওয়া হল। সবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি— দেখি সম্পূর্ণ অ-লাল্লু এক ভাল্লু বনবাদাড় থেকে বের হয়ে এসে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই আমাদের দেখছে। সোজা তার মুখোমুখি হয়ে দু হাত মাথার উপর তুলে আস্তে আস্তে পশ্চাদপসরণ করবে, মুখে বলবে 'হ্যালো মিস্টার বেয়ার' (কথাটা ইংরেজিতে বলতে হবে, ওরা বাংলা একেবারেই বোঝে না)— ভাল্লুক সাক্ষাৎকারের এই নিয়মগুলি মনে মনে আওড়ালাম। কিন্তু বুঝলাম শিরে এখন সংক্রান্তি। আমাদের কপাল ভাল ছিল। আমাদের সুখাদ্য বা সুবধ্য মনে না হওয়ায় ভাল্লুক জঙ্গলে ফিরে গেলেন।

আমার স্ত্রী প্রকৃতিপ্রেমিক। নানা নচ্ছার পশুপাখি ওঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়ে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। কিছুদিন ধরে এক অতি বজ্জাত কাক ঘরের ভিতর ঢুকে আমাকে মুখ ভেঙাত। ভিতরের লোকের উস্কানি না থাকলে এসব বেয়াদবি সম্ভব না— সে কথা যে-কেউ বুঝতে পারে। বছর পঁয়তাল্লিশ বিবাহিত জীবনের পর স্বামীর চেয়ে কাক মূল্যবান জীব মনে হওয়া কিছু বিচিত্র না। যাক গে, জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তাই চুপ করে থাকি। উনি যখন ঠিক করলেন গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে যাবেন, কুমার বলল, 'এবার তোমার সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে।' মাথা কার খারাপ হয়েছে, এ নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই। গেলাম গালাপাগোস, ইকুয়াডোরের রাজধানী কিটো হয়ে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে গোটা ত্রিশেক ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের নাম গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ। তার বেশির ভাগই মনুষ্যবাস বর্জিত। আরে মানুষ থাকার মতো হলে তো থাকবে। ওগুলি অতি বর্বর জায়গা। থাকার মধ্যে সামুদ্রিক গোসাপ (তিন রঙা মোটা মোটা ল্যাগপেকে চেহারা, অতি বিশ্রী দেখতে), সমুদ্রসিংহ অর্থাৎ অত্যন্ত গোলমালপরায়ণ সিলমাছ, এক একটার গোটা পঞ্চাশেক বউ (সব কটা আইনসঙ্গত বিবাহ বলে মনে হয় না)— গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে হারেম রক্ষায় ব্যস্ত, আর গোটা কয়েক জাম্বো সাইজের কচ্ছপ। অল্পস্বল্প মানুষ যেসব জায়গায় আছে, সেখানে গেলেই দেখবেন একটি সাদা দাড়িওয়ালা লোকের ছবি— নৌকো চেপে গালাপাগোসে নামছে। ওটা নাকি ডারউইনের ছবি। আরে বাবা, ভদ্রলোক যখন ওদেশে গিয়েছিলেন ওঁর তখন বয়স চব্বিশ। অত বড় দাড়ি গজাবে কোত্থেকে? আর যদি-বা গজায় তো সাদা হবে কোন দুঃখে? কাকে কে বোঝায়!

একটা দ্বীপে নৌকা ভিড়ল। দেখুন, এসব জিনিস টেলিভিশনে দেখাই ভাল। নৌকা থেকে পাড়ে নামতেই প্রাণান্ত। তারপর সেই উপলবিছানো উপকূল। আহা! উপল বলে উপল! প্রতি পদে আছাড় খেতে হয়। আছাড় খেতে খেতে প্রথম দেখলাম ব্লু ফুটেড বুবি। নামেই বুঝছেন প্রজাতিটি নিতান্ত নির্বোধ। পক্ষীপ্রজাতির মধ্যে বোকামিতে গোল্ড মেডালিস্ট। মানুষ দেখে ভয় পায় না। এই তার মাহাত্ম্য। আরে বলি, মাথায় কিছু থাকলে তো ভয় পাবে! একটা পাথরের উপর বসে দু'দণ্ড বিশ্রামের চেষ্টা করছি। চারপাশে গোসাপ আর সিল কিলবিল করছে। গাইড বলে দিয়েছে— কোনও জন্তুর গায়ে হাত না দিতে। বিশেষত সিল মাতারা গন্ধ শুঁকে বাচ্চাদের চেনে। মানুষ ছুঁয়ে দিলে গায়ে মানুষের গন্ধ হয়ে যায়। (প্রকৃতির ভদ্র প্রাণীদের ও গন্ধ সহ্য হয় না।) তখন আর সেই হতভাগ্য সিল শাবককে কেউ ঘরে নেয় না। শুনে আমার স্ত্রী বেশ নিরাশ হলেন। বোধ হয় ওঁর প্ল্যান ছিল একটা

সিলের বাচ্চা অক্সফোর্ড নিয়ে আসা। ইচ্ছেটা ওদের একজন আন্দাজ করে থপথপে পায়ে ওঁর কাছে এগিয়ে এল। বাচ্চাটা ওঁর কোলে ওঠার তালে ছিল। উনি খুব খুশি। কিন্তু সিলজননী চিন্তিত। গাঁকগাঁক করে তেড়ে এল। গাইড এসে দুটোকেই ভাগিয়ে না দিলে সেদিন একটা এসপার-ওসপার হয়ে যেত।

ওখানে প্রধান দ্রষ্টব্য মরালগ্রীব বিশাল মহাকচ্ছপ। তাদের একটি তার উপপ্রজাতির শেষ প্রতিভূ। মানুষের দেওয়া নাম লোনলি জর্জ। তার নিকটতম উপপ্রজাতি থেকে ক'টি সঙ্গিনী দেওয়া হয়েছিল। সে ফিরেও তাকায়নি। ওই কচ্ছপ দেবদাসের লাইনে শেষ কথা। দেখে ক্যাথারসিসে প্রাণ প্লাবিত হল। মানে 'টেরর' আর 'পিটি' কীসে আর এর বেশি হতে পারে? শুনলাম মহাকচ্ছপরা মূক। শুধু একসময় তাদের গর্জন দূর হতে শোনা যায়— মানে যখন তারা সঙ্গমস্থ হয়। একজন সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন— এ ঘটনা মাসে বা বছরে ক'বার ঘটে। শুনলাম— মাত্র বছরে একবার। ভদ্রলোক বললেন— তা হলে তো একটু উল্লসিত হবেই! তা বলে অতটা আওয়াজ! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না!

গালাপাগোস গিয়েছিলাম ইকুয়াডোর হয়ে। ফিরলাম কলাম্বিয়ার রাজধানী বোগোটার পথে। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস বিজেতারা এক স্বর্ণমণ্ডিত দেশ বা এল ডোরাডোর কাহিনি শুনেছিলেন। কারও কারও মতে কলাম্বিয়া এবং তার রাজধানীই এল ডোরাডো। এখানকার প্রাচীন সংস্কৃতিতে স্বর্ণের ব্যবহার অপরিমিত। কোনও কোনও বিশেষ উপলক্ষে এদের পবিত্র হ্রদে সোনার নানা অলংকার আর আয়ুধ নিক্ষেপ করা হত। সেইসব উদ্ধার করে এদের বিখ্যাত জাদুঘরে এখন রাখা হয়েছে। তার কিউরেটার আমাদের সেন্ট অ্যান্টনিস কলেজের ছাত্রী। খুব যত্ন করে সব ঘুরে দেখালেন। একটি ঘরে আলো নেভানো ছিল। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওই ঘরে ত্রিশ হাজার স্বর্ণনির্মিত জিনিস রাখা ছিল।

প্রাণিজগতে যদি বিরাটত্বর রূপ দেখি কেনিয়ার হাতি আর আলাস্কার তিমি মাছে, তবে তার সম্পূর্ণ অন্য এক মনোমুগ্ধকর রূপ দেখেছিলাম গ্রিনল্যান্ডে। শৈশবে ভূগোলের বইয়ে অরোরা বোরিয়েলিসের ছবি দেখেছিলাম। সেই সময় থেকে ইচ্ছে হয়েছিল— কখনও প্রকৃতির ওই বিচিত্র লীলা নিজের চোখে দেখতে হবে। সেই সুযোগ জুটল বয়স যখন পঁচাত্তর ছুঁয়েছে। বার্লিনে অস্ট্রেলিয়ান এরিক ওয়ারেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল— সেকথা আগেই লিখেছি। ও-ও দেখলাম ভবঘুরের মতো বেড়াতে ভালবাসে। আমরা মাঝে মাঝেই আলোচনা করতাম যে একবার অরোরা বোরিয়েলিস দেখতে যাব। এরিক থাকে সুইডেনে। ওখান থেকে স্বর্গীয় ওই লীলা দেখার সুযোগ কিছু বেশি। কারণ মনে রাখা ভাল— আকাশ মেঘাবৃত থাকলে দেবতাদের এই খেলা মরণশীল জীবদের নয়নগোচর হয় না।

হঠাৎ এক ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের প্রত্যাশিত সুযোগ জুটে গেল। এরিক ফোনে জানালেন— কোপেনহেগেনের এক ট্র্যাভেল কোম্পানি সস্তায় ব্যবস্থা করেছেন— গ্রিনল্যান্ড গিয়ে অরোরা বোরিয়েলিস দেখার। তবে একটু ঠান্ডার সময়— ফেব্রুয়ারি মাসে,

যখন ওখানকার তাপমান - ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিংবা তার চেয়ে কিছু নীচে। শরীরে অল্পস্বল্প গোলমাল আছে। আমার ইংরেজ ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। বললেন, 'যাও, তবে ফিরে আসবে এমন গ্যারান্টি দিতে পারি না। ঠিক আছে। না ফিরলে জানিয়ো। আমরা ভাল করে শোকসভা করব।' কোপেনহেগেন থেকে প্লেনে পাঁচ ঘণ্টা উড়ে গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে কাঙ্গারলুসা নামে এক অস্থানে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কানাডার পূর্ব উপকূল আকাশপথে মাত্র দু ঘণ্টার পথ।

প্লেন নামলে দেখলাম সব কিছুই কঠিন বরফে ঢাকা। শরীরে ছ' প্রস্থ জামা থাকা সত্ত্বেও মনে হল আমাদেরও কঠিন বরফে পরিণত হতে বেশি দেরি নেই। কিন্তু বিবেকবান ট্র্যাভেল কোম্পানি তাঁদের কর্তব্য করতে বদ্ধপরিকর। পৌঁছোনো মাত্র আমাদের ওখানকার প্রাণিসম্পদ দেখাতে নিয়ে গেলেন। এই শীতে প্রাণিসম্পদ? তারা কী খেয়ে বেঁচে থাকে? বরফ ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না। আমাদের মতো তাদের খাদ্যও কি কোপেনহেগেন থেকে উড়োজাহাজে এসেছে? পথে দু-একটি খরগোশ আর শেয়াল জাতীয় প্রাণী চোখে পড়ল। গাত্রবর্ণ ওই বরফের মতোই দেখলাম। বরফ ফুঁড়ে দু-চারটে পত্রহীন আগাছার ডাল বের হয়ে আছে। একটু পরেই চোখে পড়ল—একদল মাস্ক অক্স (মানে পুত্রকলত্রাদি সহ) ওই শুকনো ডাল থেকেই পুষ্টি সংগ্রহের (সম্ভবত ব্যর্থ) প্রচেষ্টা করছেন। ছবি তোলার হিড়িক পড়ল। ওরা বেশ একটু দূরেই আছে। তাই বাস থেকে নেমেই ছবি তোলা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর একটু কাছে যাওয়া যায়?' নিস্পৃহ উত্তর, 'তা যায়।' 'তাড়া করবে না তো?' 'করতেও পারে।' 'করলে বাসে ফিরতে পারব তো?' 'পারতেও পারো।' এই অস্তিত্ব এবং সন্দেহবাদী দার্শনিকের পরিবেশিত তথ্য বিচার করে কিংকর্তব্য নির্ধারণ করলাম। বাসেই ফিরে এলাম। নখি-শৃঙ্গীদের থেকে কত হাত দূরে থাকবে এ বিষয়ে চাণক্যমুনির নির্দেশই প্রামাণ্য মনে হল।

হোটেলের ব্যাপারে আমাদের একটা 'চয়েস' দেওয়া হয়— রিট্স অথবা হিল্টন। বনেদিয়ানার সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতা আছে। তাই আমি রিট্স-এ থাকাই ঠিক করলাম। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি দুই খানদানি হোটেলে সত্যিতে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি প্রিফেব্রিকেটেড ব্যারাক। সেটাকে সারিয়ে-টারিয়ে বাসযোগ্য করা হয়েছে। রসিকতা করে ভারী ভারী নামকরণ করা হয়েছে। ভিতরে স্নানের ব্যবস্থাও আছে। তবে ঘড়ি ধরে দিনে তিন মিনিট। যা হোক, তবুও তো তিন রাত রিট্স-এ থাকলাম। অক্সফোর্ড ফিরে বন্ধুবান্ধবদের খবরটা দিলাম। দেখলাম— সবাই বেশ ঈর্ষান্বিত। হবেই তো। রিট্স বলে কথা! মাস্টার-পণ্ডিতদের কপালে কি এসব জোটে?

পরপর দুই রাত অরোরা দেখার সুযোগ পেলাম। দেবতাদের সেই লীলা বর্ণনা করার জন্য যে কবিপ্রতিভা প্রয়োজন, বলা বাহুল্য, তা আমার নেই। নেহাতই আটপৌরে ভাষায় সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। প্রথমে দেখলাম অন্ধকার আকাশের এক দিক জুড়ে স্বচ্ছ অথচ অত্যুজ্জ্বল একটি সবুজ আলোর পর্দা নেমে এল। সেই আকাশজোড়া পর্দা কখনও থরথর করে কাঁপছে, কখনও তাতে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠছে। হঠাৎ আকাশ জুড়ে নীল রঙের একটি বিশাল রামধনু ছড়িয়ে পড়ল। তার পাশেই আর একটু সবুজ রঙের

বলয়। শুধু রামধনুর তুলনায় তাদের বিস্তার অনেক বেশি। অনেক রাত্রে দেখলাম নীল-সবুজ রামধনুরা কখন যেন বিদায় নিয়েছে। সবুজ সিল্কের পর্দাটিও আর দৃশ্যমান নেই। তার জায়গায় আকাশ জোড়া এক লাল রঙের বিশাল বলয়। মনে হল যেন সে মহাপ্রলয়ের সংকেত নিয়ে এসেছে।

গ্রিনল্যান্ডে সত্যিতেই একদিন মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করেছিলাম। আমাদের প্যাকেজ ট্যুরের অঙ্গ হিসাবে একদিন চার ঘণ্টা কুকুরে টানা স্লেজে করে বেড়াবার কথা। যদিও তখন সর্বাঙ্গ বহুস্তর জামাকাপড়ে মোড়া থাকবে, বিশেষ করে সর্বোপরি সিলের চামড়ার ওভারকোট এবং বুট জুতো আপাদমস্তক ঢেকে রাখবে, তবুও মুক্ত আকাশের নীচে - ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমান কতক্ষণ সহ্য হবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আমার পত্নীর ভয়ডর কিছু কম। বুঝলাম তিনি যাবেনই। আমি পুরুষমানুষ, কোন মুখে লেজ গুটিয়ে বাড়িতে বসে থাকি? অতএব...

এক একটা স্লেজ এগারো-বারোটা হাস্কি নামক লোমশ কুকুরে টানে। এদের বিশেষত্ব— সারাক্ষণ এরা হাউ হাউ করে চেঁচাতে থাকে। কীসে এদের এত আক্ষেপ বোঝা মুশকিল। ওই অঞ্চলে দিন-রাত্রের তফাতটা শীতকালে খুব স্পষ্ট না। তবে দু-তিন ঘণ্টা সময় অন্ধকারটা একটু ফিকে হয়ে আসে। সেই আলো-আঁধারির মধ্যে আমরা স্লেজে চড়ে বসলাম। এই চক্রহীন যান কতকটা অপ্রশস্ত নৌকার মতো আর তার উপর ঠিক বসা না, আধশোয়া অবস্থায় থাকতে হয়। এক একটি স্লেজে দু'জন করে যাত্রী। চালক বেশির ভাগ সময়টা পাশে পাশে দৌড়তে থাকে। যাত্রার গোড়ায়ই মনে হল এই ঠান্ডা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না। আধ ঘণ্টার মধ্যে হাত-পা সব হিম হয়ে এল। অতগুলো যে জামাকাপড় পরে আছি, তাতে কিছু তফাত বুঝলাম না। শুনেছি অতিরিক্ত ঠান্ডায় কাপড় বা পশমের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা চলে যায়। এক ঘণ্টার মাথায় মনে হল শরীরের সব তাপ যেন জলের মতো হাত আর পায়ের আঙুলের ডগা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। হাসিকে বললাম— এ যাত্রা পার পাব বলে মনে হয় না। চালককে বলা হল ফিরে যেতে। ফেরার পথে সত্যিই ভাবলাম মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে। অন্তত শরীরের কোনও কোনও অংশ যে জমে যাওয়ার ফলে কেটে বাদ দিতে হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রইল না। এই সময় দেখলাম আকাশ আর একটু উজ্জ্বল হয়েছে। দূরের বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি সেই বিবর্ণ আলোয় বড় মনোমোহন রূপ নিয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে চেতনায় কোনও সৌন্দর্যবোধ ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন আর একটি কোনও প্রাণী সব কিছু দেখছে, উপলব্ধি করছে, আর মৃত্যুর কোলে শুয়ে আমি তার অনুভূতিগুলি বুঝতে পারছি। যা ঘটছে তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই। একটা গভীর নির্লিপ্ততা, চেতনা সত্ত্বেও চেতনাহীনতা আমার সত্তাকে ঘিরে ছিল।

দু ঘণ্টার মাথায় স্লেজ চালকদের আড্ডায় পৌঁছে গেলাম। আগুনের তাপে কয়েক মিনিটের মধ্যে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। বুঝলাম কোনও স্থায়ী ক্ষতি হয়নি। কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিতে হবে না। শুধু ভাবি— ওই এক ঘণ্টার যে অভিজ্ঞতা, সেই কি মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের চেতনার স্বরূপ?

গ্রিনল্যান্ডে দেখা অরোরা বোরিয়েলিসের সঙ্গে তুলনা হয় এমন অন্য কোনও প্রাকৃতিক

দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু সৌন্দর্যচেতনা কতটা মানুষের জীবনে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে— বোধটা কতটা বস্তুনির্ভর আর কতটা ব্যক্তিগত চেতনানির্ভর— তার একটি অসাধারণ উদাহরণ পাই এরিকের সঙ্গে নরওয়ে বেড়াবার সময়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নরওয়ের ফিওর্ড অঞ্চল অসামান্য। বরফ ঢাকা পাহাড়, পাইনের বন, অসংখ্য পাহাড়ে নদী, ঝরনা আর জলপ্রপাত, বিশাল বিশাল হ্রদ আর সমুদ্রের নানা রূপ প্রাণে এক ভাষাতীত তৃপ্তির স্বাদ বয়ে আনে। আমরা গাড়িতে ঘুরছিলাম। রাতে কোনও কাঠের তৈরি লগ ক্যাবিনে আশ্রয় নিতাম। শেষ যে লগ ক্যাবিনে ছিলাম, তার পরিবেশ সব দিক থেকেই অসামান্য। পাইনবনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটি বড়সড় নদীর পাড়ে তার অবস্থান। নদীটিকে জলপ্রপাত বললেই ঠিক হয়, কারণ সে গভীর গর্জন সহ ধাপে ধাপে নীচে নেমে সমতলের বিশাল হ্রদটিতে বিলীন হয়েছে। লগ ক্যাবিনের মালিকটিকে এরিক জিজ্ঞেস করে, 'তুমি বুঝতে পারো যে তুমি অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বাস করো?' লোকটি বলল, 'দ্যাখো, এখানেই আমার জন্মকর্ম। এখানেই সারা জীবন কাটিয়েছি। লোকে বলে খুব সুন্দর জায়গা। আমি তো তেমন কিছু দেখি না।' শুনে মনে হল, নিজেও তো সৌন্দর্যে অসামান্য একটি শহরে বাস করি। রোজ পার্কের পাশ দিয়ে যাই, ব্রড স্ট্রিট হাই স্ট্রিটের মহিমান্বিত সৌধগুলি দেখি। কদিন চুপ করে বসে এই পরিবেশ আত্মস্থ করি, এই অতি সুন্দর শহরে বাস করার সৌভাগ্য বিষয়ে সচেতন হই? দৈনন্দিনতার চাপে অধিকাংশ মানুষের সৌন্দর্যচেতনা আর সজীব থাকে না।

এতক্ষণ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে প্রকৃতি আর প্রাণিজগতের কথা লিখেছি। এবার একটু সভ্য মানুষের দুনিয়ায় ফিরে আসি। ইউরোপ দিয়ে শুরু করি। পশ্চিম ইউরোপ বারবারই যাওয়া হয়েছে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কিছু কম। এবার সেই অভাবটা পূরণের কিছু চেষ্টা করলাম। প্রথম যাই চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ, স্থানীয় উচ্চারণে প্রাহা। অনেকের মতে এটি ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর শহর। মধ্যযুগ আর আধুনিক ইউরোপ এখানে পাশাপাশি অবস্থান করছে। আর্ট ডেকোর রাজধানী প্রাগ। এখানেই কাফকা এক ব্যাঙ্কে কেরানির কাজ করতেন। উনি স্বর্ণকারদের গলিতে ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন, সেটি দেখতে গিয়েছিলাম। রাস্তার সব বাড়িগুলিই রঙিন এবং রংগুলি বেশ উগ্র। তবে দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু আকারে এত ছোট যে ওখানে বাস করা খুব সুখের বলে মনে হয় না। কাফকা তাঁর যাবতীয় রচনা ওঁর এক বন্ধুর হেফাজতে রেখে যান। নির্দেশ ছিল— পুড়িয়ে ফেলার। সে নির্দেশ না মানার ফলে মানুষের সভ্যতা লাভবান হয়েছে। শুধু ভাবি— সত্যিই কি কাফকা তাঁর বিরাট কীর্তি ধ্বংস করে ফেলতে চেয়েছিলেন? অত বড় প্রতিভাবান মানুষ কি তার মূল্য বুঝতে পারেননি? আর নিজের প্রজাতির প্রতি কোন অভিমানে তিনি সাফল্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দারিদ্র আর পরিচয়হীনতার জীবন কাটিয়ে গেলেন? কাফকা ছাড়া প্রাগ শহরের আর একটি স্মৃতিই আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। রাত্রে চার্লস নদীর উপরে সারিসারি সেতুর আলোকসজ্জা। এক যুগের রাজকীয় বিলাস অন্য যুগে ট্যুরিস্টদের আনন্দের খোরাক জোগাচ্ছে।

ইউরোপে সারা জীবন অনেক বেড়িয়েছি। সভ্যতা-সংস্কৃতি-প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম

এই মহাদেশ। দেখার শেষ নেই। বহু দর্শনেও মন ভরে না। মনে হয় আরও দেখি। এত দেখার মধ্যেও একটি দেখা যেন স্মৃতিতে সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আছে। ২০০৪ সনে ওই এক প্যাকেজ ট্যুরেই রাশিয়া যাই। কিন্তু এবার ভ্রমণটা জলপথে। প্লেন দেরিতে ছাড়ায় মাঝরাতে মস্কো পৌঁছে সোজা গিয়ে জাহাজে উঠলাম। জার্মানিতে তৈরি আনকোরা জাহাজটির নাম এম. এস. লেনিন। রাশিয়ার ইতিহাস থেকে স্তালিনের নাম মুছে গেছে, কিন্তু লেনিন এখনও ওদের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। শহরের পথে পথে এখনও ওঁর মূর্তি বক্তৃতার ভঙ্গিতে মানুষকে প্রেরণা জোগাচ্ছে। একতন্ত্র রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর ইতিহাসে ওঁর কোনও দায়িত্ব আছে— একথা রুশ রাষ্ট্রচেতনার অংশ বলে মনে হয় না।

রাশিয়ায় নদীপথে প্রমোদভ্রমণে এত কি ভাল লেগেছিল? এর সহজ উত্তর আমার জানা নেই। সমুদ্রে জাহাজে বেড়ানোর অভিজ্ঞতাটা অন্য ধরনের। অনেক মানুষ একটা বিরাট প্রাসাদের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে, এ অভিজ্ঞতা কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক। আর এখানে ছোট পরিসরের ভিতর মনে হয় যেন কোনও সহৃদয় ধনীর ভবনে কদিনের জন্য আতিথ্য নিয়েছি। অনেক সেবক-সেবিকা আমাদের যত্ন-আত্তি করছে। আর আমরা মৃত্তিকার শিশুরা জননীর দেখা দিনের পর দিন না পেলে প্রাণ রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠে। এখানে তিনি তো সব সময়েই চোখের সামনে। হাত বাড়ালেই আচল ছোঁয়া যায়। আর রাশিয়ায় প্রকৃতিকে শুধু উদার বলে বর্ণনা করলে তার অসাধারণ রূপ কিছুই ব্যখ্যা করা হয় না। শিল্পায়ন সত্ত্বেও ওই বিরাট দেশ এখনও যেন কৃষি এবং পল্লীপ্রধান। অন্তত দেশের বেশ বড় একটা অংশ জাহাজ থেকে দেখে এই ধারণাই হয়। মনে হয় যেন নাগরিক সভ্যতা অতি প্রশস্ত নদী, সমুদ্রোপম হ্রদ, খোলা মাঠ, উন্মুক্ত খেত, পাইন আর বার্চের বনে ঢাকা রুশ প্রকৃতিকে শুধু মাঝে মাঝে ছুঁয়ে গেছে, তার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেনি। সাত দিন ধরে এই জলবিহারে সেন্ট পিটার্সবার্গ পৌঁছনোর আগে কোনও বড় শহর চোখে পড়েনি। রোজই প্রায় কোথাও না কোথাও থামা হত। মধ্যযুগের রাজধানী বা পুরনো কাঠের তৈরি গির্জা, অথবা রাষ্ট্রের আওতায় ট্যুরিস্টদের দিকে এক চোখ রেখে কুটিরশিল্পের কেন্দ্র— কোনওটাই বিরাট কিছু ব্যাপার না। মনে হত একদা দরিদ্র দেশের সব পুরাকীর্তিতেও দারিদ্র্যেরই ছাপ।

কিন্তু অন্য এক রাশিয়ার দেখা পেলাম সেন্ট পিটার্সবার্গ পৌঁছে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই শহর দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন এসেছিলাম আলোচনাসভায়। ও বড় রদ্দি জিনিস। সারা দিন একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে কেটে যায়। তারপর গড্ডলিকাপ্রবাহের মতো সকলের সঙ্গে ক্যাঁচরম্যাচর করতে করতে পুরাকীর্তি দেখা আর সান্ধ্য প্রমোদের আয়োজনে অংশগ্রহণ। এ জিনিস অনেক করেছি, কিন্তু ও থেকে খুব একটা আনন্দ পেয়েছি কখনও মনে পড়ে না। কিন্তু এবার বেড়াতেই এসেছি, তাই অনেক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওই অনুপম নগরী দেখার সুযোগ পেলাম।

শহরটি রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের দান। দেখুন, সভ্যতার সুপ্রভাত থেকেই মানুষ মানুষের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করে চলেছে। কিন্তু সেই একই ভয়াবহ শোষণের ফল তাজমহলও হতে পারে আর দিল্লির হনুমান মন্দিরও হতে পারে। পিটার দা গ্রেটের তৈরি

এই পশ্চিমি ধাঁচের মহানগর সত্যিতেই বড় সুন্দর। মনে হয় আর কোনও রাজধানী, এমনকী প্যারিসও তুলনায় হতমান। তার একটা কারণ এ শহর যদৃচ্ছ বেড়ে ওঠেনি। সম্রাট আদেশ দিলেন আর অভিজাত বোইয়ার সম্প্রদায় ভয়ে বা আনুগত্যে কম্পমান হয়ে তাঁরই নির্দেশমতো রাজধানীতে সব প্রাসাদ বানালেন। দুই নদীর মাঝখানের এই শহরে আমস্টার্ডম প্যারিসের প্রতিধ্বনি, কিন্তু তবু বিশিষ্টভাবেই রুশ। আহা, কী রূপ, কী রূপ! প্রাসাদগুলির মধ্যে সৌন্দর্য আর আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ জারের উইন্টার প্যালেস। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সব শিল্পকীর্তিতে ভরা। ইতালীয় রেনেসাঁসের চিত্রকলা থেকে শুরু করে জারের আমলের ফাব্রেজে বা সোনার কাজ করা পোর্সেলিনের সব খেলনা আর দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের গোড়ায় প্যারিসের বাজারে কেনা ইমপ্রেশনিস্টদের আঁকা সব ছবি আর প্রথম যুগের পিকাসো—সবই এই প্রাসাদে সাজানো রয়েছে। প্রাসাদের ঘরগুলি অ্যাম্বার আর সোনার কাজে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। অ্যালাবাস্টারের অতি সুদৃশ্য সব থাম অনেক উঁচু নানা অলঙ্কারখচিত সিলিং ধরে রেখেছে। জারতন্ত্রের অন্ত্যকাল যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখন গৃহসজ্জায় একটু আধুনিকতার ছাপ। সোনার ব্যবহার কিছু কম, তার জায়গায় বিলিতি ধরনে পোর্সেলিনের ব্যবহার। কিন্তু এই নতুন রুচিবোধ পূর্ণ বিকাশের আগেই জারতন্ত্রের অবসান হল।

এ যাত্রায় আগে দেখিনি এরকম একটি প্রাসাদ এবার দেখার সুযোগ পেলাম। জার্মান কন্যা ক্যাথারিন দা গ্রেট সেন্ট পিটার্সবার্গের নিরবিচ্ছিন্ন হট্টগোলে হাঁপিয়ে উঠতেন। তাই বিশ মাইল দূরে ছায়াঘন এক পল্লীতে উনি একখানি বাসা বা নীড় তৈরি করান। নেহাতই ছোট, মাত্র একশো ঘরের একটি কুটির— যাতে মহারানির কষ্টেসৃষ্টে চলে যেত। কিন্তু কুটিরটি রূপে অনবদ্য। নীল রঙের এত মনোহারিণী ব্যবহার আমি আর কোথাও দেখিনি। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে— সম্রাজ্ঞীর লিবিডো কিছু প্রবল ছিল। শেষজীবনে—বয়স যখন সত্তরের ঘরে, তখন উনি এক প্রেমিক জুটিয়েছিলেন। তার বয়স কুড়ি। ওঁর প্রিয় কুটিরটির পাশেই তার জন্যও এক বাসস্থান তৈরি হয়। যাতায়াতের সুবিধের জন্য একটি সাঁকো দুটি প্রাসাদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করত। ভারী তৃপ্তিকর ব্যবস্থা।

এবার ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ায় ভ্রমণের কথা কিছু বলি। এ প্রসঙ্গে তিনটি দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে লিখব। তার প্রথমটি হল কাম্বোডিয়া, সংস্কৃত ভাষায় যার নাম ছিল কাম্বোজ। এক সময়ে আমাদের স্বাজাত্যভিমান যখন তুঙ্গে, তখন বৃহত্তর ভারত বলে একটা কথা চালু ছিল। কাম্বোডিয়া সেই 'বৃহত্তর ভারত'-এর একটি দেশ। এই বর্ণনা এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। তার প্রধান কারণ এই বর্ণনা শুনলে ওসব দেশের লোক অত্যন্ত বিরক্ত হয়। আমাদের বড় বড় শহর ঘুরে ছেলেছোকরাদের চিচি ইংরেজি শুনে আর পশ্চিমি নাচানাচি দেখে কেউ যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে ভারতবর্ষ বৃহত্তর ইংল্যান্ড বা বৃহত্তর আমেরিকার অংশ, তা হলে আমাদের যেমন লাগবে বৃহত্তর ভারত শুনলে ওদেরও ঠিক তেমনই লাগে। আর বর্ণনাটা ভুলও বটে। ফরাসি পণ্ডিত সেডেস এই দেশগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুত্বায়িত (ইংরেজিতে হিন্দুআইজড) রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করেছেন। ওঁর বক্তব্য— স্থানীয় সংস্কৃতির শিকড় সমাজজীবনের গভীরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার উপরে

ভারতীয় সভ্যতার একটা প্রলেপ পড়ে। কিন্তু কাম্বোডিয়া কাম্বোডিয়াই থাকে, এবং তার সংস্কৃতির কেন্দ্রে রয়েছে স্থানীয় সভ্যতা। ওখানকার পুরাকীর্তি দেখতে গিয়েছিলাম আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপক (ওরফে হপন) মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রী স্কটল্যান্ডনন্দিনী পলিন-এর সঙ্গে। তিন দিন পইপই করে ঘুরে প্রাচীন শহর সিয়েম রিপের আওতার মধ্যে যত পুরাকীর্তি পড়ে তার সবই দেখেছিলাম। তার মধ্যে তিনটি প্রধান দ্রষ্টব্যর কথা মনে আছে। গোগ্রাসে গিললে যেমন হজম হয় না, তিন দিনে দশ-বারোটা অচেনা পুরাকীর্তি দেখলেও তেমনই সবকটার কথা মনে থাকে না।

পুরাকীর্তি হিসেবে আঙ্কোর ওয়াটের তুলনা নেই। তার একটা কারণ মন্দিরটির আয়তন। এতটা জায়গা জুড়ে ধর্মীয় স্থাপত্য পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। কীর্তিটি দীর্ঘদিন জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছিল। ফরাসি শাসকদের কল্যাণে তার লুপ্তোদ্ধার হয়। কিন্তু ওয়াট বা মন্দিরটির হিন্দু ঐতিহ্য সবাই প্রায় বিস্মৃত হয়েছিল। নবম শতকের গোড়ায় এই মন্দিরনগরের পত্তন হয় আর কয়েক শতাব্দী ধরে নির্মাণের কাজ চলতে থাকে। দীর্ঘদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর ওদেশে শান্তি ফিরে এসেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের মতো ট্যুরিস্টের ভিড়। আমাদের সৌভাগ্য— যখন গিয়েছিলাম তখনও ভিড়টা জমেনি। প্রায় সব পুরাকীর্তিগুলিই আমরা বেশ নিরিবিলিতেই দেখতে পেরেছিলাম। কোথাও আর কোনও ট্যুরিস্টের সাক্ষাৎ পাইনি।

আঙ্কোর ওয়াটের মন্দিরগাত্রে হিন্দু দেবদেবী পুরাণকথা ইত্যাদি নানা বিষয়ের রিলিফে ছবি আছে। মন্দিরটি স্তরে স্তরে উঁচুতে উঠে গেছে। তৃতীয় স্তরে সমস্ত মহাভারতের কাহিনির রিলিফচিত্র। বহু যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে পরিচিত কাম্বোজ শিল্পীর ছেনিতে সংঘাতের ছবিগুলি প্রায় জীবন্ত মনে হয়। অথচ বর্ণাঢ্য সান্ধ্য আকাশের নীচে পরিখার জলে যখন আঙ্কোর ওয়াটের প্রতিফলন দেখা যায়, মনে হয় মন্দিরটি যেন বিশ্বময় গভীর শান্তির মূর্তি। শান্তির সঙ্গে খেমের সভ্যতার পরিচয় সীমিত। সর্বত্রই ওদের পুরাকীর্তির গায়ে নানা আয়ুধ হাতে নরহত্যারই ছবি। যুগ যুগ ধরে মানুষের চোখে নরহত্যাটা অতি সম্মানজনক কাজ মনে হয়েছে— বিশেষ করে যদি কীর্তিটা রাজারাজড়ার হয়। এক সময় খেমের রাজ্যের রাজধানী ছিল আঙ্কোর থোম। তার ভগ্নস্তূপের প্রবেশপথে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের দৃশ্য বড় বড় মূর্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বহু পরিশ্রমে, সম্ভবত বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে, পুরাকীর্তি অপহরণকারীরা মাথাগুলি বেশ পালিশ করে কেটে নিয়েছে। ওই বিরাট এক টনি মুন্ডু কে কিনে কোথায় রেখেছে, সে সংবাদ কেউ রাখে না।

ট্যুরিস্ট-কৃত্যর এই বিবরণী আর বাড়াব না। একটি দৃশ্য বর্ণনা করে বিষয়ান্তরে যাব। একটি মন্দির যখন বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখছি, হঠাৎ কোথা থেকে পাখা হাতে কিছু সেবিকার আবির্ভাব হল। দিনটা গরম ছিল। তবু এই সেবাটি আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। ভাবলাম এটা একটি অব্যর্থ ট্যুরিস্ট ফাঁদ। ওদের সেবা নিলে একেবারে পথে বসিয়ে দেবে। দেখলাম— ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চাকুরে দীপক মজুমদার স্বভাবতই এসব বিষয়ে চিন্তা না করে সেবিকাদের পাখার হাওয়া খেতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে এসে দেখি শ্রীযুক্ত মজুমদার একটা ভাঙা পাথরের থামের উপর বসে বুদ্ধ অমিতাভর মতো নিমীলিত

নেত্রে সেবিকাদের সেবা গ্রহণ করছেন। একটু গলাখাঁকারি দিতে বোধিসত্ত্ব নয়ন উন্মীলন করলেন। বললাম, 'কী ভাবছেন?' উত্তর, 'ভাবছি এদের ওয়াশিংটন নিয়ে যাব।' সম্ভবত পলিন আপত্তি করায় এই শুভেচ্ছা ফলবতী হয়নি।

শত্রুর শত্রু তো বন্ধু। সেই সুবাদে পৃথিবীর নৃশংসতম গণহত্যাকারীদের একজন, পল পট আমেরিকার বন্ধু হন। কারণ যে ভিয়েতনামের লাথি আমেরিকাকে নীরবে হজম করতে হয়, সেই ভিয়েতনাম পল পট অধ্যুষিত কাম্বোডিয়া আক্রমণ করেছিল। অতএব পল পটের সাত খুন মাফ। পল পট কাম্বোডিয়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রায় নির্মূল করেছিলেন। এদিকে-ওদিকে নরকরোটির ছোট-বড় স্তম্ভ সেই নিদারুণ কালের স্মৃতি বহন করছে। আমাদের গাইডটি একটি ছোট স্তম্ভ দেখালেন। তার চূড়ায় কিছু মাথার খুলি। বললেন— ওর একটি ওঁর বাবার। ওঁর মাকে পল পট খুন করেনি। তিনি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যান।

আর দুটি দেশে ভ্রমণের কাহিনি সংক্ষেপে বলে এই নেহাতই অকিঞ্চিৎকর জীবনকাহিনি শেষ করব। তার প্রথমটি চিন। এই বিরাট দেশে পনেরো দিন ভ্রমণের কথাও সবিস্তারে লিখতে গেলে বেশ মাঝারি সাইজের একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়। চিন্তিত হবেন না। সেরকম কোনও সদিচ্ছা আমার নেই। কয়েকটি স্ন্যাপ শট মারফত আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রসঙ্গান্তরে যাব। বেইজিং এখন পৃথিবীর ট্যুরিস্ট-বলয়ের মধ্যে এসে গেছে। সুতরাং তিয়ানানমেন স্কোয়ার, চিনের প্রাচীর, সম্রাটদের গ্রীষ্ম কাটাবার প্রাসাদ ইত্যাদির বিবরণী দিয়ে আপনাদের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় সাহায্য করব না। সত্যি কথা বলতে ওগুলো দেখে একটু নিরাশই হয়েছিলাম। ভারতবর্ষে পুরাকীর্তি মানেই বালুপাথর, গ্রানিট বা শ্বেতপাথরের প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, মূর্তি ইত্যাদি বোঝায়। চিনের পুরাকীর্তিতে পাথরের ব্যবহার কম, কাঠের ব্যবহার কিছু বেশি। কাঠের তৈরি প্রাসাদ ঠিক অতটা অভিভূত করে না। অবশ্যি অভিভূত হওয়াই যদি দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য হয়, তবে চিনের সুদীর্ঘ প্রাচীর তো একাই একশো। কিন্তু সুরক্ষাব্যবস্থা চমকে দিতে পারলেও তার নন্দনশক্তি কম। আমাকে অবাক করেছিল চিনের স্বতন্ত্র এক রূপ। আকাশপথে উরুমকি গিয়ে সেখান থেকে ট্রেন আর বাসে দীর্ঘ পথ পার হয়ে দুং হুয়াং-এর সহস্র বুদ্ধমূর্তি শোভিত গুহাচিত্র দেখতে গিয়েছিলাম। উরুমকিতে একটি অভিজ্ঞতা হল যার কথা চিনের শত্রু-মিত্র কারও লেখায় পাইনি। আমাদের সুন্দরী গাইড একটু সাবধান করে দিয়ে বললেন— রাত্রে যেন কোনওক্রমেই দরজা না খুলি। ওই অঞ্চলের মেয়েদের সৌন্দর্যখ্যাতি মহাচিন তথা সারা পৃথিবীর বদমাসদের চুম্বকের মতো টেনে আনে। এখন আমরা সবাই শিখে গেছি যে মনুষ্যসভ্যতার শেষ কথা বাজারের সার্বভৌম রাজত্ব। সুতরাং চাহিদা থাকলে তা মেটাবার ব্যবস্থাও তো থাকবেই। সেই পথেই তো মানবজাতির মঙ্গল। তাই উরুমকির হোটেলে রাত্রে খদ্দের এবং চাহিদা মেটানেওয়ালিদের অথবা তাদের মালিকদের মোলাকাত হয়। ঘরে যাতে অবাঞ্ছিত ফোন না আসে, গাইড তার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু যারা ভিতরে ঢুকে পড়ে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় দরজায় খিল দেওয়া। একটু রাত হলেই দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল। মনে হল ভেঙেই ফেলবে। কোনও মতে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ঘুমের প্রশ্নই উঠল না।

উরুমকি থেকে দুং হুয়াং-এর পথ দুই বিশাল মরুভূমি পার হয়ে। তার প্রথমটি গোবি। আমার ভুল ধারণা ছিল যে গোবি একটি বিশেষ মরুভূমির নাম। আসলে তা নয়। বালুকাহীন শুধু পাথরের অন্তহীন বিস্তারের নাম গোবি। নিষ্করুণ রুক্ষতায় এর সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারে না। মরুভূমি আমার ভাল লাগে। মনে হয়— বিশ্বপ্রকৃতির সত্য রূপটা এখানে ধরা পড়েছে। 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'র মিসেস মুর তাঁর নিষ্করুণ সত্যদর্শনের মুহূর্তে মনে মনে বলেছিলেন, 'দা চেন অফ ইটার্নিটি ইস মেড অফ ম্যাগটস।' নিশ্চিত ধ্বংসমুখিন এই ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কোনও সান্ত্বনা নেই। দূর থেকে যে গ্রহ-তারা সুদৃশ্য কাব্যময় মনে হয় আসলে তারা সব ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড, নয়তো অসহ্য ঠান্ডা পাথরের চাঁই। আরও কোনও শ্যামল মাটির বসুন্ধরা কি আছে? জানি না। থাকলেও তা আমাদের নাগালের বাইরে। ওই করুণাহীন শ্যামলতাবর্জিত বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক। গোবি আমাকে আর একবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। গোবির পর টাকলামাকান। এই মরুভূমি আমাদের পরিচিত বালুকাবিস্তার। সব মরুভূমিই চেহারায় স্বতন্ত্র। তবু টাকলামাকান আমাকে অস্ট্রেলিয়ার কথা স্মরণ করাল।

টাকলামাকানের পথে আমরা একটি নবম শতকের বৌদ্ধ গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম। বাড়িগুলির ছাদ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দেওয়াল দাঁড়িয়েই আছে। এখানে গ্রামীণ চিনের দারিদ্র্য বড় বেশি প্রকট। কিছু বালখিল্য গোরুর গলার ঘণ্টা হাতে আমাদের পিছু নিল। তাদের বক্তব্য 'ওয়ান ডালার, ওয়ান ডালার' অর্থাৎ ওই অমূল্য বস্তু ওরা মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে আমাদের দিতে রাজি। গাইড ওদের বকাবকি শুরু করলেন। একটি ছোট মেয়েকে ধরে বোঝাতে লাগলেন— ইস্কুলে না গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? সরকার তোমাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছে। তোমরা তার সুযোগ নাও না। এর পর তোমার কী হবে? শেষমেশ কোনও চাষাকে বিয়ে করে বাকি জীবন চাষাই থেকে যাবে। মেয়েটার ললাটলিপি সম্ভবত তাই।

দুং হুয়াং চিনা তুর্কিস্তানের অন্তর্গত। মধ্য এশিয়ার এক বিরাট অংশ এক সময় বৌদ্ধসংস্কৃতির আওতায় এসেছিল। দুং হুয়াং সেই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানেরই অন্যতম ফল। ওইখানে গুহাগাত্রে বুদ্ধের ছবি আর মূর্তি হাজার নয়, বোধ হয় সংখ্যায় দশ হাজার বললে ঠিক হবে। এ বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমার চোখে অন্তত সব ছবি বা মূর্তি এক শৈলীর বলে মনে হয়নি। কিছু কিছু অত্যন্ত চোখধাঁধানো রঙে আঁকা বা রাঙানো মনে হল। প্রকৃতির অনুকরণ থেকে যখন প্রতিকৃতিগুলি সরে গেছে, তখন সেই ব্যতিক্রম মানুষের অবয়বে না, পারিপার্শ্বিকের চিত্রণে। মানুষ বা দেবতা স্বাভাবিক চেহারারই অনুগামী। প্রকৃতির অনুকরণ বা কয়েকটি আঁচড়ে তার দ্যোতনার ব্যাপারে চিনা শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভারতীয় মূর্তি বা চিত্রশিল্পে যে ধ্যানী বুদ্ধের করুণাময় বা অতীন্দ্রিয় অভিব্যক্তির ছবি পাই চিনা শিল্পীর কাজে তার তুলনা আমি পাইনি। একটা অতিসাধারণীকরণ করে বোধ হয় বলা চলে, চিনা সভ্যতার প্রবণতা ইহমুখী। ভারতবর্ষে এর বাইরে হয়তো আরও কিছু আছে, সেই অনিশ্চিত অস্তিত্বের সন্ধানে যেন মগ্ন। কথাটা অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর নিদর্শন হতে পারে। কিন্তু আমার সীমিত অভিজ্ঞতায় যা মনে হয়েছে তাই বললাম।

যে-শহরটিতে আমরা ঘাঁটি করেছিলাম, সে শহরে চিনার চেয়ে তুর্কিস্থানিই বেশি। চিনে আট রকমের রান্না আছে। এই অঞ্চলের রান্না তার একটি। এর সঙ্গে চিনার চেয়ে মধ্য এশীয় তুর্কি রান্নারই মিল বেশি। এদের একটি প্রিয় খাদ্য উটের খুর। ওটা না খেলে জীবন বিফলে গেল মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং খেলেই বোধ হয় ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে যায়।

দুং হুয়াং দেখে আকাশপথে চিনের প্রাচীন রাজধানী সিয়ানে ফিরে যাই। এইখানে সেই বিখ্যাত পোড়ামাটির তৈরি সৈন্যবাহিনী দেখলাম। জানতাম না যে এ মূর্তিগুলি প্রায় গুঁড়ো গুঁড়ো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সেই ভাঙা অবস্থায় কিছু মূর্তি এখনও আছে। তা থেকে যে মূর্তিগুলি কীভাবে উদ্ধার হয়েছে সে কথা চিন্তা করলে চিনে হুনুরির কাছে স্বতঃই মাথা নত হয়ে আসে। প্রতিটি মূর্তির মুখের অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিভিন্ন স্তরের সেনাপতিদের পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র আলাদা। কিছু কিছু সৈন্য ব্যূহের আকারে সাজানো। সব মিলিয়ে এক অবিশ্বাস্য জিনিস। এ তৈরি করতে কত দিন লেগেছিল জানা নেই।

সিয়ান হুয়েন সাং বা ইউয়ান চোয়াংয়ের শহর। ওখানকার লিটল ডাক মনাস্টারিতে উনি ওঁর সন্ন্যাসজীবনের অনেকটা কাটিয়েছেন। ওখানকার শান্ত নির্লিপ্ত আবহাওয়ায় অতীন্দ্রিয়র অনুরণন। তার কেন্দ্রে নীরবতা। চিনেরা জাপানিরা নানাভাবে নীরবতার সাধনা করেছে। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও কি একই আকুতি? তবে আমরা ব্যবহারিক জীবনে এত চেঁচামেচি করি কেন? পূজায় পেটো না ফাটালে ব্যাপারটা কেন অসম্পূর্ণ মনে হয়?

ইংল্যান্ড ফেরার পথে আবার বেইজিং এলাম। যাওয়ার পথে যে ভোজ শুরু হয়েছিল, এবার তা চরমে উঠল। প্রতিদিন প্রতিবারের আহার এক একটি নতুন রেস্তোরাঁয়। শেষ বিদায়ী ভোজ বিখ্যাত পিকিং ডাক খেয়ে। সে হাঁস স্বর্গীয় কোনও প্রাণী না চিনা পাচকের স্পর্শে দেবত্ব লাভ করেছে সে বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারিনি।

চিন ছাড়বার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ওদের পুরনো গরিব পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। যে প্রৌঢ় দম্পতির বাড়িতে আমরা গেলাম, তাঁরা দু'জনেই অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। একটি ঘরে তাঁদের বাস। কিন্তু তারই মধ্যে টেলিভিশন আর রেফ্রিজারেটার আছে। ঘরটি পরিষ্কার। ওঁরা ওই ছোট পরিসরের ঘরটিতে থেকে অখুশি মনে হল না। কিন্তু শহরের এই এক জায়গায় দেখলাম রাস্তার নোংরা ঢাকবার কোনও চেষ্টা হয়নি। তবে কলকাতার রাস্তার কাছে নোংরার ব্যাপারে ওই গরিব পাড়া নিতান্তই শিশু।

এবার আর একটি দেশে ভ্রমণের কথা বললেই আমার কথাটি ফুরাল। সে দেশটি ইরান। ইরান—কৈশোরে অনেক রোমান্টিক স্বপ্নের দেশ ইরান। ইস্পাহান, সিরাজ নানা গল্পকথা, কাব্যের মদির আবেশে পূর্ণ। হাফিজ, রুমি, ফিরদৌসি আর ভুল করে 'কবি' অঙ্কশাস্ত্রী ওমর খাইয়াম-এর দেশ। শুনেছিলাম মাথায় চুল ঢাকা কাপড়, হাত ঢাকা জামা না পরলে মোল্লাতন্ত্রের হাতে কোতল হতে হয়। কিন্তু সত্যিতে দেখলাম এসব ব্যাপারে মোল্লাশাহি একটু নরম হয়েছে। এমনকী এক রেস্তোরাঁয় এক বরযাত্রীর দল নাচবারই আয়োজন করছিল— যদিও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘটেনি। শিক্ষিত সাধারণের ব্যবহার জড়তাহীন, রীতিমতো খোলামেলা, আমাদের গাইড মোল্লাদের দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছ ওদের

জামার পকেট, ওর বিস্তার পা পর্যন্ত।' আরও বললেন, 'ওদের কেউ নির্বাচিত করেনি, ওরা হঠাৎ রাজা। আর ওদের সরাবার কোনও পথ নেই।' কথাটা অবশ্যি এখন আর সত্যি না। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট চরম প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোক। গণভোটে জয়ী হয়েই তিনি রাজ্যপাট পেয়েছেন।

ইরানের কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়ে সুন্দর একটি সকাল। ফার্সি কাব্য বুলবুল-কূজনে মুখর। হোটেলের বাইরে অসংখ্য বুলবুলের ডাক শুনে বুঝলাম তার কারণ কাব্যিক রোমান্টিকতা না, আটপৌরে সত্য। ওদেশে সত্যিই বুলবুল সংখ্যায় খুব বেশি, প্রায় আমাদের চড়াইয়ের মতো বললে সামান্যই অত্যুক্তি হবে। কয়েক শতাব্দী আগে যখন বাড়িঘর সংখ্যায় কম আর গাছপালা বেশি ছিল, তখন বুলবুলের প্রতাপও আরও বেশি থাকার কথা।

তেহরান আর পাঁচটা তৃতীয় জগতের রাজধানীর মতোই। ওখানকার একটা জিনিসই স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইরান সম্রাটের রত্নসম্ভার এক ব্যাঙ্কে রাখা আছে। পরিমাণে টাওয়ার অফ লন্ডনে রাখা ইংরেজ রাজবংশের রত্নসংগ্রহের চেয়ে অনেক বেশি। ইস্তাম্বুলে টৌপকাপি প্রাসাদের রত্নসম্ভারের চেয়ে কম। কিন্তু এর অনেকাংশই উনিশ শতকে সম্রাটের জহুরিদের হাতের কাজ। তার সৌন্দর্য চোখধাঁধানো। ময়ূর সিংহাসনের অনুকরণে তৈরি একটি সিংহাসনও দেখলাম— 'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা'। কিন্তু ওর উপর বসা কি খুব সুখের ব্যাপার? রাজকীয় পশ্চাত তো রত্নখচিত হয়ে যাবার কথা।

ট্রেন না, গাড়িতেই আমরা তেহরান থেকে আয়াতোল্লা খোমাইনির ডেরা কোম শহর হয়ে ইস্পাহান যাই। এখানে বিখ্যাত পোলো খেলার মাঠের চারপাশেই রাজকীয় সব প্রাসাদ আর একটি ক্ষুদ্র রত্নের মতো মসজিদ। আমাদের মোগল সম্রাটদের ঐতিহ্যগৌরব প্রকাশ পেয়েছে লাল-সাদা পাথরে, ইরানে ইটের উপর টাইলের কাজই বেশি। একই ধরনের স্থাপত্য সমরকন্দ-বোখারায়ও চোখে পড়ে। মোগল স্থাপত্যে সৌন্দর্যের সঙ্গে আয়তনগত গরিমার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে, এখানে প্রাসাদগুলির বিরাটত্ব নিয়ে অত কেউ মাথা ঘামায়নি। বোধ হয় মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় ইরানের শা'র অর্থ-সামর্থ্য কিছু কম ছিল। তাই বিলাসের অভাব না থাকলেও তা ঠিক মোগলাই স্তরে পৌঁছয়নি। মনে রাখা ভাল তাজমহলের স্থপতিও ইরানের লোক। কিন্তু ইরানে কোনও তাজমহল নেই। মোগল স্থাপত্যকীর্তিগুলি সব সময়ই যেন রাজকীয় মহিমা গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে— 'অয়ম অহং ভো!' ইরানে সুর একটু চাপা। স্থাপত্যের অন্যতর মহিমা অসংখ্য দেওয়ালচিত্রে— পার্সিয়ান অঙ্কনশৈলীর অসাধারণ সব নিদর্শন ইস্পাহানের প্রাসাদগাত্রে। মোগল প্রাসাদেও ইরান-প্রভাবিত অঙ্কনশৈলীর বহু নিদর্শন ছিল। এক লাহোর ছাড়া বেশির ভাগ প্রাসাদেই সেইসব দেওয়ালচিত্র লুপ্ত হয়ে গেছে। রাজপুত রাজপ্রাসাদ আর ধনীর হাভেলিতে এই ঐতিহ্যের কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। সে সবই ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতি সম্মিলনের ফল। ইরানে বিশুদ্ধ পারসিক শৈলীর নিদর্শন। হুমায়ুন বাদশা ইরান থেকে শিল্পী এনেই মুঘল অঙ্কনশৈলীর প্রতিষ্ঠা করেন— ইরানি আর রাজপুত চিত্রকরদের পাশাপাশি বসে কাজ করিয়ে।

ইস্পাহান থেকে শিরাজ। ছোট শহর। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান—হাফিজের কবর। তার পাশেই সুন্দর একটি বাগান। চারপাশে দেওয়ালের গায়ে গায়ে কুলুঙ্গি। সর্বক্ষণ হাফিজের কাব্য যন্ত্র মারফত পরিবেশন করা হচ্ছে। কুলুঙ্গিতে বসে এক সময় শিরাজি পান করা হত। সে জায়গায় পানীয় এখন জলীয় চা। গাইডকে জিগ্যেস করলাম— 'শিরাজি জিনিসটা কি বরবাদ হয়ে গেছে? মদ্যপান নিষিদ্ধ? সভ্য মানুষ সে আদেশ মেনে চলে?' গাইড মুচকি হেসে বললেন, 'পরিবর্তন শুধু একটাই হয়েছে। আগে আমরা নমাজটা গৃহাভ্যন্তরে সেরে, বাইরে শিরাজি খেতাম। এখন শিরাজিটা ঘরে বসেই খাই। নমাজ পড়ি বাইরে।'

মধ্যযুগের ইরান মনোহর। কিন্তু সত্যি বলতে মোগল পুরাকীর্তির মতো বিস্ময়কর না। তাজমহল, লালকেল্লা, ফতেহপুর সিক্রির তুলনা নেই। আমার চোখে ইউরোপেও না। শুধু মিশরে কারনাক, ভ্যালি অফ কিংস আর আবু সিম্বেলের মন্দির আর স্মৃতিসৌধগুলি তাদের গম্ভীর বিশালতা নিয়ে ক্ষুদ্র মানুষের অকিঞ্চনতা দ্ব্যর্থতাবর্জিত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদেরও তুলনা নেই।

আমাদের অতি প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলি মহেঞ্জোদারো বাদ দিলে আর কোথাওই প্রায় মাটির উপর দাঁড়িয়ে নেই। শুধু নাগার্জুনিকোণ্ডায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের পুরো একটি শহর পাওয়া গিয়েছিল। অর্থনৈতিক উন্নতির খাতিরে নাগার্জুন সাগরের জলে সেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি। শুনেছি—এটা সত্যিতে প্রয়োজন ছিল না। বাঁধটা অন্যত্রও করা যেত, শুধু কিছু দেরি হত। কিন্তু ভোটের তাগিদে নাকি স্থানীয় নেতাদের তর সয়নি। মানুষের জীবনে ভোটের চেয়ে দামি আর কি কিছু আছে?

ইরানের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিসে কঠিন পাথরে তৈরি রাজপ্রাসাদ কিন্তু মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদগুলি শুধু ধসে পড়েছে। তাছাড়া সব কিছুই আড়াই হাজার বছর আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সেকেন্দর শাহ মাতাল হয়ে মানুষের এই অনবদ্য সৃষ্টি আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধ্বংসলীলায় তাঁর সাফল্য যে সীমিত ছিল, পার্সিপোলিশের প্রাসাদ এখনও সে কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সে প্রাসাদের সব কিছুই সম্রাটের মহিমা ঘোষণা করছে। উঁচু চাতালের উপর রাজকীয় সিংহাসন বসানো থাকত। অতি প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছতে হত। সিঁড়ির গোড়ায় দুই সিংহের মূর্তি। বোধ হয় তাদের প্রতীকী বক্তব্য— সাবধান! সিংহের গুহায় প্রবেশ করছ। তোমার ভাগ্যে কী আছে তা নির্ভর করছে রাজকীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। শিরোপাও পেতে পারো, শিরশ্ছেদও হতে পারে। অতএব বুঝে যেয়ো। সিঁড়ির দু পাশের দেওয়ালে সম্রাটের অধীনস্থ নানা জাতি-উপজাতির ছবি। তাদের অবয়বে জাতিগত পার্থক্যের চিহ্নগুলি স্পষ্ট। তারা নানা উপঢৌকন নিয়ে সম্রাটের পদতলে নিবেদন করতে চলেছে। মনে হয়—চারিদিকে যেন গাম্ভীর্য আর ভয়ানক সম্ভাবনার পরিবেশ।

পার্সিপোলিসে একটা জিনিস দেখে অবাক হয়েছিলাম। ওখানকার স্তম্ভগুলি হুবহু অশোকস্তম্ভের মতো। সেই পালিশ, সেই দর্পিত সিংহমূর্তি, শুধু অশোকের ধর্মচক্রটি অনুপস্থিত। পটনার কাছে কদমকুয়ায় মেগাস্থিনিস-বর্ণিত প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনও রয়েছে।

কাঠের তৈরি প্রাসাদ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু পাথরের স্তম্ভগুলি ইতস্তত পড়ে আছে। এখানে তারা স্বকীয় মহিমায় সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এক সময় সাহেব পণ্ডিতরা অশোকস্তম্ভে গ্রিক প্রভাব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু পারসিক স্তম্ভগুলির সঙ্গে হুবহু মিলের কথা কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তবে সাম্প্রতিক পুরাতত্ত্বর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

এতক্ষণে ট্যুরিস্ট হিসাবে পৃথিবীর পথে পথে ঘোরবার বিবরণ দিয়েছি। ২০০০ সালে ট্যুরিস্ট হিসাবেই ৫২ বছর পরে নিজ গ্রাম কীর্তিপাশায় গেলাম। প্রসন্নকুমার ইনস্টিটিউটে কয়েকশো গ্রামবাসী অভ্যর্থনা দিলেন। দুটি মেয়ে গাইল, 'ঝরা ফুলদলে কে অতিথি, সাঁঝের বেলায় এলে কাননবীথি'। দেখলাম পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে আছে। দালানবাড়ির সামনেটা দেখতে একই আছে। পুষ্করিণীও সংস্কারবর্জিত না। শুধু এক হিন্দু ভদ্রলোক কড়ি-বর্গা খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ায় বাড়ির দোতলার ছাদ ভেঙে পড়ে বেশিরভাগ ঘর খন্ডহর রূপ নিয়েছে। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ জমিদারভবনের শোক বহু মানুষের অশ্রুসিক্ত আলিঙ্গনে মুছে গেল।

গত দশ-বারো বছরে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। তার থেকে কিছু স্ন্যাপ-শট পাঠক-পাঠিকাদের পরিবেশন করলাম। আমার এই কথাটি ফুরাল। নটে গাছটি মুড়াতে আর একটু দেরি আছে।

আমার জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয় দিন ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮। সেদিন দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। দেবদূতরা লম্বা লম্বা ভেঁপু বাজালেন, দ্যুলোক-ভূলোক এক স্বর্গীয় আলোকে প্লাবিত হল। যিনি সেই শুভ দিনে শুভ মুহূর্তে ভূমিষ্ঠা হলেন তাঁর নাম লীলালক্ষ্মী বিঘ্নরাজা। তাঁকে দর্শন করে আমার চতুর্বর্গ ফললাভ হল।

সেই ব্যক্তির বয়স এখন সাত। আমাকে সান্ত্বনাহীন করে লন্ডন ছেড়ে তিনি ম্যানিলা চলে গেছেন। সেখানে মাঝে মাঝে যাই। তবে অনেক দূরের পথ, অনেক খরচা। তাই সামলে-সুমলে বছরে কয়েক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে কাটাতে যাই।

তিনি অতি জ্ঞানী ব্যক্তি, এবং একজন বিশিষ্ট নারীবাদীও বটে। ট্রয়ের যুদ্ধের গল্প বলছিলাম। প্যারিস হেলেনকে নিয়ে পালাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'ডিড শি ওয়ান্ট টু গো?' ট্রয়ের সর্বধ্বংসী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মেনেলাস হেলেনকে নিয়ে ঘরে ফিরছেন। আবার প্রশ্ন, 'ডিড শি ওয়ান্ট টু গো উইদ হিম?'

সম্প্রতি তিনি পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। বললেন, 'পিপল হ্যাভ টু ডাই। আদারওয়াইজ দেয়ার ইস নো প্লেস ফর নিউ পিপল।' আশ্বাস দিলাম—আমরা স্বামী-স্ত্রী আমাদের জায়গা দুটো শিগগিরই ছেড়ে দেব।

শেষ কথা

দিন হয়ে এল গত।
ভাবিতেছি বসি নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুয়ারে
দূর প্রভাতের ঘরে ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনকথা শেষ হল। অনেক আশা, অনেক কিছু শিখবার ইচ্ছে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম। তার শতকরা দশ ভাগ পূর্ণ হয়েছে। আশাতীত সৌভাগ্যও হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে অফুরন্ত স্নেহ-ভালবাসা যা পেয়েছি তার কোনও পরিমাপ হয় না। সর্বোপরি লীলালক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েছেন। আমার ভাগ্যে এত আনন্দও লেখা ছিল কখনও কল্পনা করিনি।

অন্য ব্যর্থতাবোধ ছাড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে শুধু একটা ক্ষোভই রয়ে গেল। যৌবনে নিজস্ব জীবনদর্শনের কেন্দ্রে একটি তত্ত্ব ছিল, যা আমাকে নানা সংঘাতের ভিতর সুবুদ্ধি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্তি-মানুষের ব্যবহারে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তার চেহারার মতো মানুষের স্বভাবও প্রকৃতিদত্ত। এর উপর কারও হাত নেই। এই কথা ভেবে নানা সময়ে নানা লোকের শত্রুতার শান্ত মনে মোকাবিলা করতে পেরেছি। বার্ধক্যে এই সুবুদ্ধি আমার লোপ পেয়েছে। কিছু তথাকথিত বন্ধুর (যাদের কেউ কেউ আমার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত) নিরবচ্ছিন্ন গোপন শত্রুতার ফলে তাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বোধ করি। এতে ক্ষতি আমার, তাদের না। আশা করি এই অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তিতে মরতে পারব। তবে যে সব মানুষ নামের অযোগ্য নিকৃষ্ট জীব বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটাতে উদ্যোগী তাদের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা যেন পরম পুণ্য জ্ঞানে আমরণ চিত্তে ধারণ করি। এ ব্যাপারে আমার কোনও অপরাধবোধ নেই।

গত ৮ মে ২৫ বৈশাখ (তারিখটি লক্ষণীয়) আমার আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। শরীরে একটা জন্মগত সমস্যা আছে—aortal stenosis। যে-বৃহৎ ধমনীটি বয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে যায় সেটি বুজে আসছে। ডাক্তার এবং যমদেব নোটিশ দিয়েছেন—বছর দেড়েকের মধ্যে কিছু করা দরকার, নতুবা...। কিছু করা মানে হৃৎপিণ্ডের একটি ভাল্‌ভ কেটে কোনও শুয়ারহৃদয় থেকে তার বিকল্প নিয়ে জুড়ে দেওয়া। ওয়েবসাইটে এই তথ্য পেলাম যে, এ অস্ত্রোপচারে চারটি কমপ্লিকেশন হতে পারে—রক্তপাত, সন্ন্যাস, কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া, আর চতুর্থ, মৃত্যু। শেষোক্তটি কি কমপ্লিকেশন? ও তো সব সমস্যার সমাধান। এই আসুরিক চিকিৎসায় শতকরা দশ জন ঘায়েল হয়। সুতরাং ওটা করাব না ঠিক করেছিলাম। তা ছাড়া অন্যায় বিনিময় বলে একটা কথা আছে। কোনও শুয়ারকে ডেকে

‘ তোমার হৃদয় আমার হোক’ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কারণ পরিবর্তে শ্রীযুক্ত বা শ্রীমতী শুয়ার তো কিছু পাবেন না, নেহাতই বেধড়ক মারা যাবেন। ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। তাই নিজের ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছি। প্রাণায়ামাদি করছি। দেখা যাক, কদ্দিন চলে। তবে শেষ অবধি ডাক্তার এবং বরাহের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথ নেই। আপাতত বন্ধুগণ, বিদায়।

শেষ কথার পরের কথা

প্রথম সংস্করণের শেষ পরিচ্ছেদের নাম 'শেষ কথা'। লজ্জার মাথা খেয়ে আবারও লিখতে বসেছি, কারণ যমদেব ছুঁয়েও ছুঁলেন না, আমি এমনি পাপিষ্ঠ, যাকে বলে যমেরও অরুচি। যাক গে, পাপিষ্ঠ হলে সত্যিই যদি যম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন, তবে আমি জন্ম জন্ম পাপিষ্ঠ হতে রাজি। কারণ বেঁচে থাকার কোনও বিকল্প নেই। আর সকলেই জানেন, পাপিষ্ঠ হওয়া মহা সুখের ব্যাপার। আমাদের এই পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে পাপিষ্ঠরাই তো সবচেয়ে সুখে আছে। তারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তারাই আমাদের পয়সায় কেনা ট্রামবাস পুড়িয়ে রাজা উজির হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারাই গণহত্যা করে বা করিয়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দাবা খেলায় নামে। তারাই সহস্র কোটি টাকার কালোবাজারি করে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র বলে পরিগণিত হয়। অতএব আমার প্রস্তাব আমাদের জনগণের নতুন স্লোগান হোক— পাপিষ্ঠগুষ্ঠি জিন্দাবাদ, অপাপিষ্ঠরা নিপাত যাক। আর আমাদের নতুন জাতীয় সংগীত হোক

আমরা সবাই ছ্যাঁচোর
আমাদের এই চোরের রাজত্বে
নইলে মোরা চোরের সনে
মিলব কী স্বত্বে?

এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে এত শ্রদ্ধা তাও অটুট রইল, আর আমাদের গৌরবময় রাজনীতির প্রকৃত অবস্থাটাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য অবিস্মরণীয় ভাষায় বিধৃত হল।

কিন্তু এসব হল বাজে কথা। বর্তমান বইটির সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে বৃহত্তর পটভূমিটা বুঝতে সুবিধে হবে বলে লিখলাম। আমার বয়সের মানুষ কথা বলতে গেলে কিছু বাজে কথা বলবেই। সুতরাং ব্যাপারটা ক্ষমার্হ।

২০০৭ সনের ৬ এপ্রিল দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেলাম— আমাদের তখনকার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে। তিনি পেশায় বৈজ্ঞানিক, জাতিতে মুসলমান। যাঁরা সম্মান পাবেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে সামনে উপবিষ্ট অভ্যাগতদের দেখলাম। প্রথম সারিতে পুরানো সহকর্মী আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, মাথায় পাগড়ি, জাতিতে শিখ। তাঁর পাশে সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে শোভিত আমাদের লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, শতকরা ১৫০% বাঙালি। যাঁরা সম্মানিত হবেন তাঁরা ভারতবর্ষের সব অঞ্চল থেকে এসেছেন, গায়ে বিচিত্র আঞ্চলিক পোশাক। অভ্যাগতদের মধ্যে তাঁদের আত্মীয়স্বজন, অনেকেরই অঙ্গে আঞ্চলিক বেশবাস। তাঁদের মধ্যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং সালোয়ার-কামিজে সজ্জিতা শ্রীমতী লীলালক্ষ্মী। মনে হল আমার সামনে আমার চারপাশে আমাদের বাল্য আর প্রথম যৌবনের কল্পনার ভারতবর্ষ— যথা নদীনাং বহবাম্বু বেগাঃ। সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজ পোকায় খাওয়া, দুর্নীতিগ্রস্ত, নানা বিভেদে হতশ্বাস, দরিদ্র ভারতবাসীর অনাহার দূর করতে অক্ষম। তবুও কি আমরা সফলস্বপ্ন? না,

কিন্তু যা পেয়েছি তাকে উপেক্ষা করার মতো মনোবল আমার নেই। মাথা পেতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মান গ্রহণ করলাম। আমার জীবন সার্থক হল।

দেশ থেকে শ্বেতদ্বীপ ফিরে গেলাম, রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়ার ঠিক বারো দিন পরে অস্ত্রচিকিৎসা হল, বক্ষ বিদারণ করে, হৃৎপিণ্ডের একটি ভালভ কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় শূয়ার, না গোরুর হৃৎপিণ্ড থেকে একটি ভালভ (এই শব্দের বাংলা কোনও প্রতিশব্দ থাকলে তা আমার জানা নেই) নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। ফলে সঙ্ঘ পরিবারের চোখে আমি পবিত্র জীব হলাম, না গো-হত্যার জন্য অপ্রত্যক্ষ ভাবে হলেও দায়ী হলাম, জানি না। ভয়ে ভয়ে আছি। কারণ তেনাদের মতিগতি সহজবোধ্য নয়। সম্প্রতি এক ফতোয়া দিয়েছেন যার অর্থ— কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া চলবে না। যাঁরা ফতোয়াটা দিয়েছেন তাঁরা সম্ভবত টেলিভীষণী রামায়ণ ছাড়া আর কিছু পড়েননি।

অস্ত্রোপচারের জন্য যখন আমাকে নিয়ে গেল তখন আমি বিশেষ দাওয়াইয়ের কৃপায় সুখসাগরে ভাসমান। চেতনা যেটুকু ছিল তার মারফত বার্তা পেলাম, মরি তো সুখেই মরব। মরব এই বিশ্বাস নিয়েই অস্ত্রোপচারে রাজি হয়েছিলাম, কারণ উপায়ান্তর ছিল না। বিশ্বাসটা শতকরা ১০০% যুক্তিযুক্ত ছিল না, তবে এই চিকিৎসায় দশ জনে একজন ঘায়েল হয়, আমার বয়সে শতাংশটা আর একটু বেশিও হতে পারে।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে এল। বেঁচে আছি, এই কথাটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগল। বুঝলাম নিতান্তই আটপৌরে এক শারীরিক অভিজ্ঞতা থেকে। হাসপাতালের বিছানার ফেনশুভ্র চাদরের উপর আমার একটা হাত পড়ে ছিল। সুখশীতল সেই চাদরের স্পর্শ থেকে হঠাৎ আশ্বাস পেলাম যে আমি বেঁচে আছি। এই সংবাদে সারা শরীর এক গভীর স্নায়বিক সুখে প্লাবিত হল। দেহ মনের এমন গভীর তৃপ্তির অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি। জানলাম, মরণশীল জীবের চরম সৌভাগ্য শুধু বেঁচে থাকা, নীরোগ যন্ত্রণামুক্ত শরীরে। এর তুলনায় আর সব কিছুই তুচ্ছ। নানা আশা-নিরাশা ছোট বড় ব্যর্থতাবোধ হঠাৎ অবান্তর মনে হল। চেনা অচেনা সব মানুষ নিতান্ত প্রিয়জন বলে জানলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম দূর পাহাড়ের গায়ে রাইসরষের ক্ষেত ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে আছে। মনে হল স্বর্গের দৃশ্য দেখছি। চেতনা, শুধু বেঁচে থাকার চেতনা, কোটি মণিমুক্তার চেয়ে মূল্যবান এই বোধ দেহমনে একটা সুখের আস্তরণ বিছিয়ে দিল। আমাদের দর্শনে উল্লিখিত কৈবল্য আর এই বোধ কি এক না হলেও সমগোত্রীয়?

তারপর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে। এই সময়কালের প্রধান ব্যক্তিগত খবর, 'বাঙালনামা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল, প্রচুর বিক্রি হওয়ায় ঘরে কিছু অর্থ সমাগম হল, লেখা থেকে যার তুলনীয় অর্থ আগে কখনও পাইনি। এর মধ্যে দুনিয়ার বাজারে মহামন্দা শুরু হয়ে গিয়েছে। তার ধাক্কা আমার মতো মিশকিন মোবারক লোকেরও গায়ে এসে লেগেছে। মিশকিন মোবারক শব্দ জুটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি, ওর মানে পবিত্র ভিখারি। বাবা কথাটা প্রায়ই ব্যবহার করতেন, নিতান্ত বেচারা মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। সেই থেকে কথাটা আমাদের পরিবারে চালু, প্রয়োগটা অভিধান-সম্মত কি না জানা নেই। মোট কথা বই বিক্রি হওয়ায় আমি উপকৃত। ক্রেতাদের ধন্যবাদ।

কিন্তু জনপ্রিয়তার জন্য এ দেশে একটি বিশেষ মূল্য দিতে হয়, সে ব্যাপারটা খুব স্বাস্থ্যকর কি না আমার সন্দেহ আছে। উপযুক্ত বিশেষ্যর অভাবে আমি সেই প্রবণতাটিকে আমড়াগাছি সংস্কৃতি বলে বর্ণনা করছি। এই সংস্কৃতির প্রধান লক্ষণ— সাধারণত অযোগ্য কোনও ব্যক্তিকে মহাপুরুষ বলে বন্দিত করা। লক্ষণীয় এই যে ব্যাপারটায় স্তুতিকারদের কোনও স্বার্থ নেই। ওঁরা যা করেন তা নিতান্তই অকারণ পুলকে। পুলকের যিনি লক্ষ্যস্থল, সম্ভবত তিনিও এতে অন্তত কিছুদিন পুলকিত হন, যদিও জীবধর্মের অধীন হলে যে কোনও মানুষেরই কয়েক দিনেই এতে দমবন্ধ হয়ে আসার কথা। আমার ক্ষেত্রে আমড়াগাছি সাময়িক সুখেরও কারণ হয়নি। কারণ দুনিয়ার হাটে আমার বাজার দর আমার ভালই জানা আছে।

সেটা যে খুব উঁচু নয়, তার অন্যতর প্রমাণ ইংরাজিতে একটি আত্মজীবনী লিখেছি (সেটা কোনও অর্থেই বাঙালনামার অনুবাদ নয়), তার জন্য প্রকাশক খুঁজে পাচ্ছি না। বিলেতে পাইনি তার কারণ মন্দার ভয়ে সবাই ত্রস্ত, বিশেষ করে যে বইয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চুটিয়ে গালিগালাজ করা হয়েছে তা ছাপালে বিক্রি হবে কি না সন্দেহ। এক প্রকাশক নিতে রাজি হয়েছিলেন, আমার এক 'বন্ধু' হামলে পড়ে প্রস্তাবটা বানচাল করেন। বোধহয় সাম্রাজ্যের আলোচনাটা তাঁর ঠিক হজম হয়নি। হ্যাঁ, ওদেশেও আমি সম্পূর্ণ বন্ধুহীন না, যদিও স্বদেশের তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। আর দেশে এক সময় যাঁরা প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন তাঁদের আবিষ্কৃত মহাপুরুষরা এখন নানা ক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তি। রাজধানীতে তো তাঁরা রীতিমতো রাজত্ব করছেন। আমার মতো অকিঞ্চন লোকের বই ছাপানো বন্ধ করা তাঁদের তো বাঁ হাতের খেল। অতএব আমাকে যাঁরা আমড়াগাছি করেন তাঁরা অবহিত হোন— আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, আমার 'খ্যাতি'র যৌক্তিকতা নিয়ে যথাযথ কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে। অতএব ক্ষ্যামা দিন, আমাকে আর বেশি বাড়াবেন না, বাড়ালে আখেরে আপনাদেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

এই দুই বছরে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে কতগুলি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল যা আমার ব্যক্তিগত ভালমন্দ বোধকে স্পর্শ না করে পারেনি। প্রথমেই নন্দীগ্রাম। আমাদের উদারপন্থী রাজ্যে এমন ঘটনা দেখতে হবে এ কথা কখনও কল্পনাও করিনি। বিরোধী দলের প্রধান নেত্রীর কার্যকলাপ এতই জনস্বার্থবিরোধী, এতই সুবুদ্ধিবিরহিত যে তিনি কখনও সিংহাসন অধিকার করবেন ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। অপর পক্ষে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তসলিমা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন। এ নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিলাম। কিছু ফল হল না। ওঁকে কলকাতায় থাকতে দিলে সত্যিই কি মুসলমানরা বিরুদ্ধে ভোট দিতেন? তাঁদের অধিকাংশ লোক ধর্মান্ধ এমন মনে করার কী হেতু আছে? মুসলমান-প্রধান রাজ্য বাংলাদেশেও মৌলবাদীরা শতকরা দশের বেশি ভোট পায় না।

সম্ভবত রাজনৈতিক নেতাদের হিসাব নিকাশ আর সাধারণ মানুষের চিন্তা এক পথে চলে না। ওঁরা আমাদের চেয়ে বেশি সাবধানী, কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। আমরা রোজ রাস্তায় বের হই মিনিবাসে চাপা পড়ার ঝুঁকি নিয়ে, কাটা তেলের ধোঁয়ায় ফুসফুসে ক্যানসার হবার সম্ভাবনাটা প্রতিদিন আরেকটু বাড়িয়ে। অবশ্য ওই বিষ যাঁরা ছড়ান, তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

সরকার এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ই সমান ব্যাকুল। কাটা তেল বিক্রি বন্ধ হলে ষাট হাজার লোক খাবে কী? তাতে যদি এক কোটি লোক ক্যানসারে মরে তো কী করা যাবে? সংগ্রামশাস্ত্রে এ ধরনের মৃত্যুকে কোল্যাটারাল ড্যামেজ বলে। ওসব মেনে নিতে হয়। বৃথা ঝামেলা করবেন না, আপনার প্রাণটা কি ভোটে জেতার চেয়ে বেশি দামি? যত্ত সব!

মৃত্যুর কথা ওঠায় মনে পড়ল,— গত দেড় বছরে আমার চারপাশে মৃত্যুর উৎসব শুরু হয়ে গ্যাছে। কুমার মুখার্জির উৎসাহে 'বাঙালনামা' লেখা শুরু করি। ওর খুব ইচ্ছে ছিল বইটা প্রকাশিত দেখে যাওয়ার। দু' সংখ্যা ছাপা হওয়ার পর ও চলে গেল। ওর ইংরিজিতে লেখা হিন্দুস্থানি মার্গ সংগীতের ইতিহাস মৃত্যুর ক'দিন আগে প্রকাশিত হল। বই পড়ার ক্ষমতা তখন আর নেই। সদ্য প্রকাশিত বইটি পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দেখছিল কুমার। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান ক'জনের জীবনেই বা লোপ পায়?

কুমারের পরেই গেল অমর সান্যাল। সেদিন দুপুরেই এক সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেয়েছি। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে শুনলাম ও চলে গেছে। নানা গুণে গুণী মানুষটিকে কেউ চিনল না। অবশ্যি তা নিয়ে ওর যে খুব মাথাব্যথা ছিল এমন নয়। অদম্য প্রাণশক্তির এমন প্রকাশ আর কোনও মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি।

তারপর গেলেন কল্যাণ সেন, রেভিন্যু বোর্ডের অবসর প্রাপ্ত সভ্য, ঔদ্ধত্যবর্জিত ডাকসাইটে অফিসার, '৪৩ সন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শেষ ক'দিন বড় কষ্ট পেলেন। আমি তখন বিদেশে।

আর অরুণ দাশগুপ্ত। যৌবনের সহকর্মী, আমার বিদ্যাচর্চার প্রথম পৃষ্ঠপোষক, গান্ধীবাদ যাঁর জীবনের কেন্দ্র জুড়ে ছিল। সম্পূর্ণ শুদ্ধ চরিত্র মানুষ। আমাদের দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন সমাজে উনি কী করে বেঁচে ছিলেন সে প্রশ্নর সদুত্তর কখনও পাইনি।

সম্প্রতি গেলেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত— অসহ্য কষ্ট পেয়ে। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষটির এই অন্যায় পরিণতি দেখে আমার অবিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। রবিবাবু উনিশ শতকে বাঙালির নব জাগরণের শেষ প্রতিনিধি। মানবিক বিদ্যার এমন কোনও দিক ছিল না যা নিয়ে উনি গভীর পড়াশুনা করেননি। এই মানুষটি চলে গেলেন, বাঙালি ওঁকে নীরবে যেতে দিল। কোনও উল্লেখযোগ্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ওঁর স্মরণে একটা সভা করা প্রয়োজন মনে করল না। শুনলাম তার অন্যতর কারণ, 'উনি ওদের লোক'। উনি কারও লোক ছিলেন না। ওঁর চোখে যা কিছু অন্যায় মনে হত সহাস্য বিদ্রূপের ভাষায় উনি তার সমালোচনা করতেন। আদর্শবাদী মানুষটির বিচার সবসময় হয়তো ঠিক হত না। কিন্তু দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারার মতো কোনও অপরাধ এই অজাতশত্রু মানুষটি করেননি।

মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। আমার চারপাশে যে দিকে তাকাই শুধু মৃত্যুই চোখে পড়ে। বুঝতে পারি, নিজের মৃত্যুও আর খুব দূরে নয়। মৃত্যুচিন্তার আলোয় পৃথিবীটাকে অপরিচিত মনে হয়। সব আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা বোধ অবান্তর হয়ে যায়। মনে হয় আর অল্পদিন পরে এইসব আশা নিরাশা ভালমন্দ বিচার কিছুরই কোনও অর্থ থাকবে না। হঠাৎ সব কিছু বড় প্রিয় বড় মূল্যবান হয়ে ওঠে। চেতনা লুপ্ত হয়ে যাবে, এই রূপ রস শব্দ গন্ধের বর্ণময় জগৎ

আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে— এই চিন্তা মনে একটা বিষণ্ণতার আবরণ টেনে দেয়। আমার চেতনার জগতে লীলালক্ষ্মী থাকবে না, কারণ সেই জগৎটাই বিনষ্ট হয়ে যাবে। মৃত্যুর আর সব পরিণাম মেনে নিতে পারি, শুধু ওই অবর্ণনীয় ভালবাসার পাত্রী ছোট্ট মানুষটি আমার বিনষ্ট চেতনার বাইরে চলে যাবে এই সত্য মেনে নেওয়ার শক্তি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

নির্ঘণ্ট